উজ্জলভারত

—চতুর্দ্দশ বর্ষ—

মাঘ ১৩৬৭—পৌষ ১৩৬৮, ১৮৮৩ (১৯৬১)

বর্ষসূচী

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদিকা

শ্রীরেণু মিত্র

উজ্জলভারত

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম বাগুইআটি

পোঃ অশ্বিনীনগর

২৪ পরগণা

উজ্জ্বলভারত

১৪শ বর্ষ, মাঘ ১৩৬৭—পৌষ ১৩৬৮ ১৮৮৩ (১৯৬১)

অথর্ববেদীয় মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ১, ২
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

অন্নপূর্ণা (কবিতা)
শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

অপরাজিতা (কবিতা) ২৮৯
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

অরণ্যকাল (কবিতা)
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

আজি হতে শতবর্ষ আগে
জনাব মেজাউল করীম

আমড়া-দর্শন
শ্রীমহীদাস

আমাদের কথা ১

আমার গ্রাম (কবিতা) ৩৪৭

আমার সোনার বাংলা (কবিতা) ২৫৪
শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

উজ্জ্বলভারত (কবিতা)
শ্রীশান্তশীল দাশ

একটি উজ্জ্বল স্বপ্ন (কবিতা)
শ্রীকৃতী সোম

ঋণ শোধ (কবিতা) ১৬৬
শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

কবি রবীন্দ্রনাথ
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কন্নড় শৈব সাহিত্য ৩৬২
শ্রীবিকুপদ ভট্টাচার্য

কল্যাণধর্মী সাহিত্য
শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

গান্ধীজীর উপবাস ও রবীন্দ্রনাথ
শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

গুরু নেতাজী (কবিতা)
শ্রীকালিকিঙ্কর সেনগুপ্ত

তামিল ভক্তি-সাহিত্যের ভূমিকা
শ্রীবিকুপদ ভট্টাচার্য

তামিল বৈষ্ণব কবি অণ্ডাল্ ...২৬৬, ৩০১
শ্রীবিকুপদ ভট্টাচার্য

তিরিশে জানুয়ারী (কবিতা)
শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

তুমি মূর্ত হয়ে ওঠো (কবিতা)
শ্রীবিকুপদ রায়

দেবদেবীর স্তব-স্তুতি (কবিতা)
শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

দুঃখময় (কবিতা) ৩৬৮
শ্রীদিবাকর ঘোষ

নমোনমঃ
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

নরনারায়ণ আশ্রমের পল্লীকেন্দ্র
শ্রীপ্রতিভা রায়

নবদ্বীপে পুরুষোত্তমানন্দ ৩৩৬
শ্রীপ্রতিভা রায়

নাম ও নামী (কবিতা)
শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

নিয়ন্ত্রিত পাঠের পরিকল্পনা (২)
শ্রীসুবোধ কুমার সেনগুপ্ত

নীরব কর্মী সতীশচন্দ্র গুহঠাকুরতা
শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ

পথিক (কবিতা)
শ্রীঅরুণচরণ চক্রবর্তী
পনরই আগস্ট ২১৬
জনাব রেজাউল করীম
পশ্চিমে বৈশাখ (কবিতা)
শ্রীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
পুরুষোত্তমানন্দের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ
সম্পাদিকা
পুস্তক পরিচয় : ১৪৯, ১৯৩, ২০০, ৩০৫, ৩৫৭, ৩৬৫
পূরবীর সুরে মানবমুখিতা ৯৭
শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত
প্রণাম (কবিতা)
শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়
প্রার্থনাকালীন ভাবণ—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত
১১২, ২০৫, ২৪১, ২৯১, ৩৪৫, ৩৫৯
প্রাক্-নিত্যগোপাল ৬৭
শ্রীপ্রতিভা রায়
পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে (১৯৪৯)—২৭—
পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে (১৯৫০) ১—১২
৩৫, ৭৯, ১১৭, ১২৯, ১৫৫, ১৮২,
২০৮, ২৫৮, ২৯৫, ৩৪৯, ৩৭৩
ফাউস্ট ১৮
শ্রীমানস রায়
বহুরূপের ব্যায়াম
শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত
বরিশাল হিতৈষী হইতে
শ্রীদুর্গামোহন সেন
বাইশে শ্রাবণ
শ্রীজগন্নাথ সাহা
বাংলা লোক-সাহিত্যের অনুশীলন ২৫
ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য
বাংলা আধুনিক লিরিকের জন্ম
শ্রীসমুদ্ধ বসু
বাঁশীর ব্যথা (কবিতা)
শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়
বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গ
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
বিনোবাজীর দৃষ্টিতে শিশু-শিক্ষা
জনাব রেজাউল করীম
বিভূতি-সাহিত্যে উদ্ভিদ্ প্রকৃতি
শ্রীকেশবকুমার ভট্টাচার্য
বিরহ (কবিতা)
শ্রীশান্তশীল দাস
বৃদ্ধাশ্রম
শ্রীজিতেন গাঙ্গুলী
বেলাভিভর রোড ধরে (কবিতা)
শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ
ভগবতী (কবিতা)
শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
ভাবান্তর (কবিতা)
শ্রীসুমুদরঞ্জন মল্লিক
মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং
শ্রীগৌরী বাগচী
মানবত্তার সাধক
শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী
মায়ের পূজা ২৩৮
শ্রীরেণু মিত্র
ম্যাকডুগাল ও 'হরমিক' মনোবিদ্যা
শ্রীমনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ,
বিটি, ডি, এস, ই
যম (একাঙ্কিকা)
শ্রীযন্মথ রায়
রবীন্দ্রনাথ (কবিতা)
শ্রীকণপ্রভা ভাদুড়ী
রবীন্দ্রনাথ
শ্রীরেণু মিত্র

রবীন্দ্রনাথ (কবিতা)
শ্রীশান্তশীল দাশ

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী
শ্রীজিতেন গাঙ্গুলী

শতবর্ষ পরে (কবিতা)
শ্রীভারতী

শবরী
শ্রীঅনিলকুমার সমাজদার

শাক্ত পদাবলী ৩৬৬
শ্রীপ্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন
শ্রীবিভা সরকার

শিল্পীর মনোবিদ্যা
শ্রীসুহৃৎ চন্দ্র মিত্র

শেষ নিবেদন (কবিতা)
শ্রীসুশীল কুমার ভট্টাচার্য

শেষের খাতা (কবিতা)
শ্রীনমিতা ভট্টাচার্য

শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীবেণু মিত্র

শ্রীনিত্যগোপাল
শ্রীরেণু মিত্র

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
শ্রীরেণু মিত্র

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ স্মরণে ৩৩২
শ্রীচুনীলাল মিত্র

শ্রীমতী রাধা
শ্রীজগন্নাথ সাহা

শ্রীশ্রীদুর্গা
শ্রীনিত্যগোপাল

সবাই জাগবে বলে (কবিতা)
শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

সমন্বয়-গুরু পুরুষোত্তমানন্দ স্মরণে
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমন্বয়-মূর্তি নিত্যগোপাল ১১৬
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমস্যা ও সমাধান
শ্রীজিতেন গাঙ্গুলী

সমাজ-বিদ্যার শিক্ষক
শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত

সমাজবিদ্যাশিক্ষায় নিয়ন্ত্রিত পাঠ
শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত

সাময়িকী : সরস্বতী পূজা
সমবায়
বাসন্তী অষ্টমী ৩৬৬
বুদ্ধ পূর্ণিমা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের সমাধিস্থানে
সুকুমার গুপ্তের স্মৃতিরক্ষা
রবীন্দ্র জন্ম অনুষ্ঠান
আবার রক্তপাত
৺সুরেশ গুপ্তের স্মৃতি ও কীর্তিরক্ষা
জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা
হরিজন আশ্রম
গুরুপূর্ণিমা
জন্মাষ্টমী
১৫ই আগস্ট
পথ
'যো যেত্তি তত্ততঃ'
শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ-জন্মোৎসব
গীতাজয়ন্তী

স্বগত বিলাপ : প্রার্থনা (কবিতা)
শ্রীশান্তশীল দাশ

স্মরণতীর্থে (কবিতা)
শ্রীশান্তশীল দাশ

স্বাধীন রাষ্ট্র
শ্রীনলিনী কিশোর গুহ

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ স্মরণে ৩৩৪
শ্রীজিতেন গাঙ্গুলী

স্বামী বিবেকানন্দ ২৩৪
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

হিন্দু-রাজত্বে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ১, ২
শ্রীমোহিতকুমার সেনগুপ্ত ৪৬

হিংসা ও অহিংসা (কবিতা)
শ্রীপ্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রীতারাপীঠের আশীর্বাদে ও গ্রাহক, অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও বন্ধুবান্ধব সকলের সহযোগিতায় 'উজ্জলভারত'-এর চৌদ্দ বৎসর শেষ হইল এই পৌষ মাসে। গ্রাহকদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন পঞ্চদশ বর্ষের বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা দয়া করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব পাঠাইয়া দেন। দেরী করিলে তাঁহারা গ্রাহক থাকিবেন কিনা ইহা বুঝিতে না পারিয়া আমরা বড়ই বিপদাপন্ন হই। যদি কাহারও টাকা পাঠাইতে দেরী হয় তাহা হইলে তিনি যেন সে কথা পত্রদ্বারা জানান, তাহা হইলে আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া পত্রিকা পাঠাইতে পারি। ইতি

কার্যাধ্যক্ষ

উজ্জ্বলভারত

অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা।

উজ্জ্বলভারত

মাঘ, ১৮৮২ শকাব্দ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

আমাদের কথা

আবার বৎসর ঘুরিয়া আসিল। এই মাঘ মাস হইতে 'উজ্জ্বলভারত' পত্রিকার চতুর্দশ বৎসর আরম্ভ হইল। এই তৃতীয় বর্ষারম্ভ যে, উজ্জ্বলভারতের প্রতিষ্ঠাতা, উজ্জ্বলভারতের প্রাণশক্তি শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ উপস্থিত নাই। বারবার বলিয়াছি, বারবার বলিতে চাই, বার বার বলিব তিনি নাই, তবু তিনি আছেন। দেহহীন তাঁহারই সত্তা আছে, ফুটিয়া উঠিতেছে, থাকিবেও। তাঁহার এতটুকু না থাকা সম্ভব এইজন্য নয় যে, তিনি না চালাইলে 'উজ্জ্বলভারত'ই বা কে চালাইতেছেন, নয়নারায়ণ আশ্রম ও নয়নারায়ণ আশ্রম সঙ্ঘই বা কে চালাইতেছেন? আমি ও আমরা এত স্বল্প—সকল দিক দিয়া এত সামর্থ্যহীন যে, এই একটীমাত্র ঘটনাদ্বারাই বুঝা যায় যে, পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার স্থানে ঠিক আছেন, চালাইতেছেন, চালাইবেন। তাই আজ এই বর্ষারম্ভ দিনেও তিনি আছেন—তেরো বৎসর আগের বর্ষারম্ভ দিন হইতে ১৩৬৪-র চৈত্রমাস পর্যন্ত যেরূপ প্রত্যক্ষ থাকিয়াও সকল কাজ আমাকে দিয়া, আমাদেরকে দিয়া করাইয়া লইয়াছিলেন, এখনও সেইরূপই আছেন, করাইতেছেন। এই দিনে আজ তাঁহাকে আমাদের সকল সত্তার প্রণাম, সম্মিলিত প্রণাম নিবেদন করি।

সম্মিলিত প্রণাম পাইলে পুরুষোত্তমানন্দ আহ্লাদিত হইতেন। কেহ পাঁচজনেরা মিলিয়া মিশিয়া আনন্দে আছে শুনিলে তিনি সেইখানে স্বয়ং-প্রকাশ আস্বাদন করিয়া অতিশয় তৃপ্তি পাইতেন; পাঁচজনে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারিতেছে না জানিতে পারিলে তাঁহার মুখ গম্ভীর হইত, চোখে জল পড়িত। প্রায় তিন বৎসর হইতে চলিল তিনি অদৃশ্য হইয়া আছেন—আজ সকলের মধ্যে তাঁহারই প্রকাশ দেখিতে পাইলে, সকলকে লইয়া সুখে দুঃখে তাঁহারই পথে চলিতে পারিলে, তাঁহার নিকট সম্মিলিত প্রণাম পাঠাইতে পারিলে, মানুষের নিকট হইতে যে অজস্র প্রীতি পাইতেছি এবং ইহারই অপরাপর রূপে আবার কাহারও কাহারও নিকট হইতে যে অপমান লাঞ্ছনা পাইয়াছি—সব কিছুকে একই জীবনের প্রকাশ বলিয়া আস্বাদন করিয়া তাঁহার সেবাকাজে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারিলে তিনি খুশী হইবেন, তৃপ্তি পাইবেন। তাই বর্ষারম্ভ দিনে আমরা যাহারা ছিলাম তাঁহাদের স্মরণ করি, আমরা যাহারা দূরে কাছে ঘরে বাইরে আছি তাঁহাদের স্মরণ করি, আমাদের যাহারা আসিবেন তাঁহাদের স্মরণ করি—সকলকে একত্র করিয়া পুরুষোত্তমানন্দকে আমাদের সম্মিলিত প্রণাম নিবেদন করি আর সেই সঙ্গেই যে আদর্শে, যে জীবনপথে যে কথা বলিতে বলাইতে, আচরণ করিতে করাইতে তিনি আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই আদর্শ, সেই জীবন-চলার পথ স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহাতেই চিরদিন চলার সংকল্প বার বার গ্রহণ করি।

তারপরে প্রণাম জানাই তত্ত্বমূর্তি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-দেবকে—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের যিনি জীবনদেবতা। জড়াজড় সমন্বয়, আদর্শ বাস্তবের সমন্বয়, সংসার সন্ন্যাসের সমন্বয় অর্থাৎ পরস্পর-বিপরীত তত্ত্বের সমন্বয় শ্রীনিত্যগোপালে পাওয়া যাইবে বলিয়াই তত্ত্বমূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল সমন্বয়-মূর্তি। শ্রীনিত্যগোপাল যে সময়ে আসিয়াছিলেন সে সময় তাঁহার এই বিপরীতের সমন্বয়ের তত্ত্ব প্রচারের

দিন ছিল না—তাই তিনি দেহে অবস্থানকালীন নিজেকে কেবলই গোপন করিয়া গিয়াছেন, অথচ জগতে প্রকাশিত হইবার নিপুণ বন্দোবস্তও করিয়া গিয়াছেন। শ্রীনিত্যগোপালের এই তত্ত্বকে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ জীবন দিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য রচনা করিয়া এবং অন্যান্য বহু রচনাদ্বারা পুস্তকে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। উজ্জলভারত এই তত্ত্বকেই গত ত্রয়োদশ বর্ষ হইল প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। তাই তাহার নূতন বর্ষারম্ভ যাত্রাদিনে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালকে আমাদের প্রণাম, প্রাণভরা প্রণাম নিবেদন করি।

বাস্তব-বিমুখ, রাজনীতি-বিমুখ পরলোক-সর্বস্ব ভারতবর্ষকে জড়াজড় সমন্বয়ের কথা শুনিবার আগে কয়েকটী ধাপের মধ্য দিয়া আসিতে হইয়াছে। এই ধাপে একদিকে আছেন রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং আরও আগানো স্বামী বিবেকানন্দ—প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সন্ন্যাসী হইয়াও নূতন বিশ্বকে তথা নূতন ভারতবর্ষকে যিনি আহ্বানও করিয়া আনিয়াছেন, অন্নও দিয়াছেন; অপর দিকে আছেন বিদ্যাসাগর প্রমুখ যুগান্তকারী ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়া আসিয়া মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মা গান্ধী আসিয়া বাস্তব জীবনের কুৎসিৎ দিক রাজনীতিকে যেখানে ভারতবর্ষীয় অধ্যাত্মজীবনের সঙ্গে সংপ্রথিত করিয়া উহার রূপ বদলাইয়া দিয়াছেন, সেইখানে জড়াজড় সমন্বয়-তত্ত্বের বাস্তব প্রকাশ সুরু হইল। পুরুষোত্তমানন্দের তত্ত্ব-ঘন জীবনকে রাজনীতির মধ্যে আবর্তন করিয়া 'আমি রাজনীতি করি না, রাধা-নীতি করি'—অর্থাৎ নিপীড়িত, শোষিত, লাঞ্ছিতের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীসংঘর্ষকে প্রথমাবধিই পরিত্যাগ করিয়া সর্ব সমন্বয়ের সহাবস্থান-নীতির সেই ১৯১৯-এ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে প্রস্থাপিত দর্শনকে বাস্তব জীবনে রূপ দান করিতে সুরু হইতেই পুরুষোত্তমানন্দকে যিনি উদ্দীপিত করিয়াছিলেন, জাতির জনক সেই মহাত্মা গান্ধীকে উজ্জলভারতের নববর্ষ যাত্রারম্ভ দিনে আমরা আমাদের প্রণাম নিবেদন করি।

পরস্পর বিপরীতের সহাবস্থানের জীবনবাদ সাহিত্যের মধ্য দিয়া সর্বাপেক্ষা সুন্দর প্রকাশ লাভ করিয়াছিল যে রবীন্দ্রনাথে, সেই কবিগুরুকেও আজ আমাদের এই নববর্ষ-যাত্রারম্ভ দিনে আমাদের প্রণাম নিবেদন করি। রবীন্দ্রনাথ যেখানে বুকিতে পারিয়াছিলেন যে বিশ্বোড়া মৃত্যুর গর্জনের মধ্য দিয়া বিশ্ব-সভ্যতা নূতন সমুদ্রতীর পানে—প্রাণের কূলে—তরী লইয়া পাড়ি দিতে চলিয়াছে, সেইখানে এই সমগ্র জীবনবাদকে তিনি বরণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত রচনা জুড়িয়া সেই জীবন-বাদেরই কথা যেখানে পূর্ব ও পশ্চিম, আদর্শ ও বাস্তব, ঘর আর বাহির, প্রজ্ঞা আর প্রাণ অখণ্ডভাবে এক ব্যাপকতর ও গভীরতর জীবনকেই সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে, আহ্বান করিয়া আনিতেছে। রবীন্দ্রনাথ সেদিন যে প্রাণের উপলব্ধিকে সাহিত্যে রূপ দিয়া গিয়াছেন, শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পুরুষোত্তম-দর্শনে সেই প্রাণই উদ্গীত হইয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথকে পুরোধা করিয়া সমস্ত প্রাণ-সাহিত্যকে আমরা বন্দনা করি।

সকলকে প্রণাম জানাইয়া 'উজ্জলভারত' তাহার চতুর্দশ বর্ষের যাত্রা আরম্ভ করিল। ইহা কোন ব্যবসায়গত প্রচেষ্টা তো নয়ই, আবার কোন বিশেষ উদ্দেশ্যও সৃষ্ট নয়—সর্ববিশেষণমথিত জীবন ইহার লক্ষ্য, আদর্শ এবং বিচরণ-ক্ষেত্র। এতখানি বিস্তৃত-গতীর হওয়ায় ইহার সুবিধাও যেমন, অসুবিধাও তিলপরিমাণ। তদুপরি আমাদের লোকবল ধনবল কোনটাই একেবারেই নাই। কেবল আদর্শের ব্যাপকতা, শ্রীনিত্যগোপাল শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের জীবনের বাস্তব পথচলার আশীর্বাদে এবং আমাদের অল্প কয়জন বান্ধবের গভীর প্রাণের স্পর্শ সম্বল লইয়া 'উজ্জল-ভারতে'র মত পত্রিকা প্রতি মাসে নিয়মিত প্রকাশিত হইয়া এই তেরোটী বৎসর পার হইয়া আসিয়াছে। আরও তেরোটী বৎসর এই বলেই সে চলিতে পারিবে এরূপ বিশ্বাস আমাদের আছে। যে অল্প কয়জনের সৌহার্দ্যে নানা জটিলতার মধ্যেও এতদূর আসিয়াছি তাঁহাদের নিকট এবং তাঁহাদের মধ্য দিয়া জানা অজানা সকলের নিকট আমাদের আবেদন এই যে, তাঁহারা যেন শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের বাণীরূপ এই 'উজ্জলভারত'কে

আরও আপন করিয়া লইয়া নিজেদের দায়িত্বে ইহার অগ্রগতিকে বাড়াইয়া দেন। উজ্জ্বলভারত নরনারায়ণ আশ্রম ও নরনারায়ণ আশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র—তাই ইহাকে বাঁচাইবার প্রচেষ্টার মধ্যে আশ্রম ও আশ্রম-সঙ্ঘকেও বাঁচান হয় কিংবা আশ্রম ও আশ্রমসঙ্ঘকে বাঁচাইলেও ইহা বাঁচে। সকল জনের নিকট সকল কথাই নিবেদন করিয়া নূতন যাত্রাপথে রওয়ানা হইলাম।

চতুর্দশ বর্ষ হইতে 'উজ্জ্বলভারতে'র অবয়ব একটু পরিবর্তিত হইল। রূপ চেহারা লইয়াও সে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে একটু বাড়িল। নানা বিবেচনায় এই পরিবর্তন করা হইল। আমরা সকলের প্রাণঢালা সহযোগিতা আহ্বান করি।

যাত্রারম্ভ দিনে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ কবিগুরুর সেই নূতন সমুদ্রতীর পানে পাড়ি দিবার আহ্বান-গীতি বার বার উচ্চারণ করিতেন। আমরা কি আবেষ্টনে আছি, কি আমাদের করিতে হইবে বুঝিবার জন্য, সেই গতিতে, সেই প্রাণের তীব্রতাকে লাভ করিবার জন্য সেই যন্ত্রগম্ভীর আহ্বান উচ্চারণ আমরাও আজ করি—

"দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন,
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।
বহ্নিবন্যা-তরঙ্গের বেগ,
বিশ্বাস-কটিকার মেঘ,
ক্ষুভিত গগন
মূর্ছিত বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন।
ওরি মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্রতীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি।
ডাকিছে কাণ্ডারী
এসেছে আদেশ—
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ।
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা
আর চলিবেনা।
বন্যা বাড়িয়া ওঠে, ভরার সময়ের বহু পুঁজি,
কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি—
'তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর পানে
দিতে হবে পাড়ি।'
তাড়াতাড়ি
তাই ঘর ছাড়ি
চারিদিক হতে ওই দাঁড়-হাতে ছুটে আসে দাঁড়ী।

'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার
খুলিতে বিলম্ব কত আর।'
এ কথা শুধায় সবে
ভীত আর্ত রবে
ঘুম হতে অকস্মাৎ জেগে।
ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘ
কালোর ঢেকেছে আলো—জানে না তো কেউ
রাত্রি আছে কি না আছে, দিগন্তে ফেনায়ে উঠে ঢেউ—
তারি মাঝে হুঙ্কারে কাণ্ডারী—
'নূতন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি।'
বাহিরিয়া এল কারা। মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুছিছে।
ঝড়ের গর্জন মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে,
ঘরে ঘরে বন্ধ হল আরামের শয্যাতল;
'যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল',
উঠেছে আদেশ,
'বন্দরের কাল হল শেষ।'

মৃত্যু ভেদ করি
ঘুরিয়া চলেছে তরী।
কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার,
সময় তো নাই শুধাবার।
এই শুধু জানিয়াছে সার
তরঙ্গের সাথে লড়ি

বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল ;—
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
এসেছে আদেশ—
বন্দরের কাল হল শেষ।

অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে-দেশ—
সেথাকার লাগি
উঠিয়াছে জাগি
কটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান
মরণের গান
উঠিছে ধ্বনিয়া পথে নব জীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে।

যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল,
যত অশ্রুজল
যত হিংসা হলাহল,
সমস্ত উঠিছে তরঙ্গিয়া
কূল উলঙ্ঘিয়া,
ঊর্ধ্ব আকাশের ব্যঙ্গ করি।'
তবু বেয়ে তরী

সব ঠেলে হতে হবে পার,
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার,
শিরে লয়ে উন্মত্ত দুর্দিন
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন,
হে নির্ভীক, দুঃখ-অভিহত।
ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি ? মাথা করো নত।
এ আমার এ তোমার পাপ
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হতে জমি' বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়—
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ
ধনিকের নিত্য চিত্তক্ষোভ
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার যত অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদারিয়া
কটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।
ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান,
নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ।
রাখো নিন্দাবাণী, রাখো আপন সাধুত্ব-অভিমান,
শুধু এক মনে হও পার
এ প্রলয়-পারাবার
নূতন-সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে।"

'পুরুষোত্তমের তামসী-রাজসী-সাত্ত্বিকী তনু বিজ্ঞানঘন সচ্চিদানন্দৈকরস ভক্তিযোগে পাইলেন শেষ বিশ্রামস্থল। বিশ্বের সত্য বাস্তব স্রষ্টা কলাবিৎ 'মানুষ' পুরুষোত্তম। তিনি অসুর নন, দেবতা নন, ব্রহ্ম নন, পরমাত্মা নন, গোলোক-বৈকুণ্ঠের ভগবানও নন। পচাগলা জগতের মাটির মানুষ পুরুষোত্তমই সকল 'শেষপ্রশ্নে'-র শেষ সমাধান। এমন পুরুষোত্তই কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের 'ব্রহ্ম'-পদবাচ্য। পুরুষোত্তম-কৃষ্টির মাঝেই ভবিষ্যৎ বিশ্ব সফল, সার্থক জন্মলাভ করিয়া ধন্য।'

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ—ব্রহ্মসূত্র (১ম) পৃঃ ৪১

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে

—১৯৪৯—

(২৭)

আমরা সকলেই সাগরতীরে যাই, পরে শুচি ও প্রার্থনা করি। শেষে যোগদর্শন পাঠ করি। ক্লাস প্রধান আসিয়াছিল। আগামী রবিবার যাওয়া স্থির হয়। ক্লাস তুলিয়া দিবে। বৈকালে সাগর পারে যাই। সেখানে গঙ্গানের একটী তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর (ইংরাজী অনার্স সহ) ছাত্রের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। আমার ছেলে যাওয়ার কথা, সেখানে দর্শন লেখার কথা, গান্ধীজীর রাজনীতি ও ধর্ম্ম এক করার কথা হয়। সে বাড়ী পর্য্যন্ত আসে, কাল বৈকালে আবার আসিবে বলিয়া গেল।

'যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসি প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥'

অর্থাৎ প্রাজ্ঞ (শ্রবণ-মনন-জ্ঞানশালী স্মৃতিমান্) ব্যক্তি বাক্যকে মনে সংযত করিবেন, মনকে জ্ঞান-আত্মায় সংযত করিবেন, জ্ঞান-আত্মাকে মহদাত্মায় এবং মহদাত্মাকে শান্ত আত্মায় সংযত করিবেন।

'বাগ্‌যন্ত্রকে নিয়ত করিতে হইলে মনে মনেও বাক্য বলা রোধ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা ইন্দ্রিয়াধীশ মনে যাইয়া রুদ্ধ হয়। অর্থাৎ সঙ্কল্পক ইন্দ্রিয় যে মন তাহাতে, 'আমি সঙ্কল্প করিব না' এরূপ ইচ্ছা করিয়া বাগ্‌যন্ত্রের স্পন্দন নিবৃত্ত বা রোধ করার নামই বাক্যকে মনে নিয়ত করা।...ইহাতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ধ্যানমূলক বোধও কথিত হইল। জ্ঞানযোগের ইহা প্রথম সোপান।

'মনকে জ্ঞান-আত্মায় (আত্মা—আমি, জ্ঞান—জানছি) নিয়ত করিতে হইবে। জ্ঞান-আত্মা অর্থাৎ 'আমি আমাকে ও চিত্তের মধ্যে যে সমস্ত ক্রিয়া হইতেছে, তাহা জানিতেছি'—এইরূপ স্মৃতির প্রবাহ। ইন্দ্রিয়াগত শব্দাদি বিষয়ও সেই স্মৃতিকে জাগরূক করিয়া দিতে থাকিবে এবং তাহাতেই স্থিতি করিতে হইবে। এইরূপ জ্ঞান-আত্মা'তে স্থিতি করার নামই মনকে জ্ঞান-আত্মায় নিয়ত করা। কারণ বাহ্যমূলক সঙ্কল্পের রোধ হইলে ক্রিয়ার অভাবে মন সেই আত্মস্মৃতিরই অন্তর্গত হইয়া যাইবে। এ বিষয়ে শাস্ত্রে যথা 'তদৈবাপোহ্য সঙ্কল্পান্ মনো হ্যাত্মনি ধারয়েৎ'—অর্থাৎ সঙ্কল্প হইতে উপরত হইয়া সঙ্কল্পকে রোধ করিয়া মনকে আত্মাতে (জ্ঞান-আত্মাকে) ধারণ করিতে হয়।

'জ্ঞানাত্মাতে নিঃসঙ্কল্প ভাবে থাকিলে অস্মিতা হৃদয়ে নামিয়া আসিতেছে বোধ হয়। ক্রমশঃ উহা অভ্যস্ত হইলে হৃদয়ব্যাপী অস্মিতা অবলম্বন করিয়া ঐ বোধ উদিত হইতে থাকিবে। এই বোধে স্থিতি করিতে করিতে সত্ত্বগুণের প্রাবল্যবশতঃ অতীত সূক্ষ্মময় অস্মিজ্ঞান ক্রমশঃ প্রকটিত হইতে থাকিবে এবং তৎসহ ঋতজ্যোতিও প্রকটিত (অর্থাৎ বিশুদ্ধ, স্বচ্ছ ও প্রকৃত) হইতে থাকিবে। ইহাতে সম্যক্ স্থিতিই বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী। সেই জ্যোতির্ম্ময়বৎ অসীম আত্মবোধই মহদাত্মা। তাহাতে স্থিতি করিয়া পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান-আত্মার যে রকম আত্মস্মৃতি করিতে হয় সেইরূপ আত্মস্মৃতির প্রবাহ রক্ষাই জ্ঞান-আত্মাকে মহদাত্মায় নিয়ত করা।...মহদাত্ম মাত্রতেই যখন ধ্রুব স্থিতি হইবে তখন তাহাও দৃশ্যরূপে জানিয়া পরবৈরাগ্যদ্বারা ধ্যান করতঃ প্রত্যক্ চেতা বা শান্তোপাধিক আত্মাতে যাওয়াই মহদাত্মাকে শান্ত আত্মায় নিয়ত করা।...পরমানন্দময় জ্ঞানের পরকাষ্ঠারূপ মহদাত্মাও যে প্রকৃত দ্রষ্টা নহে—নির্ব্বিকার দ্রষ্টা যে মহতেরও পর, মহদাত্মা যে দ্রষ্টার প্রতিচ্ছায়া, ইহা সূক্ষ্ম বিচারবান

নিশ্চয় করিয়া 'ন মে, নাহং, নাস্মি' নিরন্তর এইরূপ বিবেক অভ্যাসেই জ্ঞানযোগের শেষ অভ্যাস। যাহা 'আমার' বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহা পুরুষ নহেন, যাহা 'আমি আমি' (অহঙ্কার) বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাও পুরুষ নহেন, এবং যাহা অস্মিমাত্র বা মহান্ আত্মা বা ব্যক্ত আত্মভাবের শেষ এবং যাহা পরাগতি বলিয়া বিবেকহীন দৃষ্টিতে প্রতিভাত (ভ্রান্তিজ্ঞান) হয়, তাহাও পুরুষ নহেন, এইরূপ বিবেকজ্ঞানের অপরিশেষ (চরম) অভ্যাসের দ্বারাই ক্লেশবন্ধের নিবৃত্তি হইয়া কৈবল্য হয়।"—কপিলপ্রবর্তিত সাংখ্যদর্শন যোগদর্শন—পৃষ্ঠা ৭১৯—৭২১

৬ই ডিসেম্বর

...যোগদর্শন পাঠ করি।... (মন্দিরের) রান্নার জায়গাও দেখিয়া আসে। মাটির বাসন ছাড়া অন্য কোন ধাতুনির্মিত বাসন ব্যবহৃত হয় না। ইন্দিরার জলে জগন্নাথের ভোগ ইত্যাদি রান্না হয়। জগন্নাথ জগতের ঠাকুর, সর্বসাধারণের ঠাকুর, তাই সাধারণের মতই তাঁহার আহার-বিহার, চালচলন, অঙ্গভূষণ। সব এখানে সহজ। তাই প্রাচীর-গাত্রে ঐ সকল কামভাবোদ্দীপক ছবির স্থান হইয়াছে। যে কাম বিশ্বকে গড়িয়াছে, দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছে, সেই দ্বিধা বিভাগকেই আবার একত্বে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রতি অণু পরমাণুর মাঝে একটা উন্মাদ আকর্ষণের সৃষ্টি করিয়াছে, সে কাম যে সর্বসাধারণের, তাহার যে একটী দিব্য ভাগবত রূপ আছে, তাহাই এখানে পরিস্ফুট। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রই বিশ্বভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্র। ইহার ধূলি গায়ে মাখিয়া আমি ধন্য। এই স্থানের এই আকর্ষণকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বকে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিতে হইবে—ইহাই আমার জীবনের ব্রত।

প্রায় ৪টার সময় নরসিংহ মিশ্র (উড়িয়া ছেলেটী, কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে) আসে। তাহাকে 'মহামানবের সাধনা' পড়িতে দেই, সে বেশ পড়িল। তাহার সঙ্গে এক ঘণ্টারও বেশী আলোচনার পর সমুদ্র-তীরে যাই। সে-ও যায়। সেখানে আধ ঘণ্টারও উপর থাকার পর সে চলিয়া যায়। তাহাকে উদ্বোধন পূজা সংখ্যা অগ্রহায়ণ সংখ্যা ও আরও এক সংখ্যা দেওয়া হয়। সে খাম সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। মোটামুটি আলোচনা হয়।

...গৌরসুন্দরের অপ্রকটলীলা পাঠ হইতেছিল।...

৭ই ডিসেম্বর

...আনন্দবাজারে যাই। মন্দিরের চারিদিকেও প্রসাদ বিক্রয় হইতেছে। অন্ন সম্বন্ধে কি বিরাট সংস্কার-রাহিত্যের আস্বাদন! কোথাও এমন 'সহজ' ভাব নাই। এখানের ঠাকুর, ঠাকুরের প্রসাদ যে সর্ব-সাধারণের। আজ উহারা বেশ ভাল করিয়া পুরুষোত্তমকে দেখিয়াছে সাক্ষাৎ অবস্থায়। সহজের ঠাকুরকে ঘিরিয়া এখানকার সব কিছু সহজ। এখানে অন্ন ব্রহ্ম। যেখানে জীবন ও জীবনের আস্বাদন সহজ, যেখানে ঐশ্বর্যের কাড়াকাড়ি নাই, সেখানের অন্ন তো সত্যই মহাপ্রসাদ। মন্দিরের গাত্রে নর-নারীর যৌনসঙ্গের যে সব মূর্তি রহিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া এই কথাটাই বলা হইয়াছে যে, সর্বসাধারণের জীবনের গোড়াকার এই আকর্ষণ দিয়া, উহারও একটী ভাগবত রূপ পুরুষোত্তমক্ষেত্রের মধ্যে রহিয়াছে। এই আকর্ষণকে হজম করিয়াই—এড়াইয়া নয়—প্রতি পুরুষকে পুরুষোত্তম হইতে হইবে। বৃন্দাবনে এই তত্ত্ব পারমার্থিকভাবে আস্বাদিত হইয়াছে, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে তাহারই ব্যবহারিক আস্বাদন আসিয়া উঠিবে। এই সব মূর্তির প্রয়োজনীয়তা এখানে নিশ্চয়ই আছে। নর-নারী কোন্ ছন্দে এই যৌন-আকর্ষণকে পরিণাক করিয়া মদনমোহন হইবে তারই সাধনা এখানে রহিয়াছে। বিশ্বরূপ না হইলে মদনমোহন হওয়া যায় না। বিশ্ব-রূপের সাক্ষাৎ ক্ষেত্র এই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র। তাই এখানে অন্ন বিশ্বরূপ, চালচলন আবেষ্টন সব বিশ্বরূপ।

আজ অন্নপ্রসাদ ৮ চারি থালা, লাড্ডু ৵০, ডাল-প্রসাদ ৵০ আনা সের। রাত্রিতে আর রান্না হয় না। অন্নব্রহ্মকে নমস্কার করিয়া ৮-৩৫-এ প্রসাদ পাই। ৪টার পর নরসিংহ মিশ্র (কৌশিক আত্রেয়, চক্রতীর্থ, পুরী) আসে।

কথাবার্ত্তা হওয়ার পর তাহাকে নিয়া সমুদ্রতীরে যাই। সেখানে তাহার পিসতুত ভাই রামচরণ আসে। সে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে। সন্ধ্যার পর তাহারা আমাকে বাটী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। কাল আবার আসিবে। আজ নরসিংহকে তাহার জিজ্ঞাসামত আমার অতীত জীবনের কিছু বলি—শিক্ষকতার কথা, বেদান্তপ্রচারের কথা, অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের কথা—লবন আইন অমান্যের কথা—আমার যাসার গান্ধীজীর যাওয়ার কথা—জেলে যাওয়ার কথা—সেখানে উপনিষৎ-গীতার ভাষ্য লেখার কথা ইত্যাদি।

৮ই ডিসেম্বর

…ছপুরের পর মহাপ্রভুর সঙ্গে রঘুনাথের মিলন পাঠ হয়। 'স্বরূপের রঘুনাথ'। শঙ্কর পণ্ডিতকে ভক্তগণ ডাকিতেন 'প্রভু-পাদোপধান'। কি বৈরাগ্য রঘুনাথের। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা সাগরতীরে যাই। নরসিংহ মিশ্র আসে। সে বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। কংগ্রেস সামলাইয়া লইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস—ইহা অনেক কথার ভিতর দিয়া বলি। ৭টার পর দুধ-অন্ন প্রসাদ ও তিন রকমের তরকারী ও ডাল ও ক্ষীরের মালপোয়া এক একটী লোক দিয়া দিয়া যায়। প্রসাদকে প্রণাম করিয়া ৮।০টার পরই গ্রহণ করি।… পাতঞ্জল যোগদর্শনের দ্রষ্টা-দৃশ্যসংযোগের বিবেকজ্ঞানকে আমরা কি ভাবে লাভ করিব, তাহা আলোচনা হয়। নর-নারী প্রতিটী মানুষের জীবনে দ্রষ্টাদৃশ্যসংযোগ রহিয়াছে। পুরুষ দ্রষ্টা। পুরুষ-অভিমানী দ্রষ্টা, সে প্রকৃতিকে exploit করিতেছে। নারী-দ্রষ্টা নারী-অভিমানী হইয়া পুরুষকে exploit করিতেছে। এই exploitation-এর যোগই হেয়হেতু। পুরুষ-দ্রষ্টা পুরুষ-অভিমানী হইলেও সে তো একান্ত পুরুষ নয়, পুরুষাভিমানবশতঃ তাহার প্রকৃতির দিক চাপা থাকে মাত্র; পক্ষান্তরে নারী-দ্রষ্টা নারী-অভিমানিনী হইলেও তাহার মধ্যে চাপা অবস্থায় পুরুষত্ব রহিয়াছে। আজ প্রকৃতির সহজ বিধানে ঐ exploitation দূর করিবার জন্য পুরুষ-অভিমানীর অন্তরের চাপা নারীত্বের উন্মেষ হইয়াছে, যাহার ফলে সে আজ হৈণ। নারীত্ব-অভিমানী নারীর অন্তরের চাপা পুরুষত্বও আজ জাগিয়া উঠিয়াছে, যাহার ফলে সে অধিকার লইয়া পুরুষের সঙ্গে লড়াই করিতেছে। পুরুষের মধ্যেও পুরুষ-ভাব ও প্রকৃতি-ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, মেয়েদের মধ্যে মেয়েভাব ও পুরুষ-ভাব জাগিয়াছে। কিন্তু কোথায়ও 'সামঞ্জস্য' নাই। সেইজন্য আমাদের সাধনা হইবে সমগ্রের দৃষ্টিকে নরনারী উভয়ের সামনে ধরা, যাহাতে প্রত্যেকে বুঝিতে পারে যে পুরুষত্ব ও প্রকৃতিত্বের সাম্যতা বজায় রাখিয়া না চলিলে কেহই 'পূর্ণ' মানুষ হইবে না। সাধনার ইহা এক দিক। অপর দিক হইতেছে, 'আমি'-কে এমন একটী পরম বর্ত্তমান 'আমি'-র টানের ভিতর ফেলিয়া দেওয়া যাহাতে 'আমি' উপরের স্তরে উঠিতে পারে। 'আমি' পরম আমির টানে উৎ-আসীন না হইলে কিছুতেই প্রকৃতিভাব ও পুরুষভাবের বিশ্লেষণ সম্ভব ও synthesis করা সম্ভব হইবে না, পুরুষের পুরুষাভিমান কাটিবে না, নারীরও নারীত্বাভিমান কাটিবে না। চাই দু-মুখী সাধনা—উপর হইতে ও নীচ হইতে। এই পথে পতঞ্জলির ঈপ্সিত কৈবল্য সর্ব্বসাধারণের সহজলভ্য হইবে। ইহাই পুরুষোত্তমদর্শনের বৈশিষ্ট্য। ৭টার পর শুইয়া শুইয়া আমার অতীত জীবনের কথা আলোচনা করি।

৯ই ডিসেম্বর

কৃষ্ণাপঞ্চমী—আমার জন্মতিথি

…৮।০ টার ধ্রুব প্রধান আসে ডিঙ্গা লইয়া। মন্দিরের সামনে নামি। তখন পুরুষোত্তমের শয্যাত্যাগের পর মঙ্গল আরতি হইতেছে। বহু ঘৃতের প্রদীপ প্রজ্বলিত হইয়াছে। পুণ্যার্থীরা, বাহিরের লোকেরা একত্রিত হইয়া ফুলুল হর্ষধ্বনির মধ্যে আরতি করিতেছিল। খুব ভাল লাগিল। এই-ই তো আরতি। ঠাকুরের সামনে ছোট বড়, কুলীন অকুলীন আজ সমান ভাবে দাঁড়াইয়া আরতি করিতেছেন। কোনও ব্যবধান যেন জগতের সঙ্গে

জগন্নাথের নাই। কোনও সেবাপূজার নৈষ্ঠিকতা এখানে নাই। আছে শুধু সহজ সেবাবুদ্ধি—পাওয়ানো, শয়নদান ও জাগরণ। ভক্ত-ভগবানের এমন ব্যবধান-রাহিত্য দেখিয়া মনপ্রাণ জুড়াইল। দেখিলাম, কাঁদিলাম, সকলের নাম লইয়া প্রার্থনা জানাইলাম। পাণ্ডা ঠাকুর হাত ধরিয়া প্রদক্ষিণ করাইলেন। অন্ধকার, অন্ধকার। পড়িতে লাগিলাম 'জন্মকর্ম চ মে দিব্যম্' ইত্যাদি শ্লোক দুইটী। আজ আমার জন্মদিন। আমার জন্মকে তাঁহার জন্মের মাঝে এবং তাঁহার জন্মকে আমার জন্মের মাঝে আস্বাদন করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। আমার জীবনে তোমার আমার পারস্পরিক জন্মের ভিতর দিয়া বিশ্ব দিয়া জন্ম লাভ করুক—ইহাই আজিকার প্রার্থনা। আমার জন্মকে ঘিরিয়া যাঁহারা ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন, তাঁহাদের ভিতর তোমার জন্ম অবতরণ করুক। সেখানে পাণ্ডাঠাকুরকে ১০৲ দিয়া (উষাঙ্গিণীর হাতে) পাণ্ডাঠাকুরের খাতায় তাঁহাকে পাণ্ডা করিবার জন্য আমার যাঁহারা তাঁহাদের অনুরোধ জানাইয়া গম্ভীরায় যাই। সেখানে প্রধান মোহন্ত পাঠ করিলেন, শুনিলাম। রামকৃষ্ণদাস বাবাজীর সঙ্গে আলাপ হইল। তিনি প্রথমদিন ও আজ মহাপ্রভুর পাদুকা, কড়োয়া, কাঁথা দেখাইলেন। গম্ভীরায় মহাপ্রভুর কাছে রামকৃষ্ণদাস বাবাজীর সঙ্গে কথাচ্ছলে আমার প্রার্থনা জানাইয়া আসিলাম মুচির ছোট মেয়েটী বেশ সুন্দর। প্রতিভা তাহাকে কোলে লইল, আমিও তাহাকে আদর করিলাম। তাহাকে দুধ খাইবার জন্য ৸৹ দিয়া আসি।···সমুদ্রে স্নান করি।···সন্ধ্যার পূর্ব্বে সমুদ্রতীরে যাই। নরসিংহ মিশ্র আসিয়াছিল। হরিদাসবাবুর মেয়েরা আজ যায়। সন্ধ্যার পর কালীদাসী আসে। মন্দিরের প্রসঙ্গ হয়।···

১০ই ডিসেম্বর

সকালে স্তব ও প্রার্থনা হয়। আজ আমার কলিকাতা যাত্রার দিন। পুরুষোত্তমের রথযাত্রার অর্থ হইতেছে পুরুষোত্তমতত্ত্বকে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যাত্রা। মাসীর বাড়ী যান অর্থ রক্তমাংসের সম্পর্কযুক্ত সংসারের বুকে যান সেখানের 'খুদে'র পিঠা খাইতে। রথী আত্মার বিশ্ব ভোগের অন্তরে যে দিব্য ভাগবত প্রেরণা লুকানো রহিয়াছে, তাহাই রথযাত্রার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তোমার রথযাত্রা আমার সারাজীবনের যাত্রার ভিতর জমিয়া উঠুক, আমার যাত্রা সফল হউক। সারাদিন তাঁহাকেই স্মরণ করি। পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র ছাড়িব, বেদনাও বোধ হইতেছিল। যেন আপনস্থান ছাড়িয়া যাইতেছি। পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলাম। আজ সমুদ্রে এইবারের মত শেষ স্নান করি। বেশ ঢেউ ছিল। সমুদ্রকে মনে মনে নমস্কার করিয়া চলিয়া আসি। দুপুরে খেয়া তেমন আর হইল না। কালীদাসী ২টার পর আসে। বেণুর একটা পোষ্টকার্ড আসে। ৪টার পরই ধ্রুব একটী মোটরবাহক নিয়া আসে। ৪৷৷০টায় ঘোড়ার গাড়ীতে (ভাড়া ১৷৷০) রওয়ানা হই।···৭টার গাড়ী ছাড়ে।···একটানা পুরুষোত্তম-স্মরণ চলিতেছিল। ভিড় তেমন ছিল না। বটকে সব সীটগুলি পূর্ণ হয়। রাত্রিতে মনে হইতেছিল যে, সাংখ্য দর্শন প্রকৃতির যান্ত্রিক দিকটাই দেখিয়াছে, তাই শেষ পর্যন্ত ইহার সঙ্গে যোগ রাখিয়া কৈবল্য-লাভ সেখানে অসম্ভব। সেখানে প্রকৃতি-পুরুষবিবেকেই কৈবল্য। কিন্তু পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির অর্গানিক রূপ আবিষ্কার করিয়াছেন। সেখানে প্রকৃতি-পুরুষের নিরবচ্ছ সংযোগের ভিতরই পুরুষ কেবল, প্রকৃতি কেবলা। কেবল-কেবলার সংযোগই তো রাসলীলা। সাংখ্যযোগীর কৈবল্যেও পরাপ্রকৃতি রহিয়াছে। কৈবল্য onliness, প্রতি অণুও complete in it-self, তাই কেবল। এখানে কেবলে-কেবলে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াও পরার্থ। দুই-ই স্বার্থ, দুই-ই পরার্থ। এইখানেই বেদান্তের পুরুষের একত্ব ও সাংখ্যের পুরুষ-বহুত্বের সমন্বয় সম্ভব। সর্ব্ব দর্শনের ঘনীভূত রূপ পুরুষোত্তম-দর্শন।

১১ই ডিসেম্বর

কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন

ভোর ৬৷৷০ টায় পুরী এক্সপ্রেসে হাওড়া পৌঁছি।

রেণু স্টেশনে উপস্থিত ছিল। ট্যাক্সী করিয়া (৫৲ টাকা ভাড়া) আশ্রমে আসি। আসার পর সকলকে পুরুষোত্তমের মহাপ্রসাদ নিজে দেই ও লই।···৪টার পর আফিসে যাই। প্রতিভা মোক্ষ হইতে বাসায় যায়। রেণুর কাছে সমস্ত চিঠিগুলি ও আমার জন্মদিনে লিখিত আমার সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি শুনি। ৮টার পরই আফিস হইতে আমি ও রেণু ফিরি। আজ সতীনাথের রান্নাঘরে পরীক্ষা হইয়াছে। সকালে রেণুর বাসায় খাইয়াছে, বৈকালে এখানে। 'অন্ধ চক্ষুর মুক্তি'—নামক রাধা সম্বন্ধে রেণুর লেখা প্রবন্ধটিও শুনি।·· পুরীর তুলনায় এখানে বেশ শীত। পুরীতে সত্যই অন্তরে ব্রহ্মরন্ধ্র, মহাপ্রসাদরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেখানে কাড়াকাড়ি নাই, সকলেই যেখানে সমবেত, যেখানে উচ্চ-নীচ সমভাবে মিলিত, সেখানেই ব্রহ্মরন্ধ্র জমিয়া উঠে। পুরী তেমনই একটী ক্ষেত্র। সহজ-জীবনের আস্বাদন-ক্ষেত্র এই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র। বারবার ইহার কথা মনে হইতেছে। তাই পুরীর জল নিয়া আসিতে ইচ্ছা হয়, পুরীর দুধের ক্ষীরটুকু নিয়া আসিয়াছি। পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র আমার জীবনের সকল স্পন্দনে ঘন হইয়া থাকুক।

·· দেখিব আমি সব-কিছু পরিপাক করিয়া লইতে পারি কি না। রেণুকে·····বলি, আমি দাঁড়াইতে পারিলে সব-কিছুর মীমাংসা হইবে।·····'চরৈবেতি, চরৈবেতি'।··

১২ই ডিসেম্বর

৮টার সময় রেণু তাহার বাসায় যায়। রেণু বলে যে, আপনাদেরও তীর্থবাস ফুরাল, আমারও তীর্থবাস ফুরাল। সে এতদিন আমার ঘরে শুইয়াছে, ঠাকুর পূজা করিয়াছে। আমিও সেই সময় নরু ডাক্তারের বাসায় যাই। সেখানে নরুর বড় ভাই রামধন ঘোষ ও গিরিনাথ ঘোষের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। আশ্রমে ফেরার কিছু পরেই সুধাংশু আসে। সে প্রায় ২টায় যায়। তাহাকে পুরুষোত্তমের ছবি ও মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। তাহার নিকট পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের কথা বলা হয়।···প্রতিভা আসে·· কেন উপনিষৎ লেখে। রেণু ব্যাঙ্ক, প্রেস, হেমন্তবাবু, এস, সে, লাহিড়ী, নিখিলবাবু, বাথগেট প্রভৃতি জায়গা ঘুরিয়া প্রায় ৪টায় আসে। রেণু ও প্রতিভা আমার ঘরটা সব সময় গুছাইবার ও সাফ রাখিবার সংকল্প করে। ঘর পরিষ্কার করার পর আমরা আফিসে যাই। সেখানে প্রতিভা 'কেন উপনিষৎ' নকল করা শেষ করে।···রামগোপাল ও জ্যোতি আসে। জ্যোতিকে ই, আই আর ও কলিকাতা নাথ ব্যাঙ্কের টাকা আনিবার জন্য চিঠি ও স্ট্যাম্প দেওয়া রসিদ দেওয়া হয়।···-এর ছলনের বেদনার খবর বিস্তারিত রেণুর কাছে শুনিলাম। কালও কিছুটা শুনিয়াছিলাম। আমাদের সঙ্গে প্রাণখোলা সহযোগ থাকিলে আমরা হয়ত কিছুটা সাহায্য করিতে পারিতাম। সতীনাথ দুই বেলাই রেণুদের বাসায় খাইবে। রাত্রিতে এখানে আজ আর খায় নাই। কেশব গাঙ্গুলী ৯টার পর এখানে একবার আসে। জন্মদিনের লেখাটা ছাপাইবার কথা হয় নিজেদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য। আবার পুরুষোত্তম-দর্শন প্রচার করিবার জন্য চেষ্টিত হওয়া উচিত মনে হইতেছে। ধীরেনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিব।

১৩ই ডিসেম্বর

'শিক্ষা' পত্রিকা হইতে' বাংলা হাতের লেখা' (অনাথ বসু লিখিত) ও বিজয় ভট্টাচার্য লিখিত 'বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ' পড়ি। রেণুকেও পড়িতে দিই। রেণু ১২টার পর একবার আসে। ব্যাঙ্কের পত্রিকা-তহবিল হইতে ৩০০৲ টাকা ও নিজ তহবিল হইতে ২২৫৲ টাকা তুলিয়া আনে। ফিরিয়া আসে ২টারও পর। ইতিমধ্যে প্রতিভা আসে। সে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র অনুক্রমণিকা (মাঘ মাসে প্রকাশিত হইবে) নকল করে। সন্ধ্যার পূর্বে আমরা বাহির হই। বাটীর সামনে ধীরেনবাবুর সঙ্গে দেখা। রাস্তায় তাঁহার সঙ্গে পুরুষোত্তম ও তাঁহার ক্ষেত্রের বিশিষ্টত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তিনি তাঁহার লেখা 'গীতায় পুরুষোত্তম প্রীকৃষ্ণ' (উজ্জয়ন্তভারত পত্রিকা পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত 'গীতায় পুরুষচতুষ্টয়' প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে কাশীধাম-স্থিত 'আর্যবিদ্যা-নিকেতনে'র শ্রীমদ্ভেদপ্রকাশ ব্রহ্মচারী যে

সব প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার মীমাংসা) দিয়া যান। বেশীক্ষণ থাকেন না। তাহাকে পুরুষোত্তমের নিম্বা'লা তুলসী মহাপ্রসাদ ও মিঠাপ্রসাদ দেওয়া হয়। বীরেনবাবু অবসান কালেই হেরম্ববাবু আসেন। তিনি অনেকক্ষণ থাকেন। মিঃ ব্রাইভারের লেখা 'Devaluation'-এর অনুবাদটী দিয়া যান। তিনি বলেন যে devaluation সম্বন্ধে যতগুলি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে এটী সর্ব্বোত্তম। উহার কিছুটা ব্যাখ্যা করেন। তিনি ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সিটিজেনসীপের ফর্ম্মে দরখাস্ত করিবেন না; কেননা ইহাতে পাকিস্থানের সিটিজেনসীপ মুছিয়া যায়, অথচ তাহা জন্মভূমি। ভাবিবার কথা। ৮।০টার পর চলিয়া আসি।... নীচের একতলার ২টী ও দোতলায় ১টী ঘর নাকি উচ্চ-ভাড়ায় ভাড়া দেওয়া হইবে। ইহাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মনটা খুব বিষন্ন ও উদ্বিগ্ন। ঠাকুর বলিয়াছেন, 'ভয় কি, টেনে তুলব', 'পরং, যখন যেখানে আছ সঙ্গে সঙ্গে আছি।' আমার চারিপাশের আবেষ্টন তো বিশুদ্ধ সত্বে গড়িয়া উঠিল না, পুরুষোত্তম-প্রকাশের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিল না।

১৪ই ডিসেম্বর

৯টার পূর্ব্বেই একবার আফিসে যাই, প্রুফ আসিবার কথা। গিয়া দেখি প্রুফ আসিয়াছে। বেণু খাওয়া শেষ করিয়া ১২টার সময় প্রুফ নিয়া ব্যাঙ্ক হইয়া প্রেসে, অমিয়-বাবুর ওখানে যায়, সুরেশদাসের সঙ্গেও দেখা করে। আজ আর দুপুরে সে এখানে আসে না। আমি সকালে আশ্রমে ফিরি ১২টায়। প্রতিভা আসে প্রায় ৩টায়। সে গীতার অনুক্রমণিকাটা লেখে। ৪টার পর যখন আফিসে রওয়ানা হই, তখন নীচে সত্যব্রতর সঙ্গে দেখা। তাহার সঙ্গে প্রায় ১ঘণ্টা কথাবার্ত্তা হয়। নীচের ২টা ঘর ভুকারামেরা নিবে। আমরা দোতলার একটা ঘর নিব— এইরূপ কথা হয়।...আসিয়া অনেক গোলমাল ও অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে।...কাজ গুছাইয়া করিবার বুদ্ধি থাকিলে সে রক্ষা পাইবে, ইহা বলিলাম। সব দিকে সতর্ক দৃষ্টি না রাখার ফাঁক দিয়া সব কিছু গোলমাল ও গোলমেলে লোক ঢুকিতে পারিয়াছে। আমার পত্রিকার অবস্থা ভালর দিকে, তাহাও বলিলাম। আজ ফিরিতে ৯টা হইয়া যায়। তৃতীয় ফর্মটা নিয়া আসি প্রুফ দেখিবার জন্য।

১৫ই ডিসেম্বর

গীতার অনুক্রমণিকা লেখা একরকম শেষ করি। রেণুর বাহির হইবার কথা ছিল ৯টার পর এস্, এন্, রায়ের ওখানে যাইবার জন্য। কিন্তু যাওয়া হয় নাই তাহার ভাই বৌর অসুখের জন্য। সে ২টার পর আসে। প্রতিভা তাহার পূর্ব্বেই আসিয়া অনুক্রমণিকা নকল করিতে থাকে।.....রহিয়া রহিয়াই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের কথা মনে পড়ে। সেই সুবিশাল মূর্ত্তি, সেই উন্মাদ সমুদ্র ও উন্মাদ গৌর। আজ রেণুর কাছে লক্ষ্মীর ওঁয়ার চওড়াল পিতৃগৃহে বাস, বেড়ী হনুমানের গল্প বলি। মাসী বাড়ীতে গিয়া লক্ষ্মী কেমন করিয়া রথ ভাঙ্গিয়া দিয়া আসেন, তাহাও বলি। পারিবারিক হাসি-কোতুক, মান-অভিমানের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া পুরুষোত্তম-জীবনকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে! পুরুষোত্তম মাসীর বাড়ী মাসীর হাতে খুদের পিঠা খাইতে যান, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার স্ত্রীর পায়ের কাঁটা নিজের হাতে খুলিয়া দেন। বেশ মিষ্টি। পুরুষোত্তম যে আমার ছোট-র ঠাকুর, তাই ত এমনটী সম্ভব। আজ রাত্রিতে সতীনাথ যায়।...আমার জন্মদিনে কোহিনূর হইতে নীলুর লেখা একটা পোস্টকার্ড পুরী ঘুরিয়া আজ এখানে আসিয়াছে। তাহার মধ্যে 'আমি অবতীর্ণ হইয়াছি' ইত্যাদি লেখা হইয়াছে। ঐরূপ না লেখাই ভাল। উহাদ্বারা 'অবতীর্ণ হইবার' অর্থের গৌরব হানি হয়। সব মানুষই এক হিসাবে অবতীর্ণ, তাহার মধ্যে যাহাদের উপর গুরুদেবের কৃপা আছে, সেই হিসাবে তাহারাও বিশেষভাবে অবতীর্ণ। এইভাবে বলিলে অবশ্য বলা চলে। কিন্তু অর্থের এত টানাটানি করিয়া কিছু না বলাই যুক্তিযুক্ত।

চিন্তানন্দ সন্ধ্যার পর আসিয়াছিল। সে বলিল,

গোলাপ দিদির অবস্থা খারাপ। তাঁহার গচ্ছিত টাকাগুলি পাইলে তাঁহার সেবা ভাল ভাবে চলিতে পারিত। কিন্তু তাহা পাওয়া যাইতেছে না, কেহ তেমন খবর রাখে না। অথচ একদিন তাঁহার প্রয়োজন খুব ছিল। এমনি হয়। ঠাকুরকে সব যিনি দিলেন, তাঁহার খোঁজ খবর ঠাকুরের স্টেট ও তাঁহার ভক্তগণ নেয় না।

১৬ই ডিসেম্বর

সকালে 'অনুক্রমণিকা' লেখা শেষ করি, নিজেও অনেকখানি কপি করি। পত্রিকাওয়ালাকে পত্রিকা তহবিল হইতে ৵০, নিজ তহবিল ৵০ ও উষাঙ্গিনীর নিকট হইতে ৵০ দেওয়া হয়। প্রেস হইতে সকালে আসিয়া প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ফর্মের প্রুফ দিয়া যায়। রেণু ৯।০ টায় বাহির হইয়া কোরাম ট্রাস্ট-এ যায়, সেখান হইতে বালীগঞ্জ রিয়েল প্রপার্টির বিজ্ঞাপন নিয়া প্রেসে দিয়া আসে।...অফিসে গিয়া দেখি দিলীপ চ্যাটার্জি (কিং এণ্ড কোং-র ডাক্তার) আসিয়াছেন। তিনি প্রায় ১ ঘণ্টা থাকেন। উজ্জলভারতের তিনি উচ্চ প্রশংসা করেন। বায়োকেমিকের Back ঔষধগুলি তিনি সংগ্রহ করিয়া দিবেন বলিলেন। গ্রাহক করিয়াও দিবেন বলিলেন। ইতিমধ্যে মন্মথ রায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বৃহস্পতিবার রেণুকে দেখা করিতে বলিলেন, লক্ষ্মীবিলাসের বিজ্ঞাপন পাওয়ার কথাও বলিলেন। পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের কথা তাঁহাকে বলিলাম। 'পত্রিকা নিশ্চয়ই চলিবে কেননা উহার পিছনে রেণুর অভিসন্ধিহীন সাধনা ও আপনার জীবন রহিয়াছে'—ইহা মন্মথবাবু বলিলেন।.....

১১ই ডিসেম্বর

আজ আর গীতা-ভবনে যাওয়া হয় নাই, মহেন্দ্র আসে যায়। ৭৷০ টায় আফিসে যাই।...রেণুর সতীর্থ-মাস্টার মদন আসে। সে নিজ অর্থব্যয়ে একটী হাই স্কুল তাহার স্বগ্রামে তাহার পিতামহের নামে খুলিয়াছে।... প্রতিভার সঙ্গে ...-এর সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়।... ঘটনাকে জ্ঞান বা প্রেমের দ্বারা পরিপাক না করিলে তাহা অনর্থের সৃষ্টি করে। ঔদাসীন্যে ঘটনার কার্যকরী দুষ্ট শক্তি নষ্ট হয় না, হজম করিতেই হয়।...নরনারীর বর্তমান মানসিক সম্পর্ক কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে ধারণা না থাকার ফলে বিশ্বে যে কত অনর্থ হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পুরুষোত্তম-জীবনই এই ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকা হিসাবে পথ দেখাইতে পারে। আফিসে যাওয়ার পূর্বে রেণু ও প্রতিভা দোতলার ঘরটা দেখে। সকালে 'আন্তর্জাতিক ধর্ম-সম্মেলন' বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ করি। প্রতিভা আজও অনুক্রমণিকা নকল করে।

১৮ই ডিসেম্বর

সকালে একবার আফিসে যাই। প্রায় ১০টার সময় আমি ও রেণু আফিস হইতে বাহির হই। রেণু ঝুমিলা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক হইয়া প্রেসে যায় এবং সমস্ত প্রুফ দেখিয়া ৩।০ টায়ও পর ফেরে। ঝুমিলা ইউনিয়নে ২ জন গ্রাহক হয় আগামী বৎসরের জন্য। প্রতিভা ২টার পর আসে। অনুক্রমণিকা নকল করা শেষ করে। আমি সকালে জ্ঞানবাবুর 'Behaviour Problem'-এর আলোচনা লিখি।.....সকালে আফিসে যাইবার পথে শীতলাতলার কাছে বরিশালের নরেন ঘোষের (স্টীমারে চাকুরী করে) সঙ্গে দেখা। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেক লেখালেখার অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। পাকিস্থান যদি এখন তাহার সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি না বদলায়, তবে নিজের বুদ্ধির দোষেই সে বিপন্ন হইবে। সমগ্রের চাপে সে নিষ্পেষিত হইবে। যাহা মধ্য যুগে চলিতে পারিয়াছে, তাহা এখন চলিবে না। এখন সমগ্রের চাপ খুব প্রবল। হিন্দুবিদ্বেষ লইয়া তাহার বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব হইবে। কোনও কিছু গড়িয়া তুলিবার বুদ্ধিও নাই, সুযোগও কম।...

১৯শে ডিসেম্বর

১১টার পর রেণু আসে ব্যাঙ্ক হইতে পত্রিকার ২০০৲

টাকা তুলিয়া লইয়া। তখনই আবার কীমার ও প্রেসে রওয়ানা হইয়া যায়। ৩টার কিছু আগে ফিরিয়া আসে। সকাল ৯টার সময় জ্ঞান বসু ও নারায়ণ বসু আশ্রমে আসে তাহাদের মাতার দশম শ্রাদ্ধ গঙ্গাতীরে করিবার জন্য।……বাবুর বাড়ীতে পদকীর্তন হয়। আফিসে বসিয়াই শোনা যাইতেছিল। রাধার বিরহ। প্রতি জীবনের subconscious-এ এই কান্না অনবরত চলিতেছে জাগ্রতের স্তরে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য। এই কান্নার গূঢ় প্রয়োজন হইতেছে জড় ও অজড়ের মধ্যে সন্ধি-স্থাপন, সমন্বয় স্থাপন। এই কান্নাই মানুষের স্বরূপ, তাই ইহা শুনিবার জন্য মানুষের এত আগ্রহ, ইহা শুনিলে তাই মানুষ এত বিহ্বল হয়। শ্রীরাধাই এই কান্নার মূর্ত বিগ্রহ। তাই তিনি পরাশক্তি। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ কামের এই কান্নার দিব্যরূপ আস্বাদন করিয়া গিয়াছেন ও আস্বাদন করিবার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। ……চরিত্রহীন পড়ি।…

২০শে ডিসেম্বর

১১॰টার পর রেণু আসে কলিকাতা ঘুরিয়া, প্রতিভাও আসে প্রায় সেই সময়ে। প্রতিভা পুস্তক পরিচয় লেখে। ৩টার পর রেণু ও প্রতিভা আফিসে যায় ব্যাপার মিলাইবার জন্য। আমি পরে যাই। সন্ধ্যার পরই ধীরেনবাবু আফিসে যান।……Imbecile ও lunatic-দের উপর ভগবানের করুণা ও অপক্ষপাতিত্বের তত্ত্ব জানিবার জন্য যে ভদ্রলোকটী ধীরেনবাবুর কাছে রাধাকৃষ্ণন, মহেন্দ্র সরকার প্রভৃতির মত উদ্ধৃত করিয়া পত্র দিয়াছেন, সেই পত্রটী পড়া হয়। চিঠিটা নিয়া আসা হয়, পড়িয়া আলোচনা করা যাইবে।……মাখন বাবু আসেন, পরে বালুরঘাটের নলিনীবাবুর পুত্র কালীপদ আসে। ৮॥॰টার পর প্রেস হইতে পৌষ সংখ্যা আসে।…

২১শে ডিসেম্বর

সকালেই আফিসে যাই। প্রতিভা আমার যাওয়ার পূর্বেই আসিয়াছে। ১০টার মধ্যেই ৩০০ শেষ হয়।… প্রায় ২টার সময় আফিসে যাই। সেখানে গিয়া দেখি বাকী পত্রিকা আসিয়া গিয়াছে।……৪টার মধ্যে সব গ্রাহক শেষ হয় ও রামগোপাল ও সতীনাথ পোষ্টাফিসে পত্রিকা দিয়া আসে।……সন্ধ্যার কিছু পূর্বে পাবনার সরস্বতী…আসে আফিসে।……আসে সুযোগ ও তাহার পুত্র সুব্রত…। সে প্রফুল্লের স্ত্রীর দীক্ষার কথা বলিল।

৮টার পর আসে সন্তোষ ও কালীপদ। হিন্দুমহা-সভার অধিবেশন হইবে ২৪শে, ২৫শে, ২৬শে। লক্ষ্য— পাকিস্থান বিলোপ ও পূর্ববঙ্গ উদ্ধার। উপযোগিতা বর্ত্তমানে যতই না থাকুক, ইহা স্বাভাবিক। পাকিস্থান যতদিন হিন্দুবিদ্বেষী থাকিবে, মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়মে ইহা হইতে বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা বুঝিবে না বাড়ীঘর ছাড়িবার বেদনা কিরূপ। প্রতিহিংসা মানুষের আসে, বংশপরম্পরায় উহা চলিতে থাকে।

২২শে ডিসেম্বর

৭॥॰টার পর আফিসে যাই। আজ সব কাগজ পোষ্টাফিসে দেওয়া হয়। ১০টার মধ্যেই ফিরি। চরিত্র-হীন পড়ি। রেণু কুমিল্লা ইউনিয়ন, বোম্বে নিউচুয়াল, সেফ ডিপজিট-এ যায়, পরে একবার এখানে আসে। আবার ৩টার পর রওয়ানা হইয়া কীমার-এ যায়। সেখান হইতে প্রচ্ছদপটের ছবিটা লইয়া নলিনীবাবুর পাড়ীতে ইনভেসটারস্ কারটেলে যায়।…

'সেই দুইটী পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া সাবিত্রীও কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, আমাকে এমন করে বেঁধে রেখে যেয়ো না দাদা, আমাকে মুক্তি দিয়ে যাও। এত ভার আমি বইতে পারব না।

তুই পারবিনে তো কে পারবে রে? বলিয়া মৃত্যু-পাণ্ডুর ওষ্ঠাধারে অন্তিম হাসি হাসিয়া কহিলেন, বড় যে নিজের প্রাণ দিয়ে আমার সেবা করছিলে! আনিসনে এ কলিকাল। এইসব পাগলীপাগলাদের নিয়ে কিছু-কাল ভুগে মর, তবে ত এর পুরস্কার হবে।' পৃঃ ৫৬৫। জয়া আসে প্রায় তিনটায়।…

'উপীনদা আর সে উপীনদা নেই—আমরা পাঁচজনে তাকে এক রকম ঠিক করেই এনেছি।' পৃঃ ৫৪৩। 'আমাদের সে উপীনদা আর নেই। এখন সহস্র অপরাধও আর অপরাধ নেন না—শুধু মুচকে মুচকে হাসেন।' পৃঃ ৫৪৪।

২৩শে ডিসেম্বর

...আমি আফিসে যাই। ১০টার মধ্যেই ফিরিয়া আসি। সুবোধ ও নীলুর ভ্রাতা ৺প্রফুল্লের স্ত্রীর (মৃণালিনী মীহু) আসিবার কথা ৮৷৷০টার মধ্যে। আফিস হইতে ফিরিয়া দেখি তাহারা আসিয়াছে। মীহু গিয়াছে গঙ্গাস্নান করিতে, সুবোধ গিয়াছে তাহার কাছে। কিছুক্ষণ এই ঘরে বসিয়া তাহার যাবতীয় সাংসারিক সুবিধা-অসুবিধা ও পরিচয় লই। পরে দীক্ষার মূল রহস্য যে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধের ভিতর দিয়া পুরুষোত্তম-বস্তুকে নিজ জীবনে আত্মসাৎ করা বা নিজে আত্মসাৎ হওয়া এবং এই সাধনার সিদ্ধি যে গুরু-শিষ্যের একাত্মভাব দ্বারা ও গুরু ও দেবের এক-দর্শন দ্বারাই সম্ভবপর, তাহাও বলা হয়। পিতার ধন পুত্রের হয় তাহারা একাত্ম বলিয়া, স্বামীর ধনও স্ত্রীর হয় একাত্ম বলিয়া, গুরুর জীবনের 'ইষ্টবস্তু'ও শিষ্যের হয় তাহারা সত্যিই একাত্ম বলিয়া। গুরু-শিষ্য দুই মিলিয়াই এক অখণ্ড পুরুষোত্তম বস্তু। গুরু শিষ্যকে কৃতার্থ করিবার জন্যই শিষ্যকে দীক্ষা দেন না। গুরুর আত্ম-আস্বাদনের জন্য, বিশ্ব-আস্বাদনের জন্যই শিষ্যকে আপনার করেন। নিজেকে পাইলেই পাওয়া হয় না, যতক্ষণ না নিজেকে বিশ্বের মধ্যে ও বিশ্বকে নিজের মধ্যে না পাওয়া যায়। নিজ ও বিশ্বকে মিলাইয়াই তো সমগ্র বস্তু। শিষ্য করার অর্থই বিশ্বের মধ্যে নিজের আস্বাদন। ইহাই সহজ অবস্থা। আমি বিশ্বের ও আমার মধ্য দিয়াই সত্য আমি। শিষ্য গুরুর ধ্যানের বস্তু, যেমন গুরু শিষ্যের। গুরু শিষ্যের পারস্পরিক ধ্যানের মধ্যেই পুরুষোত্তম-সাক্ষাৎকার। ঠাকুর ঘরে মীহুর দীক্ষা হয়। প্রায় ১ ঘণ্টা সব কিছু বুঝাইয়া দেওয়া হয়। বয়স ১৮।১৯। সারা জীবন হিন্দু পরিবারের বৈধব্যের অসহায়তা সহিতে হইবে। শ্বশুর-শাশুড়ীর পরামর্শ করিয়া নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াক, এইরূপ ইচ্ছা আছে, তাগিদের নাই বলিল। টাকা কড়ি কিছুই নাই। ঠাকুর ইহাদের ভার নিলেন। ১৪০টার তাগাদা যায়। গোলমালে নীলুর জন্য প্রসাদ ও তুলসী দেওয়া হয় নাই। বড় ভুল হইয়া গেল। রেণু আসে ১টার সময়, রেণুর সঙ্গে মীহুর দেখা হয়। প্রতিভা আসে তাহাদের যাওয়ার পর। সন্ধ্যার পূর্বেই অফিসে যাই।- শরৎচন্দ্রের 'পাগলী-পাগলা'র কথা খুব ভাল লাগিয়াছে। এমন 'সত্য' কথা এমন করিয়া কে বলিতে পারে? এই পাগলীপাগলাদের লইয়াই বিশ্ব কোচনী সাজায়, কৃষ্ণ বৃন্দাবনে, বুদ্ধ-যীশু-গৌর এই জগতে, আর দীন আমি? আমিও তো ইহাদের জন্যই এই দুনিয়ায় কাঁদিয়া বেড়াইতেছি। আজ বাড়ীটা নির্জন। ভোলানাথ, গঙ্গু, পদ্মরাণী ও বুলুর কোলাহল নাই। হ্যারাণ্ডেড দিয়া বারান্দা আলো করা নাই। শিশুরাই বাড়ীর শোভা। একটা বিহ্বলতার মধ্যে মীহু দীক্ষা নিল, আমিও দিলাম।

বৈকালে যজ্ঞেশ্বর (সেবানন্দ) আসে। সে কীর্তনীয়া যাইবে, দাদার জন্মোৎসব নাকি আগামী ১৩ই পৌষ। আমার কাছে কোন খবর আসে নাই। বৈকালে প্রতিভার লেখা হইতে আমার জন্মদিনের বিবরণী পড়িয়া শুনায়। তাহার লেখা বিষয়বস্তু প্রবন্ধও তো বেশ হইয়াছে।

২৪শে ডিসেম্বর

আজিকার প্রার্থনা—আজ যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন, ধরার বুকে তাঁহার আবির্ভাব সার্থক হউক। বিশ্বের সকল পাপ, সকল গ্লানি নিজে জীবনে বরণ করিয়া যিনি বিশ্বকে পাপমুক্ত করিতে আসিলেন, সেই যীশু-গোপাল নিত্যগোপালকে বার বার নমস্কার। তাঁহার শ্রীচরণতলে আজ রক্তরঞ্জিত ধরা শান্ত হউক। জাগ্রত হও বিশ্বের সহজ মানুষ সকল নিয়মনিষেধ চূর্ণ করিয়া, সকল সংস্কার গলাইয়া দিয়া, সকল উপাধির আবরণ ছিন্ন করিয়া বিশ্বের অন্তর মথিত করিয়া বিশ্বের বুকে নিদ্রিত সহজ মানুষ। সহজ মানুষ আর বেড়াজালে আটকাইয়া থাকিবে না, মুক্ত

সে হইবেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিকৃত সম্বন্ধ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইবে, স্থাপিত হইবে সেখানে সকল বৃত্তির পরম উন্মেষের সঙ্গে পরা নিবৃত্তির সহজ সমন্বয়। তখন মন-বুদ্ধি-বৃত্তি সকল বিশ্বকে নিজের মধ্যে এবং নিজেকে বিশ্বের মধ্যে 'লয়' করিয়া স্বরূপে অবস্থান করিবে, সহজ হইবে; সহজ, সহজ।

গীতাভবন হইতে কেহ আসে নাই, কাজেই যাওয়াও হয় নাই। প্রতিভা রেণুর ওখানে অপেক্ষা করিতেছিল। আমি প্রায় ৮টার সময় সেখানে গিয়া খবর দিই যে আজ হইবে না। কিছু পরে আমি ও প্রতিভা চলিয়া আসি। চরিত্রহীন পাঠ করি। জ্যোতি আসে। আশুতোষ হলে বক্তৃতার জন্য স্থান নিতে হইলে কি টাকা লাগিবে জানিবার জন্য বলিয়া দেওয়া হয়। সে স্টেজে দিবার জন্য পৌষের পত্রিকা নিয়ে যায়।... প্রতিভা সকাল হইতে থাকে, দুপুরে এখানেই খায়। প্রতিভাকে এদিকে দুপুরে খাওয়ার বন্দোবস্ত করিলে অনেকটা কাজের সময় পাওয়া যায়, কাজের সুবিধা হয়। সকালে দুপুরে অফিসের কাজ করিতে পারে। রাত্রিতে বাসায় যাইবে। সকালে আফিস হইতে আসিতে পথে প্রতিভাকে মহাপ্রভুর ভক্ত মর্য্যাদা দান সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে বলা হয়। মহাপ্রভু সকলের কাছ হইতেই শিখিতেছেন। সকলেই শিক্ষক, তিনিই শুধু ছাত্র। এই রূপেই লোক সংগ্রহ হয়, লোককে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই তো সংগ্রহ করা (organise) যায়। ইহাই রাধারে ভজিয়া রাধাবল্লভ নাম পাওয়ার গূঢ় তত্ত্ব।...

২৫শে ডিসেম্বর

'চরিত্রহীন' পাঠ করি।...সমাজের বর্ত্তমান কাঠামো না বদলাইলে এবং তাহার জন্য দর্শন না দেখাইলে কিছুতেই ধর্ষিতাদের ঘরে নেওয়া যাইবে না।...পাপ করিয়াছ, অনুতপ্ত হও ইহা বুঝাইয়া, না তোমার এই অধঃপতন আর একটা উচ্চ জীবনের ইঙ্গিত করিতেছে তাহাই বুঝাইয়া, এবং সামনের পথ খুলিয়া দিয়া? সব অধঃপতনের অন্তরেই আছে ঊর্দ্ধে উঠিবার, আগাইয়া যাইবার পথ। 'কাম' যে প্রতিনিয়ত বিস্তারলাভ করিতে চায়, তাহাকে যে কিছুতেই চাপিয়া রাখা সম্ভবপর নয় এবং বর্ত্তমান যুগ যে কামেরই দিব্যরূপ আস্বাদনের বার্ত্তা পৌঁছাইয়াছে তাহা সম্যক উপলব্ধি করানো যাইতেছে না বলিয়া কামের অপব্যবহার হইতেছে এবং বিপদ ঘটিতেছে। চাপাচাপি দ্বারা ইহার মীমাংসা হইবে না। ৫টার পূর্বে বিভা সরকার চলিয়া যায়। আমরা আফিসে যাই। বিভার আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুধাংশু আসে।...

...রেণুর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি লেখাগুলি পাইয়া খুব খুশী। আমাদের যে সত্যই একটা নূতন কিছু বলিবার আছে, তাহা তিনি এইবার বুঝিলেন। এতদিন আমাদের কোন লেখাই তিনি মনোযোগ দিয়া পড়েন নাই।

২৬শে ডিসেম্বর

মাঘ মাসের জন্য প্রবন্ধগুলি দেখি ও গুছাই। রেণু ১০।১০টায় বাহির হইয়া কীমারে প্রচ্ছদপটটী দিয়া ধর্মতলে গ্রামোফোন কোং-তে যায়।...সেখান হইতে ফোরাম ট্রাস্ট, শক্তি ঔষধালয়, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ব্যাঙ্কার্স ইউনিয়ন, এম, বি সরকার ও প্রেসে যায়।...আসিতে ৬।০টারও পর হয়।...প্রতিভা ১২টার সময় ব্যাঙ্ক পোষ্টাফিস হইয়া প্রায় ২টায় আসে।...প্রচ্ছদপটের উপরকার পতাকা সম্বন্ধে যে লেখা বাহির হইয়াছে, তাহা এইবার ঠিক মনে করিতেছি। ওটাকে অনেকে কমিউনিষ্টদের পতাকা মনে করে। উহা কম্যুনিজম-গ্রাসের পতাকা। কীমারের সত্যজিৎবাবু প্রচ্ছদপটের জন্য টাকা নিবেন না। তাঁহাকে রেণুর বই ও পত্রিকা দেওয়া হইবে...

২৭শে ডিসেম্বর

...আমি চরিত্রহীন পড়ি।...৬টার পর (প্রতিভা) আসে। রেণু আজ রাধাগেট, বোধে মিউচুয়াল, টাটা সুকুমার লাহিড়ী, এম বি সরকার প্রভৃতিতে যায়। আজ

আমি আফিসে একাই গিয়াছিলাম। রেণুও কেরে সন্ধ্যার পর। মাখনবাবু আসেন।...

'বিধবা রোহিণীকে ভালবাসা কি গোবিন্দলালের মন্দ কাজ হয় নি?

'ভালবাসা কি একটা কাজ যে তার জন্য অন্যায় হবে? স্ত্রীকে ছেড়ে যাওয়াটাই তার মন্দ কাজ হয়েছিল। চরিত্রহীন পৃঃ ৩১৩। দিবাকর প্রশ্ন করিল, পৃথিবীতে তবে পবিত্র প্রেম ঘৃণিত প্রেম এ দুটো আছে কেন?

কিরণময়ী হাসিয়া উঠিল। বলিল, তোমার তর্কটা ঠিক সতীশ ঠাকুরপোর মত হল। সংসারে ও দুটো থাকবার কথা বলেই আছে। মানুষের প্রবৃত্তি জিনিষটা মুক্তি নয় বলেই আছে। যাকে ঘৃণিত বলছ সেটা আসলে সুবুদ্ধির অভাব অর্থাৎ যাকে ভালবাসা উচিত ছিল না তাকেই ভালবাসা। অসাবধানে গাছ থেকে পড়ে হাত-পা ভাঙার অপরাধ মাধ্যাকর্ষণের উপর চাপানো আর প্রেমকে কুৎসিত ও ঘৃণিত বলা সমান কথা। ঠাকুরপো, এমনি করেই সংসারে একের অপরাধ অপরের মাথায় চেপে যায়। জীবের প্রতি অণু পরমাণু, প্রতি রক্তকণা নিজেকে উৎকৃষ্টতর পরিণতির মধ্যে বিকাশ করবার লোভ কোন-মতেই সংবরণ করতে পারে না। যে দেহে তার জন্ম, সেই দেহের মধ্যে যখন তার পরিণতির নির্দিষ্ট সীমা শেষ হয়ে যায়, তখন সেই দেহে তার যৌবন, তখনই শুধু সে অন্য দেহ সংযোগে অধিকতর সার্থক হওয়ার জন্য শিরায় উপশিরায় বিপ্লবের যে তাণ্ডব সৃষ্টি করে তাকেই পণ্ডিতদের নীতিশাস্ত্রে পাশবিক বলে গ্লানি করা হয়। এর তাৎপর্য্য বুঝতে না পেরেই হতবুদ্ধি বিজ্ঞের দল একে ঘৃণিত বলে বীভৎস বলে সান্ত্বনা লাভ করে। কিন্তু আজ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলছি ঠাকুরপো, এত বড় আকর্ষণ কোন মতেই অমন হেয়, অমন ছোট হতে পারে না। এ সত্য, সূর্য্যের আলোর মত সত্য। ব্রহ্মাণ্ডের আকর্ষণের মত সত্য। কোন প্রেমই কোন দিন ঘৃণার বস্তু হতে পারে না।' চরিত্রহীন পৃঃ ৩৪২

ধীরেনবাবু আফিসে আসেন ৬টায়। আগামী শনিবার আসিবেন imbecility সম্বন্ধে লিখিত চিঠিটার আলোচনা করিতে। মাঘ মাসে তাঁহাদের গ্রামে 'রথীন্দ্র সেবাশ্রম' খুলিবার প্রস্তাব চলিতেছে। সেখানে যাওয়ার কথাও বলিলেন। রবিবার চাকুরিয়ায় পরেশবাবুদের বাড়ী গীতা পাঠ হওয়া স্থির হয়।

সকালে চরিত্রহীন পড়ি। আজও দুপুরে ঠাকুর পূজা করি।...রেণু ৯টার পর কলিকাতা যাইয়া ঘুরিয়া ২টায় আসে। প্রতিভা আসে তাহার পর। আফিসে কিছু কাজ করার জন্য সকালেই আমরা রওয়ানা হই।...পথে নরু ডাক্তারের বাসায় আমি যাই। বাল তাহার শ্রাদ্ধ।... কিছু পরেই সুবোধ মুখার্জী আসেন।...আমাদের পত্রিকা তাহার ভাল লাগে। দত্ত রেণুকে বলিয়াছে, 'কেন সে বিনা পয়সায় তাহার প্রবন্ধ দিবে? লেখকদের কেন ঠকান? প্রেসকে যেমন দিতে হয়, লেখককে দিবার কথা তেমনি ঠিক রাখিতে হয়'। কিন্তু তাহাকে বলা উচিত ছিল—ব্যবসায়ের বাহিরেও একটা ক্ষেত্র আছে—প্রাণের ক্ষেত্র। আমরা সেই ক্ষেত্র হইতেই পত্রিকা বাহির করিতেছি প্রাণের কাছে প্রাণদর্শন দিবার জন্য। দাবী আমাদের প্রাণের। আমরা যেমন কিছুই নেই না, আপনারাও কিছু নেবেন না। অথচ আমাদের নেওয়ার প্রয়োজন আছে। আপনার তাহা নাই। আপনি চাকুরী করেন, সাহিত্য আপনার জীবিকাও নয়। সুবোধবাবুর কিছু পরেই মাখনবাবু আসেন।

২৯শে ডিসেম্বর

সকাল ৯টার পর নরুর বাসায় তাহার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পদকীর্ত্তন শুনিতে যাই। ভাল লাগিতেছিল। শ্রীরাধার বিরহ—মাথুর। এই তো মাধবীতলে—আমারে করিয়া কোরে দিবারাত্র সদা হেরে' ইত্যাদি। জীবের সারা দেহের সনাতন কান্না—দেহে মনে প্রকট হইবার জন্য আত্মার কান্না—কি গভীর, কি বেদনাময়। কি তার দিব্য রূপ! পরা প্রকৃতির জন্য পর পুরুষের কি প্রতীক্ষা, পরা-প্রকৃতির কি অমূল্য দান, দেহমনপ্রাণ সব যেন তত্ত্ব

হইয়া যায়। সেখানে প্রতাপ গুহরায়, জিতেশ গুহ, দেব-প্রসাদ ঘোষের সঙ্গে দেখা।...বলিল, উহারা খুবই ভাল মনে করুক, পাকিস্থানের ভিতরের অবস্থা ভাল নয়। পাঁচ বৎসর বাঁচিলে উহাদের পতন দেখিব। পূর্ব্ব পাকিস্থান কিছুতেই থাকিবে না। ১১টার পরেই চলিয়া আসি রেণু সকালে সুহৃৎবাবু, প্রিয়দারঞ্জনবাবুর সঙ্গে দেখা করে, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার কথাও সুহৃৎবাবুর নিকট বলিয়া আসে। তিনি একজন পরীক্ষক থাকিবেন। ডাঃ সিংহের সঙ্গে দেখা হয় নাই। ২টার পর সে এখানে আসে। প্রতিভা আসে তাহার আগে। প্রতিভাকে মহাত্মাজীর হস্তাক্ষরের নকল করিতে দেওয়া হয়। রেণু 'আমাদের নূতন বৎসর'টী নকল করে। সন্ধ্যার একটু আগেই আমরা আফিসে যাই। গোটা আটেকের সময় মনোরঞ্জন বসু নরুর এখান হইতে এখানে ঘুরিয়া আফিসে যায়। তাহার সঙ্গে রথটারও উপর কথাবার্ত্তা হয়। সে বলে যে সাধারণ মানুষ যে ভাবে দুর্নীতিপরায়ণ, তাহাতে এ স্বাধীনতা রাখা যাইবে না। দুর্নীতির মূল কোথায় তাহারই আলোচনা করি। পৌষের 'ভারতীয় সংস্কৃতি' রেণু পড়িয়া শুনায়। আগের 'নীতি' ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তাহারই ভিতর হইতে নূতন নীতি জন্মলাভ করিতেছে। আমরা সেই transition-এর মধ্যে পড়িয়াছি। জড়-অজড় সমন্বয়ের জন্যই এই সব যা-কিছু জড় ও অজড়ের ভাঙ্গাগড়া। ৮-৪০-এ রওনা হইয়া আশ্রমে ফিরি। ...সত্যব্রতেরও খুব জ্বর ও আমাশয়।...

১০শে ডিসেম্বর

ভোর ৬টায় এখান হইতে রওনা হইয়া কালীঘাট মোড় দিয়া (স্নানের নিকট) পায়ে হাঁটিয়া বেড়ালা যাই ৭টায় সত্যব্রতকে দেখিবার জন্য। তাহার জ্বর ও পেটের অসুখ। সেখানে প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত থাকি। সুধীন ব্যানার্জি ও আমি ফিরিয়া আসি...রেণু আজ ৯-৩০ সময় টালা পার্কে অল বেঙ্গল ফিজিক্যাল কালচার-এর অনুষ্ঠানে যোগদান করে। সেখানে লীলা রায়, (মন্মথ রায়ের বোন), অশোকা গুপ্তের সঙ্গে দেখা হয়। অশোকা গুপ্ত বলেন, 'আপনাদের পত্রিকায় একটা পত্রের খবর আছে।' -- ধীরেনবাবু আসেন সেই imbecile-এর চিঠিটা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য। 'ভগবানের করুণা' বলিতে যদি আমরা নিজের উপর নিজের, আমার উপর পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরের করুণা বুঝি, তবে মানুষের প্রতিটি কর্ম্ম বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া বিশ্বকর্ম্মে গড়িয়া উঠে, তখন প্রারব্ধের স্থান থাকে না বলিলেই হয়। Eternal damnation বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। এমন অধঃপতিত—কি দেহে, কি মনে - থাকিতেই পারে না যেখান হইতে পুরুষোত্তম না তুলিতে পারেন। গরু ভাই যেমন সেদিন শিলটা লইয়া টানাটানি করিয়া চাপা পড়িতে হইতেছিল, সংসারের মানুষও তেমনি সংসারের স্ত্রী পুত্র ধনদৌলত সম্বন্ধে ঠিক ঐ রূপ অন্ধ থাকার জন্য ঐ রূপই চাপা পড়িতেছে। আমরা শিশু হইতে বেশী বুদ্ধিমান হই নাই। Imbecile-দেরও সংশোধন সম্ভবপর। আর ক্রমবিকাশের জন্য প্রত্যেকেরই যে প্রতিটী অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হইতেছে না, তাহা কে বলিবে? দেহের স্তর, মনের স্তর এবং দেহ ও মনের সংযোগের অবস্থা বুঝিয়া imbecile-দেরও চিকিৎসা সম্ভবপর। আজি না থাকুক কালি নিশ্চয়ই সম্ভবপর।...ডাক্তার খোকন আফিসে আসে। তাহাকে কবিতা দিতে বলা হয়। গত বৎসরের পত্রিকার মোটামুটি হিসাব দেওয়া হয়। সে খুশী হইল।

সন্ধ্যার আগে আফিসে যাইবার পথে রেণুর সঙ্গে কথা হইতেছিল। শিশু গুরু হইতে, পুত্র পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মধ্যে রহিয়াছে 'Parent Stem' কে ছিন্ন করার আকাঙ্ক্ষা। ইহাই বুদ্ধির ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ। একান্ত-বর্দ্ধিত, একতানতার উপর গড়া এই হিন্দু সমাজের কাছে বুদ্ধ তাই মহাবিপ্লব আনিয়াছিলেন। দুইকে দুই রাখিয়া 'এক' হওয়ার খবর এ দেশের প্রাচীনেরা পৌঁছাইতে পারেন নাই। বুদ্ধ বর্ণাশ্রমকে ধাক্কা দিলেন। ইংরেজ রাজত্বে এই ভাঙ্গন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 'এক' এর অর্থ, অদ্বৈতের অর্থই আজ বদলাইয়া গিয়াছে। প্রতিটি মানুষ 'কেবল' হইবে, এই কেবলদের নিয়া সঙ্ঘ গড়িতে

হইবে, ইহাই বর্ত্তমান যুগের 'এক' হওয়া। G. C. M-এর 'এক' আজ পরিণত হইতে চাহিতেছে L. C. M.-এর 'এক'-এ। বেণুর পিতৃভক্তি তাই তাহাকে বলিয়াছে, উজ্জ্বল ভারতে তোমার দাবী কি? তুমি বঞ্চিত হইবে না তো? বেণু উত্তর করে, যে যাহা সৃষ্টি করে, সে-ই তাহার মালিক হয়। গুরুলোক বলেন, সব সময়ে তাহা হয় না। যতদিন সন্তান ধারা (একতানতা) চলিবে, ততদিন যোগ্য হউক বা না হউক, সৃষ্টি করুক বা না করুন, পিতার সম্পত্তি পুত্র পাইবে, গুরুর গদী শিষ্য পাইবে। কিন্তু যে যুগ আসিতেছে, সে যুগে unearned কেহ কিছু পাইবে না। এ যে যোগেশ্বরের যুগ। যোগ্য হইয়া সব-কিছু এবার পাইতে হইবে। পিতার পুত্র বলিয়াই সে পাইবে না, 'যোগ্য' উত্তরাধিকার বলিয়াই সে পাইবে'।

আগামী কাল রবিবার ঠাকুরিয়া যাইবার কথা গীতা-পাঠের জন্য সরেশবাবুর বাটীতে বেলা ৪টা হইতে ৬টা। ধীরেনবাবু ৪টার পূর্ব্বে আসিবেন।···'বসুন্ধরা'র জন্য বেণু 'সৃষ্টির আনন্দ' প্রবন্ধটা শেষ করে। বেহালা হাঁটিয়া যাইবার জন্য পা'টা উত্তপ্ত ও ক্লান্ত হয়।···

ইংরেজী বছর শেষ হইল। জীবন-পথে জীবন-দেবতা সব-কিছু পরিপাক করিয়া হাত ধরিয়া আগাইয়া নিয়া চলিতেছেন। তাঁহার সুস্থ অগ্রগতি অব্যাহত থাকুক আমার জীবনে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে। পুরুষোত্তম জয়যুক্ত হউন।

৩১শে ডিসেম্বর

ভগবতী

॥ শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

ভগবতী! ভগবতী! ভগবতী! অম্বা!
ভগবতী! ভগবতী! জয়, জগদম্বা!
দশ দিকে দশ কর প্রসারিত নিত্য;
দশ করে প্রহরণ কালানল-দীপ্ত;
পদ-তল-শতদল—
নিন্দিত সিংহ-বল;
ভালে জ্বলে হোমানল,
জয়, জগদম্বা!
ভগবতী! ভগবতী! জয়, জগদম্বা!

সৃষ্টির, কৃষ্টির দুর্গতি ঘুচে,
অয়ি মাতঃ, মাত তুমি রক্ষিতে শিষ্টে।
মহিষ সে মহাসুর
প্রপীড়য়ে লোকপুর;
ঘাড় তার কর চূর্ণ,
জয়, জগদম্বা!
ভগবতী! ভগবতী! জয়, জগদম্বা!

তব পদ-অর্চনে দেহ, দেবী, দীক্ষা;
তব রূপ ঈক্ষণে দেহ, দেবী, শিক্ষা।
রিপুদলে মর্দিব,
তেজ-ওজঃ অর্জিব,
তব প্রীতি বর্দিব,
জয়, জগদম্বা!
ভগবতী! ভগবতী! জয়, জগদম্বা!

ফাউষ্ট

॥ শ্রীমানস রায় ॥

[কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক ও বিজ্ঞান-তপস্বী গোটের বৃহত্তম সৃষ্টি হচ্ছে "ফাউষ্ট"। ফাউষ্টের প্রথম অংশ তিনি শেষ করেছিলেন যৌবনে। দ্বিতীয় অংশের জন্যে কাজ করেছিলেন সারা জীবন ধরে।]

১

শয়তান মেফিষ্টোফেলিস মানুষের সততার অবিশ্বাসী হয়ে ভগবানের সঙ্গে তর্ক করল তাঁর সৃষ্টি নিয়ে। যে সৃষ্টি শুধু ধ্বংসই নিয়ে আসে তার প্রয়োজনই বা কি? ভগবান কিন্তু তাকে অপর সকলের চেয়ে বিভিন্ন একজন সংলোকের কথা বল্লেন। তিনি হচ্ছেন ফাউষ্ট। শয়তান কিন্তু ফাউষ্টকেও সকলের সঙ্গে একভাবেই দেখল। সে ভগবানকে বল্ল: "আপনি তাকেও আমার কিছুদিনের জন্যে দিন, আমি তার আত্মাকেও চির-দিনের জন্যে বিধ্বস্ত করে দিতে পারব।" ভগবান শয়তানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা গ্রহণ করলেন ও বল্লেন: "যখন মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা তাকে বিচলিত করে, তার পছন্দ অপছন্দের কোন ক্ষমতা থাকে না। সে ভুলই করে। তবুও তার রাত্রির সেই ভ্রান্ত যাত্রাপথে অগো-চরেই সে আলোকপথযাত্রী হয়।"

শয়তান পৃথিবীতে নেমে বৃদ্ধজ্ঞানী পণ্ডিত ফাউষ্টকে জীবন সম্বন্ধে ভীষণ হতাশ দেখতে পেল। সে শুনতে পেল: "আমার সমস্ত শিক্ষা কি আমায় এই শিখিয়েছে যে, মানুষ নির্যাতিত হবে শুধু রক্তপাতই করবে? জীবনের সন্ধানে তারা অন্ধের মতো শুধু মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে যাবে?" শয়তান মেফিষ্টোফেলিস ফাউষ্টকে নতুন জীবন দান করল। সে তাঁকে পুনর্যৌবন দিল ও এই জন্যে তাঁর ক্রীতদাস হয়ে থাকার অঙ্গীকার করল এই সর্তে যদি পরজন্মে তিনি তার বদলে শয়তানের ক্রীতদাস হয়ে থাকেন। এই জগতে শুধু ভোগবিলাসের মধ্যে জীবনপাতের আশায় ফাউষ্ট শয়তানের ক্রীতদাস হতে স্বীকৃতি দান করলেন এক সর্তে যে, সে তাঁকে এই জন্মে আনন্দের উচ্চতম শীর্ষে উপনীত করতে সক্ষম হবে। রক্তবিন্দুতে তাদের অঙ্গীকার স্বীকৃতিলাভ করল।

শয়তান মেফিষ্টোফেলিস ফাউষ্টকে এক সুদর্শন যুবকে পরিণত করল। প্রথমে তারা দু'জনে গেল "আওয়ার-বাক্" এর সরাইখানায় যেখানে তখন খুব হৈ হল্লোর চলেছে। শয়তান সেখানে যাদুবলে কাঠের টেবিল থেকে মদ বের করল ও তাকে আবার আগুনে পরিণত করল। তাদের পরবর্তী গন্তব্য হল ডাইনীদের এক পাকশালা। এখানে শয়তান ফাউষ্টকে এমন পানীয় পান করাল তাতে ফাউষ্টের মনে জাগল দৈহিক ভালবাসার অনুভূতি। সেই সময়ে বাইরের রাস্তায় তিনি উদ্ভিন্ন-যৌবনা রূপসী নারী 'গ্রেতচেন'কে দেখতে পেলেন। তিনি তাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে চাইলেন। গ্রেতচেন তা সংশয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করল। ফাউষ্ট শয়তানকে তাঁর গ্রেতচেনের প্রতি অনুরাগের কথা জানালেন, কিন্তু মেফিষ্টোফেলিস বল্ল যে সে সবে গীর্জা থেকে আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে ফিরছে ও নিষ্পাপ হৃদয়ের উপর তার কোন ক্ষমতা নেই। ফাউষ্ট তা শুনতে রাজী নন। তিনি শয়তানকে বল্লেন যে যদি সে সেই রাত্রে গ্রেতচেনের সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটিয়ে দিতে না পারে তবে তিনি শয়তানের সঙ্গে তাঁর চুক্তি ভঙ্গ করবেন। শয়তান ষড়যন্ত্র করে গ্রেতচেনের সঙ্গে প্রতিবেশীর এক উদ্যানে ফাউষ্টের সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করল। সুদর্শন বুদ্ধিমান যুবক ফাউষ্টের ব্যবহারে গ্রেতচেন মুগ্ধ হল। সে আবার আসবে বলে কথা দিয়ে চলে গেল। এদিকে ফাউষ্ট এসে আবার গ্রেতচেনকে তার মা ঘুমিয়ে পড়লে তাঁকে ঘরে নিয়ে যাবার জন্য বল্লেন। পাছে তার মা বুঝতে পারেন এই ভয়ে তিনি গ্রেতচেনকে তার মাকে খাওয়াবার জন্যে ঘুমের ওষুধ দিলেন। এইভাবে তাদের মিলন সার্থক হল বটে, কিন্তু গভীর দুঃখ ও ব্যর্থতার মধ্যে তার পরিণতি ঘটল। ঘুমের ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় গ্রেতচেনের মার মৃত্যু ঘটল, আর

গ্রেতখেণও সন্তানসম্ভবা হল। গ্রেতখেণের ভাই ভালেন্টিন তখন সবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরেছে। সে সমস্ত শুনে বোনের প্রতিশোধ নেবার জন্যে ফাউষ্টকে খুঁজে বের করল। ফাউষ্ট ভালেন্টিনকে দ্বৈত সংগ্রামে ছুরিকাহত করলেন ও বোনের উপর অভিশাপ বর্ষণ করে ভালেন্টিনের মৃত্যু ঘটল। এবার ফাউষ্ট অলৌকিক শক্তির সন্ধান খুঁজলেন ও গভীর রাত্রে ভাইনীদের মিলনক্ষেত্রে দুষ্ট প্রেতাত্মাগুলোর সঙ্গে নানারকম যাদুক্রিয়ায় যোগ দিলেন। তিনি কিন্তু গ্রেতখেণের এই সর্বনাশের কথা কিছুতেই ভুলতে পারলেন না ও শয়তানকে তাঁকে গ্রেতখেণের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে বললেন।

তিনি গিয়ে দেখলেন যে অনেক দেরী হয়ে গেছে। সন্তান হত্যার জন্যে গ্রেতখেণের জেল হয়েছে। ফাউষ্ট তাকে উদ্ধার করতে চাইলেন। সে ভগবানের কাছে তার শাস্তিকে ন্যায়ঃ মনে করে তা প্রত্যাখ্যান করল ও পরে গ্রেতখেণের মৃত্যু ঘটল। যখন তিনি শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজী ছিলেন সেই আনন্দের চরম মুহূর্তে পৌঁছার আগেই ফাউষ্টের দৈহিক ভোগবিলাস শেষ হল। এবার তিনি ব্যগ্র হয়ে উঠলেন মানুষের সব বেদনা, আনন্দ ও দুঃখের মধ্যে নিজেকে উজাড় করে দিতে ও মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাবে যোগ দিতে।

২

হতাশ ও পরাস্ত মেফিষ্টোফেলিস তাঁকে অন্য রকমের আনন্দে প্রলুব্ধ করল ও ক্ষুদ্র জগৎ থেকে বৃহত্তর জগতে নিয়ে গেল। সে তাঁকে জার্মাণ সম্রাটের দরবারে নিয়ে গেল ও তিনি স্বীয় যোগ্যতায় সম্রাটের করুণা লাভ করলেন ও কাউন্সিলার নিযুক্ত হলেন। এই সম্মানও কিন্তু ফাউষ্টের কাছে মূল্য অর্থহীন মনে হল: তাঁর রোমান্টিক জীবনের রোমাঞ্চ জাগল মনে ও যাদুবলে তিনি হেলেনের আত্মাকে জীবনদান করলেন। হেলেনের রূপে বিমোহিত ফাউষ্ট তাকে প্রেম নিবেদন করলেন, কিন্তু অতীতের সৌন্দর্যের প্রতীক হেলেন পালিয়ে গেল ক্ষিপ্রগতিতে শুধু তাঁর হাতে হেলেনের পোষাকটুকু রেখে।

এই ভাবে বারবার ব্যর্থপ্রাপ্ত হয়ে ব্যর্থমনোরথ ও হতাশায় কাতর ফাউষ্ট আবার এগিয়ে গেলেন সুখের সন্ধানে, কিন্তু পরাজয় বা বিজয়ের শূন্যতা নিয়েই তিনি ফিরলেন বারবার। সম্রাটের হয়ে এক বৃহৎ যুদ্ধবিজয়ও তাঁর কাছে পরাজয়ের মতো তিক্ত মনে হল। শয়তান তাঁকে বৃহত্তম প্রলোভন দেখাল। নগরী, সাম্রাজ্য, গৌরবোজ্জ্বল কাজ, রূপলাবণ্যময়ী নারীমূর্তি, পার্থিব যশের অমরত্ব—কিছুই ফাউষ্টের ভাল লাগল না। তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি আবার নতুন জীবনের প্রান্তে গিয়ে পৌঁছোলেন ও অসংখ্য অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে তাঁর দ্বিতীয় যৌবনও বার্ধক্যে পরিণত হল। সব কিছুই নিয়ে এল শুধু মরীচিকা। প্রাণহীনতায় ও শক্তির অপচয়ে তিনি আবার ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। যৌবনের শীতল স্পর্শে শুধু পড়ে রইল নিঃসঙ্গতা আর তিক্ত আত্মসুখ। অন্ধত্বের শেষ আঘাতে চিরতরে তিনি সব সন্ধান ত্যাগ করতে প্রস্তুত হলেন।

যখন এই ভাবে সুখকে তিনি মরীচিকা বলে ভাবছিলেন, হঠাৎ তাঁর মনে জাগল একটা জনহিতকর কথা। তিনি সমুদ্র সৈকতের নিমজ্জমান জলাভূমিকে পুনরুদ্ধার করে তার উপর অসংখ্য লোকের গৃহনির্মাণের কথা ভাবলেন—যে সব লোক কঠোর পরিশ্রম করে তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করবে। এইভাবে আত্মবিস্মৃত ফাউষ্ট পরোপকারের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পেলেন। এই সময়ে ফাউষ্টের মৃত্যু ঘটল। শয়তান মেফিষ্টোফেলিস ভাবল যে, সে ভগবানের সঙ্গে বাজী জিতেছে কারণ ফাউষ্ট নিঃসন্দেহে পাপ করেছে অনেক। কিন্তু পণ্ডিত ফাউষ্টের আত্মা দাবী করল শয়তান, কিন্তু দেবদূতেরা পুষ্পবৃষ্টির মতো পৃথিবীতে নেমে ফাউষ্টের আত্মাকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন, কারণ তাঁর সব ভুলের মধ্যে দিয়ে তিনি আলোকের পথযাত্রীই ছিলেন। যে গ্রেতখেণের পাপ ও মৃত্যুর জন্যে ফাউষ্ট দায়ী ছিলেন, সেই গ্রেতখেণই সর্বপ্রথমে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাল। তার কর্তব্য হল ফাউষ্টকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া, কারণ নারীই চিরদিন পুরুষকে পাপ থেকে উদ্ধার বা রক্ষা করেছে।

সমাজবিদ্যার শিক্ষক

॥ শ্রীসুবোধ কুমার সেনগুপ্ত ॥

বর্তমান সময়ের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমাজ-বিদ্যার শিক্ষক সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানে উপযুক্ত এবং বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আমাদের সমাজ বর্তমান সময়ে অত্যন্ত জটিল অবস্থায় রহিয়াছে, এই জটিল অবস্থার মধ্যে পথ প্রদর্শক হিসাবে সমাজবিদ্যার শিক্ষক অগ্রণী হইয়া আসিয়া থাকেন, তিনি ছাত্রছাত্রীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সহায়ক বলিয়া মনে করা হয়। বর্তমান কালে ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা, প্রয়োজন, আগ্রহ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সমাজ-বিদ্যার শিক্ষককে ছাত্রছাত্রীদের চাহিদার উপযুক্ত সহায়ক হইতে হইবে। একজন উপযুক্ত শিক্ষক বলিতে আমরা কি বুঝি? যে শিক্ষকের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার প্রতি এবং তাহাদের অগ্রগতির উপর উপযুক্ত আগ্রহ আছে, তাঁহাকেই আমরা উপযুক্ত শিক্ষক বলিয়া থাকি। শিক্ষক শুধু শিক্ষক নন, তিনি ছাত্রও বটে এবং তিনি সর্বদাই শিক্ষাক্ষেত্রের নূতন জ্ঞান আহরণে ব্যস্ত। সমাজবিদ্যার শিক্ষক তাই নিজের বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং নিজের বিষয় ছাড়াও তিনি সাধারণ শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। তিনি স্থানীয় সমাজকে ভাল করিয়া জানেন, সমাজের ইতিহাস সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, সমাজের সম্পদ ও চাহিদা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা স্পষ্ট এবং তিনি পাঠক্রমের সঙ্গে সমাজের জ্ঞানভাণ্ডারকে যুক্ত করিতে সমর্থ—এইরূপ শিক্ষককে আমরা সমাজবিদ্যার সার্থক শিক্ষক বলিয়া মনে করিতে পারি। তিনি হইতেছেন সর্বপ্রথমে শিক্ষক, তারপর তিনি দার্শনিক, সাহায্যকারী ও বন্ধু। একজন সুশিক্ষক তাঁহার পরিবেশ সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত, এই কথা আমরা মানিয়া লইতে পারি।

একজন সুশিক্ষকের নানা সদ্‌গুণ থাকে। তিনি ছাত্রছাত্রীদিগকে ভালবাসেন এবং তাহাদের সঙ্গে কাজ করিতে উৎসাহ বোধ করেন। ছাত্রছাত্রী ও সহযোগী সকলেই তাঁহার সাহচর্য চায়। ছাত্রছাত্রী এবং তাহাদের পিতামাতা অভিভাবক সকলেই সুশিক্ষককে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানায়। তিনি সকলের বিশ্বাসের পাত্রও বটে। তাঁহার জীবনের ব্যক্তিগত উদাহরণ এবং প্রভাববারা তিনি ছাত্রছাত্রীদের শ্রম, সততা, অধ্যবসায়, সহ-যোগিতা, তৎপরতা, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন। সুশিক্ষক পক্ষপাতহীন, তিনি সর্বক্ষেত্রে দৃঢ়তা, নিরপেক্ষতা ও আত্মসংযম প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অন্যের অনুভূতির প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল, এবং তিনি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বিনয়পূর্ণ ব্যবহার করেন এবং তাহাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা দিয়া থাকেন। তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং ছাত্রছাত্রীদের মতামত শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা করেন। পাঠক্রমের বিষয় স্থির করা সম্বন্ধে সুশিক্ষকের দায়িত্ব রহিয়াছে এবং যাহাতে ছাত্রছাত্রীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সুশিক্ষক পাঠক্রমের বিষয় স্থির করিয়া থাকেন। ছাত্রছাত্রীগণ যাহাতে সুনাগরিক হইতে পারে সেইদিকে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি থাকে এবং ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে আত্মবিশ্বাসে ভর করিয়া সমাজে অগ্রসর হইতে পারে, সেদিকে তিনি সর্বদাই লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন।

সমাজবিদ্যার শিক্ষককে একজন সুশিক্ষকে পরিণত করিতে হইলে তাঁহার পক্ষে কিছু শিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে, আমাদের জটিল সমাজে সমাজবিদ্যার সুশিক্ষকের প্রয়োজন রহিয়াছে। সমাজের বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধানের মধ্য দিয়া

শিক্ষককে গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু তাহার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা হইতেছে, তাহা আমাদের জানা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ সমাজবিদ্যার শিক্ষককে সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। কিন্তু সকল সমাজ-বিদ্যার শিক্ষকই মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সমাজ-বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আসিতে পারেন না। অতএব শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে সমাজ-বিদ্যার শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণের ভিন্ন ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমাজবিদ্যার শিক্ষকের স্থান বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'র জটিলতা নিরসনের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মন প্রস্তুতির প্রাথমিক দায়িত্ব সমাজ-বিদ্যার শিক্ষকের। অতএব শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষা-মনস্তত্ত্ব, শিক্ষা-বিজ্ঞান, শিক্ষাদান-পদ্ধতির সঙ্গে সমাজবিদ্যা শিক্ষকের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।

সমাজ-বিদ্যা শিক্ষককে সমাজ সম্বন্ধে উপযুক্ত অভিজ্ঞতা দিতে হইবে। তিনি গ্রাম্য সমাজকে ভাল করিয়া দেখিবেন, গ্রামীণ সমস্যাগুলিকে সংগ্রহ করিয়া আলোচনা করিবেন। ছাত্রছাত্রীগণ গ্রামীণ সমাজ হইতেই আসিয়া থাকে। তাহাদের জীবন গ্রামীণ সমাজের সঙ্গেই ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। অতএব শিক্ষার অগ্রগতি হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের সমাজের জটিলতা হইতে মুক্তি না হয়। এই কারণে সমাজ-বিদ্যা শিক্ষকের বিশেষ প্রয়োজন গ্রামীণ সমাজকে ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করা।

শহর-জীবনের জটিলতাকে সমাজ-বিদ্যা শিক্ষককে বাদ দিলে চলিবে না। শহর জীবনের সমস্যাগুলির সম্পর্কেও তিনি ভালভাবে অবহিত হইবেন, এবং সেই ভাবে ছাত্রছাত্রীদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিবেন :

সমাজ-বিদ্যার শিক্ষকদের শিশু এবং ছাত্রছাত্রীদের বৃদ্ধি সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন, শিশু এবং ছাত্রছাত্রীরা কিরূপ মনের অবস্থা লইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, কিভাবে তাহাদের মানসিক বিকাশ হইতেছে, তাহা না জানিলে শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা দূরীকরণে এবং অগ্রগতির পথপ্রদর্শনে সাফল্য লাভ হইবে না।

বর্তমান যুগের মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সমাজ-বিদ্যা শিক্ষকের অবহিত হইতে হইবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহারা ঐ পদ্ধতির প্রয়োগ করিয়া দেখিবেন।

সমাজ-বিদ্যা শিক্ষকের পক্ষে স্থানীয় ভূগোল, ইতিহাস, প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্প, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, অধিবাসী, তাহাদের জীবনযাত্রা ইত্যাদি সম্বন্ধে জানিতে হইবে। এইসব বিষয়ে হাতে কলমে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য সমাজ-বিদ্যা শিক্ষককে হাতে কলমে পরিকল্পনা ও কাজ করিতে হইবে।

শিক্ষা বিষয়ক অভিজ্ঞতা দানের জন্য সমাজ-বিদ্যা শিক্ষককে পরিকল্পনা করিতে হইবে। পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য শিক্ষক সচেষ্ট হইবেন।

গ্রন্থাগার ব্যবহার এবং শ্রবণ ও দর্শনের সাহায্যে যে সব জিনিষ শিক্ষা করা যায়, তাহার ব্যাপক প্রয়োগ সম্বন্ধে সমাজ-বিদ্যা শিক্ষককে বিশেষ ভাবে অবহিত হইতে হইবে।

সমাজ-বিদ্যা শিক্ষক, সমাজের প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী, যাহারা গণতান্ত্রিক সমাজের নাগরিক হইয়া উঠিতেছে, তাহাদের চাহিদার গুরুত্ব দিবেন। তাঁহারা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের বৈশিষ্ট্যগুলি বাহির করিবেন এবং তাহাদের প্রয়োজন ও চাহিদাকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

যে সমস্ত অবস্থা ও সমস্যা ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া সমাজ-বিদ্যা শিক্ষকের মনে হইবে, সেই সমস্ত বিষয়ে সমাজ-বিদ্যার শিক্ষক বিশেষ দৃষ্টি দিবেন এবং সেইসব অবস্থার মধ্য দিয়া ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের উন্নতি যাহাতে হয় সেইদিকে ব্যবস্থা করিবেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদিগকে অবহিত করান সমাজ-বিদ্যা শিক্ষকের কাজ। বর্তমান বিদ্যালয়ে দেখা যায় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করা হয়, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে তাহাদের শিক্ষাদান করা হইতেছে, কোথা দিয়া তাহারা পৌঁছিবে, ঐ শিক্ষার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য

কি, তাহা ছাত্রছাত্রীদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয় সমাজ-বিদ্যা শিক্ষককে যেহেতু সমাজের জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রছাত্রীদের অগ্রগতির পথ প্রদর্শন প্রয়োজন, সেই হেতু ছাত্রছাত্রীদিগকে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে, সমাজ বিদ্যার শিক্ষক, অবহিত করিবেন।

শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে সমাজ-বিদ্যার শিক্ষকের পাঠ-ক্রমের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সহযোগিতা বলিয়া পরিকল্পনামূলক কর্ম করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে। এইরূপ কর্মের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের কর্মপটুতা, শক্তি সামর্থ্য, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ইত্যাদি বিকশিত হইবে

সমাজ-জীবনে সহযোগিতামূলক কর্মের প্রয়োজন অনুভব করিবে। কর্মের মধ্য দিয়াই একদিন ছাত্রছাত্রী সুনাগরিক এবং বিশ্বনাগরিক রূপে গড়িয়া উঠিবে।

শিক্ষণ সমাপ্তির পর সমাজ-বিদ্যার শিক্ষক যখন কোন বিদ্যালয়ে সমাজ-বিদ্যার শিক্ষক রূপে নিযুক্ত হইবেন, তখন তাঁহার শিক্ষণকাল যে সমাপ্ত হইয়া গেল, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জটিল সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-বিদ্যা শিক্ষককে শিক্ষাদান করিতে হইবে। সমাজ-ব্যবস্থা সর্ব্বদাই পরিবর্তিত হইতেছে। এই অবস্থায় সমাজ-বিদ্যা শিক্ষককে সর্ব্বদাই নূতন জ্ঞান আহরণের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কি ভাবে তাহা পারা যায় সে বিষয়ে নিম্নে কতকগুলি ইঙ্গিত দেওয়া হইল। সুপরিকল্পিত পাঠ, পরীক্ষা নিরীক্ষা, গবেষণা, পরিকল্পিত ভ্রমণ, শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ, আলোচনা সভা, কর্মশালা, শিক্ষামূলক সভায় যোগদান, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঐতিহাসিক স্মৃতি মন্দির, গ্রন্থাগার, যাদুঘর ইত্যাদি পরিদর্শনের মধ্যে দিয়া সমাজ-বিদ্যার শিক্ষক নিজেকে আরও বৃদ্ধি করিয়া লইয়া যাইতে পারেন।

সমাজ-বিদ্যা সম্পর্কিত পাঠ—সমাজ-বিদ্যার শিক্ষকেরা সমাজ-বিদ্যা বিষয়ক পত্রিকা, বিবরণী, বিজ্ঞপ্তি, জীবনী, পদ্ধতি-পুস্তক ইত্যাদি সর্ব্বদা পাঠ করিবেন। তাহা হইলেই তাহারা বর্ত্তমান সমাজ-বিদ্যার গতি সম্পর্কে অবহিত হইতে পারিবেন।

গবেষণা—সমাজ-বিদ্যার শিক্ষক সমাজ-বিদ্যা সম্পর্কিত নানারকম গবেষণা করিতে পারেন। শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে তিনি যাহা শিখিয়াছেন, তাহা লইয়া তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। সমাজ-বিদ্যা বিষয়টি গতি-প্রধান, অতএব এই বিষয়টিকে স্থিতিপ্রধান করিয়া রাখিলে চলিবে না; ইহার উপর সর্বদাই পরীক্ষা নিরীক্ষা গবেষণা ইত্যাদি করিতে হইবে, তবেই নূতন তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে।

কর্মশালা—চাকুরীতে থাকা অবস্থায় অনেক সমাজ-বিদ্যার শিক্ষক যাহাতে একত্র হইয়া একটি কর্মশালায় সমাজ-বিদ্যা বিষয়ক আলোচনা করিবার সুযোগ পান, সেই ব্যবস্থা শিক্ষা-বিভাগ করিয়া দিতে পারেন। বিষয়টির গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করিয়া সরকার এইরূপ কর্মশালার ব্যবস্থা করিলে, সমাজ-বিদ্যার শিক্ষকগণ সেই সুযোগ লাভ করিতে চেষ্টিত হইবেন।

পারস্পরিক পরিদর্শন—সমাজ-বিদ্যার শিক্ষকেরা যাতে মাঝে একে অন্যের বিদ্যালয়ে যাইয়া কি কি নূতন কাজ হইতেছে, তাহা দেখিয়া আসিতে পারেন। তাহাতে একে অন্যের অভিজ্ঞতা দ্বারা সমৃদ্ধ হইবেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

ভ্রমণ—সমাজ-বিদ্যার শিক্ষকের পক্ষে ভ্রমণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষের অনেক স্থান আছে যাহা প্রত্যেক সমাজ-বিদ্যা শিক্ষকের পক্ষে পরিদর্শন করা প্রয়োজন। কিন্তু এইরূপ ভ্রমণে যে খরচ হইবে তাহা বহন কে করিবে তাহার প্রশ্ন আসে। বিদেশে শিক্ষকদের জন্য কম টাকায় শিক্ষামূলক পরিভ্রমণের ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে এই ব্যাপারে সরকার অগ্রণী হইয়া আসিতেছেন। অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য যে ভ্রমণ তাহার ব্যবস্থা সরকার নিশ্চয়ই করিবেন।

উপরে সংক্ষেপে সমাজ-বিদ্যার শিক্ষকদের শিক্ষার উন্নতির জন্য কতকগুলি ইঙ্গিত দেওয়া হইল। এই সব পন্থা অবলম্বন করিলে সমাজ-বিদ্যার শিক্ষকগণ যে জ্ঞান-সমৃদ্ধ সুশিক্ষক হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

ক্রমশঃ

স্বামী বিবেকানন্দ

[৩০শে পৌষ, ১৩৩২ সনের উদ্বোধনে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখিত প্রবন্ধ]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের নিগূঢ়তম রস, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের যোগসূত্র, ভারতবর্ষের বিজয় তিলক, বাঙ্গলার সৌভাগ্য ঘন হ'য়ে যেদিন নরেন্দ্র-মূর্তিতে ভাগ্যবান বিশ্বনাথ দত্তের গৃহ আলোকিত ক'রে প্রকট হয়েছিল, সেদিন বিশ্বের এক মহা স্মরণীয় দিন। যা ছিল রামকৃষ্ণদেবের ভাব ও জ্ঞান-স্বরূপ নরেন্দ্ররূপে হ'ল তারই বিকাশ, তারই আস্বাদন। রামকৃষ্ণ বই 'নরেন' হয় না, 'নরেন বই ও রামকৃষ্ণ হয় না ; রামকৃষ্ণ-নরেন্দ্র যুগলমূরতি সমগ্র জগতের সমগ্রতার একটা দ্যোতনা মাত্র। যে স্পন্দন সমগ্র বিশ্ব একদিন রাজা-রামমোহনের প্রাণের ভিতর দিয়ে অনুভব করেছিল, বাঙ্গালীর ঘরের ছেলে নরেন্দ্রনাথ সেই স্পন্দনকেই ভারতীয় ভাবে মোড় ফিরিয়ে দিয়ে তারই ব্যাখ্যান মূর্তিতে বিশ্বের বুকে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। বিশ্ব যে অস্পষ্ট ছায়া-সভ্যতা নিয়ে অনির্দিষ্ট মরণের পথে ছুটেছিল, নরেন্দ্র-নাথ তাকেই নিজ রক্ত দিয়ে সরল, সুস্পষ্ট, সমুজ্জ্বল করে মানব জাতির অনুবর্ত্তনের জন্য আদর্শ রূপে দাঁড় করেছে। ভারতবর্ষ যে ভারতবর্ষ দিয়ে বিশ্ব জয় করতে পারে, ঋষিত্ব যে তার বুকের ভিতরে এখনও ঘুমিয়ে আছে কেবল তাকে জাগিয়ে তুললেই হয়, সমগ্র বিশ্ব যে ভারত-বর্ষের পায়ের জুতার 'ফিতা' বেঁধে দিয়েও গৌরব বোধ করতে পারে, সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞান-গর্ব্ব যে ভারতীয় ত্যাগ বৈরাগ্যের চরণ তলে লুটিয়ে পরতে পারে, বাঙ্গালী নরেন্দ্র-নাথে বাঙ্গালী তা একদিন প্রত্যক্ষ করেছে। বর্ত্তমান যুগ শিক্ষা, সভ্যতা, রাজনীতি বলতে যে মিথ্যাচারের পূজা করেছে, তার একটি চরম মীমাংসা দেবার দুঃসাহস যে ভারতবর্ষ রাখে এবং সমগ্র জগতের শিক্ষা-সভ্যতার গুরু যে একমাত্র ভারতবর্ষ, তা কি নরেন্দ্রনাথের জীবন-বেদান্ত অতি মহান মধুর করে জগতকে বুঝিয়ে যায় নি ? এক মাত্র বেদান্তই সমগ্র বিশ্বে বরণীয় ; তারই বেদী মূলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য জাতি-সমূহকে নব সমন্বয়ে মিলিত হতে হবে, ইহাই না নরেন্দ্রনাথের প্রচারিত বাণী ? বাঙ্গালী জানতনা-সে কে, কেন, কোথায় এসেছে ! বাঙ্গলার যে একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট বাণী আছে, একটা বিশিষ্ট তালে বিশিষ্ট আদর্শের পিছনে বিশিষ্ট পথে খেঁজবার বিশিষ্ট প্রেরণা আছে, তা এমন করে কে এর পূর্ব্বে আস্বাদন করে গিয়েছে ? যে বেদান্ত একদিন ঋষি-প্রাণের পূর্ণ সার্থকতারূপে ভারতকে অমর, অক্ষয়, অচ্যুত, আত্মানন্দ, আত্মরতি, স্বরাট করে রেখেছিল, সেই বেদান্ত হয়ে পড়েছিল খণ্ড, পরিচ্ছিন্ন, বদ্ধ। যে বেদান্ত ছিল নির্বিশেষ জীবনের ব্যক্ত বিকাশ, গোটা পরিবার, সমাজ বা সাধনার ইতিহাস, তাকেও পুঁথি ছাড়া আর কোন উচ্চতর ভাবে বহু দিন কেউ দেখেনি। বেদান্তও ছিল, দুর্ভিক্ষ—ম্যালেরিয়া—মহামারী—আলিয়ানওয়ালা—নিত্য নারী হরণ—নিত্য কন্যাদায়গ্রস্তের রক্তশোষণও তুল্য ভাবেই পাশাপাশি চলছিল। দুই যে এক সময়ে থাকতে পারে না, অবায়, অক্ষয়, অমর আত্মানন্দ বেদান্ত জীবনের আবির্ভাব হলে যে পরপদ দলন, দু মুঠা অন্নের জন্য বিদেশীর চরণে লুটিয়ে পড়া, আলিয়ানওয়ালার অত্যাচার সয়ে যাবার সহিষ্ণুতা যে থাকতে পারে না, তাতে ধর্ম্ম, ভারতের ধর্ম্ম যে রক্ষিত হতে পারে না, তা কে জানত ? ক্লৈব্যকে আমরা ধর্ম্মের নামে, রাজনীতির সীল মোহর করে, অন্ধ লোভ চারের ঝকঝকে আবেষ্টন দিয়ে মনের আনন্দে আস্বাদ করে চলেছি। এই তমোমির যুগে, সভ্যতার নামে পুঞ্জি-এই বিরাট মিথ্যাচারের যুগে, সরল ভাষায় কে এমন করে সত্য বলবার সাহস রাখত ? নরেন্দ্রনাথ ছিল একাধারে বাঙ্গালী, ভারতবাসী, বিশ্বনাগরিক। তাঁর পরিচ্ছিন্ন ধর্ম্মে ভৌগলিক রাজনীতিতে আস্থা ছিল না। ভারতবর্ষ কেবল

ভারতের জন্য—এ ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ধারণা তাঁর হৃদয়ে স্থান পায় নি ; ভারত যে 'জগদ্ধিতায়' একথা তাঁর প্রাণের ভিতর অণু অণু করে সর্বদা ছটাছুটি করত। এক মাত্র নরেন্দ্রনাথই ঋষি ভাবে ভাবিত করে ঋষির বেদান্তকে সমগ্র জগতের সামনে ব্যাখ্যা সুরু করেছিলেন। তাঁর সাধনায় বদ্ধ বেদান্ত আজ মুক্ত। যে বেদান্ত মুক্তি সাধনার ধ্রুবতারা, সেই বেদান্ত আটকে গিয়েছিল সঙ্কীর্ণ ধর্মের, সঙ্কীর্ণ সমাজের সঙ্কীর্ণ আদর্শে। বন্ধকে মুক্ত করার মত সাহস নরেন্দ্রের ছিল, তাইত বেদান্ত আজ ধর্মে, বেদান্ত আজ নয়ন জলে, বেদান্ত আজ পরিবারে, বেদান্ত আজ সমাজে, বেদান্ত আজ জাতির সাধনায়, বেদান্ত আজ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে। বন্ধকে মুক্ত করার জন্য এসেছিল বেদান্ত, সে যখন নিজেই পুঁথি ছাড়া আর কিছু ছিল না, তখন পুঁথির মরা পাতার মাঝে পড়ে বদ্ধ মরা বেদান্তকে মুক্ত-জীবনের ক্ষেত্রে মুক্তি-সাধনায় মুক্ত-বিগ্রহরূপে আস্বাদন করেছিল ও করিয়েছিল বাঙলার একটি মাত্র যুবক। যুবক শক্তির মোহন সার্থকতা এই নরেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে যে উদ্ভোধনভারত, যে উদ্ভোধ জগতের ভবিষ্যৎ চিত্র আমাদের প্রাণের সামনে দেদীপ্যমান দেখছি, আজ আমরা এই শুভ আবির্ভাব-তিথির স্মরণ দিনে প্রাণ খুলে তাকে বরণ করে নিচ্ছি। যে আহ্বান একদিন সমগ্র বাঙালী যুবকদের প্রাণে সিংহ গর্জনের মত ধ্বনিত হয়েছিল, সেই আহ্বান আজও বাঙলার আকাশে বাতাসে কেঁদে কেঁদে হাহাকার করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওগো রামকৃষ্ণের প্রাণের নরেন, তোমার সেই প্রাণ-ভাঙা রুদ্র-করুণ-প্রাণগর্জন তো আর বাঙালার যুবকদের উদ্বুদ্ধ করে না ; পর পদদলিত জননী-জন্মভূমির বন্ধনদশা মেনে নিয়ে নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দলে দলে তারা স্কুল-কলেজে যাচ্ছে ; যে বেদান্ত তুমি রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে আনবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছ, আজ তাকেই পদদলিত করে রাজনীতিতে স্থান দেবার চেষ্টা হচ্ছে ভণ্ডামীর। তোমার বাঙালী যুবকদের মাঝে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তোমার একটি মন্ত্র ও 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ'—মন্ত্র শোনবার মতন দুর্জয়-সাহসী প্রাণের ; আমরা তোমার করুণার পানে চেয়ে তোমারই প্রাণ-সাগরের এক কণা ভিক্ষা চাচ্ছি। বন্দেমাতরম্।

তিরিশে জানুয়ারী

॥ শ্রীসন্তোষ কুমার অধিকারী ॥

জীবনকে যত কুড়িয়ে কুড়িয়ে মৃত্যুর তীরে টেনে
জড়ো করি—সব জীবন সমিধে মৃত্যু ওঠেনা জ্ব'লে,
দিন ক'রে যায়, দিগন্তে নিশা, সময় নিয়েছে জেনে।

তবু কোন প্রাণ অগ্নিবাহনে যখন দীপ্যমান,
জ্ব'লে জ্ব'লে যেন সময়ের তটে আলোক অনির্বাণ,
যুগে যুগে শুধু মানুষের বুকে সূর্যোদয় সে আঁকে ;
সে প্রাণ জ্যোতিষ্মান,—
মৃত্যুসাগরে চিরসবুজের দ্বীপের লেখা সে রাখে।
মানুষের ক্ষোভ ভয়ের আঁধার নিঃশেষে যায় ক'রে।
সে প্রাণ বহ্নিমান,
জীবনের বুকে মৃত্যু লেখে সে অগ্নির আখরে।

বাংলা লোক-সাহিত্যের অনুশীলন

।। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য ।।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের মত বাংলা লোক-সাহিত্যের অনুশীলনও যে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল, এ'কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই খৃষ্টান-ধর্মপ্রচারকদিগের বাংলা ভাষা শিক্ষালাভ করিবার প্রয়োজনীয়তা হইতেই তাহাদের মধ্যেও ইহার সূত্রপাত, তারপর দীর্ঘ কাল ধরিয়া তাহারাই ইহার অনুশীলন করিবার পর ক্রমে এ দেশের শিক্ষিত সমাজেও এই বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ পায়। রেভারেণ্ড উইলিয়ম মর্টন বাংলার প্রাচীন-তম প্রবাদ সংগ্রহ প্রকাশিত করেন, তাঁহারই পথ অনুসরণ করিয়া রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙের আবির্ভাব হয়। রেভাঃ মর্টনের সংগ্রহ প্রাচীনতম হইলেও রেভাঃ লঙের সংগ্রহ বৃহত্তম। পর পর তিন খণ্ড সংগ্রহের মধ্যে দিয়া রেভাঃ লঙ প্রায় সাত হাজার প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করেন। বাংলার লোক-সাহিত্য সংগ্রহে ইহাই সর্ব্ব-প্রথম উল্লেখযোগ্য সংকলন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রেভাঃ লঙের এই সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সংকলনে সর্ব্বত্রই যে বাংলা প্রবাদই সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা নহে—অনেক ইংরাজী প্রবাদ বাংলায় অনুবাদ করিয়া যেমন প্রকাশিত হইয়াছে, তেমনই সংস্কৃত প্রবাদ বাক্যও সংকলিত হইয়াছে, তদুপরি সর্ব্বত্রই যে ইহাতে কেবল মাত্র প্রবাদই সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা নহে—ইহাদের একটি প্রধান অংশ জুড়া এবং বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ বা 'ইডিয়ম্।' রেভাঃ লঙ জুড়া, প্রবাদ এবং বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশে কোন বিশেষ পার্থক্য অনুভব করিতে পারেন নাই। এমন কি, পরবর্তী কালের বাঙ্গালী সম্পাদক কর্তৃক সংকলিত প্রবাদ সংগ্রহগুলি যে এই ত্রুটি হইতে মুক্ত, তাহা বলিবার উপায় নাই, কারণ, আধুনিকতম বাংলা প্রবাদ সংগ্রাহকগণও প্রধানতঃ রেভাঃ লঙের আদর্শই অনুসরণ করিয়াছিলেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বাংলা লোক-সাহিত্যের আর একটি বিশিষ্ট পরিচয় প্রথম প্রকাশ পায়, তাহা গীতিকা। স্যার জর্জ গ্রীয়রসন এই বৎসর উত্তর বাংলার নিরক্ষর মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে এক গীতি-কাহিনী শুনিতে পাইয়া তাহা 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' নামে প্রকাশিত করেন। দেব-নাগরী অক্ষরে ইহার মূল কাহিনীটি মুদ্রিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার একটি ইংরেজি অনুবাদও তিনি প্রকাশ করেন। ইহার মধ্য দিয়া কেবল মাত্র যে ভাষা-তত্ত্বগত কৌতূহলই নিবৃত্ত হইবার যোগ্য ছিল, তাহা নহে; ইহার সাহিত্যগত যে আবেদন ছিল, প্রধানতঃ তাহাতেই জনসাধারণের দৃষ্টি বাংলার লোক-সাহিত্যের প্রতি সক্রিয় ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহা বাহ্যতঃ নাথ-সম্প্রদায়ের বিষয় হইলেও ইহার সাহিত্যগুণের জন্যই নাথ-ধর্ম্ম লুপ্ত হইয়া যাইবার পরও মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা আত্মরক্ষা করিয়াছিল। ক্ষীণ ঐতিহাসিক ভিত্তি অবলম্বন করিয়া ইহার মধ্যে একটি সুদীর্ঘ কাহিনী রচিত হইয়াছে এবং এই সূত্রে নর-নারী চরিত্রের বিচিত্র রহস্যলোকের দিকে ইহাতে অঙ্গুলি-নির্দেশ করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যে প্রবাদ সংগ্রহগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাদের কোন সুস্পষ্ট সাহিত্য-গুণ ছিল না; ব্যাকরণ রচনা এবং ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনে ইহারা সংকলিত হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' ইহা হইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতির ছিল, ইহার একটি সাহিত্যিক আবেদনও সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। সেই জন্য লোক-সাহিত্য অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রবাদ সংগ্রহের নিষ্প্রাণ যে ধারা প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহার

মধ্যে ইহার ভিতর দিয়া প্রাণ সঞ্চারিত হইল। অল্পদিনের মধ্যেই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবিত বাঙ্গালী মনীষাও এই দিকে আকর্ষণ অনুভব করল, তাহার ফলে প্রথমেই রেভাঃ লাল-বিহারী দের সুপ্রসিদ্ধ রূপকথা সংগ্রহ Folk-tales of Bengal প্রকাশিত হইল। জর্জ গ্রীয়রসন যেমন মূল বাংলার সঙ্গে তাহার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, রেভাঃ লালবিহারী দে তাহা করিলেন না; তিনি বাংলার রূপকথা সংগ্রহের এক ইংরাজি অনুবাদ মাত্রই প্রকাশিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার ইংরাজি অনুবাদের মধ্য দিয়া এমন একটি বিশেষত্ব-প্রকাশ পাইয়াছেন যে, তাহাতে বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী জীবনের মাধুর্য বহুল পরিমাণে রক্ষা পাইয়াছে; সেইজন্য তাঁহার সংগ্রহ দ্বারা ভাষাতত্ত্বানোদীর কোন প্রয়োজন সিদ্ধ না হইলেও যাহারা সাহিত্যানোদী তাঁহাদের রস-পিপাসা অনেকখানি নিবৃত্ত হইয়াছিল। বিশেষতঃ তাঁহার সংগ্রহ সেদিন ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হইবার জন্য, একদিকে সে-দিনকার বাংলা ভাষা-বিমুখ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ যেমন ইহা পাঠ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল, আবার আর এক দিকে পাশ্চাত্ত্যের লোক-সাহিত্য-রসিক সমাজ বাঙ্গালীর জীবনে এক অপূর্ব রস-বস্তুর সন্ধান লাভ করিল। প্রকৃত পক্ষে রেভাঃ লালবিহারী দের উক্ত সংগ্রহ প্রকাশিত হইবার পূর্বে ভারতের অন্য কোন প্রদেশ হইতেই অনুরূপ কোন উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং তখন হইতেই পাশ্চাত্ত্য গবেষকদিগের মধ্যেও লোক-সাহিত্য বিষয়ক কোন আন্তর্জাতিক আলোচনায় ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতে গিয়া রেভাঃ লালবিহারী দে কর্তৃক সংগৃহীত বাংলা রূপকথা-গুলিকেই ভিত্তি করা হইত। ক্রমে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সিভিলিয়ান কর্মচারী ও খৃষ্টান ধর্ম-প্রচারক কর্তৃক বিভিন্ন সংগ্রহ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও রেভাঃ লালবিহারী দের সংগ্রহকে কেহ কোন দিক দিয়াই অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। ইহার দুইটি কারণ ছিল, একটি রেভাঃ লালবিহারী দে'র অননুকরণীয় রচনা-রীতি, দ্বিতীয় বাংলার রূপকথার বৈশিষ্ট্য। এই দুইটি গুণেই রেভাঃ লাল-বিহারী দে'র সংগ্রহ ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে যেমন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত সমাজেও প্রচার লাভ করিয়াছিল, তেমনই শিক্ষিত বাঙ্গালীর সমাজেও সেদিন প্রচারিত হইয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই প্রধানতঃ বাংলা লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। এমন কি, যে সকল বাংলা প্রবন্ধের সংগ্রহও সে দিন প্রকাশিত হইত, তাহাও ইংরাজি ভূমিকা, টীকা ও অনেক সময় ইংরেজি অনুবাদ সহই প্রকাশিত হইত। এ'কথা বলাই বাহুল্য, লিখিত সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ ভাষান্তরিত হওয়া যেমন সম্ভব, মৌখিক সাহিত্য কিংবা লোক-সাহিত্যের রূপ তত সহজে অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং এ' পর্যন্ত বাংলা লোক-সাহিত্যের যে পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা কোন দিক দিয়াই যে সুসম্পূর্ণ ছিল তাহা বলিবার উপায় নাই। বিদেশী ভাষায়-অনুবাদের ফলে ইহাদের অনেকখানি রসই প্রকাশ পাইতে পারিত না। বাঙ্গালীর গৃহ, বাঙ্গালীর জীবন, বাঙ্গালীর ভাষা আশ্রয় করিয়া যাহা সহজেই বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাকে একটি বিদেশী ভাষার ভিতর দিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া ভদ্র সমাজে পরিবেশন করিতে গেলে তাহার যে মৌলিক পরিচয় রক্ষা পাইবে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

১৩০১ সাল অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৯৪ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। সেই বৎসরই পরিষদের মুখপত্র 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহা কেবল মাত্র ছড়ার সংগ্রহ নহে—তাহার রস-বিশ্লেষণ। ইতি পূর্বে বাংলাতেই হউক কিংবা ইংরেজিতেই হউক বাংলা লোক-সাহিত্যের যে সকল সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল, সংগ্রহ ব্যতীত তাহাদের আর কোন মূল্য ছিল না। কিন্তু সংগ্রহে প্রকৃত প্রয়োজন কাহার? একদিক দিয়া ভাষা-তত্ত্ববিদের, অপর দিক দিয়া নৃতত্ত্ব কিংবা সমাজতত্ত্ববিদের —সাধারণ পাঠকের তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই।

বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনে খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ বাংলা প্রবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ভাষা বিষয়ক অনুসন্ধান করিতে গিয়া স্যার জি, এ, গ্রীয়রসন 'আদিকচন্দ্র রাজার গান' প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইংরেজি পাঠককে বাংলার রূপকথা শুনাইবার আগ্রহে রেভাঃ লালবিহারী দে Folk tales of Bengal রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালী বিদগ্ধ সমাজকে এই বিষয়ে কৌতূহলী করিয়া তুলিবার জন্য এই পর্যন্ত কোন প্রয়াস দেখা যায় নাই। এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধ সে দিন বাঙ্গালী রসিক সমাজের সম্মুখে এই জাতির রস-ভাণ্ডারের এক নূতন সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছিল। ইহার মধ্য দিয়া দেশ দেশান্তরের যাহারা লোক-সাহিত্যের গবেষক তাঁহাদের মুখ্যতঃ কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইল না, এ' কথা সত্য; কিন্তু ইহা দ্বারাই বাংলার সুধী সমাজে লোক-সাহিত্য অনুশীলনের যে প্রেরণা দেখা দিল, তাহাতে ভবিষ্যতে এই বিষয়ক আলোচনার পথ সুগম করিয়া দিল। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার দশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতা ও মফঃস্বলের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইল। সে দিন যদি বাঙ্গালী বিদগ্ধ সমাজের মধ্যে এই প্রেরণা দেখা না দিত, তবে আজ এই বিপর্যস্ত বাঙ্গালী সমাজ-জীবনের মধ্যে লোক-সাহিত্যের কোন উপকরণই আর অবশিষ্ট থাকিত না।

উজ্জ্বল ভারত

।। শ্রীশান্তশীল দাশ ।।

শুধু প্রতীক্ষায়
দিন কাটে, মাস কাটে, বর্ষ কেটে যায়।
কোথা সে ভারতভূমি উজ্জ্বল, সুন্দর?
অসংখ্য জীবন বলি যার তরে, সেই মনোহর
শাশ্বত সৌন্দর্যে ঘেরা শান্তি নিকেতন?
আসেনিকো। আসবে কি? কবে সে, কখন?
আকাশ পেলে কি কিছু তার?
এখানে যে কালো কালো অজস্র আঁধার।
আর সেই ঘন কৃষ্ণ আঁধারের মাঝে
বিকৃত জীবন কাটে। বাহিরের নানা রঙ-সাজে
ধরা পড়ে নাক তার সত্য রূপ, তাই
মনে হয়, কী সুন্দর; কোনো দুঃখ নাই,
কোনো ব্যথা বেদনার। পলকে সে আবরণ টুটে
খসে পড়ে: কী বীভৎস রূপ ওঠে ফুটে।
অজস্র যন্ত্রণা,
মন-প্রাণ কেঁদে ওঠে, কোথায় সান্ত্বনা।

তবু প্রতীক্ষায়
দিন কাটে, মাস কাটে, বর্ষ কেটে যায়।
পুণ্য ভূমি ভারতের এ আঁধার হবে অবসান—
কে যেন অলক্ষে বলে, ব্যর্থ হবেনিকো কোন দান।
এক দিন রূপ নেবে এ ভারত, তাহারই সূচনা
এই আঁখিজল, এই জনগণের বেদনা।
এ বেদনা ঘনীভূত হবে এক দিন
ভস্মসাৎ করে দেবে অসত্য যা, যা কিছু মলীন,
ছদ্মবেশধারী। অগ্নিস্নাত হয়ে গ্লানিময়
ভারত হবেই হবে আরাধ্য সে শান্তির আলয়।
অনেক সংশয়ে-ঘেরা এই দিন রাত—
তবু চেয়ে আছি সেই আসবে প্রভাত,
সোনালী রঙের আলো বুকে নিয়ে এসে
নামবেই এ ভূমিতে যন্ত্রণার অমাবাত্রি শেষে।
তারই প্রতীক্ষায়
দিন কাটে, মাস কাটে, বর্ষ কেটে যায়।

অথর্ববেদীয় মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

(অবধূত ভাষ্য সমেত)

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

শান্তিপাঠ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেম অক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি—
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্। তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব। ১

ওম্ ইতি এতৎ অক্ষরম্ [ওম্ রসানাং রসতমঃ এই অক্ষরটী] ইদং সর্ব্বম্ [এই সব-কিছু, বাচক-বাক্য, অভিধান ও অভিধেয়; উপনিষদ্ "ইদম্ সর্ব্বম্" "ওমিত্যেতদক্ষরম্" এইরূপ বলেন নাই, এইরূপ বলিলে ওঙ্কারের উর্দ্ধমূলত্ব বজায় থাকিত না, ওঙ্কারের সঙ্গেই যে সাধকের প্রত্যক্ষ ও নিকটতম সম্বন্ধ এবং ওঙ্কারের সহিত সম্বন্ধ বলিয়াই যে "ইদম্ সর্ব্বম্"কে দেখিতে শিখিতে হইবে—তাহা বুঝানো সম্ভব হইত না। সাধকের প্রথম দৃষ্টিই পড়িত 'ইদম্ সর্ব্বম্' এর দিকে, পরোক্ষ সম্বন্ধ স্থাপিত হইত ওঙ্কারের সঙ্গে] (ইহাই) তস্য [সেই পরব্রহ্মরূপ ওঙ্কারের] উপব্যাখ্যানম্ [ঘনীভূত নিকটতম ব্যাখ্যান explanation] "ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথম্ উপাসীত ওমিতি হ্যুদ্গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানম্।" ওঙ্কারেরই ব্যাখ্যান এই সব; এই সব ওঙ্কারকেই বাখানিয়া বাখানিয়া ক্লান্ত হইতেছে। "এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপঃ রসঃ আপঃ ওষধয়ঃ রসঃ ওষধীনাং পুরুষো রসঃ পুরুষস্য বাগ্রসো বাচ ঋগ্রসঃ ঋচঃ সাম রসঃ সাম্ন উদ্গীথঃ] রসঃ। স এষঃ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধোঽষ্টমঃ য উদ্গীথঃ] ভূত [অতীত]ভবৎ [বর্ত্তমান] ভবিষ্যৎ [ভাবী] ইতি [এই ত্রিকালে পরিচ্ছিন্ন] সর্ব্বম্ [সবই] ওঙ্কার এব [ওঙ্কারই; ওঙ্কার কালের প্রতি spanএর মাঝে এমন অনুস্যূত রহিয়াছেন যে, কোনও খণ্ড কালই নিজ মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করে না। পরস্পর পরস্পরে অনুপ্রাণিত থাকিয়া পরিণামের পর পরিণাম সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান যদি শুধু বর্ত্তমানই হয়, অতীত অতীতই থাকে, ভবিষ্যৎ যদি ভবিষ্যতের গর্ভেই লুক্কায়িত থাকে, তবে কাল পুরুষোত্তম-জীবনের অঙ্গীভূত হইত না, পুরুষোত্তম শুধু পুরুষই থাকিতেন, যাহাকে বাহির মুছিয়া শুধু অন্তরেই খুঁজিতে হইত। পুরুষোত্তম-জীবনে অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ হয়, বর্ত্তমান অতীত ভবিষ্যৎ হয়, ভবিষ্যৎও অতীত বর্ত্তমান হয়। কোনও খণ্ডকালই একান্ত (absolute) নয়, ইহারা relative (আপেক্ষিক মাত্র)। অতীতকে বর্ত্তমানে রূপায়িত করিয়া যিনি ভবিষ্যতের জন্য ভবিষ্যৎ কালের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সৃষ্টি করিতে না পারিবেন, তিনি স্রষ্টানামের অযোগ্য। কাল নমনধর্ম্মশীল (flexible)। যাহা এক দৃষ্টিকোণে অতীত, তাহাই অন্য দৃষ্টিকোণে বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ; ইহা বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও সত্য। কাল সম্বন্ধে এই বিজ্ঞান তখনই সম্ভব, যখন অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ যে যাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও 'অন্যোন্যসক্ত' এবং 'অনবিপ্রযুক্ত', তখনই প্রয়োজন হয় একটী 'পর'

ত্রিকালাতীত কালের। তাই শ্রুতি বলিতেছেন] যচ্চ অন্যৎ [আর যাহা অন্য] ত্রিকালাতীতম [কালের কাটিয়া গণাইয়া প্রতি কালের স্বাংমূল্য দিয়া এবং সকল কালের সমন্বয় বিধান করিয়া যিনি প্রতি কালের অতীত ও অতিগ (পর), তিনিই ত্রিকালাতীত] তৎ-অপি [তাহাও] ওঙ্কার এব [ওঙ্কারই]। এই মন্ত্রে ওঙ্কারকে মুখ্যতঃ বাচকরূপে ধরিয়া, বাচ্য অর্থসমূহের (অর্থাৎ ব্রহ্মের) সহিত তাহার ঐক্য দেখান হইয়াছে "প্রণবঃ তস্য বাচকঃ"—পতঞ্জলিঃ ; উপব্যাখ্যান সহিত ওঙ্কার বাচক, ব্রহ্ম-আত্মা তাহার বাচ্য। এখানে একটী চক্রের আকারে প্রণব এবং তাহার বাচ্য ব্রহ্ম-আত্মা পুরুষকে উপস্থাপিত করিয়া শ্রুতি বুঝাইতেছেন। বাচক প্রণব হইতে আরম্ভ করিয়া বাচ্য ব্রহ্ম-আত্মা পর্য্যন্ত পৌঁছানো চক্রের অর্দ্ধ—যাহার বর্ণনা ৭ম শ্রুতির পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে। চক্রের দ্বিতীয় অর্দ্ধ আত্মা হইতে আবার প্রণবে পৌঁছানো। প্রণব ও ব্রহ্ম-আত্মা যে দুইই সম্পূর্ণভাবে correspond করেন, ইহাই দেখান হইবে। ওম্ নামে অভিহিত এই অক্ষরই এই সব। তাহার উপ-ব্যাখ্যান কথিত হইতেছে। ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই সমস্তই ওঙ্কার এবং অপর যাহা ত্রিকালাতীত তাহাও ওঙ্কারই।

সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম অয়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।২

[ওঙ্কার-আশ্রয়ে ওঙ্কার-উপাসক ভূত-ভবৎ-ভবিষ্যৎ-ত্রিকালাতীত সব কিছুতে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু এই ছড়াইয়া পড়াই যে ব্রহ্ম হওয়া এবং আত্মাস্বাদন করা তাহাই শ্রুতি বলিতেছেন] (ওঙ্কারের সাধনায় যে সর্ব্ব মিলিয়াছে) সর্বং হি এতৎ [এই সমস্তই] ব্রহ্ম [সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্ম]; অয়ম্ [এই] ব্রহ্ম [সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্ম] আত্মা [প্রত্যক্ অহম্ আত্মা] সঃ অয়ম্ [সেই এই] আত্মা [আত্মা] চতুষ্পাৎ [চারিটি পাদযুক্ত] যাহা দ্বারা ব্রহ্মকে পাওয়া যায় (পদ্যতে অনেন) তাহাই পাদ—ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়। যাহাকে পাওয়া যায়, তিনিও পাদ-শব্দ বাচ্য (পদ্যতে ইতি) এই অর্থে ব্রহ্ম পাদ। ওঙ্কার সাধনা সর্ব্ব বিশ্বের মাঝে সাধককে ছড়াইয়া দিয়া, সেই ছড়ানোতেই ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিয়া আবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া আত্মাস্বাদন, আত্মক্রীড়া-রস পান করাইতেছেন। সাধনা-সিদ্ধি-সাধ্য-সাধক সবই ওঙ্কার, ব্রহ্ম, আত্মা।

এই সমস্তই ব্রহ্ম, এই আত্মা ব্রহ্ম। উক্ত এই আত্মা চতুষ্পাৎ।

জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি-মুখঃ স্থূলভুগ্বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। ৩।

জাগরিতস্থান [জাগ্রদবস্থা যাহার ভোগস্থান] বহিঃপ্রজ্ঞঃ [বহির্বিষয়ে যাহার প্রজ্ঞা (অনুভূতি)] সপ্তাঙ্গঃ [যাহার সাতটী অঙ্গ—দ্যুলোক যাহার মস্তক, সূর্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, আকাশ শরীর, জল মূত্রাশয়, পৃথিবী পাদদ্বয়, আহবনীয় অগ্নি যাহার মুখ (ছান্দোগ্য ৫।১৮।১)] একোন-বিংশতিমুখঃ [যাহার উনিশ মুখ অর্থাৎ উপলব্ধি ও কর্ম্মের-দ্বার ; দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই উনিশটী মুখ] স্থূলভুক্ [স্থূল শব্দাদি বিষয়ের ভোক্তা] বৈশ্বানরঃ [বৈশ্বানর অর্থাৎ নিখিল নরস্বরূপ সর্ব্বজীবাত্মা বিরাট] (আত্মার) প্রথমঃ পাদঃ [প্রথম পাদ] জাগ্রদ-বস্থায় অবস্থিত বিশ্বের (বা বাষ্টি মানবের) অবস্থাকে বৈশ্বানর বলায় বুঝিতে হইবে যে বিশ্ব ও বৈশ্বানর (বিরাট) এক।

জাগ্রদবস্থা যাহার ভোগস্থান, যিনি বাহ্য বিষয়ের অনুভূতি সম্পন্ন, সাতটী যাহার অঙ্গ, উনিশটী যাহার মুখ, যিনি স্থূল বিষয়ই ভোগ করেন, সেই বৈশ্বানরই আত্মার প্রথম পাদ।

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবি-বিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। ৪

স্বপ্নস্থান [স্বপ্নাবস্থা যাহার ভোগস্থান] অন্তঃপ্রজ্ঞঃ [ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অন্তঃস্থ মনের বাসনারূপ প্রজ্ঞাবিশিষ্ট] সপ্তাঙ্গ [সাতটী যাহার অঙ্গ] একোনবিংশতি মুখঃ [উনিশটী যাহার মুখ] প্রবিবিক্তভুক্ [(gross) স্থূল হইতে প্রকৃষ্ট রূপে বিবিক্ত (অসম্পৃক্ত) স্থূলের শুদ্ধ নির্দ্দোষ বিবিক্ত অর্থাৎ নিংড়ানো বাসনা-রস যিনি প্রবিবিক্ত অর্থাৎ

সম্পূর্ণ একাকী সকলকে আড়াল করিয়া থাকিয়া ভোগ করেন, সেটা জাগরিত অবস্থায় ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ভোগ করিতেই হইত] তৈজসঃ [স্থূল বিষয়ের স্থূলত্বের দোষকে উত্তাপ দিয়া গলাইয়া শুদ্ধ, নির্দোষ করিবার মতন তেজ অর্থাৎ কেবল প্রকাশস্বরূপ প্রজ্ঞা যাহার আছে, তিনিই তৈজস] দ্বিতীয়ঃ পাদঃ [দ্বিতীয় পাদ। এখানে তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ এক।]

স্বপ্নাবস্থা যাহার ভোগস্থান, যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ, যাহার সাতটী অঙ্গ, উনিশটী যাহার মুখ, যিনি প্রবিবিক্তভুক্, সেই তৈজসই আত্মার দ্বিতীয় পাদ।

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়োহ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ।৫।

যত্র [যে দৈনন্দিন ঘুমের অবস্থায় বা কালে] সুপ্তঃ [সুষুপ্ত ব্যক্তি] কঞ্চন [কোনও] কামং (কাম্য-বস্তু ও কামনা) ন কাময়তে (কামনা করেনা) কঞ্চন [কোনও] স্বপ্নং [স্বপ্ন] ন পশ্যতি [দেখেনা] তৎ [তাহাই] সুষুপ্তম্ [সুষুপ্তি] সুষুপ্তস্থানঃ [সুষুপ্তি যাহার স্থান] একীভূতঃ [বহুকে আনন্দরসে প্রজ্ঞান তেজে ভাসিয়া ও পাক করিয়া তাহাকে ঘনিভূত করিয়া একত্ব প্রাপ্ত] প্রজ্ঞান-ঘনঃ এব [প্রজ্ঞান মূর্ত্তিই] আনন্দময়ঃ [প্রজ্ঞার দৃষ্টি একের দিকে, আনন্দের দৃষ্টি বহুর দিকে ; তাই প্রজ্ঞানঘন বলার সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দময় শ্রুতি বলিতেছেন, কেননা পুরুষোত্তম প্রজ্ঞানানন্দঘন ; আনন্দময় অর্থাৎ আনন্দ প্রচুর, আনন্দপূর্ণ] হি আনন্দভুক্ [নিঃসন্দিগ্ধরূপে অনায়াসে আনন্দভোজী] চেতোমুখঃ [চেতঃ (বোধশক্তি) হইতেছে মুখ যাহার ; এই বোধশক্তিরূপ মুখের সাহায্যেই পুরুষ আনন্দ ভোগ করেন] প্রাজ্ঞঃ প্রজ্ঞানস্বরূপ] দ্বিতীয়ঃ পাদঃ [দ্বিতীয় পাদ]

সুপ্তব্যক্তি যে কালে কোনও কাম কামনা করে না, এবং কোনও স্বপ্ন দেখে না, তাহাই সুষুপ্তি। সুষুপ্তি যাহার স্থান, সকল বহুকে বুকে লইয়া যিনি একীভূত, কেবল অনুভূতিস্বরূপ, আনন্দময় এবং অনন্বিতরূপে অনায়াসে আনন্দভোগকারী, বোধশক্তিরূপ মুখদ্বারা যিনি ভোগ করেন সেই প্রাজ্ঞই আত্মার দ্বিতীয় পাদ।

এষঃ সর্বেশ্বরঃ এষঃ সর্বজ্ঞঃ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।৬।

এষঃ [এই প্রাজ্ঞই] সর্বেশ্বরঃ [সকলের শাসক ঈশ্বর] এষঃ [ইনিই] সর্বজ্ঞঃ [সর্বজ্ঞ] এষঃ [ইনি] অন্তর্যামী [সকলের অন্তর যমন করেন (control)] এষঃ [ইনি] যোনিঃ [কারণ] সর্বস্য [সকলের] হি [অতএব] প্রভবাপ্যয়ৌ [প্রভব এবং লয় স্থান] ভূতানাং [ভূত সমূহের]। এই পাদে প্রাজ্ঞ পুরুষ সকলকে শাসকরূপে শাসন করেন। এখানে শাসক-শাসিতের ব্যবধান রহিয়াছে, ইনি সর্বজ্ঞ, 'না-জানা'র অনৈশ্বর্য্য ইহাতে নাই, অথচ রসের ক্ষেত্রে না-জানাটা জানার চেয়েও বেশী মূল্যবান। এখানে আছেন অন্তর্যামী, যিনি সকলের অন্তর যমন করেন, কিন্তু নিজে controlled হন না, ইনি ভূতের যোনি, কিন্তু ভূত ইহার যোনি নয়, ইহাতেই ভূতসমূহের জন্ম ও লয়, ভূতসমূহে ইহার জন্ম ও লয়ের কোনও কথাই নাই। প্রজ্ঞার স্তরে আছে কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলা, শাসক-শাসন-শাসিতের মাঝে প্রকাণ্ড ব্যবধান, রহিয়াছে 'জানা'র একটা প্রকাণ্ড অহংকার। এখানে জগতের কোনও নিজস্ব মূল্য নাই, এই জগৎ ঈশ্বরেরই বিভূতি। তিনি শক্তিদ্বারাই ইহার সৃজন পালন ও সংহার করেন। ঈশ্বরের এই একতরফা শাসনও উপাধি যদি না তিনি শাসিতের শাসনে শাসিত হইতে চান, ঈশ্বর যখন শুধুই ঈশ্বর, বিশ্ব তাহার দাস মাত্র। সেই জন্যই পরবর্ত্তী স্তরের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া উপনিষদ্ পরবর্ত্তী স্তরের আস্বাদন করাইতেছেন।

ক্রমশঃ

সমস্যা ও সমাধান

॥ শ্রীজিতেন গাঙ্গুলী ॥

সমস্যার অন্ত নেই, চারদিকেই সমস্যা—সামাজিক সমস্যা, জাতীয় সমস্যা, আন্তর্জাতিক সমস্যা, তাছাড়া দৈনন্দিন জীবনে আমাদের ব্যক্তিগত সমস্যারও বিরাম নেই। প্রতিটী ছোটখাট সমস্যাই যেন পর্বত প্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়ায় চলার পথে। যতদিন সংসারে দায়িত্ব ছিল না ততদিন কোন সমস্যাই ছিল না—খেয়ে দেয়ে হৈ হুল্লোড় করে কাটিয়েছি—অবশ্য পড়াশুনার মধ্যে। বরং চ অভিভাবকদের কোন সমস্যায় বিব্রত হতে দেখে কৌতুক বোধ করেছি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের দায়িত্ব এসে পড়েছে কাঁধে। এখন দেখছি পৃথিবীটা তত সহজ সুগম স্থান নয়—চারদিকেই সমস্যাসঙ্কুল। তাই চলার পথের টেক্‌নিক্ জানতে হবে, নতুবা সংসার-পথ উৎরানো যাবে না—জীবন হয়ে উঠবে দুর্বিসহ। আজ সমস্যা ছোট হলেও একটার পর একটা এসে সামনে দাঁড়াচ্ছে। সমাধানের চেষ্টা করবই—কিন্তু একক প্রচেষ্টায় এর সার্থকতা লাভের আশা খুবই কম। নানা সমস্যার মধ্যে একটা ধরুন—বর্ত্তমান ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সমস্যা প্রায় ছেলেপিলেরা আজকাল অভিভাবকদের কথায় কর্ণপাত করে না। আচার ব্যবহারে তারা উচ্ছৃঙ্খল, 'ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ' এই মূল মন্ত্র আজ তাদের কাছে হেয়ালী, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়ার তাগিদ দিতে দিতে অভিভাবকের সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে উঠেছে তিক্ত, শিক্ষা দীক্ষা আচার ব্যবহারে তাদের শালীনতার অভাব সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হচ্ছে, অথচ অনুকরণে তারা সুদূর আমেরিকা বা বিলেতের laddy boyদেরও টেক্কা দিচ্ছে। পোষাকের পারিপাট্য, চালচলনের ভঙ্গিমা অথবা সিনেমার গানগল্পের জন্ত তাদের ট্রেনিং নিখুঁত সিনেমা আর্টিস্টদের নাড়ী নক্ষত্র তাদের নখদর্পণে অথচ; লেখাপড়ায় সমস্ত এদের স্মৃতি-শক্তি বড়ই দুর্বল। ছেলে-পিলেদের লেখাপড়া করার স্পৃহাটাই কমে গেছে, সব সময় একটা না একটা ফাঁকির চেষ্টা। বিদ্যাসাগরের সেই আলোর অভাবে রাস্তার ল্যাম্প পোস্টে পড়ার কথা হয়তো গল্পেই স্থান নিয়েছে। এই যে অবনতি—এ স্রোত রোধিবে কে?

এর পরের কথা আজকাল শিক্ষা ব্যবস্থা যে রকম ব্যয়বহুল, তাতে গরীবের কথা বাদই দিলাম, মধ্যবিত্তের পক্ষেও তাদের ছেলেপিলের শিক্ষার সুষ্ঠ ব্যবস্থা করা খুবই কষ্টসাধ্য। উচ্চ শিক্ষার বই পুস্তকের তিরিস্তি অনেকের পক্ষেই মেটানো সম্ভব নয়। গৃহ-শিক্ষক রাখা অনেকেরই আয়ত্বের বাইরে। একজনের হয়তো কিছু পয়সা আছে, সে তার ছেলেমেয়ের জন্ত হয়তো পৃথক ব্যয়সাপেক্ষ শিক্ষক রাখল বা অন্য ব্যবস্থা করল। কিন্তু সাধারণের সীমাবদ্ধ আয়ে যদি বা কিছু খরচ করা যায়, তাতে কোন ভাল শিক্ষক যোগাড় করা সম্ভব না। সুতরাং নামে গৃহ-শিক্ষক অনেকেই রাখলেও তাতে শিক্ষার থেকে বুঝি বা অশিক্ষার বাড়ে!

ছেলেমেয়েদের বর্ত্তমান অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে হলে যে পথ নিতে হবে, আজ আমি সে পথের কথা না বলে এইটেই বিশেষ করে বলতে চাই যে, কোন একক প্রচেষ্টায় আজ কোন সমস্যার সমাধান হবে না। যে সমাধানের পথই আমরা নেই, সেটাতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে পারস্পরিকতা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। আজ পারস্পর্য ছাড়া সমাজ বাঁচবে না, সমাজ না থাকলে আমার অস্তিত্বই বিপন্ন। এ সত্য আজ উপলব্ধি করতে হবে। মানুষ আজ ক্রমেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। পূর্ব্বের একান্নবর্ত্তী পরিবারগুলি আজ ছিন্নভিন্ন,

সকলেই আজ নিজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত, নিজকে নিয়েই ব্যস্ত। নিজের ছেলেটি মেয়েটী পরিবারটী—ব্যস্। অথচ সমাজে পারস্পর্যের মধ্য দিয়েই যে একমাত্র বাঁচা সম্ভব এ সত্য, মুখে আমরা যতই নানা মতবাদ প্রচার করি না কেন, কিছুতেই গ্রহণ করতে পারছি না। বিগত দাঙ্গার সময় পারস্পর্যের চেতনা উপলব্ধি করার একটা অবকাশ আমরা পেয়েছিলাম। পাড়ার একজন ধনী লোক সে সময় নিজেকে কতই না নিঃসহায় মনে করেছে। সেদিন বড়লোক গরীবলোক সকলকেই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বাঁচতে হয়েছিল। সেদিন বুঝেছিলাম কিন্তু দিন ভাল হলে সে কথা আবার ভুলে গেছি। আজ সমস্ত সমস্যা সমাধানের আগে প্রথমেই শিখতে হবে যে একা বাঁচা যাবে না, পারস্পরিকতা ছাড়া পথ নাই। আমাদের প্রত্যেককে শিক্ষায় দীক্ষায় এগোতে হবে পাঁচজনকে পিছনে ফেলে নয়—সবাইকে নিয়েই এক-সঙ্গে এগোতে হবে। যে কোন সমস্যা আজ আর আমার একলার সমস্যা হিসাবে চিন্তা করলে চলবে না। সামাজিক জীবন যে রকম জটিল হতে জটিলতর হয়ে উঠছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে চাই সমবেত প্রচেষ্টা —আজ এই টেকনিকটীই যে কোন সমস্যা সমাধানের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এ যুগ হচ্ছে সমবায়ের যুগ—কালের এই ইঙ্গিত ধরতে না পারলে আমরা কোন সমস্যা নিয়েই এগোতে পারব না। এই পারস্পরিকতা বা সমবায়ের মনোবৃত্তির ভিতরেই আছে ত্যাগের ভাব—অহংকার ত্যাগের ভাব। ভোগ মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে—বন্ধনের জালে জড়িয়ে ফেলে; কিন্তু ত্যাগ—অপর সকলের জন্য দরদ বোধ—মানুষের মনের প্রসারতা বাড়ায়, আমাদের বন্ধন-গ্রন্থিগুলো শিথিল করে মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বর ভাব আছে তা জাগিয়ে তোলে। সামাজিক জীবনে সমষ্টি-গত কর্মের মধ্য দিয়ে এ ভাবটির সম্প্রসারণে মানুষ দেব ভাবে সমন্বিত হয়ে পুরুষোত্তম-স্তরে পৌঁছাবে। এমন কি এটাই মানুষের চিরদিনের চরম এবং পরম জিজ্ঞাসার সমাধান ও পথের হদিস দেবে। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ চিরজীবন প্রেম মৈত্রী ও সাম্যের বাণীই প্রচার করে গেছেন। তাঁর গুরুদেব শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল বলতেন 'I am a cosmopolition', ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন 'যত্র জীব তত্র শিব'। এই ভাব আমাদের অন্তরে উদ্বেলিত হয়ে উঠুক, পারস্পর্যের মাধ্যমে ত্যাগ ভাব বিকশিত হউক, আমাদের কর্ম প্রচেষ্টাকে—প্রতিটী কর্মকেই যেন আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখি। তাতেই মুক্ত হবে সংস্কার ও বন্ধন জাল—ফলে সকল সমস্যা সমাধানের বীজ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবেই।

'শেষের খাতা'

॥ শ্রীনমিতা ভট্টাচার্য ॥

আমি আনমনে বসি বাতায়নে খুলি জীবনের খাতা
ধূসর আলোকে পড়িতেছিলাম শেষের কয়টি পাতা।
লাভের আশায় দিয়েছি দাদন কড়িটী পাইনি ফিরে
অসীম শূন্য রয়ে গেছে মোর সারাটি জীবন ঘিরে॥

সাময়িকী

সরস্বতী পূজা ঃ নরনারায়ণ আশ্রম সঙ্ঘের অন্তর্গত বয়স্কা মহিলা শিক্ষাকেন্দ্র ও মহিলা শিল্পশিক্ষা কেন্দ্রের তরফ হইতে নরনারায়ণ আশ্রমে গত ১৪ মাঘ ১৩৬৭ (২১শে জানুয়ারী ১৯৬০) সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মাটির রক্ত মাংসের মেয়েদের মধ্যে সরস্বতীকে দেখিতে পাইবার আশায় সরস্বতী-তত্ত্বের বন্দনা গাহিতেন। সরস্বতী জ্ঞান-প্রদায়িনী শুদ্ধ সত্ত্বের দেবী, তিনিই আবার রসবিলাসী সর্বকলাময় রসের ঠাকুরাণী। মানুষ-নারীর মধ্যেও পুরুষোত্তমানন্দ ইহাই দেখিতে প্রয়াসী হইয়া সরস্বতী বন্দনা করিতেন। প্রাণপ্রধান নারীকে জ্ঞানলাভও করিতে হইবে, আবার তাহাকে নিরস সংসারে রসের জোগান দিতে হইবে। শুধু রসের কারবার করিলে রস বিকৃত হয়, সার্বজনীন জ্ঞান মানুষকে সে বিকৃতি হইতে আত্মরক্ষা করিবার দৃষ্টি ও শক্তি প্রদান করে। আবার প্রাণের সরসতাহীন জ্ঞান সৃষ্টিক্ষমতাহীন—নূতন সৃষ্টির জন্য রসের অজ্ঞান অন্ধকারে। বীজটা মাটির নীচের অন্ধকারে পচিয়া যে নূতন প্রাণের জন্মদান করে সেটা রসের ধর্ম। এই জ্ঞান ও রস উভয়কেই নিয়মিত করিয়া স্রষ্টার যে আত্মপ্রকাশ তাহাই সরস্বতী দেবী। জ্ঞান সৃষ্ঠু করিবার বিদ্যা শিখায়, ধ্বংসের মারণ যজ্ঞের অস্ত্র যোগায়, মানুষকে উদ্যত করে। রস অপরকে বুকে টানিয়া লয়, সৃষ্টি করে, পোষণ করে, সিঞ্চন করে, আনন্দ দেয়। দুইকে দুইধারা নিয়মিত করেন বলিয়াই শুদ্ধ জ্ঞানময়ী সরস্বতী দেবীই আনন্দময়ী শ্বেতাব্জবাসিনী। পুরুষোত্তমানন্দ এই সরস্বতীর ধ্যান করিয়া নারী জাতিকে ইহাই জীবনে প্রকাশ করিবার সাধনায় আহ্বান করিয়া ছিলেন, আজও আহ্বান করিতেছেন।

সরস্বতী কলাবিদ্যাদায়িনী—

দেহঃ সর্বাণি পাত্রাণি নৃত্যগীতাদিসঙ্গম হং।
ন বিহীনং ত্বয়া দেবী তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ।
লক্ষ্মীর্মেধা ধরা পুষ্টি গৌরী তুষ্টিঃ প্রভা ধৃতি।
এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্মাং সরস্বতী।

কিন্তু যে কলা পণ্যদ্রব্যে পরিণত হয়, ভারতীর সৃষ্টি সরস্বতী সে কলা নন। তিনি পোষণময়ী। পুরুষোত্তমানন্দ এই পোষণময়ী কলা-দেবীর উপাসনাই আমাদিগকে শিখাইতে চাহিয়া গিয়াছেন। আজ আমাদের সকল কলা পণ্যদ্রব্যে পরিণত হইয়াছে—আজ মানুষই যেন কেমন পণ্যদ্রব্য হইয়া গিয়াছে। জ্ঞান-সাধনা তীব্রভাবে চলিতেছে, কিন্তু তাহা ধ্বংসের অস্ত্র নির্মাণে বিরত হইবার মত আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লাভ করে নাই। আর রসের বিকৃতিতে সমাজের সর্বত্র যে বীভৎস চিত্র ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহাও আত্মনিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাহীন, জ্ঞানের মতই সমাজের সৌন্দর্য ও শান্তি নষ্ট করিতেছে। আজ তাই যিনি রসময়ী হইয়াও জ্ঞানময়ী, জ্ঞানদায়ী, সেই সরস্বতী দেবীর তত্ত্ব বোঝা ও বোঝান বড় দরকার হইয়া পড়িয়াছে। মানুষকে জ্ঞান ও রসের ব্যবহার শিখিতে হইবে—নহিলে জ্ঞানের কুফল এবং রসের কুফল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া উভয়েরই মধ্যেকার সমাজ-সংগঠনী শক্তিকে আমরা কাজে লাগাইতে পারিব না। তাই তো সকল অর্থ-প্রয়োগ, সকল পরিকল্পনার মধ্য দিয়া সামাজই সংগঠিত হইয়া উঠিতেছে। সরস্বতী পূজার হিড়িকে তথা চাঁদা ও মাইকের অত্যাচারে জর্জরিত মানুষের কাছে কে শোনাইবে যে সরস্বতী পূজা করার অর্থ হইতেছে জ্ঞান ও রসের পরিমিত ব্যবহার শেখা? কে শিখাইবে যে জ্ঞান যেন আমাদিগকে উদ্ধত, দুর্বিনীত না করে, তাহা যেন আমাদিগকে পরেরটা অপহরণ করিবার বা ধ্বংস করিবার

কৌশল না শিখাক, আবার হৃদ যেন বিকৃত রুচির পাকে ফেলিয়া আমাদিগকে অমানুষ না করিয়া দেয়? কে শিখাইবে জানি না, কিন্তু শিখানো যে দরকার এ বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নাই। যতটুকু পারি এই কথাই আমরা বলিতে চেষ্টা করিয়া যাইব—আমরা বড়রা এবং ছোটরা সবাই যেন জ্ঞান ও রসের সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে শিখি, কথা বলিতে শিখি, আচরণ করিতে শিখি। সমাজের সকলের সামনে এইটাই এখন একমাত্র সমস্যা।

সরস্বতী পূজার দিন স্কুলের মেয়েরা সব সাজাইয়া গুছাইয়া সরস্বতী পূজার ব্যবস্থা করে। পূজা ও অঞ্জলির পরে দুই স্কুলের মেয়েরা দ্বিপ্রহরের প্রসাদ পায়। পরে বয়স্কা শিক্ষার মেয়েদের মধ্য হইতে ১৪ জন এবং স্থানীয় গ্রামের ছেলেমেয়েরা তিন ভাগে ২৪ জন কবিতা আবৃত্তি করে। ২৪ পরগণার সমাজ শিক্ষা পরিদর্শক শ্রীঅনাদি নাথ সিংহ প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কার বিতরণ করিয়া যেন। শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্রের মেয়েদের সেলাই প্রদর্শন করা হইয়াছিল। সূচীশিল্প, ছাটকাট ও উলে প্রথম স্থান অধিকারীদেরও পুরস্কার দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত অনাদিবাবুর অল্পক্ষণের বক্তৃতাও অতি সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

'আমি বাঁধিয়া রাখার দলের লোক নই। ছাড়িয়া যদি কাহাকেও রাখিতে পারি তো রাখিব ও পাইব, নচেৎ বাঁধিয়া রাখা গোলাম দিয়া আমার কি সুখ? মানুষের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া কোনো মানুষ আমি চাই নাই, চাহিলে মর্য্যাদাহীন অনেক মানুষ পাইতে পারিতাম।'

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম পোঃ দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩.১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

CALCUTTA

উজ্জ্বলভারত

মাঘ, ১৮৮২ শকাব্দ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে

—১৯৫০—

(১)

ওঁ পুরুষোত্তম শ্রীনিতাগোপাল

……, আমি একাই প্রার্থনা করি ও স্তব করি ৭টার সময় রেণুর ওখানে যাই। তাহাকে সুধীর দাশগুপ্তের স্ত্রীর সঙ্গে বলা বোডে দেখা করিতে বলি। সে ও আমি একত্র হইয়া বাহির হই। সে ট্রামে যায়। আমি চলিয়া আসি। গোসাই আসে বড় বড় ৮টী কমলা লইয়া। প্রায় ১ ঘণ্টা থাকে। তাহাকে পুরুষোত্তমের তুলসী ও প্রসাদ দেওয়া হয়। সে তাহার স্ত্রীসহ গৌহাটী যাইবে। ১২টার পর রেণু আসে, প্রতিভা আসে ২টার পর। …১৪০টায় বীরেনবাবু আসেন, তাহার সঙ্গে 'চরিত্রহীন' সম্বন্ধে কথা হয়। কিছুটা পড়িয়া শোনান হয়। উষাঙ্গিণী দুলালীসহ সকালে বেহালা হইতে ফেরে। আমি প্রতিভা রেণু, দুলালীকে কোলে লইয়া উষাঙ্গিণী বীরেনবাবুর সঙ্গে চাকুরিয়া রওয়ানা হই। স্টেট বাসে গড়িয়াহাটা হইয়া, পরে অনেকটা হাঁটিয়া পরেশবাবুর বাটীর কাছ দিয়া প্রথমে বীরেনবাবুর বাসায় যাই। সেখানে জলযোগ করিয়া ৪।০টায় পরেশবাবুর ওখানে পৌঁছি। তখনই আলোচনা আরম্ভ হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রকাশ হইবার স্থান যুদ্ধক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য নয়—প্রাণের স্তর হইতে উহা বলা হইয়াছে। ব্যাখ্যাগুলি সব হইয়াছে মনের স্তর হইতে। প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ উহার বক্তা—মনুও নন, যাজ্ঞবল্ক্যও নন। বনবাসী ব্রহ্মকে ঘরের ঠাকুরে রাখাপরাজড়ে ধরার বুকে 'ইহৈব' জটিলতার মাঝে স্থাপন করাই ইহার প্রয়োজন। যাহা 'কিমকুর্বত' প্রশ্নে 'উপক্রম', 'করিষ্যে বচনং তব' বাক্যে তাহারই উপসংহার। পুরুষোত্তম ঘন-সমাস, তাই তাঁহার প্রকাশ ক্ষেত্র প্রাণের স্তরে অর্জুনকে 'medium' করিয়া। মনের স্তরে শুধুই সংঘাত। পাণ্ডবগণ প্রজার উপাদক, দুর্যোধনাদি প্রাণের। পুরুষোত্তম প্রজ্ঞা-প্রাণসমন্বিত ব্রহ্মপথের সন্ধান দিতেছেন। এই সন্ধানদান সম্ভব করিয়া তুলিবার জন্যই অর্জুন বলিলেন, 'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত' ৭দণ্টায় শেষ হয়।…, কেহ না আসায় গীতাভবনে যাওয়া হয় নাই। চাকুরিয়ার সভায় ব্রজেনবাবু, ধীরেন মজুমদার, শ্যামলাল প্রভৃতি ছিলেন।…

১লা জানুয়ারী

৮।০টার পর আফিস হইতে ফিরিয়া দেখি ক্ষীরোদ (নলিনীদের পূর্ব্ব চাকর) আসিয়াছে। বলিলাম, পারস্পরিক কৃতজ্ঞতা স্মরণ করিয়া নিজের মত চলিয়া যাও, অভিযোগ করিও না। আফিস বাদ সব ছুটি। সকালে আফিসে গিয়া সন্তোষের নিকট সতীনাথকে পাঠাই মাঘের প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য। সন্তোষ বাড়ী গিয়াছে, কাল আসিবে।… ১২টার মধ্যে রেণু ও প্রতিভা আসে। প্রতিভা চিঠিগুলি লেখে। রেণু মাঘের প্রবন্ধগুলি গুছাইয়া গণিয়া ঠিক করে। চারিটার পর আফিসে যাই।…চরিত্রহীন পড়ি। সকালে উষাঙ্গিণীর সঙ্গে অনেক কথা হয় কেমন করিয়া প্রকৃতিকে, বাহিরের আবেষ্টনকে নিজের জীবনে জয় করা যায় এই বিষয়ে।

অবস্থার মধ্যে ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা না আনিয়া হাত পা ছাড়িয়া দিলে অবস্থা মানুষকে পাইয়া বসে। পথ তো সর্বত্রই আছে, খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। 'পারিনা' বলিলে অবস্থা মানিবে কেন? পারিতেই হইবে—ইহাই তো বুদ্ধিযোগের শিক্ষা। গুছানো শিখিতে হয়। গুছাইতে পারিলে সময় বাঁচে, অর্থ বাঁচে, পারস্পরিক মিলনও দৃঢ় হয়। পাঁচ ঘণ্টার কাজ ৮ঘণ্টা বসিয়াও করা যায়, তিন ঘণ্টায়ও পারা যায়। চাই কৌশল জানা। মানুষের জন্যই এই সাধনা।

'সাবিত্রীসে হারাইয়া পর্যন্ত এই সত্য কথাটার সে সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিল যে, যুবতী রমণীর মন পাওয়া এক, কিন্তু তাহাকে ব্যবহার করিতে পারা আর। পাওয়া যখন নরনারীর নিভৃত হৃদয়ে গোপনে, নিঃশব্দে সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকে, বাহিরের সংসার তাহার সাড়া পায় না; কিন্তু যেদিন তাহাকে না জানাইয়া, তাহার সম্মতি না লইয়া আর একপদও অগ্রসর হইবার উপায় থাকে না সেই দিনই দারুণ দুঃখের দিন। এ পাওয়া যে কি কঠিন পাওয়া, বাহিরের সংসার তাহার কোন হিসাব রাখে না, এ রত্ন যে কত দুর্লভ বাহিরের সংসার সে বিচারের দিক দিয়াও যায় না,—সে কেবল তাহার পায় লইয়া সমাজ লইয়া বিরুদ্ধ স্বরে কলরব করে, বাধা দেয়, নিষ্ফল করে—এই শুধু তাহার কাজ।' পৃ ৪৭১। 'তুমি বলবে সত্য হোক মিথ্যা হোক, আমি সমাজ চাইনে, তোমাকে চাই। কিন্তু আমি তো তা বলতে পারিনে। সমাজ আমাকে চায় না, আমাকে মানে না জানি, কিন্তু আমি ত সমাজ চাই, আমি ত তাহাকে মানি। আমি ত জানি এ ছাড়া ভালবাসা দাঁড়াতে পারে না। সমাজ যে স্ত্রীকে তার সম্মানের আসনটী দেয় না, কোন স্বামীরই ত সাধ্য নেই নিজের জোরে এই আসনটী তার বজায় করে রাখেন'। পৃ ৪২৮। সমাজকে মেনে, অধিকতর জীবনের ভিতর পরিপাক করেই আসন প্রতিষ্ঠা করতে হয়, যেমন শ্রীরাধা।

২রা জানুয়ারী

সকালে রেণুর ওখানে যাই·· এর সম্বন্ধে কি করা যাইবে তাহা জানিবার জন্য অফিসে যাইতে বলিতে। আজ ঠাকুরের যাত্রা হয় কুকারে·· প্রতিভা আসে ১টার কিছু পরে। রেণু আসে তিনটারও পর। প্রতিভা সাময়িকীটা কিছু লিখিয়া চিঠি লেখে। আজ সন্ধ্যার পর ধীরেনবাবু আসেন···। কুকারের তরকারী ও ভাত খাইয়া পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের কথা মনে হইতেছিল। আজ যেন বুকটার ভিতর মনে হইতেছে, কাজ হইবে, মানুষের মধ্যে সাড়া মিলিবে। সারা জীবন তো তাঁহাকেই খুঁজিয়াছি।···হাওড়ার অনাথবন্ধুর একটা পোষ্ট কার্ড আসে। সরস্বতী পূজার দিনে সেখানে নদের নিমাই মন্দিরে বক্তৃতা হইবে। সে ইতিমধ্যে আসিবে। বন্ধু রামচরণ ঘোষের মৃত্যু সংবাদ ও তাহার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্র পাই। তিনি আশ্রমের অনেক সেবা করিয়াছেন। ঠাকুর তাহাকে কোলে করিয়া রাখুন।

৩রা জানুয়ারী

সকালে একবার অফিসে যাই-তে যাওয়া হইবে না, ইহা রেণুকে বলিবার জন্য। সন্তোষ আসে, তাহাকে প্রবন্ধের কথা বলা হয়। সোমবার দিবে একরূপ বলিল। এখানে প্রতিভার খাওয়ার কথা ছিল, তাহা হইবে না। আজ একার মত কোথাও থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে। সন্তীনাথ আজ মুর্শিদাবাদ গেল। অনেক দিন ছিল, দুঃখবোধ হইতেছে। মাথার সিন্ধি দিয়া তাহাকে মনোযোগ দিয়া পড়িতে বলিয়াছি।···আমার নিজের সুখ সুবিধার জন্য তো কোনও মানুষের সঙ্গেই ঝগড়া হয় নাই; যাহা হইয়াছে তাহা তাহাদের কল্যাণের কথা বলিতে গিয়াই। কি আর আমি করিব? সকলের কল্যাণ চাহিয়া দূর হইতে শুধু প্রার্থনা করিয়াই নিজের চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া যাইব। নির্বিশেষের দুই রূপ—এক, সকল বিশেষকে অস্বীকার করিয়া, মুছিয়া ফেলিয়া; দ্বিতীয় হইতেছে প্রতিটি বিশেষের স্বয়ংমূল্য দিয়া এবং প্রতিটী স্বয়ংমূল্যবান বিশেষকে পারস্পরিক প্রীতির বন্ধনে বাঁধিয়া 'এক' করা। নির্বিশেষ—সর্ব-

বিশেষসমন্বয়। প্রথম নির্ব্বিশেষের কথা শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বলিয়াছেন। দ্বিতীয় সমন্বয়ের কথা পরিপূর্ণভাবে বলিয়া গেলেন শ্রীনিত্যগোপাল। শ্রীরামকৃষ্ণ এই দুইয়ের মাঝখানের কথা বলিয়া গেলেন। শঙ্কর-নিত্যগোপালের যোগসূত্র শ্রীরামকৃষ্ণ।...উজ্জ্বলভারতকে বুকের রক্ত দিয়া বড় করিয়া তুলিলে সে-ই আমাদের 'আলয়' দিবে। আকাঙ্ক্ষা তো ঠাকুর পূর্ণ করিবেনই, তবে কালও যে সত্য, তাই ধৈর্য্য ধারণ করিতেই হইবে।

'হাঁ, আমি মানি শুধু ইহকাল আর এই দেহটাকে। কিন্তু এ জীবনে পোড়া দেহটা কি আর ছাই কিছুই চাইলে না। চাইলে শুধু ভালবাসা। এ কাঙ্গাল বৃত্তি এর কি আমি কিছুতেই ঘোচাতে পারলুম না। আর পারবই বা কি কোরে? আমার আমিকে ত আমি অতিক্রম করতে পারি নে। নইলে অনঙ্গ ডাক্তারকেও কি না একদিন মজাতে গিয়েছিলাম। এমনি পোড়া কপাল। পৃঃ ৪৩১। আমি-কে অতিক্রম করিতে না পারিলে ভালবাসা হয় না—অতি বড় সত্য কথা। দারোয়ান গিয়াছিল মন্থর বাসায়...।

৪ঠা জানুয়ারী

ধীরেনবাবুর আসায় পূর্ব্বেই ঢাকার...ভাগিনেয়ী সে গ্রাহক হইবে তাহার বাবার নামে, আরও গ্রাহক করিয়া দিবে। রেণু সেখানে যাইবে, ঠিকানা রাখিয়া গিয়াছে।

'মুসলমানের কৃত অত্যাচারগুলিই মুসলিম-বিজয়ের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নহে—এই সব অত্যাচারের অন্তরদেশে লোকচক্ষুর অগোচরে হিন্দুমুসলিম-সৌহার্দ্দ্য গড়িতেছিল, অতি সুন্দর ভাবে একটা অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন হইতেছিল। হয়ত বিজেতৃগণ এ সমন্বয় চাহেন নাই, হয়ত ইহাতে তাহারা সাধ্যপক্ষে বাধা দিয়াছিলেন। কিন্তু যে শক্তির উপর মানুষের কোনই হাত নাই, তাহার অদৃশ্য ইঙ্গিতেই এই সমন্বয় ক্রিয়া চলিতেছিল।'—রেজাউল করীম প্রণীত সাধক দারাশিকোহ-প্রস্তাবনা পৃষ্ঠা ৯। 'ভারতে মুসলিম বিজয়ের ধারার প্রতি লক্ষ্য করিলে একটা বিষয় সহজেই ধরা পড়িবে; সেটা এই যে, তাঁহাদের ভারত-বিজয়ের কাজ অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলিয়াছিল। এ দেশে প্রথম পদার্পণের পর হইতে মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণকাল পর্য্যন্ত এই কয়েক শত বৎসরের মধ্যে তাহারা পাঞ্জাবের সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই। অবশ্য ইহার পরে দ্রুত ভাবেই নানা দেশ বিজিত হইয়াছিল। মুসলমানগণ যত সহজে অন্যান্য দেশ জয় করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ তত সহজে জয় করিতে পারেন নাই।'—প্রস্তাবনা —পৃ ১২

সকালে রেণুর কাছে ...দরখাস্তটা ও...টা দিয়া আসি। ...বেলা ৩টার পর রেণু নিউ ইণ্ডিয়া...আসে। দমদম ও কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে যায়। সন্ধ্যার সময় অফিসে যাই। কিছু পরেই নলিনীবাবু (কুমিল্লা) আসেন। আধঘণ্টার উপর থাকেন। পত্রিকার উন্নতি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। পত্রিকা তাঁহার ভাল লাগিয়াছে। পত্রিকার কতকটা দায়িত্ব তাঁহাকে নিতে বলা হইল। আগামী রবিবার চাকুরিয়ায় আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিতে একরূপ রাজী হইল। প্রতিভা দুপুরে 'হিন্দুমহাসভা'—সাময়িকীটা লেখে। আফিসে বসিয়া চিঠি লেখে। আফিসের কাজ সারিয়া রেণু আমার কাছে বসিয়া 'চরিত্রহীন' পড়ে। প্রায় ৯টায় আশ্রমে ফিরি।...

৫ই জানুয়ারী

আজ আর বাহির হই না। রেণু সকালে ডাঃ সিংহের ওখানে যায়। সে বিজ্ঞাপন দিবে। সুহৃৎবাবুর ওখানে যাওয়ার সময় হয় নাই। দুপুরে কীর্ত্তনে প্রভৃতিতে ও শক্তি ঔষধালয়ে যায়। আমি ও প্রতিভা ৫টার আগেই আফিসে যাই। রেণু ফেরে প্রায় ৬টায়। আমি সকালে জগদীশ ঘোষের[১] গীতা পড়ি 'পুস্তক পরিচয়ে'র জন্য। শরৎবাবুর কমলের জীবন দার্শনিক জীবন, সেখানে সমাজের জটিলতা নাই বলিলে চলে। কিন্তু সাবিত্রীকে চলিতে হইয়াছে জটিলতম আবেষ্টনের মধ্য দিয়া পুড়িয়া পুড়িয়া, সব শেষে সে বাহির হইয়া পড়িল safe and unhurt। বাহির হইতে চাপানো মিথ্যা অপবাদকে কেমন করিয়া মানিয়া লইয়া পরিপাক

করা যায়, সাবিত্রীর জীবনে ইহাই ফুটানো হইয়াছে। মানিয়া লইয়া হজম করিলেই তাহা সত্য বাস্তব হজম করা হয়। বাদপ্রতিবাদ করিয়া নয়, জীবনের ছন্দ দ্বারাই সব কিছু সহজে পরিপাক করা যায়—ইহাই সাবিত্রীর জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কমলকে ফেলিলে সে যাহা হয়, তাহাই সাবিত্রী। দুই-ই কেমন সরল, স্বচ্ছ, কোথায়ও যেন বন্ধন নাই, অথচ আছে সব কিছুরই সঙ্গে, দুনিয়ার ভাবও পরে তাহাদেরই উপর। উপনিষদ দিয়া গেলেন পাগলীপাগলাদের সঁপিয়া সাবিত্রীর হাতে, আর আশুবাবু দিলেন অগ্নিকে সঁপিয়া কমলের কাছে। সতীশ কিরণময়ী সকলেই অব্যবস্থিত-চিত্ত, কমল ও সাবিত্রী শুধু ধীর স্থির, স্থিতপ্রজ্ঞ। সকলকে সঙ্গে লইয়া অথচ সকলকেই ছাড়িয়া কেমন করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হয়, লোক-সংগ্রহ করা যায়, তাহাই 'চরিত্রহীনে' দেখানো হইয়াছে। সতীশই চরিত্রহীন। সতীশের জীবনে আছে ভালমন্দের সংঘাত। সাবিত্রীর সহায়তায় সে সেখান হইতে উত্তীর্ণ হইল। সাবিত্রীকে কেন্দ্র পাইয়া উপনিষদার পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন হইল।...

৬ই জানুয়ারী

সকাল ৬।০টায় মন্থর বাসায় যাই। নীচের ঘরেই বসি, সেখান হইতে ৮।০টায় রওয়ানা হইয়া আফিসে আসি। রেণু তখন ছিল না। রেণু ১২টার কিছু পূর্বে আসে। সে জ্যোতিষবাবু, শশীবাবু, পোস্টাফিস, ক্যালকাটা কেমিক্যালে যায়। সে খাওয়ার পর কাছের বাসাগুলি ঘুরিয়া এখানে আসে প্রায় ৩টায়। ইহার পরই এখানেই ধীরেন বানার্জী আসেন। রবিবার ধীরেন মজুমদার মহাশয়ের বাসায় পাঠ হইবে, তিনি আসার বন্দোবস্ত করিবেন।...জানার রাজ্যে চলে বিচার, কিন্তু 'জানা'র রাজ্যকে যে অজানার রাজ্য ঘিরিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য চাই সেই অজানার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকা। এই উন্মুখ হইয়া থাকার মনোবৃত্তির নামই বিশ্বাস। একান্ত বিচারে আটকাইয়া থাকিলে ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিবে কোন্ সূত্র ধরিয়া? 'জানি-জানিনা'-র মধ্য দিয়াই জগৎ ও জীবন অগ্রসর হইতেছে।

প্রাণ উপনিষৎ-সিদ্ধান্তে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। প্রাণ সকল অঙ্গের নিংড়ান রস আত্মিরস। চিৎশক্তির, জড়শক্তি ও অজড় শক্তির সমন্বয়ই প্রাণশক্তি। অড়াংশে প্রাণ সর্বেন্দ্রিয়ের জ্যেষ্ঠ; অজড়াংশে প্রাণ ইন্দ্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ। শ্রীরাধাই প্রাণশক্তি, প্রাণবল্লভা। প্রাণই রসশক্তি, রাসবিলাসিনী, চিত্তরঞ্জন। এই রসদর্শনে আমি আমাকে, আমার পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছি। আমার পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্বও আমাকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। আমি ও বিশ্ব পরস্পরের স্রষ্টা ও সৃষ্ট। আমি ও বিশ্ব বিশ্বেশ্বরকে সৃষ্টি করিতেছি, বিশ্বেশ্বর আমাকে ও বিশ্বকে সৃষ্টি করিতেছেন। প্রতিটী জীবই এইভাবে বিশ্ব ও ঈশ্বরের স্রষ্টা। এই সমগ্র সৃষ্টির যে-কোনও পশু হইবে, সৃষ্টি হইবে বিকলাঙ্গ। এই বিকলাঙ্গ সৃষ্টিতে আমি হইব বিকলাঙ্গ, পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র বিকলাঙ্গ, ঈশ্বর বিকলাঙ্গ। পুরুষোত্তম-সৃষ্টির মধ্যে সব বিকলাঙ্গ পূর্ণাঙ্গ হইবেন। ৮।০টার পর আশ্রমে ফিরি।

৭ই জানুয়ারী

আজও গীতাভবন হইতে কেহ আসে নাই। রেণু সকালে তাহার বাসার কাছের গ্রাহকদের কাছে যায়। সকালে আমার গীতাভাষ্যের 'রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত'-অংশটী পুনরায় লিখি। অস্ত্রসম্পাত প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছে, অর্জুন ধনু উত্তোলন করিয়াছেন, হঠাৎ থামিয়া গিয়া বলিলেন, উভয় সেনাদলের মধ্যে রথ স্থাপন কর। অর্জুনের মধ্যে এতক্ষণ Death-instinct প্রবল হইয়াছিল, এইবার চাপা Life-instinct জাগিয়া উঠিতে চাহিতেছে। ইহা শুধু ভগবৎ-স্পর্শেরই ফল। ভীষ্ম-দ্রোণাদির সামনে দাঁড়ানোর ফলে তাহার ভালবাসা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তখন Endopsychic conflict betweeen Life instinct & Death

instinct। ইহারই ফলে বিবাদ। একই সনাতন বংশে নর-নারায়ণ দুইটী 'যা নযুত্বা সখায়া' পরিবৃক্ত। ধ্বংস-প্রাপ্ত একটা সভ্যতার সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া নরনারায়ণ যুগলস্রষ্টা। এই সখ্যত্বের আস্বাদন করিবার জন্যই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের। 'সোঽহমস্মি' —ইহা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক দুই ক্ষেত্রেরই মহাবাক্য। অ+উ+ম্+অর্দ্ধমাত্রা—প্রণব। অ—স্থূল বিশ্বরূপ, উ—সূক্ষ্ম বিশ্বরূপ, ম্—কারণ বিশ্বরূপ, অর্দ্ধমাত্রা=ব্রহ্মবস্তু। প্রতি জীব একাধারে স্বরূপ বিশ্বরূপ। অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ দুই সখা 'এক' হইয়া মহাভারত, বিশ্বভারত, উজ্জ্বলভারত সৃষ্টি করিতেছেন। ইহাই 'অর্জ্জুন উবাচ' (১ম অধ্যায়) পদের তাৎপর্য্য। ১-২০ মিনিটে রেণু আসে। তাহার কিছু পরেই সুধাংশু আসে।...প্রতিভা আসে ২টার পূর্ব্বে। সুধাংশু তিনটার পূর্ব্বেই চলিয়া যায়। নলিনী-বাবু ঠিক ৩টায় আসেন। উপরে আসেন। তাঁহাকে আমার লেখা ভাষ্যগুলি দেখানো হয়। আমরা ৩-২৫ মিঃ নলিনীবাবুর মোটরে রওয়ানা হই।...৪-৫ মিঃ আলোচনা আরম্ভ হয়। ৬টায় ১ম অধ্যায় শেষ হয়। আলোচনা বেশ জমিয়াছিল। নলিনীবাবু আগাগোড়া ছিলেন, খুব খুশী। বলিলেন, এই ব্যাখ্যা প্রচলিত থাকিলে কম্যুনিজম প্রয়োজন হয় না।...

৮ই জানুয়ারী

সকালে ফাল্গুন মাসের প্রবন্ধগুলি বাছিয়া বাহির করি। দেখি। 'অন্ধের কথা' বইটুকু সমালোচনার জন্য পড়ি। প্রতিভা বাঁশবেড়িয়া গিয়াছে, আসে নাই। রেণু দুপুরে কলিকাতা যায়, সেও আসে নাই। আমি ৪।০টায় আফিসে যাই। একাকী বসিয়া থাকি। রেণু ফেরে প্রায় ৬টায়। হেরম্ববাবু ইহার আধঘণ্টা পূর্ব্বে আসেন। তাহাকে বসাইয়া রাখি। পত্রিকার আনুকূল্য করিতে বলি। ইহার পর রেণু আসে। তাহার আধঘণ্টা পর সে যায়। সন্তোষ আসিয়া তাহার লেখা গল্পটি দিয়া যায়। ৭।০টার পর শেখরবাবু নামে এক ভদ্রলোক আসেন। তাহার সঙ্গে পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা, প্রচারের ধারা সম্বন্ধে ৯টারও পর পর্য্যন্ত আলোচনা হয়। তিনি কোনও পাঠ হইলে সেখানে যাইবার কথা বলিলেন। তিনি শেষ পর্য্যন্ত খুশী হইয়াছেন বোধ হইল। প্রথমে বিরুদ্ধভাবের মধ্য দিয়া রওয়ানা হইয়াছিলেন, তৎপরে সে ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া সরলভাবেই কথা বলিলেন। 'আকর্ষণ না থাকিলে আসিব কেন?'—ইহা ছিল তাহার কথা। প্রয়োজন বোধ হইলে কাছে আসে বিধা রাস্তায়ও দেখা হইতে পারে। পথে দাঁড়াইয়া আছি, হঠাৎ দেখা-হওয়া লোকদের সম্বন্ধ করিয়া আগাইয়া যাইতে চাই। টানাটানি করিয়া মানুষ পাওয়া যায় না। অভিসন্ধি থাকিলে টাকাও পাইতাম, লোকও আসিত। কিন্তু সে টাকা ও মানুষ দিয়া বিশ্বের সেবা হইবে না। ইত্যাদি কথা বলিলাম। 'অন্ধের কথা' পড়িতে পড়িতে মনে হইতেছিল—মানুষের জীবন অনন্ত সম্ভাবনাময়; তাহা কেমন করিয়াই বা সমস্ত দেহ প্রাণ মন মথিত করিয়া বাস্তবের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ ও আত্মস্থিতি লাভ করিবার জন্য আকুলি বিকুলি করিতেছে। যাহাদের এই আত্মপ্রকাশ স্বাভাবিকভাবে হইল, তাহারা ইহার মর্য্যাদা দিতে না পারিয়া ইহার কত অপব্যবহার ও অপমান করে। কিন্তু অন্ধ বধিরদের জীবনে এই আত্মপ্রকাশ তো সহজ নয়। তাই কী ইহাদের বেদনা। যখন এই আত্মপ্রকাশ কিছুমাত্রও সম্ভবপর হয়, তখন কি আনন্দই না তাহারা অনুভব করে। কোনও একটী ইন্দ্রিয়দ্বার অবরুদ্ধ থাকিলে সমগ্র জীবন অন্য সব দ্বার দ্বারা উপচাইয়া পড়িতে চায়। হেলেন কেলারের চক্ষু-কর্ণ ছিল না, চক্ষু-কর্ণের অভাব তিনি পূরণ করিতেন ঘ্রাণ ও স্পর্শদ্বারা।

৯টায় শেখরবাবু তাহার মোটরে আশ্রমে পৌঁছাইয়া দেয়। শেখরবাবুকে গত বৎসরের পত্রিকাগুলি দেওয়া হয়। এবারও গ্রাহক হইবে। পাবনা রাধাচরণবাবুর একটা পোস্টকার্ড আসে।

৯ই জানুয়ারী

৯টার কিছু আগে আফিসে যাই ডাক attend

করিবার জন্য। একাকী বসিয়া থাকি, বেণু সুহৃৎবাবু ও প্রিয়দারঞ্জনবাবুর ওখানে যায়। সে ফেরে ১০টার পর। তখন শিবানও আসে। কালীপদ বৈদ্য আসে আমার যাওয়া ঠিক করিবার জন্য তাহার মেসের সভায়। ২২শে জানুয়ারী রবিবার সভা হইবে। শীতের মধ্যে বাসে ও গরুর গাড়ীতে যাওয়ার অসুবিধা, বিশেষ-ভাবে হাওড়া 'নদের নিমাই'-র ওখানে যাওয়ার কথা লিখিয়া দিয়াছি বিধায় যাওয়া সম্ভব হইল না। আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া ঠিক করা উচিত ছিল। আমি যাইব আগে তো কখনও বলি নাই, বরং অনড়ই করিয়াছি। কালীপদ বিষণ্ণ হইল। ১১।০টার পর আশ্রমে ফিরি। বেণুও তখন সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া ট্রামে কলিকাতা যায়। সে ৩টার অনেক পর ফেরে। ১১।০টার পূর্বে সুধাংশু আসে।...আজ ৭ জনের চাঁদা পাওয়া গেল। সত্যেন মোদক টাকা মণিঅর্ডার করিয়া-ছেন। ৮টার পর প্রেস হইতে মাঘের প্রথম ফর্মা পাঠাইয়া দেব...।

১০ই জানুয়ারী

সকালে ৮।০টার পর আফিসে যাই ডাক attend করিতে। বেণু তখন ছিল না। কিছু পরে আসিয়া আবার বাহির হইয়া যায়। ১০টার পূর্বে আসে। আমি ১১টার পর চলিয়া আসি। বেণু খাওয়া শেষ করিয়া কলিকাতা শক্তি ঔষধালয়, এ মুখার্জী, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, হিন্দুস্থান, সি, কে, সেন প্রভৃতি জায়গা ঘুরিয়া প্রায় ৩টার ফেরে, সন্ধ্যার পূর্বে আমরা আফিসে যাই। ছয়টায় ধীরেনবাবু আসেন। রবিবার চাকুরিয়া যাওয়া ঠিক হয়। মাখনবাবু আসেন। পত্রিকার কাজ এত জমিয়া গিয়াছে যে, আগাইয়া যাওয়া সম্ভব হইতেছে না। এবার তো গ্রাহক বাড়াইতেই হইবে। শেখর দাসের চেক ও চিঠি বেণুর কাছে আসে। কাজ এত বেশী ও বহু রকমের এবং মানুষ একমাত্র বেণু, তাহাতে মনোমত কাজ হইবে না, গুছাইয়াই করিতে হইবে। সব দিক তো বজায় রাখিতে হইবে। প্রতিভাও ২।১ দিন নাই। অসম্ভব কাজের চাপ। আমি তো কিছুই পারি না চক্ষুর জন্য। তবে সকল ঘটনার বুকে যিনি, তিনি যদি হাত ধরিয়া আগাইয়া নিয়া যান, তবে বেগ পাইতে হইবে না।.. শোওয়ার আগে ও শেষ রাত্রিতে শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতার প্রুফ দেখি।...

১১ই জানুয়ারী

সকাল ৮।০টার পর আফিসে যাই, 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র প্রুফ দেখিয়া নিয়া যাই। ১১টার পর ফিরি। বেণু কলিকাতা হইতে ফেরে প্রায় ৪টার সময়। আমরা সন্ধ্যার পূর্বে আফিসে যাই। ৬টার সময় প্রতিভা বাঁশবেড়িয়া হইতে আফিসে যায়।...আমি বলিলাম, জানা মিটিংয়ে পথ জানিয়া লইলে জানাও হয়ত: মিটিংয়ে পারিত, পথ না চিনিলে জানা মিটাইবার জন্য আসিবে কেমন করিয়া?...ইহার পর চিদানন্দ হিন্দুমহাসভার কাজ সারিয়া আসে, কিছুকাল থাকে। সন্তোষ আসে।... বেণু তিন দিন হইতে রোজই বিস্কাতাড়া দিয়া দেয়, বেশ শীত পড়িয়াছে বলিয়া। আমার আসা হয় না। পয়সার যেরূপ কৃচ্ছ্রতা, তাহাতে যেটুকু হাঁটিয়া পারা যায় তাহার জন্য পয়সা খরচ করিতে প্রাণ চায় না। সে অবশ্য দুঃখ পায়। মনে পড়িল জগদানন্দের দাবী কেমন করিয়া মহাপ্রভু প্রত্যাখ্যান করিতেন, আর জগদানন্দ দুঃখ অভিমানে কষ্ট পাইতেন। ৯টার সময় শাকগুলি (প্রতিভার আনা) লইয়া আশ্রমে আসি। কুসুমের নিকট আজ একটা চিঠি দেওয়া হয়। তর্কের ভিতর দিয়া সম্বন্ধ মানুষকে দূরে সরাইয়া দেয় যদি না ব্যক্তি-গত সম্বন্ধ, হৃদয়ের সম্বন্ধ সঙ্গে সঙ্গেই জাগাইয়া রাখা হয়; তেমনি হৃদয়ের সম্বন্ধেও মলিনতা আসে যদি না কর্ম ও জ্ঞান সেই সম্বন্ধকে ব্যাপক ও পবিত্র করে। কোন এক দিকের সম্পর্কেই মানুষ সমগ্র জীবন লাভ করিতে পারে না। প্রতি অঙ্গের কান্না যে মানুষের সনাতন, Cognition-Emotion-Conation—চাই তিন দিক হইতেই সার্থকতা। চাই ভগবৎ-জ্ঞান, ভগবৎ-ভক্তি, ভগবৎ-কর্ম সমন্বয়।

১২ই জানুয়ারী

সকালে কিছুক্ষণের জন্য আফিসে যাই। চিদানন্দ মারফত প্রথম ফর্ম-এর অর্ডার পাঠানো হয়। বেণু ১১টার পর এখানে আসে। শক্তি ঔষধালয়ের, এস্ এন্ রায়ের নিকট খোঁজ করে। পরে সি, কে, সেন, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, মেট্রোপলিটান প্রভৃতিতে যায়। প্রতিভা আসে ২টার পর।...বেণুকে বলেন যে, আপনি হন সম্পাদক, আপনাদের সম্পাদককে পরামর্শদাতা রাখুন, তাহা হইলে বিজ্ঞাপন পাইতে অসুবিধা হইবে না। উদ্বোধন ব্যতীত অপর কোনও ধর্মপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে আমাদের কর্তৃপক্ষের নিষেধ। বেণু বলিল, আমাদের পত্রিকা সে হিসাবে ধর্মপত্রিকা নয়। স্বামিজী তো সারাজীবন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য জনসাধারণের মধ্যে আমাদের বক্তব্য ছড়াইয়া দেওয়া। তাই ২টী বিষয়ের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে—একটী আমাদের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ভাল ভাল প্রবন্ধ ও গ্রাহক সংগ্রহ করা। এই হিসাবে বিজ্ঞাপন সংগ্রহও গৌণ। এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে বিনা বিজ্ঞাপনে পত্রিকা চলিতে পারে। এই বৎসর গ্রাহক সংগ্রহের দিকে জোর দিতেই হইবে। একদল স্থায়ী গ্রাহক সৃষ্টি করা প্রয়োজন। প্রতিভাকে ১০টার মধ্যে খাইয়া আফিসে আসিতে বলা হইল। অর্জুনকে সিঙ্গল হইতে একটী নূতন দর্শন ও নূতন জীবন ধাক্কা দিতেছিল, অথচ তিনি তাহা তাঁহার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারিতেছেন না—ইহাই বিষাদযোগের গোপন কথা। এই নূতন দর্শন হইতেছে Life instinct ও Death instinct-এর সমন্বয়। এই আনন্দময় নূতন দর্শনের মধ্যে পৌঁছানো আর চলা, সিদ্ধি ও সাধনা এক হইয়া গিয়াছে; তাই সাধক দেখিতেছে অর্জুন সাধক, সিদ্ধ দেখিতেছে অর্জুন সিদ্ধ, কৃষ্ণলখা, বর্ত্তমানে মোহের অভিনেতা মাত্র।

১৩ই জানুয়ারী

...সকালে আফিসে যাই।...আফিসে গিয়ন আসা পর্য্যন্ত থাকি। বেণু ও আমি একত্র হইয়াই বাহির হই। সে পোষ্টাফিস, প্রেস হইয়া হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভে যাইবে। ২৷৷০ টার পর ফেরে। প্রতিভা কিছু আগে আসে। ৩টার পর অনাথবাবু (হাওড়ার) তাহার স্ত্রীসহ আসে। সে যায় ৫টার পর। তাহার সঙ্গে অনেক কথা হয়। ঠাকুরের জন্য সন্দেশ নিয়া আসে। তাহাদিগকে চরি পিঠা খাওয়ানো হয়। শ্রীনিত্যগোপাল-রূপেই যে শ্রীগৌরসুন্দর দ্বিতীয়বার আসিলেন, মহাপ্রভুর নিজের ও তাঁহার সম্প্রদায়ের আলোচনার মধ্যে যে মায়াবাদ প্রবেশ করিয়া আছে, তাহা দূর করিতেই যে তাঁহার এই দ্বিতীয়বার আগমন, 'কৃষ্ণকে বাহির না করিও ব্রজ হইতে'—ইহার মধ্যেও যে মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, পারমার্থিক ব্যবহারিক ভেদ রহিয়াছে, রায় রামানন্দের সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে 'এহো বাহ্য আগে কহ আর' যে মায়াবাদেরই উক্তি কেননা এখানেও বাহ্য-আন্তর ভেদ স্বীকৃত হইতেছে, উচ্চ-নীচ ভেদ (hierarchy) রহিয়া যাইতেছে—ইহা বিস্তারে আলোচিত হয়। যদি নূতন কিছুই বলিবার না থাকিত তবে কেন শচীমাতাকে বলিয়াছিলেন, আমি আবার দুইবার আসিব? অনাথবাবু চাঁদায় টাকা দিয়া যায়। ঠিক হইল সরস্বতী পূজার দিন গাড়ী আসিবে, আমরা হাওড়া যাইব।... 'অনার্য্যজুষ্টম্'—আর্য্য দ্বারা সেবিত নয় এবং অনার্য্যদ্বারা সেবিত। আর্য্য কে? গত্যর্থক ঋ ধাতু হইতে আর্য্য শব্দ। যাহার জীবন গতিশীল, 'আসীনঃ দূরং ব্রজতি,' তিনিই আর্য্য। অনার্য্যকে দমন করিতে পারে যে আর্য্য, সে-ই সত্য আর্য্য। একান্ত statics নয়, একান্ত dynamics নয়। একান্ত statics অনার্য্য, একান্ত dynamics অনার্য্য। অনাথবাবু ও তাহার স্ত্রীকে পুরুষোত্তমের শুভ প্রসাদ দেওয়া হয়। মন্দাগ্নি পুরুষই অনার্য্য, উদীপ্তাগ্নি, সৃষ্টিতে সক্ষম মানুষই আর্য্য। ক্লৈব্যই অনার্য্যের লক্ষণ।

১৪ই জানুয়ারী

যেখানে অধি-সত্তাভাব শেষ, সেখান হইতেই পুরুষোত্তম-কৃষ্টির যাত্রারম্ভ। অধিসত্তাভা শুচি-অশুচির

মধ্যে শক্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে, অশুচিকে চাপা দিয়া অস্বীকার করিয়া শুচির পথে মানুষকে সিদ্ধির জন্য প্রেরণা দিয়াছে, ফলে ইহার প্রতিক্রিয়ায় অশুচি ধীরে ধীরে কালধর্মে শক্তি সঞ্চয় করিয়া শুচিকেই কোণঠেসা করিয়াছে, অশুচির হাতে ঋষি-সভ্যতার চরম বিপর্যয় ঘটিয়াছে। পুরুষোত্তম আসিয়াছেন জীবনের ক্ষেত্রে শুচি-অশুচির সমান স্থান ও মান দান করিয়া পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে। শুচি-অশুচি, সত্ত্ব-তমঃ যদি absolute হইত, তবে ঋষি-সভ্যতার সম্বন্ধে বলিবার কিছু থাকিত না। কিন্তু উহারা যে সবই relative, তাহাই জীবনের ক্ষেত্রে সকলকেই মান দান করিতে হইবে, না হইলে পরে পারস্পরিক সঙ্ঘর্ষে জীবনই বিপন্ন হইবে।

গীতা-ভবন হইতে কেহ আসে নাই। ১২॥টার পর বেণু আসে। তাহার পর আমাদের স্নান ও আহার হয়। ৩টার পর প্রতিভা আসে। শেখরবাবুর গাড়ীর জন্য ৩-২০ পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া হাঁটিয়া গিয়া বাস ধরি ও বালীগঞ্জ যাই। সেখান হইতে ৩-৫৪ মিনিটে ৮০ নং বাসে চাকুরিয়া পৌঁছি ৪-৪ মিনিটে। সকালে আফিসে সুবোধ দে আসিয়াছিল, সঙ্গে তাহার এক বন্ধু। বন্ধুটী গ্রাহক হইয়াছে। ৪-৩০ মিনিটে একটী সঙ্গীতের পর পাঠ আরম্ভ হয়। ঋষাতীত হইবার সাধনা ও তাহার সিদ্ধি লইয়াই শ্রীভগবান ও মুনিঋষিদের পার্থক্য। আগে শুচি দিয়া অশুচিকে দূর করিয়া, পরে শুচিকেও ত্যাগ করিয়া—এই প্রতিপক্ষ ভাবনার মধ্যে দিয়া ঋষাতীত হওয়ার সাধনাই আমরা জানি। কিন্তু ইহাতে জীবন রক্তাক্ত হয়, পঙ্গু হয়। শ্রীকৃষ্ণ দুইকেই স্বীকার করিলেন, জীবনের মধ্যে দুয়ের সম মান ও মূল্য দিয়া দুইকে পরিপাক করিলেন, ঋষাতীত হইলেন। ইহাতে সংসারও বজায় থাকে, ঋষাতীত হওয়াও সহজ হয়। ৩-৩০ মিঃ পাঠ শেষ হয়। আমরা যখন খাইতে বসিয়াছি তখন নলিনীবাবু তাহার গাড়ী নিয়া উপস্থিত। গাড়ীতে আমরা উষাদিগীকে আশ্রমে রাখিয়া আফিসে পৌঁছি, তখন ৭-৫০। প্রতিভা ব্যাপার লিখিয়া ৯টায় যায়। আমি তাহার পর আশ্রমে আসি। তোলানাথ সকালে ভাত বমি করে। জ্বর জ্বর মত হয়। N. Sulph+ P. P.+C, P ২ মাত্রা চারুবিয়া হইতে আসিয়া দেই।

১৫ই জানুয়ারী

সমগ্র ভারতীয় সাধনা 'প্রতিপক্ষ ভাবনা'কে অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নিত্যের প্রতিপক্ষ অনিত্য। এই অনিত্যকে অস্বীকার করিয়া, মুছিয়া ফেলিয়া নিত্যকে নিত্য হইতে হইবে। কিন্তু একই বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিরই তো দুইটী সম প্রকাশ ঐ নিত্য বুদ্ধি ও অনিত্য বুদ্ধি। অনিত্য বুদ্ধিকে মুছিয়া ফেলিতে গিয়া নিত্য বুদ্ধির সঙ্গে সংগ্রামও উহার নিত্যই চলিতেছে। প্রতিপক্ষকে প্রতিপক্ষ ভাবিয়া কিছুতেই 'পক্ষ' আত্মস্থ হইতে পারিবে না। পক্ষ-প্রতিপক্ষ যে একই সমগ্রের দুইটী সমমূল্যযুক্ত আস্বাদন। পক্ষ-পাতবিনির্মুক্ত হইতে হইলে পক্ষ-প্রতিপক্ষকে একই জীবনের মধ্যে উহাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া সমন্বয় করিতে হইবে। পুরুষোত্তমের প্রতিপক্ষভাবনা ঋষির প্রতিপক্ষভাবনা হইতে পৃথক। গীতার প্রারম্ভ এইখানেই। 'সেনয়োঃ উভয়োঃ মধ্যে রথং স্থাপয়' বাক্যের অর্থ ইহাই। সকালে প্রুফ নিয়া আফিসে যাই। তখন ৮॥০টা। গিয়া দেখি সুধাংশু আসিয়াছে। সে দুধে পাকানো পিঠা আনিয়াছিল। তাহা খাই। এখান হইতে খাইয়া খাইতে পারি নাই। বেণু প্রুফ নিয়া ৯-২০ মিঃ এস্, এন্, রায়ের ওখানে যায়, পরে বুমিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও প্রেসে যায়। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরীতে সহজপড়া (শুদ্ধ করা) দিয়া আসে। সে ৩টায় ফেরে। প্রতিভা সুধাংশু থাকিতেই আফিসে আসে। আমি ও সে একত্র হইয়া আশ্রমে আসি। প্রতিভা গীতা লেখে। ...আমি প্রায় ১১টা পর্যন্ত গীতার দ্বিতীয় প্রুফ দেখি।...প্রতিপক্ষকে নিজের জীবনে ভাবন অর্থাৎ হওয়ানো, জন্মদান করাই, হজম করাই সত্য বাস্তব প্রতিপক্ষ-ভাবন, ইহাই পুরুষোত্তমের বীর্য। পক্ষ-প্রতিপক্ষের সম্পর্ক পরকীয়। রাসলীলায় পক্ষ-প্রতিপক্ষ সব হাত ধরাধরি করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ।

১৬ই জানুয়ারী

ক্রমশঃ

বয়স্কের ব্যায়াম

॥ শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ॥ *

ভূমিকা

প্রত্যহ ব্যায়ামের দ্বারা শরীরের মাংস-পেশী চালনা না করলে সব রকমের পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া সত্ত্বেও মাংস-পেশী অযুক্ত থাকে। তাই বয়স যা-ই হোক না, প্রত্যেক ব্যক্তিরই উপযুক্ত ব্যায়াম করা একান্ত প্রয়োজন। অল্প বয়সের বাড়ন্ত লোকের ব্যায়াম এক প্রকারের—মাংস-পেশী শক্ত করে পরিশ্রম সহকারে তাদের ব্যায়াম করা প্রয়োজন। কিন্তু জীবনের ৪০ বছর পার হয়ে যাওয়ার পরে যখন আর শরীরের বাড়ন্ত অবস্থা থাকে না, তখনকার যে ব্যায়াম, তার ধরণটা অন্য প্রকারের—তখন মাংস-পেশী ঢিলা রেখে এমন ভাবে ব্যায়াম করতে হবে যাতে শরীরের কোথাও কোনো ক্লেশ অনুভব না হয়। শরীরের বাড়ন্ত অবস্থার অবসানে মাংস-পেশী ও শিরা-উপশিরাগুলি শক্ত হতে থাকে। তখন আর তাদের সহজ সরল অবস্থা থাকে না। তার ফলে শরীরের নানা স্থানে বাতের প্রকোপ দেখা দেয় এবং শিরা-উপশিরা দিয়ে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। নিম্নলিখিত ব্যায়াম প্রণালীই হচ্ছে তার একমাত্র প্রতিকার নিম্নলিখিতরূপে ব্যায়াম অভ্যাস করলে পেটের মাংস-পেশীগুলি সহজ স্বাভাবিক ভাবে কাজ করতে পারবে বলে কোষ্ঠ-কাঠিন্যের ব্যায়াম হতে পারবে না। এইসব কথা হিসেব করেই বয়স্কের উপযোগী নিম্নলিখিত ব্যায়াম প্রণালীর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই প্রণালী সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত এবং বহু বছরের পরীক্ষায় বয়স্কের পক্ষে এই ব্যায়াম প্রণালীর উপযোগিতা ও উপকারিতা নিঃসংশয় ভাবে প্রমাণিত।

আমি আমার ২০ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা বলতে পারি যে, যে-কোনো বয়স্ক ব্যক্তি এই ব্যায়াম অভ্যাস করলে তার স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাবে নিশ্চয়ই ভাল থাকবে এবং অটুট স্বাস্থ্যের অভাবে নিত্য-নৈমিত্তিক যে অসুবিধা দেখা দেয়, তার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। তাই প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তিকে এই ব্যায়াম অভ্যাস করতে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই। প্রত্যূষে হাতমুখ ধোওয়ার পর এই ব্যায়াম অভ্যাস বিধেয়।

ব্যায়াম প্রণালী

পেট

১। বিছানার বালিশে মাথা রেখে হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শোবে। পরিধেয় বস্ত্র ঢিলে করে নেবে। তারপরে দুখানা পা মুড়ে পায়ের পাতার উপরে সামান্য ভর রেখে কোমর ডাইনে বাঁয়ে হেলিয়ে বিছানার উপরে কোমর ঘসবে যাতে মাজার দিকটা একটু গরম হয়ে ওঠে।

প্রত্যেক প্রক্রিয়ায় যে অঙ্গের চালনা হচ্ছে, সেই অঙ্গের প্রতি মন নিবিষ্ট থাকবে এবং সেই অঙ্গ ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ শিথিল থাকবে। শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। কোন্ প্রক্রিয়া কত বার করবে তা গুণবার দরকার নেই—যেদিন যতবার ইচ্ছা, ততবার করবে।

২। এক নম্বরের মত দুই পায়ের পাতার উপরে ভর দিয়ে কোমর বিছানা থেকে একটু উঁচুতে তুলে ডাইনে বাঁয়ে দোলাবে।

৩। দুই পা মুড়ে, অর্থাৎ গুটানো অবস্থায় রেখে পেটটাকে উপরে নীচে চালনা করবে—পেটকে পর পর স্ফীত ও সঙ্কুচিত করবে।

---

* ৬০ রাজা সুবোধ মল্লিক রোড, কলিকাতা—৩২

৪। দুই পা মুড়ে গুটানো অবস্থায় রেখে পেট ডাইনে বাঁয়ে চালনা করবে।

৫। দুই পা মুড়ে গুটানো অবস্থায় রেখে পায়ের পাতা দুটো কাছাকাছি আনবে এবং সেই অবস্থায় হাঁটু দুটোকে ডাইনে বাঁয়ে দোলাবে। এইভাবে দোলাতে দোলাতে পায়ের পাতা দুটো সরাতে থাকবে, যে পর্যন্ত না দুটো পা-ই সোজা হয়ে যায়।

পায়ের গাঁট

৬। শোওয়া অবস্থায় পায়ের গোড়ালী দুটো বিছানার উপর রেখে গোড়ালীর উপরে ভর দিয়ে পায়ের পাতার উপরের দিকটা কয়েকবার বৃত্তাকারে ঘোরাবে, যেদিকে ঘড়ির কাঁটা ঘোরে, সেই দিকে এবং তারপরে কয়েকবার ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে ঘোরাবে।

৭। পায়ের গোড়ালির উপরে ভর রেখে পায়ের পাতার উপরের দিকটা সামনে পিছনে দোলাবে।

কোমর

৮। শোওয়া অবস্থায় প্রথমে ডান পায়ের উপর জোর দিয়ে গোড়ালিটা যথা সম্ভব দূরে সরাবার চেষ্টা করবে এবং তারপরে ডান পায়ের উপর জোর ছেড়ে দিয়ে অর্থাৎ ডান পা ঢিলে করে বাঁ-পায়ের উপর জোর দিয়ে বাঁ-পায়ের গোড়ালিটা যথাসম্ভব দূরে সরাবার চেষ্টা করবে। এই প্রক্রিয়া একবার ডান পায়ে, একবার বাঁ পায়ে বার বার করতে হবে। গোণা গুণতি নেই—যত বার করতে ইচ্ছা হয়, তত বার করবে। আসলে এটা কোমরের ব্যায়াম।

পায়ের আঙ্গুল

৯। হাত পা বিছানায় ছড়িয়ে রেখে দুই পায়ের আঙুলগুলি একই সঙ্গে একবার গুটানো, একবার ছড়ানো—এই প্রক্রিয়া বার বার করবে—যত বার ইচ্ছা।

কোমর

১০। শোওয়া অবস্থায় দুই পা গুটিয়ে প্রথম ডান পায়ে জোর দিয়ে ডান দিকের কোমরের উপর চাপ দিবে এবং তার পরে বাঁ পায়ের উপর জোর দিয়ে বাঁ দিকের কোমরের উপর চাপ দিবে—এরূপ বার বার করবে—যত বার ইচ্ছা।

১১। পূর্বের মত পা গুটানো অবস্থায় রেখে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে কোমরটাকে যতটা সম্ভব উর্ধে তুলতে হবে। এই প্রক্রিয়া বার বার করবে—যত বার ইচ্ছা।

ঘাড়

১২। হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে বালিশের উপরে মাথাটাকে ডাইনে বাঁয়ে বার বার আস্তে আস্তে দোলাবে।

হাতের কনুই

১৩। চিৎ হয়ে শোওয়া অবস্থায় হাতের কনুইয়ের উপর ভর রেখে দুই হাতের উপরের অংশ বৃত্তাকারে ঘোরাবে। কয়েক বার ঘড়ির কাঁটার দিকে এবং কয়েক বার ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে।

হাতের আঙ্গুল

১৪। চিৎ হয়ে শোওয়া অবস্থায় কনুইয়ের উপর ভর রেখে দুই হাতের আঙুলগুলি এক সঙ্গে একবার মুষ্টিবদ্ধ করা এবং তার পরেই আবার বদ্ধ মুষ্টি খুলে আঙুলগুলি টান করে ছড়িয়ে দেওয়া—এরূপ বার বার করবে—যত বার ইচ্ছা।

হাতের কব্জা

১৫। পূর্ব প্রক্রিয়ার মত কনুয়ের উপর ভর রেখে ও হাতের মুঠা ঢিলা রেখে কবজার উপরে হাতের মুঠা বৃত্তাকারে ঘোরাবে ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে।

১৬। শোওয়া অবস্থায় কানের কাছ দিয়ে দুই

হাত খাড়া করে হাতের মুঠো বৃত্তাকারে ঘোরাবে ঘড়ির কাঁটার দিকে।

ঘাড়মুল

১৭। পূর্ব প্রক্রিয়ার মত দুই হাত খাড়া করে দুই হাত সমেত এক সঙ্গে বৃত্তাকারে ঘোরাবে কয়েকবার ঘড়ির কাঁটার দিকে এবং কয়েকবার ঘড়ির কাঁটার উল্‌টো দিকে।

হাঁটু

১৮। চিৎ হয়ে শয়ান অবস্থায় দুই পা গুটিয়ে প্রথমে ডান পায়ের হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত বৃত্তাকারে ঘোরাবে কয়েক বার ঘড়ির কাঁটার দিকে এবং কয়েকবার ঘড়ির কাঁটার উল্‌টো দিকে। তার পরে আবার বাঁ পা ঐ ভাবে ঘোরাবে। তার পরে দুই পা এক সঙ্গে বৃত্তাকারে ঘোরাবে ঘড়ির কাঁটার দিকে কয়েকবার এবং ঘড়ির কাঁটার উল্‌টো দিকে কয়েকবার।

জঙ্ঘা

১৯। হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শোওয়া অবস্থায় প্রথমে ডান পা মাথার দিকে আনবে কষ্ট না করে যতটা পারা যায় এবং তার পরে বাঁ পা মাথার দিকে আনবে। এক পায়ের পরে আর পা, তার পরে আবার অন্য পা—এইরূপে কয়েক বার।

২০। শবাসন: হাত পা টান্ টান্ থাকবে—সর্ব অঙ্গ টান্ টান্ থাকবে—কোনো অঙ্গ শিথিল থাকবে না। আর মনে মনে এক মনে ভাবতে হবে শ্বাসটা যেন নাভি মূল থেকে উঠছে। যতক্ষণ না শ্বাসটা স্বাভাবিক হয়ে আসছে, ততক্ষণ এই ভাবে থাকবে। তার মানে এক মিনিট মত সময়।

কটিদেশ থেকে শরীরের ঊর্দ্ধ ভাগ

২১। পদ্মাসন করে বসে হাত দুখানা পায়ের উপরে ঢিলে ভাবে রাখবে। তারপরে কোমরের উপরের সমস্ত অঙ্গটা ডাইনে বাঁয়ে দোলাবে কয়েকবার। তারপরে কয়েকবার সামনে পিছনে ঢোলাবে। তার পরে কোমরের উপরে শরীরটাকে বৃত্তাকারে ঘুরাবে কয়েকবার ঘড়ির কাঁটার দিকে এবং কয়েকবার ঘড়ির কাঁটার উল্‌টো দিকে।

পিঠ

২২। পদ্মাসনে বসা অবস্থায় বগল দুই ভেঙে কনুই দুটো জোরে জোরে পেছনের দিকে নিবে ও ফিরিয়ে আনবে। তারপর কাঁধ দুটো এক সঙ্গে উপরের দিকে তুলবে ও নীচে নামাবে। এতে পিঠের মাংসপেশীর চালনা হবে।

ঘাড়

২৩। পদ্মাসনে বসা অবস্থায় ঘাড়টাকে আস্তে আস্তে পিছনের দিকে নিবে এবং আবার সামনের দিকে আনবে। এরূপ কয়েক বার করবে। তার পরে ঘাড়টাকে ডাইনে বাঁয়ে নড়াবে। তারপরে ঘাড়টাকে ঘুরিয়ে মুখটাকে একবার ডান দিকে ঘোরাবে এবং তার পরে বাঁ দিকে ঘোরাবে কয়েক বার। তারপরে সমস্ত ঘাড়টাকে একবার ঘড়ির কাঁটার মত ডাইনে থেকে বাঁয়ে ঘোরাবে বৃত্তাকারে। এবং তার পরে ঘড়ির কাঁটার উল্‌টো দিকে বাঁ দিক থেকে ডাইনে ঘোরাবে বৃত্তাকারে।

ফুসফুস

২৪। পদ্মাসনে বসা অবস্থায় দুই হাতে জোর দিয়ে জোর করে শ্বাস টেনে বুকটা চিতিয়ে দিবে এবং তার পরেই শ্বাস একটুও বন্ধ না করে হাতটা নামিয়ে হাতের উপর ভর দিয়ে শ্বাস ছেড়ে দিবে যতটা সম্ভব। যত জোরে শ্বাস টানবে, তত জোরেই নিশ্বাস ছেড়ে দিবে। এ রকম কয়েকবার করবে।

চোখ

পদ্মাসনে অথবা স্বস্তিকাসনে বসা অবস্থায়

চোখ দুটো আস্তে আস্তে অর্থাৎ চোখে বিশেষ জোর না দিয়ে একবার উপরে তুলবে এবং আবার নীচে নামাবে। তারপরে একবার ডান দিকে চাইবে, আবার বাঁ দিকে চাইবে। তারপরে চোখ দুটো ঘড়ির কাঁটার মত ডাইনে থেকে বাঁয়ে ঘোরাবে বৃত্তাকারে, এবং আবার ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে বাঁ থেকে ডান দিকে ঘোরাবে বৃত্তাকারে। প্রত্যেকটি প্রক্রিয়া কয়েক বার করে করবে।

কাণ

২৬। পদ্মাসনে বসা অবস্থায় দুই হাতের তর্জনী দুটো কাণের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে কয়েকবার খুব করে ঘষবে।

নাক

২৭। পদ্মাসনে বসা অবস্থায় দুই হাতের মধ্যমা অঙ্গুলি দুটো নাকের মধ্যে ঢুকিয়ে খুব করে কয়েকবার ঘষবে।

জিভ

২৮। পদ্মাসনে বসা অবস্থায় জিভটাকে দুমড়ে যতটা সম্ভব ভিতরের দিকে নিবে এবং তারপরে টাকরায় ঠেকিয়ে জিভের অগ্রভাগটা দিয়ে বাকী জিভটাকে রগড়ে দিয়ে জিভ সোজা করবে। এরূপ কয়েকবার করবে।

বিশ্রাম

২৯। তারপরে কিছুক্ষণ স্থির ভাবে পদ্মাসনে বসে থেকে বিশ্রাম নিবে।

সবাই জাগবে বলে

॥ শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ ॥

সবাই জাগবে বলে একদিন আকাশের ঘরে
শেকড়ে শেকড়ে তার সঞ্জীবনী মুদ্রার প্রভাব,
সন্নিহিত সূর্য আর স্বপ্নের প্রতিভা
পাতায় পাতায় কাঁপে, তারা জানে অবশেষে আশ্চর্য প্রহরে
হৃদয়েরা গান হবে—পৃথিবীর আদিম শরিক
আনন্দের আভিজাত্যে আরোগ্যের গভীর আলোকে
রূপ-রস-গন্ধের পূর্ণায়ত প্রথম পূর্ণিমা—:
বছরে বছরে তারা ফিরে আসে আকাঙ্ক্ষায় থরকে থরকে।

আমার অনন্ত দিন,—রাঙা-ভরা দুটি চোখে নীলাভ বিস্ময়—
তারা জানে জীবনের যৌবনের রহস্যের নেই কোনো সীমা,
তারা জানে জীবনের মূল মন্ত্র,—অন্ধকার অতীতের শবে
আশ্বিনে না হয় যদি ফাল্গুনের ফুলের সময়ে
আষাঢ়ের আয়োজনে, পৌষে তারা পূর্ণের অভয়
ফিরে পাবে; নির্ভুল ফলের ঠিকানা। এই প্রাচীন পল্লবে
আম-জাম-অশ্বত্থের পীত পত্রে—চেতনার উজ্জ্বল আঙ্গিকে
কোজাগরী জেগে আছে—উপলব্ধ গাঢ় কোনো ভোরের
বিস্ময়
মৃত্যুকে ছুপায়ে দলে তারা ঠিক চলে যাবে অস্তিত্বের দিকে।

বিষণ্ণ বিষাদে স্নিগ্ধ আমাদেরই অসহায় মনের আয়না
সূর্যকে বুকে করে স্বপ্ন হয়ে উঠবে না। আর
ফাল্গুনের কোনো কথা পৌষের পথে পৌঁছুবে না,
নিষ্ঠুর শিশির তবু-অঘ্রাণের ধূসর হারনা—
শুষ্কির শিশুকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে; নখে তার নীলাভ
প্রহার।
প্রাণের প্রতিভা স্নিগ্ধ সূর্য আর স্বপ্নের বিহারে
আমাদের মুক্তি নেই বোধিতে বিষণ্ণ স্থির নীরব বেদনা।

তামিল ভক্তি-সাহিত্যের ভূমিকা

॥ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ॥

সুদূর অতীত হইতে দাক্ষিণাত্য ভক্তিধর্মের দেশ বলিয়া পরিচিত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভক্তপ্রবর চৈতন্যদেব যে দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল "দক্ষিণ দেশ উদ্ধারিতে" বলিয়া মনে হয় না; তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভক্তি-তীর্থ পরিক্রমা, ভক্তি-সাহিত্যের অনুসন্ধান এবং ভক্তজনের সঙ্গলাভ। অনুপম ভক্তিশাস্ত্র শ্রীমদ্ ভাগবত রচিত হয় দাক্ষিণাত্যে। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈততত্ত্বের সহিত আবেগমূলক ভক্তিতত্ত্বের সমন্বয় করিয়া দশম শতকে যে ভাগবত রচিত হইল, (১) তাহা কোনো আকস্মিক ঘটনা নহে, তাহার পশ্চাতে ছিল তামিলভাষী দ্রাবিড়ীদের চার শতাব্দীর নিরবচ্ছিন্ন সাধনা।

ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের মনুষ্যগণ পুনরায় কলিতে জন্মলাভ করিতে চাহেন। কারণ কলিযুগে অনেক বিষ্ণুভক্ত আবির্ভূত হইবেন। অন্যত্র ইহাদের সংখ্যা বেশি হইবে না, কিন্তু দ্রাবিড়দেশ তাঁহাদের জন্মলাভে ধন্য হইবে। তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, পয়স্বিনী, কাবেরী ও পশ্চিম মহানদী—এই নদীসমূহের জলপান করিয়া সেখানকার অধিবাসীবৃন্দ ভগবান বাসুদেবের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইবেন। (২)

প্রাচীন তামিল সাহিত্যের ইতিহাস স্মরণ করিলে ভাগবতের উল্লিখিত অংশের তাৎপর্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। দ্রাবিড় দেশে, অথবা ঠিক ঠিক বলিতে গেলে, দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণতম অংশ তামিলনাড়ে, খৃষ্ট হইতে নবম শতাব্দীর মধ্যে একটি প্রবল ভক্তি আন্দোলন গড়িয়া উঠে। শৈব ও বৈষ্ণব উভয় শ্রেণীর ভক্তই সমভাবে এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তোলে এবং ইহাদের যৌথ সাধনায় তামিল সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। বৈষ্ণব ভক্ত কবিদের মধ্যে যে বারোজন তামিল সাহিত্যে দ্বাদশ আলোয়ার (৩) নামে পরিচিত তাঁহাদের জন্ম হইয়াছে ভাগবতে উল্লিখিত নদীগুলির তীরবর্তী অঞ্চলে। তাম্রপর্ণীর দেশে জন্মিয়াছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি নম্মালোয়ার এবং তাঁহার শিষ্য মধুর কবি আলোয়ার; কৃতমালা অর্থাৎ বর্তমান ওয়াইগাই (বৈ) নদীর তীরে আবির্ভূত হন পেরিয়ালোয়ার এবং তাঁহার পালিতা কন্যা আণ্ডাল্; পয়স্বিনী অর্থাৎ বর্তমান পালার (৪) নদীর তীরে জন্মগ্রহণ করেন পোয়ৈ আলোয়ার

১। Among the Puranas the Bhagavata was composed some where in South about the beginning of the tenth century.....The Bhagavata combines a simple surging emotional Bhakti to Krishna with the Advaita philosophy of Sankara in a manner that has been considered possible only in the Tamil Country. K. A. Nilakanta Sastri—A History of South India (1955) P. 329.

(২) কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ। ৩৮
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রাবিড়েষু চ ভূয়সঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী। ৩৯
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ। ৪০

(৩) আল্ (অর্থাৎ মগ্ন)+আর্ (সম্মানসূচক অথবা বহুবচনাত্মক প্রত্যয়)—আল্বার্ (আলোয়ার) অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেম-সাগরে মগ্ন হইয়াছেন যাঁহারা।

(৪) পাল্ (দুগ্ধ)+আর (নদী)—পালার বা পালার পয়স্বিনীর সমার্থক।

কুবস্তালোয়ার, পেয়ালোয়ার এবং তিরুমলিসৈ আলোয়ার; কাবেরী নদীর তীরে তোণ্ডরডিপ্পোড়ি আলোয়ার, তিরুপ্পান্ আলোয়ার এবং তিরুমঙ্গৈ আলোয়ার; মহানদী বা পেরিয়ার (৪) নদীর নীরে কুলশেখর। (৬)

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে উল্লিখিত তথ্যের সমর্থন আছে উক্ত গ্রন্থের ভাগবতমাহাত্ম্য বর্ণনায় "ভক্তিনারদসমাগম" নামক অধ্যায়ে দেখা যায় কি ভাবে ভক্তিধর্ম প্রথমে দ্রাবিড় অর্থাৎ তামিলনাড় হইতে কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, গুজরাত প্রভৃতি অঞ্চলে ঘুরিয়া অবশেষে স্বয়ং কৃষ্ণের দেশ বৃন্দাবনে আসিয়া উপনীত হইল। (৭) ভক্তির আশ্রয় বৃন্দাবনবাসী কৃষ্ণ হইলেও ভক্তিধর্মের স্ফুরণ ঘটিয়াছিল দক্ষিণ ভারতে। এই কারণেই বোধ করি হিন্দীতে একটি কথা প্রচলিত আছে—ভক্তির জন্ম হইয়াছে দ্রাবিড় দেশে—ভক্তী দ্রাবীড় উপজী।

কিন্তু দ্রাবিড় দেশের ভক্তিধর্মের মূলে রহিয়াছে উত্তরাপথের প্রাচীনতর ভক্তিধর্ম। সেই প্রাচীনতর ভক্তিধর্মের মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আর্য-সভ্যতার সুদূর অতীত লোকে গিয়া পৌঁছিতে হয় (৮)। বহু শতাব্দীর পথ বাহিয়া ভক্তির ভাবাত্মভূতি যে ভাবে ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার বিভিন্ন স্তরগুলি সর্বদা সুস্পষ্ট নহে এবং বর্তমান প্রবন্ধে সে আলোচনার স্থান নাই।

পৌরাণিক যুগে আসিয়া আমরা দেখিতে পাই, বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া যে ভাগবতধর্ম (অথবা বৈষ্ণব ধর্ম) মহাভারতের মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত উত্তর ভারতে তাহার পূর্ণ প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে অশোকের যে স্থান, বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে গুপ্ত-সম্রাটগণকে সেই স্থান দেওয়া যাইতে পারে। পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইলে (স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু ৪৬৭ খৃষ্টাব্দে) উত্তর ভারতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে। কিন্তু ততদিনে দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব ধর্মের নব পর্যায় শুরু হইয়া যায়।

অগস্ত্য কোন্ ঐতিহাসিক অথবা পৌরাণিক যুগে উত্তর ভারত হইতে আর্যসংস্কৃতিকে দক্ষিণ ভারতে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, সে আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই। অগস্ত্যের যাত্রা অবশ্যই দাক্ষিণাত্যের অভিমুখে আর্যসভ্যতার জয়যাত্রা, কিন্তু তাঁহার কাল অনির্দিষ্ট। ঐতিহাসিক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মতে, দাক্ষিণাত্যের আর্যীকরণ অত্যন্ত ধীর গতিতে অগ্রসর হইতেছিল এবং ইহা খৃঃ পূঃ এক হাজার অব্দের কাছাকাছি সময়ে আরম্ভ হইয়া মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বেই সম্পন্ন হইয়াছিল বলা যায়। (৯)

সুতরাং উত্তর ভারতের ভক্তিধর্ম বা ভাগবতধর্ম যে

---

(৪) পেরি (মহা) + আর (নদী) = পেরিয়ার্ অর্থাৎ মহানদী

(৫) ইঁহারা সকলেই ভাগবত রচনার অর্থাৎ দশম শতকের পূর্ববর্তী। তামিল সাহিত্যের ইতিহাসে ষষ্ঠ হইতে নবম শতাব্দী পর্যন্ত ইঁহাদের কাল নির্দিষ্ট হইয়াছে। আলোয়ারদের কালানুক্রমিক বিবরণে কিঞ্চিৎ মতভেদ থাকিলেও সাধারণভাবে তাঁহাদের আবির্ভাব-সম্পর্কে কোনো মতভেদ নাই।

(৬) বারু একদা বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন যমুনাতীরে এক বিরহবধূ তরঙ্গিণীকে। কৌতূহলবশে নিকটে আসিয়া উক্ত রমণীর পরিচয় জানিতে চাহিলে সে বলিল—আমার নাম ভক্তি। আমি জন্মিয়াছি দ্রাবিড় দেশে, বৃদ্ধি লাভ করি কর্ণাটকে, তারপরে কিছুকাল মহারাষ্ট্রে অবস্থান করিয়া গুর্জরে আসিয়া জীর্ণ হইয়া পড়ি। সম্প্রতি পুনরায় বৃন্দাবনে আসিয়া আমি সুরূপিণী নবীনার ন্যায় পূর্ণ যৌবন ও প্রিয়তম প্রাপ্ত হইলাম।—

উৎপন্না দ্রাবিড়ে সাহং বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা।
ক্বিচিৎ ক্বিচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জরে জীর্ণতাং গতা।
• •
বৃন্দাবনং পুনঃ প্রাপ্য নবীনেব সুরূপিণী।
জাতাহং যুবতী সম্যক্ প্রেষ্ঠরূপা তু সাংপ্রতম্।

(8) The Origin oh he way of devotion is hidden in the mists of long ago. S. Radhakrishnan—The Bhagavadgita, P. 59

(৯) The aryanization of the south was doubtless a slow process spread over several centuries. Beginning probably 1000 B. C. It had reached its completion sometime before the establishment of the Mauryan empire, before the time of Katyayana the Grammarian of the fourth century B C. K. A, Nilakanta Sastri—A History of south India P P 66-74,

প্রাচীনকালেই দাক্ষিণাত্যে প্রচারিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষিণ ভারতে যে সমস্ত প্রাচীনতম মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার একটি মাদুরার নিকটবর্তী কৃষ্ণমন্দির। (১০) খৃষ্টীয় প্রথম শতকে চোল সম্রাটদের রাজধানী কাবেরীপট্টনম্-এ যে সকল মন্দির ছিল বলিয়া জানা যায়, তাহার কয়েকটি কৃষ্ণ-বলদেবের উপাসনার জন্য নির্মিত হইয়াছিল। (১১) সুতরাং খৃষ্টজন্মের পূর্বেই যে আর্যাবর্তের বৈষ্ণবধর্ম দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ লাভ করে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। (১২) কিন্তু তখনও সাহিত্যের মধ্য দিয়া ভক্তিধর্মের কোনো প্রকাশ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না।

দাক্ষিণাত্যের ভক্তি সাহিত্যে বিষ্ণু ভক্তির তুলনায় শিব ভক্তির গুরুত্ব কিছু কম নয়। বরং ভক্তি সাহিত্যের উৎকর্ষ ও পরিমাণ, মঠ-মন্দির-দেবালয় ইত্যাদির কথা চিন্তা করিলে তামিলনাডের বৈষ্ণব সাধনা অপেক্ষা শৈব-সাধনাকেই প্রবলতর বলিয়া বোধ হয়। কেহ কেহ মনে করেন, শৈব ধর্মই দাক্ষিণাত্যের প্রকৃত ধর্ম এবং শৈব-সিদ্ধান্তই দক্ষিণ ভারতের দার্শনিক চিন্তাধারাকে সব চেয়ে বেশি প্রভাবিত করিয়াছে। (১৩) ব্যাপকতার দিক হইতে শৈবধর্ম বৈষ্ণবধর্মকে অতিক্রম করিলেও উৎপত্তির দিক হইতে ইহাও বৈষ্ণবধর্মের ন্যায় বহিরাগত ধর্ম বলিয়াই বিবেচিত হইবে। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব শৈব উভয় ধর্মই আর্যাবর্তের দান। বিষ্ণু ভক্তি অপেক্ষা শিবভক্তি কিছু অর্বাচীন বলিয়া মনে হয় না। স্বয়ং বুদ্ধদেব শৈব ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। মহাভারতে শিব-ভক্তির বহু উল্লেখ আছে এবং যজুর্বেদের মধ্যেও শিব-পূজার প্রমাণ পাওয়া যায়। (১৪)

এইরূপে দেখা যায়, উত্তরাপথের আর্য্য সমাজের প্রাচীন ভক্তিধর্ম দাক্ষিণাত্যে প্রচারিত হইয়া পড়ে। ধর্ম ও অধ্যাত্ম-সাধনার বহু ক্ষেত্রেই দক্ষিণ উত্তরের কাছে ঋণী সন্দেহ নাই, কিন্তু কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই দক্ষিণ-ভারত উত্তর ভারতের ভক্তিধর্মকে আত্মসাৎ করিয়া যে নব্যভক্তির প্রচার করে, আর্যাবর্তে তাহা দাক্ষিণাত্যেরই দান বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত। এই কারণেই ভক্তির ও প্রেমের কথা বেদ-উপনিষদ্-গীতায় থাকিলেও অনেকে মনে করেন, তাহা দ্রাবিড় সভ্যতার প্রভাবেই ভারতীয় সাধনায় বিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়াছে। (১৫) প্রচলিত ভক্তিধর্মের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইল নৃত্যগীতবাদ্য। অথচ ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদগান ছাড়া শিব বা বিষ্ণুর জন্য নৃত্যগীত করা নিষিদ্ধ ছিল। (১৬) সুতরাং ভক্তিধর্মের চর্চা ও বিকাশের পক্ষে দ্রাবিড়ী সভ্যতার প্রভাব এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ হইয়া পড়ে। (১৭)

---

(10) One of the oldest of South Indian shrines (near Madura) for which we have a reference is devoted to the worship of Krishna. S. Krishnaswami Aiyangar—Some contributions of South India to India culture. P. 117.

(11) Do. PP 117-118

(12) H. C. Raychoudhuri—E. H. V. (2nd edition) P. 180 S. K. Aiyangar—Some contributions of South India to Indian culture. PP. 251—252

(13) Saivism is the real religion of the South of India.....and the Saiva Siddhanta philosophy has far more influence than any other. Rev. G. N. Pope—Tiruvacagam (1900)

(14) Rudra appears in the Rigveda and Siva-worship can be traced from the Yajurveda onwards. The great epic contains innumerable proofs of Siva-worship. According to tradition confirmed by archaeology Buddha was first a Saiva. K. R. Subramaniam—The origin of Saivism and its History in the Tamilnad (1929). P 2.

(15) Southern Vaishnavism is the Vaishnavism of the Gupta Empire (Footfalls of Indian History. P. 208) বিবেচিতার এই অভিমত কিছুটা সংশোধনের দাবি রাখে বলিয়া মনে হয়। তবে গুপ্তযুগে সংকলিত এবং বিক্রমাদিত্যের কালে প্রচারিত মহাভারতের কাহিনী দাক্ষিণাত্যের পূর্বপ্রচলিত ভক্তিধর্মে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করিয়া থাকিবে।

(16) ক্ষিতিমোহন সেন—ভারতের সংস্কৃতি পৃঃ ১০-১১

(17) Bhakti may be regarded as an important contribution of South India to Indian culture not in reference to its origin but in regard to the important feature of its further development. Krishnaswami Ayyangar—Some Contribution of South India to Indian culture.

ধর্ম-কলহ ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে যে কতটা সমৃদ্ধির কারণ হইতে পারে, প্রাচীন তামিল সাহিত্য হইতে তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যাইবে। পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত তামিলনাড়ের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব ও সহিষ্ণুতা এক প্রকার বজায় ছিল। একদিকে যেমন প্রচলিত ছিল শিব, ইন্দ্র, কৃষ্ণ, মুরুগন (বাল কার্তিক) প্রভৃতির পূজা ও উপাসনা, অন্যদিকে তাহার পাশাপাশি চলিতেছিল বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রচার। কিন্তু শেষোক্ত ধর্ম দুইটির ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি হিন্দু তামিল সমাজে ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এবং এই অবৈদিক নিরীশ্বরবাদী সম্প্রদায় দুইটিকে প্রতিহত করিবার জন্য শিব ও বিষ্ণুর উপাসক সম্প্রদায় তাহাদের নিজস্ব ভক্তিসাধনাকে শক্তিশালী করিয়া তোলার আবশ্যকতা অনুভব করে। (১৮) এইরূপে বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম-সংগঠনরূপে শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে প্রচার-ধর্মে ব্রতী হইল।

এই সাধনায় জয়লাভ করিতে হইলে সমাজের উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীরই সহযোগিতা অত্যাবশ্যক মনে করিয়া শৈব ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ জাতিভেদ-বর্জনের আবশ্যকতা অনুভব করিলেন। যে ভক্তি সাধনা ছিল কেবল মন্দিরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ, তাহাকে ছড়াইয়া দেওয়া হইল জনসাধারণের মধ্যে। যাহা ছিল কেবল উচ্চবর্গের অধিগত, তাহার উপর স্বীকৃত হইল সর্ব-সাধারণের অধিকার। শাস্ত্রের অনুশাসনের সহিত যুক্ত হইল হৃদয়ের আবেগ। এইরূপে ভক্তি সাধনার মধ্য দিয়া শুরু হইল হিন্দুধর্মের আত্মরক্ষার প্রবল প্রচেষ্টা।

অপর পক্ষে বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ও নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিল না। নানা উপায়ে তাহারাও আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইয়া উঠিল। এই প্রবল ধর্ম-সংঘর্ষের যুগে উভয় পক্ষে তুমুল বাদানুবাদ হইল, রাজশক্তিকে স্বপক্ষে আনয়নের চেষ্টা চলিতে লাগিল এবং অলৌকিক ক্রিয়া কলাপের দ্বারা অজ্ঞ জনসাধারণকে দলভুক্ত করার প্রয়াসও কম হইল না। কিন্তু শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় উল্লিখিত উপায়গুলি হইতে যে একটি বিশেষ স্বতন্ত্র পন্থার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন, তাহা হইল সঙ্গীত। জন-সাধারণের মধ্যে তাঁহাদের আবেগমূলক ভক্তিধর্ম প্রচারের প্রধান বাহন রূপে তাঁহারা সঙ্গীত সাধনাকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। কোনো বিশিষ্ট সিদ্ধ পুরুষকে পুরোভাগে রাখিয়া দলে দলে ভক্ত সাধারণ নৃত্যগীত সহযোগে গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেব-পরিক্রমা আরম্ভ করিল। পল্লীর পথে, মন্দিরের চত্বরে, দেবতার সম্মুখে তাঁহারা মনের কথাকে গানের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিতে লাগিল। প্রবল ধর্মোদ্দীপনার ফলে প্রতিষ্ঠিত হইল নতুন নতুন মঠ ও মন্দির। অবশেষে সেই মন্দিরে মন্দিরে চলিল তাহাদের তীর্থযাত্রা, পথে পথেই রচিত হইল সঙ্গীত। এইরূপ সমবেত সঙ্গীতের সুর ও ভাষা যে সরল ও সহজ হইবে ইহাই স্বাভাবিক।

এই ভক্তির আন্দোলন সমগ্র তামিলনাড়ে এমন শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে, ইহাকে একটি জন-আন্দোলন বলাই সমীচীন। শৈব ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায় এই আন্দোলনে সমান অংশ গ্রহণ করে এবং তাহাদের সম্মিলিত চেষ্টায় তামিলনাড়ের ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজ ভক্তিরসে পুনঃ সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। এই ধর্ম-আন্দোলনের যুগে তামিল ভাষায় যে ভক্তি-সাহিত্য গড়িয়া উঠে, জনসাধারণের উপর ব্যাপক প্রভাবের দিক হইতে তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ষষ্ঠ হইতে নবম শতাব্দী পর্যন্ত রচিত এই ভক্তি-সাহিত্য প্রাচীন তামিল সাহিত্যের একটি বিশেষ সম্পদ।

---

(18) S. Vaiyapuri Pillai—History of Tamil Language and Literature.

অথর্ববেদীয় মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা। সবিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৭

ন অন্তঃ প্রজ্ঞম্ [অন্তঃপ্রজ্ঞ নন, তৈজস দ্বিতীয়পাদ নন্, অন্তরকে যিনি প্রজ্ঞানদ্বারা জানেন, তিনিই অন্তঃপ্রজ্ঞ; তাঁহার প্রজ্ঞান ক্রিয়ার কর্ম অন্তর নহে। জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ভেদ বজায় রাখিয়া জ্ঞান ক্রিয়ার দ্বারা জ্ঞেয় হয় শোধ্য, জ্ঞাতা হন্ স্বাধিকারপ্রমত্ত; তখন জ্ঞেয়ের জ্ঞাতার 'জন্য' ব্যবহৃত হওয়া (পরার্থ) ছাড়া অন্য কোনও স্বতঃমূল্য থাকে না—জ্ঞাতা তখন অভিমানী আর জ্ঞেয় অপমানিত। জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের সম-মান প্রতিষ্ঠা ছাড়া কাহারও কোন গৌরব নাই। তাই অভিমানের 'অভি' উপসর্গ এবং অপমানের 'অপ' উপসর্গ দূর করিতে পারিলেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'মান'। অভিমানী ও অপমানিত যখন নিজের স্তর ভিঙাইয়া 'পর' স্তরে তুরীয়-তুরীয়াতীতের স্তরে উঠিবে, তখনই দুই দুইয়ের মাঝে পরস্পর ডুবিয়া, নিভিয়া গিয়া, মরিয়া, বাঁচিয়া 'দুইয়ে এক, একে দুই' হইয়া লীলারস আস্বাদন করেন। এই স্তরে অন্তঃ থাকে কিন্তু তাহা জ্ঞাতার পরকীয় সম্বন্ধে, যে সম্বন্ধে, দুই-ই দুইয়ের সমকক্ষ, দুই-ই দুইয়ের অনুগত, দুই-ই দুইয়ের অতীত।]

ন বহিঃ প্রজ্ঞং [বহিঃপ্রজ্ঞ নন্; বাহিরকে বাহিরে রাখিয়া নিজে অন্তরে থাকিয়া, অন্তর ও বাহিরের মাঝে শক্ত প্রাচীর তুলিয়া জ্ঞেয় বস্তুকে নিজ প্রয়োজনে লাগাইবার মত প্রজ্ঞা তাঁহার নাই। তাঁহার মাঝে অন্তরও বাহির হয়, বাহিরও অন্তর হয়; অন্তর-বাহির ও তিনি অভেদ হয়। তিনি বাহিরের প্রতি স্পন্দনে অনুস্যূত থাকিয়াও বাহির হইতে "পর"] ন উভয়তঃ প্রজ্ঞম্ [উভয়তঃ অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নের মধ্যাবস্থায় থাকিয়া উভয় পক্ষের অনুভূতিসম্পন্নও নন্; অন্তর বাহিরকে শক্ত ব্যবধানযুক্ত উদ্ভাসিত দেখিয়া উভয়কে জানিলেও উভয়ের বিচ্ছিন্নতারূপ অবিদ্যাদর্শন তো থাকিয়াই যায়; জ্ঞেয়-জ্ঞাতাভেদ দর্শনরূপ অজ্ঞান সর্বক্ষেত্রে তো সমভাবে রহিয়াছেই] ন প্রজ্ঞানঘনম্ [জমাটবাঁধা প্রজ্ঞানও নহেন; জ্ঞাতা-জ্ঞানভেদ বজায় রাখিয়া যে প্রজ্ঞান, তাহাও তিনি নন; তাঁহাতে প্রজ্ঞাতা প্রজ্ঞেয়-প্রজ্ঞান রূপে গলিয়া যাইতে পারেন, প্রজ্ঞান প্রজ্ঞাতা-প্রজ্ঞেয়রূপে গলিয়া যাইতে পারেন, প্রজ্ঞেয়ও প্রজ্ঞাতা-প্রজ্ঞান হইতে পারেন] ন প্রজ্ঞম্ [নিছক প্রজ্ঞও তিনি নন্। কেননা তিনি প্রজ্ঞান-প্রজ্ঞেয়ও বটেন] ন অপ্রজ্ঞম্ [অপ্রজ্ঞও নন্; না জানিবার মত শক্ত "না" উপাধিযুক্তও তিনি নন্; ভেদবুদ্ধির স্তরের কোনও হাঁ-ও তিনি নন্, "না"-ও তিনি নন্; 'জানা'কে কেন্দ্র করিয়া বুদ্ধি জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়ের মধ্যে যত রকমের যতরকমই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সম্বন্ধ স্থাপন করুকনা কেন, তিনি কোনও একটীতেও ধরা পরেন না; অথচ তিনি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সবকেই পূর্ণ করিয়া অতীত রহিয়াছেন] অদৃষ্টম্ [তিনি সকল দৃষ্টে "ন" রূপে লুক্কায়িত; অতীত দৃষ্টে তিনি আটকাইয়া যান্ নাই। যদিও তাঁহার স্পর্শে সেই অদৃষ্টও পূর্ণ; বর্তমান দৃষ্টেরও যতটুকু দৃষ্ট হইতেছে, তাহা ছাড়াও অনন্ত যে সেখানে লুকাইয়া রহিয়াছে, যাহা ধরাই পড়ে নাই, তাহাও তিনি; ভবিষ্যতে যাহা-

দৃশ্য, তাহাও তো বর্ত্তমানে অদৃষ্ট। তিনি তাহারও অদৃষ্ট প্রাণরূপে তাহাও ফুটাইতে তুলিতেছেন] অব্যবহার্য্য [ভেদবুদ্ধি সম্ভূত সকল লোক-ব্যবহারের অতীত, অথচ সব ব্যবহারিক সম্বন্ধের প্রাণরূপে যিনি স্থিত; যিনি ব্যবহারিক-পারমার্থিক ভেদ ভাঙ্গিয়া সহজ-সম্বন্ধে সব ব্যবহারকে দেখেন, তিনিও অব্যবহার্য্য। লৌকিক ব্যবহারিক ক্ষেত্রকে যিনি পারমার্থিকভাবে গড়িতে আসিলেন, সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সত্তাই অব্যবহার্য্য; যাহারও ব্যবহারে তিনি ধরা দিলেন না, অথচ সকলের সঙ্গে মাতা-পিতা, সখা-সখী, সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্ব, কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগী-ভক্ত, সংসারী-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে এমন 'ব্যবহার' করিয়া গেলেন, যাহা আশ্চর্য, শুধুই আশ্চর্য্য; সর্ব্ব-ব্যবহারাতীত যিনি, তিনিই অব্যবহার্য্য; তিনিই লোক ও বেদে পুরুষোত্তম: লোক অর্থ লোকব্যবহার] অগ্রাহ্যম্ [কোন কিছু দিয়া যাহাকে ধরিয়া ফেলিবার মত গ্রহণ করা যায় না, গ্রহণ করিয়াও যাহাকে গ্রহণ করার সাধ মিটে না, দিয়া যাহাকে গ্রহণ না করিলেও যেন তাহার কিছুই আসিয়া যায়না বরং অগ্রহণকারীকেও যিনি গ্রহণ করেন তিনিই অগ্রাহ্য; তাঁহাকেই তাই সকলে "অগ্রাহ্য" করে, অথচ সে জন্য কোনও প্রতি-হিংসা তিনি নেন না; কেননা অগ্রাহ্য করাও গ্রহণ করারই বিচিত্র আস্বাদন; তাঁহাকে গ্রহণ না করিয়া কেহ তাঁহাকে অগ্রাহ্যও করিতে পারে না] অলক্ষণম্ [কোনও লক্ষণাদ্বারা যাহার 'লক্ষণ' হয় না; যে কোনও লক্ষণাক্রান্ত করে, তিনি তাহা হইতে অনেক দূরে, অথচ সব লক্ষণই তাঁহার লক্ষণ; তিনি বাচ্য নন, লক্ষ্য নন, বাচ্য নন, অথচ বাচ্য লক্ষ্য-ব্যঙ্গ্যও তিনি। তিনি সব সুলক্ষণ দুর্লক্ষণকে পুরুষোত্তম-লক্ষণে লক্ষিত করিয়া, লক্ষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহারই মাঝে "ন" রূপে লুকাইয়া রহিয়াছেন, তিনি তাই 'অলক্ষণে' ঠাকুর] অচিন্ত্যম্ [সমস্ত চিন্তার গণ্ডী এড়াইয়া, যাহা তুমি চিন্তার নাগাল পাও নাই, তাহারও মাঝে অণু অণুতে থাকিয়া যিনি সব চিন্তা, সব অচিন্ত্যের যোগসূত্ররূপে 'ন', তিনিই অচিন্ত্য; চিন্তক যখন চিন্তা, চিন্তা যখন চিন্তক—সেইখানেই চিন্তা নিজকে নিজে ভিঙ্গাইয়া অচিন্তা, চিন্তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে রহিয়াছে অচিন্তা] অব্যপদেশ্যম্ [কোন্‌ও ব্যপদেশ, ছল, কোনও বিশ্ব 'নিমিত্ত' তাহাতে নাই। সকল উপায় যে জীবন-প্রবাহে উদ্দেশ্য সেখানে ব্যপদেশ কোথায়? ব্যপদেশের আড়াল থাকে সেখানে যেখানে অভিসন্ধি থাকে; সহজ অব্যক্তি-চরিত, নিরভিসন্ধি, প্রোজ্ঝিতকৈতব জীবনে কোনও কিছুর ব্যপদেশে কিছু নয়। প্রত্যেক বস্তু-ক্রিয়া নিজের জন্যই নিজের মধ্যে নিজের দ্বারা পূর্ণ] একাত্মপ্রত্যয়-সারম্ [একাত্মতারূপ প্রত্যয়ের নির্যাস; জীবনের সকল স্তরে—জড়-অজড় স্তরে, জ্ঞান-অজ্ঞান স্তরে, আত্মা-অনাত্মা স্তরে সব বস্তুকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে 'একাত্ম প্রত্যয়ে' পূর্ণ করিয়া, প্রতি পূর্ণ এক-গুলির মাঝে ঘন একাত্মপ্রত্যয় ফুটাইয়া তুলিয়া, এক-বহুর মাঝে এক-বহুর অতীত একাত্মপ্রত্যয় আস্বাদন করিয়া, সমস্ত স্তরের ভিন্ন ভিন্ন একাত্মপ্রত্যয়ের মন্থনের ফল যে একাত্মপ্রত্যয়, তাহাই তিনি] প্রপঞ্চোপশমম্ [প্রপঞ্চের উপশম তিনি; যে পঞ্চ দিয়া প্রপঞ্চ গড়া সেই পঞ্চ যখন তাহাদের মধ্যের পুরুষোত্তম-দেওয়া বিনিময়-ধর্ম্ম ছাড়িয়া যেন পরস্পর অস্তিত্বের জন্য কোমর বাঁধিয়া লড়িতে থাকে, তখন প্রপঞ্চ আপনা আপনি উপশমের পথে আরূঢ় হয়। প্রপঞ্চের এই উপশমমুখী গতিকে তিনি দিব্য উপশমে গড়িয়া তুলিয়া তাহার মধ্য হইতে দিব্য বিনিময়প্রচুর প্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন, প্রপঞ্চনাশক ও প্রপঞ্চ-স্রষ্টা পুরুষোত্তম; উপশমই সৃষ্টির আদি বীজ] শান্তম্ [সমস্ত ইন্দ্রিয় কি-ক্রিয়া যখন অর্পিত হইয়া পুরুষোত্তম-বিশেষ ক্রিয়ায় গড়িয়া উঠিল, তখনই সব ক্রিয়া পুরুষোত্তম-রসে পূর্ণ তৃপ্ত হইয়া শান্ত, অবিক্রিয়; যাহার জন্য দেহময় বিশ্বময় ছুটাছুটি, তাহাই যদি মিলিল, আর কেন ছুটাছুটি? সকলেরই সেদিন যে ছুটি মিলিল, শান্ত হইল, উদ্ধাম নৃত্য থামিয়া গেল, লীলারসে মত্ত হইল] শিবম্ [বিশ্বের সব স্তরে আজ শুধু কল্যাণ, শুধুই কল্যাণ, শিব আজ সর্ব্বমঙ্গলা শিবার সহ সকল স্তরে লীলাঘনানন্দে বিভোর] অদ্বৈতম্ [সব দ্বৈত, এমন কি দ্বৈত-অদ্বৈতের

দ্বৈতকে পরিপূর্ণ করিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিত দ্বৈতাদ্বৈত-সমন্বিত যে অদ্বৈত, তাহাই শিবম্ অদ্বৈতম্]।

চতুর্থং (তুরীয়ং) মন্যন্তে [মনে করিয়া থাকেন। পরবর্ত্তী শ্রুতি এই তুরীয়েরই আর একটী পরিস্ফুট ধনাত্মক (positive) আস্বাদন দিয়াছেন। সব "না" লক্ষণে যিনি লক্ষিত, তাঁহাকেও তো অলক্ষণ বলা চলিবে না, অথচ বর্ত্তমান প্রচলিত তুরীয়ে ব্রহ্ম-পুরুষোত্তম সব "না"-এর সমষ্টি, যাহার ভিতর "হাঁ"-এর প্রবেশের কোনও অবসরই নাই। "হাঁ" যদি বুদ্ধিগোচর বলিয়া অবিদ্যা, "না" বুদ্ধির লক্ষ্য বলিয়াই কি অবিদ্যা নয়? তুরীয়ে যিনি নিছক "না" এর লক্ষ্য, তুরীয়াতীতে তিনি "না" ও "হাঁ"-এর সমন্বিত বাক্য-লক্ষ্য-বাচ্য সর্ব্বার্থসাধক। যিনি প্রণবের পাদত্রয়কে "না"-এর সাধনায়, "না"-কে পাদত্রয়ের সাধনায় জমাটো তুলিতে পারেন, তিনিই তুরীয়াতীত। "না"-কে "হাঁ" হইতে পৃথক দেখাই অবিদ্যাদর্শন। জড়-চৈতন্যের ভেদই সকল অনিষ্টের মূল। চৈতন্য জড়েরই এক সম্বন্ধ। জড়ে সম্যক্ ওতপ্রোত থাকিয়া জড়কে সম্পূর্ণ 'পর' রাখিয়া এবং নিজেও জড় হইতে 'পর' থাকিয়া যে জড়-চৈতন্যের একাত্মপ্রত্যয়সার, তাহাই তুরীয়াতীতের আত্ম-প্রত্যয়] সঃ [এই তুরীয়াতীতই] আত্মা [সব "হাঁ" ও সব "না"কে ব্যাপ্ত করিয়াই তিনি আত্মা, সব আত্মার পার পরমাত্মা ভগবান পুরুষোত্তম]। সঃ [তিনি] বিজ্ঞেয়ঃ [বিজ্ঞানের যোগ্য; তিনি বিজ্ঞেয়ই নন্,—ইহাও তুরীয়াতীতে নাই, পক্ষান্তরে বিজ্ঞাতা-বিজ্ঞেয়-বিজ্ঞানের প্রাচীর-ব্যবধানও তাঁহাতে নাই। গলানো বিজ্ঞাতা-বিজ্ঞান-বিজ্ঞেয় যখন জমিয়া একাত্মপ্রত্যয়ঘন হইয়া তুরীয়াতীতে স্ব স্ব বৈচিত্র্যে অটুট অক্ষুণ্ণ থাকিয়া এক লীলারস আস্বাদন করে, তখনই হয় তুরীয়াতীত অবতীর্ণ লৌকিক-বৈদিক সমন্বিত পুরুষোত্তম]।

যিনি তৈজস নহেন, বিশ্ব নহেন, স্বপ্ন-জাগরণের মধ্যবর্ত্তী নহেন, প্রজ্ঞান-ঘন নহেন, প্রজ্ঞ নহেন, অপ্রজ্ঞও নন্, অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য একাত্মপ্রত্যয়সার, প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, শিব, অদ্বৈত তাঁহাকে চতুর্থ মনে করা হয়। তিনিই বিজ্ঞেয়।

সোঽয়মাত্মাঽধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রম্, পাদা মাত্রাঃ,
মাত্রাশ্চ পাদাঃ অকার উকারো মকার ইতি ॥ ৮

পরিপূর্ণ চক্রের একার্দ্ধ অর্থাৎ প্রণব হইতে চতুষ্পাৎ আত্মা পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া এইবার অপরার্দ্ধ অর্থাৎ আত্মা হইতে চারিমাত্রা সমন্বিত প্রণব পর্য্যন্ত পৌঁছান যাইবে। প্রথমার্দ্ধে যে প্রণব ছিলেন বাচক, ব্রহ্ম-আত্মা ছিলেন বাচ্য, এই পরার্দ্ধে ব্রহ্ম-আত্মা হইবেন বাচক, প্রণব হইবেন বাচ্য। চতুষ্পাৎ আত্মা ও চতুর্ম্মাত্র প্রণবের পাদে মাত্রায় মাত্রায় পাদে থাকিবে পরিপূর্ণ কাঁটায় কাঁটায় মিলন (correspondence)।] সঃ অয়ম্ [সেই এই] আত্মা [চতুষ্পাৎ আত্মা] অধ্যক্ষরম্ [অক্ষরকে অধিকার করিয়া, অক্ষরেরই পরিপূর্ণ নিকটবর্ত্তী; আত্মার পাদ থাকিতে পারে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত না ঐ পাদ-গতি প্রণবের মাত্রাযুক্ত হইতেছে, আত্মগতি মাত্রা ছাড়াইয়া বা হারাইয়া সম্পূর্ণ অচল হইবে; প্রণব ছাড়া চতুষ্পাৎ আত্মার স্থিতির ভাবনা সম্ভবপর বটে; কিন্তু উহার 'গতি' ভাবিতে হইলে পাদ ও মাত্রাকে এক করিতেই হইবে। প্রণবের মাত্রার জন্যই চতুষ্পাৎ আত্মা আজ অক্ষরের, প্রণবের 'অধি'] (কোন্ অক্ষরের অধি?) ওঙ্কারঃ [ওঙ্কার—এই অক্ষরেরই 'অধি' ঐ আত্মা] অধিমাত্রম্ [প্রণবের চারিটী মাত্রার 'অধি'] পাদাঃ [অংশ সমূহ] মাত্রাঃ [মাত্রাসমূহ, measure, range, rythm)] মাত্রাঃ চ [মাত্রা সমূহও] পাদাঃ [পাদসমূহ; পাদ ও মাত্রার পরিপূর্ণ অখণ্ডত্ব দেখাইবার জন্য "পাদাঃ মাত্রাঃ মাত্রাঃ পাদাঃ" ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলা হইল। নামীর যত স্তর আছে, সে সমস্তই নামের স্তর, কিম্বা নামের যতগুলি স্তর আছে সবগুলিই যে নামীর, নাম-নামীর যে পৃথক্ কোনও কোঠাভাগ নাই কিম্বা নামের মাত্রা ও নামীর পাদ এমনই অন্যোন্য-মৈথুন রয় যে, একটী হইতে অপরটীকে বিচ্ছিন্ন করাই

যায়না; শুধু বুদ্ধির সামনে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া অভাগত্ব স্থাপন না করিলে বুদ্ধির মানিয়া লইতে অসুবিধা হইবে তাই এই কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে। মাত্রাহীন পাদ অচল, পাদহীন মাত্রারও কোনও অর্থই হয় না। মাত্রার আশ্রিত পাদ, পাদের আশ্রিত মাত্রা। মাত্রা পাদেরই চলিবার পথে কৌশলমাত্র] অকারঃ [প্রথম মাত্রা] উকারঃ [দ্বিতীয় মাত্রা] মকারঃ [তৃতীয় মাত্রা] [অমাত্রই চতুর্থ মাত্রা] ইতি।

[প্রণব বাচকের যে আত্মা ছিলেন বাচ্য] সেই এই আত্মা (বাচকরূপে) অক্ষর অধিকার করিয়া অধ্যক্ষর (বাচ্য) ওঙ্কার, অধিমাত্র; আত্মার পাদসমূহই প্রণবের মাত্রাসমূহ, প্রণবের মাত্রাসমূহই আত্মার পাদ। অকার, উকার, মকার (ইহারাই মাত্রা)।

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রা আপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্বা। আপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামান্ আদিশ্চ ভবতি, য এবং বেদ। ৯।

জাগরিতস্থানঃ [জাগ্রতাবস্থাই যাহার ভোগ স্থান] বৈশ্বানরঃ [বিরাটই] প্রথমা মাত্রা অকারঃ [প্রথম মাত্রা অকার] আত্মার প্রথম পাদও যিনি, প্রণবের প্রথম মাত্রাও তিনিই; বৈশ্বানরেই প্রথম পাদ ও প্রথম মাত্রা অথও] আপ্তেঃ [চরম ফলের আপ্তিহেতু; বিরাটও যেমন ব্যাপক, অকারও তেমনি ব্যাপক; কোন ব্যঞ্জনই তো অকার ছাড়া হয় না; কোন স্বরও হয় না, তাই অকারই ব্যাপক। অকার জপের সঙ্গে যদি জীবন সর্ব্বব্যাপক না হয়, সম্যক আপ্তি আসিবে কোথা হইতে? এই অকারের বুকেই সকলের সব আপ্তি বাস্তব, অকারহীন উ-ম-অমাত্র সবই আকাশ কুসুম; অকার এই বিশ্বই সকলের এমন কি তুরীয় তুরীয়াতীতেরও প্রতীনক্ষেত্র, শ্রীক্ষেত্র] আদিমত্ত্বাৎ [সাধন রূপে ও ফল রূপে আদিমত্বহেতু; 'ফল আগে তুল পরে'—শ্রীরামকৃষ্ণ। অকার বিশ্ব হইতেই রওয়ানা, উকার-মকার-অমাত্র ঘুরিয়া অকারেই আবার বিশ্রাম লাভ, চরম ফল প্রাপ্তি।

চিৎ-এর দৃষ্টিকোণে বিশ্বকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করিয়া গোলোক-বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মলোকে গিয়াও যাত্রার সমাপ্তি সমাপ্তি হইল না। পুরুষোত্তম তাইতো গোলোক হইতে অবতরণ করিয়া এই আদিমৎ বিরাটের বুকে শ্রীবৃন্দাবনে শাশ্বত বাস্তব বিশ্বরসলীলা প্রকট করিলেন; যাহা আদি, তাহাই অন্ত] আপ্নোতি হ [নিশ্চয়ই আপ্ত হন] সর্ব্বান্ কামান্ [সর্ব্বকাম, যে সকল কামকে বিরাট করিয়া দেখিল, সর্ব্বকাম তো সে হইবেই। কাম তখনই মহাপাপ্মা, জ্ঞান-বিজ্ঞান নাশন, যখন বিরাটকে বাদ দিয়া নিজেরই ভোগে লাগাইবার জন্য ব্যগ্র; 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'; কামকে বিরাটে ত্যাগ করিয়া ভোগ করিলে বিরাট ভোগই প্রাপ্ত হওয়া যায়। Error of omission বশতঃ কাম কাম] আদিঃ চ [এবং আদি] ভবতি হন্ [আদিক্ষেত্র এই বিরাটের বুকে দাঁড়াইয়া যে জন উকার-মকার-অমাত্রকে দুনিয়ার বুকেই প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি নূতন দুনিয়ার 'আদি' স্রষ্টা হন্] য এবং বেদ [যিনি এইরূপ জানেন]

ব্যাপকত্ব ও আদিমত্ব হেতু জাগরিতস্থান বৈশ্বানরই প্রথম মাত্রা। যিনি এইরূপ জানেন তিনি সর্ব্বকাম আপ্ত হন, এবং আদি হন্।

স্বপ্নস্থানৈতসঃ উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বা উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং, সমানশ্চ ভবতি; নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি, য এবং বেদ। ১০।

স্বপ্নস্থানঃ [স্বপ্নই যাহার ভোগস্থান] তৈতসঃ [তৈতসই] দ্বিতীয়া মাত্রা [দ্বিতীয় মাত্রা] উৎকর্ষাৎ [উৎ অর্থাৎ উর্দ্ধভাবে কর্ষণকরারূপ যোগ্যতা থাকা হেতু, শ্রেষ্ঠত্ব হেতু] উভয়ত্বাৎ বা [বিশ্ব উভয় জাগরিতস্থান ও সুষুপ্তিস্থানের মধ্যবর্ত্তিত্ব হেতু, দুইকেই দুইয়ের মধ্যে অনুপ্রাণিত করার জন্য] উৎকর্ষতি হ বৈ [নিশ্চয়ই উর্দ্ধাভিমুখী কর্ষণ করে, উৎকর্ষত্ব প্রাপ্ত করায়; মূলের প্রতি স্পন্দনের গতি উর্দ্ধ গতিতে গড়িয়া তুলিতে পারে উকার মাত্রা;] জ্ঞানসন্ততিম্ [জ্ঞানপ্রবাহকে] সমানঃ চ ভবতি [সুখকে দুঃখে দুঃখকে সুখে গড়িয়া তোলে, তমালে

কৃষ্ণবৃদ্ধি, কৃষ্ণে তমালবৃদ্ধি, শোকে অট্টহাস্য, প্রিয়-সমাগমে চোখে জল, এই ভাবে সব কিছুকে গলাইয়া সমানরূপে বর্ত্তমান] অস্য কুলে [ইহার কুলে] অব্রহ্মবিৎ [অব্রহ্মজ্ঞ] ন ভবতি [হয় না] যঃ [যিনি] এবং বেদ [এইরূপ জানেন। প্রতি স্তরের ফল ফলে বিরাটের বুকে; স্বপ্ন-সাধনার ফলে কুলে ব্রহ্মবিদের জন্মলাভ। এখানেই কুলের উৎকর্ষ; কুল ও ব্রহ্মজ্ঞানের ইনি সমান।]

স্বপ্নস্থান তৈজস উকার দ্বিতীয় মাত্রা, যেহেতু উৎকর্ষ বা উৎকর্ষ অথবা জাগ্রৎ-স্বপ্ন উভয়ের উপর সমান প্রভাবযুক্ততা ইহাতে বর্ত্তমান। যিনি এই রূপে জানেন, তিনি জ্ঞানসন্ততিকে ঊর্দ্ধ গতিতে কর্ষণ করেন, সমান হন, ইহার কুলে অব্রহ্মবিৎ জন্মগ্রহণ করে না।

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্বা। মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি, য এবং বেদ। ১১

সুষুপ্তস্থানঃ [সুষুপ্তিতে যাহার ভোগস্থান] প্রাজ্ঞঃ [প্রাজ্ঞঃ] তৃতীয়া মাত্রা [তৃতীয় মাত্রা] মিতেঃ [পরিমিতি হেতু, সবকিছু মিতির অর্থাৎ পরিমিতির (measurement) স্থান এই সুষুপ্তিস্থান। উপরের টানে যখন সব শুকনো "মানদণ্ড" তাহার ভিতরে গুস্ত হয়, তখনই তো সত্যিকার মানদণ্ড ফিরাইয়া পায়। সকলের সব "মান" নিহিত রহিয়াছে ঐ মাতৃস্বরূপিনী যোগনিদ্রার মাঝে, মকারের মাঝে; যিনি মিতি, তিনিই মাতা] অপীতেঃ বা [কিম্বা সবকিছু ঐ যোগনিদ্রার মাঝে লীন হয় বলিয়া] মিনোতি হ বৈ [নিশ্চয়ই সব-কিছুর পরিমাপ জানেন, কার কোথায় মান, কোন্ কৌশলে তাহা রক্ষিত হইতে পারে, কেনই বা "মান" যায়, সবই তিনি মাপিয়া বলিতে পারেন; বিশ্ব-পরিমিতি তাঁহার কাছে সহজ বিজ্ঞান মাত্র] সর্ব্বম্ ইদম্ [এই সব] অপীতিঃ চ [এবং সব জগৎ তাঁহার কোলে নিদ্রার বিশ্রাম লইতে পারে এমন যোগ্য] ভবতি [হন্] যঃ এবং বেদ [যিনি এইরূপ জানেন]

সুষুপ্তস্থান প্রাজ্ঞ, তৈজস তৃতীয়মাত্রা ম-কার। কেননা 'ম'-কারেই মিতি এবং অমিতি। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি এই সকলের পরিমাপক হন, তিনি সকলের লয় স্থল হন্।

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈতঃ এবমোঙ্কারঃ আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ। ১২।

অমাত্র [সর্ব্বমাত্রা-সমন্বিত, সর্ব্বমাত্রা-বর্জ্জিত] চতুর্থ [তুরীয় এবং; তুরীয়ের অন্তর্নিহিত গুপ্ত ধনাত্মক দিক তুরীয়াতীতে পরিস্ফুট বলিয়া তুরীয়াতীত তুরীয়েরই ধনাত্মক (positive) আস্বাদন। পূর্ণ চক্রের প্রথম অর্দ্ধে অর্থাৎ প্রণব হইতে আত্মা পর্য্যন্তের প্রণব ছিল বাচক, সাধন এবং গৌণ; প্রণব তাহার প্রথম মাত্রা দ্বারা আত্মার প্রথম পাদের পিছু পিছু চলিয়া আত্মার প্রথম পাদেরই সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে; পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অর্দ্ধে অর্থাৎ আত্মা হইতে আবার প্রণবের অমাত্র স্তর পর্য্যন্ত আত্মার প্রথম পাদ প্রণবের প্রথম মাত্রার পিছু পিছু চলিয়া বাচকরূপে, সাধনরূপে প্রণবের প্রথম মাত্রার স্বয়ংমূল্যত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। দুই-ই দুইএর পিছু পিছু ছুটিয়া চলিয়াছে; অথচ গন্তব্যস্থল এক শিব, অদ্বৈত। যাহা প্রথম অর্দ্ধ স্তরে প্রণব-সাধনা, তাহাই দ্বিতীয় স্তরে প্রণবের স্বয়ংসিদ্ধ রূপ। সাধনা-সিদ্ধি শিব-অদ্বৈতের দ্বিবিধ আস্বাদন। সাধনার ভিতরই দ্বিতীয় স্তরে সিদ্ধ বস্তু ব্যাখ্যাত হন্, ঘন হন্। সিদ্ধির ঘনীভূত আস্বাদনই সাধনা। ওঙ্কার সাধনা, ওঙ্কার সিদ্ধি।

অমাত্র ওঙ্কারই চতুর্থ, ইনি অব্যবহার্য্য, প্রপঞ্চোপশম, শিব ও অদ্বৈত। এইভাবে ওঙ্কার আত্মাই। যিনি এইরূপ জানেন আত্মাতেই সম্যক্‌রূপে প্রবিষ্ট হন।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ সমাপ্ত।

দেব-দেবীর স্তব-স্তুতি

॥ শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

জটাজুট-হাড়মাল, অহিভূষা সুবরাল,
প্রোজ্জ্বল শশী-ভাল,
জয় জয়, শিব মহাকাল !
ধর দিশ-অম্বর, ত্রিতিমির কলেবর,
ভূত-প্রেত-পরিচর,
জয় জয়, শিব মহাকাল !
নমো, স্বয়-হুতাশন,
শ্মশান ভূনিকেতন,
জয় জয়, শিব মহাকাল !
নমো, ভীম ! ভীমভূপ নির্মূল দ্রোহীকুল,
তাণ্ডব ভূতুমুল,
জয় জয়, শিব মহাকাল !
নমো, ভব-ভৈরব ! দেহ পদ-বৈভব,
অনুকূল মম ভব,
হে নকুল, শিব মহাকাল !
নমো, ভীম ! কান্ত হে, নমো, শিব, শান্ত হে,
নমো, দেব, দান্ত হে,
জয় জয়, শিব মহাকাল !

(২)

জয় মা তারা, জয় মা তারা, জয় মা তারা, জয় !
জয় মা কালী, জয় মা কালী, জয় মা কালী, জয় !
করাল তব ভয়াল রূপ, অঙ্গ যেন আঁধার-স্তূপ,
তবুও, তব অতুল রূপ, জয় মা কালী, জয় !
মুক্তকেশী, দিগ্‌বসনা, খড়্গপাণি, লোলরসনা,
অট্টহাস-করাননা, জয় মা কালী, জয় ।
পিশাচ-প্রেত-ভূতের দল বাজায় তোর ঘোর মাদল,
চরণ-তলে ভীম পাগল জয় মা কালী, জয় ।
তা-থই তা-থই তোমার নাচে ; কয় সে যেন 'মা ভৈঃ' ভাষ,
শ্মশান কর স্বর্গ-বাস, জয় মা কালী, জয় !
অসুরগণে নিধন কর, সুরগণেরে তরণ কর,
তমস্-দিবা হরণ কর, জয় মা কালী, জয় !
অয়ি মা কালী, তোমার কালো—
সেই তো আলো—সেই তো আলো !
ঢালো সে আলো, ঢালো, মা, ঢালো !
জয় মা কালী, জয় !
দুর্গ পথে দুর্গ-ভয়ে, তোমার পদ পাথেয় ক'রে
মর্ত্য আজি যাত্রা করে । জয় মা কালী, জয় !
জয় মা কালী, জয় মা কালী, জয় মা কালী, জয় ।

(৩)

করে রাজে প্রহরণ, শিখী 'পরে বীরাসন,
কার্তিক, ষড়ানন,
হে কুমার, হে কুমার !
চোখে তব চিদ্-ভাস, দেহ হেম-সঙ্কাশ,
বুকে ওজঃ উচ্ছ্বাস,
হে কুমার, হে কুমার !
বেগ তব উদ্দাম, ভীম তব আস্ফান,
বীর তুমি ধূম্রধান,
হে কুমার, হে কুমার !
যেথা পাপ-ব্যভিচার সেথা ঘোর হাহাকার,
সেথা তুমি দুর্বার,
হে কুমার, হে কুমার !
শর তব, সিংহ-বলে, অশিবের শিবাদলে
দলে বলে-কৌশলে,
হে কুমার, হে কুমার ।

এ জীবন-বিগ্রহে অসুরের নিগ্রহে,
জেগে ওঠো শীঘ্র হে,
হে কুমার, হে কুমার !

(৩)

জয় জয় লোকমাতা, জয় জয় লক্ষ্মী !
প্রোজ্জ্বল-উজ্জ্বল-কজ্জল-অক্ষি !
শতদল বক্ষ
গুরুরে স্তব্ধ
গুণী মৌ-মক্ষী।
জয় জয় লোকমাতা, জয়, জয়, লক্ষ্মী !
তুমি মোরে কৃপা ক'রে দাও বরে অর্থ।
অর্থ সে স্বার্থের গড়িবে না গর্ত।
টুনটুন ঝঙ্কারে সখ্যের সকারে,
শোভিবে সে সংসারে
সৎ পথ লক্ষি'।
জয় জয় লোকমাতা, জয় জয় লক্ষ্মী !

(৪)

জয় জয় গঙ্গা মা, জয় জয় গঙ্গা !
উচ্ছল কলকল তরঙ্গ রঙ্গা !
হরিপদ-নিঃসৃতা, হরজটা-সংশ্রিতা,
বেদ-নাদ-নন্দিতা,
গঙ্গা মা, গঙ্গা !
জয় জয় গঙ্গা মা, জয় জয় গঙ্গা !

হিমবৎ তব পদ ধরি' লয় মুণ্ডে ;
মকর সে বহে তোমা চুমি'পদ শুণ্ডে।
অধমের উদ্ধারে, সবুজের সকারে,
ধ্রুব তুমি সংসারে, অয়ি মাতঃ গঙ্গা !
জয় জয় গঙ্গা মা, জয় জয় গঙ্গা !

তব ভীম ঊর্মির উত্তাল ছন্দ,
তব বেগ—ভীম বেগ, মহামেধ-মন্দ্র,
দাও আজি বিশ্বকে, দাও সব নিঃস্বকে,
দাও তব শিষ্যকে, অয়ি মাতঃ গঙ্গা !
জয় জয় গঙ্গা মা, জয় জয় গঙ্গা !

'বর্ত্তমান যুগ না ঘরকা, না ঘাটকা ; তাহার বর্ণাশ্রম জাতিয়া চৌ-চির, ভাগবতও সে নিল না। কি তাহার বিধান ? দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি, মেয়েদল আজ কোথায় দাঁড়াইবে বর্ণাশ্রমে ? নারী-পুরুষ অগ্নি ও বারুদের মত দুইটী ভীষণ বস্তু বলিয়া বর্ণিত, যাহাদের মিলনে যখন তখন বিস্ফোরণ হইতে পারে। অথচ তাহাদের অবাধ মিলনের পথ বর্ত্তমানে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে খোলা হইয়া গিয়াছে ; এখন কে আছে এ তাল সামলাইবে ? কোনও মুনিঋষি এখানে অগ্রসর হইবেন না। ইহা এখন একরূপ হইয়াও গিয়াছে (fact), অথচ ইহা সমাধানের যোগ্য বিষয়ও (task) বটে। কিন্তু কে এমন সাহসী সুহৃৎ আছেন বিশ্বের এই মহা সঙ্কটে ? শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কেউ নাই, আর কেউ নাই।'

—পুরুষোত্তমানন্দ, ব্রহ্মসূত্র ১ম খণ্ড

নরনারায়ণ আশ্রমের পল্লীকেন্দ্র

॥ শ্রীপ্রতিভা রায় ॥

১৩৪২ সনে আমি একবার কলিকাতা নর-নারায়ণ আশ্রমে গিয়াছিলাম। সেখানে যাইয়া দেখিলাম গেরুয়া বসন পরিহিতা মধ্য বয়সী একটি মহিলাকে, নাম তাহার যোগেশ্বরী দেবী। শুনিলাম তিনি নাকি হুগলি জেলার বলদবাদ গ্রামের স্বর্গীয় প্যারি মোহন চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা; পিতার অন্য কোন সন্তান না থাকায় পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তিনিই তাঁহার ইচ্ছা বাড়ী সহ বাইশ বিঘা জমি তাঁহার পিতার স্বহস্ত লিখিত উইলের মর্মানুযায়ী, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর শালগ্রাম শ্রীশ্রীহরজীকে দান করিয়া, তাঁহার সেবার ভার পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজকে অর্পণ করিবেন, এইরূপ আলোচনা চলিতেছে। কয়েক দিন পর আমি নবদ্বীপ চলিয়া আসিলাম। কিছুদিন পর স্বামীজীর পত্রে জানিতে পারিলাম, স্বামীজীর নামে বলদবাদের ঐ স্থান যোগেশ্বরী দেবী রেজেস্টারী করিয়া দিয়াছেন। নর-নারায়ণ আশ্রমের পল্লীকেন্দ্র বলদবাদে স্থাপনা হইবে, ইহার জন্য খুব প্রচেষ্টা চলিতেছে।

স্বামীজীর পাগল-প্রাণ এই সংস্থাটাকে বৃন্দাবনে গড়িয়া তুলিবার জন্য সারাজীবন কি প্রাণপণ চেষ্টাই না করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কর্ম ছিল নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধির পর যে কর্ম তাহাই, সেই জন্যই তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও অক্লান্ত ভাবে কর্ম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, বলদবাদের পল্লীকেন্দ্রে তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী বহু পরিবার একত্রে থাকিবে। এই পরিবারগুলি স্বামীজীর নির্দ্দেশিত পথে নিজেদের ভরণ পোষণের উপযুক্ত অর্থ ঐ স্থান হইতেই উন্নত ধরণের কৃষির সহায়তায় উপার্জ্জন করিবেন এবং জীবন যাপন করিবেন এমনই উন্নত ধরণের যে তাহা হইবে ঋষি জীবনের অনুরূপ। একাধারে ব্রহ্মজ্ঞান ও কৃষি—ব্রহ্মজ্ঞানী ও চাষী—যাহা রাজর্ষি জনকের আদর্শ। নরনারায়ণ আশ্রমের পতাকা তাই লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা। এই পরিকল্পনানুযায়ী পল্লীকেন্দ্র গড়িতে হইলে প্রচুর টাকার প্রয়োজন। এই জন্য সেই সময়ে স্বামীজীর কর্মের আদর্শ জনসাধারণের নিকট ধরিবার জন্য একটি বিজ্ঞাপনও ছাপান হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"তিন বৎসর আশ্রম পরিচালনার পর এই কথাটা খুব স্পষ্ট করিয়া বোঝা গিয়াছে যে, নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধ ব্যক্তি তাঁহার জাগ্রত অদ্বৈত জ্ঞানকে যদি কর্মের এবং প্রেমের ক্ষেত্রে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কর্ম্ম-জগতে নিযুক্ত হন, তবেই মাত্র তিনি কর্মে অচ্যুত থাকিয়া অবিরত কর্ম্ম করিতে পারেন। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই অতি ছোট 'পা'-ধোয়া কর্মের অধিকারী, যুধিষ্ঠির আদিও নন্। পা ধুইয়া দিবার মত গুরুতম কর্মের যোগ্য পুরুষ, যোগী পুরুষ দ্বিতীয় কেহই ছিল না বলিয়া "গুরুগরীয়ান্" পুরুষ নিজেই তাহার ভার লইয়া ছিলেন। দেখিলে মনে হয় 'কাজ করা' খুবই সহজ; কিন্তু কর্মের পিছনে রহিয়াছে প্রেমঘন অদ্বৈত-জ্ঞানময় নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি। এই কর্মের আদর্শই শ্রীকৃষ্ণ প্রচার করিয়াছেন; ইহাই পুরুষোত্তম-কর্ম।

নৈষ্কর্ম্য লাভ করিবার পূর্ব্বের কর্ম জ্ঞানলাভ হইলে ভস্মসাৎ হইয়া যায়—এ কথা মুক্তি-শাস্ত্র স্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছে, গীতারও মত তাহা। কিন্তু মুক্তি-শাস্ত্র নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধির পর আর কোনও কর্ম স্বীকার করে না। ফলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এই কর্ম্ম-জগৎ একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। বিশ্বে আমরা আজ কর্মক্ষেত্রে সকলের পশ্চাতে। কর্মক্ষেত্রের সহিত একেবারে অপরিচিত থাকার বিপদ হইতে বাঁচিবার একমাত্র পথ—নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধ কর্মীর কর্ম্ম-জগতে কর্ম্মভার গ্রহণ, বিজ্ঞানের

ক্ষেত্রকে ব্রহ্মেরই মত সমান মানদানের শাস্ত্র প্রচার এবং সেই আদর্শে কর্মক্ষেত্রের সৃষ্টি করা। মাটিতে আলু-পটোল হয়—ইহাই জানিতাম। তাই না ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য আমরা খুঁজিয়াছি চিৎএর ক্ষেত্র? কিন্তু মাটি খুঁড়িয়া যে আলু-পটোল ও ব্রহ্মজ্ঞান যুগপৎ মিলিতে পারে এ কথা শ্রীকৃষ্ণই নির্ভীকভাবে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ইহলোকের মানদান করিয়াছেন, ইহলোকের বুকে গোলোক প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহাই যোগস্থ হইয়া কর্ম করার চরম সার্থকতা। নরনারায়ণদেবই বিশ্বে নৈষ্কর্ম্য লক্ষণ কর্মের প্রচার ও আচরণ করিয়াছেন। কিন্তু মুক্তি শাস্ত্র এমন করিয়াই এই তত্ত্বটীকে অস্বীকার করিয়াছে, সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া লোকের রক্ত-মাংসে প্রবেশ করাইয়াছে যে, বর্ত্তমান যুগ ভাবিতেই পারে না মুক্তি শাস্ত্র হইতে লীলাশাস্ত্র অনেক বড়। মুক্তিবাদীদের মতে লীলাশাস্ত্র এক ধাপ নীচের শাস্ত্র।

কর্ম-পরাজিত ভারতবর্ষের বুকে পুরুষোত্তম শ্রীমান ও শ্রীকৃষ্ণ জীবনই আজিকার যুগের সকল জটিল-কুটিল সমস্যার—অন্ন ও ব্রহ্মজ্ঞানের—সমাধান দিতে পারে। অনাবাদী কৃষিক্ষেত্রে—পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মে—গীতার পুরুষোত্তমবাদের লাঙ্গল চাষ লাগাইয়া নূতন বিশ্ব গড়িবার দিন আজ আসিয়াছে।"

এইভাবে আশ্রম গঠন করিবার পরিকল্পনা স্বামিজীর জীবনে পাইয়া বসিয়াছিল এবং সংসারটাকে এইভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্যই ধাক্কাধাক্কি করিয়া গিয়াছেন। পৌষমাস বেশ শীত, আমার শরীরও ভাল ছিল না; এমন সময় স্বামীজীর একখানা পত্র আসিল—তাহাতে সত্যেন্দ্রনাথ সাহিত্যশাস্ত্রীকে ও আমাকে বলদবাদ সেই পল্লীকেন্দ্রে যাইবার জন্য স্নেহের আহ্বান ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন "আমরা আশ্রমের সবাই বলদবাদ গ্রামে পল্লীকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য যাইতেছি, ৭ দিন সেখানে থাকিব। সেখানে লাঙ্গল যুক্ত গৈরিক পতাকা উত্তোলন হইবে, মিটিং হইবে এবং সেখানকার লোকদিগকে লইয়া একটা উৎসব হইবে। আমার এই নূতন যাত্রাপথে তোমাদিগকে আমার পাশে পাইতে ইচ্ছা করি, অবশ্য আসিও"। পত্র পাইয়া তাঁহার নূতন অভিযানের সময় তাঁহার পাশে থাকিবার জন্য প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। শরীর অসুস্থ, শীতের মধ্যে যাইতে দিতে মায়ের অমত, সত্যেন শাস্ত্রীরও যাইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না কিন্তু আমি তো না যাইয়া পারি না। স্বামীজী একদিন বলিয়াছিলেন "আমার কাজ যে দিন আরম্ভ হইবে সেদিন তোমাকে পাইব তো?" আমি বলিয়াছিলাম, পাইবেন। আমার কান্নাকাটিতে মা যাইবার মত দিলেন, সত্যেন শাস্ত্রীও লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন। ২২শে পৌষ সোমবার বেলা ১২ টার ট্রেনে বলদবাদ রওনা হইলাম। একেবারে অপরিচিত স্থান, মিটিং ৫টায়; তাহার পূর্বে পৌঁছিবার জন্য মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। শেওড়াফুলি হইয়া তারকেশ্বর লাইনের হরিপাল স্টেশনে নামিলাম; বহু চেষ্টায় বাস পাওয়া গেল, কোথায় যে নামিতে হইবে তাহাও জানা ছিল না। কিন্তু আমরা যাইতেই দেখিলাম এক জায়গায়, রাস্তার পাশেই, স্থানটীর নাম রায় চক্রবর্ত্তীর ডাঙ্গা, এক সভার আয়োজন এবং স্বামীজী সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন, দেখিয়া আমরা সেখানেই নামিয়া পড়িলাম। আমাদিগকে দেখিয়া স্বামীজী খুবই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। আমরা নামিবার সঙ্গে সঙ্গেই সভার কাজ আরম্ভ হইল। প্রথমেই লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা মাতা ঊষাঙ্গিনী ঘোষকে দিয়া উত্তোলন করান হইল। স্বামীজী বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—বৃন্দাবনের রাখাল রাজের সেই বন বিহারের সহিত বলদবাদ গ্রামের সৌভাগ্যকে যুক্ত করিয়া চোখের জলে গ্রামবাসীর নিকট প্রাণের দেবনার আবেদন জানাইলেন। বলদবাদকে আপনারা বৃন্দাবনের ভাবে গড়িয়া তুলুন এই তাঁহার আবেদন। প্রায় ২ ঘণ্টা মত বক্তৃতা হইল, শীতের বেলা রাত্রি হইয়া গেল; শেষে কীর্তন আরম্ভ করিলেন, কীর্তন করিতে করিতে বিগ্রহ শ্রীধরজীর মন্দির পরিক্রমা করিয়া ঠাকুর প্রণাম করিয়া যোগেশ্বরী দেবীর শৈত্রক যে বাড়ী সেখানে ফিরিয়া আসিলাম এবং সেখানে কিছু সময় কীর্তনের পর স্বামীজী গ্রামবাসী

সকলকে কোল দিলেন, তাঁহারা স্বামীজীকে প্রণাম করিলেন। পূর্বেই প্রসাদের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন, সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হইল। স্বামীজী বক্তৃতায় রাখালরাজের যে প্রীতির কথা, পরস্পরের প্রাণখোলা গলাগলির কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহার সেই ভাবের মূর্তবিকাশ যেন সেই সময় হইয়াছিল। সে এক অপূর্ব আস্বাদন। সকলেই সে দিন স্বামীজীর সেই চোখের জলে বুকে জড়াইয়া ধরার ভিতর দিয়া এক অনাস্বাদিত আনন্দ অনুভব করিয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করিয়াছিল।

বলরামের কন্যারা যোগেশ্বরী দেবীর সেই বহু পুরাতন ভগ্ন বাড়ীটীকে পরিষ্কার করিয়া বাসযোগ্য করিয়া রাখিয়াছিল, আমরা প্রায় ১৫।১৬ জন লোক সে সময় উপস্থিত ছিলাম; আহারাদি সারিয়া সকলে যে যাহার স্থানে ঘুমাইলাম।

খুব ভোরে সকলে মিলিয়া উঠিলাম, স্বামীজী প্রার্থনা করিয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন, হারমোনিয়াম করতাল আদি ছিল; খুব কীর্তন হইল। সকালে গ্রামবাসিরা খেজুরের রস আনিয়া দিল, স্বামীজী তাহা কত আনন্দের সহিত খাইলেন, আমরা সকলেই খাইলাম। পূর্বেই আশ্রম কর্মীরা কিছু শাকসব্জী তৈরী করিয়াছিল এবং স্থানীয় লোকেরাও কিছু দিল। মা তাহা দ্বারা অনেক রকম ব্যঞ্জন তৈরী করিলেন, সকলে মিলিয়া পরমানন্দে আমরা বন-ভোজন করিলাম। সন্ধ্যাবেলা স্বামীজী সবাইকে লইয়া খুব কীর্তন করিলেন। পূর্বেই চার স্থানে সভার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ২৩শে পৌষ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৩ টায় কৈকালা গ্রামে এক সভা হইল; আমরা সকলেই স্বামীজীর সহিত সেখানে গেলাম, ২ ঘণ্টা স্বামীজীর বক্তৃতা হইল; ছোট দিনের বেলা, বাসায় ফিরিতে রাত্রি হইল। ২৪শে পৌষ বুধবার অপরাহ্ণ ৪টায় হরিপাল গ্রামে সভার আয়োজন হইয়াছিল, সেদিনও আমরা সবাই স্বামীজীর সহিত হরিপাল গেলাম। কাছে কাছে গ্রাম, মাঠের ভিতর দিয়া আমরা হাঁটিয়া হাঁটিয়া যাইতাম, সে কি আনন্দ। ২৫শে পৌষ বৃহস্পতিবার তারকেশ্বরে ৩টায় সভার আয়োজন হয়। সেদিন আমরা সকাল ৮টায় তারকেশ্বরে রওনা হই, আমরা প্রায় ১৬।১৭ জন লোক ছিলাম, তারকেশ্বরের মহান্তজী আমাদের দ্বিপ্রহরে সেখানেই প্রসাদ পাইবার কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। স্বামীজী সহ আমরা তারকেশ্বরে পৌঁছাইলে তারকেশ্বরের মহান্তজী স্বামীজীকে (এবং আমাদের সকলকেই) খুব সমাদর সহকারে দোতালার একটী বড় হলে কারুকার্য খচিত ভেলভেটের আসনে ডাকা, সেখানে লইয়া গেলেন। আমরা সবাই কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম করিলাম। মহান্তজী ও স্বামীজী কথোপকথন করিতে লাগিলেন, ঘণ্টা খানেক বিশ্রামের পর স্বামীজী আমাদেরসহ তারকেশ্বর দর্শনে যাইলেন বলায় মহান্তজী স্বামিজীর জন্য ১ ঘণ্টা মন্দিরে অন্য কোনও যাত্রীকে যাওয়া নিষেধ করিয়া দিলেন। স্বামীজী আমাদের লইয়া তারকেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে আমরা পূজা করিয়া আবার দ্বিতলে ফিরিয়া আসিলাম। আমরা আসিবার পর এক পূজারী এক বাল্‌তি দুধিই চরণামৃত এক গেলাস করিয়া আমাদিগকে দিয়া গেলেন। কিছু পর তারকেশ্বরের লুচি-তরকারী মিষ্টাদি সহ প্রসাদ পাইলাম। সেখানে বিনা লবণে তরকারী হয়, পাতে লবণ দিয়া গেল তাহা দ্বারা পরে তরকারীতে মাখাইয়া খাওয়া হইল। প্রসাদ পাইতে বেলা ২।০ টা বাজিয়া গেল; সভার সময় হইয়া আসিল; তাড়াতাড়ি সকলে সভায় গেলাম। প্রকাণ্ড স্থান, লোকে লোকারণ্য, স্বামীজী বক্তৃতা দিতে উঠিলেন। মহান্তজী নিজে তারকেশ্বরের প্রসাদী মালা স্বামীজীকে পরাইয়া দিলেন, সভা আরম্ভ হইল। সকলেই স্তব্ধ হইয়া তিন ঘণ্টা কাল স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিলেন। সে দিনে স্বামিজী কি তেজস্বিতাপূর্ণ অথচ অশ্রু প্লাবিত হইয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন আজও তাহা যেন কানে বাজে। সেদিন সকলেই বলিয়াছিল চিত্তরঞ্জন দাসের পর তারকেশ্বরের আঙ্গিনায় এমন বক্তৃতা আর হয় নাই। সভা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনের সময় হইয়া গিয়াছিল; তাড়াতাড়ি সবাই স্টেশনে আসিয়া ট্রেনে উঠিলাম।

আশ্রমে ফিরিতে রাত্রি ৮টা হইল। ২৬শে পৌষ শুক্রবার কর্ম্ম-কুটীর-নালিকুল-এ অপরাহ্ণ ৩টায় সভা হইল, স্বামীজীর সঙ্গে আমরা সবাই গেলাম। এই ভাবে কি আনন্দে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। শনিবার সকালে স্বামীজী আমাদের সহ কলিকাতা চলিয়া গেলেন। প্রতি রবিবার কলিকাতা আশ্রমে গীতার ব্যাখ্যা করিতেন সেজন্য আর থাকিলেন না, আমরাও নবদ্বীপ চলিয়া আসিলাম।

প্রায় দুই বৎসর কাজ ভালই চলিল। স্বামীজীর দুই ছেলে এবং আরও ৭।৮ জন যুবক কর্ম্মী প্রাণপণে বলদবাদের পল্লী কেন্দ্রে কৃষির কার্য্য করিতে লাগিল। স্বামীজী এক পত্রে লিখিলেন—"আশ্রমের বর্ত্তমান অবস্থা জানাইতেছি। ৪ বিঘা জমিতে আখ হইয়াছে। প্রথম বৎসর বেশী কিছু হইবে না। মূলা দেওয়া হইয়াছিল উহাতে ৩৫৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এক বৎসরে এখানে আশ্রমের খরচ কৃষি খরচ বাবদ মোট খরচ হইয়াছে প্রায় ১৪০০৲ শত টাকা। জল দিবার জন্য পাইপ কেনা হইয়াছিল। তাহা আছে। আগামী বৎসরে আখের জন্য আর কোন খরচ হইবে না। এইবারের আখ দ্বারা আরও ২ বৎসর চলিবে। এই আখের গোড়া হইতেই নূতন গাছ হইবে। প্রথম বৎসর খরচ হইয়াছে বেশী। ছেলেরা নূতন কাজে লাগিয়াছে, কাজেই খরচ কিছু হওয়া অনিবার্য্য। এখন আবার বেগুন, চ্যারস, টমেটো লাগান হইয়াছে। কিছু মুলাও লাগান হইয়াছে। শুড় কিরকম হয়, কত দরে বিক্রয় হয় বলিতে পারি না। সবটার ভিতরেই রহিয়াছে ভগবানকে সকল ক্ষেত্রে আস্বাদন করা। আজ কৃষি-ক্ষেত্রে ঠাকুরকে আস্বাদন করিবার দিন আসিয়াছে। লোকের জন্য কৃষি নয়, কৃষি শুধু কৃষ্ণচন্দ্রকে সেবার জন্য। যাহার ফলে কৃষি নিশ্চয়ই যোগক্ষেম বহন করিবেন। তারপরে আশ্রম বর্ত্তমানে এক নূতন পরিস্থিতির মধ্যে যাইতেছে। যে গ্রামে পল্লীকেন্দ্রটী স্থাপিত হইয়াছে, ঐ গ্রামটী যে তালুকের মধ্যে, সেই তালুকটী তালুকের মালিক বিক্রয় করিবেন, আমাদের কিনিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতেছেন। গ্রামটী যখন উহাদিগকে বিক্রয় করিতেই হইবে তখন আমাদিগকে দেওয়া উহাদের অভিপ্রায়। তাহা হইলে উহাদের কতকটা তৃপ্তি হয়। ঐ তালুকটী রাখিলে আমাদের গ্রামটীকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করিবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। আজ সমস্ত গ্রাম শ্মশানে পরিণত। হুগলী জেলায় এমনি একটী শ্মশান পল্লীতে ঠাকুর নিষ্ঠা ফেলিয়াছেন। গ্রামটীর ২৫।৩০০ শত লোক ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাগ্দী। গ্রামটিকে ব্রজধামে গড়িয়া তুলিতে হইবে। কৃষকের মাঝে কৃষির ঠাকুরকে নিয়া গোষ্ঠে হৈ হৈ রৈ রৈ করিবার বাসনা। কৃষ্ণচন্দ্রই আমার জীবন দেবতা।"

বলদবাদের আশ্রম-কর্ম্মীরা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া কলিকাতার আশ্রমে চলিয়া আসায় ১৩৪৩ সনের শ্রাবণ মাসে স্বামীজী একমাসের মত বলদবাদে যাইয়া ছিলেন। সেই সময় তিনি একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন -রে নিকট; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

নরনারায়ণ আশ্রম
বলদবাদ গ্রাম
২০শে শ্রাবণ ৪৩ সন

নারায়ণেষু

…পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। আমি নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছি।…… এখানে আমার খুব ভাল লাগিতেছে। প্রথমে আসিলেই চোখে পড়িল কাগজে লেখা "নরনারায়ণ আশ্রম পল্লীকেন্দ্র"। মনে হইল হাজার হাজার বৎসর পর্য্যন্ত নর নারায়ণ আশ্রম ছিল তুষার মণ্ডিত হিমালয়ের অগম্য গিরি শৃঙ্গে; এতদিন পরে কি তাহা লোকালয়ে আসিল? তাহাই তো জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছি। জনসাধারণের মধ্য হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া নরনারায়ণ আশ্রম লোকবহুল জনপদের মাঝে স্থাপন করাই তো আমার জীবনের ব্রত। তোমরা মানুষ হইলে তাহাই হইবে। আমার কল্পনাকে তোমরা বাস্তবে পরিণত কর। মা। আমার তোমরাই ধন দৌলত। তোমরাই সম্বল। তোমাদের লইয়াই আমি এই বিরাট বোঝা মাথায় লইয়াছি। আমার আর কে আছে? তারপর দৃষ্টি পড়িল বাঁশের বেড়া দেওয়া, অনন্ত আকাশযুক্ত

ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঘরখানির দিকে। ঘরখানি যেন "স্বপ্ন দিয়ে তৈরী এ ঘর, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।" কুটীরটী তপস্যার যোগ্য বটে। জিনিষগুলি সব গুছানো সাজানো। বেশ ছিট-ফাট। খুব ভাল লাগিতেছে। গুড়ের লোভে বহু ভোঁমরা, বোলতা, মাছির গুণ গুণ শব্দ বেশ লাগে। কুটীরের পাশ দিয়া স্রোতস্বিনী নদী বহিয়া চলিয়াছে, তাহাই বা কি মনোরম। নিশ্চয়ই এ কুটীরটী রবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতনের কুটীরের চেয়ে কম আদরের, কম স্বপ্নমাখা নয়! তোমরা……নিশ্চয়ই এ কুটীরের চিত্র অঙ্কিত করিবার জন্য লুব্ধ হইবে। কি নিঃশব্দতা, কি মধুর, কি নিঃসঙ্গতা! সারা দুনিয়ার স্বপ্নটা আজ যেন আমাকে নেশার মত পাইয়া বসিয়াছে। ভাঙ্গা ঘরখানির প্রতি ফাঁকের মাঝে দেখিতেছি ভবিষ্যৎ সন্ধ্যের সুমোহন স্বপ্নময় চিত্র। অতীতের যত স্মৃতি ইহার পশ্চাতে, ভবিষ্যতের যত সৃষ্টির স্বপ্ন ইহার প্রতি ভাঙ্গনের মধ্যে জল জল করিতেছে। আজ কাল একটু হাওয়া আছে, ঘরে বেশ হাওয়া আসে। কৃচ্ছ্রের প্রাচুর্য্য আছে, কিন্তু তাহা যে মধুরতায় মণ্ডিত। এই কৃচ্ছ্রই তো জীবনে চাহিয়াছি। তোমাদিগকেও তাই কৃচ্ছ্র সাধনার ভিতর টানিয়া আনিয়াছি। পুরুষোত্তমকে পাইতে গিয়া রাধারাণীকে যত তপস্যাই না করিতে হইয়াছিল। …একদিন রাধারাণী নিজ সখিবৃন্দকে বলিতেছিলেন—সখি, আমি কৃষ্ণকে পাইবার জন্য কি কি করিয়াছিলাম, শুনবি? "অঙ্গনে চালিয়া জল করিয়া অতি পিছল, গতাগতি তাহাতে করিতাম।" জানি শ্যাম বঁধুকে পাইতে হইলে যত পিছল পথে চলিতে হইবে, তাহা না শিখিলে চলিবে কেন? আঙ্গিনায় কাঁটা পুঁতিয়া তাহার উপর দিয়া ছুটাছুটি করিতাম। বিষ-বৈদ্য ডাকিয়া আনিয়া বিষ খাওয়া শিখিয়াছিলাম। বিষ খাইতে না শিখিলে হরিকে পাইব কি করিয়া? সেইজন্যই না পিছল পথে চলিবার কৌশল তোমাদিগকে শিখাইতে চাই? পুরুষোত্তমকে জীবনে পাইতেই হইবে। নচেৎ সব ব্যর্থ! তাঁহাকে পাইবার জন্য কোন কষ্টই কষ্ট নয়। কবিতায় কুটীরটী ভরপুর। ভাবুকতা যেমন অনন্ত, রসিকতারও কিছু অভাব নাই। যোগেশ্বরী খুব সেবা করিতেছে গত বৈকালে ভদ্রেশ্বরের বাড়ী হইতে লুচি ও রাত্রিতে মুগ দিয়া খিচুড়ী, মুলার শাক ভাজা, পটল ভাজা বেগুন দিয়া তরকারী। খুব আরাম। গতকল্য দিনে মুলার শাকের ভোগ্গা দিয়া ডাল, পাঁচ মিশানো তরকারী, কচুর ডাটার ডাল্‌তে, আজ সকালে লুচি তরকারী। আজ হইবে লাউভোগা ও মুগ দিয়া ডাল, কচুর ডাটা ভাজা, তরকারী।……একাই আমি বেশ থাকি। মানুষ করে আত্ম-প্রবঞ্চনা, তাই আর ভাল লাগে না। এই কঠোরতার মাঝে, তপস্যার মাঝে মানুষের সব প্রতারণা ধরা পড়ে। এই কুটীরে আত্ম প্রতারকের স্থান কোথায়? আজ চাই তপস্বী, চাই সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবন লইয়া কর্ম্মের ধ্যানে, প্রাণের ধ্যানে, জ্ঞানের ধ্যানে বসিয়া যাওয়া। কাল ও আজ ভোরে প্রার্থনা হইয়াছে। খুব ভাল লাগে। চোখে জল বহিয়া যায়। নিত্য সুন্দর এমনই শ্মশানের বুকে পৌরীর ধ্যানে নিমগ্ন! আচ্ছা …ম্যালেরিয়ার মধ্যেও কি কোনও কবিত্ব নাই? কলিযুগের কবিত্ব ভগবান সেখানেই আবিষ্কার করিলেন, যেখানে সব মুনি ঋষি ভয়-বিহ্বল। বর্ণাশ্রম শাস্ত্র কলির দোষ-কীর্ত্তনে মুখর, ভাগবত সেখানে গুণ কীর্ত্তনে সহস্র-বদন। কলি যদি এমত কবিত্ব মাখা, ম্যালেরিয়ার অন্তরেও পুরুষোত্তমের কবিতার গন্ধ ভূর ভূর করে! এই কবিত্বকে ফুটাইয়া আস্বাদন করিবার জন্যই কি আমাদের ম্যালেরিয়ার দেশে আসা? একবার ম্যালেরিয়ার অন্তর-দেবতার খোঁজ পাইলেই ম্যালেরিয়া থাকিবে না, থাকিলে সেখানে পুরুষোত্তমের স্পর্শ। আবার এখানে থাকিবার নেশা লাগিয়াছে। কিন্তু আমাকে তো থাকিতে দিবে না। তোমার… বলিও তাহার কবিত্ব ফুটাইবার স্থান সহর নয়। বলদবাদের মতন নয় সহজ পল্লীতেই সহজ কবিতার জন্ম। সহরের কবিত্বে নূতনত্ব কোথায়? নিশ্চয়ই দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি তোমাদের ২৪।২-এর বাটী হইতে এই ভাঙ্গা কুটীর কবিত্ব হিসাবে সহস্র গুণে শ্রেয়। খালের জল খাই, তাহাতে স্নানও করি। এ যে জীবন্ত জল। এখানে খালের পারে ঘর করিবার লালসা জাগিয়াছে। বারমাস

যদি খালটি ভরা থাকে, তবে এ আয়গাব তুলনা ছিল না। দুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্নতাই যে আমাব পক্ষে মহামোদকতা! দুনিয়া হইতে দূরে না থাকিলে কি দুনিয়াকে দৃষ্টি করা যায়! 'অবতিঃ জন সংসদি' গীতা।..."

পুরুষোত্তমানন্দ কি অদ্ভুত মানুষ ছিলেন, তিনি কি জ্ঞানী, না ভক্ত, না কর্মী, তিনি দার্শনিক, না সাহিত্যিক, না ভাবুক, না বাস্তববাদী? তিনি কোনও একটাই নন, তিনি সবই; তিনি ছিলেন একখানি উচ্ছসিত প্রাণপ্রবাহ। তাই তাঁহার জীবনখানি ছিল সকল বিপরীতের সামঞ্জস্য মাখানো একখানি পরিপূর্ণ জীবন।

এই ভাবে দুই বৎসর আশ্রমের কাজ করার পর কর্মীরা সব ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। কেহ কেহ এমন অসুস্থ হইয়া পড়িল যে সেখানে আর থাকা সম্ভবই হইল না। আশ্রমের কাজ কর্ম বন্ধ করিয়া কর্মীরা কলিকাতা আশ্রমে ফিরিয়া আসিল। বলরবাবু আশ্রম করার কথা শুনিয়া সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র স্বামীজীর ছোট ছেলেকে বলিয়াছিলেন, তোমার বাবাকে বলিও হুগলী জেলা ম্যালেরিয়ার দেশ, সেখানে কেন আশ্রম করিতে যাইতেছেন? সেখানে টিকিতে পারিবেন না। তাহাই হইল। আর কেহ সেখানে গেল না। এই কর্ম এই প্রচেষ্টা সমস্তই এক হিসাবে ব্যর্থ হইল। আজও সেই স্থান ঐ রূপই পড়িয়া রহিয়াছে। আর কেহ সেখানে যায় নাই। যোগেশ্বরীদেবী সেখানেই রহিয়াছেন।

স্বামীজী এই ভাবেই সারা জীবন এই সংসারটাকে বৃন্দাবনের ভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন, কত সঙ্ঘই তিনি করিয়াছেন! জীবনের প্রথম হইতে এই প্রচেষ্টাই চলিয়াছে পর পর— সত্যব্রত সমিতি, বিশ্বকল্যাণ সভা, আনন্দমঠ, কংগ্রেস, স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ, গৌরাঙ্গ-গোষ্ঠী, শেষ কলিকাতায় নরনারায়ণ আশ্রম। কলিকাতার আশ্রম তুলিয়া দিয়া তিনি চলিয়া যাইবার দুই বৎসর পূর্বে নিজস্ব জমি ক্রয় করিয়া এই ২৪ পরগণা জেলার বাগুইআটী গ্রামে নরনারায়ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সারা জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা এইখানে মূর্ত হইয়া উঠিবে বলিয়া নিজ দেহ স্থাপনা করিয়া পিঠস্থান করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, গড়িয়া তুলিবার ভার দিয়া গিয়াছেন আমাদের মত কয়েকটী ক্ষুদ্র মানুষের উপর। তিনি যতদিন ছিলেন, তাঁহার অফুরন্ত কর্ম ছিল, ব্যর্থতার বেদনাও প্রচুর ছিল, আমরা ক্ষুদ্র হইলেও সেই বিরাট পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক বৎসর ছিলাম, সে চলায় ছিল কত আনন্দ, কত তৃপ্তি। আজও তাঁহার সেই অফুরন্ত কাজ রহিয়াছে, অলক্ষ্যে আজও তিনি আছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষের সে আনন্দ সে তৃপ্তি নাই, আছে শুধু দায়িত্ব, আছে তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে সুন্দরতর করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারার বেদনা। তাঁহার আশীর্বাদে শত প্রতিকূলতার ভিতর দিয়াও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণ আশ্রম আগাইয়া চলিয়াছে, চলিবে। জগন্নাথের রথ আপনি চলিবে, আমরা যেন তাঁহার চলমান রথের রজ্জু ধারণ করিয়া নিজকে সার্থক করিতে বঞ্চিত না হই। পুরুষোত্তমানন্দের সাধনা বিশ্বে জয়যুক্ত হউক, তাঁহার নিত্যগোপাল-ব্রহ্ম-বিদ্যাপীঠ বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হউক।

সাময়িকী

সমবায়ঃ বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ পশ্চিমবঙ্গ সমবায় প্রচার সমিতি হইতে নরনারায়ণ আশ্রমে চড়ুই-ভাতি করিতে প্রায় চল্লিশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে উক্ত সমবায় প্রচার সমিতির সভাপতি শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত এবং সদস্যদের মধ্যে শ্রীঅরুণচন্দ্র দে'হাজ্জি, শ্রীননী মৈত্র প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। বিকালে তাঁহারা সমবায় সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য একটি সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিয়া খুব হাওয়া দিতেছিল বলিয়াই বোধহয় স্থানীয় লোকেরা অল্পই উপস্থিত হইয়াছিলেন। সমবায় সম্বন্ধে আলোচনা খানিকটা হইয়াছিল। সমবায়ের দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে অংশবিশেষ আমরা এইখানে উদ্ধৃত করিলাম—সমবায় সম্বন্ধে আগ্রহশীল ব্যক্তিদের এই উদ্ধৃত অংশ চিন্তার খোরাক দিবে, এবং সমবায়কে কর্ম-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে প্রেরণা জোগাইবে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি।

"পুরুষোত্তমদর্শনে 'সমবায়' একটি নিত্যপদার্থ। এই সমবায় প্রথমে দ্রব্যের অন্তরে, গুণের অন্তরে, কর্মের অন্তরে 'জাতি'রূপে থাকিয়া পরে বাহিরের পদার্থান্তরের সঙ্গে উহাদিগকে 'সমবেত' করিয়া চলিয়াছে; সমবায়ও ব্যাপকতর পর্যায়ে অগ্রসর হইতেছে, অন্তরের সমবায়-সম্বন্ধই বহির্বিশ্বের সমবায় সম্বন্ধে গড়িয়া উঠিতেছে। এইভাবে অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে যে, কারণোপাধি ঈশ্বর পর্যন্ত কার্যোপাধি জীবসমূহের সঙ্গে সমবায়সম্বন্ধে মিলিত হইতেছেন। তখনই ঈশ্বর জীবাশ্রিত। ঈশ্বরের এই জীবাশ্রয়ত্ব-প্রত্যয়ই গড়িয়া তুলিবে এই বিশ্বকে পুরুষোত্তমক্ষেত্ররূপে। কারণের কার্যাশ্রয়ত্ব, গুণীর গুণাশ্রয়ত্ব, জাতির ব্যক্তি-আশ্রিতত্ব প্রত্যয়ের, এবং ঈশ্বরের জীবাশ্রিতত্ব প্রত্যয়েরই ঘনীভূত রূপ আমাদের পুরুষোত্তম-জীবন। পুরুষোত্তম জীবনেই জীব-ঈশ্বর, কার্যকারণ পারস্পরিক সমবায় সম্বন্ধে সমবেত। বিশ্বই যে মুক্তিধাম, ইহা এই সার্বভৌম সমবায় সম্বন্ধদ্বারাই শুধু সম্ভবপর। গুণী যখন গুণাশ্রিত, কর্মী যখন কর্মাশ্রিত, তখনকার গুণই নির্গুণ, কর্মই নৈষ্কর্ম্য। এই গুণ-কর্মই নমনধর্মশীল (flexible)। গুণকর্মের এই রূপ আস্বাদন করিলে এই বিশ্বই হয় নির্গুণের ঘনক্ষেত্র, নৈষ্কর্ম্যের মূর্তিমান আস্বাদন ক্ষেত্র। অপবর্গকে মাটির জগতে আস্বাদন করানোই ছিল বৈশেষিকদর্শনের প্রয়োজন। অথচ সেই প্রয়োজন প্রজ্ঞাবাদীর হাতে পড়িয়া সিদ্ধ হয় নাই। এইবার সেই প্রয়োজন বর্তমান বিজ্ঞানের আলোকে পূর্ণ হইবে।

এইবার আমরা ব্যক্তির বুকে জাতির 'সমবায়'-রহস্য আস্বাদন করিব এবং দেখিব কেমন করিয়া 'সাম্য' ও 'অনবস্থিতি' এই সমবায়ের প্রাণকথারূপে বিশ্বের অখণ্ডৈকরসরূপ বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। কারণ যেমন কার্যের আশ্রিত, জাতিও তেমনি ব্যক্তির আশ্রিত। ব্যক্তির বুকে ('ইহ') জাতির 'ইদম্'রূপে আস্বাদনই সমবায়ের সার্থকতা। সমবায়-সাধনায় প্রতিটি ব্যক্তিই 'জাতি'; যেমন 'ইহা একটি দ্রব্য'—'ইহা একটি দ্রব্য'—এইরূপ ভাষা আমরা প্রয়োগ করি, তেমনি আমরা বলি—'রাম একটি মানুষ'—'যদু একটি মানুষ' ইত্যাদি। মানুষ-'জাতি' আজ প্রতি ব্যক্তিতে অবতরণ করিয়া প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষকে মানুষ-জাতিতে গড়িয়া তুলিয়াছে। মানুষ হিসাবে প্রতিটি মানুষে মানুষ-সাম্য নিশ্চয়ই রহিয়াছে। জাতি-মানুষ আজ অনন্ত ব্যক্তিগত মানুষ। এইভাবে জাতি-মানুষই ব্যক্তি মানুষসমূহের মধ্যে সমবেত হইবার জন্য, এবং মানুষসঙ্ঘের ভিতর দিয়া দেব-মানুষ-পশু-পক্ষীর

সমবায়ে বিশ্বসঙ্ঘ গড়িয়া তুলিবার দিকে ছুটিয়াছে। কোথায় এই যাত্রার পরিসমাপ্তি? ইহা নিশ্চয়ই 'অনবস্থিতি'। অথচ এই অনবস্থিতিতেই বিশ্বের প্রাণ-স্থিতি। যে অনবস্থাদোষের মধ্যে বৈশেষিক জড়াইয়া পড়িয়াছেন, সেখান হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া অনাদিল অব্যাহত জীবন্তভাবে প্রবাহিত রাখাই পুরুষোত্তমদর্শনের প্রয়োজন। এই দর্শন সৃষ্টির সামনের দিক উন্মুক্ত রাখিয়াছে, সমবায়কে ঘন-ঘনতর-ঘনতমরূপে আগাইয়া নিয়া চলিয়াছে, ধরার চোখের জল মুছিয়া দিয়াছে। পুরুষোত্তমই বিশ্বকারণকে প্রেরিত করিতেছেন বিশ্ব-কার্য্যের আশ্রয়ে কারণোপাধির আলা জুড়াইতে, আবার কার্য্যোপাধি জীবসমূহকেও প্রেরণা যোগাইতেছেন বিশ্বকারণের আশ্রয়ে কার্য্যোপাধি হইতে মুক্ত হইয়া কারণের সঙ্গে অদ্বৈতবাদ আস্বাদন করিতে। ব্যক্তি আজ পুরুষোত্তম-জীবনের সমবায়ে জাতি হইবে, জাতিও অনন্ত ব্যক্তিবৃত্তি হইয়া ব্যক্তিঘনরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে। সে দিন ঐ অদূরে। যে 'অনবস্থা' ছিল দোষ, আজ তাহাই পুরুষোত্তমদর্শনের স্পর্শে 'মহাওপাধতে'। পুরুষোত্তম-বাদুকরের মোহন যষ্টিস্পর্শে সর্ব্বদর্শনের সর্ব্বদোষ আজ মহাগুণ।

সমবায় আস্বাদন করিতে হইলে চাই ব্যক্তির বুকে জাতিত্ব (সামান্য, Genus) আশ্রিতত্ব প্রত্যয়ের সাধনা, ব্যাপ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপকের স্থিতি ও উপলব্ধির সাধনা। কৌলীন্যমর্য্যাদাসম্পন্ন জাতি ব্যক্তির আশ্রিত হইতে পারে না, ব্যক্তির বুকে অবতরণ করিতে পারে না, যদি ঐ সমবায় সম্বন্ধ আস্বাদিত না হয়, যদি না উহা 'resides in more individuals than one' ('নিত্যম্ অনেক-ব্যক্তিবৃত্তিঃ'), যদি না eternal জাতি 'whether high or low, is coexistent in the same substratum with the mutual non-existence of its own situation or foundation' ('নিত্যত্বে সতি স্বাশ্রয়ান্যোন্যাভাবসমানাধিকরণং বা পরমপি সামান্যং অপরমপি তথা'—বৈশেষিকের 'সামান্যং বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্'-সূত্রের শঙ্কর মিশ্র কৃত উপস্কার), এবং যদি না সেই 'Genus also takes the name of Species, as for example, at the same time that there is the cognition of reappearance or recurrence, namely, 'This is Substance,' 'This is Substance' and so on, there is the particular cognition that it is not Attribute, that it is not Action etc. so that the nature of species belongs to the genus themselves, e, g, substance-ness etc.' ('সামান্যং বিশেষসংজ্ঞামপি লভতে যথা দ্রব্যমিদং ইত্যাদ্যনুবৃত্তপ্রত্যয়ে সত্যেব নায়ং গুণো নেদং কর্ম্মেতি বিশেষপ্রত্যয়ঃ তথাচ দ্রব্যাদীনাং সামান্যানামেব বিশেষত্বম্')।

'সামান্যং দ্বিবিধং পরমপরঞ্চ। তত্র পরং সত্তা অপরম্ দ্রব্যত্বাদ্যাম্ দ্রব্যত্বাদি, তত্র সামান্যস্য তদ্বিশেষস্য চ লক্ষণং বুদ্ধিরেব'—'সামান্যং বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্' সূত্রে (১।২।৩) শঙ্করমিশ্র।—'Genus is two fold high and low, of which the first is Existence and the second is Substanceness etc., pervaded by Existance.' সামান্য জাতি (Genus) 'অনেক ব্যক্তিবৃত্তি' ('resides in more individuals than one' এবং উহা 'বিশেষসংজ্ঞাং লভতে' ('takes the name of species'), এবং উহা 'স্বাশ্রয়ান্যোন্যাভাবসমানাধিকরণং' ('co-existent in the same substratum with the mutul non-existence of its own situation or foundation'। সামান্য মানবজাতি 'সমবায়' সাধনা দ্বারাই অনন্ত ব্যষ্টি মানবে 'সমভাবে' অবস্থান করিতেছে, এই সামান্য মানবজাতিই আবার 'রাম' 'শ্যাম' নাম ধারণ করিয়া ব্যক্তিসত্তায় প্রাণ খুলিয়া অনুপ্রবেশ লাভ করিয়াছে, এবং ইহাই অ-মানুষ সত্তার সঙ্গে সম-অধিকরণে স্থিত থাকিয়া 'অন্যোন্যাভাব'-রস আস্বাদন করিতে করিতে ব্যাপকতর সমবায়ের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। এই 'স্বাশ্রয়ান্যোন্যাভাব'ই সূত্রোক্ত 'অনবস্থিতেঃ' সামান্যতর

ও সামান্যতমের সঙ্গে সমবেত হইয়া, প্রত্যেকের স্ব স্ব আশ্রয়-অবস্থানকে অভাব-সাধনার ভিতর দিয়া বাঁচাইয়া দিয়া জীবনের পথে অগ্রসরই হইতেছে। 'সামা ও অনবস্থিতি'ই বিশ্বসঙ্ঘ, বিশ্বসমবায় গঠনের মূল রহস্যকথা।

কিন্তু পরমাণু-অবয়ব হইতে অবয়বী দ্ব্যণুকের, অনন্ত ব্যক্তি হইতে জাতির উৎপত্তি এবং ব্যক্তির বুকে সমবায়ের ভিতর দিয়া জাতির অবতরণ কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না, দুই-ই দুইয়ের নাগালের বাহিরেই থাকিবে যদি পরমাণু-দ্ব্যণুক, ব্যক্তি-জাতি ব্যাপকতর জীবন-সত্তার মাঝে L. C. M-এর সমবায়ে সমবেত না হয়। অণুর সঙ্গে অণুর, কিম্বা অণুর সঙ্গে দ্ব্যণুক ত্র্যণুক চতুরণুকের, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে জাতির, এবং জাতির সঙ্গে জাতির সমবায় সম্ভব হইতে পারে, মহাজাতিসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতে পারে পুরুষোত্তম-জীবনের সমানাধিকরণেই। সেখানে সবই স্বয়ংমূল্যবান সত্তা লইয়া সম, সকলেই এক অধিকরণে নিজ আশ্রয়ের সঙ্গে অভাবযোগে যুক্ত, তাই 'অনবস্থিত'। এইভাবে ভাব-অভাবের সমবায়েই বিশ্বসংগঠন সম্ভবপর। যদি জীবনের মাঝে পরমাণু-দ্ব্যণুক-মহদ্ভূতের অবস্থান না থাকিত, তবে সমবেত হইবার প্রবৃত্তিই (urge) জাগ্রত হইত না, কেহই পরস্পরের জন্ম-জনক হইতে চাহিত না, পারিতও না। পুরুষোত্তম-জীবনই সকলকে স্ব স্ব আশ্রয়ে অধিষ্ঠিত রাখিয়া অথচ প্রত্যেককেই আবার স্ব স্ব আশ্রয়চ্যুত করিয়া অবস্থান-অনবস্থানের সমন্বয়ে, উপনিষদ্যুক্ত নিলয়ন-অনিলয়নের সমন্বয়ে দিব্য ব্রহ্মধাম গড়িয়া তুলিতে সক্ষম। ব্যক্তির কাছে জাতি থাকিত অথচ, জাতিও ব্যক্তিকে ধরিয়া ফেলিতে পারিত না, যদি না উভয়ে জীবনের মধ্যে সমবেত হইত। ব্যক্তিসমূহের সংযোগে 'জাতি' হয় না, জাতির বিভাগেও 'ব্যক্তি' হয় না, যদি না ব্যক্তি ও জাতি সংযোগ-বিয়োগ-সমন্বিত পরকীয় সমবায়সাধনাশ্রয়ে জীবনে তাহারা সমবেত হইত। অত্যন্ত-ভিন্নতা যেখানে অত্যন্ত-অভিন্নতার সঙ্গে সমবেত, একত্ব ও একপৃথক্ত্ব যেখানে সমবেত, তাহাই পুরুষোত্তম-জীবন। তখন বৈশেষিক দর্শনেরই ঘন আস্বাদন এই পুরুষোত্তমদর্শন।

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্ত্য সাধনা যে কর্মের ভিতর দিয়া 'সমবায়' গড়িতে পারিতেছে না, তাহারও মূলে রহিয়াছে বৈশেষিকদর্শন-প্রচারিত সমবায় সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অপূর্ণতা। কর্ম-কর্মীর নিত্যসম্বন্ধই সমবায়। কিন্তু যে-সমবায়ের ফলে কর্মের সঙ্গে কর্মের এবং কর্মের সঙ্গে কর্মীর সমবায় সম্ভবপর, সেই সমবায়ের তত্ত্বজ্ঞান যদি কর্মের তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে স্বয়ংমূলো সমবেত না হয়, কেমন করিয়া কর্ম-কর্মীর সমবায় হইবে? 'নিষ্ক্রিয়ানাং সমবায়ঃ কর্মতো নিষিদ্ধঃ'—বৈশেষিক ৫।২।২৩।—'(The relation) of the inactive (i, e. Attribute and Action), (to Substance) is Combination, (which is) independent of action. 'নিষ্ক্রিয়দের বস্তু সম্বন্ধই সমবায়, তাহা কর্ম হইতে নিষিদ্ধ'। 'তস্য সম্বন্ধস্য উৎপত্তিরেব নাস্তি যুতে তু কর্মাধীনতা' ইত্যাদি। কেবল মাত্র কর্মদ্বারা কেহ সমবেত হইতে পারে না, কর্মক্ষেত্রে সঙ্ঘ রচনা করিতে পারে না, যদি না কর্মের মতই সমবায়েরও এক স্বতন্ত্র পদার্থত্ব স্বীকার করা হয়। কর্মের সঙ্গে কর্মের, একের কর্মের সঙ্গে বিশ্বের কর্মের, কর্মের সঙ্গে কর্মীর সমবায় তবেই সম্ভব হইতে পারে, যদি প্রতিটী কর্ম নিজের মধ্যে বিশ্বকর্মের আস্বাদন করিয়া 'সম' হয়, এবং সামান্যাবাপন্ন এইসব বিশ্বকর্ম-কর্মসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আশ্রয়াশ্রয়ীভাব সাধন স্ফুরিত হয়। কর্মে কর্মে সমতাও যেমন আছে, নিজের আশ্রয়ভূমির সঙ্গে তাহার 'অভাব' সম্বন্ধও তেমনি আছে। এই সমত্ব ও অনবস্থিতির ভিতর দিয়াই পুরুষোত্তমকর্ম অনাদি-অনন্ত লীলাপদবাচ্য।

—ব্রহ্মসূত্র : অবয়ব ভাষ্য ; পৃঃ ৩৯১-৯৬

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম পোঃ দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

উৎকলভারত

চৈত্র, ১৮৮৩ শকাব্দ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

প্রাণনিত্যগোপাল

॥ শ্রীপ্রতিভা রায় ॥

প্রাণ-রস ধারার প্রাবিত পুণ্যভূমি পাণিহাটি। বহুদিন হইতেই পাণিহাটির বুকে গোপন প্রাণ প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, সেই জন্যই বাঙ্গালীর পুণ্যতীর্থ পাণিহাটি। অদ্যও প্রতি বৎসর পাণিহাটিতে যে দণ্ড মহোৎসব হয় উহাও তো এই প্রাণের খেলারই অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। যে দিন বাঙ্গলার প্রাণ নিমাই সন্ন্যাস লইয়া বাঙ্গলা ছাড়িয়া চলিয়া যান, সেদিন মায়ের আদেশে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রাণপ্রিয় গৌর-সুন্দরকে বিদায় দিয়া নদীয়া তথা বাঙ্গলার ভক্তবৃন্দ গৌরাঙ্গ বিরহে আকুল হইয়া প্রতি বৎসর তাঁহাকে দর্শন করিতে জগন্নাথের রথযাত্রার পূর্ব্বে সকলে পুরীধামে যাইতেন। সেই সময় এই পাণিহাটি গ্রাম হইতে রাঘব পণ্ডিত ভগিনী দময়ন্তী প্রদত্ত প্রীতির কোলা সাজাইয়া লইয়া প্রতি বৎসর মহাপ্রভুকে উপহার দিতেন। রাঘবের কোলা মহাপ্রভুর পরম প্রীতির ও আনন্দের বস্তু ছিল সেই কোলার ভিতর থাকিত প্রতিটি দ্রব্যে প্রাণের স্পর্শ, কতই না প্রেম ভক্তির প্রতীক ছিল সেই বস্তুগুলি। কোলার ভিতর থাকিত কত রকমের আচার, কত রকমের বড়ি, কত রকমের নাড়ু, কাসন্দ আদি কত কি সামগ্রী সারা বৎসর ধরিয়া রাঘবকার যে জিনিষ যেমনভাবে তৈরী করিয়া যত্ন করিয়া রাখিলে মহাপ্রভুর ভোগে লাগে দময়ন্তী দেবী তাহাই করিতেন। আর বৎসরান্তে ভক্তবর রাঘব সেই প্রীতির কোলা আনন্দের সহিত বহন করিয়া লইয়া যাইতেন মহাপ্রভুর নিকট। প্রাণমূর্ত্তি মহাপ্রভুর নিকট এই প্রাণস্পর্শপূর্ণ ছোট জিনিষগুলির কি মূল্য, কি আদরই না ছিল। যে পুণ্যভূমি পাণিহাটি হইতে এই প্রাণের অর্ঘ্য মহাপ্রভুর নিকট গিয়াছে, সেই পুণ্যভূমিকে আদর করিতে, গৌরব দান করিতে গোপন প্রাণ আসিয়াছিলেন ১২৬১ সনের চৈত্র মাসের বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে শ্রীনিত্যগোপাল রূপে।

প্রাণ সর্ব্বস্বহরী; সর্ব্বকে সে শোষণ করে, শোষণ সেখানে নাই। বিশ্বপ্রাণ নিত্যগোপাল বলিয়া গিয়াছেন "জড়াজড়" সমন্বয়ের কথা, উহার ভিতরই রহিয়াছে প্রাণের পূর্ণ প্রকাশ। তিনি জড়কে দিয়া অজড়ের শোষণ, অজড়কে দিয়া জড়ের শোষণ যাহাতে বন্ধ হয়, বিশ্বভ্রাতৃত্ব যাহাতে স্থাপিত হয় তাহার জন্যই এই ব্যাপক ও গভীর সমন্বয় তত্ত্ব বলিয়া গিয়াছেন, যাহার মাধ্যমে বিশ্ববাসী আদর্শ ও বাস্তবের গলাগলি ধরিয়া বিশ্বের প্রাণ প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়া মুক্ত বিশ্বের রসাস্বাদনে ধন্য হইবে।

প্রাণের কোন চোখ ঝলসানো ঐশ্বর্য্য নাই। প্রাণের ঐশ্বর্য্য বিপুল কিন্তু দম্ভ বড়ই কঠিন! সেইজন্যই নিত্য-গোপাল আসিয়াছিলেন গোপনে ভাগিরথী-চুম্বিত পুণ্য পাণিহাটি গ্রামে মাতুল নবীনকৃষ্ণের গৃহে। পিতা জয়েজয় বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী এবং রাজধানী কলিকাতায় আহিরীটোলায় তাঁহার বিরাট বাড়ী। তাহা থাকা সত্ত্বেও নিত্যগোপাল আসিলেন গোপনে মাতুলগৃহে পাণিহাটি গ্রামে। মাধুর্য্যের খনি শ্রীনিত্যগোপালের কত ঐশ্বর্য্যের লীলা পাণিহাটিবাসী এবং পরিজনবর্গ অহরহ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু বিমুগ্ধকারী প্রাণের যাদুস্পর্শে তাহা তাঁহারা জগৎ ঐশ্বর্য্য বলিয়া বুঝিতেই

পারেন নাই। আড়াই বৎসরের শিশু নিতাগোপালের নির্বিকল্প সমাধি হইল, দেহ একেবারে স্পন্দনহীন, শোকের কালছায়া সমস্ত পরিবারকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। মাতা পৌরী দেবী ও পিসিমা আনন্দময়ী, মূর্ছাহারা হইয়া আকুল হইয়া পড়িলেন। নিতাগোপালের দেহে কোনও স্পন্দন না থাকিলেও দেহের উষ্ণতা রহিয়াছে দেখিয়া তিন দিন পর্যন্ত সেই পরম সুন্দর অতি আদরের দেহখানিকে গভীর শোক-দুঃখের আবরণে আবৃত করিয়া যত্নে রক্ষা করিলেন। সেদিন পরিবারবর্গ দেহের সৎকার করিবার মনস্থ করিলেন, সেইদিন অকস্মাৎ এক জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, এই বালকের উহা মৃত্যু নহে, যোগীজনবাঞ্ছিত নির্বিকল্প সমাধি, দেহ সযত্নে রক্ষা করুন, ইহা বলিয়া যতিবর অন্তর্ধান হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর সেই পরম সুন্দর নিতাগোপাল পরিজনবর্গের শোক অপনোদন করিয়া স্নিগ্ধ মধুর মনোমোহন আঁখি দুটি মেলিয়া আত্মীয়গণের মৃতপ্রায় প্রাণে অমিয় সিঞ্চন করিলেন। ইহা মানুষ্য-বর্জিত প্রাণেরই ঐশ্বর্য্য-লীলা। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে নির্বিকল্প সমাধি খুবই ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক, কিন্তু প্রাণের তো উহা স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ, প্রাণ তো চায় বিশ্বের সহিত এক হইতে, নিজকে বিলাইয়া দিয়া নাই হইয়া যাইতেই। প্রাণ অণু হইতেও অণু, মহৎ হইতেও মহান্। সে কোথায় নাই, সে তো বিশ্বে ছড়াইয়া রহিয়াছে, অথচ প্রাণের তো কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। একটি পিপীলিকাতেও যিনি প্রাণরূপে, বিশ্বের ক্ষেত্রেও তিনিই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মরূপে। আমরা ঐশ্বর্য্য-মুগ্ধ জীব, ঐশ্বর্য্যেই মুগ্ধ হইতে চাই, প্রাণ তাই আমাদের নিকট থাকেন অপরিচিত, অজ্ঞাত। কিন্তু মূর্খ আমরা তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কি নির্ণয় করিব? এই বিরাট বিশ্বের রচয়িতা যিনি, প্রতি মুহূর্ত্তে যে বিশ্বে কত অঘটন ঘটিতেছে, যে বিশ্ব-রহস্য এত অত্যাশ্চর্য্য যে, যাহা যুগ যুগ ধরিয়া মহা মহা মনীষীগণ যাহার তত্ত্ব জানিয়া কূল কিনারা করিতে পারেন নাই, সেই প্রাণের খেলা আমরা সামান্য জীব কি বুঝিব। ব্রহ্মা পর্য্যন্ত ব্রজে এই পূর্ণ প্রাণের প্রকাশ গোবিন্দকে শ্রম নিরসনের জন্য একদিন গো এবং গোপবালকদিগকে চুরি করিলেন। যখন দেখিলেন পূর্ণপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় গো এবং গোপবালকদিগকে সৃষ্টি করিয়া নাচিতে নাচিতে ব্রজকুল চন্দ্রমা গোষ্ঠ হইতে বাড়ী ফিরিলেন, তখন ব্রহ্মার শ্রম নিরসন হইল। আমরা সেই মহাপ্রাণের ছোট ছোট ঘটনাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার ছোটর প্রতি স্নেহ এবং সৌন্দর্য্যজ্ঞানের কথা ধ্যান করিয়া, নিজকে তাঁহার স্নেহে পরিপ্লুত করিয়া ধন্য হইতে চাই।

প্রাণধন নিতাগোপাল পানিহাটি গ্রামে এক আনন্দের হাট বসাইয়াছিলেন। এমন সুন্দর মনোমুগ্ধকর বালক, পানিহাটির স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া এত অপূর্ব্ব লীলাবিলাস করিয়াছিলেন। মানুষ শুধু ঐ শিশুটীর প্রতি আকৃষ্ট হন নাই, বনের বিষধর সর্প, বৃক্ষে বিচরণকারী বানর পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গ লাভের প্রয়াসী হইয়া তাঁহাকে নিজেদের কাছে পাইবার চেষ্টা করিয়াছে। মাতা এবং মাতামহীর বড় আদরের গোপালকে তাঁহারা অতি যত্নে অতি শুশ্রূষাচারে পালন করিয়াছেন। নিতাগোপালের ধাইমা ছিলেন নীচ বংশীয়া, কিন্তু নিতাগোপালকে আদর করিয়া খাওয়াইতে তাঁহার মাতৃহৃদয় বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিত এবং নিজের হীনতায় বেদনায় বুক ভরিয়া যাইত। অন্তর-দেবতা নিতাগোপাল ধাইমার এই অন্তরের বেদনা অনুভব করিলেন, তাঁহার নীরব প্রাণের বেদনা নিতাগোপাল উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; একদিন বেলা দুই প্রহরের সময়—সেদিন ধাইমার ঘরে কিছুই ছিল না, শুধু শাক ভাত রান্না করিয়া আহার করিবেন আয়োজন করিয়া লইয়াছেন—এমন সময় কোথা হইতে চঞ্চল বালক নিতাগোপাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বজনবৎসল নিতাগোপাল আসিয়াই আব্দার ধরিলেন—"ধাইমা, আমার বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে আমাকে কিছু খাইতে দাওনা"। ধাইমা তো অবাক! এ শিশু বলে কি? আমি তাহাকে খাইতে দিব, তাহাকে দিবার মত কিছুই আজ আমার ঘরে নাই, আমি নীচ বংশীয়া, আমার হাতের শাক অন্ন তো গোপালকে দিতে পারিব না। এই ভাবিয়া ধাইমা কিছুকাল

স্তম্ভিত অবস্থায় রহিলেন। তাহা দেখিয়া চপল বালক অনুনয় করিয়া বলিলেন, ধাইমা, তুমি চুপ করিয়া রহিলে কেন? আমার যে বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে, আমাকে যা হয় কিছু খাইতে দাও! ধাইমা বলিলেন, বাবা গোপাল, আমার ঘরে তো তোমাকে দিবার মত কিছু নাই, তোমার ধাইমা যে বড় দরিদ্র, শুধু শাক ভাত রান্না করিয়াছি, উহা তোমাকে দিতে পারি না, আমি নীচ জাতি, তোমার মা দিদিমা জানিলে রাগ করিবেন। গোপাল কোন কথাই শুনিলেন না, আমি ঐ শাক ভাতই খাইব, আমাকে দাও, শাক ভাত আমি খুব ভালবাসি ইত্যাদি বলিলেন। ধাইমার মাতৃহৃদয়! গোপালের কথায় সকল বিশ্ব জগৎ ভুলিয়া গিয়া গোপালকে কোলে বসাইয়া আদর করিয়া সেই শাক ভাত খাওয়াইতে লাগিলেন। ধাইমার চির আকাঙ্ক্ষিত ধন গোপালকে পাইয়া সে আত্মহারা, গোপালেরও সে কি আনন্দ ধাইমার শাক ভাত খাইয়া। বলিলেন, ধাইমা তোমার শাক ভাত খাইয়া আমি বড়ই পরিতৃপ্ত, শাক ভাত যে এত সুস্বাদু হইতে পারে তাহা তো জানিতাম না। ওগো চতুর, তুমি সবই জান, ভক্তের দেওয়া কলার খোসা, ভক্তের দেওয়া ক্ষুদ্র ভাজা, ভক্তের শাক কণা সবই তোমার নিকট অমৃত।

সহসা ধাইমার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, মাতা গৌরীমণির মুখের গোপাল ডাক শুনিয়া। ভক্ত ভগবান দুইজনেই চমকিত হইয়া উঠিলেন মাকে দেখিয়া। গৌরীমণি অনেকক্ষণ নিত্যগোপালকে না দেখিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে ধাইমার বাড়ী আসিয়া এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া গোপালকে ধমক দিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন, মায়ের ভয়ে ভীত শিশু নীরবে মায়ের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। ধাইমা বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন। যুগে যুগে এমনি করিয়াই তো তিনি ভক্ত-জনের মর্য্যাদা দান করিয়া আসিয়াছেন এবং যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ বলিয়া ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি কেমন করিয়া ধাইমা নীচ জাতি বলিয়া তাঁহার বাসনা অপূর্ণ রাখিবেন, যিনি আসিয়াছেন সর্ব্বজাতি সমন্বয় করিতে, যিনি আসিয়াছেন মানুষের মর্য্যাদা দিতে, যিনি আসিয়াছেন ছোটর মূল্য দিতে? প্রাণের মূল্য স্বীকার করিতে কেমন করিয়া ধাইমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করিবেন? নিত্যগোপালের প্রত্যেকটি চলন বলন আলোচনা করিলে দেখা যায় একদিকে তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্যের খেলা অন্যদিকে মাধুর্য্যের ধনি নিত্যগোপালের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য মণ্ডিত প্রাণের লীলা। অজড়-চুম্বিত জড়ের এই গৌরব দান ভাবিলে অবাক হইতে হয়।

পরবর্ত্তী কালে শ্রীনিত্যগোপাল যখন গুরুরূপে সকলের নিকট নিজের স্বরূপ কিছু কিছু প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সেই সময়ের একটি ঘটনা। তিনি তখন শ্রীধাম নবদ্বীপে আমপুলিয়া পাড়াতে থাকিতেন। তাঁহার শিষ্য পূজ্যপাদ নগেন্দ্রনাথ প্রামাণিকের মুখে শোনা ঘটনা। নগেনবাবুর বাড়ী ছিল শান্তিপুর, তিনি একদিন তাঁহার এক বন্ধুর সহিত নবদ্বীপ বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। সেই বন্ধুটী ছিলেন নবদ্বীপবাসী এবং শ্রীনিত্যগোপালের শিষ্য। রাত্রি তখন ১২টা—আমপুলিয়া পাড়ার রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে বন্ধুটি বলিলেন, নগেন, চল, এইখানে এক সাধু থাকেন তাঁহাকে দেখিয়া যাই, এই বলিয়া নগেনবাবুকে সঙ্গে করিয়া আমপুলিয়া সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। এদিকে সেই দিন কলপাম নিত্যগোপাল তাঁহার এক আশ্রিতা মহিলাকে ডাকিয়া বলিলেন—তুলি, আজ আমার খুব ক্ষুধা পাইয়াছে বেশী করিয়া ভাত রান্না করিবি। তাহাই হইল। নিত্যগোপাল রাত্রে খাইতে বসিয়া বার বার ভাল তরকারী ভাত চাহিয়া তিন জনের আস্বাদ্য জিনিষ লইলেন। নিজে যাহা খাইবার তাহা খাইয়া আর দুই জনের আস্বাদ প্রসাদ লইয়া অত রাত্রে পর্যন্ত বসিয়া রহিলেন। নগেনবাবুরা আশ্রমে ঢুকিতেই তিনি বলিলেন, তুলি, দেখ তো শান্তিপুর হইতে দুইজন ভক্ত আসিয়াছেন এই প্রসাদ লইয়া তাহাদিগকে খাইতে দাও। তখন সেই মহিলাটী বলিয়াছিলেন, এতক্ষণে আপনার খুব ক্ষুধা পাইয়াছে তাহার অর্থ পাইলাম। রাত্রি ১২টায় যাইয়া নগেনবাবুরা এই ভাবে প্রসাদ পাইয়া আশ্চর্য্য হইলেন

এবং ঠাকুরের অহৈতুকী করুণা স্মরণ করিয়া আনন্দে পরিপ্লুত হইলেন। পরের দিন প্রাতে নিত্যগোপাল নগেনবাবুকে বলিলেন, গঙ্গা স্নান করিয়া আইস। তখন আশ্রমবাসী ভক্তেরা বলিলেন—নগেনবাবু, তোমার উপর ঠাকুরের কি করুণা, তিনি আজ তোমাকে দীক্ষা দিবেন। এইভাবে অযাচিত করুণার করুণাময় নিত্যগোপালের চরণে আশ্রয় পাইয়া নগেনবাবু ধন্য হইলেন।

এমনই করিয়াই ভক্তদের জন্য তিনি মায়ের প্রাণ লইয়া বসিয়া থাকিতেন। একবার নিত্যগোপাল তখন হুগলী মঠে, একদিন মঠে ছানার পোলাও হইবে সংবাদ হইল। সেই সময় পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ সেখানে ছিলেন, তিনি তখন দুধের কোন জিনিষই খাইতেন না। তাঁহার কথা ছিল যে দিন দেশের সকলে মিলিয়া দুধ এবং দুগ্ধজাত মিষ্টান্নাদি খাইতে পারিবে, সেই দিন খাইব। নিত্যগোপাল তাহা জানিতেন। তিনি তুলিকে ডাকিয়া বলিলেন—"তুলি, কি হবে? ছানার পোলাও যে হবে শরৎ যে ছানার জিনিষ খায় না"? তখন তুলি বলিলেন আমি শরৎকে যাইয়া বলিতেছি, আপনি দুঃখ পাইবেন জানিলে সে নিশ্চয় খাইবে। তিনি সেই কথা পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজকে যাইয়া বলিলেন, শরৎ, আজ ছানার পোলাও হইবে তুমি ছানার জিনিষ খাও না, ঠাকুর দুঃখ করিতেছেন। পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ বলিলেন, তুমি ঠাকুরকে যাইয়া বল আমি ছানার পোলাও খাইব। নিত্যগোপালের প্রীতি ছাড়া পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে আর কিছু ছিল না। তাঁহাকে তিনি বেদনা দিতে পারেন? খাওয়া না-খাওয়ার সংস্কার-মুক্ত জীবন পুরুষোত্তমানন্দের ছিল। সে দিনের সেই মাতৃ হৃদয়ের কথা পুরুষোত্তমানন্দ কত হাজার বার যে চোখের জলে আমাদের নিকট বলিয়াছেন, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। এক ভক্ত একদিন একটি মোচা দিয়াছিলেন ঠাকুর ভোগের জন্য। ঠাকুর বলিলেন একলা খাইব, সুখ না পাইব। এতটুকু মোচা এত লোকের মধ্যে কি করিয়া হইবে? বাজার হইতে আরো মোচা আনাইয়া ঐ মোচা সহ সকলে আমোদের সহিত প্রসাদ পাইলেন। এইরূপ কত অসংখ্য ছোট ছোট ঘটনার ভিতর দিয়া তাঁহার প্রাণের প্রকাশ পাইত।

এইরূপে শ্রীনিত্যগোপালের ছোট ছোট ঘটনার ভিতর দিয়া যেমন প্রাণের প্রকাশ ছিল, আবার অন্য দিকে কত বিভূতি তাঁহার ভক্তগণ দর্শন করিয়াছেন। তিনি কত পতিতকে, কত মূর্খকে কোলে টানিয়া লইয়া কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন। মূর্ত প্রাণ আসিয়া প্রাণের স্পর্শ দিয়া জীবন পথে চলিবার পথের ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। প্রথমে একটা স্পর্শ না পাইলে মানুষ কাহার টানে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিবে? তাঁহার দিব্য দর্শনের ভিতর দিয়া স্বরূপে পৌঁছিবার পথ নির্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন আবার বলিয়াও গিয়াছেন—"এক ব্যক্তি হীরক পাইয়াছে, অথচ সে হীরক চেনে না সুতরাং সে হীরকের মর্ম বোঝে না। ছদ্মবেশী ভগবান পাইয়াছ, অগ্রে তাঁহাকে চেন, তবে তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিবে। শ্রীনিত্যগোপাল তত্ত্বরূপে যে জীবন ও দর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, আজ আমাদিগকে সেই তত্ত্ব-জীবন নিজ নিজ জীবনের ভিতর লইতে হইবে। নতুবা দিব্য দর্শনের মধ্য দিয়া ভাবের 'পাওয়া' বাস্তবের ধাক্কায় ধূলিসাৎ হইবে, জীবন ব্যর্থ হইবে, তাঁহার আসার কোনও ব্যাখ্যাও মিলিবে না, যদি বাস্তবের রূপে রসে তাঁহাকে রূপায়িত না করি। শ্রীনিত্যগোপাল আমাদের উপর এই দায়িত্ব ভারই অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, নর এবং নারায়ণ মিলিয়াই এই জগৎকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভাবরূপী পুরুষ অবতরণ করিয়াছিলেন এই ধূলি-মলিন বাস্তব ধরার বুকে, তাঁহাকে যদি আমরা বাস্তবের রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ দিয়া বরণ না করি তবে তো তিনি ভাবের ঠাকুরই থাকিয়া যাইবেন, ধরার জ্বালা, বাস্তবের ক্ষুধা তো মিটিবে না। তাঁহার জড়াজড় সমন্বয় জীবনের ক্ষেত্রে, বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতে হইবে। নিত্যগোপাল, প্রাণগোপাল, জয় হউক তোমার।

সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল

॥ অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

(শ্রীনিত্যগোপালের ১০৭তম জন্মতিথিতে ১৯৮১ সালের ২৫শে মার্চ মহানির্বাণ মঠের আহূত সভায় পঠিত।)

পরম ভাগবত সভাপতি মহাশয়, মাননীয় প্রধান অতিথি, সমবেত মাতৃমণ্ডলী ও সজ্জনবৃন্দ—

প্রতি বৎসর এমনি বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে যে মহাপুরুষের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জন্য আমরা সমবেত হয়ে থাকি, শতাধিক বর্ষ পূর্বে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত পাণিহাটি গ্রামে মাতুলালয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীনিত্যগোপালের দিব্য জন্ম ও কর্ম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে গেলেই আমার মনে আসে তাঁর প্রিয়তম আশ্রিত সন্তান শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের কথা। বছর তিন পূর্বে এমনি এক সভায় পুরুষোত্তমানন্দজী শ্রীনিত্যগোপালের কথা আলোচনাকালে গুরুতরভাবে পীড়িত হন এবং এর একদিন পরেই তাঁর দেহাবসান ঘটে। উভয়কে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করে শ্রীনিত্যগোপালের জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে দু একটি কথা উপস্থাপিত করার চেষ্টা করছি।

শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন যখন অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সত্য ধর্মে গ্লানি প্রবেশ করে তখন আমি মানবদেহ নিয়ে অবতরণ করি। তাঁর যেমন নির্বিশেষরূপ আছে, তেমনি বিশেষ রূপও আছে। এই বিশেষ রূপেরই প্রকাশ শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীশঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীনিত্যগোপাল।

শ্রীনিত্যগোপাল আবির্ভূত হলেন মাতুলালয়ে পাণিহাটি গ্রামে। মাতামহী নাম রাখলেন নিত্যগোপাল। আট বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগের পর দুরন্ত বালক নিত্যগোপাল-জীবনে গাম্ভীর্য নেমে এল। এর পর কলিকাতায় এসে পড়াশুনা আরম্ভ করলেন বটে কিন্তু বেশীদিন চালাতে পারলেন না। প্রবল অন্তর্মুখীনতার টানে কালীঘাট ত্রিকোণেশ্বর মন্দিরে পরমহংসাচার্য ব্রহ্মানন্দ অবধূত মহারাজের নিকট একদিন শ্রীনিত্যগোপাল দীক্ষা নিলেন। এর পর শ্রীনিত্যগোপাল পুরুষোত্তম ক্ষেত্র থেকে হিমালয় থেকে আরম্ভ করে কুমারিকা পর্যন্ত ভারতের সকল তীর্থ পর্যটন করেছিলেন। এই সময় তিনি ভারতের ধর্মশাস্ত্রগুলি অধ্যয়নও আরম্ভ করেন। পরবর্তীকালে দেখা গেছে বিশেষ কোন গ্রন্থ কাছে না থাকলেও তিনি স্থান বিশেষ পৃষ্ঠাসংখ্যাসহ উদ্ধার করতেন।

শ্রীভগবানের মধুর নাম চিরদিন ধরেই আছে, মানুষ তা শুনেও থাকে কিন্তু সময়ে সময়ে কারো কারো মুখে সেই চিরপুরাতন নামই এমন নূতন সুরে বেজে ওঠে যে, মানুষ অবাক হয়ে বলে—আজ ও নাম নূতন শুনলাম। সাড়ে চার শত বৎসর পূর্বে শ্রীচৈতন্যের মুখে একদিন হরিনাম এমনি মধুক্ষরী হয়ে বেজেছিল—নিমাইয়ের মুখে হরিনাম শুনে তাই জগাই-মাধাইয়ের পাষাণ প্রাণও দ্রবীভূত হ'ল। তারা সকলে বললে—এমন সুধানাখা হরিনাম নিমাই কোথা হতে এনেছে। শ্রীনিত্যগোপালের আবির্ভাবের সঙ্গেও একদিন অনেকদিনের জানা কথা নূতন অর্থ, নূতন ব্যঞ্জনা, নূতন ইঙ্গিত নিয়ে প্রকাশ পেল।

অল্পবয়সেই শ্রীনিত্যগোপাল সন্ন্যাস নিলেন, তাঁর সন্ন্যাস আশ্রমের নাম—শ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেব। কিন্তু তিনি শ্রীগুরুর কাছে অনুমতি নিলেন সন্ন্যাস বেশ ইচ্ছামত পরবেন। শ্রীনিত্যগোপালের কাছে সন্ন্যাস বেশটাই বড় ছিল না। তিনি লিখছেন—"সন্ন্যাস স্বভাবে। শিখাসূত্র ও গৃহস্থের পরিচ্ছদ ত্যাগ করলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। মহাসিদ্ধাবস্থায় গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস এক বলিয়া বোধ হয়।" সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য দুটো

মনোবৃত্তি মাত্র। দুটো অবস্থাই মানুষের মধ্যে রয়েছে, তবে এক এক জনের মধ্যে এক একটার মাত্রাধিক্য। যেটার আধিক্য, সেই নামে, সেই রূপে মানুষ পরিচিত হয়। মুস্কিল হয়েছে মাত্রার কথাটা ভুলে গিয়ে। আধিক্য যার কম, মানুষ তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে যায়—আর তাইতেই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে জীবনকে সে জটিল ও অসত্য করে তোলে।

শ্রীনিত্যগোপালের আবির্ভাব একটী সুদূর প্রসারী ইঙ্গিতকে বহন করে এনেছিল যা একই সঙ্গে আধ্যাত্মিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন তিনি প্রত্যেক মতবাদের বিশিষ্টতা রক্ষা করে সবগুলির মধ্যে প্রত্যেককে বিধৃত করে এক ব্যাপকতম সমন্বয়ের সংবাদ রেখে গেছেন, তেমনি তিনি সমাজের ক্ষেত্রেও প্রতি জাতির বিশিষ্ট স্থান ও মান রক্ষা করে সর্বজাতিসমন্বয়ের বার্তা রেখে গেছেন। শাস্ত্রীয় চতুর্বর্ণকে বিকৃত করে আমরা দেশকে সমাজক্ষেত্রে ছিন্ন ভিন্ন করেছি। শ্রীনিত্যগোপাল শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ জাতিভেদের অসারত্বতা প্রমাণ করে গেছেন। শ্রীনিত্যগোপাল বর্ণ-বিভাগ স্বীকার করেন কিন্তু কাহারও কৌলীন্য, অর্থাৎ কেহ বড় কেহ ছোট স্বীকার করেন না। জীবন্ত বিশ্বে প্রত্যেকের সমান অধিকার, সমান মর্য্যাদা, সমান প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের উচ্চ নীচ ভেদবাদ অস্বীকার করে শ্রীনিত্যগোপাল দার্শনিক যুক্তির দ্বারা প্রকৃত সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'জাতিদর্পণ' গ্রন্থে তিনি লিখছেন—"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এক ব্রহ্মার কায়াই নানাপ্রকার হইয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র অভেদ। সেইজন্য ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়তা বৈশ্যতা শূদ্রতা আছে। সেইজন্য ক্ষত্রিয়েতেও ব্রাহ্মণতা, বৈশ্যতা, শূদ্রতা আছে। সেই জন্যই শূদ্রেতেও ব্রাহ্মণতা, ক্ষত্রিয়তা বৈশ্যতা আছে। সেইজন্যই বলি ব্রাহ্মণও সর্ববর্ণ, ক্ষত্রিয়ও সর্ববর্ণ, বৈশ্যও সর্ববর্ণ, শূদ্রও সর্ববর্ণ। প্রকৃতপক্ষে নানা জাতি নহে, প্রকৃতপক্ষে একই জাতি। কোন বৃক্ষের উর্দ্ধভাগের ফল যে জাতীয়, সেই বৃক্ষের নিম্নভাগের ফলও সেই জাতীয়। সমস্ত বৃক্ষের সর্বভাগের ফল এক জাতীয়। সেইজন্য ব্রহ্মার দেহজাত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এক জাতীয়। ব্রাহ্মণও মনুষ্য, ক্ষত্রিয়ও মনুষ্য, বৈশ্যও মনুষ্য, শূদ্রও মনুষ্য। সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এক মনুষ্য জাতি।"

শ্রীনিত্যগোপালের জীবন ও দর্শন মায়াবাদের প্রতিবাদ। আজ হতে প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে শ্রীনিত্যগোপাল মায়াকে নিত্য সত্য বলে এক ব্যাপক বিপ্লবের সূত্র রেখে গেছেন। অধ্যাত্মবাদী ভারতের বুকে দাঁড়িয়ে এত বড় ঘোষণা যে কী দুঃসাহসের কথা, আজিকার আবেষ্টনের মধ্যে থেকেও তা কল্পনা করা শক্ত। ভারতীয় অদ্বৈত বেদান্ত মায়ার ক্ষেত্রকে পারমার্থিকভাবে সত্য বলে স্বীকার করেন না। শঙ্করের মায়াবাদ অজড়ের অতিমাত্রায় মূল্য দিয়ে জড়কে জগৎকে প্রকৃতিকে মিথ্যা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। জড়ের যদি কিছু প্রয়োজন থাকে তা ব্যবহারিক, কিছুদিনের জন্য প্রথম অবস্থায়। এদেশে ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সত্য বস্তু। তাই এদেশে সংসার করার অর্থ ভূতের বেগার খাটা। সংসারকে যারা এত অবহেলা করে, সংসারের উন্নতি অনুন্নতির সে জাতি কেমন করে করবে?

ব্রহ্ম-মায়ার এই দৃষ্টিতে ভারতের সমাজ গঠিত বলে এদেশের সমাজ পুরুষ-তন্ত্র। পুরুষ-নিরপেক্ষ নারীর কোন স্বাতন্ত্র্য, কোন মান, মূল্য, মর্য্যাদা এখানে নেই। নারী তাই বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন, বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের অধীন—কোন অবস্থায় নারী স্বাধীন নয়। ব্রহ্মজ্ঞান সাধনায় সংসার প্রতিবন্ধক, প্রকৃতি বাধা, নারী পরিত্যাজ্য।

অজড়ের উপাসক অধ্যাত্মবাদী ভারতীয় সভ্যতা ও জড়বাদের উপাসক ভোগবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতা মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে। অজড়ের ধাক্কায় আজ ভারতবর্ষ বিকম্পিত। জড় জগৎকে, প্রকৃতিকে অস্বীকার করার প্রতিক্রিয়ারূপে ব্রহ্মই আজ মিথ্যা হতে বসেছে। কিন্তু উভয়ই একদেশদর্শী। অদ্বৈতের এক প্রান্তে চৈতন্য, অপর প্রান্তে জড়, এক প্রান্তে ব্রহ্ম, অপর প্রান্তে মায়া; এক প্রান্তে আদর্শ, অপর প্রান্তে বাস্তব। এদের কোন এক প্রান্তে অতিমাত্রায় ঝোঁক দিলে, কোন এক প্রান্তকে একান্ত সত্য বলে

ঘোষণা করলে, স্বাভাবিক প্রাণ বিদ্রোহ করে।

এই-ই হল মনবুদ্ধির দর্শনশাস্ত্র। এই দর্শন পরস্পর বিপরীতের একই সময়ে একই স্থানে অবস্থান স্বীকার করে না। একান্ত-চিন্তাই মন-বুদ্ধির ধর্ম—সেখানে হয় এটা সত্য, নয় ওটা সত্য—হয় আলো, নয় অন্ধকার, হয় ব্রহ্ম, নয় মায়া। কিন্তু জীবন্ত বিশ্বের অখণ্ডতাকে এমন করে খণ্ডভাবে সংজ্ঞিত করা যায় না, এখানে কোন water-tight compartment নেই। পরস্পর বিপরীত মিলিয়াই জগতের সৃষ্টি—কেবল কাহার মধ্যে কোনটী কত মাত্রায় আছে, তাহা দ্বারাই তার পরিচয়।

মনবুদ্ধি বলে এক সঙ্গে দুই—আলো-অন্ধকার, ব্রহ্ম-মায়া—সত্য হতে পারে না। প্রাণ বলে দুইই সত্য, দুইই আছে—প্রশ্ন শুধু কাহার মধ্যে কে কতটা মাত্রায় আছে। এ বিশ্বে নিছক ব্রহ্ম বলে কিছু নেই, নিছক মায়া বলে কিছু নেই; একান্ত জড় বলে কিছু নেই, একান্ত অজড় বলে কিছু নেই। শুধু দেখব কতটা ব্রহ্মের মায়ার মধ্যে, কতটা মায়ার ব্রহ্মের মধ্যে। ইহাই প্রাণতত্ত্বের কথা। প্রাণ পরস্পর বিপরীতের সম মান, মূল্য, মর্যাদা দিয়ে, প্রেমের পরশ বুলিয়ে তাদের পারস্পরিক সহাবস্থিতির ব্যবস্থা করে। যন্ত্রের ভূমি মন-বুদ্ধির স্তর ছেড়ে বিশ্ব আজ প্রাণের স্নিগ্ধ শান্তি ছায়ার জন্য ব্যাকুল। শ্রীনিত্যগোপাল এই প্রাণতত্ত্বের মূর্ত বিগ্রহ। তিনি বলেন—ব্রহ্ম সত্য, জগৎও সত্য। স্থিতিধর্মী অপরিণামী ব্রহ্ম যেমন অনাদি অনন্ত, গতিধর্মী পরিণামী প্রকৃতিও তেমনি অনাদি অনন্ত। ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়েও প্রকৃতি মরে নাই, রয়িয়াছে; এমন কোন দিনই হবে না, যে দিন প্রকৃতি মায়া অবিদ্যা নিঃশেষে মুছে যাবে, একমাত্র ব্রহ্ম থাকবেন। স্থিতি থাকলেই গতি থাকবে, আলো থাকলেই ছায়া থাকবে; নির্গুণ থাকলেই সগুণ থাকবে, ব্রহ্ম থাকলেই মায়া থাকবে; আদর্শ থাকলেই বাস্তব থাকবে—এই তত্ত্বটীকে দার্শনিক ভাবে মিলিয়েছেন শ্রীনিত্যগোপাল প্রাণের স্তরে দাঁড়িয়ে। এইই হচ্ছে শ্রীনিত্যগোপাল-প্রবর্তিত সামগ্রিক জীবনবাদ। সিদ্ধান্তদর্শন গ্রন্থে শ্রীনিত্যগোপাল লিখছেন—"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয় ভক্তই ইহার অবতারণা।...সমস্ত অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদক গ্রন্থ আলোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্মমায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে।"

একমাত্র প্রাণের ভালবাসার মধ্য দিয়াই মানুষ এত বড় উদার ও ব্যাপক হতে পারে। প্রেম, প্রীতি, প্রাণের ভালবাসাই পরকে বুকে টেনে নিতে পারে। মনবুদ্ধি কেবল বিশ্লেষণ করে টুকরা টুকরা করে, ভেদ সৃষ্টি করে, diplomacy সৃষ্টি করে। বুদ্ধির কুটিল মারপ্যাঁচে জগতের হাওয়া বিষিয়ে উঠেছে। বুদ্ধির কুটিল খেলায় diplomacy আজ শুধু বিভিন্ন দেশের রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ নেই—পিতা-পুত্রে, শিক্ষক-ছাত্রে, ধনিক-শ্রমিকে, স্বামী-স্ত্রীতে diplomacy চলছে। নিত্য নূতন নিষ্ঠুর ঘাত পৃথিবী উন্মত্ত।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ কি রকমের হলে তা দিব্য জীবন লাভের প্রতিবন্ধক হয় না, ঊর্ধ্বগতির পথে বাধা দেয় না, তার একটু ইঙ্গিত দিয়ে তিনি লিখেছেন—'অন্যের সুখে সুখ বোধ হইলে, অন্যের দুঃখে দয়া হইলে, অন্যের পুণ্যে হর্ষ হইলে এবং অন্যের পাপ উপেক্ষা করিলে চিত্তে যে এক অপূর্ব অমল ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহার তুলনা নাই। সে ভাব প্রফুল্লতাময় চিত্ত প্রসাদ। সেই ভাবময় চিত্ত প্রসাদই সমাধির জনক'—সিদ্ধান্তদর্শন, পৃঃ ২৪৪।

মানুষ যদি এই একটী মাত্র সূত্র আয়ত্ত করার চেষ্টা করে, তবে কি তার জীবনে আর দুঃখ থাকে? পরের সুখে সুখী হওয়া, পরের দুঃখে দুঃখী হওয়া—এই চিত্ত প্রসাদ লাভ করাই আমাদের সাধ্য হোক, এই যেন হয় আমাদের জপ-মন্ত্র। শ্রীনিত্যগোপালের আবির্ভাব জয়যুক্ত হোক, তাঁর প্রবর্তিত সামগ্রিক অখণ্ড জীবনবাদ জয়যুক্ত হোক। সেই মহামানবের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে আপনাদের কাছে বিদায় নিলাম।

শ্রীনিত্যগোপাল

॥ শ্রীরেণুমিত্র ॥

একশত ছয় বৎসর আগে ১২৬১ সালে এই বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে চব্বিশ পরগণা জেলার পানিহাটী গ্রামে এক শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শত শিশুই জন্মায়, কয়জনকে স্মরণ করার অবকাশ হয়? এই শিশুকে কেন আজ স্মরণ করি?

একই বিধাতার একই নিয়মে সৃষ্ট হইলেও, মানুষকে ছাড়া মানুষ বাঁচিতে না পারিলেও, মানুষ বিরাটের প্রতিচ্ছ হইলেও মানুষেরই মধ্যে আবার একটা স্বভাব আছে নিজেকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা, এক মানুষের সঙ্গে আর এক মানুষের ভেদ সৃষ্টি করা, ছোট বড় উঁচু নীচু করিয়া মানুষ দ্বারা মানুষকে অপমান করা, লাঞ্ছিত করা। মানুষের এ স্বভাব ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না—এমন মনোবৃত্তি দিয়া গঠিত সামাজিক বিধিনিষেধের শক্ত অননমনীয় কাঠামোর মধ্যে পড়িয়া যখন মানুষ নিষ্পীড়িত হইতে থাকে, তখন সে বড় দুঃসহ অবস্থা। বড় দুঃসহ আরও এইজন্য যে দীর্ঘকালের অভ্যাসের ফলে লাঞ্ছনাকে আর মানুষ লাঞ্ছনা বলিয়া বুঝিতে পারে না। অনির্বচনীয় রহস্যময় এই সৃষ্টির এই মানুষদের মধ্যেই কেহ আবার মানুষে মানুষে এই ভেদকে, এই অসাম্যকে অস্বীকার করিয়া, ভাঙিয়া দিয়া সহজ প্রেমময় স্বরূপের স্বাভাবিকতা লইয়া মানুষের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। এমনই একজন মানুষ ১০৬ বৎসর আগে এই বাসন্তী অষ্টমীতে জন্ম-নেওয়া ঐ শিশুটী। তাই তাঁহাকে স্মরণ করিতে হয়। স্মরণ না করিয়া পারা যায় না, স্মরণ না করিয়া ভাল লাগে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের উচ্চ নীচ, ছোট বড়, স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের যে মন-গড়া ভেদবাদ মানুষই নিজের হাতে গড়িয়া দীর্ঘকাল হইল বাস করিতেছিল, ঐ শিশুটী সে ভেদবাদকে বেমালুম অস্বীকার করিয়া ছোট বড়, শিক্ষিত অশিক্ষিত, নর নারী, এদেশী অপর দেশী, দূর নিকট সকলের সঙ্গে এক স্বাভাবিক প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনা করিয়া সকল মানুষকেই ভালবাসিলেন—বর্তমান অতীত ভবিষ্যতের সকল মানুষকেই। তাঁহার এই ভালবাসার টানে তাঁহাকে স্মরণ করিতে হয়, প্রতিদিন স্মরণ করিতে হয়, বিশেষ দিনেও স্মরণ করিতে হয়।

সহজ স্বাভাবিক প্রেমস্বরূপ বলিয়া ঐ শিশু শিশুবয়স হইতেই আকর্ষণ করেন। তাঁহার দেহের সৌন্দর্যই যে নয়নমনোমুগ্ধকর ছিল তাহা নয়, তাঁহার সকল ব্যবহারেরই একটা বিশিষ্টতা ছিল যাহা আকর্ষণ করে। তাই তাঁহাকে স্মরণ করিতে হয়, প্রতিদিন স্মরণ করিতে হয়, বিশেষ দিনেও স্মরণ করিতে হয়।

তাই এই বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে ঐ শিশুকে স্মরণ করিতে আজ আমরা সমবেত হইয়াছি।

এই শিশুর নাম তাঁহার দিদিমা রাখিলেন নিত্যগোপাল, পরবর্তী কালে তাঁহার গুরুদেব রাখিয়াছিলেন যোগাচার্য শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত। শিশুর যে আনন্দ-স্বরূপ হইতে শিশু বা কিশোর বয়স পর্যন্ত আনন্দ করিয়া পড়িত, অথচ যাহা উচ্ছৃঙ্খলতার অসৌন্দর্যে কখনও নিজেকে বিড়ম্বিত করে নাই, সেই আনন্দ যৌবনে অর্জিত জ্ঞানরাশি এবং চিত্তের স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপকতা, বিস্তার ও অবকাশের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহার জ্ঞানানন্দ নাম পরিপূর্ণভাবে সার্থক করিয়াছিল।

নূতন যুগের ভোরে শ্রীনিত্যগোপাল এই কথাটাই তাঁহার সারা জীবন ও রচনা দিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, সুস্থ সার্থক জীবন্ত জীবনের কেন্দ্র জ্ঞানও নয়, রস বা আনন্দও নয়; আবার জ্ঞানও, রস বা আনন্দও। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ফলে ভারতবর্ষ দুই ভাগে ভাগ হইয়া যাইতেছিল। জ্ঞানকৈন্দ্রিক অধ্যাত্মবাদীরা নিজেদের

অধ্যাত্ম-জীবনকে বহু সতর্কতার রক্ষা করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া আসিতেছিল, আর এক দিকে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ফলস্বরূপ ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতিষ্ঠা, সমাজ-জীবনের কল্যাণ আর রাষ্ট্র-জীবনের স্বাধীনতার প্রশ্নকেই ঐকান্তিক করিয়া তুলিয়া আর এক রূপ ভিন্নতর ব্যর্থতাকেই আহ্বান করিয়া আনিতেছিল। অধ্যাত্মবাদীরা মনে করিত ব্যক্তিগত-জীবনে বা সমাজে বা রাষ্ট্রে যাহাই থাকি না কেন, সেখানে যত অত্যাচার অনাচার উৎপীড়নই চলিতে থাকুক না কেন, পরলোকে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য যথাতথরূপ ক্রিয়াকলাপটা ঠিক রাখিতে পারিলেই হয়। আর আধ্যাত্মিকতাকে যাহারা বাদ দিল, তাহারা মনে করিল পাশ্চাত্ত্যের মত শুধু রাজনীতি সমাজনীতি করিলেই বুঝি রাজনীতি সমাজ-নীতির শুদ্ধি বজায় রাখা যাইবে—পাশ্চাত্ত্যও যে 'শান্তি' 'শান্তি' বলিয়া একদিন চীৎকার করিবে, তাহা তাহাদের কাছে সেদিন ধরা পড়ে নাই। 'East is East, West is West, twin shall never meet'—এই কথাটার সর্বাঙ্গীণ মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিয়াই শ্রীনিত্যগোপাল জড়াজড়, আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়ের বাণী বজ্র নির্ঘোষে ঘোষণা করিয়া সেই সঙ্গেই বলিলেন, I am a Cosmopolitan। তাঁহার রচনায় ও জীবনে শ্রীনিত্যগোপাল এইটেই প্রমাণিত করিয়াছেন যে, প্রাচ্য সভ্যতার যে আধ্যাত্মিকতা বিগত কয়েক সহস্র বৎসর পর্যন্ত প্রচলিত ছিল বা আজও অনেকটা আছে তাহাও সমগ্র সত্যের এক দিক, আবার পাশ্চাত্ত্য যেখানে সেদিন ছিল বা আজও মোটামুটি আছে, তাহাও সমগ্র সত্যের অপর দিক। শ্রীনিত্যগোপাল বলিলেন এই দুই-ই পরস্পরকে অস্বীকার করিয়া এমন একটা তৃতীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হইবে যাহার মধ্যে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা ও জড় সভ্যতার শেষ রূপ কম্যুনিজম উভয়ই হজম হইয়া যাইবে। সেই রূপান্তরিত তৃতীয় অবস্থায় আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে কম্যুনিজমের মিলনের ফলে কোনটারই বর্ত্তমান রূপ থাকিবে না, থাকিবে না তাহাদের ঐকান্তিক হওয়ায়, একক সত্য হওয়ার অবৈজ্ঞানিক মিথ্যা গর্ব, অথচ তাহারা থাকিবে। সত্যের অপরার্ধকে স্বীকার করার জন্য নিজেকে যতটুকু বদলাইতে হয় উভয়কেই তাহা বদলাইতে হইবে, বদলাইয়া উভয়কে মিলিতে হইবে। উভয়ের এই মিলনের সূত্র দিয়াই শ্রীনিত্যগোপাল লিখিলেন, 'নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়। জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়। সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়। জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-অদ্বৈত সমন্বয়। সর্ব্ব সমন্বয়'।

ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবাদের একটা অবদান ছিল ব্যক্তির অহং—বিচ্ছিন্ন, পরিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র অহং-কে ছিঁড়াইয়া একটা ব্যাপকতার স্তরে ওঠা, ব্রহ্মত্বে পৌঁছানো। এই সাধনা ছিল একেবারেই আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে—যদি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এই ব্যক্তিকে ছিঁড়াইয়া সমষ্টি-বোধকে আনার সাধনা গ্রহণ করা হইত, তাহা হইলে যে পাশ্চাত্ত্যাগত সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ আজ জোর করিয়া ভারতবর্ষের জীবনে প্রবেশ করিল, তাহার প্রয়োজন হইত না। আজ যে ভারতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে এত দুর্নীতি, এত অসৌন্দর্য তাহার কারণ কালের ধাক্কায় প্রচলিত অধ্যাত্মবাদের সৌন্দর্যও স্বাভাবিক কারণেই রক্ষা করা যায় নাই, আবার পাশ্চাত্ত্য হইতে যাহা লইতে বাধ্য হইয়াছে তাহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যও গ্রহণ করিতে পারে নাই। প্রচলিত অধ্যাত্ম সাধনায় নির্বাক্তিকে পৌঁছানটা লক্ষ্য ছিল, কিন্তু সাধনাটা ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। তাই পরিবার সমাজ রাষ্ট্রকে বাদ দিয়া সে নির্বাক্তিকে পৌঁছান চলিত। শ্রীনিত্যগোপালের কথা এই যে, নির্বাক্তিকে অবশ্যই লাভ করিতে হইবে—নিজেকে অতিক্রম করিতেই হইবে—কিন্তু সর্ব এই জগৎ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্যক্তিগত সাধনায় নয়—পরিবার সমাজ রাষ্ট্র বিশ্বসমেত সর্বভূতময় এই যে জগৎ—ইহারই মধ্যে নিজেকে বিস্তারিত করিয়া, ছড়াইয়া দিয়া, তাহার সঙ্গে নিজেকে একীভূত করিয়া, আবার তাহাকেও ছিঁড়াইয়া যাইয়া। এই নির্বাক্তিকতা বর্ত্তমান যুগ-সাধ্য। ইহাতে ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার লক্ষ্যও লাভ হয়, জগতের

মধ্যে নিজেকে পাইবার সাম্যবাদের যে লক্ষ্য তাহাও লাভ হয়। ইহাতে সাহারিনের জীবনযাত্রা চলে এক নীতিতে, আর সন্ধ্যার পরে জগতপথানবারণা চলে অন্য নীতিতে—এই বিচারণা হইতে বাঁচাইয়া মানুষকে অধিকতর আনন্দিত ও সার্থক করিবে। শ্রীনিত্যগোপালের মতে একই সর্বসমন্বয়ের নীতিতে চলিবে সমগ্র জীবন—ঘরে বাইরে, দিনে রাত্রে একই মানুষ বহু রকম হইয়া ব্যর্থ হইবে না।

আজিকার কারবারীর জীবনের অসৌষ্ঠব দূর করিবার পথের নিশানা দিতেই শ্রীনিত্যগোপালের প্রয়োজন। সংসারকে যাহারা মিথ্যা মায়াময় জানিত তাহারা যখন পাশ্চাত্যের ধাক্কায় এই সংসারেই থাইয়া পরিয়া থাকার কথা শিখিল, তখন প্রতিক্রিয়ায় এই সংসারের খাওয়া পরাতেই যে একান্ত করিয়া ফেলিল কেবল তাহাই নয়, ঘরে ঘরে মিলিয়া মিশিয়া খাওয়া পরাটা শিখিল না। ফলে সে জড়বাদী পাশ্চাত্য অপেক্ষাও নোংরা চ্যাচড়া ভোগবাদী হইয়া পড়িল। আজ তাহাকে সংসার মিথ্যা একথাও ভুলিতে হইবে, আবার ধনতন্ত্রবাদই হউক বা সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদই হউক, প্রয়োজনকে সীমাতিরিক্ত বাড়াইয়া ভোগ করাকেই জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিল যে চিন্তাধারা, সে চিন্তাধারাকেও ভুলিতে হইবে। ভোগই ভোগের শেষ কথা নয়, সংসারই সংসারের শেষ কথা নয়। ভোগ সার্থক, সুন্দর, গৌরবময়ী যখন সে ত্যাগের সঙ্গে যুক্ত হয়, সংসার সত্য সার্থক যখন সে সংসারাতীতের সঙ্গে সমন্বিত হয়। ভোগই যখন শেষ কথা হয়, তখনই তা কাড়াকাড়ির স্থান হয়—সেটা ধনতন্ত্রের ক্ষেত্রই হউক বা সাম্যবাদের ক্ষেত্রই হউক। রাশিয়া চীনের সাম্যবাদই যদি জীবনের সকল সমস্যার মীমাংসা দিতে পারিত, তাহা হইলে সেখানকার আকাশ বাতাস হইতে যে স্নিগ্ধ শান্তি বিচ্ছুরিত হইত তাহা সমগ্র জগৎকে শান্তির পথে আপন স্বধর্মবলেই জানিতে অজানিতে আকর্ষণ করিয়া লইত—এমন বিপুল প্রোপাগাণ্ডা সাহিত্যও যাহার অতি সামান্যই করিতে পারিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় শান্তি আসে নাই, তথাপি তাহাকে আজ যাহা দেওয়াও চলিবে না—তাই শ্রীনিত্যগোপাল তাহাকে রূপান্তরিত করিবার মন্ত্র রাখিয়া গেলেন।

শ্রীনিত্যগোপাল এক স্থানে লিখিলেন, 'এ সংসার অতি ভীষণ স্থান,' অপর স্থানে লিখিলেন, 'এই বিশ্বই আমার মহা মঠ'। কি অধ্যাত্ম-জীবনে কি সংসার-জীবনে বিচ্ছিন্ন অহংকার যখন কেন্দ্র, তখনই সেটা ভীষণ—কেননা সেটা তখন কাড়াকাড়ির স্থান। যাহা নিয়া কাড়াকাড়ি হয়, তাহাই বিষ, বিষাক্ত, বিষয়। আবার এই অহং-ই যখন নিজের বিচ্ছিন্নতা ভিঙাইয়া পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্ব ও বিশ্বাতীতের সঙ্গে যুক্ত, তখনই তা মহা মঠের প্রশান্তি দান করে। সর্বত্র একটী মাত্র সাধনা—নিজের অহং-কে অহং রাখিয়াও তাহার ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্নতাকে মুছিয়া ফেলিয়া তাহাকে ব্যাপকতর গভীরতর রূপে ও স্বরূপে আস্বাদন করা। এই সাধনা দিয়াই শ্রীনিত্যগোপাল লেখেন যে, 'আমি ব্রহ্মাস্মি' এই সাধনার সঙ্গে সঙ্গে চলিবে 'আমি বিশ্বনাগরিক' এই সাধনা। ব্রহ্মত্ব মানেই বড়ত্ব—সে বড়ত্ব কেবল ধ্যানে নয়, সব রূপের বাইরে নয়—সে বড়ত্ব পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে বিশ্বেও আস্বাদন-যোগ্য—তবেই সত্যিকারের ব্রহ্মত্ব লাভ; তখনই উপাধি মুক্তি। শ্রীনিত্যগোপালের সর্ব সমন্বয়ের একই নীতিতে সমগ্র জীবন চালনা, জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে বিচরণ সম্ভবপর—অহং-কে ব্যাপকতর গভীরতর করিয়া করিয়া চলা—অহংকারের বিনাশ নয় সেটা, সেটা শ্রদ্ধায় বিনয়ে নম্রতায় ভরা, প্রীতিতে মধুর। প্রতি মানুষই নিজেকে ভিঙাইয়া যাইতে চায়—সে যখন পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন সে একরকম করিয়া নিজেকে অতিক্রম করে, সে যখন সমাজের সঙ্গে, রাষ্ট্রের সঙ্গে, বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখনও সে নিজেকে ভিঙাইয়া বড়ত্বের আস্বাদনই পায়। অথচ এত করিয়াও কেন মানুষ শান্তি পায় না তাহার কারণ নিজেরই আত্মধর্মের খোঁচায় সে নিজেকে বড় করিতেই আগাইয়া যায় বা যাইতে প্রয়াস পায় বটে কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কারের দোষে নোঙরটাকে অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন অহং-বোধকে ছাড়াইয়া লয় না—তাই সব কর্ম, সব জ্ঞান, সব কিছু

ধারাই কেবল নিজেকেই 'ঘিরিয়া ঘিরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে'। তাই পাশ্চাত্ত্য তাহার সকল বাহ্য ও সকল ঐশ্বর্য সৌন্দর্য লইয়াও শান্তি পায় নাই, ভারতবর্ষ তাহার এতদিনকার প্রচলিত অধ্যাত্মসম্পদ লইয়াও শান্তি আনিতে পারে নাই—আজ সে জড়বাদের হাতে বন্দী মাত্র। তাই শ্রীনিত্যগোপালের কথা হইল জীবনটা সর্ব-কৈন্দ্রিক—ব্রহ্ম-কৈন্দ্রিকও বটে, জগৎ-কৈন্দ্রিকও বটে, চৈতন্য-কৈন্দ্রিকও বটে, জড় কৈন্দ্রিকও বটে।

সমন্বয়-মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল এই তত্ত্বেরই মূর্ত বিগ্রহ। তাঁহার জীবনের বিপরীত ঘটনাবলী এই সর্ব-কৈন্দ্রিকতার তত্ত্বকেই প্রমাণ করে। আড়াই বৎসর হইতেই তাঁহার নির্বিকল্প সমাধি হয়, পরবর্তী জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁহার সমাধিতেই কাটিত, আবার তিনিই লেখেন যে সমাধিও একটা ঘটনা, তাই উহাও অমায়িক নহে; তিনিই আবার লেখেন এই বিশ্ব সত্য। জগৎকে মানুষ মিথ্যা বোধে, এ সংসার হইতে পলায়নী মনোবৃত্তিতে তাঁহার সমাধি হইত না। তাঁহার সমাধি যারা তিনি এই কথাটাই প্রমাণিত করিয়াছেন যে, সংসার সত্য, বিশ্ব সত্য, কিন্তু সমাধিস্থ হইবার মত চিত্তবৃত্তি সম্পন্ন হইয়াই সংসার সত্য করিতে হইবে এবং সমাধিস্থ পুরুষও সংসার করিতে পারেন, উভয়ের মধ্যে বিরোধ নাই। সমাধিস্থ হইতে না পারিলে সংসারের চাপে চাপা পড়িতে হয়। সমাধিস্থ হইয়া সংসার করিতে পারিলে মহানির্বাণ তন্ত্রোক্ত অবধূতের সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। অবধূতের লক্ষণ নিত্যগোপাল লিখিতেছেন, 'অবধূত যোগীর ন্যায় যোগনিয়মের বশীভূত নহেন বিষয়ীর ন্যায় ভোগপরায়ণও নহেন, জ্ঞানীর ন্যায় মোক্ষ-কাঙ্ক্ষী নহেন, বীরের ন্যায় বলপ্রকাশক নহেন, ধীরের ন্যায় সংযমত্যাগী নহেন, তপস্বীপ্রভৃতি মন্ত্রসাধকও নহেন। তিনি শৈব নহেন, শাক্ত নহেন, বৈষ্ণবও নহেন। তিনি পরমানন্দস্বরূপ সাক্ষাৎ দ্বিতীয় শিবতুল্য বিরাজ করিয়া থাকেন'।

সংসারকে সত্য বলার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনিত্যগোপাল সর্ব মানুষকে উপস্থিত করিয়া বলিলেন, 'আমি বিশ্বনাগরিক' এবং ব্যক্তিগত মুক্তি সাধনার স্থলে স্থাপন করিলেন মানুষের প্রতি—সকল মানুষের প্রতি প্রেম-সাধনা। বিশ্ব-নাগরিকতা-বোধহীন সংসার সত্য হইতে পারে না, কেননা বিস্তারহীন গভীরতা আসক্তির রূপ মাত্র। সর্ব মানুষের সঙ্গে প্রেম-সাধনার যে সংসার তাহাই শ্রীভগবানের আবাস-স্থল, তাহাই সত্য—তাহাই পাশ্চাত্ত্যাগত সাম্য-বাদকে সত্য করিয়াও ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবাদকে আলিঙ্গন করিয়া আছে। শ্রীনিত্যগোপাল তাই লিখিলেন, 'আমার শিষ্যগণের প্রতি আমার এই উপদেশ যে তাঁহারা পরস্পর ভ্রাতৃভাবে থাকিবেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বিপদে পড়িলে অন্য সকলে তাঁহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবেন। যদ্যপি কাহারো কোন কষ্ট হয় তবে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। অনাথ আতুর দেখিলে সাহায্য করিবেন, পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন না। সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমানভাবে ভক্তি ও বিশ্বাস রাখিবেন'।

শ্রীনিত্যগোপালের মতে ইহাই দাঁড়াইল যে, সংসার জীবনেরও শেষ কথা মানুষ-কে ভালবাসা, অধ্যাত্ম-জীবনেরও শেষ উপদেশ মানুষকে ভালবাসা। সাম্যবাদের প্রয়োজনকেও মিটাইয়া অধ্যাত্মবাদের স্থান ও মান-নির্দেশ করিয়া তাই শ্রীনিত্যগোপাল যুগ-দেবতা। আজ তাঁহার এই জন্ম-বার্ষিকী উৎসব ক্ষণে বসিয়া প্রার্থনা জানাই—বিশ্ব যখন ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও বিশ্বজনীন দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে পর্যুদস্ত, তখন হে যুগ-দেবতা, হে শ্রীনিত্যগোপাল, তুমি প্রকাশিত হও, ছড়াইয়া পড়—সর্ব সমন্বয়ের, সর্ব কৈন্দ্রিকতার জীবনের ছন্দ মানুষের সামনে তুলিয়া ধরিয়া তুমি তাহাকে সুস্থ পথে চালিত কর, তাহাকে শান্তি দাও।

তিন বৎসর আগে শ্রীনিত্যগোপালের এই তত্ত্ব-ঘন মধুর হইতেও মধুর জীবনের কথা আপনারা শুনিয়াছেন শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের কণ্ঠ হইতে। শ্রীনিত্যগোপালের এই জন্মতিথি বাসরের তিন দিনের উৎসব-বক্তৃতা শেষ করিয়া তিনি চলিয়া পড়িলেন তাঁহার জীবনসর্বস্বের শ্রীচরণতলে। শ্রীনিত্যগোপালের

কথা আর তিনি শুনাইবেন না—কিন্তু সত্যের নিজস্ব প্রকাশ-ধর্মের স্বভাবানুযায়ী মানুষেরই মধ্যে সে কথা ফুটিয়া বাহির হইবে, হইতেছে। শ্রীনিত্যগোপাল যে প্রয়োজনবোধে হুগলীতে দেহরক্ষা করিয়াও কলিকাতার এই প্রান্তদেশে তাঁহার দেহকে সমাধিস্থ করিতে নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন, সে প্রয়োজন-বোধ অবশ্যই কালের গতিতে মিটিয়া যাইবে, শ্রীনিত্যগোপালের জীবন ও বাণী মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়া মানুষকে তৃপ্তি দিবে, শান্তি দিবে, জটিলতার মধ্যে পথের নিশানা দিবে—গতিশীল জীবনে স্থিতির মোড়ক দান করিবে। গতির মধ্যে স্থিতিই আজকের মানুষের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা—গতিহীন নিশ্চল অচল অনড় স্থিতি নহে—শ্রীনিত্যগোপাল তাহাই বিশ্বকে দিতে আসিয়াছেন, দিবেন, দিতেছেন। তাঁহার জয় হউক।

(মহানির্বাণ মঠে ১০৭-তম জন্ম-উৎসবে পঠিত)

জয়তু নেতাজী

॥ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ॥

মেঘাচ্ছন্ন ভারতের ভারার্ত আকাশে বিভাবসু
শেফালি-শীকর-ভ্রান্ত স্নিগ্ধোজ্জ্বল উষ্ণীষ ছবি,
তিমির বিদার কান্তি সম্মিলিত শশাঙ্ক ও রবি
প্রেমে ও পৌরুষে বীর্যে একাধারে পুষ্প ও পরশু।
অষ্টদশ শ্রেষ্ঠ তুমি শান্ত নব ভীষ্ম নব বন্ধু
রাজসূয় জ্বালি দিয়া ঢালি দিলে পূর্ণাহুতি হবি
তুমি ভারি হৃদয়ের বহ্নি ভারি পবিত্র সুরভি
অভূতোত্তরের মন্ত্রে দেশ পুনঃ হল বীরপ্রসূ।
রাষ্ট্রের সম্বিৎ তুমি অতন্দ্র উদগ্র আত্মারূপে
এ-বরেন্দ্র ভূমে বীর বঙ্গের বরেণ্য প্রতিনিধি
আপন তপস্যাব্রত যাপন না হতে চুপে চুপে
চ্যুত কক্ষ হে জ্যোতিষ্ক! তোমারে কি লুকাইল বিধি?
গৌরবের পরশমণি প্রতি সৈন্য তোমারি প্রতীক
নেতাজীর জয় হোক আজাদীর প্রথম ঋত্বিক।

মেঘমুক্ত ভারতের আজো তুমি পৌরুষের রবি
সমরক্ষয়হীন তেজে অস্তহীন অমলিন ছবি—
অশ্বমেধ যজ্ঞে তুমি দিগ্বিজয়ী রাজন্য যেমন
জনতন্ত্রে সাধী তুমি সকলের একান্ত আপন।
বঙ্গের বীর্যের মূর্তি জনগণ মনের অগ্রণী
হিসাব করিয়া মিছে পিছে স্থান কখনো লহনি।
কণ্ঠে তব 'জয়হিন্দ্' বক্ষে তব দীপ্ত হোমানল
অপাঙ্গে বিদ্যুৎ বহ্নি লক্ষ্য শুধু দেশের মঙ্গল।
তুমি নাই আজি তাই দুর্ভাগ্যের লক্ষ্মী যায় ছাড়ি
ছন্নছাড়া বঙ্গদেশে অন্ন ছাড়া হয় বেকারী!
ছিঁচ কাঁদুনের সংজ্ঞা লাভ করে সংজ্ঞাহীন জাতি
আসাম আসামী তাই ব্যাঙে মারে ঐরাবতে দাবি।
সবে আজ ঘরে ঘরে সুবিজ্ঞপ্ত তোমার কীর্তিকে
'নেতাজীর জয় হোক' কোটি কণ্ঠে উঠে দিকে দিকে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে

—১৯৫০—

(২)

সকালে কিছু না খাইয়াই আফিসে যাই।...রেণু ১১০টার পর বাইটার্স বিল্ডিং, ওয়াণ্টার টম্পসনে প্রুফ দেখাইতে যায়, সেখান হইতে প্রেসে যায়। আমি ও প্রতিভা আফিসে যাওয়ার পর রেণু ফেরে। ইহার মধ্যে মৌগ্রাম (বর্দ্ধমান) নিবাসী উদ্বোধনগ্রাহকের গ্রাহক বিজলীমোহন দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্নাথ দাস আসিয়া বিজলীবাবুর বার্ষিক চাঁদা ৩৲ টাকা দিয়া যান। তিনি বৈষ্ণব, গৃহত্যাগী একরূপ। স্ত্রী-পুত্র আছে, তবু একরূপ সংস্রব নাই। তারমণ্ড-হারবারে চলিয়াছেন, সেখানে ও মাস থাকিবেন। তাঁহারা সকলেই উদ্বোধন-ভারত পছন্দ করেন ও পড়েন। তাঁহার আলোচনায় তৃপ্তি পাইলাম। কোন্ অদূরে অজানা কে আমাদের আপন জন আছেন ভাবিয়া পুলকিত হইলাম। যাহারা পুরুষোত্তম-তত্ত্ব ভালবাসেন, তাঁহারাই তো আমাদের স্বগোত্র। তাঁহাদের লইয়াই তো সঙ্ঘ গড়িতে হইবে। তাঁহাকে পুরুষোত্তমের স্থান করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। কোলাকুলির পর বিদায় নেই।...নলিনীবাবু রেণুকে বলেন, আপনি slave of time, এখানে আসিয়াও প্রুফ দেখেন, একটু সময়ও বাদ দেন না। কালের প্রতি অংশকে মর্য্যাদা দিতে দিতেই তো আমাদের 'কালাতীত' হইতে হইবে। ইহাই তো কালকে তুচ্ছ করিয়া কালজয়ের হওয়া ; কালকে ফাঁকি দিলে কালও ফাঁকি দিবে। কালকে তুচ্ছ করিয়া কালাতীত হওয়াই তো আনন্দের উপাসনা। পাশ্চাত্য এই কালের মর্য্যাদা জানে বলিয়া কিছুটা কালাতীত হইতে পারিয়াছে, তাইতো সে ছিল বিশ্বজয়ী। ভারতবর্ষ কাল ও কর্ম্মকে avoid করিয়া কালের হাতে ধরা পড়িয়াছে, কর্ম্ম তাহার হাতছাড়া।...

১৭ই জানুয়ারী

সকালে এখানে রুটী খাইয়া আফিসে যাই। ৮৷৷০ টার পর শেষ ২ কর্ম্মার প্রুফ দিয়া যাই। আমি ১১টার মধ্যে চলিয়া আসি। প্রতিভা আফিসে যায় প্রায় ১২টার সময়। রেণু প্রেসে গিয়া সংশোধিত বিষয়বস্তু দিয়া আসে। ২টার মধ্যে ফেরে।...পুরুষোত্তম-দর্শন ছাড়া মানুষের গতিও নাই, অথচ ইহা বর্ত্তমান আবেষ্টনে গ্রহণ করাও কঠিন, অতীতের সংস্কার এমনই শক্ত। একদল মানুষ আছে যাহারা পরস্পরবিরুদ্ধ সংস্কারের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের সঙ্গে দেখা হইলে পথ পাওয়া যাইবে। শক্ত হইয়া নিজের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজেদের কাজ করিয়া যাইতে হইবে। পথ ও পথের দেবতা তো বুকের মধ্যে আসিয়াই গিয়াছেন, এখন বাইরে প্রকট হইতে যা-কিছু দেরী।...ওঁর সঙ্গে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব, রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছাড়াও ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার সঙ্গে জীবনের সৌহার্দ্য রহিয়াছে। তাঁহার নিকট এই বছরের গ্রাহক হইবার জন্য পত্র দেওয়া হইয়াছিল। সে গতকাল উত্তর দিয়াছে—নিজের গলায় ছুরি দিবার জন্য contribute করিতে পারিবে না। আমি যে কোনও দলেই নাই, কংগ্রেস, শরৎবাবুর দল, সনাতনী, কম্যুনিজম সকলেরই যে সমানভাবে আলোচনা করি এবং এইরূপ পক্ষপাতবিনির্মুক্ত সমালোচনা করা যে বর্ত্তমান সময়ে নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা বুঝিলে—বাবু

আমার সঙ্গে এরূপভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করিতেন না। আমি কাহারও গলায় ছুরি দিতে বসি নাই। যে যাহার নিজের গলায় ছুরি মারিতেছে, তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্যই আমার প্রচেষ্টা। কাজেই কেহই আমার নাই। কংগ্রেসী নয়, সনাতনীও নয়, কমিউনিষ্টও নয়। সব দলছাড়া আমি, ইহা— বাবু বুঝিতে পারিবেন। ৯টায় আশ্রমে ফিরি।...

১৮ই ফেব্রুয়ারী

আজ আর বাহির হই না। বেলু ৮।০ টার পর মন্মথবাবুর বাসায় যায়।...আফিসে যাইবার সময় বিশ্বনাথ হৃষীকেশ মারফত তাহার ও ২ জনের উজ্জলভারতের এক বৎসরের চাঁদা পাঠাইয়া দেয়। বাহিরের বাস্তিক দৃষ্টিতে দেখিলে উজ্জলভারতের চলিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। কেননা বুদ্ধির দিক হইতে যত সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন, তাহার কিছু নাই। লোক নাই, টাকা নাই, হৈ চৈ করিবার কিছু নাই। তবুও প্রাণ-দৃষ্টিতে দেখিলে বেশ অনুভূত হইবে যে, ইহা ভিতরে ভিতরে কোন্ গোপন স্থান হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া ধীরে ধীরে পথ করিয়া চলিয়াছে। মানুষের যে একটা appreciation আছে, তাহার ভিতর দিয়া ইহাই ফুটিয়া উঠিতেছে। নদীতে জোয়ার যখন আসে, তখন নদীর বুকের ভিতরেই তাহা আগে আসে, নদীর উপর তাহা প্রকাশ পায় অনেক পরে। উজ্জলভারতের অবস্থাও তাহাই। সমাজের বুক ভরিয়া ইহা একদিন সমাজকে ভাসাইয়া দিবে। এবারকার 'গীতা-জ্ঞান' যে সমাজের চিন্তার মধ্যে কত-বড় বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা ছড়াইয়া পড়িবে কবে, সেইদিনের প্রতীক্ষায় আছি।...চট্টগ্রামের নীরদবাবু ৪৲ টাকা তাহার (কুসুমের) ঠিকানায় পাঠাইয়াছেন। আজ মনে পড়িতেছে ঠাকুরের ছবি ও বাসন বিক্রী করিয়া মঠ চালাইবার কথা। এখানের ইহারা যদি ঠাকুরকে বুকে করিয়া থাকিত, তবে কি মধুর হইত, কি শোভন হইত। আমারও বুকটা জুড়াইয়া যাইত। ঠাকুরই তো সব কিছুর চরম সার্থকতা!...পদ্মরাণীকে F. P. চারিবার দিলাম।

১৯শে জানুয়ারী

সকালে রিক্সা করিয়া সব পত্রিকা অফিসে দিয়া যাই। প্রতিভা আসে প্রায় ১১টায়। ৯টার পর শিশির ও ভবদাবু আসে। তাহারা ১১টার পর যায়। তাহারা রাহুতা হইতে হাতে লিখিয়া 'মিলনী' নামে একটি বার্ষিক পত্রিকা বাহির করিয়াছে। রাহুতার ২৩শে নেতাজী জন্মোৎসবে সোমবার যাওয়ার জন্য বলিল। সোমবার হাওড়া দিব আছে বলিলাম। তাহাকে গ্রাহক করিয়া ৪ টাকা আদায় করা হইল। বাকী ২ বৎসরেরও দিবে বলিল। রাহুতার লোক ঘুরে থাকিয়া আমার ধ্যান করে। আমি বলিলাম—ইহা হয় না। যেখানে দর্শন, স্পর্শ, মনন হয় না, সেখানে ধ্যান জমিবে কি করিয়া? উহাতে অহঙ্কারের ধ্যানই হয়। এবার যে গায়ে গা লাগাইয়া তত্ত্বজ্ঞান শিখিতে হইবে। রাধুনীর হাতের নাড়া দেখিয়াই রান্না শিখিতে হয়। পাক প্রণালী পড়িয়া বিশেষ কি হইবে? জীবনের সমাধান জীবনে জীবন মিলাইয়াই সম্ভব। রাহুতাকে তো আমি নিজের স্থান বলিয়া জানি। ২৬শের মধ্যে আবার আসিবে বলিয়া গেল। ১২টার কিছু আগে প্রতিভা আসিয়া খবর দিয়া গেল যে পত্রিকা আসিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি খাইয়াই আফিসে গেলাম। বৈকালে বাড়ীতে প্রস্তুত রুটী ও কলাইশুঁটি খাইলাম। মাথাটা জানি না কেন ভার হয়। ৯টার আগেই আশ্রমে ফিরি। শেখর দাস আসিয়া গত রবিবার তাহার গাড়ী না পাঠাইবার কৈফিয়ত দিয়া যান। সমস্ত বই বাঁধা হইয়া যাওয়ার পর 'চরিত্রহীন' কিছুটা পড়া হয়। প্রতিভা রাত্রিতে বেণুর ওখানেই ছিল।

উজ্জলভারতের ৩য় বর্ষ আরম্ভ হইল। ১ম সংখ্যাও বাহির হইল। ঠাকুর জানেন। বিশ্বপ্রাণ ইহাকে বিশ্বের অন্তরে বাহিরে ছড়াইয়া দিবে, ইহাই আমার আশা। বিশ্বপ্রাণ নিতাগোপাল বলিয়াছেন, 'শরৎ, যখন যেখানে আছ, আমি সঙ্গে সঙ্গেই আছি, তাহা কি

তুমি টের পাও না'? আজ তাহাই টের পাইবার জন্য বিশ্বের সর্ব্ব কর্ম্ম তাঁহাকে আস্বাদন করিতে চাই। বিশ্বের সব প্রাণ আজ সাড়া দিয়া উঠুক।

২০শে জানুয়ারী

৭।০টায় আফিসে যাই ৭৷৷০টার পর সব পত্রিকা নিয়া রিক্সায় রেণু ও প্রতিভা পোষ্টআফিসে যায়। পোষ্ট-আফিস হইতে রেণু মন্থর বাসায় যায়। সেখানে খাওয়া দাওয়া করিয়া বোধে মিউচুয়ালে ও নলিনীবাবুর ওখানে যায়। নলিনীবাবু অসুস্থ বিধায় আফিসে আসেন নাই। ১।০টায় রেণু ফেরে। প্রতিভা জয়ার ওখানে ও অনসূয়ার ওখানে যায়। ফেরে ৪টার পর। ইতিমধ্যে ধীরেনবাবু আসেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার একটা প্রবন্ধ পড়েন—গীতায় হিংসার আদর্শ। তাহার পর উদ্ধবভারত হইতে রেণু ভগবদ্গীতার অনুক্রমণিকা-ভাগ পাঠ করিয়া শুনায়। ইহার পরই মনোরঞ্জনবাবু আসে। পত্রিকা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। রেণুর একজন অনারারী part-time সহায়ক পাওয়া যায় কি না তাহা বলিল। আমরা সন্ধ্যার সময় একত্র হইয়া বাহির হই। মনোরঞ্জনকে খই ও দই খাইতে দেওয়া হয়।...আজিকার যুগান্তরে কালীপদ বাগচীর মুর্শিদাবাদ হইতে extern-ment-এর খবর পাইলাম। সন্তোষের কাছেও জানিলাম শরীরটা ভাল নয় বলিয়া আজ দুপুরে স্নান করি নাই, রাত্রিতে রুটী খাইয়াছি। সকালে ফাল্গুন মাসের জন্য 'অন্ধদের কথা'-র সমালোচনা লিখি পুস্তক পরিচয় হিসাবে।...

২১শে জানুয়ারী

সকালে উদ্বোধন পত্রিকা হইতে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে প্রদেশপাল ডক্টর কাটজুর ভাষণ অবলম্বন করিয়া 'ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ত্রুটি' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ করি। রেণু আজ সকালে গলফ ক্লাব রোডে যায়, দেখা হয় না। একজন মেয়ে এ্যাডভোকেটের সঙ্গে দেখা হয়, পত্রিকা দিয়া আসে। রেণু ১২টার মধ্যে এখানে আসে। তাহার পরই প্রতিভা আসে। আমার খাওয়া হয় ১টার পর। মনু, নীহার, রেণুরা আসে ২-৩০টায়। তখন আর নীহারের মাতুল প্রফুল্লবাবুর কাছে যাওয়ার সময় ছিল না, তিনটার মধ্যেই বাহির হইয়া ঢাকুরিয়া যাইতে হইবে। প্রফুল্লবাবু আমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন, ঠিকানা জানিতাম না, যাওয়া তাই সম্ভব হয় নাই। ৩টার মধ্যে রওয়ানা হইয়া ৩-১০এর ট্রেনযোগে ঢাকুরিয়া পৌঁছি। রেণু বিনোদবাবুর বাসায় যায়। আমি ও প্রতিভা যাই ধীরেনবাবুর বাসায়। সেখান হইতে শ্যামলালবাবুর বাসা হইয়া ধীরেন মজুমদারের বাসায় যাই ৪টার সময়। অরবিন্দের প্রজ্ঞাবাদের আলোচনা পড়ি। কেমন করিয়া অর্জ্জুনের উক্তির ভিতর 'abstracting of universal' ফুটিয়া উঠিয়াছে, কেমন করিয়া সর্ব্ববিশেষবর্জ্জিত 'নির্ব্বিশেষ' আত্মবস্তুর প্রচার করিলে তাহাও প্রজ্ঞাবাদ হয়, কেমন করিয়া ছোট কথা, ছোট ব্যাপার, ছোট মানুষ বাদ দিয়া বড়দের সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ লইয়া বিব্রত হইলে তাহাও প্রজ্ঞাবাদ হয়, কেমন করিয়া ছোটদের ভাষা যে প্রাণের ভাষা—তাহারই আলোচনা হয়। কৌমার-যৌবন-জরা-মৃত্যুর সমন্বয়ই আত্মা এবং ইহাই কৌমার-যৌবন-জরা-মৃত্যু বিবর্জ্জিত আত্মার concrete আস্বাদন। বরিশালের সতীশ সরকার উকিলের ভাগিনেয় আমার ছাত্র, তাহার সঙ্গে ঢাকুরিয়ায় দেখা। সে গ্রাহক হয়। ৭টায় ট্যাক্সিতে রওয়ানা হইয়া ৩৲ টাকা ভাড়া দিয়া আফিসে পৌঁছি। ৭৷৷০টার পর মনু আছে বলিয়া আশ্রমে ফিরি।... খবর দেয় প্রফুল্লবাবু মারা গিয়াছেন।...আজ গীতাপাঠে তারক গুপ্ত ও তারকদাস চ্যাটার্জ্জি যোগ দেন।

২২শে জানুয়ারী

সকাল ৮টার পর রেণু ঠাকুরের জন্য ফুল ও তুলসী নিয়া আসে ও তাঁহার পূজা করে। ১১টার পর চলিয়া যায়। ২টার ভিতর আবার আসে। প্রতিভা ইহার মধ্যে আসে ও পুস্তক পরিচয় হিসাবে 'অন্ধদের কথা' নকল করে। সকাল বেলা ডি, এন্, বসুর (সি ২২ লেক রোড) পুত্র

মূলুক বন্ধ ও তাহাদের ড্রাইভার বলাই আসে যখন আমি হাওড়া মঠের নিমাই প্রসন্নকে যাইব তাহা জানিবার জন্য। ওটার সময় যাইব বলিয়া দেওয়া হয়। উহারা গ্রাহক হয়। ৯।১০এ গাড়ী আসে। আমরা ৬-৪০-এ হাওড়া পৌঁছি। আলোচনা আরম্ভ হয় ৪।১০-এ। শ্রোতা তেমন বেশী হয় নাই। সকালে অমিত মল্লিককে ফোন করিয়াছিলাম তাহাকে আমার আলোচনায় যোগদানের জন্য। সে সুভাষবাবুর সভায় সভাপতি হইবে, যাইতে পারিবে কি না সন্দেহ করিল। সে যায় নাই। 'মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী। ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য বলে নিরবধি'—ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই বলা হইল। মায়াবাদেরই জবাব এসেছিল 'রাধাভাবে' শ্রীগৌরাঙ্গ। 'জ্ঞান লেজে কাঁদালে রাধায় এবার কাঁদ রে গৌর সাজে'। পুরুষোত্তম-তত্ত্বে প্রকৃতি পুরুষ অনাদি অনন্ত। কি আশ্চর্য্য যিনি মায়াবাদের বিরোধী, তাঁহাকেই মায়াবাদের পরিকল্পিত সন্ন্যাস নিতে হইল। কেন? 'অতএব মুক্তি করিব সন্ন্যাস' সত্যই তিনি 'সহজ মানুষ', অবস্থার চাপে তাঁহাকে সন্ন্যাসী বানাইয়াছিল। তিনি 'কপট সন্ন্যাসী'। মায়াবাদী 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' না বলিয়া বলে শুধু 'চৈতন্য'। মায়ার ব্রহ্মের মূল্য, বড়র মূল্য দিয়াছে, ছোটদের দেয় নাই, মায়াবাদে আত্মার মূল্য দিয়াছে, অনাত্মার মূল্য দেয় নাই, মায়াবাদ চৈতন্যের মূল্য দিয়াছে, অচৈতন্য ধূলির মূল্য দেয় নাই! পুরুষোত্তম একাধারে বড়-ছোট, ব্রহ্ম-মায়া, আত্মা-অনাত্মা, চৈতন্য অচৈতন্য। মহাপ্রভু খোলা-বেচা শ্রীধরের মূল্যও যেমন দিয়াছেন, বাসুদেব সার্ব্ব-ভৌমেরও তেমন মূল্য দিয়াছেন। মহাপ্রভু চৈতন্যের যেমন, ধূলিরও তেমন মূল্য দিয়াছেন, ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছেন, ধরাকে বৃন্দাবনে গড়িতে চাহিয়াছেন। ৭টার কিছু পূর্বে আলোচনা শেষ হয়। প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বলাই চালিত বীরেনবাবুর গাড়ীতে আমি প্রতিভা ও রেণু চলিয়া আসি। প্রথমে আফিসে যাই, পরে ১টার পর আশ্রমে ফিরি। উদ্বোধনীর যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু রেণু এখানে আছে বলিয়া যাওয়া হইল না।

২৩শে জানুয়ারী

সকালে 'ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ত্রুটী' প্রবন্ধ শেষ করি। গীতাপাঠ দেখি। চুপুরের পরই রেণু আসে। গতকালকার হাওড়ার আলোচনার গল্পটা ভাঙ্গিয়াছে। প্রতিভা পোস্টাফিস ব্যাঙ্ক ও জ্ঞানিমান হইয়া এখানে ২টার পর আসে। সে উপরের প্রবন্ধটা লিখিতে সুরু করে। 'চরিত্রহীন' পাঠ হয়। সাবিত্রী যদি 'প্রজ্ঞাবাদী' হইত, তবে সে তাহার intellectualism নিশ্চয়ই 'sink' করিত 'verp deeply into our speech'। কথার কাটাকাটি করিয়া সাবিত্রীর সম্বন্ধে যে ধারণা স্বাভাবিক ভাবে সতীশদের হইয়াছিল, সে তাহা বারবারই প্রতিবাদ করিয়া খণ্ডন করিতে চেষ্টা করে নাই, বরং উহাকে সত্য মিথ্যা এক করিয়া বাড়াইয়াছে, বিহারী যাহা জানিত তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছে এবং শেষে ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়া জীবনের আলোচনা দ্বারা তাহার মীমাংসা করিয়াছে, আবেষ্টনকে জয় করিয়া বীরের মত বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, উপীনদার সমস্ত কার্য্যের ভার পাইয়াছে। সব 'ছত্রভঙ্গ হওয়ার' শেষ মীমাংসায় পৌঁছিয়াছে। ভাগবতের 'যাম্যা যেন সদা নিরস্ত-দুরত্যয়' সাবিত্রীর জীবনে সার্থক হইয়াছে। সব অপবাদ মানিয়া লইয়া কোন্ কৌশলে অপবাদমুক্ত হইয়া বুক টান করিয়া দাঁড়ানো যায়, এবং চরিত্রহীন মানুষকেও ঘুরাইয়া পথে আনা যায়, তাহাই সাবিত্রী দেখাইয়াছে।

সরস্বতী পূজায় মনে হইতেছিল এমন করিয়া আর্টকে উচ্চতম জীবনে ব্রহ্মোপাসনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কৌশল হিন্দু ছাড়া আর কেহ জানিত না। ব্রহ্মের মূর্ত্তি না থাকিলে কি তাহা সম্ভব হইত? আর্ট-হীন ব্রহ্ম শুধু মরালিটি (morality) দ্বারা উপাস্য। পুরুষোত্তম-জীবনেই শুধু আর্ট ও মরালিটি সমন্বিত। এই জীবনের উপরেই ভারত থাপে থাপে গড়িয়া উঠিয়াছে। বহু মূর্ত্তি ও অমূর্ত্ত একের সমন্বিত পুরুষোত্তমই ভারতের ইষ্ট। প্রতি অনুভূতে উৎপল ফুল ফল সমাবেশ করিয়া ব্রহ্ম যোগে যুক্ত করিয়া প্রাণের কি সহজ স্পন্দনই না ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যার আগেই অফিসে যাই, তখন বিসর্জনের খুব ভিড়। ৯টায় ফিরি।···পুরুষোত্তমের 'অন্ন' সত্যই অন্ন-ব্রহ্ম, তাই উহা অস্পৃশ্য হইলেও অশুচি হয় না। পুরুষোত্তম-অন্নই সার্বজনীন, সদাশুচি।

সকালে বাহির হই না। 'চরিত্রহীন' পড়ি। বেণু ৯টার পর হরিদাসবাবুর বাসায় যায় ও চাঁদা ৫৲ টাকা নিয়া আসে। ১১টার পর ফুলিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে যায়। প্রতিভা ১১টার পর আফিস হইয়া পোস্টাফিস যায়, পরে সেখান হইতে এখানে আসে ২টার পর। বেণু তাহার পর আসে। নরেশকৃষ্ণের কাছে একটা পোষ্টকার্ড দেই। প্রতিভা 'ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ত্রুটি' নকল করে। সন্ধ্যার সময় আমরা আফিসে যাই। ৬।০ টার পর ধীরেনবাবু আফিসে আসেন। 'বিকলাঙ্গ' সম্বন্ধীয় চিঠিটা নিয়া আসেন, পড়া হয়; আমি দেখিবার জন্য রাখিয়া দেই। তাহাদের দেখে যাওয়া সম্বন্ধে কথা হয়। আবার শুক্রবার আসিবেন। হিরণ্ময় দেব চৌধুরী গৌহাটী হইতে পত্রিকার গ্রাহক করিয়া দিবেন জানাইয়াছেন, একজনের নামও পাঠাইয়াছেন। নিজের ও তাহার কাগজ V. P.তে পাঠাইতে লিখিয়াছেন। কিছু পরেই সুবোধ দে মহাশয় তাহার বন্ধু ডাঃ নন্দী সহ আসেন, আধঘণ্টা থাকেন। ডাঃ নন্দীকে গ্রাহক করিয়া দিবার কথা বলা হয়। তাহারা একটা পত্রিকা বাহির করেন তাহা দিবেন বলিলেন। ৯ টার সময় প্রতিভা যায়। তাহার পরেই কালীপদ বাগচী আসে। তাহার exteronment সম্বন্ধীয় কথাবার্তার পর আমার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রম পর্যন্ত আসে।···

সারা বিশ্বের প্রাণের মাঝে ঢুকিয়া বিশ্বপ্রাণের মধ্যে বিশ্বপ্রাণ বনিয়া গিয়া তাহাকে মন্থন করিয়া বিশ্বের বাহিরে ছুটিয়া আসিতে ইচ্ছা হয়, সারা দেহপ্রাণমনকে পুরুষোত্তম ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে ইচ্ছা হয়—Life is from within out—ভিমের ছানার খোসা ভাঙিয়া বাহির হইবার মত। সুহৃদের কাছ একটা পত্র আসিয়াছে। প্রেস হইতে পাঁচ্চা (২৫), প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা (১২০০), ও 'দেশের এবার জগৎটাকে' (৫০) রিপ্রিন্ট দিয়া যায়।

২৫শে জানুয়ারী

সার্বভৌম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবস

সকালে পতাকা তোলে—রেশমের একটা পতাকা, দাম দশ টাকা। ভূধরাম কিনিয়া আনে। ঠাকুরের ভোগের জন্য অমৃতী ও সন্দেশ আনে।···বেণু সকালে গল্‌ফ খেলিতে যায় গ্রাহকের জন্য। ১২টার পর আসে, প্রতিভাও আসে। কিছু পরেই হাওড়ার অজিত মল্লিক তাহার মোটর লইয়া আসে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবসের সভায় যোগদান করিবার জন্য। সে ছাড়িল না, যাইতে ইচ্ছা ছিল না। বেণু-প্রতিভা সহ হাওড়া পৌঁছি সাড়ে ৩টার পর। পথে লাটসাহেবের গড়ের মাঠে আগমন জন্য কিছু সময় আটকাইয়া ছিলাম। বেণু ৪।০ টায় চলিয়া আসে। আজ··· -এর আসার কথা। যাইবার সময় ভুলিয়া গিয়াছিল। সভার কাজ আরম্ভ হয় ৫ টায়। শোভাযাত্রা করিয়া আমাদিগকে নেওয়া হয়। সভাপতি হয় অজিতবাবু, সতীশ চক্রবর্তী মহাশয় প্রধান অতিথি। তিনি সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করেন। আমি ব্যাখ্যা করি। ভারতীয় নরনারীদের 'সম মর্যাদা' দিবার সঙ্কল্প আপনারা নিলেন। কিন্তু রাষ্ট্র ক্ষেত্র হইতে এই সঙ্কল্প নেওয়া হইলেও এ দেশের সামাজিক কাঠামো, দার্শনিক কাঠামো ইহাতে বাদ সাধিবে, যেমনটী হইয়া আসিয়াছে বুদ্ধদেবের আমল হইতে। সত্যকারেই শুধু অশোক-চক্র রাখিলে চলিবে না, যাহাতে দার্শনিক হিসাবে মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়া আর্য-অনার্য, বৌদ্ধ জৈন, খৃষ্টান মুসলমানকে ব্যাপকতম দর্শন ও চিন্তাধারার মধ্যে পরিণত করা যায়, তাহারই খোঁজ করিতে হইবে। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবন ছাড়া এ অসাধ্য সাধন আর কেহ করিতে পারিবে না। ৬।০ টার পর বওয়ানা হই। হাওড়ার পুল পার হওয়ার পরই গাড়ী আর অগ্রসর হইতে পারে না, ভিড়ে আটকাইয়া যায়। ৯টার পর পথ পাই, ১০টায়

কিছু আগে ঠেকিতে ঠেকিতে আশ্রমে পৌঁছি। প্রতিভা রাত্রিতে এখানেই থাকে।...

২৬শে জানুয়ারী

গত রাত্রিতে মোটর গাড়ীতে গঙ্গার হাওয়ায় খুব ঠাণ্ডা লাগায় শরীরটা ভার বোধ হয়, পা'টাও খুব ফুলিয়াছে। 'আমার কর্মই কর্মপদবাচ্য। কিন্তু ইহা খুব সত্য যে, আমার কর্ম আমাকে সার্থক করিতে পারে না, আমার কর্মের মধ্যে ফাঁক থাকিয়াই যায়, যদি না পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্ব-বিশ্বাতীতের দৃষ্টি সেই কর্মের পরিপূরক হয়। পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্ব-বিশ্বাতীতের দৃষ্টি ও সহযোগিতাই করুণাপদবাচ্য। তাই তো 'পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বম্ ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর' মন্ত্র। ভগবানের করুণা, পরিবারের করুণা, সমাজের করুণা, রাষ্ট্রের করুণা, বিশ্বের করুণা, বিশ্বাতীতের করুণাই মানুষের কর্মের অপরার্দ্ধ। মানুষ যুগপৎ কর্ম করিয়া ও করুণা পাইয়া অনন্তের পথে আগাইয়া চলিতেছে। ইহার কোনও এক দিকের উন্মেষ বাধাপ্রাপ্ত হইলে মানুষের দেহপ্রাণনে বৈকল্য উপস্থিত হয়। মানুষ একাধারে ব্যষ্টি ও সমষ্টি। ব্যষ্টি জীবন ও সমষ্টি জীবনের সমন্বয়ই পুরুষোত্তম-জীবন।"

রেণু সকালে প্রিয়দারঞ্জন বাবুর কাছ হইতে ফুলগুলির ক্যালেণ্ডার লইয়া আসে। ১১টার পর এখানে আসে। প্রতিভা আসে ২টার পর। সন্ধ্যার সময় আফিসে যাই। ধীরেনবাবু আসেন ৬টার পর। মথুরাপুর রোডে নামিতে হইবে। ৯-১০ এ বালীগঞ্জের গাড়ী। দুই টাকা রাখিয়া যান। ধীরেনবাবুকে উল্লিখিত অংশটুকু দেওয়া হয় ঐ বিকলাঙ্গ সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসার উত্তরের সঙ্গে দিয়া দিবার জন্য। তিনিও কিছুটা লিখিয়া আনিয়াছিলেন। সকালে শিশির আসে...। অনেক কথাবার্ত্তা হয়। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার টাকাটা আফিসে দিয়া যায়।

২৭শে জানুয়ারী

সকালে 'ইণ্ডিয়ান কন্‌স্টিটিউশান' সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি করওয়ার্ড হইতে পাঠ করি। রেণু আসিয়া উদ্বোধনসহ বুধু, গদু, ভোলানাথ ও পদ্মরাণীকে টাকা দিবার জন্য নিয়া যায়। পদ্মরাণীকে দেয় না পেটের অসুখ বলিয়া। ১টার পর আসে। প্রতিভা আসে ২টার পর। চরিত্রহীন পাঠ হয়।...গীতাভবন হইতে মহেন্দ্র আসে। সে আধঘণ্টা থাকে। আবার গীতাপাঠের কথা বলে। আগামী রবিবার হইতে হইবে বলিয়া দিলাম। কাল ধীরেনবাবুদের দেশে যাইব। মাখনবাবু তাহার নিজের হাতের তৈয়ারী ২টী ফুলকপি শালগম ও আরও কি তরকারী আনিয়াছে। ...রেণু ৭৷৷০টার মধ্যে জ্যোতির্ময়ী মিত্রের সঙ্গে দেখা করিয়াছিল। দিল্লীর এক হিন্দুসভাপন্থী আমাদের গ্রাহক গত মাঘ সংখ্যার 'হিন্দুমহাসভা' (১২ পৃঃ) প্রবন্ধের খুব প্রতিবাদ জানাইয়া একটী পত্র দিয়াছে। ছত্রপতি শিবাজী হইতে আজিকার দিন পর্য্যন্ত হিন্দু মুসলমান সমস্যা সমাধানের ধারা ধরিয়া আমরা যে কথা বলিতে চাহিয়াছি, সে দিকে প্রতিবাদকারীর কোনও দৃষ্টিই পড়ে নাই। কি অন্ধ মানুষ! ইহার মধ্য হইতেই তো চলিতে হইবে। কিছুই তো মানুষ তলাইয়া দেখে না। এত superficial তাহাদের দৃষ্টি। অথচ বলিয়া যাইতেও হইবে। সপ্তস্রোতের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে বড় বৌয়ের সঙ্গে আলাপ হয়। দুপুরের কিছু পর কেশব গাঙ্গুলী আসে। সে আধ ঘণ্টারও উপর থাকে।

২৮শে জানুয়ারী

...ধীরেন ব্যানার্জীর দেশ রামবাটীতে 'রথীন্দ্র সেবায়তনের' উদ্বোধন উপলক্ষে যাত্রা।

ভোরে ৮-২৫ মিঃ আশ্রম হইতে রেণুসহ রওয়ানা হই। আমি মোড়ে দাঁড়াই, রেণু আফিস হইতে ধীরেন বাবুদের সেই ছাপানো বিজ্ঞাপনটা নিয়া আসে। স্টেশনে পৌঁছি ৮-৫৫-এ; ঢাকুরিয়া হইতে দুই ধীরেনবাবু, ধীরেন মজুমদারের স্ত্রী ও কন্যা ও জাম-কম্বল ওঠে। ১১ টার পর মথুরাপুর রোডে পৌঁছি। বাটী পৌঁছি ১২ টায়। ...পরিবেশন করেন মা। একটু বিশ্রাম করি। ২ টার পর সভা আরম্ভ হয়। সভাপতি হন গোপাল নগরের

ফণীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়। আমি প্রধান অতিথি। প্রথমে ধীরেন ব্যানার্জী উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন ও রথীন্দ্র সেবাশ্রমের জন্য একখণ্ড ভূমিদানের ঘোষণা করেন। সুধীরা মজুমদার, ধীরেন মজুমদার, রথীনের মাস্টার ও আমি বক্তৃতা করি। সর্বশেষে সভাপতির ভাষণ। ধীরেনবাবুর কন্যা ২টী কবিতা—'শেষ-শিক্ষা' ও 'শেষের খেয়া' আবৃত্তি করে। সভাপতির পুত্র হাক বাবু আরম্ভে ও শেষে সঙ্গীত গান। আজ পল্লী ব্রজে রাখালরাজ স্থাপনের দিন আসিয়াছে, সন্ধ্যা ছাড়া কখনও শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলা করেন নাই। মথুরা ধ্বংস হইবে, মথুরার শ্রীতে ব্রজ আবার উদ্ভাসিত হইবে। মুক্তি একার নয়, চাই সকলের মুক্তি। 'ন কামযে অহম্,' 'প্রাণেশ দেব মুনয়ঃ' শ্লোক দুইটী দ্বারা উপসংহার করি। ৫-৩০-এর গাড়ীতে রওয়ানা হইয়া ৭-২৫-এ বালীগঞ্জে পৌঁছি। আফিসে পৌঁছার পর ৮টা বাজে। রেণু ঘরের শীষ, আমের মুকুল ও কতগুলি শালুকের গোলা নিয়া আসে। বেশ ভাল হইয়াছে, ভাল লাগিয়াছে। লোক বেশ হইয়াছে। বন্দোবস্ত ও আদর যত্ন সুন্দর। কাজ হইবে আশা করা যায়। মথুরাপুরের স্টেশনমাস্টার আমাকে চেনে। সে বরিশালে ডলাস্টিয়ারের কাজ করিত। সে উজ্জলকারতের মাষ সংখ্যা কিনিয়া নেয়। ফণীন্দ্রবাবু গ্রাহক হইবেন। প্রতিভা এখান হইতে চাবি লইয়া আফিসে গিয়া র‍্যাপার লেখে। আমরা আসিলে পর ৮৷৷০ পর যায়। আফিসে কালীপদ আসে। সে আধ ঘণ্টারও উপর থাকে।

২৯শে জানুয়ারী

সকালে ফাল্গুন মাসের জন্য গীতার অংশ ঠিক করার পর ৯ টার মধ্যে ডাক attend করিবার জন্য আফিসে যাই। কিছু পরে সেখানে সুধাংশু আসে। সুধাংশু থাকা কালীন ১০টার মধ্যে প্রতিভা আসে। প্রতিভা পোস্টাফিসে যায়। একত্র হইয়া ১২ টার কিছু পূর্বে আশ্রমে ফিরি। সুধাংশু সিঙ্গারা ও রসগোল্লা খাওয়ায়। বহুকে যতই একত্বের মধ্যে আনিতে চেষ্টা করা যাক না কেন, বহুর ঐ সংটুকু একের আমলে কিছুতেই আসিবে না, সেই জন্যই তো প্রয়োজন এক ও বহুর সমন্বয়। যে অংশ এক হইল আর যে অংশ হইল না অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া রহিল, তাহাদিগকে বৃহত্তর আর এক 'একের' মধ্যে সমন্বয় করার প্রয়োজন থাকে। যাহা সত্যই বহুর অর্থাৎ প্রাণের দিক, তাহা কিছুতেই একত্বের মাঝে নিঃশেষে এক হইবে না। পূর্ণও সব অপূর্ণকে পূর্ণ করিতে পারিবে না, অপূর্ণ থাকিয়াই যাইবে। পরিবার-বন্ধন সব বিশেষ ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্যকে ভাঙিতে পারিবে না, বৈশিষ্ট্যের ক্ষুধা সেখানে থাকিবেই, ইহা মানিয়া লইয়া পরিবার গড়িতে হইবে। Rigid একান্নবর্তিত তাই ব্যর্থ হইয়াছে, সব ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। সকালে রেণু সুবোধ দে'-র বাসা হইতে তাহাকে লইয়া অনেক স্থানে যায় গ্রাহক করিবার জন্য। ফেরে ২ টার সময়। বাসায় খাইয়া এখানে আসে ৩ টার সময়। প্রতিভা র‍্যাপার লেখে। সন্ধ্যার সময় আমরা আফিসে যাই।...ঠাকুরের পায়ে মাথা খুড়িয়া কাঁদি...ধনজন নাই, আবেষ্টন অনুকূল না থাকিলে কেমন করিয়া চলিব? তুমি আমার যাত্রাপথে সব-কিছু অনুকূল করিয়া দাও। ৯টার পূর্বে আশ্রমে ফিরি।

৩০শে জা

...সকালে ৮৷৷০ টায় আফিসে যাই ডাক attend করিবার জন্য। রেণু ইতিমধ্যে বাহির হইয়া গিয়াছে। সে ১১ টায় ফেরে। সে খাইয়া ১১৷৷০ টায় বাহির হয়। আমি ও সে ট্রাম পর্যন্ত আসি। সে কোরাম ট্রাস্ট, বুমিলা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ইত্যাদিতে যায়। ফেরে ৫ টায় কিছু পূর্বে। প্রতিভা পোষ্টাফিস হইয়া আসে ২ টার পর। প্রতিভার কাছে সকালে নারাণ ঘোষ আসিয়াছিলেন। নরেশগুরু তাহার পুত্র-কন্যাসহ সন্ধ্যার পর আশ্রমে আসে, তখন আমি আফিসে। ৪৲ টাকা রাখিয়া যায়, পরে আফিসে যায়। সেখানে ২০ মিনিট আন্দাজ থাকে। সে একদিন ধীরেন মজুমদারের বাড়ীতে

গীতাপাঠে গিয়াছিল বলিল। আফিসের দিনে উদ্বোধন-তহবিলের একাউণ্টে উপরোক্ত টাকা আছে।...

ভগবান সর্ব্বকৃতজ্ঞতাপাশ। ব্যক্তিগত জীবনের ফাঁক ভরিবার জন্য প্রয়োজন পরিবার-জীবনের, পরিবার জীবনের ফাঁক বুজাইবার জন্য প্রয়োজন সমাজ-জীবনের, সমাজ-জীবনের ফাঁক ভরিয়া উঠে রাষ্ট্রীয় জীবনের স্পর্শে, রাষ্ট্র জীবনের ফাঁক বিশ্ব-জীবনের চুম্বনে ভরিয়া যায়, বিশ্ব-জীবনের ফাঁক মুছিয়া যায় অনন্ত অগ্রসর বিশ্বাতীত জীবনের আলিঙ্গনে। ভজনের ভিতর মানুষ সৃষ্টি করে তাহার আবেষ্টনকে করুণারূপে এবং আবেষ্টন সৃষ্টি করে মানুষকে কর্ম্মরূপে। কর্ম্ম ও করুণা পরস্পরকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। এই পারস্পরিক সৃষ্টি ভজনের মধ্যেই সম্ভব হয়। কর্ম্ম ও করুণা একই ভজনের দুইটী দিক। ভজনের ভিতর ব্যষ্টি-সমষ্টি, ব্যক্তি-জাতি পরস্পরকে পরিপাক করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। ভজনের ভিতর কর্ম্ম-করুণা, ব্যক্তি-জাতি গলিয়া, পরিপাক হইয়া এক জীবনে পরিণত হয়। কর্ম্ম ও করুণা কিছুই একতরফা নয়। বালকের পরপাগলিতেই মা করুণাময়ী; মায়ের করুণাতেই বালক কর্ম্মী। তাই কর্ম্মের অঙ্গ হিসাবে 'দৈব' পঞ্চম বলিয়া গীতায় উক্ত।

৩১শে জানুয়ারী

খুব ভোরেই প্রতাপ গুহ রায়ের ওখানে যাই। তাহাকে গত বৎসরের ১ সেট উদ্বোধন দিয়া আসি পড়িবার জন্য। সেখান হইতে ৯টার সময় আফিসে ফিরি। আফিস হইতে ১১টার আশ্রমে ফিরি। বেলু খাওয়ার পর বিশ্রাম করিয়া ২টায় পাবলিসিটি ফোরাম, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, ক্ষেত্রবাবু, নিখিলবাবু, জ্যোতির্ম্ময়বাবুর ওখানে যাই। ৪টার পর নলিনীবাবুর গাড়ীতে বাসায় ফেরে। প্রতিভা এখানে ১২টার আগে আসে।... প্রতিভা বিষমঙ্গল প্রবন্ধটা লেখে। আমরা সন্ধ্যার আগেই আফিসে যাই। টালায় সত্যব্রত ঘোষ পত্রিকার চাঁদা ৪৲ টাকা দিয়া যায়। সন্ধ্যার পর ধীরেনবাবু আসেন। বিকালের সন্ধ্যার সেই চিঠিটা পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রামবাটীর যে স্থানটী তিনি 'রবীন্দ্র-সেবায়তন'-কে দিয়াছেন, তাহার মালিক তাহার ভাইয়েরাও, অথচ বড় ভাইয়ের অনুমতি নেওয়া হয় নাই। এখনই তাহার বড় ভাইয়ের নিকট পত্র দিতে বলা হইল। আগামী রবিবার গীতাপাঠ হইবে কিনা স্থির নাই। শনিবার যাহা হয় জানাইবেন। বিজলী দাসের জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগন্নাথ দাস এক পত্র দ্বারা তিনি একজন গ্রাহক করিয়াছেন এবং তিনি সম্ভবতঃ টাকাও পাঠাইয়াছেন—ইহা জানাইয়াছেন। কিরণময়ীর অত বড় বুদ্ধি ও ভালবাসার প্রবৃত্তির সংঘাতেই সে পাগল হইয়াছে। যদি কোনও মানুষের স্নেহস্পর্শ সে পাইত, কিংবা স্বীকৃতি পাইত, এ সঙ্ঘাত সময়ের কুটিয়া উঠিত। স্বামীর আদর সে পায় নাই, উপীনবাবুকে সে ভাল বাসিয়াছিল, সেখানেও আঘাত পাইয়াছে, আদর বা স্বীকৃতি পায় নাই। অত বড় বুদ্ধি ও প্রাণের দ্বন্দ্ব কি করিয়া সামলাইবে? শেষ পর্য্যন্ত সাবিত্রীর হাতে সাবিত্রীর বিরাট প্রাণের মধ্যেই তাহাকে আশ্রয় নিতে হইল। সেই ভার—কিরণময়ীর—উপীনবাবু সস্নেহে প্রকাশ্যভাবে লইলেন, কিন্তু তাহা মৃত্যুর পূর্ব্বে, এবং কিরণময়ীর পাগল হওয়ার পর। সেই স্নেহদৃষ্টি ও উদারতা যদি তাহার আগে প্রকাশ পাইত ও কিরণময়ী জানিতে পারিত, তবে কিরণময়ীর এতবড় বিপর্য্যয় আসিত না। সাবিত্রীর উপর সব পাগলা-পাগলীদের ভার দিয়া উপীনবাবু নিশ্চিন্ত হইলেন এবং এইখানেই সব সমাধান সম্ভবপর হইয়াছে। উপীনবাবুও যাহা পারেন নাই, সাবিত্রী তাহাই পারিবে। যোগ্য পাত্রই বটে।...

১লা ফেব্রুয়ারী

ক্রমশঃ

নীরব-কর্ম্মী সতীশচন্দ্র গুহঠাকুর

॥ শ্রীসুনীল কুমার ঘোষ ॥

যে সকল নীরব-কর্ম্মী, গ্রন্থপ্রিয় ব্যক্তি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন স্বর্গত সতীশচন্দ্র গুহঠাকুর ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার চরিত্র ছিল অম্লান কুসুমের ন্যায় চির প্রফুল্ল, স্বার্থত্যাগ উজ্জ্বল, নিষ্ঠা ধর্ম্মে সুমধুর। প্রিয়বন্ধু সতীশচন্দ্র গুহঠাকুর মৃদু ভাষণে সকলকে সন্তুষ্ট করিতেন, সরলতা ও অনাড়ম্বরে সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

আজন্ম গ্রন্থসেবী সতীশচন্দ্র গুহ বঙ্গীয় ১২৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বরিশাল জেলায় জন্ম লাভ করিয়া স্থানীয় শিক্ষালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার বিদ্যানুরাগ দেখিয়া সকলে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁহার ছিল সূক্ষ্ম বুদ্ধি, প্রখর মেধা ও অপূর্ব্ব বিবেচনা-শক্তি। গ্রন্থানুরাগ তাঁহার শিক্ষালাভের কাল হইতে এরূপ পরিস্ফুট হইয়াছিল যে, উত্তরকালে বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক রূপে তাঁহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল। বরিশাল জেলা ছিল তৎকালে জাতীয়তা-বোধের রঙ্গমঞ্চ; বহু পণ্ডিত, মনীষী, দেশ-প্রেমিক দেশাত্মবোধ প্রচার করিয়াছেন এই জেলা হইতে। প্রসিদ্ধ নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত, আদর্শ সমাজসেবী মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, আচার্য্য ললিত মোহন দাস ও জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ধর্ম্মপ্রাণ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (রাজনৈতিক নেতা শরৎকুমার ঘোষ) প্রভৃতি সকলেরই জন্মস্থান বরিশাল। যুগের মনীষিবৃন্দের মধ্যে জ্ঞান-সাধক ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত, ঐতিহাসিক প্রবর ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ সেন প্রভৃতি বরিশাল বা বাখরগঞ্জ জেলার লোক।

দেশকর্ম্মী সতীশচন্দ্র গুহঠাকুর দেশপ্রেম অর্জন করিয়াছিলেন মাতৃভূমির মাটি হইতে। দেশ-সেবায় আদর্শ ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত, কর্ম্ম সাধনার মন্ত্র, সমাজ কল্যাণের প্রধান লক্ষ্য। তাঁহার শিক্ষায় ছিল বিবেকানন্দের সেবাধর্ম্ম, মহাত্মাজীর নিষ্ঠা ও ত্যাগস্বীকার, দেশবন্ধুর দেশাত্মবোধ, সুরেন্দ্র নাথের কর্ম্মপ্রিয়তা ও গঠন মূলক প্রচেষ্টা, অশ্বিনীকুমার ও কৃষ্ণকুমারের স্বদেশী ব্রত গ্রহণ।

গ্রন্থাগারিক সতীশচন্দ্র গুহ প্রসিদ্ধ "জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ" হইতে জ্ঞান লাভ করেন। কলিকাতার এই সমুন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাঁহার জ্ঞানের উন্মেষ সাধন করে। গ্রন্থ-সেবা-ব্রতী সতীশচন্দ্র গুহঠাকুর নিজ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—"পূর্ব্ববঙ্গে বরিশাল শহরে এটর্নী দুর্গা চরণ গুহঠাকুরতা মহাশয় তাঁহার শহরস্থ বিস্তীর্ণ বাড়ীর এক প্রান্তে ৩৪ খানি চালাঘর তুলিয়া নিঃশুল্ক ছাত্রাবাস করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে ১০।১২ ছাত্রের বাসস্থান কুলাইয়া যাইত। ঠিকা বাসার আহার ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইত। পাঠ্যাবস্থায় (১৯০২-৬ খৃঃ) আমি ঐ ছাত্রাবাসে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলাম।

গোড়ার দিকে দেখিতাম বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন শ্রীসরৎকুমার ঘোষ, তিনি তখন ব্রজমোহন কলেজে বি, এ ক্লাসের ছাত্র। ইনিই পরবর্ত্তী জীবনে পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত।

ঐ ছাত্রাবাসে তখন আমি সকলের বয়ঃকনিষ্ঠ, এবং শরৎদা জ্যেষ্ঠ। প্রথম হইতেই জ্যেষ্ঠরা আমাকে অনুজের স্নেহ দান করিতেন। আমিও টোলের ছাত্রের মত সবাইকে অগ্রজের সম্মান দিতাম।"

আদর্শমূলক জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হইতে তাঁহার যে বিদ্যালাভ হয় তাহা নানা প্রকারে তাঁহার জীবন সুচারুরূপে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল এই সুশিক্ষার ফলে তাঁহার জীবনে পরিলক্ষিত হয়—

১। চরিত্র মাধুর্য্য—সুমিষ্ট বাক্য ও সদয় ব্যবহার ছিল তাঁহার অঙ্গের ভূষণ। তিনি ছিলেন অক্রোধী, নিরহঙ্কার ও নির্লোভী। সদাশয়তা তাঁহাকে সর্ব্বজন-প্রিয় করিয়া রাখিয়াছিল।

২। মানসিক দৃঢ়তা ছিল তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ধনাঢ্য নাগরিকের সংস্পর্শে আসিয়াও তিনি বিলাসিতা বা ভোগ লালসায় আকৃষ্ট হন নাই। দারিদ্র্যবরণ তাঁহার সমুজ্জ্বল আচরণেও বিশেষ লক্ষণীয় বস্তু—সরল জীবন যাপন ও উচ্চ চিন্তা ছিল তাঁহার আদর্শের বীজমন্ত্র।

৩। জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ হইতে শিক্ষা গ্রহণের ফলে তাঁহার দেশপ্রেম বা স্বাদেশিকতা হইয়া উঠিয়াছিল উগ্র, জাতীয়তাবোধ হইয়াছিল সচেতন ও সক্রিয়।

৪। ধর্ম্মপ্রবণতা তাঁহার ছিল নির্মল, কঠোর ও সুনিবিড়। মনে-প্রাণে তিনি ধর্ম্ম সাধনা করিয়া গিয়াছেন। সমাজকে বাদ দিয়া তিনি ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন করিতে চাহিতেন না। অনাড়ম্বর ধর্ম্ম সেবা তাঁহার প্রকৃতির অনুমোদিত।

৫। উদ্ভাবনী শক্তি তাঁহার জীবন-আলেখ্যে লক্ষণীয় বস্তু। বিরুদ্ধ সমালোচনার অটল-মতি হইয়া, স্ব-উদ্দেশ্য স্থাপনে স্থিরপ্রজ্ঞ সতীশচন্দ্র আপনার নিজ আদর্শ পন্থা হইতে বিচ্যুত হন নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন "প্রাচ্য বর্ণীকরণ ব্যাপারে।" পারিবারিক ও ও সামাজিক বিষয়ে নিজ আদর্শ প্রতিফলিত করিয়াছিলেন নানা দিক দিয়া।

৬। তাঁহার সরল ও সুগভীর শিক্ষা তাঁহাকে আনিয়া দিয়াছিল মহত্তর শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব। শিক্ষাগ্রহণে ছিল যে নিবিড়তা তাহাই রূপান্তরিত হইতে দেখা গিয়াছিল বিবিধ মনোরম বৈশিষ্ট্যে। সতীশচন্দ্রের অসংখ্য সহকর্ম্মী ও অগণিত বান্ধব তাঁহাকে বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় বলিয়া জানিতেন।

৭। বিশ্বপ্রেম বা মহামানবত্বার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সঙ্গীতের মধ্যে এই সুর বহুত, তিনি বলিতেন। মহাত্মাজী, টলষ্টয়, রলাঁতোল প্রভৃতির দর্শন তাঁহার নিকট ছিল আদরণীয়।

৮। বিবিধ প্রবন্ধ রচনায় তিনি মৌলিকত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। 'উদ্বোধন ভারতে' প্রকাশিত তাঁহার চিন্তাকর্ষক নিবন্ধ "মহাকবি রলাঁতোল ও মহা মানব পুরুষোত্তমানন্দ" তাঁহার বিশ্লেষণ শক্তি, রসগ্রাহিতা ও বিচার দক্ষতার পরিচয় দেয়। [কার্ত্তিক, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ]। মহাকবি রলাঁতোল ছিলেন সর্ব্বগুণসম্পন্ন রসস্রষ্টা। তাঁহার অপরিমিত রচনা অত্যন্ত জনপ্রিয়, রাষ্ট্রকবি হিসাবে তাঁহার সুযশ সুদূর প্রসারিত। তিনি মালাবার (কেরল) প্রদেশের লোক। সতীশচন্দ্রের জীবনে রলাঁতোলের প্রভাব দৃষ্ট হয়।

ধর্ম্ম-চেতনা সতীশচন্দ্রের ছিল উদার-প্রকৃতির। সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মের মধ্যে সারবস্তু তিনি উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। এ কারণ মহামানবরূপে দেখিতেন পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজকে। তিনি তাঁহার সমন্বয় যুক্তির পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া উদারনৈতিক মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন "মহাকবি রলাঁতোল এবং মহামানব পুরুষোত্তমানন্দ উভয়ে ভারতের এক মহা সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইয়া ভারতবর্ষ ও সমগ্র জগৎকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিবার জন্য মানুষ গড়ার কৌশল রাখিয়া গেলেন; মানব চিরদিন তাহা সম্বল করিয়া অগ্রগতির পথে চলিবে।"

তিনি আরও বলিয়াছেন "বাগ্মীরূপেও পুরুষোত্তমানন্দ অপরূপ! অধ্যাপক শশিভূষণ ৮।৯ বছরের বালকাকে এক নাগাদে তিন ঘণ্টাকাল মন্ত্রমুগ্ধবৎ বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে কুত্রাপি দেখি না যে, দীর্ঘকাল ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোনো বাগ্মী আসর জমাইয়া রাখিতে পারেন। স্বামিজীর প্রাণ ছিল একেবারে খোলা, হৃদয় আকাশের মত অসীম। আমি জীবনে অনেক বাগ্মীর বক্তৃতা শুনিয়াছি, যথা মাতাজী (মিসেস ডক্টর) এনি বেসাণ্ট, মাতাজী নিবেদিতা এডগার, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া, ডক্টর একতেল···সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, শ্রীঅরবিন্দ, লিয়াকৎ হুসেন, আবুল কালাম,

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অশ্বিনী কুমার দত্ত, মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, তিলক, গোখলে, লাজপত রায়, নটেশন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ দেবধর, মহাত্মা গান্ধী, শশধর তর্কচূড়ামণি, শিবনাথ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ চৌধুরী, আশু মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস, কৃষ্ণকুমার, শচীন্দ্র প্রসাদ, রাধাকৃষ্ণন, শিবস্বামী, কৃষ্ণস্বামী, রামস্বামী, প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্র শীল, আনন্দ মোহন বসু, কুমারস্বামী, ভগিনী নিবেদিতা, কৃষ্ণমূর্তি, দাদাভাই নাওরাজী, বসার্ডে, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আচার্য্য রায়, কাব্য বিশারদ, রামেন্দ্রসুন্দর, নেতাজী সুভাষ, যতীন্দ্র মোহন সেন, সখারাম গণেশ দেউস্কর, নেহেরু, কৃপালনী, বিনোবা, মহাদেব দেশাই প্রভৃতির বক্তৃতা স্বকর্ণে শুনিয়াছি। অনেকের বক্তৃতা পাঠ করিয়াছি, যথা কেশবচন্দ্র, কৃষ্ণপ্রসন্ন আচার্য্য, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বিবেকানন্দ প্রভৃতির বক্তৃতা সংগ্রহগুলি পড়িয়া দেখিয়াছি, বিশেষভাবে বিবেকানন্দ ও কেশবচন্দ্রের মুদ্রিত বক্তৃতাগুলি সযত্নে পড়িয়াছি। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের বক্তৃতা আমি অল্পই শুনিয়াছি; তবু আমি বলিতে পারি, তাঁহার মতন বাগ্মী আমি দেখি নাই। এমন মর্ম্মস্পর্শী প্রাণখোলা কথা অন্যত্র কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়। স্বামীজীর প্রতিটি বক্তৃতা প্রাণ-মন-হৃদয় আন্দোলিত করে।"

৯। পুস্তক-প্রিয় সতীশচন্দ্র গুহঠাকুর প্রচুর অধ্যয়ন ও উর্ব্বর মস্তিষ্ক ফলে যেরূপ উদ্ভাবনী শক্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে দেশবাসী উপকৃত হইয়াছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে তাঁহার অমেয় অভিজ্ঞতা প্রদান করিয়াছে উদ্ভাবনী শক্তির শ্রেষ্ঠ অবদান—"গ্রাচ্য বর্গীকরণ"। ডিউইর দশমিক পদ্ধতি ভারতীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে বা গ্রন্থাগারে উপযোগী হইবে না বুঝিয়া তিনি গবেষণা শক্তি সাহায্যে নিজ পদ্ধতি উদ্ভাবনা করেন। শ্রীরঙ্গনাথন বা মিঃ কাটারের বর্গীকরণ হইতে ইহা উৎকৃষ্ট তিনি দেখাইয়াছেন। ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহার স্বচ্ছ দৃষ্টি, বিবেচনা-শক্তি, ব্যাপকতা অনুধাবনের ক্ষমতা। স্থিতি স্থাপকতা গুণ ইহাতে সন্নিবিষ্ট, ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনা ইহাতে প্রকটিত।

১০। দেশপ্রেম ও স্বাদেশিকতা তাঁহার ছিল অনাবিল ও অকৃত্রিম। চরকা-কাটা তিনি গৃহ-কর্ম্মের অঙ্গ মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া লইয়া ছিলেন। বিদেশী প্রব্য-বর্জ্জন ছিল তাঁহার স্বভাব-সুলভ জীবনের ব্রত। বিদেশী ভাব গ্রহণ, আচার-ব্যবহার হইতেও তিনি বিরত থাকিতেন। চা-পান তিনি স্বগৃহে নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। অপর ভবনেও চা পানের পক্ষপাতী ছিলেন না। স্বকীয় উদ্ভাবনী শক্তিগুণে এক দেশী পানীয় প্রস্তুত করিয়া লইতেন। তাঁহার প্রিয় পানীয় ছিল কোন ফলের রস গরম জলে ফেলিয়া তিনি মিশ্রিত করিয়া পান করা। বিশেষ করিয়া তিনি ভালবাসিতেন পানিফলের গুঁড়া আদার রসের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিতে। গৃহে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আসিলে উহা দ্বারা আপ্যায়িত করিতেন। দুধ-চিনি সাহায্যে উহা হইয়া উঠিত মুখরোচক, পুষ্টিকর। কেহ কেহ বলিতেন ওভালটিন বা কোকোর মত আস্বাদ ইহাতে আছে। চিরদিন তিনি নূতনের পক্ষপাতী যাহাতে আছে আরাম, উপকার। গতানুগতিকের তিনি ছিলেন বিরোধী, যাহা আনে শরীরে ও মনে জীর্ণতা, দৈন্য, অপকার।

মধুরভাষী ইতিহাস-লেখক সতীশচন্দ্র গুহঠাকুরের ইতিহাসের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া বিস্মিত হই। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন সময়ের ইতিহাসে অভিজ্ঞ ছিলেন। ভারতীয় বীর্য্য কাহিনী পাঠে বিশেষ আনন্দ পাইতেন। মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত ও রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা আখ্যায়িকা আবেগভরে ব্যক্ত করিতেন। উড়িষ্যার খ্যাতনামা গজপতি কপিলেন্দ্র দেবের বীরত্ব কাহিনী একদিন বর্ণনা করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির পাণ্ডিত্য ও গবেষণা কার্য্যের জন্য তাঁহাদের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। কোনদিন বাঙ্গলা দেশের বাগ্‌ভূয়ার সমৃদ্ধি ও কৃতিত্বের উল্লেখ করিলে আনন্দোৎফুল্ল লোচনে তাহা

গ্রহণ করিতেন। রাজা গণেশ, রাণী ভবানী, অহল্যাবাঈ প্রভৃতি স্মরণীয়গণের প্রতি তাঁহার উচ্চ ধারণা ছিল অপ্রতিহত।

উড়িষ্যাদেশে খ্যাতনামা কপিলেন্দ্রদেব গঙ্গ বংশের শেষ রাজার মন্ত্রী ছিলেন। এই শেষ রাজা ১৪৩২ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ক্রমশঃ কুশাসনে ও অনাচারে দেশে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা আসিল। প্রবীণ ও বিচক্ষণ মন্ত্রী কপিলেন্দ্রদেব রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া উড়িষ্যায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে। একজন সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন কপিলেন্দ্রদেব মন্ত্রীর পদ হইতে স্বীয় বাহুবলে ও বুদ্ধির প্রভাবে সম্রাট পদবী লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভয়ে বাহ্মনী সুলতান ও বিজয়নগরের বীর সম্রাট পর্য্যন্ত শশব্যস্ত হইয়া থাকিতেন। এই সকল গৌরবকাহিনী বলিতে ও শুনিতে সতীশবাবু হইতেন অজ্ঞান। একবার স্বাস্থ্য পুনর্গঠন মানসে আমরা যখন বারাণসীধামে প্রায় তিন মাস ছিলাম, তিনি আমাদের বাসায় প্রায়ই আসিতেন ইহা ছিল চৌষট্টি যোগিনী ঘাটের নিকটে অবস্থিত। নানা প্রকার বিষয় তাঁহার সহিত আলোচনা হইত। তিনি তখন কাশীবাসী। ইতিহাসে তাঁহার দক্ষতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমি একদিন শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন বাঙ্গালার রাজা গোপালদেবের কাহিনী উত্থাপন করিলাম। পরে বলিলাম তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপালও প্রাতঃস্মরণীয় লোক। বাঙ্গালী যোদ্ধারা তাঁহার আমলে দুর্জ্জয় সাহসে দিগ্বিজয় করিতে বাহির হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল বঙ্গীয় সৈন্য সম্ভার লইয়া কাশী জয় করিলেন। অমিত তেজা বাঙ্গালী সৈন্যবাহিনী পরে কনৌজের পথে প্রয়াগ অধিকার করিয়াছিল। কনৌজ ছিল তখন ভারতের রাজধানী, ইহা জয় করিতে পারিলে সমগ্র ভারত স্বকীয় অধিকারে আসিতে পারে। ইতিহাসখ্যাত ধর্ম্মপাল নিজ বীর্য্যবলে কনৌজ জয় করিয়া স্বকীয় বন্ধু চক্রায়ুধকে সুবিখ্যাত কনৌজের সিংহাসনে বসাইলেন। ধীরে ধীরে উত্তর ভারতের সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্য তাঁহার করতলগত হইল। বাঙ্গালীবীর ধর্ম্মপাল অচিরে উত্তর ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিলেন। এই সকল ঐতিহাসিক কাহিনী শুনিতে শুনিতে ইতিহাসামোদী সতীশচন্দ্র গুহঠাকুর গর্ব্বস্ফীত বক্ষে অপলকদৃষ্টিতে চাহিয়া গৌরব অনুভব করিতেন।

সতীশবাবু স্বনাম প্রসিদ্ধ অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ডন সোসাইটির তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন) মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। জাতীয় শিক্ষাপ্রবর্ত্তনে উৎসাহী নেতা, নিরলস কর্ম্মী ও শিক্ষাব্রতীগণের সংস্পর্শে আসিয়া সতীশ চন্দ্র গুহঠাকুর নিজ জীবন ও চরিত্র আদর্শ-মূলক সূত্র এবং তৎকালীন প্রথা অনুসারে গঠন করিয়া তুলিবার শুভ সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ ছিল দেশসেবা, জীবনের লক্ষ্য ছিল পরোপকার ব্রত পালন। সরলভাবে সংযমী ও অবিলাসী জীবন যাপন বন্ধু প্রবর চিরকাল সাধন করিয়া আসিয়াছেন। সুরেন্দ্র নাথ, বিপিন চন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতির নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

তাঁহার ন্যায় সংযমী, অমায়িক ও নিরহঙ্কার ব্যক্তি কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। সদালাপী, মৃদুভাষী সতীশচন্দ্র দেশ-হিতব্রতী, কর্ম্মঠকল্পে সতত স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও চরখা এবং খদ্দর প্রচার করে আদর্শ বিস্তারের কথা ভাবিতেন। তাঁহাকে কোন দিন বিনা খদ্দরে দেখি নাই, —শীত কালেও নহে। অতিরিক্ত শীতে খদ্দরের জামার ব্যবহার করিতেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি শিক্ষকের কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে দেশ সেবার যজ্ঞে দিবারাত্র আত্মনিয়োগ করেন।

দ্বারবঙ্গের অধীশ্বর তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। দ্বারবঙ্গের (দ্বারভাঙ্গা) রেট লাইব্রেরীর গ্রন্থাধ্যক্ষরূপে তিনি সুনামের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন শুনিয়াছিলাম। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সুধীরত্ব সতীশ চন্দ্র গুহঠাকুরের কর্ম্মকুশলতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার বিবেচনা শক্তি, পাঠস্পৃহা, স্বাধীন চিন্তা যেমন অপূর্ব্ব, তেমনই অসাধারণ ছিল চরিত্রবল, অমায়িক ব্যবহার, সদাচার পালন প্রভৃতি গুণ। পরম নিষ্ঠার সহিত তিনি গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য যে ভাবে সুচারুরূপে

নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। গ্রন্থাগার বিদ্যায় তাঁহার নিবিড় পারদর্শিতা, শ্রেণী বিভাগের চরম সূক্ষ্ম দর্শন, তালিকা প্রস্তুতের নিয়মনিষ্ঠা, গ্রন্থ-পঞ্জী প্রণয়নের বিধি, পরিচালনা পদ্ধতি প্রভৃতিতে তাঁহার সুনিপুণ জ্ঞান তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহার মেধা, বিবিধ বিষয়ের অধ্যয়ন ও গবেষণা তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল।

শান্তিনিকেতনের সুপ্রসিদ্ধ কলা ভবনের সংগ্রহ-সচিব রূপে কার্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক যখন তিনি কিছুকাল করিয়াছিলেন, সেই কার্য্যে (কিউরেটার পদে) তিনি কর্ম্ম তৎপরতা, বিবেচনা শক্তি দেখাইয়া সকলকে প্রীতি ও আনন্দে বশীভূত করেন। বিচারবোধ তাঁহার ছিল অমের বৈজ্ঞানিক ক্রমপর্য্যায় নির্ণয়ের ক্ষমতা তাঁহার ছিল অসীম।

কর্ম্মদক্ষ সতীশ চন্দ্র কাশী বিদ্যাপীঠের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দি ভাষায় তাঁহার বুৎপত্তি ছিল প্রচুর। সে কারণে বহু লোকের সংস্পর্শে আসিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা বিপদ সঙ্কট বা অর্থকষ্ট কমাইতে পারে নাই। আজীবন বিদ্যাচর্চ্চা ও গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের অনুশীলন ছিল তাঁহার জীবনের ব্রতস্বরূপ। পুণ্যধাম বারাণসী ছিল তাঁহার বহুদিনের বাসস্থান এবং জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্র। মহামতি শিবপ্রসাদ গুপ্ত ছিলেন তাঁহার পৃষ্ঠপোষক, অভিন্ন বন্ধু ও মন্ত্রদাতা। গুপ্ত মহাশয় দানবীর, স্বদেশপ্রাণ ছিলেন। বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অকাতর দান তাঁহাকে চিরকাল অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহার ছিল প্রচুর পুস্তক সংগ্রহ। বঙ্গবাসী শিবপ্রসাদের বিরাট গ্রন্থাগার নির্দ্দোষ সতীশচন্দ্র বহুকাল কার্য্য করিয়া সুনাম অর্জন করেন। প্রখ্যাতনামা শিবপ্রসাদ গুপ্তের গ্রন্থাগারিক রূপে তাঁহার অর্থকষ্ট বিদূরিত হয়, উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য ঘনীভূত হয়। তাঁহারই সৌজন্যে সতীশচন্দ্র গুরুঠাকুর মহাশয়ের জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ হইবার সুযোগ ঘটে. বর্গীকরণ বিষয়ে তাঁহার উৎসাহ, চিন্তা ও উদ্ভাবনা শক্তি দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করি। ডিউইর দশমিক শ্রেণীবিভাগ (Decimal Classification of Melvil Dewey) পদ্ধতি আমাদের ভারতীয় সাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থগুলির পক্ষে উপযুক্ত নহে এই অভিমত প্রকাশ করেন।

নিষ্ঠাবান সতীশচন্দ্রের অমর কীর্ত্তি 'প্রাচ্যবর্গীকরণ'। প্রাচ্য বিদ্যার তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। সমস্ত জীবন তিনি বৈজ্ঞানিক বর্গীকরণের বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাহায্যে ভাষাতত্ত্ব বা নির্ণয় পদ্ধতি দ্বারা (philological system) তিনি প্রচুর গবেষণার সহিত ইংরাজী বা বিদেশী শব্দ ও বানানগুলি ভাষান্তরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জ্ঞানের গভীরতার ফলে তাঁহার প্রচেষ্টা ও অনুবাদ হইয়া উঠিয়াছিল মনোজ্ঞ। উপযুক্ত শব্দ তাঁহার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। দ্বারভঙ্গ (দ্বারভাঙ্গা), কাশী প্রভৃতি স্থানে অধিককাল বসতি ও নিষ্ঠার সহিত কর্ম সাধনা ও গ্রন্থাগার পরিচালনা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবার ফলে তিনি ইংরাজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দ্দু, ফার্সি প্রভৃতি বিষয়ে ভাষাগত পার্থক্য নির্দ্ধারণ করিতে অপরিমেয় সুযোগ পাইয়াছিলেন। ঐ সকল ভাষার জ্ঞান তাঁহাকে বর্গীকরণ কার্য্যে ও অন্যান্য গুরুতর সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিয়াছিল। শব্দচয়ন ব্যাপারে ও বিচারবোধ সম্মত বর্গীকরণ ধর্ম্মনির্ণয়ে তাঁহার মনোহর কৃতিত্ব বুঝিতে পারা যায় তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রাচ্যবর্গীকরণ ও অন্যান্য হৃদয়গ্রাহী রচনাবলী হইতে।

নিখিল ভারত গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার সিনেটহলে এক সম্মেলনে স্থির করেন যে, বর্গীকরণ ব্যাপারে পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত পদ্ধতিগুলি এদেশে সম্যকরূপে উপযোগী নহে, ঠিকভাবে খাপ খায় না, যে কারণ প্রাচ্য দেশগুলির জন্য একটি উপযুক্ত পদ্ধতি প্রবর্ত্তন আবশ্যক। সে সভায় ভারতের বিভিন্ন স্থান ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার হইতে যে সকল বিচক্ষণ গ্রন্থাগারিক ও কর্ম্মসচিব উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের লইয়া একটি বিশেষ সমিতি গঠন করা হয়; তাহাতে সতীশচন্দ্র, ডাঃ রঙ্গনাথন, শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন।

এই বিশেষজ্ঞ সমিতির বৈঠক বহুবার (এক যোগে)

না থাকিলেও, ব্যক্তিগতভাবে সতীশচন্দ্র গুহ ও রজনীথন মিত্র নিজ নিজ গবেষণা যথাক্রমে ১৯৩২ ও ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ কৃত প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতিটি সরস্বতী ভবন গবেষণা বার্ষিকপত্রের প্রথম খণ্ডে (১৯৩০) সম্পাদনকর্ত্রী কর্তৃক তদানীন্তন বারাণসীর স্বামী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ আচার্য মহামহোপাধ্যায় ভট্টর গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের ভূমিকা সংবলিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ভট্টর রজনীথন কৃত "কোলন ক্লাসিফিকেশন" ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ হইতে একবারে পুস্তকাকারেই বাহির হয়। [প্রবাসীর 'আষাঢ়, ১৩৩৬' দ্রষ্টব্য]।

"প্রাচ্যবর্গীকরণ পদ্ধতি" পুস্তকে যেমন সতীশচন্দ্রের মৌলিকতা পরিস্ফুট, "পুস্তকের জাতবিচার" নামক প্রবন্ধে সেইরূপ তাঁহার চিন্তার প্রসার ও প্রকাশ ভঙ্গীর নিপুণতা পরিলক্ষিত হইয়াছে। শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিল তাঁহার অমের। বারাণসীর "ভারতীয় জ্ঞান পীঠ" এবং "পার্শ্বনাথ জৈনাশ্রমে" তাঁহার প্রাচ্যবর্গীকরণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি প্রয়াগে হরিজন আশ্রমে "গান্ধী সাহিত্য ভবনে" ঐ পদ্ধতি অনুসারে গ্রন্থ বর্গীকৃত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতেও তৎ-প্রবর্তিত প্রাচ্যবর্গীকরণ পদ্ধতি তিরুপতি নগরে শ্রীবেঙ্কটেশ্বর গবেষণাগারে (অধুনা তিরুপতি বিশ্ববিদ্যালয়) পঞ্চদশ বৎসর যাবৎ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে [প্রবাসীর আশ্বিন ১৩৬৮ সাল দ্রষ্টব্য] এ ছাড়া বহু পত্র পত্রিকায় তিনি সুচিন্তিত ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।*

সাময়িকী

বাসন্তী অষ্টমীঃ বিগত ১০ই চৈত্র ১৩৬৭ বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের শুভ ১০৭-তম জন্মতিথি শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের সমাধি স্থান পুণ্য শুক্লপীঠ মহানির্বাণ মঠে (১১৩ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯) উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যগোপাল আজও জনসমাজে পরিচিত নন বলা যায়—তাই তাঁহার জন্মোৎসব লোকসমাজের অগোচরেই পড়িয়া থাকে। শ্রীনিত্যগোপালের জনসমাজে আলাদাভাবে পরিচিত হওয়ার পথে বাধা তিনি নিজেই অর্থাৎ তাঁহার প্রচারিত চিন্তাধারাই। তিনি বলিয়াছেন তিনি কোন আলাদা সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী সৃষ্টি করিতে আসেন নাই, কেবল যত সম্প্রদায়ের যত দৃষ্টিকোণ এ পর্যন্ত জন্মলাভ করিয়াছে, সেই সবগুলিরই স্বীকৃতি দিয়া সর্ববিশেষ সমন্বিত একটী নিখিলের ধর্মের রূপ দিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহাকে বিশেষরূপে ফুটাইয়া তোলা কোনদিনই যাইবে না—সর্ব বিশেষকে স্বীকার করিয়া তাহাকেও যে ছাড়াইয়া যাইতে হয়, এই চিন্তাধারাটা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও বিশ্বজনীন জীবনে শুধু ফুটিয়া উঠিবে—ইহাই অবধৃত অবস্থা। শ্রীনিত্যগোপাল বিশ্বের প্রতি নরনারীকে এই অবধূতাবস্থায় আহ্বান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ ভাবটীকে তো আজও ফুটাইয়া তোলা যায় নাই, তাই তাঁহার জন্মোৎসব আজও নীরবেই পালিত হইয়া আসিতেছে।

চারিদিকটা কেমন ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধকালীন উত্তেজনা অত সময়ে থাকে না সত্য, তাই স্বাধীনতার পূর্বের আন্দোলনের সময়কার উত্তেজনা, উদ্দীপনা এখন

---

* প্রবাসী ১৩৬৭ "প্রত্যাবর্ত" হইতে উদ্ধৃত।

১৩শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা ভাদ্র ১৩৮২ উদ্ভোধনকে লিখিত প্রবন্ধে সতীশ গুহ মহাশয় সম্বন্ধে কিছু জানা যাইবে।

পাওয়া যাইবে না ঠিকই, তবু গড়িবার কাজ তো শেষ হয় নাই—গঠন করিবার জন্য যে জাগ্রত চেতনা, যে সংকল্প, যে দৃঢ়তা, যে একমুখীনতা দরকার, জাতির জীবনে তাহা তো নাই! মানুষ কেমন যেন বেপরোয়া আছে। সকালে উঠিয়া রেডিয়ো শোনে, গান শোনে, খবরের কাগজ পড়ে, এটা ওটা সমালোচনা করে, চাকুরী করে কিংবা ব্যবসা করে কিংবা ইস্কুল কলেজে যায়, সিনেমা দেখে, খেলা দেখে, গল্প করে, পার্কে যায়, আবার রেডিয়ো শোনে বিকেলে, রাত্রেও এলিয়ে পড়া গান শুনতে শুনতে ঘুমায় ব্যস্—দিন কাটিয়া গেল। কোথাও গঠনমূলক কিছু নাই—দেহ গঠন, মন গঠন, চরিত্র গঠন—একজনের বা বহু জনের—কিছু নাই। ক্লাব সমিতি যেগুলি আছে সেগুলি যতটা দেহ গঠন চরিত্র গঠন করায়, তাহা হইতে বেশী নাটক, সাহিত্য আর আর্টের অনুশীলন করায়—বছরে একদিন ফুটবলওয়ালা বা ড্রিল মাস্টার ছবি কাগজে বাহির হয়—তাহা কি তাহাদের দৈনন্দিন দেহ-চর্চার অন্তর্গত? সেরূপ মনে হয় না। রেডিয়ো সিনেমা খবরের কাগজ সব কিছুর মারফত বুদ্ধির চর্চাই হয়—দেহ বা চরিত্র সংগঠন হয় কতটুকু? দেশ বিদেশের খবর, কে কি করিল না করিল ইত্যাদি জ্ঞানের সংবাদ জানিয়া কয়জন জীবনে সংকল্প লইল, প্রেরণা পাইল? জ্ঞান বা বুদ্ধি যতটা প্রেরণা মানুষকে তথা শিশু বা কিশোরকে দিতে পারে, তাহা অপেক্ষা বেশী প্রেরণা দিতে পারে সুস্থ সবল দেহ যাহার এমন মানুষ, কিংবা চর্চা করিয়া যে দেহকে সুস্থ সবল করিয়া তুলিয়াছে এমন মানুষ প্রত্যক্ষ-ভাবে। চরিত্রবান বা আদর্শবান মানুষের প্রত্যক্ষ স্পর্শ অপরকে চরিত্রবান হইতে বা আদর্শবান হইতে যতটুকু প্রেরণা দিতে পারিবে, বই পড়িয়া বা রেডিয়ো শুনিয়া সে প্রেরণা পাওয়া যায় না। তাই বলি শিশুরা, কিশোর বয়স্কেরা যে পরিমাণ বুদ্ধিমান হওয়ার মালমসলা পাইতেছে, সে তুলনায় প্রাণবান, চরিত্রবান, আদর্শবান হইয়া উঠিতেছে না—ইহাই আমাদের ভাবনার ও আলোচনার বিষয়।

সমস্যাটা হইতেছে চরিত্রবান ও আদর্শবান বলিতে আজ কি বুঝিব? পঞ্চাশ বা পঁচিশ বৎসর পূর্বে এই দুইটী শব্দে যাহা বুঝাইত, আজ কি তাহাই বুঝায়? সেইরূপ চরিত্রবান ও আদর্শবান হইতে কি আজকালকার শিশু কিশোর বা কেহই রাজী হইবে? না সেইরূপ তাহাদের করান সম্ভব হইবে? অথচ চরিত্রবান হওয়া বা আদর্শবান হওয়া বলিয়া নিশ্চয় কিছু আছে। সেটা কি তাহা আমরা অভিভাবকেরা জানি না বলিয়াই ছোটদের জানাইতে পারি না। অভিভাবক ও শিক্ষকদের আজ আমাদের আদর্শ কি, চরিত্রবান হওয়ার অর্থ কি এ সকল বুঝিতে হইবে।

তাহা হইলেই গোড়া হইতে সুরু করা দরকার। ইংরেজ আমাদের দেশে আসার পূর্ব পর্যন্ত আমরা জানিতাম এ সংসারে যে জন্মিয়াছি ইহা নিতান্তই পাপের ফল; সংসারের ওপারে ভূ-ভুবঃ-স্বঃ-জন-সত্য লোকে ভগবান থাকেন, এই দুইদিনের মায়াময় সংসার যত শীঘ্র পারা যায় ছাড়িতে পারাই মোক্ষ। যে বিষয় আশয় লইয়া থাকিত, সে-ও মনে জানিত এই সবই মিথ্যা, কেবল ছাড়াইতে পারিত না বলিয়াই জড়াইয়া আছে। পাশ্চাত্যের নিকট হইতে আমরা শিখিলাম এ সংসারেই ভাল করিয়া খাইব, পরিব; এই সংসারই সত্য—ভগবান বলিয়া কিছু নাই ইত্যাদি। সংসারকে মিথ্যা যাহারা বলিত তাহারা ভগবান পাইবার জন্য যে সকল আচার-আচরণ বিধি-নিষেধ দিয়া আমাদের জীবন বাঁধিয়া দিয়াছিল—আমরা সেগুলি সবই ভাঙিলাম। তা বেশ কথা—কিন্তু এ সংসার কি ভগবানকে বাদ দিয়াই সত্য? পাশ্চাত্যের এই শিক্ষা আমাদের ভুলিতে হইবে—এ সংসার সত্য সন্দেহ নাই—কিন্তু ভগবানের আবাসভূমি এই সংসারই সত্য—ঈশাবাস্যম্ ইদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—এই সব যা কিছু জগতের মধ্যে জগৎ সেই সবই ঈশাবাস্য—ভগবানদ্বারা—পুরুষোত্তম-দ্বারা আবাস্য। কাজেই ভারতবাসী এই কথাটাই আজ শিখিবে, এই আদর্শ ই লইবে যে ভগবানের আবাসভূমি এই সংসার সত্য—এখানে এমন করিয়া মিলিয়া মিশিয়া

খাইতে হইবে, পরিতে হইবে, যে কোন কাজ করিতে হইবে যেন তাহাতে শ্রীভগবানের প্রীতি জন্মে। কেবল আমার সুখের জন্য আমার জীবন নয়, কেবল আমার বা আমাদের যাহা মনের ভাল লাগার জন্য আমার সংসার নয়—আমার সংসার ভগবানের প্রীতির জন্য। ভগবানের প্রীতি হয় কিসে? সকলের যাহাতে তৃপ্তি,—দেশ কাল জাতি নির্বিশেষে সকলের যাহাতে সম্মান, আনন্দ রক্ষা পায় তাহাতেই ভগবানের প্রীতি। ভগবান কথাটা আনি কেন? সংক্ষেপে তাহার উত্তর এই যে ইংরেজের ছেলে যে কোন ইংরেজকে প্রাণসম ভালবাসে, কিন্তু ভালো চামড়া হইলেই তাহাকে শত্রু বলিয়া জানে—কেননা বর্ণ জাতি দেশ কাল সবকে যিনি বিধৃত করিয়া আছেন এমন কোনো ভগবানকে তাহারা জানে না। সবই ভগবান। ভারতবাসী ধর্মিও নিত্য করিয়া তাহার পাশের বাড়ীর লোকটিকেও ভালবাসিয়া উঠিতে পারিল না, তথাপি সে মনে জানে যে, বিশ্বে যেখানে যে কেহ আছে তাহাকেই আপন মনে করিতে হইবে। যাহা হউক, সংসার করিতে হইবে ভগবানের সংসার মনে করিয়া, ভগবানের প্রীতির জন্য। আজিকার ছেলে মেয়ের সামনে পাশ্চাত্ত্য হইতে পরিবর্তিত, আমাদের এতদিনকার মনোবৃত্তি হইতেও পরিবর্তিত এই আদর্শ তুলিয়া ধরিতে হইবে। এ কথা কি আমরা জানি?

চরিত্র বলিতে কি বুঝিব?—স্বভাব, রীতি নীতি, আচরণ, চালচলন, নীতি, ধর্ম। জীবন্তের স্বভাব এই যে সে স্বভাবতঃই যে কোন দিকে ঐকান্তিক হইয়া পড়িতে চায়। হয় সে প্রভুত্ব করিবে, নয় দাসত্ব করিবে, হয় সে পাপ করিতে ঝুঁকিয়া পড়িবে, নয়তো পুণ্য করিবার দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকিবে। এতদিন সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছিল না—পণ্ডিত, কুলীন, ধনীর আধিপত্য, পুরুষের আধিপত্য, পিতৃত্বের, অভিভাবকের, শিক্ষকের আধিপত্য অর্থাৎ যাহারই হাতে কোন রকম না কোন রকম ক্ষমতা আছে তাহারই আধিপত্য চালাইবার ঘুণ গিয়াছে। আজ ছোট যে, দুর্বল যে, কোন রকম ক্ষমতাহীন যে তাহারও একটা মর্যাদা, একটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি দিয়া চলিতে হইবে। খুব ভাল কথা—কিন্তু আমরা জীব কি না—তাই যখনই আত্মস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইল, অমনি অপরকে সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা, বিনয়ী হওয়া, পূজ্যকে সম্মান করা, বয়োজ্যেষ্ঠেরও একটা মর্যাদা দেওয়া এ সকল আর রক্ষা করিতে পারিলাম না। এ সকল আজ উঠিয়া গিয়াছে। এইখানে আমরা পরাজিত হইতেছি। আজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে, প্রত্যেকেরই আত্মমর্যাদা বোধের সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধাশীল হওয়া, বিনয়ী হওয়া, অপরকে মর্যাদা দান করিবার মত ধীশক্তিমান হওয়া, পূজ্যপূজাব্যতিক্রম যাহাতে না হয় সেদিকে যত্নবান হওয়া প্রভৃতি গুণ অর্জন করিতে হইবে। জাতীয় জীবনে এই সকল আয়ত্ত করা আজ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহা আয়ত্ত করিতে না পারিলে আমাদের জাতীয় জীবনে কিছুতেই শক্তি ও ত্যাগের মহিমায় মণ্ডিত হইবে না। চরিত্র বা চালচলন সম্বন্ধে আরও একটা কথা এই যে, ছেলে মেয়ের আজ বিচরণ ক্ষেত্র একটা—শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে উভয়কে একই সঙ্গে চলিতে হইতেছে। কাজেই উভয়ের দেহ মনের স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্য নিশ্চয়ই কোনো পথ বাহির করিতে হইবে। সে পথের প্রথম কথা হইল শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রই যেন এক থাকে, আড্ডাক্ষেত্র নয়। দ্বিতীয় কথা হইল প্রত্যেক ছেলে মেয়েকে বুঝাইতে হইবে যে সংসারে অপরের সঙ্গে সম্বন্ধটা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ, এ হাসি তামাসা নয়। তাই অপরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের বেলায় নিজের যোগ্যতা, স্থান, মর্যাদা, অপর দিকের এই সব বিবেচনা প্রভৃতি রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। আর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যতই থাকুক, বিদ্যা বুদ্ধি যতই অর্জন করা যাউক, অল্প বয়সে নিজের অভিভাবকত্ব নিজের হাতেই লওয়া উচিত নয়, নিজের মতামত পছন্দটা তাহাদের নিকট বলা যাইবে অবশ্য। সমাজ-চিত্ত গঠনে এই চিন্তাধারা আজ উপস্থিত করিতে হইবে।

যাহাহউক, এ সকল দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ—অভিভাবকগণেরও বিচার ও শিক্ষাসাপেক্ষ। আজ বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে শ্রীনিত্যগোপালের জন্মদিনে বসিয়া এই প্রার্থনা জানাই যে সমাজের বর্তমান বিষাইয়া পড়া তামস আবেষ্টনকে শ্রীনিত্যগোপাল যেন তাঁহার সমন্বয়ের দীপ্ত ধারা দিয়াইয়া তোলেন।

শ্রীযুক্ত মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম পোঃ দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
বি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

উদ্বোধন

বৈশাখ, ১৮৮৩ শকাব্দ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

১৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

পুরুষোত্তমানন্দের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখিতেছেন—

"রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে নূতন বিজয়ধ্বজা তুলিয়া নূতন সৃষ্টির উপকূলে পৌঁছিবার জন্য এ প্রলয় পারাবার পার হওয়ার যে ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, যে আহ্বানে তিনি বুঝিয়াছিলেন 'পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা আর চলিবে না', যে প্রেরণা তাঁহাকে জানাইয়াছিল এ বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মত শেষ হইয়াছে, এখানকার নোঙর এখন তুলিতে হইবে—নূতন সৃষ্টির সেই আহ্বানকে, সেই ডাককে, সেই প্রেরণাকে সার্থক করিয়া তুলিবে শ্রীনিত্যগোপাল-প্রবর্ত্ত সর্ব্বাঙ্গীন বিপ্লবাত্মক এই নূতন জীবনদর্শন…,"—উদ্বোধন, ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

"রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ও বিশ্ব এক 'নূতন যুগের ভোরে' আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।"—উদ্বোধন, ৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা।

শ্রীনিত্যগোপালের আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়, জড়-অজড় সমন্বয়ের এই প্রাণধর্ম যে যুগের হাওয়ায় আসিয়া গিয়াছে, রবীন্দ্রনাথে যে ইহার পূর্ণ সাহিত্যিক রূপ পরিস্ফুট তাহাই উল্লেখ করিতে পুরুষোত্তমানন্দ রবীন্দ্রনাথের লেখা উদ্ধৃত করিতেছেন, 'ভারতবর্ষ যে পরিমাণে আধ্যাত্মিকতার দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়ে প্রকৃতির দিকে ওজন হারিয়েছে, সেই পরিমাণে তাকে আজ পর্যন্ত জরিমানার টাকা গুণে দিয়ে আসতে হচ্ছে। এমন কি তার যথা-সর্বস্ব বিকিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। • • • আমাদের সাধনাকে যদি অত্যন্তভাবে প্রকৃতি অথবা আত্মার দিকে স্থাপন করি, তাহলে আমাদের ভিতরকার প্রকৃতি এবং আত্মার মধ্যে লড়াই বেঁধে যায়। তখন প্রকৃতি বলে, 'আত্মা মরুক আমি থাকি', আত্মা বলে, 'প্রকৃতিটা নিঃশেষে মরুক আমি একাধিপত্য করি'। তখন প্রকৃতির দলের লোকেরা কর্মকেই প্রচণ্ড এবং উপকরণকেই প্রকাণ্ড করে তুলতে চেষ্টা করে; এর মধ্যে আর দয়া মায়া নেই, বিরাম বিশ্রাম নেই। ওদিকে আত্মার দলের লোকেরা প্রকৃতির রসদ একেবারে বন্ধ করে বসে, কর্মের পাট একেবারে তুলে দেয়, নানাপ্রকার উৎকট কৌশলের দ্বারা প্রকৃতিকে একেবারে নির্মূল করতে চেষ্টা করে—জানে না সেই একই মূলের উপরে তার আত্মার কল্যাণও অবস্থিত।

এইরূপে যে দুইটী পরস্পরের পরমাত্মীয়, পরম সহায়, মানুষ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করে তাদের পরম শত্রু করে তোলে। এমন নিদারুণ শত্রুতা নেই—কারণ এই দুই পক্ষই পরম ক্ষমতাশালী"।

পুরুষোত্তমানন্দ ইহার পরেই লিখিতেছেন, "মহা কবির শেষ সিদ্ধান্ত এই যে 'প্রকৃতি এবং আত্মা, মানুষের এই দুই দিককে আমরা যখন স্বতন্ত্র ক'রে দেখেছি তখন যত শীঘ্র সম্ভব এদের দুইটীকে পরিপূর্ণ অখণ্ডতার মধ্যে সম্মিলিতরূপে দেখা আবশ্যক। আমরা যেন এই দুটি অনন্ত বন্ধুর বন্ধুত্ব সূত্রে অন্যায় টান দিতে গিয়ে উভয়কেই ক্ষুণ্ণিত না করি'।"—উদ্বোধন, ৭ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যগোপালকে

অনুসরণ করিয়া এই প্রকৃতি ও আত্মাকে এক 'পরিপূর্ণ অখণ্ডতার মধ্যে সম্মিলিতরূপে' দেখিয়া তাহাকেই দর্শন রচনা করিয়াছেন, নিজের জীবনের আচরণে তাহারই দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত ভারতীয় প্রস্থান-ত্রয়ের—উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতার—ভাষ্য প্রকৃতি ও আত্মাকে এই অখণ্ডতার দৃষ্টিতে দেখা হইতে রচিত।

পুরুষোত্তমানন্দ লিখিতেছেন,

"শ্রীনিত্যগোপাল প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে অদ্বৈত সমন্বয়ের, ব্রহ্ম-মায়া সমন্বয়ের যে বাণী নিজ জীবনে আস্বাদন করিয়া দার্শনিক ভাষায় সূত্রাকারে যুগের সামনে রাখিয়া গিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাহাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অপূর্ব সাহিত্যে ও সাধনার বিশ্বের সামনে উপস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। এতদিন এদেশে আত্মজ্ঞান ও পূর্ণজ্ঞান একার্থবাচকই ছিল। কিন্তু নিত্যগোপাল লিখিতেছেন যে, আত্মজ্ঞান পূর্ণজ্ঞানের 'এক শাখা' মাত্রই আর কিছুই নয়। পূর্ণজ্ঞানের এক শাখা 'আত্মজ্ঞান', পূর্ণ-জ্ঞানের অপর শাখা 'অনাত্মজ্ঞান' বা জড়ের জ্ঞান। এইরূপ বৈপ্লবিক ঘোষণা সত্তর বৎসর পূর্বে বাঙ্গলার একজন সমাধিস্থ পুরুষ অদ্বৈতবাদী বেদান্ত-অনুপ্রাণিত ভারতের বুকে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। উপরে উক্ত বাণীর উপব্যাখ্যান রূপেই যেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সুললিত সাহিত্যের ভাষায় লিখিয়াছেন: অর্জুন এবং কর্ণ সহোদর ভাই। মাঝখানে কুন্তীর বন্ধন তারা যদি না হারিয়ে ফেলত তাহলে পরস্পরের যোগে তারা প্রবল বলী হত। সেই মূল বন্ধনটী বিস্মৃত হওয়াতেই তারা কেবলই বলেছে, 'হয় আমি মরব, নয় তুমি মরবে'। তেমনি আমাদের সাধনাকে যদি অত্যন্তভাবে প্রকৃতি অথবা আত্মার দিকে স্থাপন করি, তাহলে আমাদের ভিতরকার প্রকৃতি এবং আত্মার মধ্যে লড়াই বেঁধে যায়। তখন প্রকৃতি বলে, 'আত্মা বলুক আমি থাকি', আত্মা বলে, প্রকৃতিটা নিঃশেষে মরুক আমি একাধিপত্য করি'।...ভারতবর্ষ আজ যে খ্রীষ্টান হয়েছে তার কারণ এই যে, সে একচক্ষু হরিণের মত জানতো না যে, যেদিকে তার দৃষ্টি থাকবে না সেই দিক থেকেই বাঘের মৃত্যুবাণ এসে তাকে আঘাত করবে, প্রাকৃতিক দিকে সে নিশ্চিন্তভাবে কাণা ছিল, প্রকৃতি তাকে মৃত্যুবাণ মেরেছে।...এ কথা যদি সত্য হয় যে পাশ্চাত্য জাতি প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করবার জন্য একেবারে উদ্যত হয়ে উঠেছে, তা হোলে একথা নিশ্চয় জানতে হবে যে, একদিন তার পরাজয়ের বজ্রাস্ত্র অন্য দিক থেকে এসে তার মর্মস্থলে বাজবে'।"

—পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার সমগ্র দার্শনিক আলোচনায় অর্থ সত্য যে নিজের প্রতিহিংসা নিজেই নেয়, এক তরফা গোড়ামির মধ্যে যে অপর পক্ষের গোড়ামি লুকাইয়া থাকে ইহাই দেখাইয়া উভয় পক্ষকে এক সমন্বয়ের মধ্যে বিধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে পুরুষোত্তমানন্দ লিখিতেছেন, 'প্রাণসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র কবিত্ববাদের ভিতর দিয়া সমাজকে মুক্তিক্ষেত্ররূপে, পুরুষোত্তমক্ষেত্ররূপে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের প্রতিভার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন'। —পৃঃ ৪২৭।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ যে অখণ্ড সামঞ্জস্যতাকে—প্রকৃতি ও আত্মা, জড় ও অজড়, দ্বৈত ও অদ্বৈত, নিত্য ও অনিত্য, জ্ঞান ও অজ্ঞান, চৈতন্য ও অচৈতন্য, গতি ও স্থিতিকে একত্র করিয়া যে অখণ্ড সামঞ্জস্যতাকে—উপনিষৎ বেদান্ত ও গীতার মধ্য দিয়া প্রস্থাপন করিয়াছেন, তাহারই সাহিত্যিক রূপ রচিয়াছে রবীন্দ্রনাথে। তাই যে যুগ-চেতনাকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ভাষায় অনন্য রূপ দিয়াছেন, তাহার দার্শনিক প্রকাশের পূর্ণাঙ্গ রূপ পুরুষোত্তমানন্দের রচনায় ও জীবনে।

প্রণাম

॥ শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় ॥

ভারতীর শ্রীমন্দিরে, ওগো কবি, আলি গন্ধধূপ
আরতি করেছ তুমি, অপরূপে দেছ নব রূপ।
অসীম সীমাতে হ'ল হারা, শিব সত্যে কোলাকুলি।
নিগূঢ় বিচিত্র রসে পূর্ণ হ'ল ধরণীর ধূলি।
বাসনার শতদল বিকশিল হৃদয়-তড়াগে।
অভিমানে, বেদনায়, রাগে, আনন্দেতে, অনুরাগে
মর্ত্যভূমি লভেছিল সঞ্জীবনী মন্ত্রের প্রসাদ।
তুমি এনে দিয়েছিলে সুন্দরের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ।

গতির যে দোলা চলে মাটি হ'তে আকাশের পানে,
রজনীগন্ধার বুকে নিত্য বায়ু যে কাঁপন আনে
যে সুর মূর্ছি পড়ে খুঁটিনাটি দৈনন্দিন কাজে,
তোমার কাব্যের ধ্বনি তারি মাঝে রহি রহি বাজে।

সমবেত হৃদয়ের শ্রদ্ধা সম্মুখে রাখিলাম,
শতাব্দীর অন্তরালে বাঙালীর সহজো প্রণাম।

পূরবীর সুরে মানবমুখিতা

॥ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত ॥

'বলাকা'য় রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনার মধ্যে বাহিরের আঘাতকে অবলম্বন করিয়া একটি নূতনভাবে জাগরণ দেখিতে পাই। ইহার ফল দেখা দিয়াছে কবির ক্রমবর্ধমান মানব-মুখিতায়। যৌবনে মানবপ্রীতি দেখা দিয়াছিল কল্পনা-মিশ্রিত একটা আকাঙ্ক্ষারূপে। একটা অন্তরাবেগের দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া এই মানবপ্রীতি চিত্তের অন্যান্য প্রকারের সকল আচ্ছাদন ভেদ করিয়া বিভিন্ন প্রসঙ্গে বার বার আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। 'নৈবেদ্য' হইতে আরম্ভ করিয়া 'বলাকা'র পূর্ব পর্যন্ত দেখি কবিচেতনায় অধ্যাত্মবোধের প্রাধান্য; এই অধ্যাত্মবোধ তাঁহার মানব-চিন্তাকে ঘুরে সরাইয়া দেয় নাই— কবি অধ্যাত্ম-অনুভূতির আলোকে মানবত্বকে উজ্জ্বল করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন, অধ্যাত্ম মূল্যবোধের দ্বারাই মানবত্বের সকল অর্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু 'বলাকা'র পর হইতে যে মানবমুখীনতা তাহার মধ্যে একটা নূতন ঝোঁক বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। এখানে বেগধ্বনির অধ্যাত্ম-আলোক পাত করিয়া জীবনকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার চেষ্টা না করিয়া কবি মানবত্বার আপন উজ্জ্বলাকেই নানাভাবে এমন বড় করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন যাহাতে মানবত্বার মর্ত্যসীমা-লঙ্ঘন-কারী মহিমার মধ্যেই দেবত্ব কেবলই আবিষ্কৃত হইতে থাকে। এখানে দেবতার আত্ম-নিবেদিত মানুষ অপেক্ষা মানুষের মধ্যে বিকশিত দেবতার কথাই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। এইজন্য দেখিতে পাই, 'বলাকা'র পর হইতে সৃষ্টিরহস্যের কথা এবং অধ্যাত্মরহস্যের কথা যত আসিয়াছে তাহা অধিকাংশ স্থলেই কবির নিজের ভিতরকার যে

একটি বিস্ময়কর কবি-পুরুষ তাহার রহস্য ও মহিমাকে অবলম্বন করিয়াই। কবিতার মধ্যে অধ্যাত্মচিন্তা অনেক সময়ই তাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে জন্মদিনের স্মরণে। 'পূরবী'র মধ্যে আসিয়া তাঁহার পূর্ব অধ্যাত্মবিশ্বাসের কথা গভীর করিয়া পাইলাম তাঁহার 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাতে। এই 'পঁচিশে বৈশাখ' তো একটি দিন বা একটি তারিখ মাত্র নয়,—

এই দিন এল আজ প্রাতে
যে অনন্ত সমুদ্রের শঙ্খ নিল হাতে,
তাহার নির্ঘোষ বাজে
ঘন ঘন মোর বক্ষ-মাঝে।

এই জন্মদিনের স্মরণের মধ্যে বিস্ময়ের সঙ্গে কবি দেখিয়াছেন নিজের ভিতরকার মানুষটিকেই—সেই মানুষটিকে দেখার ভিতরেই স্মরণ করিয়াছেন এই মানুষটির পিছনকার অখণ্ড জীবনের নির্ঝরধারাকে।—

মনে রেখো, হে নবীন,
তোমার প্রথম জন্মদিন
ক্ষয়হীন ;—
যেমন প্রথম জন্ম নির্ঝরের প্রতি পলে পলে ;
তরঙ্গে তরঙ্গে সিন্ধু যেমন উছলে
প্রতিক্ষণে
প্রথম জীবনে।

'পূরবী'র 'সৃষ্টিকর্তা' কবিতাটিতে কবির চিরকালের 'তিনি'র পদসঞ্চার শুনিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু সে পদসঞ্চার দেখা দিয়াছে কবির আত্মচেতনাকে অবলম্বন করিয়া।

জানি আমি মোর কাব্য ভালোবেসেছেন মোর বিধি,
ফিরে যে গেলেন তিনি বিশুর আপন-দেওয়া নিধি।
তাঁর বসন্তের ফুল বাতাসে কেমন বলে বাণী
সে যে তিনি মোর গানে বারবার নিয়েছেন জানি।
আমি শুনায়েছি তাঁরে, শ্রাবণরাত্রির বৃষ্টিধারা
কী অনাদি বিচ্ছেদের জাগায় যেমন সঙ্গীহারা।...
ছায়াতে তিনিও সাথে ফেরেন নিঃশব্দ পদচারে,
বাঁশির উত্তর তাঁর আমার বাঁশিতে শুনিবারে।

এই পর্যন্ত যেটুকু কথা তাহার সহিত কবির পূর্বযুগের কথার মোটামুটিভাবে মিল আছে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও কবির মানবচেতনা যে কতখানি বড় হইয়া উঠিয়াছে তাহার পরিচয় মেলে পরের কথায়—

যেদিন প্রিয়ার কালো চক্ষুর সজল করুণায়
রাত্রির প্রহর মাঝে অন্ধকারে নিবিড় ঘনায়
নিঃশব্দ বেদনা, তার দু'টি হাতে মোর হাত রাখি'
তিমিত প্রদীপালোকে মুখে তার স্তব্ধ চেয়ে থাকি,
তখন আঁধারে বসি' আকাশের তারকার মাঝে
অপেক্ষা করেন তিনি, শুনিতে কখন বীণা বাজে
যে-সুরে আপনি তিনি উন্মাদিনী অভিসারিণীরে
ডাকিছেন সর্বহারা মিলনের প্রলয়তিমিরে।

প্রেম এখানে কোনো দেশপ্রেম বা বৃহৎ মানবসমাজের প্রতি প্রেম নয়, নেহাৎ মানবী প্রিয়ার জন্য মানব প্রিয়ের প্রেম ; সেই প্রেমের মহিমার মধ্যেই অধ্যাত্মপ্রেমের মহিমা আবিষ্কৃত। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কবিতায় এই জিনিসটি যে এইখানে আসিয়াই এই প্রথম ধরিল এমন নহে ; এ জিনিস পূর্বেও আছে, শুধু ঝোঁকের মাত্রাটা একটু সরিয়া আসিয়াছে, এই কথাটাই লক্ষণীয়।

এই মানুষের প্রেমকেই মর্ত্য সবকিছু হইতে কবি শ্রেষ্ঠ মূল্য দিয়াছেন। তাহার কারণ, কবির মতে সৃষ্টি-বিবর্তনের ভিতরে পরম ধন যে মানুষের ভিতরকার পুরুষ-চৈতন্য, সেই চৈতন্যেরই ঘনীভূত সার বস্তু প্রেম। স্থানে স্থানে তাই কবি বলিয়াছেন যে মানুষের প্রেমের মূল্যেই হইল সৃষ্টির যাহা কিছু সকলের মূল্য। মানুষের প্রেমের মধ্য দিয়া মানুষ শুধু আত্ম-অতিক্রম করে না, মানুষ অতিক্রম করে সকল মর্ত্যসীমা। তাই—

যেখানে ধরণীর সীমার শেষে
স্বর্গ আসিয়াছে নামি
সেখানে একদিন মিলেছি এসে
কেবল তুমি আর আমি।

সেখানে বসেছিনু আসন কোলা
আমরা দোঁহে পাশে পাশে।

সেদিন বুঝেছিনু কিসের দোলা
দুলিয়া উঠে ঘাসে ঘাসে।
কিসের খুশি উঠে কেঁপে
নিখিল চরাচর ব্যেপে,
কেমনে আলোকের ছন্দ
আঁধারে হল তারাময়;
প্রাণের নিশ্বাস কী মহাবেগে
ছুটেছে দশদিক্‌গামী,
সেদিন বুঝেছিনু যেদিন জেগে
চাহিনু তুমি আর আমি।

যতদিন গিয়াছে ততই দেখিতে পাই কবির অন্তর্যামি-চেতনার সঙ্গে কবির মানবচেতনা—কবির ইতিহাস চেতনাও প্রধান হইয়া উঠিতেছে। এ বিষয়ে যে জিনিসটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় তাহা এই যে, এই অন্তর্যামি-চেতনা ও মানব-চেতনাকে কবি কোথাও পরস্পর-বিরোধী হইয়া উঠিতে দেন নাই, উভয়কেই একটী গভীর সঙ্গতির মধ্যে বর্ধিত হইতে দিয়াছেন। 'পরিশেষে'র মধ্যে আবার 'জন্মদিন'-এর কবিতা পাই জীবনের রুদ্রতাবোধ জীবনকে রুদ্রাক্ষের মালা করিয়া তুলিয়াছে, একটি একটি দিন যেন সে-মালার একটি একটি রৌদ্র-দগ্ধ অক্ষ। রুদ্রের রূপেই জীবন দেবতাকে এখানে কবি আহ্বান করিয়াছেন এবং কবিতার প্রথমাংশে এই রুদ্র জীবন-দেবতার কাছেই আবেদন জানাইয়াছেন এই জীবনের রুদ্রাক্ষমালা নিজের হাতে গ্রহণ করিতে।

আমার রুদ্রের
মালা রুদ্রাক্ষের
অন্তিম গ্রন্থিতে এসে ঠেকে
রৌদ্রদগ্ধ দিনগুলি রেখে একে একে।
হে তপস্বী, প্রসারিত করো তব পাণি
লহো মালাখানি।

জীবনের মূল্যবোধের রবীন্দ্রনাথের এই একটা দিক্—পূর্বের সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই বর্ধিত হইতেছে এই বোধ। 'গীতাঞ্জলি'র যুগে যে দেবতাকে কবি রুদ্র করিয়া দেখেন নাই তাহা নহে; 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী' একথা কবি জানিতেন এবং সেই সুরেতেই নিজে জাগ্রত হইয়া উঠিতে চাহিয়াছেন; 'ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার'—এ-কথাও সেই-যুগেরই কথা; নিজের হৃদয়ের মধ্যে 'তীব্র দাহন' জ্বালিবার আহ্বান কবি নিজেই জানাইয়াছেন। তথাপি যে কথাটি মনে হয় তাহা এই, 'গীতাঞ্জলি'র যুগে রুদ্রকে জীবনের এই রৌদ্রদগ্ধ দিনগুলি গাঁথা রুদ্রাক্ষের মালাখানি গ্রহণ করিয়া আবেদন জানাইয়াই শেষ করিতেন। কিন্তু এখানে কবি সেই আবেদন জানাইয়াই শেষ করিলেন না, কবিতাটির শেষে বলিলেন—

এ জন্মের গোধূলির ধূসর প্রহরে
বিস্মরণ-সরোবরে
শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ
দূর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ,
সব খ্যাতি, সকল দুরাশা,
বলে যাব, 'আমি যাই, রেখে যাই, মোর ভালোবাসা।'

কবিতাটির প্রথম অংশের সহিত শেষ অংশের যে কোনও বিরোধ আছে একথা বলিব না; কিন্তু মনে হয়, এক পূর্ণ দেবতার 'পূর্বের পদ পরশ'-এর মধ্যেই জীবনের সকল মূল্য একথাটাই কবিকে উদ্দীপিত করিয়া রাখে নাই; পূর্ণদেবতাকে কবি মনুষ্যত্বের পূর্ণাদর্শের মধ্যে নামাইয়া আনিয়াছেন—শাশ্বত মানবের মধ্যে যখন 'পরম পুরুষ'কে অনুভব করিতে চেষ্টা করিলেন তখন এই চিরকালের মানুষের জন্য যে অফুরন্ত ভালোবাসা কবি বলিয়া গেলেন সেই ভালোবাসাই তাঁহাকে জীবন-মূল্যে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে; তাই দেখি, একদিকে আবেদন 'লহো মালাখানি,' অন্যদিকে আশ্বাস—'আমি যাই, রেখে যাই, মোর ভালবাসা'। নিখিল মানবের ভিতর নিজের জীবনের এই মূল্যবোধের ধারণাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে পরিশেষের 'আমি' কবিতার মধ্য দিয়া—যে কবিতায় বলিয়াছেন যে ব্যক্তি-জীবনের মধ্যে প্রবাহিত যে 'আমি'—

সাধকের ইতিহাসে তারি জ্যোতির্ময়
পাই পরিচয়।

কিন্তু মানুষের সাধনার ভিতর দিয়া 'আমি'র এই জ্যোতির্ময় পরিচয়ের কথা বলিতে গিয়া কবি তাঁহার চিরদিনের 'তুমি'কে বিস্মৃত হইয়া যান নাই; সাধকের ইতিহাসের মধ্য দিয়া 'আমি' যে জ্যোতির্ময় পরিচয় লাভ করুক, বিশ্বমানবের ভিতর দিয়া ব্যক্তিমানব সার্থকতা লাভ করুক—এই ইতিহাস-চেতনাকে কবি তাঁহার অধ্যাত্ম-চেতনার সহিত অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যক্তিমানবের হৃদয়কমল যে ঘুমঘুমাতে ফুটিয়া উঠিতেছে তাহার ভিতর দিয়া মহামানবতার বিশ্বকমল ফুটিয়া উঠুক ইহাই যে 'তুমি'রও ইচ্ছা; তাই 'আমি'র এই জ্যোতির্ময় পরিচয়ের সহিত 'তুমি'র যে চিরন্তন যোগের বিশ্বাস তাহা ভঙ্গ হয় নাই। 'পরিশেষে'র 'আমি' কবিতার পাশেই তাই পাই 'তুমি' কবিতাটি যেখানে দেখি—

সূর্য যখন উঠাল কেতন
অন্ধকারের প্রান্তে,
তুমি আমি তার রথের চাকার
ধ্বনি পেয়েছিনু জানতে।

এই 'তুমি'র মধ্যে আবার দেখিতে পাই সেই যৌবনের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র সঙ্গিনীকে—

সংগীতে ভরি এ প্রাণের তরী
অসীমে ভাসিল যবে,
চিনি নাহি চিনি চিরসঙ্গিনী
চলিলে আমার সবে।

ইহার সহিত আবার যুক্ত হইয়া যাইতেছে 'চিত্রা'র অন্তর্যামী—'চিত্রা'র জীবনদেবতা—

আমার নয়নে তব অঞ্জনে
ফুটিছে বিশ্বচিত্র,
তোমার মন্ত্রে এ-বীণাতন্ত্রে
উদ্গাথা সুপবিত্র।
অতল তোমার চিত্তগহন,
মোর দিনগুলি সঞ্চেন নাচন,
তুমি সনাতনী আমিই নূতন,
অনিত্য আমি নিত্য।...

প্রেমের দিয়ালি দিয়েছিল জ্বালি
তোমারি দীপের দীপ্তি
মোর সংগীতে তুমিই সঁপিতে
তোমার নীরব তৃপ্তি।
আমারে লুকায়ে তুমি দিতে আনি
আমার ভাষার সুগভীর বাণী,
চিত্রলেখায় জানি আমি জানি
তব আলিম্পনলিপি।
হৃৎশতদলে তুমি বীণাপাণি
সুরের আসন পাতি
দিনের প্রহর করেছ মুখর,
এখন এল যে রাতি।

'পরিশেষে'র 'প্রাণ' কবিতাটি একটি সংক্ষিপ্ত কবিতা। এ বিষয়ে এরূপ সংক্ষিপ্ত কবিতা ইহার পূর্বে কবি আর লেখেন নাই। সংহতির গুণে কবিতাটি নিটোল মুক্তা। দীর্ঘ দীর্ঘ ভাবণে এবং দীর্ঘ দীর্ঘ কবিতায় নানাভাবে কবি জড় সৃষ্টির এবং সেই জড়সৃষ্টির ভিতর দিয়া প্রাণ ও চেতনার আবির্ভাবের যে রহস্যকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বিস্ময়কর সংহতাকারের সেই সমগ্র রহস্যটিকে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন এই কবিতাটির মধ্যে। ইহার মধ্যে উদ্গীত হইয়াছে চেতনার দীপে পরমোজ্জ্বল মানুষের বিজয়ধ্বনি।—

বহু লক্ষ বর্ষ ধরে জ্বলে তারা
বাষ্পময় অন্ধকার কালস্রোতে
অগ্নির আবর্ত ঘুরে উঠে।
সেই স্রোতে এ ধরণী মাটির বুদ্বুদ;
তারি মধ্যে এই প্রাণ
অদ্ভুত কালে
কণাতম শিখা লয়ে
অসীমের বক্ষে সে আরতি।
সে না হলে বিরাটের নিখিল মন্দিরে
উঠত না শঙ্খধ্বনি,
মিলত না যাত্রী কোনো জন,
আলোকের সামমন্ত্র ভাষাহীন হয়ে
রইত নীরব।

রবীন্দ্রনাথ

॥ শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী ॥

তুমি যে অতুলনীয়, অনিন্দ্যসুন্দর।
শুভ্র মনোহর, জ্যোতিষ্কের মত আকর্ষণীয়।
এ বিশ্ব তোমার পেয়েছে প্রণাম,
পেয়েছে অন্তরপ্রাণি সুপবিত্র প্রেম।
নন্দনের আনন্দ মধুর মনোরিরাম,
অমের অমৃত বার্তা তপঃসিদ্ধ ক্ষেম।
তোমাতে সম্পূর্ণ সত্য মূর্ত্ত পরিস্ফুট,
তোমাতে বিকচ ফুল্ল জলজ সম্পুট।
এ মৃত্তিকার তুমি পরমাপনার
শিশিরাক্ত তৃণে তৃণে প্রাণাণুকণায়।
পুষ্পে পর্ণে বর্ণাভরাগে,
মধুস্রাবি সুগন্ধী পরাগে
যে অখণ্ড যোগাযোগ প্রাণ থেকে প্রাণে।
তোমার অমের সত্তা সে চেতনাস্থধানে
দিবা রাত্রি প্রতিক্ষণ প্রাণময় বাঙ্ময়।
উদ্বেল মমত্ববোধে,
স্নেহাণুকণায়।
সঞ্জীবিত সংযোজিত বসুধা আত্মায়,
জীবনের শিলাপটে অঙ্কিত সপ্রেম প্রত্যয়।
কবি তুমি সত্যাশ্রয়ী মনীষী মহামহিম।
তারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ তুমি
মানুষের বন্ধু অকৃত্রিম।

মানবতার সাধক

॥ শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ॥

মানবসভ্যতার অগ্রগতির পথ কোনদিনই নিরঙ্কুশ নয়। ইতিহাসের আবৃত্তি থেকে দেখা যায় যে বারবার মানুষ নিজেরই অন্ধতা ও আদিম বর্বরতা দিয়ে মানবতার সহজ প্রকাশের পথ রুদ্ধ করেছে। একথা পুরাযুগ সম্বন্ধে যেমন সত্য ছিলো আধুনিক যুগ সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি সত্য। সভ্যতার এই ভাবীবহ সংকট দেখে সর্বপ্রথম এ'যুগের কবি রবীন্দ্রনাথ যে স্পষ্ট ভাষায় সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন তার মর্মার্থ আজ পৃথিবীতে অন্ততঃ চিন্তাশীল মানুষেরা কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করেছে।

বস্তুতঃ এই সঙ্কটের উদ্ভব হয়, মানুষ যখন তার ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে মনুষ্যত্বের অপমান করতে বসে। মানুষের মনে একটি আদিম লিপ্সা ও স্বার্থান্ধতার ছায়া আজ পর্য্যন্ত থেকে গিয়েছে। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপান্তর ঘটছে সত্য কিন্তু তা'তে আদিম নিষ্ঠুরতার হ্রাস হচ্ছেনা। কখনও ধর্মান্ধতার নামে, কখনও জাতীয়তা বা দেশাত্মবোধ এমন কি মানবহিতৈষণার নাম ধরেও এই আদিমতার আত্মপ্রকাশ ঘটছে। রবীন্দ্রনাথ এই যুগের পৃথিবীর মনে সেই বর্বরতার সুতীব্র বিকাশ লক্ষ্য ক'রে যে শঙ্কিত হয়েছিলেন সে কথা তিনি বারবার নানাভাবে প্রকাশ করেছিলেন। এমন কি তাঁর

"সভ্যতার সঙ্কট" প্রবন্ধে মানবতার এই অবক্ষয় আত্ম-গ্লানির প্রকাশ। কবি এই প্রবন্ধে বলছেন "ইউরোপের এই বর্বর নির্দয়তা যখন আজ এমন নির্লজ্জভাবে চারিদিকে উদ্ঘাটিত হ'তে থাকলো তখন এই কথাই বারবার মনে আসে—কোথায় রইলো মানুষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ আপিল পৌঁছবে আজ? মনুষ্যত্বের পরে বিশ্বাস কি তাহলে হ'বে—বর্বরতা দিয়েই কি চিরকাল ঠেকাতে হ'বে বর্বরতা?"

কবির এই আশঙ্কা যে অমূলক ছিলোনা তা উত্তর-কালে প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নারকীয় নৃশংসতার পরও আজ মানবনিধন যজ্ঞের সমারোহের শেষ হয়নি। আর এ'কাজে প্রধানতঃ অগ্রসর ইউরোপ ও আমেরিকা। ইথিওপিয়া থেকে চীন পর্যন্ত ব্যাপ্ত হ'য়েছে এই নির্লজ্জ সাম্রাজ্যলোলুপতার আকাঙ্ক্ষা। আজকের সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা হ'লো মানুষ-নিধনের সবচেয়ে মারাত্মক ও দ্রুত কার্যকরী অস্ত্রের আবিষ্কার। কেউ মানব-হিতৈষণার নামে, কেউ জাতীয়তার ছলনায় আর কেউ ইজ্‌ম্ এর ধোঁয়া তুলে এই কাজে ব্রতী। পৃথিবীতে আজ চন্দ্রগ্রহ আমাদের কাছে নিকটতর হ'য়ে গেছে। কিন্তু দুটি মানুষের মনে সংশয়, ঘৃণা ও হিংসার এবং আত্মঅহমিকার অন্ধকারে অন্তর্লীন রয়েছেন। পৃথিবীর এই অবস্থা লক্ষ্য করেই কবি বলেছিলেন

> দানবেরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
> শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।

অথচ এই দানবের হিংসা যজ্ঞে পৃথিবীকে ও মানুষের সমাজকে আহুতি দেওয়া চলেনা। অন্ততঃ কোন মানব-প্রেমিক মানুষই পৃথিবীর ভবিষ্যতের এই পরিণতি কল্পনা করতে পারেন না। আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তর্যামী মানব সৃষ্টির সঙ্গে যে আশাবাদ ও মনীষার উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন তাতে তাঁর মত কবির পক্ষে এ অবস্থাকে মেনে নেওয়া কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। তাই সমস্ত দিক থেকে পৃথিবী বিপদসঙ্কুল জেনেও তিনি আশা করেছেন যে এ বিপদসঙ্কুল থেকে মানুষের পুনরভ্যুত্থান ঘটবে। শুধুমাত্র আশা পোষণ করেই নিশ্চেষ্ট হননি কবি, তিনি সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। তাঁর সমস্ত জীবনই এই মানুষের কল্যাণসাধনার ব্রত।

এই প্রসঙ্গে আমরা মনে রাখতে পারি যে, ইউরোপে আজ যে এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতার, বর্বরতার প্রকাশ তার একটি কারণ এও যে, সমগ্র ইউরোপের মানুষ একান্ত-ভাবে বস্তুতন্ত্রবাদী। এই বস্তুতন্ত্রবাদ একদিকে তাদের বিজ্ঞান শিল্প ও অন্যান্য বহু বিষয়ে অগ্রগামী করেছে কিন্তু অন্যদিকে তারা আজ একান্তভাবে রিক্ত। দেশ জাতি ও সময়ের সীমাকে অতিক্রম ক'রে এক আত্ম-লোকে সকল আত্মার যে বিকাশ—সেই সত্য থেকে তারা ভ্রষ্ট জীবনের অমৃত ঐশ্বর্যের বোধ থেকে তারা বঞ্চিত। পৃথিবীতে সবকিছুকে তারা পেতে জেনেছে কিন্তু সেই সবকিছু পাওয়ার পরেও যে অনেককিছু না পাওয়া থেকে যায়, সেই জ্ঞান থেকে তারা বঞ্চিত। রবীন্দ্রনাথ—ভারত-দর্শনের ও প্রজ্ঞার বাহক রবীন্দ্রনাথ আমাদের নতুন ক'রে আবার সেই কথাই শোনালেন।

> "এক আত্মলোকে সকল আত্মার অভিমুখে আত্মার সত্য। এই সত্যের আদর্শে বিচার করতে হ'বে মানুষের সভ্যতা, মানুষের সমস্ত অনুষ্ঠান—তার রাষ্ট্র-তন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র।"

কবির মানসলোকে যে অনুভূতি, তার উপলব্ধি এসেছে উপনিষদের যুগ থেকে। একদিন এই ভারতবর্ষের ঋষি কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা'। মানুষকে অমৃতের পুত্র বলে ভাবতে পারার মত মহৎ উদারতা এই ভারতবর্ষের মানুষের মনেই ছিলো। তাই বহু বিচিত্র মানুষকে এক অমৃত সত্যে বিচার করবার প্রেরণা তাঁরা পেয়েছিলেন। আধুনিক পৃথিবীর ভোগের বিলাসের চাহিদা তাঁদের ছিলোনা; আত্যন্তিমান বা সাম্রাজ্য-লোলুপতাও ছিলোনা; তাই তাঁদের সাধনা ছিলো সারল্যের, সংযমের, সত্যের। পূর্ণ মানবকে চোখের সামনে রেখে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলো সে যুগের ভারতবর্ষ। আর সেই সাধনাই মূর্ত হ'য়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের

স্বপ্ন বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বললেন : "আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।"

এই উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে—সর্ব মানবের মধ্যে এক অপরিবর্তন ও অক্ষয় জীবন সত্যের উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই—পৃথিবী যে পরিত্রাণ পাবে বর্তমান সংকট থেকে এ' বিশ্বাস তাঁর ছিলো। তাই তিনি উদাত্ত আহ্বানে জানিয়েছেন পৃথিবীর মানুষকে :—

"এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে"

অনন্ত আশার বাণী শুনিয়েছিলেন :

"আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে—অপেক্ষা করে থাকবো সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে সে আসবে; মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এনে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই।"

মানব সভ্যতার পথ প্রতিমুহূর্তে আপন গতিবেগে আপনার মধ্যেই আবর্তের সৃষ্টি করে। এ' কথা শুধু পাশ্চাত্ত্য সম্বন্ধে নয় সর্বদেশের ও সর্বযুগের মানুষ সম্বন্ধেই সত্য। এই ভারতবর্ষে যেখানে মানুষের পূর্ণতার সাধনাই ঋষিদের সাধনা ছিলো, সেখানেও কি বারবার নানাভাবে মনুষ্যত্বের অপমান ঘটেনি? মানুষ কি আপন অন্ধতা দিয়ে মানুষকে ছোট ক'রে দেয়নি?

রবীন্দ্রনাথ 'সভ্যতার সংকট' দেখে যেমন ব্যথিত হ'য়েছিলেন এবং ইউরোপীয়দের পররাজ্য-লোলুপ নির্মম বর্বরতার প্রকাশে যেমন ক্ষুব্ধ হ'য়েছিলেন তেমনি ব্যথিত বোধ করেছিলেন এ'দেশেও মানুষের অশিক্ষা ও কুসংস্কার জনিত ক্ষুদ্রতায়। মানুষকে—তা' সে অন্যায় হোক, আর হীন প্রকৃতির হোক—বাদ দিয়ে, মানুষকে আঘাত ক'রে যে মানুষের দেবতাকে প্রসন্ন করা যায় না এই উপলব্ধিকে কবি প্রকাশ্যে সুউচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। এ'র জন্যে তাঁকে বহু লাঞ্ছনা ভোগ করতে হ'য়েছে। কিন্তু প্রতিবন্ধকতা না থাকলে সত্যের বিকাশ ঘটে না এই ছিলো কবির বিশ্বাস। তাই বারবার মুক্তকণ্ঠে বলেছেন :

ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

বস্তুতঃ ভারতবর্ষের মানুষের মন কি শতাব্দীর পর শতাব্দীর দর্মান্ধতা ও সামাজিক অনুশাসনে কলুষিত হ'য়ে যায়নি? এ' দেশেই কি মানুষকে মানুষের সম্মান দিয়ে মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করা হয়েছে? হীন অস্পৃশ্য, পারিয়া ইত্যাদি বিশেষণে অপাংক্তেয় ক'রে মানুষকে কি আমরা দূরে সরিয়ে রাখিনি?

কিন্তু এই অন্ধতা আমাদের স্বভাবধর্ম নয়। এ'র কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে কবি একটি চিঠিতে বলছেন :

"জগতের যেখানেই ধর্মকে অতিভূত করিয়া আচার আপনি বড়ো হইয়া উঠে সেখানেই মানুষের চিত্তকে সে রুদ্ধ করিয়া দেয়।"

কিন্তু এই অবস্থা ত' দীর্ঘস্থায়ী হ'তে পারে না। যখনই এই অবস্থার উদ্ভব ঘটে "তখনই ত' মানবের গুরু মানবের হৃদয়ের দাবি মিটাইবার জন্য দেখা দেন।"

কবির "অচলায়তন" নাটকটি এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। আচার ও পূজার্চনার কঠোরতায় চারিদিকে কঠিন পাথরের দেয়াল তুলে, পৃথিবী থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে মহাপঞ্চকরা অচলায়তন গড়ে তুলেছিলো, তখনই গুরু এলেন। কিন্তু তিনি এলেন যোদ্ধবেশে—সমস্ত প্রাকার ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে শোনপাংশু আর দর্ভকদের হাত ধ'রে দেখা দিলেন গুরু

অন্যত্র কবি লিখলেন—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছো অপমান
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।

এই সাধারণ মানুষ, অশিক্ষিত, অন্তর্ভুক্ত বা অনুভূক্ত মানুষ তাদেরকে আমাদের সমান না করে নিলে যে আমরা সর্ব মানবের দেবতাকে পাবো না, এ'কথা জানাতে কবির কোন কুণ্ঠা নেই। তাঁর সাধনাই হ'চ্ছে মানবতার সাধনা। তাই তিনি সুউচ্চ কণ্ঠে বললেন—

ওই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা। তাই পৃথিবী ব্যাপী মানবতার বেদনায় তিনি ম্রিয়মাণ। যেখানেই জাতি বৈরতায়, বা পররাজ্যলোলুপতায় মানবতা নিগৃহীত সেখানেই কবি মুহ্যমান। কিন্তু হতাশা বা পলায়নীবৃত্তিও তাঁর নেই। তিনি আন্তরিক ভাবেই বিশ্বাস করেন যে মানবতার এই চরম দুর্লক্ষণের দিনে মনুষ্যত্বের আত্ম-প্রতিষ্ঠার দরকার। পৃথিবীব্যাপী যে নির্লজ্জ বর্বরতার প্রকাশ আজ ঘটছে, তাকে প্রতিহত করতে হ'বে। এঁর জন্যে মানুষের শুভ যজ্ঞমন্ত্রেই আবির্ভূত হ'বেন।

আমরাও আশা করে আছি। কবির বাণী ঋষি-বাক্যের মতই অমোঘ। আমরা তাই জেনেছি যে পরিত্রাণ কর্তার আবির্ভাব ঘটছে।

শতবর্ষ পরে

॥ শ্রীভারতী ॥

শতবর্ষ আগে এই দিনে
বৈশাখের দীপ্তবহ্নি ছড়াইছে বনে
দিকবিদিকে আপন বৈভব;
সেইক্ষণে হে নবজাতক—
ক্ষুদ্র মুষ্টি দুটি ভরি এনেছিলে তুমি
রাশি রাশি আলোর সম্পদ।
সেদিন জানেনি কেউ, মন্ত্রপূতঃ কি মহাস্ত্র আছে ছিল তব
অমঙ্গলের সাথে সংগ্রাম তরে।

তারপরে দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ পথ, কত কর্ম কত কীর্তি
দিকে দিকে বাঁকে বাঁকে রেখে গেল চিহ্ন অনির্বাণ।
কত কবি, দার্শনিক কর্মযোগী মিলে
একক জীবন সূর্যে সহস্র দর্পণে ধরি দেখে
বিস্ময়ের নাহি পায় পার; তল কোথা?
কোথা তার সম্পূর্ণ স্বরূপ?
শুধু জানি, 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।
সেই সত্যে বারম্বার করি নমস্কার।

বারে বারে প্রণমি তোমারে।
হে জয়ী, হে কালজয়ী বিরাট পুরুষ
মূর্তিমান মুক্তবেদ হে মহান দূত
ধ্বংস করি পথে পথে অসুন্দর কণ্টকের রাশি
সূর্যালোকে উদ্ভাসিলে আরণ্য জগৎ।
মূঢ়তারে করিলে ধিক্কৃত।
মানুষের মুখে দিলে আরেকটু হাসি
মনে দিলে আরেকটু মধু,
সৃষ্টি যজ্ঞে হোম করি বেদনারে করিলে অমৃত।
মানুষের সেই তো গৌরব, সে গৌরবে
ললাটেতে জয়টীকা ধরে আজ সমগ্র ভারত।

আরো দূরে পশ্চিমেতে শ্বেত পারাবত
উড়ে চলে উচ্চারিয়া আজো মহাবাণী
সে সঙ্গীতে মুগ্ধ ধরাতল।
বৈশাখের দীপ্ত দাহে বরষার নব ধারাজল
স্নিগ্ধিয় সুন্দর।
সূর্যমুখী একচিত্তে পূরব পশ্চিম
বরষোঢ়ে বরে জপ সেই মন্ত্র সুধা।
আর্তজন চিত্তে পায় অসীম সান্ত্বনা,
দুর্বল সবলা হয়;
রাজপুত্র দুঃখ পায় বিশ্বজন লাগি

সুধীর নয়নে ঝরে জল।
ভালোবাসা হয় সর্বজয়ী।

কমনীয় ভালোবাসা দৃপ্ত তেজে তবু মহীয়ান।
'প্রশ্ন' তাই রেখে গেলে কাল হতে দূর কালান্তরে।
নবযুগ খুঁজিছে—উত্তর তার, মাগিছে আশীষ
'যাত্রার পথে' তব 'চেয়ে আছে উৎসুক।'

যে কবি, আজি শতবর্ষ পরে পরবিনী জন্মভূমি তব
জন্মদিনে পাতিয়াছে স্নেহ ক্রোড় খানি
আবার এসো ফিরে ফিরে এসো কবি
বঙ্গের আকাশে পুনঃ দেখা দিক বহু রশ্মি রবি।

শতবর্ষ পূর্ণ আজি—
ও চরণে প্রণমি আবার।

"আজি হতে শতবর্ষ আগে"

॥ জনাব রেজাউল করীম ॥

The East bowed low before the blast
In patient, deep disdain.
She let the legions thunder past
And plunged in thought again

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে ম্যাথু আরনল্ডের এই বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ল—মনে পড়ল সেই সুবিশাল রোম-সাম্রাজ্যের কথা, যার বিরাট জাঁকজমক, যার অক্ষৌহিণী সেনা সমাবেশ সারা বিশ্বকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছিল। প্রাচ্যদেশ সে-সব দিকে লক্ষ্যও করেনি। সে ছিল মগ্ন আপন মহতী চিন্তায়। হঠাৎ এই প্রাচ্যের বেথেলহেমের একটি নগণ্য কুটিরে প্রজ্জ্বলিত একটি অগ্নি-শিখাবোধের সমস্ত গর্বকে ম্লান ক'রে দিল, সেই শিখা আলোকিত করল রোমের প্রাসাদ শীর্ষকে, যার ফলে সারা ইউরোপ পেল নূতন পথের ইঙ্গিত। ঠিক তেমনি ভারতে যখন ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তখন এই পদানত দেশের একটি প্রান্তে জ্বলে উঠল নবীন জ্যোতি। সেই জ্যোতি সারা পৃথিবীকে আলোকিত করল, মানুষকে দিল পথের দিশা, নিষ্প্রাণ পরিবেশের মধ্যে বহিয়ে দিল আনন্দের স্বর্ণাধারা।—সেই আলো, সেই জ্যোতিই রবীন্দ্রনাথ।

আজি হ'তে শতবর্ষ পূর্বে এই শুভ পঁচিশে বৈশাখে বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর সেই গৌরবময় জীবন ছিল একান্ত-ভাবে জাতি ও বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য উৎসর্গিত। আজকের এই পুণ্যদিনে, একবার যখন অতীতের দিকে তাকাই, তখন একটা বিষয় দেখে বিস্মিত হই যে, এই দুই যুগের মধ্যে কত পার্থক্য! যেদিন তিনি অবতীর্ণ হন, সেদিন জাতি ছিল কত রিক্ত, কত দরিদ্র, কত শূন্য! তিনি তাঁর বিরাট প্রতিভা, অপূর্ব মনীষা, অনন্য-সুলভ কবিতাশক্তি দিয়ে জাতিকে নানাভাবে সার্থক ও পূর্ণ করেছিলেন। ব্যর্থ ছিল না তাঁর সে জীবন, সর্ববিধ সার্থকতায় মণ্ডিত ছিল তাঁর সে গৌরবময় জীবন। আজ শতবর্ষের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি—আমরা আজ পূর্বাচলের দিকে তাকাই অস্তাচলের ধারে আসি, কত পরিবর্তন হয়েছে এই ভারতবর্ষের। সেদিন যারা তাঁকে দেখেছিল, তাদের থেকে আমরা কত সৌভাগ্যবান। তাঁরা তাঁর প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাননি। কিন্তু আমরা তাঁর প্রতিভা বিকাশের প্রত্যেকটি স্তরকে দেখবার ও বুঝবার পূর্ণ সুযোগ পেয়েছি। তাঁর মুক্ত হস্তের অজস্র দানে আমাদের পাত্র পূর্ণ, আমাদের

জীবন ধন্য, আমাদের জন্ম সার্থক। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে বৈশাখ আমাদের কাছে যত সার্থক, শতবছর পূর্বে সে যুগের মানুষের কাছে ততটা সার্থক ছিল না। আমাদের যুগ সত্যই ধন্য।

আজি হতে শতবর্ষ পূর্বে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের যুগের ছিল কতকগুলি বৈশিষ্ট্য; সেগুলি না জানলে তাঁকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তিনি তাঁর যুগের সমুদয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই হয়েছিলেন আবির্ভূত। সে যুগে বঙ্গদেশের তথা ভারতবর্ষের নানাস্তরে বিপ্লবের পদধ্বনি শুনা যাচ্ছিল—সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক। জাতি ছিল পরাধীন সত্তা। কিন্তু বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে রুদ্ধ করার মত মনোবৃত্তি জাতির ছিল না। সমাজের সর্বস্তরে বিপ্লবের সুর ওতপ্রোত হতে লাগল। এই সব বৈপ্লবিক ভাবধারা সমগ্র দেশকে ঝাঁকিয়ে দিল। প্রথমেই বলতে হয় রামমোহনের কথা। তিনি ছিলেন ভারতের রিনেসান্সের morning star—শুকতারা। রামমোহন সর্ববিধ কুসংস্কারের মূলে মরণ-আঘাত হানলেন। ধর্মের যৌক্তিকতার উপর বিশেষ জোর দিলেন। প্রাচীন সংস্কার, ধর্মান্ধতা, প্রাচীন রূপমুগ্ধতা—এই সবকে তিনি কঠোর ভাবে আক্রমণ করলেন। তাঁর rational আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও আরম্ভ হ'ল: এই সব আন্দোলন, প্রতি-আন্দোলন, বৈপ্লবিক ও বিপ্লব-বিরোধী কর্ম-পদ্ধতির ঘাতায় দেশ যখন উদ্বেলিত, তখনই হ'ল রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। তাঁর শৈশবের দিনগুলি কেটে গেছে এই সব বৈপ্লবিক-ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে। তিনি নিজের চোখে দুই দিকই লক্ষ্য করলেন এবং এ-সবের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েও পড়লেন। বিপ্লবের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে তাঁর আবির্ভাব বলেই বোধ হয় পরিণত বয়সেও তাঁর চিন্তাধারা থেকে বিপ্লবী মনোভাব কোনদিন বিদূরীত হয় নি।

সাহিত্যক্ষেত্রেও দেখা দিল অভিনব বিপ্লব। সাহিত্য-রচনার পদ্ধতি-রীতি-নীতি নিয়ে চলছিল নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কাদম্বরীর সংস্কৃত-ঘেঁষা গুরুগম্ভীর, শব্দাড়ম্বরপূর্ণ ভাষাকে উদার করলেন বিদ্যাসাগর। আর অন্য দিকে বঙ্কিমচন্দ্র শক্তিহীন নিস্তেজ বাঙলা সাহিত্যের দেহে নূতন প্রাণ সঞ্চার করে চাঙ্গা করে তুললেন। তিনি আনলেন একটা critical outlook—সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী। দুর্বল জীবপ্রাণ ভাষাকে তিনি মহান ও সুউচ্চ ভাব প্রকাশের বাহন করে তুলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশবকালের মধ্যেই আর একটা আন্দোলন দেখলেন—সেটা হচ্ছে, "জাতীয় আন্দোলন"—এটা কিছুটা ছিল রাজনৈতিক, আর কিছুটা সাংস্কৃতিক। দেশের এই জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হ'ল, বিদেশী শাসকের উদ্ধত আচরণের বিরুদ্ধে—আর এদেশের এক শ্রেণীর লোকের দাসমনোভাবের বিরুদ্ধে এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা ছিল অতি মাত্রায় পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন। তারা এই কথা বলে আত্মপ্রসাদ পেত যে, আমরা সভ্যনেতা, আমাদের আপনার বলতে কিছু নাই, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার উপর নির্ভর করা ব্যতীত আমাদের চলবে না। এই হীন মানসিকতার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হতে লাগল। তবে এটাও অস্বীকার করব না যে এই জাতীয়তাবোধ পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতার ভাল জিনিষটাকে গ্রহণ করতে অসম্মত হয় নি। কেবল বিনা-বিচারে ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবন দর্শনকে বর্জনের পদ্ধতির বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জানাল। রবীন্দ্রনাথ এই দুই দলের দ্বন্দ্বকে স্বচক্ষে দেখলেন। তিনি কেশব সেনের প্রভাব দেখলেন, রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দের আন্দোলনও দেখলেন,—তাঁর পূজনীয় পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেব-চরিত্রের প্রভাবও নিজের জীবনে সম্যকভাবে উপলব্ধি করলেন। তাঁর উদার ও সংস্কারমুক্ত ধর্মবোধের জন্য এইসব আন্দোলন প্রধানতঃ দায়ী।

এইরূপ একটা উদার ও বৈপ্লবিক আবহাওয়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পলে পলে মানুষ হয়েছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের যে আন্দোলন চলছিল, তারই মধ্যে তিনি আবির্ভূত ও তাঁর অপূর্ব প্রতিভার দ্বারা সব কিছুকেই সোনা করে তুললেন। পরবর্তী যুগের বিরাট, মহান রবীন্দ্রনাথ প্রথম যুগের রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা মৌলিক দিক্ দিয়ে পৃথক ছিলেন না।

শৈশবকালেই তিনি ছিলেন ক্ষুদ্র সংস্করণের বিরাট রবীন্দ্রনাথ।

অর্থসম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি কোন কিছুরই অভাব ছিল না তাঁর। কিন্তু তাঁর শৈশবকাল কেটেছে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে। মা থাকতেও তিনি মায়ের সেবা-যত্ন বেশীদিন পাননি। কারণ তাঁর জননী ছিলেন চিররুগ্না। সুতরাং কবির লালন পালন ও দেখাশুনার ভার পড়ল বাড়ির চাকর-চাকরদের উপর। তারা তখন তাঁর প্রতিভার পরিচয় পায়নি। তারা মনে করত চির-চরিত প্রথামত কড়া শাসনের মধ্যে রাখলেই বুঝি 'ছেলেটি' সভ্য হবে, ভাল হবে, ভাল চাকরী করবে। তারা তাঁকে কিছুতেই ঘরের বাইরে যেতে দিত না। অথচ কবির ছিল 'উড়িতে বাসনা মোর নীলাকাশে ভাসি।' তিনি চাকরদের জুলুমে কোথাও যেতে পারতেন না, কিন্তু মনে মনে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতেন—'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা, মনে মনে।' বন্ধ ঘরের আবহাওয়া যে কত বিরক্তিকর, কত ক্ষতিকর তা উপলব্ধি করতে কবির বেশী বিলম্ব হ'ল না। তাঁর বিবিধ কবিতায় এর পরিচয় তিনি দিয়াছেন,—

"ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই,
যাবনা আজ ঘরে,
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেব রে লুঠ ক'রে।
যেন জোয়ার জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশী
কাটবে সকল বেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা··· ।"

ছেলেবয়সের স্মৃতিকথা লিখবার সময় চাকরদের প্রভুত্বের বিষয় তিনি ভুলতে পারেননি। তাই একস্থানে বলেছেন, The period of slave dynasty in the history of India is not a happy one।

এমনি এক নিরানন্দ পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল কেটে গেছে। এই যুগের কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, বাল্যকালের যে-স্মৃতি তাঁর মনে পড়ে তাতে তিনি এই বুঝেছিলেন যে সেই শুকুমার বয়সেই তিনি গভীরভাবে প্রকৃতিকে ভালবেসেছিলেন ছেলে বয়সে ছোড়া-সাঁকোর বড় বড় অট্টালিকার মধ্যে তিনি ছিলেন আবদ্ধ; কিন্তু এই অবরুদ্ধ অবস্থাতেও তিনি বহির্জগতের স্পর্শের জন্য আকুল হতেন, ছটফট করতেন। ঘরের বাইরে যে সব মানুষ আছে, তাদেরকে জানবার জন্য, তাদের সান্নিধ্য-লাভ করবার জন্য তাঁর কি আকুল আগ্রহ! কি চরম আকুতি!

The school text book is not a work of art—বড় বড় মনীষা-সম্পন্ন মহামানবকে স্কুলের পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখলে তাঁদের প্রতিভা বিকাশের পথে মহা অন্তরায় উপস্থিত হয়। হোমার কালিদাস, সেক্সপীয়র—এঁরা কখনই এতবড় হতে পারতেন না, যদি এঁদেরকে বিদ্যালয়ের নিয়মবাঁধা পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে সীমিত করে দেওয়া হত। প্রকৃতির স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ পরিবেশে এঁদের প্রতিভা বিকশিত হয়েছে। তাঁর শৈশবের গুরুজনগণ রবীন্দ্রনাথকে বিদ্যালয়ের নিয়মাবদ্ধ সিলেবাসের শিক্ষা দিতে মনস্থ করলেন। তাঁকে সাধারণ স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। কিন্তু স্কুল তাঁর ভাল লাগল না। তিনি বলেছেন, The first experiment of school distressed me.—স্কুলের প্রথম অভিজ্ঞতা আমাকে ব্যথিত করে তুলল। উত্তরকালে যিনি সতত প্রাণমন নিয়ে অসীমের কোলে খেয়ে চলতে চেয়েছিলেন, মনে মনে যাঁর পৃথিবীর কোথাও হারিয়ে যাওয়ার ছিল না মানা, আর যিনি দেখতেন, চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন—সেই চিরমুক্ত, চিরস্বাধীন মানুষকে, স্কুলের পিঞ্জরে আবদ্ধ করে রাখলে চলবে কেন? স্কুলের পরিবেশ, বাঁধা-ধরা নিয়ম, কঠিন মাফিক পড়াশুনার চির-অভ্যস্ত পদ্ধতি এসব তাঁর সহ্য হল না। তাঁকে এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু স্কুলে তিনি কোন সুবিধা করতে পারলেন না। তাঁর অভিভাবকগণ চেয়েছিলেন তিনি আই, সি, এস, হবেন। কিন্তু আই, সি, এস, হওয়া তাঁর

যাতে সইল না। ডিগ্রির মোহ তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারল না। যাঁর একটা সুপারিশ পত্র সকল উপাধির বড় উপাধি বলে গণ্য হ'ত উপাধি তাঁকে কি মর্য্যাদা দিতে পারে? যিনি হাজার হাজার লোককে উপাধি দিয়ে ভূষিত করেছেন, তিনি কি ডিগ্রী বিতরণকারী বিদ্যালয়ে যাবতে পারেন? অভিভাবকগণ ভাবলেন, এ-ছেলের কিছু হবে না। তখন তাঁকে অগত্যা স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলেন এবং মনে করলেন বিলাত প্রেরণ করলে যুক্তিরা এর কিছু বিদ্যা হয়। তাই ১৮৭৮ সালে ১৭ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিলাত গমন করলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হলেন। তিনি অধ্যাপক হেনরী মোর্লির শিক্ষাধীনে লেখাপড়া শিখতে লাগলেন।

বস্তুতঃ, যাকে বলে self-taught man—আত্ম-শিক্ষিত মানুষ,—রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই জাতের ছেলে। এই যে, আত্মশিক্ষা, এটা ছিল তাঁর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। শৈশব-কালেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। অতি শৈশবে তিনি বিদ্যা আরম্ভ করলেন, বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ বর্ণ-পরিচয়। যখন তিনি প্রথম বানান করে পড়তে শিখলেন, তখনই তিনি জানিয়ে দিলেন যে, তিনি সাধারণ ছেলেদের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ পড়ার সময় তাঁর মনের উপর কি ছাপ পড়েছিল, তা সর্ব্বজনবিদিত। একদিন প্রথম ভাগের সেই অংশে উপনীত হলেন, সেখানে আছে 'জলপড়ে, পাতানড়ে।' এই অংশটি পড়েই তিনি চমকিত হয়ে উঠলেন। 'জলপড়ে পাতানড়ে'—এই শব্দগুলি তাঁর সম্মুখে প্রকৃতির অনন্ত রহস্যপূর্ণ এক জগতের দ্বার খুলে দিল। তিনি দেখলেন, এই শব্দগুলির মধ্যে নিহিত আছে একটি গভীর অর্থ,—কে যেন তাঁকে নিয়ে গেল এক অসীম রাজ্যে; রুমুরুমু-রুমুরুমু বৃষ্টি ঝরছে, পৎ পৎ করে গাছের পাতাগুলি কাঁপছে। তিনি কোন এক অজানা জগতের ছবি দেখতে পেলেন। সেই জগৎ যেন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে—তিনিও আকুল আবেগে সেই জগতের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন,—'থাকবোনা পড়ে এই বদ্ধ জগতের মধ্যে'—এই ভাবে তিনি ছয়মাস বৈশবেই কল্পনার সাহায্যে অসীম রহস্যময় জগতের মধ্যে অবাধে বিচরণ করতে লাগলেন। তিনি যেন একটা নূতন কিছু আবিষ্কার করলেন। আর এই আবিষ্কার আরও অদ্ভুত অদ্ভুত আবিষ্কারের দিকে নিয়ে গেল। পরবর্ত্তী জীবনে এই কবি আবিষ্কার করেছেন the lesson of unity and harmony—ঐক্য ও সমতানের শিক্ষা। সেই শিশু-বয়সে 'জলপড়ে পাতানড়ে' এই শব্দের মধ্যে তিনি সেই unity and harmonyর গভীর রহস্য কেন্দ্রীভূত হতে দেখেছেন। এই ভাবে তাঁহার প্রাথমিক জ্ঞান তাঁর নিকট হয়ে পড়ল রহস্য-জগতের তোরণ-দ্বার, যার মধ্যে দিয়ে কবি সৃষ্টির গভীরতম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারলেন। মাতৃভাষার ভিত্তি হ'ল মজবুত। এই ভাষাজ্ঞান তাঁর চরিত্র গঠন করতে সাহায্য করল। সেই থেকে তিনি শিখলেন, a deep consciousness of self respect—আত্মসম্মান সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি।

কবির ভিতরের মানুষটি এইভাবে তৈরী হ'ল। এখন সাধারণ ছেলের চেয়ে তাঁর জ্ঞান অনেক বেশী। তারপর ১৮৭৮ সালে পরিপূর্ণ মন নিয়ে তিনি চল্‌লেন লণ্ডন। সেখানে দু'বছর ছিলেন। তারপর ১৮৮০ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। পরবৎসর ১৮৮১ সালে আবার আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য ইংলণ্ড যাত্রার আয়োজন করলেন। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। লণ্ডন যাওয়া হল না। মাদ্রাজ থেকে কলিকাতায় ফিরে এলেন। তাঁকে educate করার জন্য—অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে শিক্ষিত ক'রে তোলবার চেষ্টা হতে লাগল। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। বিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মোহ থেকে তিনি সসম্মানে আত্মরক্ষা করলেন। বাল্যকাল থেকেই কবিতা রচনার অভ্যাস করেছিলেন। ১৮৮২ সালে ২১ বছর বয়সে তিনি 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' নাম দিয়ে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করলেন। এই সন্ধ্যাসঙ্গীত সর্ব্বত্র প্রশংসা অর্জ্জন করল। মানুষ বুঝল জোড়াসাঁকো পরিবারের মধ্যে একজন নতুন কবির আবির্ভাব হয়েছে, যিনি বাঁধাধরা নিয়মে চলেন না, নিজের নিয়ম নিজেই রচনা করেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বভাব কবি। ছন্দজ্ঞান তাঁর সহজাত বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির লীলা বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি

সুর শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু তা হলেও প্রথম জীবনে তাঁকে প্রভাবিত করেছিল বিহারীলালের কবিতা। 'জীবন দেবতার' ধারণা করতে বিহারীলাল তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রভাব পড়েছিল তাঁর উপর বৈষ্ণব লিরিক-কবিতার। অনুভূতির গভীরতা, দুঃসাহসিক কল্পনা, এবং বিচিত্র ছন্দের স্বাধীনতা—এই তিনটি গুণের জন্য বৈষ্ণব কবিতা চিরবিখ্যাত। জয়দেব ও গীতগোবিন্দের ললিত ঝংকার পূর্ণ একটি পংক্তি, কালিদাসের মেঘদূতের দু' একটি শ্লোক, তাঁর কানের মধ্যে দিয়ে একেবারে মর্মস্থল স্পর্শ করল—সেদিন মধুর স্পর্শ। শব্দগুলি শুনামাত্র তাঁর কল্পনা জেগে উঠল। প্রকৃতির রাজ্যে যা তিনি দেখতেন, তাকেই তিনি কল্পনার তুলি দিয়ে বাড়িয়ে তুলতেন। তিনি বলেছেন যে, বৈষ্ণব কবিতার lyrical ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে তাঁর মনেও ছবি অঙ্কিত হত। বৈষ্ণব কবিতা তাঁকে form বা বাহ্যিকরূপ দিয়েছে, আর তাঁকে শিখিয়েছে ছন্দকে নিয়ে নানারূপ পরীক্ষা করতে। এইভাবে কবিতার মূল তত্ত্ব তিনি অল্প বয়সেই শিখে ফেললেন।

এ-পর্য্যন্ত তিনি বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচিত হবার বিশেষ সুযোগ পাননি। এবার সে সুযোগ এল। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবার তাঁকে কলিকাতার বাহিরে বৃহত্তর জগতের মধ্যে নিয়ে গেলেন। পাহাড়-পর্ব্বত, নদী-নালা, বন জঙ্গল, সব কিছুর সহিত নিবিড়ভাবে পরিচিত হলেন। এর পূর্ব্বে সত্যিকার বাংলাদেশ দেখা তাঁর হয়নি। এবার বাঙ্গালাদেশকে দেখবার সুযোগ পেলেন—দেখলেন, এই সোনার বাঙ্গালা সৌন্দর্য্যের খনি; সম্পদের ভাণ্ডার আনন্দের চিরনিকেতন।

বাঙ্গলা দেশের দু'রকম চেহারা—একটি অপর থেকে পৃথক। একদিকে আছে গাঙের বাঙ্গলা,—সেখানকার নদীনালায় ধীর গতিতে চলে নৌকা, সেই নৌকা শস্য সম্পদে পূর্ণ। শ্যামলা বাঙ্গলার সর্ব্বত্র সবুজের সমারোহ—গাছে গাছে ফল, মাঠে মাঠে কাশ-ফুলের ঢেউ উঠে মনকে দুলিয়ে দেয়। নদীর বুকে পাল তুলে নৌকা ছুটে চলে—নদীয়া, শিলাইদহ, শাজিপুরে তিনি দেখলেন, এই বাঙ্গলার ছবি।

আবার অন্যদিকে আছে রাঢ় দেশের বাঙ্গলা,—বোলপুর যার বিশিষ্ট উদাহরণ। এ-বাঙ্গলা গাঙের বাঙ্গলা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এ অন্য বাঙ্গলা। এর পূর্ব্বে তিনি কেবল গাঙের বাঙ্গলা দেখেছেন। এবার রাঢ় দেশের বাঙ্গলার সঙ্গে পরিচিত হলেন। "মুক্ত করহে সবার সঙ্গে মুক্ত করহে বন্ধ"। প্রথমে তাঁর পূজনীয় পিতা তাঁকে বোলপুরে আনলেন। কিছুদিন এই বোলপুরেই থাকলেন। এখানকার প্রাকৃতিক রুক্ষ দৃশ্যাবলীর মধ্যেও তিনি একটা কোমলতার আভাষ পেলেন। এই কোমলতা ধীরে ধীরে মানুষকে বশীভূত করে—কিন্তু তার প্রভাব চিরস্থায়ী। বোলপুরের এই দৃশ্য দেখে কবি কি সত্যিই অনুভব করেছিলেন একদিন এই বোলপুর হবে সারা ভারতের তীর্থভূমি। কবি বলেছেন, এখানে এসে আমার অভিজ্ঞতার জগৎ শক্ত-হ'ল বলে মনে হ'ল। এ-পর্য্যন্ত যে সব ঘটনা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন অস্পষ্ট ছিল, সেগুলি এখানেই ঐক্য ও তাৎপর্য্যের ভিত্তি খুঁজে পেল। বোলপুর হ'য়ে পড়ল তাঁর সমস্ত সাধনার কেন্দ্রভূমি।

তা হলে দেখা গেল যে প্রথমে কলিকাতা, পরে লণ্ডন, এবং আরও পরে পল্লীবাঙ্গলা—এই সব স্থানে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করলেন কবি যার ফলে তাঁর অন্তরদেশ একটা নতুন আলোতে আলোকিত হয়ে উঠল :

কলিকাতায় থাকার কালে কতকগুলো নতুন ইমোশন লাভ করলেন। কিন্তু পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হবার পূর্ব্বে এই ইমোশনগুলি ছিল অস্পষ্ট আলোড়ন মাত্র। তারপর লণ্ডনের অভিজ্ঞতা। সেই সময় প্রাথমিক যুগের ইমোশনের স্পন্দন তিনি অনুভব করলেন। তারপর প্রত্যাবর্ত্তন করলেন স্বদেশে। এইভাবে জীবন সম্বন্ধে কবির মনে জেগে উঠল নতুনতর স্বপ্ন। তাঁর এই নতুনতর স্বপ্নের ইতিহাসের আছে তিনটি স্তর। যেমন আছে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের মনের ক্রমবিকাশের পশ্চাতে তিনটি সুস্পষ্ট স্তর। রবীন্দ্রনাথের মনোবিকাশের তিনটি স্তরের কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া দরকার।

প্রথমেই তিনি বুঝেছিলেন যে সৃষ্টির উৎপত্তিস্থল হচ্ছে Human soul বা মানবাত্মা। কিন্তু এর স্বজনী প্রেরণা একে এর নিজস্ব সত্তা থেকে দূরে নিয়ে যায় এবং পরিশেষে একে প্রকৃতির inner life—আত্মাভ্যন্তরীণ জীবনের সহিত যুক্ত করে, প্রকৃতির এই inner life মানবীয় বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ।—তাই কবি বলছেন, "যুক্ত করছে সবার সঙ্গে, যুক্ত করছে বন্ধ।"

তাহলে দ্বিতীয় স্তর—মানুষের ক্রম-প্রসারশীল জ্ঞান এবং প্রকৃতির স্পিরিট—এ দুয়ের মিলন হচ্ছে আনন্দের উৎস; এবং inner harmony of objects থেকে যে-আনন্দের জন্ম—তাকেই কবি বলেন সৌন্দর্য্য।

সর্বশেষে এল তৃতীয় স্তর—কবির নিকট আনন্দ বা সৌন্দর্য্য থেকে অভিন্ন সত্তা। কারণ তিনি বলেন যে অতি তুচ্ছ অতি সাধারণ বস্তুর উপরের পর্দা বা আবরণ তুলে ফেললেই জীবনের আসল তাৎপর্য্য ও প্রকৃত অর্থের ব্যাখ্যা করা সহজ হয়ে পড়বে। এই প্রসঙ্গে তিনি মি, এণ্ড্রুজকে বলেছিলেন, "I have felt ever since that this was my goal, to express the fulness of light in its beauty as perfection—if only the nail withdrawn." ওয়ার্ডসওয়ার্থ এইভাবেই নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তাঁর সেই ভাবকে তিনি অনবদ্য ভাষায় ব্যক্ত করেছেন :—

And I have felt
A presence that disturbs me with joy
Of elevated thoughts; a sense sublime
Of something far more deeply interfused,
Where dwelling is the light of
setting sun,
And the round ocean and the living air,
And the blue sky, and in the
mind of man.
A motion and a spirit, that impels
All thinking things, all objects of
all thought,
And rolls through all things.

এ-পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে যা বুঝলাম, তাতে মনে হতে পারে যে তিনি বাস্তবকে অগ্রাহ্য করে একেবারে দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার দিকে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ত শেলীর Skylark নয় :—তিনি ত the scorner of the ground নন, তিনি যে ওয়ার্ডসওয়ার্থের আদর্শের অনুগামী। তিনি True to the kindred points of Heaven and Home. এই সময় ভারতে আত্মপ্রকাশ করল জাতীয়, তথা বন্ধন-মুক্তির আন্দোলন। তিনি কি কেবল দর্শনের তত্ত্বকথায় সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত হয়ে থাকতে পারেন? দেশ তাঁকে ডাকল :—তিনি সে ডাকে সাড়া না দিয়ে পারলেন না। কিন্তু এখানেও তিনি তাঁর বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

দেশ-প্রেম তাঁর ছিল অত্যন্ত গভীর। কিন্তু তাঁর দেশ-প্রেমের মধ্যে লেশমাত্র ইংরাজ-বিদ্বেষ ছিল না। সমাজের মধ্যে যে-সব পাপ দুর্নীতি প্রবেশ ক'রে দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করছিল, রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ সেইগুলির সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। তিনি ইংরেজকে গালাগালি দিলেন না। আমাদের অধঃপতির সমস্ত দায়িত্ব ইংরাজের স্কন্ধে চাপিয়ে দিলেন না। তিনি করলেন আত্ম-সমালোচনা। আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য আমরা কতটা অধঃপতে হয়ে পড়ছি, সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলেন। অতীতের প্রতি তাঁর একটা গভীর ভালবাসা ছিল। কিন্তু এই আত্ম-সমালোচনা তাঁর অতীত প্রেমকেও কিছুটা লঘু করে দিল। Unity of man—মানব জাতির ঐক্যে তাঁর একান্ত বিশ্বাস ছিল। সুতরাং জাতিভেদ প্রথা, উচ্চ নীচের পার্থক্য ও ব্যবধানের তিনি ছিলেন নিদ্রাহীন সমালোচক। তিনি স্বাধীনতাকামী ও জাতীয়তাবাদী ছিলেন, সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন মানবতাবাদী ও আন্তর্জাতিক আদর্শে বিশ্বাসী। তাই তিনি পাশ্চাত্য দেশের ভাল দিকটার প্রশংসা করতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, সেটা গ্রহণ করতেও উপদেশ দিয়েছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলন যখন দেশময় প্লাবন সৃষ্টি করল, রবীন্দ্রনাথ তার প্রতি উদাসীন থাকতে পারেন নি। স্বদেশী

আন্দোলন ছিল কিছুটা রাজনৈতিক আর কিছুটা অর্থ-নৈতিক। কবি এ-সব ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি। তিনি সমস্ত আন্দোলনটিকে অন্য দৃষ্টিতে দেখলেন। তিনি দেখলেন, এই আন্দোলনে যতটা হৈ চৈ হচ্ছে, ততটা কাজ হচ্ছে না। যে-আন্দোলনে জাতীয় চেতনা-শক্তি জাগ্রত হয় না, তার দ্বারা স্থায়ী কাজ হয় না। চেতনাশক্তির সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই সংগঠন শক্তি। রবীন্দ্রনাথ দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে আন্দোলনের নেতাগণ বাংলাদেশ সম্বন্ধে, দেশের অধিবাসীদের সম্বন্ধে অজ্ঞ। প্রকৃত দেশ-সেবার প্রতি নেতাদের ছিল চরম ঔদাসীন্য। রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি বহু সভায় বক্তৃতা দেন, বহু উপাদেয় প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি রাখীবন্ধন উৎসবের নেতৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথ ও অপরাপর রাজ-নৈতিক নেতাদের মধ্যে ছিল বিরাট ব্যবধান। দেশের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর ছিল প্রত্যক্ষ ও গভীর জ্ঞান। কিন্তু অপরাপর নেতাদের সেরূপ কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না। তাঁরা টাউন হল কম্পিত করে যতটা বক্তৃতা করতে পারতেন, দেশের অবস্থা সম্বন্ধে ততটা জ্ঞান রাখতেন না। এই দিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গান্ধীজীর পূর্ব্বগামী। তিনি সেই যুগে দেশীয় শিল্পের প্রতি উৎসাহ দেন, জাতীয় শিক্ষার প্রোগ্রাম রচনা করেন। এ-বিষয়ে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষাও করেছিলেন। মরমী কবি রবীন্দ্রনাথ—তাঁর হাতে কবির বাঁশরী; কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত। সেই কবির আর এক মূর্ত্তি দেখি, যখন তিনি গ্রাম-সেবকের ব্রত গ্রহণ করলেন। তিনি আহ্বান জানালেন দেশের কর্ম্মীদেরকে, 'গ্রামে গিয়ে কাজ কর এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জ্জন কর।' তিনি বহু প্রকার গঠনমূলক কাজের পরিকল্পনা রচনা করে ফেললেন। দেশব্যাপী অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও জড়তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করলেন।

স্বদেশী আন্দোলন তাঁর নিকট থেকে এই সরল, সহজ ও মহৎ আদর্শ লাভ করল যে, স্বরাজ অপরের নিকট থেকে উপহার স্বরূপ পাওয়া যাবে না। স্বরাজ এমন একটা অধিকার যা সাধনার দ্বারা অর্জ্জন করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে বললেন যে, সরকারী সাহায্যের আশা ছেড়ে দাও, সরকারের উপর নির্ভরতা জাতিকে পঙ্গু ক'রে দিবে। নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের প্রচেষ্টায় গঠনমূলক কাজ করে যেতে হবে। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের মূলকথার ইঙ্গিত তিনি বহু পূর্ব্বেই দিয়েছিলেন। তিনি জাতীয় আন্দোলনের মূলনীতি সমর্থন করেছিলেন সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর মধ্যে ছিল একটা সার্ব্বজনীন আদর্শ। বিশ্বের সর্ব্বমানবের কল্যাণবোধ ছিল তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। তাই তিনি একাধারে জাতীয় কবি ও বিশ্বকবি। তিনি দুঃখের সঙ্গে দেখলেন যে স্বদেশী আন্দোলন তার আদর্শ ধরে ঠিক পথে চলছে না। তাতে নানাপ্রকার অনাচার, দুর্নীতি প্রবেশ করল। কিন্তু এসব দেখে তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন না। তিনি এই সময় এমন একটা mystical feeling, মরমী অনুভূতি লাভ করলেন যা তাঁর মনে এনে দিল শান্তি। ১৯০৭ সালে তিনি কতকগুলি কবিতা ও নাটক লিখলেন, যা থেকে তাঁর মনের মরমী দিকটার পরিচয় পাওয়া যাবে। রাজা, ডাকঘর, এবং গীতাঞ্জলি এই সময়ের রচনা। সি, এফ, এনড্রুজ বলেন, "এইসব গ্রন্থ তাঁর জীবনে একটা পরিবর্ত্তন সূচিত করে। এই সময় কবির জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা বিশ্বের সহিত একীভূত হয়ে যায়।" যে-সৌন্দর্য্যের মধ্যে মানব-জীবনের পূর্ণ পরিণতি, সেই সৌন্দর্য্যকে তিনি রূপ দিতে ব্যস্ত ছিলেন—to express the fullness of human life as perfection। তাঁর মধ্যে দেখতে পেলাম একজন তত্ত্বদর্শী সাধককে—যাঁর আবেদন হ'ল সার্ব্বজনীন। এই সময় cult of nationalismকে বা জাতীয়তাবাদ-দর্শনকে নিন্দা করলেন—এই ধরণের জাতীয়তাবোধ মানুষের মনকে সঙ্কীর্ণ করে ফেলে। তখন থেকে জাতীয়-কবি হয়ে পড়লেন বিশ্বকবি।

সকলেই অবগত আছেন যে, ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে একজন লেখক বলেন "It looks as though we have a great poet among us"। আর একজন বিখ্যাত

ব্যক্তি বলেন, "সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ সেই সব লেখককে দেওয়া হয়, যাঁহারা নিজেদের মধ্যে artist and the prophet—এই দুইটি গুণকে সংযুক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আর কোন কবি এমনভাবে এই দুইটি আদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি।" বাস্তবিকই রবীন্দ্রনাথ বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। সার্বজনীন মানবীয় আদর্শ তিনি শান্তিনিকেতনে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনের আদর্শকে একটি কথার মধ্যে প্রকাশ করা যেতে পারে,—unity ঐক্য। কারণ তিনি মূলতঃ ছিলেন, Poet and Prophet of Rhythm, Harmony and Completeness. আজ রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের শতবর্ষ পরে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে অন্তরের প্রণতি ও শ্রদ্ধা জানিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করি।

পঁচিশে বৈশাখ

॥ শ্রীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ॥

বৈশাখের দাহদগ্ধ পিঙ্গল আকাশে,
জন্ম নিয়েছিল এই পৃথিবীর মৃত্তিকা প্রাঙ্গণে,
জ্যোতিঃ সূর্য এক।
প্রসন্ন উত্তাপ যার, প্রাণের আভাসে বিগলিত।
শ্যামলের সুনবুর দাক্ষিণ্যে উদার।
কোটাল অনেক ফুল, এই রুক্ষ সাহারার মাঠে।
সেই সূর্য রেখে গেছে জ্যোতির স্বাক্ষর,
এই পৃথিবীর প্রাণে, সূর্য চন্দ্র তারকার প্রাণে
প্রকৃতির অন্তর সত্তায়।
উত্তরকালের গাঢ় পুঞ্জীভূত ঘন অন্ধকার,
দূর করে যে আগাল সীমাহীন আলোর উল্লাস,
সে আলোয় পথিক পৃথিবী পথ চেনে সৌর জগতের।
সে আলোয় যাবে চেনা
পৃথিবীর প্রতিদিন, আজ আর আগামী কালের।

এই পৃথিবীর মৃত্যু হবে,
সৌর জগতের সূর্য একদিন উত্তাপ হারাবে।
তারি মাঝে এই সূর্য চিরদিন রবে সমুজ্জ্বল,
অন্তরে উজ্জ্বল যার নিরন্তর প্রভাত চেতনা,
পঁচিশে বৈশাখ
যে দান দিয়েছে পৃথিবীকে
প্রতিদানে পেয়েছে সে অন্তহীন প্রাণের আশ্বাস॥

রবীন্দ্রনাথ

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ জন্ম দিনে তাঁহাকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন জীবন ও সাধনা চিরদিন মানুষকে আনন্দ দিবে, প্রেরণা দিবে। রবীন্দ্রনাথ কবি ছিলেন, নাট্যকার ছিলেন, চিত্রকর ছিলেন, প্রবন্ধকার ছিলেন, আরও কত কত কি ছিলেন। তাঁহার এক একটি দিক সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে, আয়ত্ত করিতে বহু সময় সাধনা ও সাধ্যের প্রয়োজন—সকল দিক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা বোধকরি একজনের পক্ষে সম্ভবই নয়। তথাপি এতবড় ব্যক্তিত্বটিকে এই ভাবে খণ্ড খণ্ড করিয়া বুঝিলে তাঁহার সবটুকু বোঝা হইবে না। ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনের কোন্ আবেষ্টনে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রভূত রচনার মধ্য দিয়া কি চিন্তাধারা পরিবেশন করিয়া ভারতবর্ষে কোন্ আবেষ্টনকে তিনি আহ্বান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার আসার আগে, সময়ে ও পরে ভারতীয় চিন্তাধারায় কি পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে—এই সবখানি কথা বুঝিতে হইবে রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে হইলে। রবীন্দ্র-চিন্তাধারা সমাজ-জীবনে ছড়াইয়া পড়িবার আগে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে বা সামাজিক ভাবে কি চিন্তা করিতাম, কিরূপ সাহিত্য রচনা করিতাম, আমাদের অবসর সময় কি ভাবে যাপন করিতাম, আমরা ধর্ম দর্শন ঈশ্বর সম্বন্ধে কি ভাবিতাম? এই সমস্ত ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা সমস্ত ভারতবর্ষের (বিদেশের দৈনন্দিন জীবনের চিন্তাধারাকে রবীন্দ্রনাথ কতখানি বদলাইয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি না) জীবন-যাত্রাকে বদলাইয়া দিয়াছে। কেবল বদলাইয়া দেয় নাই প্রাচ্যের চিন্তাধারার মুক্ত সৌন্দর্যধারার সঙ্গে পাশ্চাত্যের জীবনের গতিবেগের সৌন্দর্যকে যুক্ত করিয়া দিয়া ভারতবর্ষকে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক চরম পতন হইতে রক্ষা করিয়া গিয়াছে। বর্ণাশ্রম-শাসিত ভারতের অচলায়তনত্ব ঘুচাইয়া একটা বৃহত্তর উন্নততর স্তরে তাহার সহিত পাশ্চাত্যের এই মিলনীকরণই রবীন্দ্রনাথের জীবনের সর্বপ্রধান দান। তাঁহার সাহিত্য ইত্যাদি সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়াই এই মিলনীকরণই ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ যে স্তরে দাঁড়াইয়া এবং যে স্তরকে আহ্বান করিয়া এই মিলনীকরণ সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা যে আমাদের শিক্ষিত সমাজের নিকটও—যাঁহারা তাঁহার রচনা মুখস্থ করিতেছি কিংবা তাঁহার বিভিন্ন দিক লইয়া গবেষণা করিতেছি তাহাদের নিকটও—আজও স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। না ওঠার আশ্চর্যও কিছু নাই—যুগান্তকারী প্রতিভার মধ্য দিয়া যাহা বিচ্ছুরিত হয়, সাধারণের সমাজ-জীবনে তাহা দীর্ঘদিন ধরিয়াই ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয়—ইহাই স্বাভাবিক, ইহাই ইতিহাস।

রবীন্দ্রনাথ হুবহু প্রাচ্যও ছিলেন না, হুবহু পাশ্চাত্যও ছিলেন না—দুইকে মিলাইয়া তিনি এমন ব্যাপকতর ও গভীরতর জীবনের অধিকারী হইয়াছিলেন যে তাহা এক গভীর বিস্ময়ের বস্তু। বাহিরের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ছিলেন—অথচ ব্রাহ্মধর্ম বলিতে যাহা বুঝায় রবীন্দ্রনাথের ধর্ম তাহা অপেক্ষা অনেক অনেক বড় ছিল। হিন্দুধর্ম বলিতে সেদিন যাহা ছিল তাহার চেহারা আজকের আমাদের স্মরণ করা শক্ত, তাই আমরা বুঝিতেই পারিব না সেদিনের বর্ণাশ্রমের বিধিনিষেধাত্মক হিন্দুত্বের স্থানে উপনিষদীয় বা গীতা-ভাগবতোক্ত হিন্দুত্বকে স্থাপন করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কি বিরাট কাজ হইয়াছিল। 'শান্তিনিকেতনে' রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, 'আমাদের দেশের জ্ঞানীসম্প্রদায় কর্মকে বন্ধন বলে থাকেন। এই বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিষ্ক্রিয় হওয়াকেই তাঁরা মুক্তি বলেন। এইজন্য কর্মক্ষেত্র প্রকৃতিকে তাঁরা

ধ্বংস করে নিশ্চিন্ত হতে চান। এইজন্ত ব্রহ্মকেও তাঁরা নিষ্ক্রিয় বলেন, এবং যা কিছু জাগতিক ক্রিয়া একে মায়া বলে একেবারে অস্বীকার করেন'। কর্ম বন্ধন, ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় এবং যা কিছু জাগতিক ক্রিয়া তাহা একেবারে মায়া—এ চিন্তাধারা ভারতবর্ষ এত দীর্ঘদিন ধ্যান ও অনুসরণ করিয়াছে যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য তাহার অতি আদরের বস্তু হইলেও সমস্ত রবীন্দ্র-সাহিত্য যে উপরি-উক্ত চিন্তাধারাকে একেবারে অস্বীকার করিয়া কর্মকে আনন্দের প্রকাশ বলিয়া আস্বাদন করিতেছে একথা সে আজও সচেতনভাবে বুঝিতে পারে না—তবু অভ্যাসের মত উচ্চারণ করিয়া যায় এইজন্ত যে, যত বড় কুসংস্কারাচ্ছন্নই হউক না কেন মানুষের অন্তর্নিহিত আনন্দস্বরূপতাকে একেবারে চাপা দিয়া চিরদিনের জন্ত রাখা যায়ই না।

বর্ণাশ্রমীয় চিন্তাধারার বিপরীত কর্ম সম্বন্ধে এই চিন্তাধারার বিবৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথ উহার পরেই লিখিতেছেন, 'কর্মের মুক্তি আনন্দের মধ্যে এবং আনন্দের মুক্তি কর্মে। সমস্ত কর্মের লক্ষ্য আনন্দের দিকে এবং আনন্দের লক্ষ্য কর্মের দিকে। এইজন্ত উপনিষৎ আমাদের কর্ম নিষেধ করেন নি।...আনন্দের ধর্ম যদি কর্ম হয় তবে কর্মের দ্বারাই সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে। গীতার একেই বলে কর্মযোগ।

কর্মযোগের একটি লৌকিক রূপ পৃথিবীতে আমরা দেখেছি। সে হচ্ছে পতিব্রতা স্ত্রীর সংসার যাত্রা। সতী স্ত্রীর সমস্ত সংসার-কর্মের মূলে আছে স্বামীর প্রতি প্রেম, স্বামীর প্রতি আনন্দ। এইজন্ত সংসার-কর্মকে তিনি স্বামীর কর্ম জেনেই আনন্দ বোধ করেন—কোনো ক্রীতদাসও তাঁর মতো এমন করে কাজ করতে পারে না। এই কাজ যদি একান্ত তাঁর নিজের প্রয়োজনের কাজ হত তা হলে এর ভার বহন করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হত। কিন্তু এই সংসার-কর্ম তাঁর পক্ষে কর্ম যোগ। এই কর্মের দ্বারাই তিনি স্বামীর সঙ্গে বিচিত্রভাবে মিলিত হচ্ছেন।' যে ভারতবাসী হাজার হাজার বৎসর ধ্যান করিয়াছে কর্ম বন্ধন, কর্ম-ত্যাগই মুক্তি, ক্রমশঃ কর্ম কমাইয়া আনিয়া নিষ্কর্মতা, নিষ্ক্রিয়তাই চরম সার্থকতার লক্ষ্য, সে ভারতবাসী রবীন্দ্রনাথের কর্ম যে আনন্দেরই প্রকাশ এ কথা এত শীঘ্র ও এত সহজে আয়ত্ত করিবে কি করিয়া? তাহার আজিকার অবস্থাটা সাধারণভাবে এইরকম যে, সে মনে জানে কর্ম বন্ধন, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলেও তাই—গোবিন্দ, এ কর্মভোগ (অর্থাৎ সংসার) কবে কাটবে—তবু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যও না পড়িয়া পারে না, পাশ্চাত্যকেও বাদ দিতে পারে না। অর্থাৎ তাহার ভিতরে বাহিরে মিল নাই। তাই কর্মকে গ্রহণ করার যে পথের কথা সাহিত্যিক-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ রাখিয়া গেলেন, এ রাখিয়া যাওয়া মায়াবাদী ভারতবর্ষের পক্ষে নিতান্ত দরকার ছিল। রবীন্দ্রনাথের মত কোন ধর্মের চিহ্নবিহীন এত বড় ব্যক্তিত্বের বন্যা দিয়া এ কথা উচ্চারিত না হইলে শ্রীনিত্যগোপাল যখন বলিলেন, 'পূর্ণ জ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান। পূর্ণজ্ঞানের এক শাখা আত্মজ্ঞান। সর্ব জড় ও অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান,' কিংবা পুরুষোত্তমানন্দ যখন বলেন, 'প্রজ্ঞাবাদের মায়া দোষযুক্ত, ব্রহ্ম নির্দোষ, প্রজ্ঞাবাদ মায়াভয়ে ভীত। প্রজ্ঞাবাদী ভারতবর্ষ আজ ভয়-ভীত, ক্লীবত্বপ্রাপ্ত; সকল গঠনক্ষেত্রে সে আজ দুর্বল, সকলের অশ্চাতে। কোন কিছু সৃষ্টি করিতে না পারাই ক্লৈব্য। এই ক্লৈব্য ভারতবর্ষকে পরের দুয়ারে ভিখারীর বেশে ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করিবার ব্রতে ব্রতী করিয়াছে। সে আজ ভিক্ষাব্রতী। ভারতবর্ষ আজ ক্লৈব্যগ্রস্ত। প্রকৃতি-বিদ্রোহ, প্রকৃতি হনন তাহার হাত হইতে সকল সংগঠন কৌশল কাড়িয়া লইয়াছে,' তখন এদেশের জ্ঞানবানেরা তাহা একেবারেই শুনিতে চাহিতেন না। ভারতবর্ষের প্রকৃতি-হনন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র লিখিতেছেন, 'যাহাকে প্রকৃতি বলিতেছ তাহা তো একটা প্রকৃত জিনিস; তুমি তাকে বাদ দিতে গেলেও সংসার হইতে সে তো বাদ পড়ে না। অতএব, সে যেন নাই এমনভাবে যদি সাধনা করিতে থাক, তবে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হইবে; একদিন সে ফাঁকি এমন ধরা পড়িবে তখন পালাইবার পথ পাইবে না।...প্রকৃতির

বিশ্বজোড়া ফাঁদ আমি নিজের হাতে পাতি নাই এবং সেটাকে সম্পূর্ণ পাশ কাটাইয়া চলি এমন জায়গা আমি জানি না। ইহাকে বেকবুল করা যখন আমাদের হাতে নাই তখন সাধনা তাহাকেই বলি, যাহাতে প্রকৃতিকে মানিয়া প্রকৃতির উপরে উঠিতে পারা যায়।...প্রকৃতির স্রোতের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে জীবন-তরী বাহিয়া চলিতে হইবে। আমাদের সমস্যা এ নয় যে, স্রোতটাকে কী করিয়া বাদ দিব; সমস্যা এই যে, তরী কী হইলে ডুবিবে না, চলিবে। এইজন্যই হালের দরকার'।

প্রকৃতির স্রোতের মধ্য দিয়াই যে আমাদের জীবন-তরী বাহিতে হইবে, প্রকৃতিকে মায়া মিথ্যা ঘোষণাকারী বর্ণাশ্রমী প্রজ্ঞাবাদী ভারতবর্ষ ইহা নূতন করিয়া শুনিল. কর্ম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই যা কিছু বলিয়া গেলেন তাহা প্রজ্ঞাবাদী ভারতবর্ষ নূতন করিয়া শুনিয়া কতটুকু গ্রহণ করিতে পারিল তাহা পরের কথা, কিন্তু স্থিতিধর্মী অচলায়তনের কানে তিনি যে চাবি পিটাইয়া তাহাকে সর্ব সমন্বয়ের ব্যাপকতর ও গভীরতর এক স্তরের কথা শুনাইয়া গিয়াছেন, জাতি যখন রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে বসিয়াছে, তখন তাহাকে এ কথাও বুঝিতে অবশ্যই হইবে।

সাহিত্য, চিত্রকলা, নৃত্য প্রভৃতি যত দিক দিয়া রবীন্দ্র-প্রতিভা বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছে, সেইগুলিকে আলাদা আলাদা ভাবে যেমন আমরা দেখিব, বুঝিব, আয়ত্ত করিব, তেমনি সেই সব বিচ্ছুরণ মধ্য দিয়া সচেতনভাবে স্পষ্ট ভাষায় কিংবা অচেতনভাবে নানা ভাবে ইঙ্গিতে আচরণে যে চিন্তাধারাটী আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা যে ভারতবর্ষের স্থিতিশীলতার সঙ্গে পাশ্চাত্যের গতিশীলতার সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়া একটী ব্যাপকতর জীবন-চেতনাকে প্রকাশ করিয়া গিয়াছে এ কথা যদি আমরা না বুঝিয়া চলি, তাহা হইলে তাঁহার বিরাট অবদানের অনেকখানিই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সভ্যতার গতিধর্মকে স্বীকার করিয়াও উপনিষদীয় বিরাট প্রাণ-চেতনাতে স্থিতি লাভ করিয়াছিলেন, যে জন্য দেশকালপাত্র নিরপেক্ষ মানুষ মাত্রই তাঁহার আপন। তাঁহার মানুষ বিষয়াসক্ত ক্ষুদ্র মানুষও নয়, আবার জীবনের কলধ্বনি বাদ দিয়া শুধু অতীন্দ্রিয়ের ধ্যানে বিভোর নির্জীব মানুষও নয়। জীবনকে অতীত ও অনুপ সত্তার একত্র আস্বাদন করাতেই তাঁহার সাহিত্য ও তথা জীবন এত মধুর ও এত ব্যাপক, এত প্রাণ-মাতানো অথচ ক্লেদ-মুক্ত। বাহুল্য ভয়ে আমরা তাঁহার সমস্ত সাহিত্য জুড়িয়া এই সীমার মধ্যে অসীমের আস্বাদন, প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার অনন্ত বন্ধুত্বের প্রকাশ উদ্ধৃত করিলাম না—পাঠক এই দৃষ্টিকোণ মনে রাখিয়া যেমন তাঁহার সাহিত্য পাঠ করিবেন, তেমনি ভারতীয় পরিবার সমাজ ও ধর্ম-জীবনকে তিনি কোন্ অচলায়তন হইতে টানিয়া তুলিয়া গতিশীল জীবনের কলধ্বনির সঙ্গে যুক্ত করিয়াও তাহাকে আত্মার মধ্যে স্থিত করিয়া রাখিয়া বাঁচাইলেন, তাহাও লক্ষ্য করিয়া, আয়ত্ত করিয়া ধন্য হইবেন। পাশ্চাত্যের জড়বাদীয় জীবন-চেতনা যখন আপনার মধ্যে জীবিত থাকিয়া প্রজ্বলিত হইবার তেল খুঁজিয়া পাইবে না, তখন এই রবীন্দ্রনাথই শুধু উপনিষদের বিদ্যাকাবিদ্যাক যদ্বেদোভয়ং সহ, অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে মন্ত্র শুনাইয়া তাহাকে জড়কে স্বীকার করিয়াও যে জড়াতীত হইতে হয় এই তত্ত্বকে ভূমীষার সাধনা তাহার নিকট উপস্থিত করিবেন। কেননা ভারতবর্ষের এই সামগ্রিক সমন্বয় শ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীপুরুষোত্তমানন্দে আজ দার্শনিক রূপ পাইলেও সহজে সাধারণ মানুষ যাহাতে ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে সেই রূপ তাহারা পাইবে তাহাদের পরিচিত রবীন্দ্রনাথে—যদি তাঁহাকে সেইভাবেও পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। আমরা রবীন্দ্রনাথের এই পরিচয়ই মানুষের কাছে তুলিয়া ধরিতে প্রয়াসী যেখানে তিনি বিদ্যা অবিদ্যাকে সমন্বিত করিয়া আনন্দের খোঁজ পাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

'তুমি মানুষের কবি'—এ তোমার সত্য পরিচয়।

যে-মানুষ 'পুণ্যে পাপে, দুখে সুখে' আলোকে আঁধারে,
বেদনা-বন্ধুর পথে চলে আর থামে বারে বারে ;
সম্মুখে অনন্ত পথ, ক্লান্ত গতি, চলে না চরণ,
নৈরাশ্যের গ্লানি বুকে নিয়তিরে যে বরে বরণ ;
'নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি',
এই মত দিন যার কেটে যায় ঘুণ ঘুণ ধরি'—
সেই মানুষের তালে ছিলে তীব্র অমর অক্ষয় :
তুমি মানুষের কবি—এ তোমার সত্য পরিচয়।

সভ্যতার অভিমানে অভিমানী উদ্ধত মানুষ,
নির্মম, নিষ্ঠুর রক্তে পায়ে দ'লে চলে অহরহ
অসংখ্য দুর্বল জনে—শক্তিহীন ভীরু কাপুরুষ,
আকাশের পানে চেয়ে, ভিলে ভিলে যন্ত্রণা দুঃসহ
সয়ে যায়। তারপর অকালে নিঃশেষে দেয় প্রাণ ;
তুমি কবি, গেয়ে গেছ সেই মূক মুমূর্ষুর গান।
সে-গানের ধ্বনি আজো ঘুরে ফেরে সারা বিশ্বময় :
তুমি মানুষের কবি—এ তোমার সত্য পরিচয়।

সীমা দিয়ে ঘিরে যারা এ পৃথিবী গড়ে কারাগার,
আর সেই সীমা-ঘিরে-বেরা ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর
বাস করে, কাঁদে, হাসে, ভালবাসে, করে হাহাকার ;
শোনেনাক' অসীমের ডাক ওঠে বেধা নিরন্তর।
সে অসীম-স্পর্শচ্যুত সীমা-ঘিরে, অসংখ্য জীবন—
তাদের বেদনা তুমি শুনেছিলে ; সে মূক ক্রন্দন।
তোমাকে ঘিরেছে ব্যথা তাদের সে অক্ষয় পরাজয় :
তুমি মানুষের কবি—এ তোমার সত্য পরিচয়।

'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী', 'মানুষ অন্তর হতছাড়ে'
অভিশপ্ত শতাব্দীর চারিধার আর্ত হাহাকারে
পরিপূর্ণ ; সদা ত্রস্ত, আতঙ্কিত জীবনের দিন
কাটে কী দুঃস্বপ্ন মাঝে ; ব্যর্থতায় সর্ব দীপ্তি ক্ষীণ।
অর্থহীন এ জীবন, অর্থহীন বিলাস বৈভব,
দিকে দিকে পশুদের উদ্দাম, উন্মত্ত কলরব ;
তার মাঝে শোন তুমি ধ্বনি ওঠে কী বিষাদময় :
তুমি মানুষের কবি—এ তোমার সত্য পরিচয়।

অসংখ্য মানুষ যেথা সুদৃঢ় সবল দু'টি হাতে
মাটি কাটে, পথ গড়ে, সারা অঙ্গ দিয়ে ঘেম ঝরে,
কর্ম মাঝে আত্মলীন ; সুখে দুঃখে, আঘাতে সংঘাতে
জীবনের দিনগুলি কেটে যায় এক একটি ক'রে।
তোমার দেবতা তুমি দেখেছ সে কর্মযোগী মাঝে,—
যেখানে অর্ঘ্যের ডালা সুসজ্জিত, শঙ্খ ঘণ্টা বাজে,
সে উচ্চে দেবতা নাই, তোমার মন্দির সেথা নয় :
তুমি মানুষের কবি—এ তোমার সত্য পরিচয়।

তোমার দু'চোখ ভরা স্বপ্ন ছিল সেই মানুষের,
যে মানুষ খণ্ড নয়, ক্ষুদ্র নয় ; সর্ব তুচ্ছতার
ঊর্ধ্বে উঠে, চিরন্তন সত্য আর শিব সুন্দরের
নিত্যজ্যোতি পথগামী, বাধামুক্ত সমস্ত সীমার।
অসীম সম্ভাবী সেই দিব্যমূর্তি প্রণয় জীবন,
একটি আকাশ তলে সন্তানস্ক, স্বেচ্ছাবিচরণ ;
চির দীপ্ত সে মানুষ, তুমি গেয়ে গেলে তার জয় :
তুমি মানুষের কবি—এ তোমার সত্য পরিচয়। •

• লেখকের সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'তোমার কী দিয়ে বরণ করি' হইতে গৃহীত।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে

—১৯৫০—

(৩)

...সকাল ৮।০টার পর আমি আফিসে যাই। রেণু মনোরঞ্জনবাবুর বাসায় যায়, ১০।০টার পর ফেরে। এখানে আসে ১২টার পর। প্রতিভা পোষ্টাফিস ও ব্যাঙ্ক হইয়া আসে।...৪টার সময় বাহির হইয়া আমি ও রেণু ডোভার লেন এক্সটেনসান-এ ভূপেন বসুর ওখানে যাই। রাখাল বসু গ্রাহক করিয়া দিবে বলিয়া ছিল। সে অনুপস্থিত। ভূপেনও তেমন কিছুই আগ্রহ প্রকাশ করিল না। প্রতিভা 'বিষমর্দন' প্রবন্ধটা লেখে, পরে আফিসে যায়। আমরা ডোভার লেন হইতে আফিসে যাই। আজ পুরী হইতে নরসিংহের একটা পোষ্টকার্ড পাই। মনোরঞ্জন গুপ্তেরও একটা পোষ্টকার্ড পাই। নরসিংহ মঠের ঠিকানায় পত্র দিয়াছিল, redirected হইয়া আসিয়াছে। তাহাতে সচ্চিদানন্দ লিখিয়াছে, মোদে কালনা যাইতে হইবে। নবদ্বীপ হইতে যদুনাথ সরকারও এক পত্র দিয়াছে শিবরাত্রিতে সেখানে যাইবার জন্য, আর একটা কবিতাও পাঠাইয়াছে ছাপাইবার জন্য—'চরকার ছড়া'। ৮। টার পর আমি ও প্রতিভা আফিস হইতে বাহির হই। আসিতে রাস্তায় গুরুদাসের প্রায় কাছাকাছি পাখুরিয়া পল্লীর সত্যেন্দ্রনাথ বাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে চেনেন। তিনি ৪।৫ দিন পর দেখা করিবেন।...

২রা ফেব্রুয়ারী

সকালে সাময়িকী—'ভারতের সাধারণতন্ত্র' লিখিতে আরম্ভ করি। ৮।০টার পর আফিসে যাই। রেণু বাহির হইয়া ১০টার পর ফেরে। সে আবার ১টার পর বাহির হয়। আফিসে 'চরিত্রহীন' কিছুটা পাঠ হয়। প্রতিভা পোষ্টাফিস হইয়া ২টার পর এখানে আসে। রেণু আসে তাহারও পর। প্রতিভা সাময়িকীটা কপি করে। রেণু প্রতিভার লেখা 'লোকসংগ্রহ ও শ্রীগৌরাঙ্গ' প্রবন্ধটা দেখিয়া দেয় এবং সবটা একবার আফিসে পড়িয়া শোনায়। সমন্বয়ের দ্বিতীয় পর্য্যায় কেমন করিয়া নিতাগোপালে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, এবার তাহাই তাঁহার জন্মোৎসব উপলক্ষে লিখিতে ইচ্ছা হয়। মানদেন্দ্র সিংহ সন্ধ্যার পর আসিয়া চাঁদার টাকা দিয়া যায়। সে পত্রিকা সম্বন্ধে সহানুভূতিসম্পন্ন।...উজ্জলভারতের জন্য একটা প্রচার পত্র ছাপাইতে হইবে। ধীরেন মজুমদার ছাপাইয়া দিবেন, আমরা কাগজ দিব। ছোট ছোট আলোচনা-বৈঠক organise করা ভাল।...

কিরণময়ীর প্রজ্ঞা স্থিত হইতে পারিল না, কেননা সারাজীবন—বাল্যে যৌবনে—সে প্রাণস্পর্শ পায় নাই, প্রাণ দিতে পারে নাই। তাই তাহার মস্তিষ্কবিকৃতি।

৩রা ফেব্রুয়ারী

সকালে সাময়িকীটা কিছু লিখি, ৮।০টার পর আফিসে যাই। কোন মনিঅর্ডার আসে নাই। রেণু ফেরে ৯।০টার পর। 'চরিত্রহীন' পড়া শেষ হয়। সন্ধ্যার পর সমালোচনা লেখা আরম্ভ করে। ২টার সময় নমিতা মজুমদার রেণুর ওখানে লেখা করিতে আসে। আজ আমার এখানে আসিল না, বুধবার আসিবে বলিয়া গেল। রেণু এখানে আসে ৩৫০টায়। প্রতিভা পোষ্টাফিস ঘুরিয়া এখানে আসে ৪।৫টায়। শঙ্করী আসিয়া ছিল। ...ধীরেন ব্যানার্জী আসিলেন না, কাজেই বুধবার চারুবিদ্যার পাঠ হইবে না। মাখনবাবু সন্ধ্যার পর আফিসে আসে। সে বলে প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত কাহারও পুস্তক অনুবাদ করিয়া ছাপানো আইনবিরুদ্ধ। টাটা ও পেপার কন্ট্রোলারের নিকট ২টা দরখাস্ত

লিখাইয়া রাখা হইল। মানুষ বিচার না করিয়া পারে না, বিশ্বাস ছাড়াও তাহার চলে না। যে বৃত্তিদ্বারা সে যাবতীয় ঘটনাকে নিজের মধ্যে পরিপাক করিতে পারে, তাহা বিচার; আর যাহার উপর হাত নাই, যাহা করায়ত্তের বাহিরে অথচ যাহার সম্বন্ধে স্থির মীমাংসায় না পৌঁছিলে চিত্তকে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকিতে হয়, তেমন কোন-কিছু সম্বন্ধে একটা স্থির প্রত্যয়ে পৌঁছিবার জন্য যে মনের বৃত্তি, তাহাই বিশ্বাস। বিচার দ্বারা চিন্তাকে আমলের মধ্যে আনা যায়, বিশ্বাস রাখে আমলের বাহিরে, অথচ স্থিতিলাভের জন্য চাই দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র। নইলে জীবন চলে না। শরৎগতির সাধনায় এই দুইয়ের সমন্বয় সম্ভবপর। যেখানে বিচারে কুলায় না, বিচার হয় নিরর্থক বা অবান্তর, সেখানে বিশ্বাসই মানুষকে স্থিতিভূমি দান করে। অগ্রগতির জন্য চাই বিচার বিশ্বাস দুইয়ের মিলন। ইউনিফরমিটি অব্ ল' যদি একান্ত সত্য হইত, তবে বিচারও একান্ত হইত। কিন্তু সেখানেও যখন ফাঁক থাকিয়া যায়, তখন বিশ্বাস ছাড়া কি করিয়া চলিবে? ল অব্ ইনডিটারমিনিজম্-এর প্রয়োজন তো এইজন্যই রহিয়া যাইতেছে।...

৪ঠা ফেব্রুয়ারী

গীতাভবন হইতে কেহ আসিবে অপেক্ষা করিতেছিলাম, কেহ আসিল না। ৭।০টার পর আফিসে যাই। প্রতিভা আসিয়া সেখানে ছিল। সে ৮টার পর বাসায় যায়। ৯টার পর নলিনীবাবু আসেন। রেণু তাহার সঙ্গে বিভা সরকার, হরেন রায়, এস এন্ মিত্র, তপন চ্যাটার্জী, মটরবাবুদের বাসায় যায়। পরে বাসায় আসিয়া খাইয়া চাকুরিয়া যায়। সেখানে দুরজনের টাকা আদায় করিয়া ৪টার মধ্যে ফেরে...। সাইকোলজিক্যালি কেহ ভাবে না, চলে না, ব্যবহার করে না; তাহার জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। উদ্ভ্রান্তভারত সে দায়িত্ব নিয়াছে। যাহারা সাইকোলজি আলোচনা করেন, তাহাদের কর্তব্য উদ্ভ্রান্তভারতকে সাহায্য করা। কোলানাথকে Kali Mur 3X+F.P. 3X ৩ বার দেওয়া হয়। পল্লবীকে দেওয়া হয় Kali Mur 3X F.P. 3X সপ্তাহের প্রতিষেধক হিসাবে।

৫ই ফেব্রুয়ারী

সকালে নিত্যব্রতের দ্বারা লোন বণ্ড paid up করিবার দরখাস্ত দস্তখত করাইয়া রেণুর নিকট দিয়া আসি। কেন উপনিষদের পাণ্ডুলিপি সেপার কন্ট্রোলারকে দিয়া প্রকাশক হওয়ার অনুমতি পাইবার জন্য রেণুর নিকট নিত্যব্রত পরে দিয়া আসে। রেণু ১১টার পর বাহির হইয়া সব ঠিক করিয়া ৪টার পর আসে। বোধে মিউচুয়াল, জি, জে, কীমার, শেখর দাস প্রভৃতির ওখানে যায়। শেখরবাবু ডানলপ-এর পাবলিসিটি অফিসারের নিকট এক সুপারিশ পত্র দেয়। কাল তাহার গাড়ীতে সে ডানলপ আফিসে ১০টায় পৌঁছাইয়া দিবে বলিয়াছে। প্রতিভা সোস্টাফিস ঘুরিয়া ২টার পর আসে। সে সামেরিকীটা নবল করে।...রেণুর নিকট এক পত্র দ্বারা জানায় যে রাজনীতিক্ষেত্রে মতবিরোধ হইলেও প্রীতির সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ক্ষুণ্ণ যে সে করিয়াছে, তাহা তাহার বেশ বোধ হইয়াছে, তাই এই চিঠি। আমার কোনও রাজনৈতিক দল নাই, কাহারও সঙ্গে যুক্তও নাই। আমাকে লইয়া ট্যানাহ্যাচড়া কেন? আমার মত নিছক ব্যক্তিগত।..... বাবু সত্যই বলিয়াছেন, উদ্ভ্রান্তভারত newspaper নয়, ইহা viewspaper। পিছনের একটা অখণ্ড চিন্তাধারা কেমন করিয়া সমস্ত খণ্ড ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে, তাহাই শুধু দেখানো হইতেছে। ইহার সঙ্গে মতভেদ থাকিতে পারে। কংগ্রেসীদের সঙ্গে আমি নাই, সনাতনীরা আমার উপর ক্ষিপ্ত, কমিউনিষ্টরা নাখাজ, হিন্দুমহাসভা চটিয়া লাল। আমি কার? আমি সকলের বলিয়াই আমি কাহারও নই। একদিন সকলেই আমার চিন্তাধারার মূল্য বুঝিবে, আজ হয়তঃ বুঝিবে না। রেণুর শরীরটা খুব ক্লান্ত, তাই রাত্রিতে সকালেই ৯টার মধ্যে আসিয়া পড়ি।

৬ই ফেব্রুয়ারী

আজ আর আফিসে যাই না। রেণু কলিকাতা সি সি কোম্পানী, এ কে, মুখার্জী প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া ২।০টার মধ্যে পৌঁছে।...প্রতিভা ১টার মধ্যেই আসে। সকালে সাময়িকী লেখা শেষ করি।...বালুরঘাট শৈলেন-বাবু ডাক্তার ও হিন্দি প্রতাপ মজুমদারের নিকট পত্র দেওয়া হয়। সন্ধ্যার পর পরিমল মৈত্র আসে। একদিন তাহার বাবার সঙ্গে দেখা করিতে যাইব বলিলাম। আমাকে আসিয়া নিয়া যাইবে। রেণু 'চরিত্রহীনে'র সমালোচনা লেখা আরম্ভ করে। আলোচনায় স্থির হইল যে, আমার লেখা ডায়গুলি ছাপাইবার জন্য একটা fund তুলিতে হইবে ২৫৲।২০৲।১০৲।৫৲।২৲।১৲ যাহার কাছ হইতে যাহা পাওয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করিয়া। ঐ টাকা মজুত রাখা হইবে, উহা দ্বারা যাবতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইবে। এরূপ না করিলে আমার থাকাকালীন প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আমার সবগুলি দেখিয়া দেওয়া দরকার। সকালে নিত্যব্রতের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়। দুর্যোগের মধ্যে মন ও মাথা ঠিক রাখিতে হয়, সত্যব্রতর সঙ্গে কোনও কথা কাটাকাটি না হয়। নিজের ক্ষেত্রে স্থির থাকিয়া সম্প্রীতিই ভবিষ্যতের পথ উন্মুক্ত রাখে। উষাদিদির সঙ্গেও এই নীতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়।...রবীন্দ্রনাথের 'এবার তোমায় ফিরব না যেতে' কবিতাটী রেণু পাঠ করিয়া শুনায়। চার বৎসরের কন্যার ঐ বাক্য সারা প্রকৃতির মধ্য হইতে শুনিতে হইতেছে। কি মায়া! কি মধুর! ছাড়িয়াও কেহ দিতে চায় না, অথচ ধরিয়াও তো রাখিতে পারিতেছে না। ধরিয়া রাখা ও ছাড়িয়া যাওয়ার সমন্বয়ে এই বিশ্বপ্রকৃতি ছুটিয়া চলিয়াছে। ৯টার আগেই আফিস হইতে প্রতিভাসহ বাহির হই। ৭ই ফেব্রুয়ারী

সকালে 'কেন উপনিষৎ' ছাপাইবার জন্য দেখি। ১০টার পর রেণু ও তাহার ভাই বৌ (জ্ঞানবাবুর স্ত্রী) ও পুত্র আসে।...ছয়টার কিছু পূর্ব্বে রেণু ফেরে। প্রতিভা ১২টায় আসে ও ব্যাঙ্কে টাকা...জমা দিয়া আসে। হিসাবটা গোলমাল হইয়া আছে। আবার মিলানো প্রয়োজন। আমি ও প্রতিভা আফিসে যাই। নক্ষত্রার জন্য প্রতিভাকে দিয়া ৫।০ দামে একটা ভিনকোলা কিনিয়া আনাই। নিত্যব্রত আজ বেহালায় যায়। সন্ধ্যার পর ধীরেন ব্যানার্জী আসেন। আগামী রবিবার চারুবিয়া দেবী গুপ্তের বাসায় গীতাপাঠ হইবে। ইত্যবসরে নমিতা মজুমদার আসে। তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইতেছে, তখন রেণু আসে। ঘণ্টা দুই মত সে থাকে। সে রেণুর 'ঘরে-বাইরে' কিনিয়া নিল। মনে হইল মেয়েটী বিনীত, একটা আদর্শবাদ আছে। সে বলিল, intuition-এ সে ইহার একটা খোঁজ পাইয়াছে। আমি বলিলাম, intuition আজ সকলের মধ্যে আসিয়াছে, কিন্তু উহা সাইকোলজির স্তরে জমিয়া না উঠিলে ভাবুকতার সৃষ্টি করিবে, কোনও কাজেরই হইবে না। আমি সেই সাইকোলজিই দিতে চাই। সে আবার কাল আসিবে বলিয়া গেল। সে থাকিতে থাকিতে উপেন ঘর (যাহার নিকট ধীরেন মজুমদারের নির্দ্দেশমত চিঠি ও মাঘ মাসের কাজ পাঠানো হইয়াছে) আসে ও উজ্জয়ন্তারতের টাকা দেয়। তাহার সঙ্গে প্রায় আধ ঘণ্টারও উপর আলাপচারি হয়। নমিতা তাহা শুনিতেছিল। ভাগবতের 'প্রায়েন দেব মুনয়ঃ' 'ন কাময়েঽহম্' শ্লোক ব্যাখ্যা করা হয়। নমিতা প্রণাম করিয়া চলিয়া যায়। উপেনও যায়, কিন্তু আবার ৭টী কমলা আনিয়া দেয়। ১টী আমরা সকলে, ১টী রেণুকে, ২টী উপেনকে, ১টী প্রতিভাকে ও বাকী ৩টী আমি নিয়া আসি। কত মানুষের কত স্নেহই না জীবনে ভোগ করিলাম। প্রেস হইতে প্রথম ফর্ম্মের (ফাল্গুন মাসের) প্রথম প্রুফ আসে। আমার লেখার অংশটা আমি নিয়া আসি। নীলু ও মণির পোস্টকার্ড আসে।...প্রতিভা কলাইগুটি ভাজিয়া আনিয়াছিল। রেণু এখানে আসে নাই। তাহাকে দিবার কথা মনে হইয়াছিল।

৮ই ফেব্রুয়ারী

সকালে প্রুফ দেখিয়া রেণুর কাছে দিয়া আসিবার জন্য যাই, পরে চলিয়া আসি। কিন্তু প্রতিভার প্রবন্ধের

নীচে page-filler দিয়া আসা হয় নাই বলিয়া আবার যাই ও দিয়া আসি। জীবনে কোনও কাজেরও তো ফাঁকি দেই নাই, তাই খাটিতে হইয়াছে প্রচুর, কিন্তু কর্মের প্রসাদও পাইয়াছি, বুকটাও ঠাণ্ডা আছে। ২টার পর প্রতিভা আসে। রেণু ১১টার পর প্রেস, এম্, বি, সরকার এন্ড সন্সকার, মন্মথ রায়, হেমবরবাবু প্রভৃতির ওখানে ঘুরিয়া প্রায় ৭টায় ফেরে। বৈকালে আমি ও প্রতিভা আফিসে যাই। নমিতার আসিবার কথা ছিল, অপেক্ষাও করিতেছিলাম। কিন্তু রেণুর কাছে শুনিলাম যে মাণিক-তলার ওদিকে কারফিউ হইয়াছে। সেই জন্যই বোধহয় আসে নাই। সারা জীবন মানুষের অপেক্ষাই করিলাম। জানি না কে আসিয়া ঠাকুরের কাজের ভার লইবে। আমার পক্ষে এখন আসা ও না আসা প্রায় সমান হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়বার যখন সকালে আফিসে যাই তখন সুরেনের সঙ্গে নীচে দেখা। তাহার কাছে শুনিলাম যে সত্যব্রতরা···। সুবিধা তাহাতে হইবে। প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে আমি একটা বিপদ হইতে মুক্ত হইলাম বোধ করিতাম।···'আমি' ও 'আমার' যখন পুরুষোত্তমাশ্রিত তখনই তো সেখানে বিশুদ্ধ সত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। নিত্যব্রতের চেষ্টটা আজ আসে। প্রেসে ধীরেনবাবু অসুস্থ। এ মাসের পত্রিকার কাগজ এখন পর্যন্তও হইল না। আজ মাখনবাবুকে একটা পোষ্টকার্ড দেওয়া হইল। নীলুর নিকট পত্র ছিলাম। দিল্লীর আমাদের গ্রাহক মাঘ মাসের 'হিন্দুমহাসভা' পড়িয়া চটিয়া গিয়া আর পত্রিকা রাখিবেন না শুনিয়া নিখিলবাবু রেণুর নিকট বলিয়াছেন যে, অমন insensible একজন লোক যে উদ্বোধন ভারতের গ্রাহক নাই, ইহা খুব ভাল হইয়াছে।

৯ই ফেব্রুয়ারী

সকালে 'কেন' উপনিষৎ রিভাইজ করি। রেণু বোধে মিউচুয়াল, বিশ্ববিদ্যালয়, কাগজের দোকান ঘুরিয়া ৪টার আগে আসে। প্রতিভা আসে ২টায়। অন্য কিছু পরেই আসে। ৪টার পর আমরা বাহির হইয়া জয়দেবের আফিসে যাই। অন্য ঠাকুরের জন্য ২খানা ভিজিটিং ও ২টি দক্ষিণাস্তিকা আনে। বুঝতে পেরে আমি যাই। অন্যের সঙ্গে সাধনা ও ঠাকুরের সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। শুচি অপেক্ষা প্রেম বড়। মন ও প্রাণের মাঝে চলিতেছে বর্তমানে দ্বন্দ্ব—ইহাই আলোচনা হয়। অন্যকে প্রতিভা বাসে তুলিয়া দিয়া আসে। আজিও নমিতা আসে নাই, কারণ কারফিউ। সকালে দেবেন্দ্র চ্যাটার্জী আসিয়া অর্দ্ধেক কলসেদানে উদ্বোধন ভারতের চাঁদা ২৲ দিয়া যান। অন্য ২ জনের চাঁদার টাকা আনে। সুহৃদ ও নলিনীর নিকট ২টা পোষ্টকার্ড দেওয়া হয়। 'কেন' উপনিষৎ নিজের প্রকাশখরচে ছাপাইবার হুকুম আজ আসে। নলিনী দত্ত সন্ধ্যার পর আসিয়া এ্যাডভান্সীর নিকট হইতে আনা কাগজের দামের হিসাবটা দিয়া যান। Nat Sulph খাওয়ায় বোধকরি চোখের জল ও পিত্তটা পড়াটা অনেকটা কমিয়াছে। প্রতিভা আজ কঠ উপনিষৎ নকল করে। রেণুর দাদা জ্ঞানবাবু ২১ দিন পূর্বে পুরুষোত্তম-দর্শন প্রচার প্রতিষ্ঠানের জন্য ১০৲ টাকা দিয়াছে। পরে ১৫৲ টাকা দিবে। এই তাগুলি লেখার কথা হইয়াছে। ১৭ বি শ্রীমোহন লেনের দেবেন চ্যাটার্জী তাহার 'চণ্ডী' রিভিউ করিবার জন্য দিয়া যান। তিনি হাই স্কুলে পড়ান। তাহাকে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার কথাও বলিয়া দেওয়া হয়। রাধাচরণবাবু আজ এনভেলাপে একটা প্রবন্ধ পাঠান। সুহৃদকে লিখিয়াছি—আমি তোমাদের কলাট চুমুখ দিয়া গুবিয়া লইয়া তোমাদিগকে শান্তিতে রাখিলে সুখী হইতাম। কিন্তু আমি যে সর্বতোভাবে দীন। প্রতিভা তাহার ওখানে একদিন যাওয়ার কথা বলিয়াছিল, তারিখ ঠিক হয় নাই।

১০ই ফেব্রুয়ারী

সকালে 'কেন' উপনিষৎ রিভিসন শেষ করি। একবার রেণুর ওখানে যাই, আমহার্স্টষ্ট্রীটের কারফিউ-এর খবর জানাইবার জন্য। কেননা সেখানে বোস এণ্ড কোং-তে কাগজের জন্য যাইবার কথা। ১০টার পর আমি ও সে আফিস হইতে বাহির হই। সে ট্রামে সত্যেনবাবুর বাড়ী যায় এবং সেখান হইতে তাহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতা

যায় ও কাগজ কেনে। সে ফেরে ২৪০টার পর। সকালে পিসিমের লোক তব আসিয়াছিল। ফিরিয়া গিয়াছিল, আমি তখন আফিসে। ১১টায় পর আহার আসে। পিসিমের প্রবন্ধ দিয়া যায়। ২৪০টার পর নমিতা আসে। ৪টায় পর যায়। সে আমার বইগুলি ও প্রতিভার বই নিয়া যায়। ঈশোপনিষদের ২৲ টাকা দিয়া যায়। গীতার ভাষ্য পড়িতে আরম্ভ করে। গীতা জয়ন্তী হইতে 'শ্রীভগবান্ উবাচ' অংশ পড়ে। 'অভিজ্ঞানাতি'-র অর্থ বলা হয়। 'না-পাইয়া' পাওয়ার সাধনা আমাদের নয়। পাওয়ার পর হারানো এবং পুনরায় দ্বিতীয়বার পাওয়ার সাধনাই সত্য বাস্তব সাধনা। না-পাওয়ার ভুল ভাঙানোই সাধনা। মানুষ তো তাহাকে পাইবাই আছে। যে বস্তু যত বড়, সে তত স্বতঃসিদ্ধ। জুতা কিনিতে বাজারে যাইতে হয়, বাবু ঘরে বসিয়াই পাওয়া যায়। আলোকে কাহারও ডাকিতে হয় না, আলো যে আপনিই আসে, দুয়ার খুলিয়া রাখাই সাধনা। এক-জনের পাওয়া অপরে তাহার সঙ্গে এক হইয়াই পায়। যেমন পুত্র মায়ের পায়, স্ত্রী স্বামীর পায়। পাইয়া তো আছেই, একত্ব অনুভূতি হইলে না-পাওয়ার ভুল কাটিয়া যায়।···মনোরঞ্জনবাবু এখানে আসে, না না পাইয়া আফিসে যায় রেণুর সঙ্গে বিজ্ঞাপনের কথা বলিবার জন্য। সে আফিসে প্রায় ১ঘণ্টা থাকে।···

১১ই ফেব্রুয়ারী

সকালে 'কেন' উপনিষৎ শেষবারের মত দেখি, সারা হয় না। শ্রীযুত গোপাল গুপ্তের দৌহিত্র নারায়ণ আসে, তাহার সঙ্গে বরিশালের অনেক কথা হয়। গোপালবাবুর শরীর ভাল নয়। ৪৲ টাকা দিয়া যায়। গীতায় 'মাত্রা' শব্দের জন্য মৈত্রায়ণী উপনিষদের ভূতমাত্রা, প্রজ্ঞামাত্রা ও প্রাণ-অংশ একটু দেখি। শব্দকল্পদ্রুমখানিও একটু দেখি। 'নঞ্' অল্পার্থেও হয়; শব্দকল্পদ্রুমে নঞ্-এর ঐরূপও আছে। ১২টায় পর প্রতিভা আসে। রেণু সকালে টালিগঞ্জে মিঃ চৌধুরীর ওখানে যায়। ৩ জন গ্রাহকের টাকা নগদ নিয়া আসে। কাল সকালে আর ৩ জনের দিবে। মাখনবাবু আসে আফিসে। মহানির্বাণ মঠ হইতে প্রসাদ আনে ১টার পর। এখানে আসে ২-৩৫-এ। একটা রিক্সাতে আমরা যাই। বাসে যাই। ৩-১০-এর গাড়ীতে চারুবিহা যতীনবাবুর বাসায় পৌঁছি। ৩-৫০-এ রওয়ানা হই। ৪টার মধ্যেই পৌঁছি। ৪-৯০-তে আলোচনা আরম্ভ হয়। ৬টায় শেষ হয়। 'মাত্রা'র মধ্যেই বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়বর্গের স্পর্শ হয়, ভূতমাত্রার সঙ্গে প্রজ্ঞামাত্রার স্পর্শ হয়, তাহাতেই শীত উষ্ণ, সুখ-দুঃখের জন্ম হয়। কিন্তু 'অমাত্র' ব্রহ্মপুরুষের স্পর্শ যাহার জীবনে হয়, তাহার সব মাত্রাগুলি অমাত্রার সঙ্গে সমন্বিত হয়, নমনধর্মশীল হয়, তখন তাহা বিশ্বের সুখদুঃখের সঙ্গে মিলিয়া যায়, তিতিক্ষা আপনাআপনি আসে। মাত্রা অর্থ মাপজোখ। অমাত্র স্পর্শে মানুষের শক্ত (rigid), স্থিতিশীল মাপজোখ সব গোলমাল হইয়া যায়, তখন ইন্দ্রিয়বর্গ কেবল হয়, অমৃত হয়; বিশ্ব সমূহও ভাগবত রূপ ধারণ করে। 'নঃ অমৃতত্বায় কল্পতে'।···৯টার সময় চলিয়া আসি।

ভূতমাত্রা ধর্মচক্রের 'নেমি', প্রজ্ঞামাত্রা হইতেছে 'অর', আর প্রাণ হইতেছে 'নাভি'। দশ ভূতমাত্রা ছাড়া দশ প্রজ্ঞামাত্রা হয় না, আবার দশ প্রজ্ঞামাত্রা ছাড়া দশ ভূতমাত্রা হয় না। ঢাকা হইতে নানা রাবাত্মক গুজব আসিতেছে।

১২ই ফেব্রুয়ারী

সারা সকাল 'কেন' উপনিষৎ শেষবারের রিভিসন করি। প্রতিভা আসে ২টার পর। রেণু কলিকাতা ঘুরিয়া আসে ৩টায়। রেণু আগে যায়। আমি ও প্রতিভা ৪টার পর রওয়ানা হই, মোড় হইতে আমি মহিম হালদার ষ্ট্রীটে জীতুর খবর জানিতে যাই। সেখানে সুধীরঞ্জন প্রভৃতির সঙ্গে কথা বলিয়া সিধা অফিসে আসি। ঢাকার ঘটনার জন্য মনটা বিশেষভাবেই ভাল নয়। মনে হইতেছে পাকিস্থানের ভরা ডুবি হইতে রেহাই নাই। যে রাজ্যে প্রজা—হিন্দুই হউক মুসলমানই হউক বা যে কেহই হউক—নিরাপদ নয়, সে রাজ্য টেকে না।

অংশ তাহার অনিবার্য্য। এত বড় একটা সম্প্রদায় এত অমনুষ্য সম্পন্ন? এতকাল এ দেশে বাস করিতেছে হিন্দুর মানসিক অবস্থা কিছুই সে জানিল না? সর্ব্বক্ষণ বাধাদানের নীতি বেশী দূর বেশী দিন চলিতে পারে না। আজ সব দিক দিয়াই সে বেড়াজালে আটকাইয়া যাইতেছে, ইহার ভিতর হইতে বাহির হওয়া তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। বাধাদানের চরম হইতেছে 'যুদ্ধ করা'। তাহার সামনে ইহা ছাড়া আর কিছুই বাকি নাই। মরণ ঘনাইয়া আসিতেছে। সেদিন খুব দূরে নয়। সংসারে ছোটও বাঁচে, কিন্তু বড়র সঙ্গে খোঁচাখুঁচি করিয়া কতদিন সে বাঁচিতে পারে? এত মানুষের অনর্থক লাঞ্ছনা, এত দীর্ঘনিশ্বাস যাহার পশ্চাতে, সে কি করিয়া বেশীদিন গায়ের জোরে বাঁচিবে? তাহার পিছনে নৈতিক কোন সমর্থনই নাই। রেণু গতকাল নেহরুর ডিস্‌কভারী অব ইণ্ডিয়া এম্প লাইব্রেরী হইতে আনিয়াছে।·· প্রতিভা তাহার ওখানে একদিন খাওয়ার কথা কিছুদিন হইতেই বলিতেছে। রেণুর সুবিধামত ঠিক করা যাইবে। ফুলকে চাপা দিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া শুদ্ধ করিবার চেষ্টা শুধু বিদ্যালয়েই প্রশ্রয় দেওয়া নয়, উহাদ্বারা ফুল subconscious-এ যায়, complex সৃষ্টি করে, আত্মার দীন দশা আনিয়া দেয়। ফুলকে সহজভাবে ফুল বলিয়া স্বীকার করিবার সাহস থাকিলে ফুল শুদ্ধ হইয়া যায়। চাপাচাপি, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সমর্থন করিবার চেষ্টায় জীবনের সহজ সরল গতি রুদ্ধ হয়।

১৩ই ফেব্রুয়ারী

কিছুটা 'কেন' উপনিষৎ দেখার পর ৮টার পর আফিসে যাই। রেণু ৯-৩৫-এর পর বাহির হইয়া যায়, ফেরে সন্ধ্যার পর। প্রতিভা ১০টায় আসিয়া গল্প করিয়া ছেলে যায় নিজেই। সে ১২টার মধ্যেই ফেরে। সুধাংশু আসে ৪টার পর। নলিনীর ছেলে গোপাল আসে ৪টার আগে।·· প্রতিভা কঠ উপনিষৎ নকল করে। রেণু ২টা বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিয়াছে। আমি, সুধাংশু ও প্রতিভা একত্র হইয়া আফিসে যাই। রেণু আমার পূর্ব্বেই সে বাসায় চলিয়া যায়। সুধাংশু পত্রিকা বিক্রয় বাবদ ১৫৲ আনে। আমার মাথা ধরে ভার হয়। ৮।০ টায় পর আফিস হইতে বিদায় আসি। রাত্রিতে জলটুকু এখনও করি নাই। টাকার খরচ লইয়া মানুষের উদ্বেগের আর সীমা নাই। যতদূর বোঝা যাইতেছে বেশ অত্যাচার হিন্দুদের উপর হইয়াছে।···পুরুষোত্তম-দর্শনকে জীবনে আঁকড়াইয়া ধরিবার ও ছড়াইয়া দিবার মত কি কেহ নাই? জওহরলালের The Discovery of India হইতে ফাল্গুন মাসে আমার প্রবন্ধের নীচে একটা page-filler দেওয়া হয়। সেই লেখাটার পরই আছে—"In our individual lives also, we have to discover a balance between the body and the spirit, and between man as part of nature and man as part of society. For our perfection,' says Tagore, 'we have to be vitally savage and mentally civilized; we should have the gift to be natural with the nature and human with human society.' Perfection is beyond us, for it means the end, and we are always journeying, trying to approach something that is ever receding. And in each of us are many different human beings with their inconsistencies and contradictions, each pulling in a different direction.'—The Discovery of India—P 645। উজ্জয়ন্তভারত ইহাকে বাস্তবে রূপদান করিবার উপযোগী সাইকোলজি ও সমাজ ব্যবস্থার খোঁজ দিতেছে। জওহরলাল ও কাটজুর কাছে সব পত্রিকাগুলি একটা চিঠি দিয়া পাঠাইলে হয় না?

১৪ই ফেব্রুয়ারী

রাত্রিতে মাথা ভারটা কমিয়া যায়। সকালে স্নানাদি খাই। বাহির হই না। দুপুরে ভাত খাই, রাত্রে রুটি।

'কেন' উপনিষৎ শেষবারের দেখা শেষ করি। 'প্রাণের ঠাকুর শ্রীনিত্যগোপাল' প্রবন্ধ চৈত্র মাসের জন্য লিখিতে আরম্ভ করি। রেণু ১১টার পর আসিয়া নিত্যব্রতের চেকটা নিয়া যায় ও ব্যাঙ্কে জমা দেয়। সে কলিকাতা যায়। ফেরে সন্ধ্যার সময় আফিসে। সকালে 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া' বইটা কিছু পড়ি। প্রতিভা আফিস হইয়া এখানে আসে ১টার পর। কঠ উপনিষৎ নকল করে। আজ দুপুরে দ্বিতীয় কর্মী নিয়া যাওয়ার ও তৃতীয় কর্মী দিয়া যাওয়ার কথা ছিল। আসিল না। কি যে উহারা করিবে, বুঝিতেছি না। এমন করিয়া কি কাজ হয়? Religion has helped greatly in the development of humanity. They have laid down values and standards and have painted out principles for the guidance of human life. But with all these good they have done, they have also tried to impose truth in set forms and dogmas, and encouraged ceremonials and practices which soon lose all their original meaning and become mere routine.....

Philosophy has avoided many of these pitfalls and encouraged thought and inquiry. But it has usually lived in its ivory tower cut off from life and its day-to-day problems, concentrating on ultimate purposes and failing to link them with the life of man. Logic and reason were its guides and they took it far in many directions, but that logic was was too much the product of the mind and unconcerned with fact.

Science ignored the ultimate purposes and looked at fact alone.···Man became almost a geological force, changing the face of the planet earth chemically, physically and in many other ways...It is therefore with the temper and approach of science allied to philosophy and with reverance for all that is beyond, that we must face life. Chapter: Religion, Philosophy & Science—The Discovery of India.

১৫ই ফেব্রুয়ারী

সকালে 'শ্রীনিত্যগোপাল' ও উপনিষদের প্রাণবর্দ্ধন প্রবন্ধটী লিখি। ১১টায় রেণু আসে, প্রেসে ফোন করে। প্রেস হইতে তৃতীয় কর্ম্মের প্রথম প্রুফ দিয়া যায়। রেণু কলিকাতা চলিয়া যায়। দুপুরের পর গীতার প্রুফ দেখি। প্রতিভা সোয়াছিসে ফি, পি, করিয়া ২টার ফেরে। ৩টায় ধীরেনবাবু আসেন। তাহার একটা প্রবন্ধ পাঠ হয় ও আলোচনা হয়। প্রথমটী বেশ হইয়াছে, যেখানে বুদ্ধ-শঙ্করের আলোচনা হইয়াছে, সে জায়গাটি controversial বলিয়া উহা বাদ দেওয়াই সমীচীন মনে হয়। আমাদের কথাই বহুলাংশে লেখা। আমি প্রতিভা ও ধীরেনবাবু একত্র হইয়া বাহির হই। ধীরেনবাবু মোড় হইতে চলিয়া যান। আমি আফিসে যাই, প্রতিভা একটু পরে যায়। ইতিমধ্যে রেণু আসিয়াছে। সুশীল সেন আসিয়া খ্রিষ্টমাসের বাবদ ৫।০ দেয়, এক আনা বেশী দেওয়া হয়। সে ২টী প্রবন্ধ ও গ্রাহকদের টাকা পাঠাইয়া দিবে। রামগোপাল আসিয়াছিল—সে আফিস হইতে স্কুলগুলির ঠিকানা লিখিয়া দিতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে সে রাজী হয়। সোমবার আসিয়া জানিয়া যাইবে, কবে সেখানে যাওয়া হইবে। সতীনাথের পত্র আসে তাহার মারফত।

অরবিন্দের সব আরম্ভ absolute জ্ঞানশূন্য, পাপপুণ্য সত্ত্বরজঃতমঃ হইতে, static world হইতে। তাহাতে জগৎ থাকে না, অথচ বর্ত্তমানের বুদ্ধি বলিতেছে যে জগতের মূলের একটা সম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর। তখন এই দুই বুদ্ধিকে মিলাইবার জন্য ঈশ্বরের একটী 'অবতরণে'র প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। অথচ এই অবতরণের দ্বারা

ঠিক এই জগতের সৌন্দর্য রক্ষিত হয় নাই। ইহাও একটি ভাবুকের জগৎ ছাড়া খুব বেশী কিছু নহে। আমাদের অন্তর্ভূত matter is flexible এই অভিজ্ঞতা হইতে এবং তাহাতেই এই জগতের পারমার্থিক রূপ ফুটিয়া উঠে ও তাহার মর্যাদা রক্ষিত হয়। এই flexibility ততই অনুভবগম্য হইবে, মানুষ যতটা 'গুরুদেবে'র চরণে শরণাগত হইবে। ইহা একাধারে Inductive ও Deductive —অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী।

সন্ধ্যার সময় নলিনী দত্ত আসিয়া বাথগেট ও আর একটী কোম্পানীর চিঠি দিয়া যায়। ৯টার সময় আশ্রমে ফিরি, পথে ৵০ আনার চিনা বাদাম কিনি বুধুর জন্য।

১৬ই ফেব্রুয়ারী

সকালে 'শ্রীনিত্যগোপাল ও উপনিষদের প্রাণধর্ম্ম' প্রবন্ধটী একরূপ নূতন করিয়াই উপনিষৎ দেখিয়া লিখিতে আরম্ভ করি। ১০।০টার পর রেণু আসে। কিছুক্ষণ থাকিয়া ১১টার পর গ্র্যাণ্ট এণ্ড কোং, ফোরাম ট্রাস্ট প্রভৃতি স্থান হইয়া প্রেসে যায়। সেখান হইতে ফেরে ৬টার পর। প্রতিভা পোস্টাফিসে ডি, পি, করিয়া আসে ২টার পর। আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আফিসে যাই।··· ফোরাম ট্রাস্টে নলিনীর সঙ্গে রেণুর দেখা। সে আসিবে। সে আমাদের কথা ইংরাজিতে ব্যক্ত করিতে চায়। পারিলে তো ভাল কথা। আমার প্রত্যেক বই ছাপাইবার সঙ্গে ছেলখানার নাম ও তারিখ দিয়া দিতে হইবে। দেশকালের উল্লেখ থাকায় 'অখ' বুঝিবার পক্ষে অনেক সুবিধা হয়। আবেষ্টন যে মানুষের অনেক-কিছু। আমার শরীরটা তেমন ভাল যাইতেছে না, পেটটা ঠিক নয়, মাঝে মাঝে বেদনা করে। সকালে তো ছেলেদের সঙ্গে দুধসাবু খাই। বৈকালে দৈ ও খই খাই। রাত্রিতে খাইতে বসিয়া নিত্যব্রতের সঙ্গে তাহাদের ব্যবসায় সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়।···ব্যবসায়ী হইতে ডি, এন, যাহা পত্রিকা তাঁহার ভাল লাগে, এবারেও গ্রাহক থাকিবেন, মার্চ্চে টাকা পাঠাইবেন জানান। লেপের ওয়াড়টা বুইয়া আনিয়া প্রতিভা লেপে পরাইয়া দেয়। উষারিণীকে সকাল বেলা তো রীতিমতই রান্না করিতে হয়। সারা জীবন তো ইহাই চলিল। কি আর আমি করিব? বিশ্রাম আর জীবনে ঘটিল না। রেণুকে গতকাল অনিল ঘোষ ১০০৲ টাকা দিয়াছে, অবশ্য তাহার লোক। পত্রিকার প্রবন্ধের পুঁজি তো করিয়া গেল। আবার রেণুর বাহির হইতে হইবে। কত দিক সামলাইবে? ঠাকুর শক্তি দিন, স্বাস্থ্য দিন। প্রতিভা তাহার সাধ্যমত খাটিতেছে। তাই তো তবু পারিতেছে। এই প্রাণধর্ম্মন নিবার জন্য কি কেহ নাই? অথচ ভাল তো লাগে অনেকেরই দেখিতেছি, শুনিতেছি। পথের দিকে তাকাইয়া আছি। পথিকের খোঁজ যদি পাই। রাত্রি ৯।০টার পর আশ্রমে ফিরি। আজ দ্বিতীয় ফর্ম্মার ফাইল কপি পাইলাম। আর সব এখনও বাকী।

১৭ই ফেব্রুয়ারী

'শ্রীনিত্যগোপাল ও উপনিষদের প্রাণধর্ম্ম' প্রবন্ধটী কিছুটা লিখি। সকালেই আফিসে একবার যাই গীতা-প্রবন্ধের নীচে 'আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল' ইত্যাদি অংশটা লিখিয়া দেওয়াইবার জন্য গীতা-ভাষ্যের দুই খণ্ড লইয়া। রেণু ও আমি একত্রিত হইয়া ১১টার পূর্ব্বেই আশ্রমে আসি। সে ২।০টার পর সব প্রুফগুলির ফাইনাল অর্ডার দিবার জন্য প্রেসে যায়। প্রতিভা আসিয়া উপরের প্রবন্ধটী নকল করে। সে ও আমি ৪টায় আফিসে যাই। কিছু পরেই রেণু ফেরে। হেরম্ববাবু আসে। সে বলিয়া গেল আজ রাত্রিতে সে পণ্ডিচেরী যাইবে মিঃ ভ্রাইকারকে লইয়া। ৭ দিন পর ফিরিবে। ইহার পর আসে স্কুলের সুধাংশুবাবু। সে আধ ঘণ্টার উপর থাকে। সে আসিয়া খবর দিল যে, রেণু পরীক্ষক হইবে নীচের বোর্ডে ঠিক হইয়াছে, এইবার সিণ্ডিকেটে যাইবে। ইহার পর মাখনবাবু আসে। সে মিনিট ২০ থাকে, র‍্যাপারগুলি মিলায়। ৯টার পর আশ্রমে ফিরি। জ্যোতির ভাই এক চিঠি দিয়াছে, তাহারা ভাল আছে। ক্রমশঃ

সাময়িকী

বুদ্ধপূর্ণিমা ঃ—বৈশাখী পূর্ণিমা ভগবান বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্বলাভ ও মহাপরিনির্বাণের দিন—তাই বৈশাখী পূর্ণিমাই বুদ্ধ পূর্ণিমা। ভারতবর্ষের জীবনে ভগবান বুদ্ধের স্থান ও দান কি আমরা আজও সঠিকভাবে তাহা জানি না। বর্ণাশ্রমী সনাতন ধর্ম বুদ্ধদেবকে ভারতবর্ষ হইতে প্রায় নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, অতি সাম্প্রতিক কালে রাষ্ট্রক্ষেত্রের মাধ্যমে ভগবান বুদ্ধের খানিকটা স্বীকৃতি লাভ ঘটিয়াছে বটে কিন্তু বুদ্ধ তো রাষ্ট্রগুরু ছিলেন না যে রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে সম্মান লাভেই তাঁহার প্রকৃত সম্মান লাভ ঘটিল—তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি ধর্ম ও দর্শনক্ষেত্র হইতে প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন সেই দৃষ্টিকোণকে যদি সমগ্র জীবনের একটা দৃষ্টিকোণ বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলেই তাঁহার প্রকৃত সম্মান লাভ ঘটে। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের অবধূত ভাষ্যে বৌদ্ধ বেদান্ত সমন্বয় করিয়া লিখিতেছেন—"বৌদ্ধদর্শন দীক্ষিত হইয়াছে 'স্থিরতা' (permanence)-র অত্যাচারের হাত হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিয়া চঞ্চলতার গৌরবে তাহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে, 'অখণ্ডে'র নির্যাতন হইতে খণ্ডকে উদ্ধার করিতে, 'একে'র হাত হইতে বহুকে বাঁচাইতে, 'চেতনে'র শোষণ হইতে জড়কে মুক্তি দিতে, 'ভোক্তা'র বলাৎকার হইতে ভোগের মর্যাদা রক্ষা করিতে, স্থির চেতন 'ঈশ্বর'-শাসকের শাসন ও শোষণ হইতে শাসিত-শোষিত জীবকে মুক্তিদান করিতে, 'সনাতন' বেদের সনাতনত্বের নিষ্ঠুর পীড়ন হইতে সনাতনেরই একটী বিচিত্র আস্বাদন রূপে বর্ত্তমানের মর্যাদা দান করিয়া নূতন বেদ সৃষ্টি করিতে, ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতা মুছিয়া ফেলিয়া এই মাটির বুকে সঙ্ঘ-সাধনা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্যক্তিকে মুক্তি দান করিতে, উৎপাদ-নিরোধের কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার শক্ত ব্যবধান তুলিয়া দিয়া উৎপাদকে উৎপাদের মূল্যে এবং নিরোধকে নিরোধের মূল্যে আস্বাদন করিতে, 'সনাতনে'র চাপ হইতে মুক্ত করিয়া নিত্যই নব ক্ষণকে স্বয়ং মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে, 'পূর্বে'র সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার হাত হইতে ভূতকে রক্ষা করিতে, 'জলা'র জ্বালা হইতে জুড়াইবার জন্য চিরনির্ব্বাণের মহিমা কায়েম করিতে। যে স্থির-চেতনের বিরুদ্ধেই ছিল তাঁহাদের অভিযান, তাহা তাঁহাদের সিদ্ধান্তে না থাকাটা একান্ত দোষের নয়। কিন্তু তাঁহারা তখনই অসত্যদর্শী হইলেন, যখন উহাদিগকে একান্তভাবে অস্বীকার করিলেন এবং ভাবিলেন উহাদিগকে বাদ দিয়াই সিদ্ধান্ত স্থাপন করা সম্ভব হইবে। উহাদিগকে খোলা প্রাণে নিজেরই অপরার্দ্ধরূপে অঙ্গীকৃত না করিলে নিজেরাই পরিণামে উজাড় হইবেন, একথা তখন তাঁহাদের বুঝিবার সুযোগ ছিল না, থাকিতেও পারে না। কেননা, যখন কোনও নূতন কথা ধরার বুকে আসে, তাহাকে 'একান্ত' করিয়া প্রচার না করিলে মানুষ উহাকে ধরিতেই পারে না সমন্বয়ের কথা উঠে পরবর্ত্তী কালে।"—পৃঃ ৪১৮–১৯।

বৌদ্ধ দর্শনের এই দৃষ্টিকোণ স্বীকার করিয়া শঙ্কর-দর্শনকে তাহার অপরার্দ্ধরূপে দেখিয়া পুরুষোত্তমানন্দ লিখিতেছেন, 'ক্ষণিকবাদের জগৎ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহারই অপরার্দ্ধ ঐ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ, সাতত্যধারা (continuity), স্থিরতা ও তাদাত্ম্যকেও তাহার সাথে সমন্বিত করিয়া এক অখণ্ড পুরুষোত্তম-দর্শন আস্বাদন করিতে হইবে। জীবনের বাহিরে একান্ত বাহ্য ও একান্ত অভ্যন্তর দ্বারা একান্ত জড় বা একান্ত চৈতন্যদ্বারা 'সমুদয়' সৃষ্টি সম্ভবই নয়। জীবনের বাহিরে উহারা আপেক্ষহীন পরস্পর-স্পর্দ্ধিক্ষু প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র। কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ ও সাতত্য যুগপৎ স্বীকার না করিলে সৃষ্টি 'শয়তানের নৃত্যে' পরিণত হয় সত্য, কিন্তু একান্তভাবে কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা ও সাতত্য স্বীকারে মানুষ যে কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইয়া জীবনের সর্ব্ব শক্তির সহজ স্ফূরণ হারাইয়া ফেলে,

continuity-র নেশায় অনন্তধূর্যাস্বাদনে বঞ্চিত হয়, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য চূর্ণীকৃত হয়, ইহাও কি সত্য নয়? কার্য-কারণের শক্ত শৃঙ্খলা ও স্থিরতাকে একান্তভাবে স্বীকার করিলে অবাধিল উদ্ধার, চিন্তামণির বাটী হইতে বিষমঙ্গলের বৃন্দাবনযাত্রা, পুতনার যাত্রী উচিত গতি-প্রাপ্তি, পাষাণী অহল্যার উদ্ধার, রামচন্দ্র কর্তৃক ভক্ত শবরীর উচ্ছিষ্টভোজন, ব্রাহ্মণ না হইয়াও খোলা কবীরের ভগবৎপ্রাপ্তি প্রভৃতি ঘটনার ব্যাখ্যা মিলিবে না। 'Exception proves the rule'-নীতি কার্যকারণ-শৃঙ্খলাকে আরও পাকাই করে মাত্র।'

—এইভাবে দর্শনের ক্ষেত্র হইতে বৌদ্ধ দৃষ্টিকোণের প্রাধান্যের স্বীকৃতিই ভগবান বুদ্ধের প্রতি আসল সম্মান দান। ভারতবর্ষের জনসাধারণ সে কথাটা যত শীঘ্র উপলব্ধি করিবে, যত বেশী বৌদ্ধ চিন্তাধারার সঙ্গে শঙ্করাচার্যের চিন্তাধারার সমন্বয় করিতে পারিবে, তত শীঘ্র এবং তত বেশী সে বাস্তব ও আদর্শের সমন্বয় করিয়া বিশ্বের চিন্তাজগতে তথা কার্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা ভগবান বুদ্ধের এই জন্ম, বুদ্ধত্বলাভ ও পরিনির্বাণ লাভের অপটিকে সনম্র মনপ্রাণ দিয়া আস্বাদন করিয়া তাঁহাকে জীবনের মধ্যে গ্রহণ করিবার প্রয়াস করিতেছি।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের সমাধি স্থান ঃ বিগত চৈত্র শুক্লা দ্বাদশী ১৮ই চৈত্র ১৩৬৪তে (১৯৫৮র ১লা এপ্রিল) শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার আনন্দময় এই জীবনের স্থূল পরিসমাপ্তি টানিয়া দিয়া আনন্দময় পরবর্তী জীবনের পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার ১৯৫১ সনের ৬ই জুনের ডায়েরীতে তিনি লিখিয়া-ছিলেন, 'কোনও এক জায়গায় আমার দেহ রক্ষিত হয় এবং সেখানে কর্মকেন্দ্র, বিদ্যাকেন্দ্র ও ভক্তিকেন্দ্র গড়িয়া উঠে, ইহা মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়। কেওড়া-তলায় ছাই হইয়া যাইব, নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইব, ইচ্ছা হয় না। কিন্তু সব ইচ্ছা তো মানুষের পূরণ হয় না।' পুরুষোত্তমানন্দ ইচ্ছা করিয়াছিলেন আবার না-হওয়ার জন্যও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু বিধাতা পুরুষোত্তমানন্দকে যে প্রয়োজনে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার স্থূল দেহ অপসারণের সঙ্গেই তাহা শেষ হইবে না বলিয়া চলিয়া যাওয়ার দুই বৎসর আগে এই বাগুইআটি গ্রামে জমি কিনিয়া তাঁহার নরনারায়ণ আশ্রম লইয়া পুরুষোত্তমানন্দ এখানে আসেন। দুই বৎসর শেষ হইতে না হইতে তাঁহার স্থূল দেহ রুক্ষ-বর্ষা কহিতে কহিতে চলিয়া পড়িল—সেই অপরূপ সুন্দর দেহ বাগুইআটির এই মাটির নীচে সমাহিত হইল। আচ্ছাদন ও আবরণহীন স্থানেই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ইচ্ছামত চার বেলা ভোগ দেওয়া হইত ও সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালানো হইত। মাসখানেকের মধ্যে বন্ধুবরেণ্য শ্রীযুগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীসুধীন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী বলিলেন, স্বামিজীর সমাধি এইভাবে থাকিতে পারে না—কিছু করা দরকার। তাঁহারা কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দিলেন, বাকি কিছু গুরুভাইভগ্নীদের নিকট হইতে সংগৃহীত হইল। সমাধি মন্দিরের ভিৎ পর্যন্ত হওয়ার পর কোন কারণে উহা পাকা করিবার কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হই। ১৯৫৮র জুন মাসেই ভিৎ গাঁথা হইয়া গিয়াছিল। ইহার পর জুলাই মাসের মধ্যে বেদী নির্মিত হয়। তখন সেখানে বাঁশের খুঁটি দিয়া চারিদিকে দরমার বেড়া দিয়া উপরে টিনের একচালা করিয়া রাখা হয়। এইভাবে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। বাঁশের খুঁটি অকেজো হইয়া পড়িল—চালের কাঠামো শক্ত না থাকায় প্রতি বৎসরই ঝড়ে উড়াইয়া লইত বা সরাইয়া ফেলিত। খুঁটি বদলান ও চালের কাঠামো শক্ত করা এবার অপরিহার্য হইয়া পড়ায় আশ্রম-সম্পাদিকা নিজের ব্যক্তিগত ৫০০৲ টাকা হাতে লইয়া তাঁহাদের বিশেষ বান্ধব শ্রীযুত জ্ঞানরঞ্জন সেন—চীফ ইঞ্জিনীয়ার, ত্রিবেণী টীম্ লিঃ—মহাশয়কে অনুরোধ জানান যে তিনি পূর্বে যেরূপ আশ্রমের স্যানিটারী পায়খানা ও সেলাইয়ের ঘরের কাজ নিজের দায়িত্বে শেষ করিয়া দিয়াছিলেন, সম্পাদিকা ৮৬৮ টাকা সেই সময় দিতে না পারায় তাহা তাঁহার নিকট বাকি রহিয়াছিল—প্রায় বৎসরখানেক ধরিয়া তাহা ক্রমে ক্রমে শোধ দেওয়া হয়, সেইরূপ এইবারেও যদি তিনি দায়িত্ব

দান তাহা হইলে চারিদিকে দেওয়াল দিয়া উপরে ঐ টিনই বসিয়া দিবার মত করিয়া কাজ আরম্ভ করা যায়। সম্পাদিকা এখনই ৫০০৲ টাকা দিতে পারিবেন, পরে যখন যেরূপ উঠিবে, সেরূপ দিবেন। মহৎ-হৃদয় জানবাবু সম্মত হওয়ায় কাজ আরম্ভ হয়। এই সঙ্গে ১৩।১১।১৩৬৭ তারিখে দৈনিক জনসেবক পত্রিকায়, ১৫।১১।১৩৬৭তে আনন্দবাজারে এবং ১৭।১১।১৩৬৭তে যুগান্তর পত্রিকায় এবং ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৬৭র উদ্বোধনে পত্রিকায় পুরুষোত্তমানন্দের অনুরক্তদের প্রতি সমাধিমন্দির পাকা করিবার জন্য সাহায্য করিতে আবেদন জানান হয়। ইতিমধ্যে সম্পাদিকা সমাধিস্থান নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়া তৎকর্তৃক লিখিত পুস্তকের প্রকাশক ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানীর নিকট প্রাপ্য কমিশন চাহিয়া পাঠান। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী পাঁচশত টাকা দেয়। পূর্বের পাঁচশতের সঙ্গে এই পাঁচশত যুক্ত হয়। গ্রন্থাগারের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীর মাহিনা এই সঙ্গে যুক্ত হয়। শ্রীমৎ স্বামিজীর বই ছাপানোর তহবিল হইতে ১৯২৷৫০ লওয়া হয়। সমাধিমন্দিরের ভিৎ হইতে আরম্ভ করিয়া বাহিরের যাহাদের নিকট হইতে আজ পর্যন্ত যাহা পাওয়া গিয়াছে, আমরা প্রাপকদের আনন্দের সঙ্গে তাহা উদ্ধৃত করি—

ভিৎবাবদ ১৯৫৮-তে প্রাপ্ত

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও	
,, সুধীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর মারফত সংগ্রহ	... ৫৫০·০০
,, লীলা চৌধুরী	২·০০
,, গীতা চৌধুরী	... ১০১·০০
,, মণীন্দ্রলাল বিশ্বাস	১০·০০
,, সুধাংশুকুমারী ঘোষ	৫·০০

বৎসর দেড়েক পূর্বে বেদীর সম্মুখে শ্বেতপাথরের ফলকে নাম লিখাইয়া উহা গাঁথিবার খরচ বাবদ শ্রীনিত্যরঞ্জিণী রায় দিয়াছিলেন ১৩০·০০ মত।

বাকি অংশ বাবদ ১৯৬০ ও ৬১-তে প্রাপ্ত

শ্রীমীরা চট্টোপাধ্যায়	
,, অমিতাভ মিত্র	
,, সুধীরচন্দ্র সান্যাল	
,, মৃণালিনী বিশ্বাস	
,, সুনীতি চক্রবর্তী	
,, গার্গী সেন	
,, — মুখোপাধ্যায়	
,, অনিল ঘোষ	
,, মীনাক্ষী দাস	
,, হরিপদ ভট্টাচার্য্য	
,, সন্তোষকুমার অধিকারী	
,, জিতেন্দ্রনাথ সেন	
,, যোগেন চক্রবর্তী	
,, নরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত	
,, প্রিয়রঞ্জন রায়	
,, সেবা দাস	
,, পরিমল মুখার্জী	
,, প্রভাতকুমারী রায়	
,, সাধনা ভট্টাচার্য	
,, সরোজিনী বন্দ্যোপাধ্যায়	
,, আশুতোষ মজুমদার	
,, হরিগোপাল গাঙ্গুলী	
,, সুশীল ঘোষ	
,, রসিকলাল গুহ	
,, শিশির বন্দ্যোপাধ্যায়	
,, কালীপদ সরকার	
,, ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়	
,, গোপালদাস অধিকারী	
,, জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	
,, সুবল চন্দ্র দাস	
,, বিরজা মজুমদার	
,, জয়া বন্দ্যোপাধ্যায়	
,, ক্ষিতীন রায়	
,, কুসুমকুমারী সরকার	
,, দীপক পাল	
,, নলিনীবালা দাশগুপ্তা	

শ্রীপাসী সেন মারফত সংগৃহীত	২·০০
,, সনাতন মণ্ডল ,,	৪·৫০
,, হৃষীকেশনাথ গাঙ্গুলী মারফত সংগৃহীত	১১৬·০০
,, সুরেশচন্দ্র দাস	৩৫·১৫
,, সন্ধ্যা চক্রবর্তী	৪·১৫
,, সুধাংশু কুমারী ঘোষ	৪·০০
,, বিমলা মিত্র	৩·০০

নির্মাণ-কার্য খানিকটা অগ্রসর হইলে শ্রীযুত জ্ঞানবাবু যে উদ্যোগী যুবকটীর উপর এই কাজের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, শ্রীকালিদাস সরকার নামক সেই ছেলেটির অগ্রহাতিশয্যে এবং শ্রীযুত সেনবাবুর সম্মতিতে মন্দিরের ছাদে টিন না রাখিয়া ঢালাই করিয়া দেওয়া স্থির হয় এবং সেই মত কাজ হইয়াছে। ইহাতে অনেক টাকাই তাঁহাদের নিকট বাকি থাকিবে—আমরা এ পর্যন্ত ঘরের বাহিরের যোগ করিয়া মোট ২২৭৯৵০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছি—(ভিতের টাকা ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই) মালমসলা খরিদেই ইহা ব্যয়িত হইয়াছে। পুরা হিসাব আমরা এখনও পাই নাই—কর্মীদের মজুরী ও জানালা দরজার মূল্য বাবদ আনুমানিক দেড় হাজার টাকা তাঁহাদের নিকট বাকি থাকিবে। তাঁহারা অতি উদার হৃদয় বলিয়াই এই টাকা বাকি রাখিয়া মন্দিরের কাজ সমাধান করিয়া দিলেন। আমরা যত শীঘ্র পারি, তাঁহাদের টাকা পরিশোধ করিব—কিন্তু সকলের সহযোগিতা ব্যতীত তাহা পারিয়া উঠিব কেন? তাই বন্ধুবান্ধবদের প্রতি আমাদের বিশেষ আবেদন এই যে যাঁহারা এ পর্যন্ত সাহায্য কিছু পাঠান নাই, তাঁহারা যেন যে যাহা পারেন শীঘ্র পাঠাইয়া দেন।

বিগত ১৭ই বৈশাখ ১৩৬৮ রবিবার নূতন সমাধি মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে নেওয়া হয়। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা উষাঙ্গিনী ঘোষ ও তাঁহাদের মেজো ও ছোট পুত্রবধূদ্বয়, মেয়ে ও দুই ছেলের ছেলেমেয়েরা সেদিন উপস্থিত থাকিয়া যে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করিয়াছেন এজন্য আমরা এবং অন্যান্য পুরুষোত্তমানন্দ বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন। ইহারা ব্যতীত স্বামিজীর শিষ্য-শিষ্যা ও অনুরাগীদের মধ্যে (যাহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ জানান হইয়াছিল) অনেকেই উপস্থিত হইয়া বিপ্রহরে মোট প্রায় সত্তর জন প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিকাল ৪-১৫-তে সমাধি মন্দিরে সকলে বসিয়া তাঁহার সমাধিস্থান পাকা হওয়ার মধ্য দিয়া এই নরনারায়ণ আশ্রম যে একদিন শ্রীনিত্যগোপাল ব্রহ্ম-বিদ্যাপীঠে পরিণত হওয়ার পুরুষোত্তমানন্দের ইচ্ছার দিকে এক ধাপ অগ্রসর হইল, আনন্দের সহিত সম্পাদিকা কর্তৃক তাহাই আলোচিত হয়। অতঃপর বুদ্ধ জন্ম উপলক্ষে পুরুষোত্তমানন্দ কোন্ সময়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতবর্ষের বুকে গতিধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধদেবকে দেখিয়াছিলেন, তাহাই আলোচিত হয়।

সুকুমার গুপ্ত স্মৃতিরক্ষা : উদ্বোধনের পাঠকবর্গের মনে থাকিবে আমাদের অশেষ প্রীতিসম্পন্ন বন্ধুবর সুকুমার গুপ্ত কেমন করিয়া বিগত ৪ই পৌষ ১৩৬৭ অকস্মাৎ পরলোকগমন করিয়াছিলেন। সুকুমারবাবুর মহৎ হৃদয় অনুযায়ীই তাঁহার মা, স্ত্রী ও ভাইয়েরা তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখিত একখানি উপনিষদের অবলুপ্ত-প্রায় ছাপাইবার জন্য তাঁহারা নরনারায়ণ আশ্রমকে ৪০১৲ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়া ইহাই প্রমাণিত হয় যে সুকুমারবাবুর নাম উপনিষদ প্রকাশের কারণ হইয়া থাকিয়া অমর হইয়া রহিল। আমরা শ্বেতাশ্বেতর উপনিষৎ ছাপাইবার ব্যবস্থা করিতেছি। উপনিষদের ভাষ্যে লিখিত চিন্তাধারা বর্তমান যুগসমস্যার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করায় এই পুস্তক প্রকাশ পুরুষোত্তমানন্দের জীবনের একটী বিশেষ আগ্রহ ছিল—তাই সুকুমারবাবুর স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁহার আত্মীয়গণের এই দান পুরুষোত্তমানন্দকে বিশেষ আনন্দ দান করিবে। আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের প্রাণভরা কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম পোঃ দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

CENTRAL
VERSITY

উদ্বোধন

জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৩ শকাব্দ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ ১৪শ বর্ষ, ৫ম সং

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫০—

(৪)

…পুরুষোত্তম আমার বিশ্বমথন ধন। আমার ও বিশ্ব জীবন মথিত হইলেই পুরুষোত্তম জন্মগ্রহণ করিবেন। এই পুরুষোত্তমকে দেখিবার জন্য অনাদিকাল হইতে মানুষের কি আকুলি বিকুলি! মহাপ্রভুর 'আইতে যোয়াস্তি নাই নিদ নাই চোখে'। বুধুকে ডুপুরে ৵০ আনার দই কিনিয়া দেই। রেবতী সেন ৪৲ টাকা আমার নামে এই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়াছে। বেলা ২।০টায় প্রাণহরি আসিয়া ছিল। সে যাদবপুরে কিছু জায়গা নিয়াছে। সেখানে শীঘ্রই যাইবে। পুত্র উচ্ছৃঙ্খল। চাকরী বেশীদিন নাই। মানুষ যে কি সহিতে পারে ভাবিলে অবাক হইতে হয়। জ্যোতি বহরমপুর গিয়াছে। ২।১ দিনের মধ্যেই আসিবে। আশ্রমের ঠিকানায় কুমার এক পত্র দেয়।… -এর বিবাহে সে তাহার মাকে নিয়া আসিবে। তাহার মা এখানে থাকিতে পারিবে কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছে। উষাদিদির নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম—থাকা হইবে স্থির হইল। মনে হইতেছিল বৃন্দাবনে তাহারা তন্ত্র কি আমার তন্ত্র করিয়াছে দুই বৎসর ধরিয়া। দুলালীর বাত দিন ধরিয়া জ্বর।…কুসুমের কোনও চিঠি না পাইয়া উদ্বিগ্ন।…

১৮ই ফেব্রুয়ারী

খুব ভোরে 'দশগ্রাম সতীশচন্দ্র শিক্ষাসদনের উদ্যোগে বিরাট প্রভাতফেরী'র উপলক্ষে শশি ভুঁইয়ার পুত্র পূর্ণেন্দু আসিয়া আমার যাইবার জন্য বলে। সোমবার সকালে আবার আসিবে। আলোচনা হয়। গত ২ বৎসরের পত্রিকা নিবে বলিয়া গেল। গ্রাহকও হইবে। তাকুরিয়া গীতাপাঠের জন্য প্রস্তুত হই। সৎ+অসৎ দুই-ই তিনি, আবার 'ন সৎ ন অসৎ'—ইহাও সত্য। অক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ (গীতা ১১।৩৭), ন সৎ নাসদুচ্যতে (গীতা ১৩।১২), সদসচ্চাহমর্জুন (গীতা ৯।১৯), কুতঃ সত্তঃ সৎ জায়তে (ছান্দোগ্য ৬।২।১।২), একা সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি (ঋক্ ১।৬৪।৪৬), অসৎ বা ইদমগ্র আসীৎ (তৈত্তিরীয় ২।৬।১)। সৎ ও অসৎ শব্দদ্বয় গীতায় ও উপনিষদে বিভিন্ন অর্থে ভাষ্যকারগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে। একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ খুব শোভন নয়; উহাতে অভিসন্ধিই অভিব্যক্ত হয়। প্রজ্ঞা ও প্রাণ, ভাব ও রসের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে একই শব্দের সর্বস্থলে এক অর্থ বোঝা যায়। ভাব আস্বাদন করে 'সৎ'-এর মাধুর্য্য, রস আস্বাদন করে অসৎ-এর মাধুর্য্য। ভাবের কাছে 'সৎ'-ই সৎ, রসের কাছে 'অসৎ'-ই সৎ। রসের দৃষ্টিকোণে 'অসৎ অগ্রে আসীৎ', ভাবের দৃষ্টিকোণে 'সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ'। গীতায় নাসতঃ বিদ্যতে শ্লোকের এইভাবেই ব্যাখ্যা আমি করিয়াছি। 'জীবনপ্রবাহ' দ্বারাই 'ইদং সর্বং' অর্থাৎ সৎ ও অসৎ দিক, থাকা ও না-থাকার দিক 'ততম্' রহিয়াছে। এই জীবন-প্রবাহই অনাদি ও অপ্রমেয়।

কোন মাপজোপের মধ্যে জীবন-প্রবাহকে ধরিয়া রাখা যায় না। রেণু আসে ১টায়। প্রতিভাও আসে তাহার পর। আমরা এখান হইতে রিক্সায় মোড় পর্যন্ত গিয়া বাসে বালীগঞ্জ যাই। ২-৪০-এর গাড়ীতে ঢাকুরিয়া পৌঁছি। মা-র ওখানে যাই। ৪-২৫-এ পাঠ আরম্ভ হয়। ২ ঘণ্টা পাঠ চলে। জলযোগ করিয়া ট্যাক্সীতে আসি। ভাড়া ৩৲। দেবীবাবু দেন। ট্যাক্সীতে আফিসে যাই। আফিসের আলোচনায় দুইজন মুসলমান ঐ পাড়ার যোগদান করিয়া ছিলেন। শুনিলাম তাঁহারা খুব তৃপ্ত হইয়াছেন। বিমলা দাস আসিয়াছিল। তাহার ৪ বৎসরের একটী পৌত্র টাইফয়েডে ১৯ দিন ভুগিয়া ১০/১২ দিন আগে মারা গিয়াছে। মঞ্জরা ৬টার আগে এখানে আসিয়াছিল। ৮।০টার পর চলিয়া যায় বাসায়।

১৯শে ফেব্রুয়ারী

সকালে ৯টার পর 'কেন' উপনিষদের পাণ্ডুলিপি দিয়া আসিবার জন্য আফিসে যাই। রেণু ১০টার পর বাহির হইয়া যায় উহা প্রেসে দিয়া আসিবার জন্য এবং প্রেস হইতে একটা ব্লক এক পার্টিকে ফেরত দিবার জন্য। ...প্রতিভা এখানে রান্না করে ও ঠাকুরভোগ দেয়। সকালে মেদিনীপুরের পূর্ণেন্দু শেখর কৌমিক ও ধরণীধর মাইতী আসে। ২ বৎসরের পত্রিকার দাম ৪৲ টাকা করিয়া ৮৲ টাকা পূর্ণেন্দু দিয়া যায়। আর ৪ জন করিয়া দিবে বলিল। আগামী রবিবার ১২টায় যাইব স্থির হয়। প্রতিভা 'নিত্যগোপাল ও উপনিষদের প্রাণদর্শন' প্রবন্ধ নকল করে। রেণু এখানে দুপুরে আসে না। আমরা ৪টার সময় আফিসে যাই। রেণু ৪টার সময় দিয়া তাহার বাসায় যায়। মাখনবাবু ..আসিয়াছিল। বৈকালে সুবোধ মুখার্জী আসিয়াছিল। আজ নীলুর পোষ্টকার্ড ও ফুলের এনভেলাপ আসিয়াছে। ভাল আছে। কল্যাণ বুকি ও বীরেনবাবু পাবনার ঠিকানায় টাকা পাঠাইয়াছে। প্রতিভা রাত্রে রেণুর ওখানেই থাকিবে। কাল রেণুর ওখানে আমার খাওয়া স্থির হইল। অনেক-দিন হয় প্রতিভা খাওয়াইবে কথা ছিল। মঞ্জু কাল বহন আসিয়াছিল আমার জন্য কিন্তু ফিরমিল রাখিয়া গিয়াছিল

২০শে ফেব্রুয়ারী

ভোরেই খবর প্রচারিত হয় শরৎ বসু মহাশয় গত রাত্রি ১১-২০টায় পরলোক গমন করিয়াছেন। রেডিওতে রাধার জন্য কৃষ্ণবিরহ (শশিশেখরের পদ) শুনিতে শুনিতে মনে হইতেছিল, বৈষ্ণবগণ নির্বিশেষকে বিশেষের ক্ষেত্রে গোপীলীলা প্রভৃতির ভিতর দিয়া আস্বাদন করিতে চাহিতেছেন, কিন্তু উহাকে সাধন-দেহ পর্যন্ত গড়িয়া না তুলিয়া শুধু সিদ্ধ দেহের ব্যাপার, ধ্যানের ব্যাপার করিয়া রাখায় 'মায়াবাদে'রই প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। নির্বিশেষকে বিশেষ চৈতন্যের ক্ষেত্রে আনায় 'মায়াবাদ' কিছুটা পরিপাক করা হইয়াছে বটে, কিন্তু কর্মের বুকে ঐ চিৎ-বিশেষত্বকে গড়িয়া তুলিয়া দিবার দিকে দৃষ্টি না থাকায় উহাও মায়াবাদেরই সামিল হইতেছে। অরবিন্দের মতবাদও এই হিসাবে মায়াবাদেরই সংস্করণ মাত্র। কর্মের বুকে জ্ঞান ও আনন্দের আস্বাদনই শুধু মায়াবাদ-মুক্ত। সকালে স্নান করিয়া রেণুর ওখানে যাই। সেখানে ১২টায় খাই.. । বৈকালে সুধাংশু আসে, তাহাকেও ভাল তরকারী প্রসাদ দেওয়া হয়। রেণু একবার রাইটার্স বিল্ডিংএ যায় রামগোপালের সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্য। স্কুলের নামগুলির একটা ছাপানো লিস্ট নিখিলবাবুর নিকট হইতে আনে। সন্ধ্যার পর পত্রিকা আসে। প্রতিভা রাত্রিতেও ওখানে থাকে। দিনে ওখানেই রান্না করিয়াছে ও খাইয়াছে। সকালে গোপাল গুপ্তের পুত্র কালীপদ ফোন করিয়াছিল। তাহার বাবা-মায়ের কোন পত্র পায় না। বাইবে কিনা জিজ্ঞাসা করিল। আমি যাইতে মানা করিলাম। তাহারা তো সেখানে একেবারে নিরাশ্রয় নন। সন্ধ্যায় বেহালাবাবু আসেন। কিছুকাল থাকেন। শরৎবাবুর জন্য শ্মশানে খুব ভিড় হয়। আজ জয়ার মেয়ে আশ্রমে

আসিয়াছিল শরৎবাবুর উপলক্ষে শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য।...

২১শে ফেব্রুয়ারী

সকালে জলখাবার খাইয়া আফিসে যাই। ১২টার পূর্ব্বে ফিরি। আবার ২টার পূর্ব্বে যাই। ২।০টায় প্রথম দফা গ্রাহক ও ওপি প্রতিভা দিয়া করিয়া দিয়া আসে। আমি আশ্রম হইতে আফিসে ফিরার পথে, বৃষ্টি হইতেছিল। সকাল হইতে মেঘাচ্ছন্ন ছিল। ৪টার মধ্যে একরকম সব হইয়া যায়। প্রতিভা আমার মশারিটাকে বহলাইয়া দিয়া ও সেখানে রেণুর ধোয়া মশারিটা টানাইয়া দিয়া ও ঔষধ বানাইয়া রাখিয়া দিয়া সন্ধ্যার সময় বাসায় যায়। আমি তখন আফিসে। বরিশাল হইতে খুব গোলমালের খবর আসিতেছে। হাজার বৎসরের হিন্দু মুসলমান সমস্যা সমাধানের পথে চলিয়াছে বলিয়া মনে হয়, মানুষের চরম দুর্ভোগ হইবে, তবুও ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় বলিয়া তাঁহার শ্রীচরণে শরণাগত হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে। কেহই তো ব্যক্তিগত-ভাবে কিছু করিতে পারিবে না। শুধু 'স্বস্তি অস্তু নঃ'—এই প্রার্থনা। যে চক্র ঘুরিয়াছে, কে মরিবে, কে বাঁচিবে স্থির নাই। তবু প্রার্থনাপর হইয়া থাকিতে হইবে এবং তাহাতেই কূল মিলিবে। মরণের জন্যই পাকিস্তান বাড়িয়াছে। ...সন্ধ্যার পর রামগোপাল আসিয়া calenderটা দিয়া যায়। সে কাল সন্ধ্যা হইতে আসিবে হেডমাস্টার মহাশয়দের চিঠির শিরোনামাটা লিখিয়া দিবার জন্য। রেণুর শরীরটা ভাল নয়...। ধীরেনবাবু আজ আসিলেন না, হয়তো অসুখই করিয়া থাকিবে।

২২শে ফেব্রুয়ারী

সকালে একবার আফিসে যাই। রেণু তাহার ঝিকে লইয়া পোষ্টাফিসে বাকী পত্রিকা দিয়া আসিতে যায়, আমি চলিয়া আসি। প্রতিভা ১২টার পর এখান হইতে আফিসের চাবি লইয়া সেখান হইতে ২১টা ডিপি পোষ্টাফিসে দিয়া আসে ও ব্যাঙ্কের বইটা নিয়া আসে ২টার সময়। ইতিমধ্যে রেণু আসে। প্রতিভা আসিয়া আমার 'নিতাগোপাল ও উপনিষদের প্রাণদর্শন' প্রবন্ধ নকল শেষ করে। রেণু 'চরিত্রহীন' লেখে। গীতা ভার্গব হইয়া এক পত্র দিয়াছে। আমি তো পূর্ব্বেই এক পত্র দিয়াছি। বরিশালের যে সব খবর আসিয়াছে তাহা বীভৎস ও মর্ম্মান্তিক। আজ জওহরলাল নেহরু পার্লামেন্টে এক বিবৃতি দিয়াছেন; পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুকে সর্ব্বপ্রধান সমস্যা বলিয়া ধরা হইয়াছে। বৈকালে পেটটা বেদনা করে...আফিস হইতে আসিবার সময় রামগোপাল মোড় পর্য্যন্ত সঙ্গে আসে। রামগোপাল স্কুলগুলির ঠিকানা লিখিবার জন্য সন্ধ্যার পরই আসে তাহাকে দিয়া জওহরলালের বিবৃতির টেলিগ্রাম (ভূপান্তর) আনাই। সে ঠিকানা কিছু লেখে।..

২৩শে ফেব্রুয়ারী

সকালে বাহির হই না। ঠাকুরের লেখা চৈত্রমাসে দিবার জন্য সংগ্রহের চেষ্টা করি। শ্রীনিতাগোপাল সম্বন্ধে লেখাটির বিভিসন শেষ করি। দাদা ও বিজয়ের কুশল সংবাদ জানিবার জন্য ২টী পত্র দেই। ১১টার সময় রেণু কলিকাতা বাহির হইয়া যায়, দুপুরে এখানে আসে নাই। প্রতিভা পোষ্টাফিস ঘুরিয়া আসে ২টায়। ...আমরা আফিসে গেলে পর রেণু কলিকাতা হইতে ফেরে। ত্রিপুরাশঙ্কর বাবুর একটা পত্র আসে, তিনি ভাল আছেন। ধলগ্রাম হইতে একটী ইনভেলাপ আসে আফিসের ঠিকানায়। রবিবার ১২টায় রওয়ানা না হইয়া ৯-৩১-এর গাড়ীতে রওয়ানা হইবার জন্য। তাহাতে দিনের মধ্যেই পৌঁছানো যাইবে। রামগোপাল স্কুলের চিঠির ঠিকানা লিখিবার জন্য সন্ধ্যার সময় আসে, ৮।০টার পর যায়। প্রেস হইতে ৯টার মধ্যেও চিঠি দিয়া গেল না। 'কেন' উপনিষৎ আরম্ভ করে নাই। কাগজে দেখিলাম অতীন চক্রবর্ত্তীও ছুরিকাহত হইয়াছে। সত্য খবর জানি না। Ill got, Ill spent—পাকিস্থানের এই দুর্দ্দশাই হইবে। আত্মস্থ থাকিয়া বিস্তারের তেজ বুদ্ধিই কি এই কৃষির মধ্যে নাই? শুধুই আক্রমণশীল ও

পক্ষকে গ্রাস করিবার মনোবৃত্তি ও অপকৌশল? বর্তমান বিশ্বমনস্তত্ত্বের মধ্যে এই সমস্যা কি করিয়া দাঁড়াইবে? পতন অনিবার্য্য এবং তাহাও খুব দূরে নয়। দিনরাত সংঘর্ষের মধ্য দিয়া কতদিন কে টিকিতে পারে? এতটুকু স্থিতিও তো তাহার নাই। চতুর্দিক দিয়া কত অবরুদ্ধ সে। এই দাঙ্গার ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে সে জন্তুর কত দুর্বল ও অসহায়। সে একটা closed circle-এর মধ্যে পড়িয়া ছটফট করিতেছে এবং এবং হিন্দু যাহাকে পাইতেছে তাহাকে মারিয়া গায়ের জ্বালা মিটাইতেছে। সে আরও জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে। সে ইহা জানে বলিয়াই বাহির হইবার জন্ত এই হীন দাঙ্গা হাঙ্গামা। ইহা ছাড়া যাহার আর পথ নাই, সে কি বিপদেই না পড়িয়াছে।

২৪শে ফেব্রুয়ারী

পূর্ব্ববঙ্গের পৈশাচিক ঘটনার বেদনায় ও প্রতিবাদে হরতাল (পূর্ণ)।

আজ সকালে চৈত্রমাসের জন্ত 'গীতা' ঠিক করা হয় এবং দুপুরে প্রতিভাকে দিয়া লেখা শেষ করা হয়। রেণু ৭।০টার পর আসে। রেণুপদ··· আসে···। আজ খুব হরতাল হইয়াছে পূর্ব্ববঙ্গের ঘটনাবলীর বেদনায় ও প্রতিবাদে। ট্রাম বাস বন্ধ ও ট্যাক্সি, সব দোকান (ছোটবড়) সব বন্ধ। এক পয়সার বিড়িও পাওয়া যায় নাই। রাত্রিতে ছিল। প্রতিভা দুপুরে হাঁটিয়া আসে ও সন্ধ্যায় আবার হাঁটিয়াই চলিয়া যায়।···'শ্রীনিত্যগোপাল জীবন বেদ' নামে এক ব্যক্তি হীরক পাইয়াছে ইত্যাদির ব্যাখ্যা লিখি। যদি সম্ভব হয় আরও ২।১টী এইরূপের সংখ্যায় দিবার ইচ্ছা আছে। 'নিত্যধর্ম্ম' পত্রিকা একটু পড়ি।

২৫শে ফেব্রুয়ারী

৭ টায় পরই সুব্রত ভৌমিক (পূর্ণেন্দুর ভাই, ওরফে মন্টু) তাহার এক ডাক্তারি পড়িতেছে-ভূতপূর্ব ভাই সহ আসে। স্নান করিয়া আলুভাতে, ডাল ও বেগুন-ভাজা খাইয়া ট্যাক্সীতে ৮।০ টায় রওনা হই। রেণু ও প্রতিভা সকালেই আসিয়াছিল। সঙ্গে রুটি ও তরকারী একটা কৌটায় দেওয়া হইয়াছিল। ৯-৩১ মিঃ-এ নাগপুরের গাড়িতে রওনা হই। ১২ টার পর খড়্গপুর পৌঁছি। প্রথম বারটী পেট্রোল আনিতে গিয়া বিগড়ায়, সেটি ছাড়িয়া অপর একটীতে উঠি, সে-ও যায় না। পরে তৃতীয়টীতে উঠিয়া নারায়ণগড় পৌঁছি। সেখানে রুটী তরকারী খাই কমলকৃষ্ণ ঘোষের চায়ের দোকানের সামনে বসিয়া। তাহারা শ্রদ্ধা ভক্তি করে, প্রণাম করে। পরে পালকী বেহারারা খাইয়া আসে। ওটার পর রওয়ানা হইয়া ৭ টার সময় ধলগ্রাম পৌঁছি। বালকগণ 'স্বাগত অতিথি' গান গাহিয়া অভিনন্দিত করে। পরে ছাত্রাবাসে যাই। মুখ ধুইয়া জলযোগ করি—কমলা, পেঁপে, ছানার জিলাপী ইত্যাদি। পূর্ণেন্দু, ঈশ্বর, গোপাল অধিকারী প্রভৃতির সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ আলোচনা হয়, ঈশ্বরের সঙ্গে মোহাতি শশিবাবুদের ওখানে ২০ বৎসর পূর্ব্বে দেখাশুনা ছিল। সে ছিল স্বেচ্ছাসেবক। আজ সে এখানে প্রধান শিক্ষক। সে আমাকে পাইয়া খুব তৃপ্ত। আমিও ইহাদের পাইয়া পরিতোষ লাভ করিলাম। পরে প্রসাদ পাই—ছাত্রাবাসের প্রস্তুত। কপির তরকারী, আলুভাজা, বেগুন-ভাজা, ডাল, টমেটোর চাটনি ও দুধ। খাওয়ার পূর্ব্বে ছেলেদের tug of war এ যোগদান করি। ১০ টার পর শয়ন করি। যাতায়াতের গোলমালে ১২ টার সময় ঘুমাইয়া পড়ি। পালকীতে আসিতে আসিতে মনে হইতেছিল—পালকীর ভিতর যে আছে, যে ঠাকুর, তাহার সব-টুকু জুড়িয়া থাক, তাহাকে বহন করিয়া যেন তোমাকেই বহন করা হয়, তবেই পালকীবেহারাগণ ধন্ত হইবেন। পালকীবেহারাদের জড়াইয়া ধরিতে ও পায়ের ধূলা নিতে ইচ্ছা হইতেছিল। মানুষের মর্য্যাদা কেন মানুষ স্বীকার করিবে না, যে-কোন কাজেই সে থাকুক না কেন। কি ভীষণ খাটুনি ইহাদের। দেহের এই খাটুনি ও অবসন্নতা দূর করিতে হইলে চাই প্রকৃতির স্পর্শ, স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের সঙ্গে সঙ্গ। প্রজ্ঞাপ্রধান মানুষ

এই খাটুনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। প্রাণ-স্পর্শই প্রাণের গ্লানি দূর করিতে পারে, প্রজ্ঞা নয়।

২৬শে ফেব্রুয়ারী

…সকালে এখানের কেহ কেহ আসেন। তাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। এখানের পরিস্থিতিমণ্ডল বেশ উদার।…দুপুরে বালকদের সঙ্গে একত্র বসিয়া আহার করি। প্রায় ১০০টী বালক ছিল। বেশ ভাল লাগিল এমনটী তো কোনদিন আস্বাদন করি নাই। পরে ঈশ্বর ও পূর্ণেন্দু ছিল। খাওয়ার পর দুয়ার বন্ধ করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি। ৫ টায় প্রদর্শনী ক্ষেত্রে যাই কিছুক্ষণ কীর্ত্তন হওয়ার পর ৫।০ টায় পর আলোচনা সুরু হয়। গোপালবাবু সভাপতি হন। পূর্ণেন্দুর দ্বারা আমার একটু পরিচয় দেওয়ার পর ১।০ ঘণ্টা বক্তৃতা দেই। ইংরেজ চলিয়া যাওয়ায় যে শূন্যের সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে কাহাকে বসাইব? পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবন ছাড়া আর কেহ নাই। 'মন্নানাং অর্থিং' শ্লোক দিয়া আরম্ভ করি। প্রজ্ঞাধারা এবং প্রাণধারা, morality & Art। বেশ লোক হইয়াছিল।…ঈশ্বরের সঙ্গে বারে বারে অনেক কথা হয়। ঈশ্বর একবার বলিয়াছে নাম' কার্য্যের ভিতর যেন কোন সময়ে আত্মহারা হইয়া যাই, উচ্চ জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না। এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়।

২৭শে ফেব্রুয়ারী

সকালে বালকদের সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দেই। প্রথমে তাহারা তাহাদের নিয়মিত কার্য্যধারা অনুসারে প্রার্থনা করে। তাহার পর আমি কিছু বলি। প্রার্থনার কবিতার মধ্যে ছিল 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা দূর কর'। জীবনের মহাপ্রকাশকে কখন সঙ্কোচে এড়াইয়া যাইও না, জীবনের ব্যাপকতর ও গভীরতর প্রকাশের মধ্যে তাহাকে পরিপাক কর, ছোট মনে করার পাপ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখ, একলা চলিতে শিখিলেই একদিন সব আসিয়া যুক্ত হইবে। প্রার্থনার পর আমাকে লইয়া তিন রকমের কটো তোলা হয়। গোরক্ষন আসে, কথাবার্তা হয়। ১১ টার সময় পূর্ণেন্দুর ঘরে তার স্ত্রী, ঈশ্বরের মা ও স্ত্রীর সঙ্গে কিছুক্ষণ বসি। শ্রীরাধা জাতি-কুলশীলত্যাগিনী, বিপ্লবময়ী; আজ সেই বিপ্লবের পথেই নারীদের জীবনকে আগাইয়া নিয়া যাইতে হইবে। ইহারা যেন এখানে তাহাদের নারীত্বের পরিপূর্ণ সাধনা করিবার সুযোগ পায়। মায়ের মত যেন বালকদের লালন পালন করেন। পরে স্নান করিয়া গোপাল অধিকারীর বাড়ীতে যাই। ছইহীন গরুর গাড়ীতে ছাতি মাথায় দিয়া (গোপালই অবশ্য ছাতি ধরিয়াছিল) তাহার বাড়ীতে যাই। বাড়ী আধ মাইল দূর হইবে। সেখানে তাহার স্ত্রী পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে খাওয়ায়। আলু-ভাজা, শাক, কুমড়াফুল ভাজা, কই মাছের ঝোল ও অম্বল, ডাল, টমেটোর চাটনি, দই ইত্যাদি সেবা করি। গোপালের ওখানে বরিশালের হরন্তপুরের একটী ব্রাহ্মণ গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দের পূজা করেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার দেশের কথা হইল। গোপালের পুত্র স্বরাজ মহাত্মাজীর সঙ্গে চরকায় সুতা কাটিয়াছিল মহিষাদলে। এখনও তাহারা সকলে রোজ খাওয়ার পর ১ ঘণ্টা সুতা কাটে। ইহাদ্বারা তাহাদের পরিবারের কাপড় হয়। খাওয়ার পর ১ ঘণ্টা বিশ্রাম করি। ৩ টায় পূর্ব্বে আবার গরুর গাড়ীতে এখানে আসি। বহু লোক গোপালের বাড়ীতে জড় হইয়াছিল। ৫ টায় প্রদর্শনীতে যাই ও সব বিভাগ ঘুরিয়া দেখি। রেশমের বিভাগ দেখি। কেমন করিয়া প্রজাপতি ডিম পাড়ে ও তাহা হইতে ক্ষুদ্র পাতার মধ্যে থাকিয়া সেই পাতা খাইতে খাইতে ক্রমশঃ স্তরে স্তরে বড় হইতে থাকে এবং শেষে গুটি কাটিয়া বাহির হয় তাহা দেখি। রেশম উঠাইবার প্রক্রিয়াও দেখি। তৎপর মহিলা সভা হয়। ৫।৬ শত মেয়ে হইবে। ১ ঘণ্টার উপর আলোচনা হয়। পরে ছাত্রাবাসে আসিয়া হাতমুখ ধুইয়া বিশ্রাম করি।…১টার সময় ছেলেদের থিয়েটার শেষ হয়। তখন আমি খাই ও শুইয়া পড়ি। খাইতে খাইতে ঈশ্বরের সঙ্গে এখানের কথা হয়।

২৮শে ফেব্রুয়ারী

কাল রাত্রিতে ২টার সময় শোবার জন্য একটু দেরীতে উঠি ...সকালে খাওয়ার বন্দোবস্ত ঈশ্বরের স্ত্রী করিয়াছিল। সেখানে ৯টার সময় যাইতে যাই।...বার বার তাগিদ দিয়া ৩টার পর স্কুলের ছেলেদের 'মধুচক্র'-এর বৈঠক হয়। অনেক ছেলে ও মেয়ে আবৃত্তি করে ও গান গায়। একটী ছেলের অভিনয় দেখিয়া মনে হইতেছিল ব্রজ-বালকদের অন্তর্গত 'মধুমঙ্গলে'র কথা, ব্রজবালকদের বিদূষক। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, দেবতার গ্রাস আবৃত্তি হইয়াছিল। সব শেষ হওয়ার পূর্ব্বে আমি আমার বিদায়-বাণী বলি। আমি এখানে আসিয়া তৃপ্ত। তোমরা আমার সেবা করিয়াছ, আমার ছোট ছোট প্রাণ-প্রয়োজন তোমরা মিটাইয়াছ, তাহা ঠাকুরে অর্পিত হউক, ঠাকুর ইহার মূল্য দিবেন। মানুষের সেবা আমি নিতে সাহসী নই, সব কিছু তাঁহাকে পৌঁছিয়া দিয়া আমি খালাস। তোমরা ছাত্রাবাসের ৮০।৯০ জন বালক এক দেহ, একপ্রাণ হইয়া থাকিও, যেমন ব্রজবালকগণ ছিলেন। ব্রজধাম গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন আমি দশগ্রামের ছাত্রাবাসে মূর্ত্ত দেখিতে চাহিব। আমি বৃদ্ধ, সন্ন্যাসী; তোমাদের সকল প্রাণ দিয়া আশীর্ব্বাদ করি। ইহার পর ঈশ্বর তাহাদের সহকর্ম্মীদের মধ্যে ও ছাত্রশিক্ষকদের মধ্যে ও শিক্ষক সেক্রেটারীর মধ্যে যে প্রাণ-সম্বন্ধ আছে, তাহা বর্ণনা করিয়া আমার আশীর্ব্বাদ চায়। আমি বলিয়াছি—এতদিনকার প্রজ্ঞা-দর্শনের উপর শিক্ষা-সমাজ ব্যবস্থার স্থানে আসিতে চাহিতেছে প্রাণ-দর্শন। দশগ্রাম সে কাজ আরম্ভ করিয়াছে। জয় হউক। ৪-২০মিঃ গরুর গাড়ীতে উঠি; বালকগণ বিদায় বন্দনা গায়। ৯-৩০মিঃ নারায়ণগড় পৌঁছি। গাড়ী ৪৫ মিঃ লেট করিয়া ১০-৪৫মিঃ আসে। দ্বিতীয় ক্লাসে উঠি। বলিয়াই আসিয়াছি। ৪-১৫মিঃ হাওড়া পৌঁছি। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া ট্রামে আসি।

১লা মার্চ

ভোর ৪-১৫ মিঃ হাওড়ায় পুরী প্যাসেঞ্জারে নামি। ঘাস না থাকায় ১ ঘণ্টা অপেক্ষা করি। পরে জানিলাম যে ট্রাম চলিতেছে। তখন ট্রামে এ্যাসপ্ল্যানেড পর্য্যন্ত, পরে সেখানে হইতে ট্রামে আশ্রমে ফিরি। সঙ্গে দশগ্রামের মণীন্দ্র ঘাস (মণি) ছিল। ভোরের প্রার্থনায় যোগ দিতে পারি নাই। তাহার সঙ্গে উদ্বোধন ভারত মায়ের ৬ খানা ও কাল্পনের ৩ খানা দিয়া দিবার কথা। সে জন্য দারোয়ানকে বেণুর নিকট পাঠাই, এখানে ছিল না। তাহার আসিতে দেরী হইতেছে। মণিও আর দেরী করিতে পারে না, তখন আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তায়ই দারোয়ানের সঙ্গে দেখা। মণিকে বাসে তুলিয়া দিয়া আফিসে যাই ও কয়েকদিনের সংবাদ আদ্যপূর্বিক সব শুনি। কিছু পরেই ফিরি। বেণু কলিকাতা যায়। প্রতিভা দুপুরের পর আসে। বেণুও তখন আসে। ৪টার সময় আমরা আফিসে যাই। সেবানন্দ মঠ হইতে এখানে ঘুরিয়া আফিসে যায়। মঠের ৪৲ টাকা দেওয়া হয়। কাল ৩-৪৫ মিঃ গাড়ীতে কালনা যাওয়া স্থির হয়। সেবানন্দ সঙ্গে যাইবে...। মনু কয়েকদিন পূর্ব্বেই আমার জুতার জন্য তাহার মায়ের কাছে ১০৲ টাকা দিয়াছে। আমার 'কেন' উপনিষদের জন্যও বোধহয় নীহার কাগজটা দিবে। ঈশ উপনিষৎ ছাপাইবার কাগজও (১০০৲ টাকার কাছাকাছি) সে দিয়াছিল।... ঊষাদিদী বিব্রত থাকায় আমিই ঠাকুর পূজা করি।

সকালে ৯টার পর শিশির আসে, কিছু পরে তরু আসে। ১৪০ ঘণ্টা আন্দাজ সে আলাপ আলোচনা করে। সে একজন গ্রাহকের টাকা ও নাম দিয়া যায়। যোগলীলার তাৎপর্য্য কি জিজ্ঞাসা করে। এই সময়ে রাহতা যাইবার কথা বলিবার জন্য সে ইতিপূর্ব্বে ২ দিন আসিয়াছিল; যাওয়া হইল না। সতীনাথ ১ জন গ্রাহকের টাকা ও ব্রহ্মসূত্র বাবদ ১৮৵ মণিঅর্ডার করে। ১২টার পর বেণু ও প্রতিভা আসে। বেণু কলিকাতা যাহির হয় নাই। সেবানন্দ আশ্রমে প্রসাদ পায়। আমরা ২টার পরই বাসে কালনা রওয়ানা হই। বাসে মাধবানন্দের সঙ্গে দেখা। সে উঠিয়া আমাকে বসিবার

জায়গা দেয়। কিছু পরে সে-ও বসিতে পারে।... ৬-৪০-এ কালনা পৌঁছি। ঘোড়ার গাড়ীতে আমরা আসি। কালীপদানন্দও গাড়ীতে আসে। আসার পর মুড়ি-গুড় খাই। মাধবানন্দের উপর সকল মহারাজদের দেখিবার ভার। নিত্যগৌরবানন্দের কথাই বারবার মনে হইতেছিল। সে খুব আদর যত্ন করিত। একবার এখানে ছিলাম; দুপুরের গরমের সময় প্রতিভাকে পাখা লইয়া বাতাস দিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিল। সব দিকেই তাহার দৃষ্টি ছিল। তাঁহার চলিয়া যাইবার পর এই প্রথম কালনায় আসা। বেদনা বোধ হইতেছিল। তাঁহার লোকজনেরা 'দৃষ্টি' দিতেছে। 'দৃষ্টি' রাখাই তো একমাত্র কাজ।.....।

৩রা মার্চ

আজ দোলযাত্রা। এমনই এক দিনে হুগলী ছিলাম, ঠাকুর তখনও প্রকট। আমরা সকলে ঠাকুরের শ্রীচরণে আবির দিবার জন্য সমবেত। হঠাৎ মনে হইল এ ভাবে হোলি খেলার তো কোনও সার্থকতা নাই। আবির খেলা মধুর ভাবের লীলা। গুরু উচ্চাসনে বসিয়া থাকিবেন, আর শিষ্যগণ আসিয়া প্রণাম করিয়া পায়ে আবির দিয়া যাইবেন, ইহা কি রকম হোলি খেলা? সমানে সমানে চলা উচিত এই লীলা। শুনিয়াছিও তো একদিন ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে আবির লইয়া, পিচকারী লইয়া সমানে সমানে খেলিতেন। এই লীলা মানুষের সঙ্গে মানুষের সকল অঙ্গ নিংড়াইয়া সকল রক্তকে আবির জলে পরিণত করিয়া পরস্পরকে রাঙাইয়া দিয়া খেলা করিবার লীলা। নাঃ, আমি খেলিব না। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে পাশের ঘরে ছুটিয়া গেলাম। ঠাকুর বলিয়াছেন, "দেখতো, ঐ লোকটা পালাল কোথায়"? ভক্তগণ আসিয়া আমাকে যাইতে বলিলেন। আমি গেলাম, অভিমানভরে সেখানেই রহিলাম। গুরু-শিষ্যের এই খেলা আমার সঙ্গে তাঁহার হয় নাই। যদি হয় হইবে, নয় এ যাত্রা সে বেদনা রহিয়াই গেল। আমার 'পাওনা' রহিয়া গেল, মিটিল না। আমি কাহার সঙ্গে আবির খেলিব? বিশ্বের সঙ্গে যদি এই আবির লইয়া খেলার সাধ আমার মিটে, সেই আশায়ই তো বাঁচিয়া আছি নিত্যগোপাল, তুমি জান। না চাহিলে পাওয়াইব না—এই অভিমানে তোমাকে খাওয়াই নাই। খাওয়াইতে পারিতাম—কত জনেই তো খাওয়াইয়াছে। তুমি চাহ নাই, আমিও খাওয়াই নাই। আমিও ঠকিয়াছি, তুমিও ঠকিয়াছ, চাহিয়া খাইবার 'রস' তুমি পাও নাই। চাওয়ার পর খাওয়াইবার রস হইতে আমিও বঞ্চিত। এই দুই বঞ্চিত আজ বিশ্বের মধ্যে তাহাদের সাধ মিটাইবে না কি?

'কেন' উপনিষদের প্রথম প্রশ্নটা অনেকক্ষণ দেখি। ৩টার সময় হল ঘরে প্রসাদ পাই—...। সন্ধ্যার কিছু পরে 'যুগল মিলন' পদকীর্তন হয়। শুইয়া শুইয়াই শুনিলাম। বেশ লাগিল। যোগমায়ার খেলা। নর নারী হইতে না পারিলে, নারী নর হইতে না পারিলে, 'না সো রমণ না হাম রমণী' হওয়ার যোগ্যতা লাভ না করিলে ব্রজলীলা আস্বাদিত হয় না। ১টার সময় হয়। তাহার পর সামান্য একটু প্রসাদ পাই ও নিদ্রা যাই।

৪ঠা মার্চ

সকালে মুড়ি-গুড় প্রসাদ গ্রহণ করি। পোস্টমাস্টার শ্যাম প্রভৃতির সঙ্গে পুরুষোত্তম-দর্শন সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলোচনা হয়। সে গ্রাহক হইবে বলিল, মাঘ-কার্তিকের কাগজ দেওয়া হইল। সকালে মণি আসিয়া বসে। প্রকাশ আসিয়া প্রণাম করে, সেও গ্রাহক হইবে। অবনীকে গ্রাহক হইতে বলায় সে গ্রাহক হইল, টাকাও দিয়া দিয়াছে। পতিতপাবনের সঙ্গে কাল কথা হইয়াছে, সেও গ্রাহকের টাকা দিয়া দিয়াছে। ৯টার পর হরগোবিন্দ বেজ পূর্বদিনের কথামত আসেন। তাঁহার সঙ্গে প্রায় ১ ঘণ্টা কথাবার্তা হয়। ইহার পরে রঙখেলা সুরু হয়। সকলেই আসিয়া প্রণাম করে ও পায়ে কপালে আবির দেয়। আমি সকলকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরি। তাহারা ঠাকুরের আশ্রিত, তাহারা সকলেই আমার বুক জুড়াইবার ধন। এই সম্প্রদায়ের যে যেখানে যে অবস্থায় আছে, তাহাদিগকে ঠাকুর

আত্মসাৎ করুন, তাহাদের অন্তরে বাহিরে ঠাকুর ও তাঁহার দর্শন জাগিয়া উঠুক এবং তাহাদের মারফত ঠাকুরের জীবন ও দর্শন ছড়াইয়া পড়ুক—ইহাই আমার কামনা। নিম্নলাদিদি ঠাকুরের পায়ে দেওয়া আবির আমাকে মাখাইয়া দেন। তাহার পর স্নান করি ও প্রসাদ পাইয়া ১.৩০টার পর ২টা রিক্সায় স্টেশনে আসি। আমার রিক্সায় হরিময়ানন্দ আসেন, আরটীতে রেণু-প্রতিভা। ভাড়া ১৪০ টাকা করিয়া তিন টাকা। ২-২ মিনিটে গাড়ী ছাড়ে। ৫-৩০ টায় গাড়ী পৌঁছে। আমি-রেণু বিক্সায় আশ্রমে আসি। প্রতিভা বংশবাটী নামে, যমুনার ওখানে যায়। সেবানন্দকে মোড় হইতে বাসের পয়সা দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।···রেণু কিছু না খাইয়াই চলিয়া যায়। ৯টার আগেই শুইয়া পড়ি। কালনা হইতে ফিরিয়া দেখি নীহার ৩০ পাউণ্ডের ১ রিম ১৫ দিস্তা এন্টিক ।৵০ আনা এক পাই প্রতি পাউণ্ড পাঠাইয়া দিয়াছে। কালনার কামিনী ঘোষের কন্যা ও তাঁহার স্বামী পুত্রদের সঙ্গে দেখা হয়।

৪ই মার্চ

দুপুর বেলা 'কেন' উপনিষদের বাকী অংশের প্রুফ দেখি, প্রথম অংশটার প্রুফ কালনা থাকিতেই অনেকটা দেখা হইয়া ছিল। সকালে এখানে শেষ করি। আফিসে একবার যাই। ১১ টার পর ফিরি। মাদার ও গীতার পোস্টকার্ড পাই।···৪ টার পর কলিকাতা ঘুরিয়া রেণু আশ্রমে আসে। জওহরলাল নেহরু আজ সকাল ১১-২৫ মিঃ কলিকাতা পৌঁছেন। ৮।০ টার সময় চিদানন্দ আফিসে আসে। সে বাঁকুড়ার স্কুলের ঠিকানাগুলি লেখে। ব্রহ্মচারীগণ যতগুলি মঠ করিয়াছেন, সব গুলিতে যদি 'যাতায়াত' রাখা যায়, ধীরে ধীরে ঐ কেন্দ্রগুলিকে ঠাকুরের ভাবে অনুপ্রাণিত করা যাইতে পারে বলিয়া মনে হইতেছিল, তাহারা শুধু ভোগরাগ ও কীর্তন আরতি লইয়াই থাকিতে চায় না। ঠাকুরের আলোচনা শুনিবার জন্য তাহাদের বেশ আগ্রহ দেখা যায়। কালনায় সব সময়েই তো কেহ না কেহ আলোচনা শুনিবার জন্য কাছে বসিয়া থাকিত। ইন্দুরের গর্তে সাপের থাকার মত প্রত্যেক মঠে থাকিতে ও যাতায়াত করিতে পারিলে বোধহয় কাজ হইত। কালনায় রেণু বেশ আদৃত হইয়াছে। ইহাদের নিয়া মঠগুলিতে ঘুরিলে অনেক কাজ হয়। দেখা যাক্, কতখানি পারা যায়। ৯ টার পর আফিস হইতে ফিরি।

৬ই মার্চ

সকালে সাময়িকী 'প্রশ্নের জবাব' লিখি কতকটা। রেণু আজ আর বাহির হয় না। শরীর ভাল নয়। দুপুরের পর পোস্টাফিস ও ব্যাঙ্ক হইয়া এখানে আসে। 'চরিত্রহীন' কপি করিতে আরম্ভ করে ও কতগুলি স্কুলের ঠিকানা লেখে। প্রতিভা আজ ভোরের গাড়ীতে বাঁশবেড়িয়া হইতে কলিকাতা আসে। বাদার পাওয়া যাওয়া করিয়া দুপুরের অনেক পরে এখানে আসে। বাঁশবেড়িয়া হইতে আনীত লাউ শাক ও কিছুটা লাউ এখানে নিয়া আসে। সন্ধ্যার কিছুটা আগেই আফিসে যাই। বাহির হইতেই দিগেন ঘোষ উকিলের সঙ্গে দেখা।···আফিসে কিছুক্ষণের জন্য নরেশ পাল আসিয়াছিল। তাহাকে গ্রাহক করিয়া দিতে বলা হইল। ইহার পরে চিদানন্দ আসে। সে কিছু স্কুলের চিঠির ঠিকানা লেখে। তাহার কাছে শুনিলাম অতীন চক্রবর্তী ঘোড়ার আঘাতে মারা গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের সঙ্গে আমাদের কী গভীর সম্বন্ধই না ছিল। সবই মনে পড়িতেছে। সারাজীবন তিনি কিছু গড়িবার জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। কি অক্লান্ত পরিশ্রম ও ধৈর্য! কি আকুলিবিকুলি! তাঁহার গ্রামকে তিনি গড়িতে চাহিয়াছেন, গড়িয়াছেনও। আজ খয়েরাবাদ যাহা তাহা অতীনবাবুরই গড়া। খয়েরাবাদকে তিনি টানিয়া পিছন হইতে সামনে আনিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিশ্বরূপসেবা তাঁহার কীর্তি। বিশ্বরূপের বিশ্ব-ইচ্ছা পূর্ণ হউক—ইহা আমাদের আজিকার দিনে প্রার্থনা। ৯ টায় পর আসি। কিছু চিঠির খাম নিয়া আসি স্কুলের ঠিকানা লিখিবার জন্য। কালনার ঘটনা ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রতিভার সঙ্গে আলোচনা হয়।···

৭ই মার্চ

ক্রমশঃ

শান্তিনিকেতন

॥ শ্রীবিভা সরকার ॥

শান্তিনিকেতনের কথা অমৃত সমান
ভাগ্যবানে বলে আর শুনে পুণ্যবান।

নামেই তার পরিচয়। কঙ্করময় সে রুক্ষভূমির কি বৈরাগ্যময় রূপ। সর্ব অঙ্গে তার ছড়ানো গৈরিক বসন। ঘর-ভোলানো সে রূপ অস্থির করে তোলে পথ-পিয়াসী মন বেরিয়ে আসে কিসের সন্ধানে?

কে যেন অলক্ষে বলে, ওরে হিসেবী, সব যে তোর বেহিসেব হয়ে গেল। জীবন-পথে কি পেলি, কি পেলিনে কাজ কি তার হিসেব নিকেশে! বিশ্ববাউল তাক দিয়েছে উদাস করা সুরে। বর্ষার পর শরৎ, শীতের পর বসন্ত। 'এই ভরে তাই মানব-জীবন ফুল ফোটা, ফল ধরা' বেজে ওঠে বাউলের একতারায়। পেছনের সব থাক পেছনে পড়ে, ভার-মুক্ত মন নিয়ে এগিয়ে চল। রাঢ়ের এ মাটি কি মানুষের চোখের জলে ভিজে? এ বন্ধুর প্রান্তর কি জন্ম-উদাসী? এখানের আকাশে বাতাসে কি ঘর-ভোলানো সর্বহারার ডাক?

একুলে ওকুলে গোকুলে দুকুলে আপনা বলিব কায়
শীতল বলিয়া শরণ লইনু ওদুটি কমল পায়।

কোথায় চলেছে এ আত্মহারা বৈরাগিণী? একতারার ঝঙ্কারে ঝংকৃত হচ্ছে ও কিসের সব-ভোলানো গুঞ্জন? এরা ত ফাঁকি দেয় না। প্রাণ ভরেই ভালবাসে, প্রাণ খুলেই গ্রহণ করে। কিন্তু কোন আসক্তির শক্তিই যে এদের পথ-চলা রোধ করতে পারে না—কিসের টানে কার সন্ধানে এরা এমন চিরমুক্ত, চিরউদাসী? গেরুয়া মাটি কি যাদু জানে? তাই যা হবে, নয় ত কেন যুগে যুগে এ মাটিকে ঘিরে এমন বৈষ্ণবের সমারোহ। কোন্ সে আদিম কিরাত জম্পতীর মত বনলক্ষ্মীর বন্য ছেলেমেয়ে সাঁওতাল সাঁওতালী। যৌবনের জয়কেতন রক্ত পলাশ তাদের কালো কেশে, হাতে কারো বাঁশের বাঁশী। জীবন্ত সজীব ছবির মত পথিকজনের চোখে তারা মায়ার অঞ্জন পরিয়ে খোয়াইয়ের ডাক পৌঁছে দিয়ে কঠিন মাটীতে পা ফেলে ফেলে ঘুরে মিলিয়ে যায়। রুক্ষাক্ষুব্ধ পৃথিবীতে আজও এরা সুন্দর শিশুর মত সরলতায়। দুঃখ দৈন্য অভাব অনটনকে এরা উপহাস করছে প্রাণ-প্রাচুর্যে। তাই এরা মনমাতানো মাদল বাজায়। চাঁদনী রাতে বাঁশের বাঁশি বন্ধু সুরে চকল করে তোলে নিঃসঙ্গ বন্ধুর প্রান্তর! এ গেরুয়া ধূলি যেন চির উদাসিনী। মনের বাউল একতারা হাতে ঘর ছেড়ে পালায়। তাই না বাউল কবি শান্তির নীড় বাঁধলেন বন্ধুর এই গেরুয়া দেশে। তাইত এখানে পথে পথে এত ঘর-বিবাগী উদাসী ঘুরে বেড়ায় তবঘুরে হয়ে—

নিঠুর সরজী তুই কি মানস মুকুল
জানবি আগুনে
ও তুই ফুল ফুটাবি বাস ছুটাবি
সবুর বিহনে?

সবুর সয় না!

এ সংসার যে তাকায় না কারো পানে। এগিয়ে যে গেল বেঁচে গেল, পিছনে সে রইল পড়ে বিড়ম্বনা তারই। আপন-ভোলা এই দেশের রূপ, তাইত এর বুকে আশ্রম স্থাপনা করলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ছাতিম তলায় পেলেন পরমতম দীক্ষা। এই কঙ্করময় মরুভূমে কত সাধনায় কত বেদনা অধ্যবসায়ে গড়ে উঠল শ্যামল বনভূমি। এ যে তপস্বীর তপোবন। মহর্ষির আদি বাড়ীটি আজ অতিথি নিকেতন। পাশেই একটি পুকুর—আজকাল প্রায়ই থাকে জলহীন হয়ে। সামনের প্রবেশ পথের বামধারে উপাসনা মন্দির।

আশ্রমের পেছনে আম্রকুঞ্জ। ঝতুতে ঝতুতে কত

উৎসব, কত বিদ্যুৎ-সভা। কত বরেণ্য মানবের পায়ের ধূলায় এ মাটি ধন্য!

আমকুঞ্জ ছাড়িয়ে শালবীথি—পায়ে পায়ে এগিয়ে চল, সিংহসদন বা হর্টাঘর পড়বে বাঁদিকে। ছাত্রছাত্রীদের যত সভা, যত উৎসব, যত নৃত্যগীত এই গৃহেই। এইটাই এ আশ্রমের দভা গৃহ। ডান দিকে বিদ্যাভবন—শ্রীভবন—ভোজনাগার। বাঁ ধারে ছেলেদের খেলার মাঠ—আরও একটু যাও—কলাভবন; সঙ্গীত ভবন তারও পরে।

গুরুপল্লী ছাড়িয়ে এগিয়ে যাও লাল বাঁধ জলে টলমল, ছেলেরা সাঁতার কাটে, স্নান করে। সোঁয়াইয়ে হারিয়ে একাকার হয়ে গেছে তারও ওপাশ—অতিথি নিকেতনের সীমানা-প্রান্তের পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গিয়েছে সোজা উত্তরায়ণে। মহর্ষি পিতার রাজর্ষি পুত্রের বাসভবন।

এ যে রাজপুরী!

সুন্দর লাল পাথরের বাড়ীটির সর্ব অঙ্গে আছে বিশিষ্টতা, আছে নৈপুণ্য। এর ভিতরে দেব বিগ্রহ নেই, আছে শিল্প-দেবতার বিচিত্র অর্চনা। কত না তার রূপ, কত না তার ভঙ্গী। শিল্পীর কল্পনা এখানে তার মুক্তি পেয়েছে। এর মধ্যে আছে কবিগুরুর স্বহস্ত অঙ্কিত কত ছবি—আরও আছে অবন ঠাকুরের টুকিটাকি কটুম কাটাম। কত আর বলব! উত্তরায়ণের বাগান ছোট হতে পারে কিন্তু কত যে বিচিত্র সৌন্দর্য সেখানে। কত দেশের কত বিদেশিনী ফুল এখানে পেয়েছে সাদর অভ্যর্থনা, সযত্ন সমাদর। সহকার শাখাও এখানে লতিয়ে উঠেছে। পল্লবিনী তার রূপ। কবির প্রিয় শালস-ময়ূরগুলি স্বচ্ছন্দে বেড়াচ্ছে ঘুরে।

জগদ্বুরে কবি থাকতে পারতেন না একজায়গায় বেশী দিন। তাই তৈরী হয়েছে কোনার্ক। গড়ে উঠেছে কবির পরম প্রিয় মাটির ঘর শ্যামলী, গড়ে উঠেছে পুনশ্চ—কবির শেষ বাসস্থান উদয়ন।

কোনার্কের গা বেয়ে উঠেছে নীলমণি লতা, ফুল-ফোটার আনন্দলগ্নে হয়ত ফোটে গুচ্ছে গুচ্ছে নীলমণি মঞ্জরী। সামনের বিরাট শিমুল গাছটিকে সহস্র পাকে জড়িয়ে শীর্ষে উঠে গেছে মালতীলতা—এই বুঝি

ঐ শিমুল তরুর কোলে
মালতীলতা দোলে!

রাত্রে সেদিন দেখি সহস্র জোনাকি কোন্ খেয়ালে আলোর মিটিমিটি দেয়ালী জ্বালিয়ে দিয়েছে এই গাছটিকে ছেয়ে! আশ্রম ছাড়িয়ে হিমকুঠি বীথি পার হয়ে আবাগড়ের রাজবাড়ী। লাল কাঁকরের রাস্তা চলে গেছে তারপর খোয়াইয়ের বুকে গোয়ালপাড়া গাঁয়ের দিকে। কীপা যে গিরিকন্যা শীতে, বর্ষায় সেই হয় অনন্তা যৌবনমত্তা কল-নাদিনী জলোচ্ছ্বাসে। শীতের এ শীর্ণ কোপাই বর্ষায় হয় কোপবতী।

এ যে মানবের মহামিলনের তীর্থ। এখানে যে সারা বিশ্বকে আহ্বান করেছিলেন কবি। এরই বুকে বিরাজমান বিরাট চীনাভবন তার শিল্পবিদ্যা বিজ্ঞান নিয়ে। এশিয়ার দুইটি ঐতিহ্যমণ্ডিত গৌরবান্বিত জাতি পরস্পর পরস্পরকে সভ্যতার বন্ধনে বেঁধেছে।

মহাকবি তাঁর আশ্রম রচনা করে রেখে গেছেন এইখানেই। তাঁর আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে দায় আশ্রমবাসীদের, দেশের, দশের। এ পরীক্ষায় তাঁরা উত্তীর্ণ হবেন কিনা তার জবাব নেবে আগামী কাল। আজ আমি শুধু একটি দিনের একটি অবিস্মরণীয় ছবি স্মরণ করে আজকের মত আমার কথিকা শেষ করব।

বসন্তের সেদিন শেষ হয়ে এসেছে। অশোকে কিংশুকে শিমুলের ডালে ডালে আবির খেলা সমাপ্তপ্রায়। তপ্ত বাতাস রাঙা ধূলির তুফান তুলে ছুটে চলেছে কোন্ দিকে? সে শান্তিনিকেতন আজ হারিয়ে গেছে। সে দিনের শান্তিনিকেতন সত্যই শান্তির নিকেতন ছিল। কয়েকটি কুটির নিয়ে একান্ত নিরালায় মাঝখানে একটি পরিচ্ছন্ন গণ্ড গ্রামেরই ছবি আঁকতো সে দিনের শান্তিনিকেতন। স্বচ্ছ আকাশের উদার নীলিমা মনকে মুক্তির পথে টেনে নিয়ে যেত। মহা অসীমের স্পর্শ এনে দিত গোপনে প্রাণের নিভৃত নীড়ে!

কলির শেষ ব্রাহ্মণ সেই মহা তাপসকে দেখার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিলো এমনি একদিনে।

আকাশে বাতাসে আমের বোলের মন-ভোলানো গন্ধ মনকে মদির করে তুলেছিলো। তারও আগে গান গেয়ে ঘুম ভাঙিয়ে গিয়েছিলো ভোরের বৈতালিক পরিপূর্ণ শান্তির রূপটি বুকে নিয়ে সে দিনের শান্তি-নিকেতন সত্যই আশ্রম ছিলো আর সেই আশ্রম আলো করে বসেছিলেন যেন জীবন্ত রূপ নিয়ে মহর্ষি বাল্মীকি।

উত্তরায়ণের সামনে পূর্ব দিগন্তের পানে চেয়ে স্তব্ধ ধ্যানমৌন হয়ে বসেছিলেন শ্বেতশ্মশ্রু এক মহামানব। চলা আমার স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো সে অপার্থিব রূপ দর্শনে। পাতা খসানোর শব্দটিও যেন অসহ্য হয়ে উঠেছিলো—মুখর হয়ে চাপল্য দেখাতে পারিনি সে বন্দনীয় মুহূর্তটিতে।

কবি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য। আকাশের গায়ে প্রভাত সূর্য যেন স্তব্ধ হয়ে তাঁকেই দেখছিলো। কবি কি মনে মনে বলেছিলেন "হে পূষন্ অপাবৃণু' তোমার সত্য স্বরূপ আমায় দেখতে দাও—আবরণ উন্মোচন কর অথবা দিনেশ্বরই বুঝি ছুটে এসেছিলেন সেই মর্ত্যের জ্যোতির্ধরকে দেখতে। কে কাকে দেখতে এসেছিলেন জানি না—সেই মুক্ত প্রাণের আর মুক্ত আলোর কোলাকুলি দেখে আমি ধন্য হয়ে গিয়েছিলুম।

সেই তন্ময়ত ধ্যানমৌনকে দূর থেকেই প্রাণের প্রণাম জানিয়ে চুপে চুপে পালিয়ে এসেছিলাম। সফল হয়েছিলো সেদিন আমার জীবনে পূর্ব ওঠা।

'সংসারে পথ চলা খুব কঠিন—'সংসার অতি ভীষণ স্থান'—এজন্য সংসারের দোষ নয়—মানুষের অহম্ ও মম—এই দুটোতে আটকা পড়েই এ সংসার ভীষণ স্থান হ'ল। প্রত্যেকে সামগ্রিক দৃষ্টি হারিয়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে বলেই ভীষণ। যদি নিজের মম বা অহম্‌কে আর কারো কাছে ন্যস্ত করা যায়, তাহলে ভীষণ নয়। জ্ঞানী বা ভক্ত দুই-ই নিজের বাইরে যাবার চেষ্টা করে—জ্ঞানী আমার নয় আমার নয় বলে ধ্যান করে, ভক্ত বলে তোমার, তোমার।··· ঘরের বৌরা নিজেদের সন্তানদের আমার সন্তান বলে দেখে—যদি মনে করত এরা আমাদের শ্বশুরের পৌত্র তাহলে অন্য রকম হতো। এই ভাবে দেখলেই দৃষ্টি বদলে যায়। ব্যাপকতার মধ্যে এলেই ঘটনার সীমাংসা হয়—যত ছোটর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, ততই সমস্যা ···একটা বড় আমির মধ্যে যেতে হবে···ফ্যাসাদ হয় ক্ষুদ্র ঘর সংসারে।···'

শ্রীশ্রী পুরুষোত্তমানন্দের প্রার্থনাত্মিক ভাষণ—১৯.১১.১৯৫৬

বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গ

॥ শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত ॥

পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের নাম অনেকেই জানেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যেমন শ্রদ্ধা করিতেন তেমনি তাঁহার সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ উঠিলে তাহা অতিশয় আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেন। একবার অধ্যাপক বিপিন বিহারী গুপ্তকে বলেন,—'তুমি বোধহয় জাননা, বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু তোৎলা ছিলেন, কেহ তাহা টের পাইত না। তোৎলার প্রধান ঔষধ, আস্তে কথা বলা। বিদ্যাসাগর এরূপ অভ্যাস করিয়াছিলেন যে, কখনও জোরে কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইত না। ইহাতে কথা কহিবার সময় কখনও প্রকাশ পাইত না যে, তিনি তোৎলা। সংস্কৃত কলেজের সহিত তিনি ত অনেক কাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন; কিন্তু কখনও ক্লাস পড়ান নাই। একবার শুনিয়াছিলাম, তিনি 'উত্তররাম চরিত' ও 'শকুন্তলা' ক্লাসে পড়াইতেন, কিন্তু বক্তৃতা তাহা ঘটে নাই। আমার বোধ হয়, পূর্ব্বোক্ত কারণবশতঃই তিনি ক্লাসে পড়ান ব্যাপারে অগ্রসর হইতেন না। কিন্তু ফোর্টউইলিয়ম কলেজে যখন তিনি চাকরী করিতেন তখন বোধ হয় সময়ে সময়ে তাঁহাকে এক একজন সিভিলিয়ান ছাত্র লইয়া বাঙ্গলা পড়াইতে হইত, কারণ, তিনি নিজেই গল্প করিয়াছেন, তিনি বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীল অংশ পড়াইতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ছাত্র তাঁহাকে সে বিষয়ে অভয়দান করেন। 'বেতালপঞ্চবিংশতি' বাহির হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গলা 'পুরুষপরীক্ষা' ও 'প্রবোধচন্দ্রিক' নামক দুইখানি পুস্তক প্রচলিত ছিল। সিভিলিয়ানরা তাহাই পাঠ করিত। এখনকার রীতি অনুসারে ঐ দুইখানি গ্রন্থ পছন্দ হইবার কথা নাই। সেইজন্যই বিদ্যাসাগর 'বেতালপঞ্চবিংশতি' রচনা করেন। 'পুরুষপরীক্ষা' গ্রন্থের মধ্যে একটি সন্দর্ভ লইয়া পূর্ব্বে খুব হাস্য পরিহাস চলিত। এই সন্দর্ভের মধ্যে লিখা আছে যে, বুদ্ধি চারি প্রকার—বেগবেগা, বেগচিরা, চিরচিরা, চিরবেগা। বেগবেগার অর্থ যে শীঘ্র বুঝিতে পারে, অথচ শীঘ্র ভুলিয়া যায়; চিরচিরা—বুঝিতে দেরী হয়, অথচ শীঘ্র ভুলিয়া যায়; বেগচিরা—শীঘ্র বুঝে অনেকদিন মনে রাখে; চিরবেগা বুঝিতে দেরী হয় কিন্তু অনেককাল মনে থাকে। এই 'চিরচিরা' লইয়া লোক বিস্তর আমোদ করিত। যাহা হউক সে গ্রন্থ দুইখানি একেবারে মূর্খ হওয়া ভাল নহে, কারণ, বিদ্যাসাগরের প্রবর্ত্তিত রীতির পূর্ব্বে কি প্রকার রীতি প্রচলিত ছিল, বিশেষতঃ ভোঁপো পণ্ডিতদিগের মধ্যে, তাহার অতি সুন্দর নমুনা ঐ দুই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থ পড়াইবার সময় বিদ্যাসাগর বোধ হয় হাড়ে চটিয়া যাইতেন।...বোধ হয় তাই তিনি অত উৎসাহের সহিত 'বেতালপঞ্চবিংশতি' রচনা করেন। 'বেতালপচিশি' নামে যে হিন্দি বহি আছে, বিদ্যাসাগরের গ্রন্থখানি উহার নামমাত্র অনুবাদ। হিন্দিতে তিনি কেবল কঙ্কালখানি পাইয়াছিলেন; রক্ত, মাংস, চর্ম্ম ইত্যাদি সকলই তিনি আপনা হইতে যোজনা করিয়া দিয়াছেন। তাই বাঙ্গলায় অমন পরম সুন্দর একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে 'বেতালপঞ্চবিংশতি' প্রথম প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণকমল বলেন, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মদনমোহন ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট হইয়া মুর্শিদাবাদে যাইবেন। আমি তখন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ক্লাসে পড়ি। রামকমল সেনের বাড়ীর উপরের এক হল ঘরের ভিতর মদন মোহন তর্কালঙ্কারের ক্লাস, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের ক্লাস ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ক্লাস বসিত।

তর্কালঙ্কারের এক খুড়া ছিলেন, সেটি একটি character। বিদ্যাসাগর তাঁহাকে কলেজে সংস্কৃত পুঁথির scribe নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তাঁহার হাতের

লিখা মুক্তার মত ঝলমল করিত। লোকটি কিন্তু সংস্কৃত লিখাপড়া কিছুই জানিত না। তাহা হইলে কি হয়, সে অনর্গল যা তা সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিত। একজন Librarian এর নামে পার্ষদ বিদ্রূপ ছলে এক প্রকাণ্ড শ্লোক রচনা করিল, সে কবিতার শেষ পংক্তি দুইটি এইরূপ

তারাশঙ্কর শঙ্কর সদয়া
বিদ্যাসাগর সাগর কৃপয়া
বিদ্যামন্দির মধ্য বিরাজে
পুস্তকধ্যাক্ষ লাইব্রেরি কাজে

'পুস্তকাধ্যক্ষ' লিখিলে ছন্দ ঠিক থাকিবে না তাই কথাটা ঐরূপ করা হইয়াছিল।

আবার রসময় দত্ত চলিয়া যাইবার পর বিদ্যাসাগর যখন কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া আসিলেন, খুড়ো কং করিয়া শ্লোক রচনা করিয়া দিলেন,

যঃ ঈশ্বরো নিরগতঃ করন্তি
যঃ ঈশ্বরো লিপালয়া নয়ন্তি।

'লোকটির impudence আবার এত ছিল যে, পুঁথি নকল করিবার সময় আদর্শ পুঁথিতে কাটছাট করিত। আদর্শ পুঁথিতে আছে সকর, খুড়ো ভাবিলেন দন্ত্য স ভুল, তালব্য শ, এবং আদর্শ পুঁথিতে স কাটিয়া 'শ' করিয়া দিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সকলেই দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিয়াই জানেন, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সহিত মিলিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহার কথাবার্ত্তায় হাসি তামাসার একটি অদ্ভুত শক্তি ছিল। সে সকল কথা মনে করিয়া লিখিতে পারিলে বোধ হয় বেশ একখানি গ্রন্থ হইতে পারে, কিন্তু সেরূপ শক্তি এখন কাহারও আছে কিনা, বলিতে পারি না।

এক সময় বিদ্যাসাগর বীটন কলেজে সেক্রেটারী ছিলেন, তখন অনেক উচ্চপদস্থ 'সাহেব' কমিটির মেম্বর ছিলেন। একটি ফিরিঙ্গী স্ত্রীলোক প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। কি কারণে জানিনা, একজন স্কুলের পণ্ডিতের উপর তাঁহার কিছু আক্রোশ জন্মিয়াছিল, তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য কমিটিকে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর সেক্রেটারী, তদন্ত করিবার ভার তাঁহারেই দেওয়া হইল। তিনি বিশেষ অনুসন্ধানের পর বুঝিলেন, পণ্ডিতের কোনও দোষ নাই। পরে এই বিষয়ের বিচারের জন্য একদিন কমিটির বৈঠক হইল। সেই বৈঠকে বিদ্যাসাগর সকলকে পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিলেন যে পণ্ডিতটি নিরপরাধ; কিন্তু কমিটির মেম্বর অধিকাংশ য়ুরোপীয়; প্রধান শিক্ষয়িত্রী ফিরিঙ্গী; কমিটি ভাবিল, পণ্ডিতকে একেবারে নির্দ্দোষ করিয়া ছাড়িয়া দিলে শিক্ষয়িত্রীর অপমান করা হয়; তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, 'তবে না হয়, দু'একমাসের জন্য পণ্ডিতকে suspend করা যাক্; কেমন, বিদ্যাসাগর, তুমি কি বল?'

বিদ্যাসাগর গত্যন্তর না দেখিয়া কেবল এইমাত্র বলিলেন, "yes, do if you thiuk some sacrifice is necessary to appease her."—আচ্ছা তবে তাই কর, যদি তোমরা ভাব যে কিছু বলিদান না করিলে দেবী সন্তুষ্ট হইবেন না। ইংরাজেরা আর যাহাই হউক, প্রকৃত রসিকতা (wit) পাইলে তাহা গ্রহণ করিতে পারে। বিদ্যাসাগরের appease শুনিয়া সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পণ্ডিত বাঁচিয়া গেলেন।

এখানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাসি ও সরস রসিকতা সম্বন্ধে আর একটি গল্প বলিতেছি।

একবার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা গভর্ণমেণ্টের কাছে কোন এক বিষয়ে দরখাস্ত করিয়া বিলক্ষণ অপমানিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদের বিমর্ষভাব দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—ওরে, আজকে Polical world যে বড়ই gloom দেখে এলুম। এ gloom কথাটা তিনি এমন মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন যে তাঁহার শ্রোতৃবর্গ হাসিয়া উঠিল।

বিদ্যাসাগর একজন তাঁহার কোনও বিশেষ আত্মীয় বন্ধুর বাটিতে গিয়াছিলেন, বন্ধুটি কিছু অধিক বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর আসাতে তিনি বাহিরে আসিলেন বটে, কিন্তু অন্যমনস্কভাবে

তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ কথোপকথন দেখিয়া বিদ্যাসাগর অবশেষে বলিয়া উঠিলেন,—"যাও, আর উস্‌খুস্ কোরচ কেন? বাড়ীর ভেতরই যাও।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার এই বন্ধুটি অবসর পাইলেই শ্বশুর বাড়ী যাইতেন। বিদ্যাসাগর একদিন একত্রে দু'জনের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"হিমালয়ে হরঃ শেতে হরি শেতে মহার্ণবে।"

আমাদের ইচ্ছা আছে বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত বিবিধ হাসি পরিহাসের গল্প ক্রমশঃ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করি।

একটি উজ্জ্বল স্বপ্ন

॥ শ্রীকৃতী সোম ॥

একটি উজ্জ্বল স্বপ্ন বুকে বয়ে নিয়ে
আজো আমি অফুরান পথ হেঁটে চলি,
আমার আকাশে তারা ওঠে জ্বলজ্বলি;
উড়ন্ত পাখির মত পৃথিবী ছাড়িয়ে
মনে হয় চলে যাই অন্য কোনখানে
যেখানে ফলেছে কত সৃষ্টির ফসল
প্রজ্ঞাদীপে কোটি মন করে ঝলমল
যেখানে খুঁজলে পাই জীবনের মানে।

এই যে সৃষ্টির আশা, পথ-পরিক্রমা
মগজেতে পটুয়ার শুধু ছবি আঁকা
তীব্র পিপাসা এক,—একি সব ফাঁকা?
মনের গভীরে কত হীরে হয় জমা!
আজ তাই চোখভরা স্বপ্নের অঞ্জন,
দুর্বার নেশায় ছোটে মধুকর-মন।

শেষ নিবেদন

॥ শ্রীসুনীল কুমার ভট্টাচার্য্য ॥

আমার ব্যথার প্রদীপখানি আসবো তোমার দ্বারে
পারো যদি নিঠুর তুমি তুলে নিয়ো তারে।
যদি তারে অবহেলে
পথের ধারে রাখো ঠেলে,
আঘাত তোমার ফিরাবে সে মরণ-উপহারে।

নিশিশেষে করুণ, ম্লান শুকতারাটি সম
প্রণাম তোমায় জানিয়ে যাবে শেষ নিবেদন মম।
পাষাণ, তোমার কঠিন রূপে
জড়ায়ে সে রইবে চুপে,
প্রণয় তার লভিবে দান তোমার চুপিসাড়ে।

'বরিশাল হিতৈষী' হইতে

॥ শ্রীদুর্গা মোহন সেন ॥

জন্মোৎসবে প্রার্থনা

১৭ই মাঘ

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের ৬৮ বৎসর বয়ঃক্রম উপলক্ষে গত শনিবার অপরাহ্নে রাজা রাজেন্দ্রলাল রায় বাহাদুরের হাবেলীতে এক সভা হয়। তারিণীবাবু সভাপতি হন ললিত মুখোপাধ্যায়, দুর্গামোহন সেন ও শরৎকুমার ঘোষ কিছু কিছু বলেন। তৎপরে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্বিনীবাবুর দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করেন।

২৪শে মাঘ, ১৩২৯ বুধবার

গত বুধ ও বৃহস্পতিবার শ্রীযুত মন্মথমোহন দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীযুত শরৎকুমার ঘোষ গয়া কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর আলোচনা ও বক্তৃতা করেন।

কংগ্রেস কার্য্য

বরিশালে কংগ্রেস কার্য্য ধীর স্থির ভাবে বেশ চলিতেছে; শ্রীযুত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় মেহেন্দীগঞ্জ অঞ্চলে প্রচারকল্পে গমন করিয়াছেন। তিনি সেখানে সংগ্রহ ও নানাবিধ গঠন কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন।

শরৎকুমারের সফর

২রা ফাল্গুন, ১৩২৯

গত ২রা ফেব্রুয়ারী শনিবার বাগ্মীপ্রবর দেশপূজ্য শ্রীযুত শরৎকুমার ঘোষ মেহেন্দীগঞ্জ থানার অধীন হাদলুর স্টেশনে পতাকাশোভিত বিরাট জনসঙ্ঘের গগনবিদারী বন্দেমাতরম্, আল্লা হো আকবর, মহাত্মা কী জয়, দেশপূজ্য শরৎকুমার কী জয় ধ্বনির মধ্যে স্টীমার হইতে অবতরণ করেন। বিরাট জনসঙ্ঘ তাহাদের নেতাকে পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করিয়া শ্রীযুত অক্ষয়কুমার কর মহাশয়ের বাড়ী লইয়া যান। বেলা ৪ ঘটিকার সময় জমিদার সুরেন্দ্রমোহন রায়চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভা হয়। সাম্যমুক্ত গোপালচন্দ্র সেই বরিশাল জেল-কাহিনী বলার পর শ্রীযুত শরৎকুমার সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। সভায় ২৫০০ হাজার লোক উপস্থিত ছিল। রাত্রি ৯ ঘটিকায় সভা ভঙ্গ হয়।

৩রা রবিবার কালীগঞ্জ হাটে শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। ঐ সভায় ১২০০ লোক উপস্থিত ছিল। প্রথমে গোপালবাবু সংক্ষেপে জেলকাহিনী বর্ণনা করিলে বাগ্মীপ্রবর শরৎবাবু বক্তৃতা-মঞ্চে সমর্পণ করেন। সভাপতি মহাশয় তাহাকে পুষ্প-মাল্যে ভূষিত করিলে তিনি ওজস্বিনী ভাষায় সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। রাত্রি ৮টায় সভা ভঙ্গ হয়।

৪ঠা সোমবার প্রাতে উনালীয় ভলান্টিয়ারগণ পতাকা হস্তে বন্দেমাতরম্ প্রভৃতি ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়া শরৎবাবুকে অভ্যর্থনা করেন। বেলা ৪ ঘটিকায় সময় এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। গোপালবাবু প্রথম জেল কাহিনী বর্ণনা করেন, পরে সভাপতি কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যে ভূষিত হওয়ার পর তিনি বক্তৃতা করেন। জমিদার ওয়াহেদ বেজা চৌধুরী সাহেব শরৎবাবুকে ধন্যবাদ প্রদানান্তর সভা ভঙ্গ হয়।

৫ই মঙ্গলবার হিজলা কাছারী বাড়ী প্রায় ৪ শত ভলান্টিয়ার পতাকা হস্তে ঘোর নাদে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া শরৎবাবুকে অভ্যর্থনা করিতে আসেন। ৫ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমে শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন, তৎপর হক ভূঞা স্থানীয় অবস্থা বর্ণনা করেন। গোপালবাবুর বক্তৃতান্তে দেশপ্রাণ শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় সভাপতি কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইয়া রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা করেন। পরে সভা ভঙ্গ হয়।

৬ই বুধবার গোবিন্দপুর বাসুদেব বাড়ীতে এক বিরাট মহিলা সভার অধিবেশন হয়। দেশপ্রাণ শরৎবাবুর বক্তৃতায় প্রায় ২০০ শত মহিলা চরকায় সুতা কাটিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। বহু মহিলা আইন অমান্যের জন্য সোনার গহনা প্রদান করেন। এবং কয়েকজন ভলান্টিয়ার হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

৮ই শুক্রবার গোবিন্দপুর গ্রামে শ্রীযুত গুরুচরণ কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে একটী ক্ষুদ্র মহিলা সভার অনুষ্ঠান হয়। শ্রীযুত শরৎ কুমার ঘোষ মহাশয় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, বক্তৃতা যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ৯ই শনিবার ৩ ঘটিকার সময় পাতারহাট ষ্টেশনে জনমণ্ডলী ষ্টেশন পতাকা সুশোভিত করিয়া খোল করতালে গান গাহিয়া শরৎবাবুকে অভ্যর্থনা করেন। ৫ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথম গোপালবাবুর বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয় পুষ্পহারে সুশোভিত করিয়া দিলেন। শরৎবাবু এক প্রাণোন্মাদকর সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। প্রত্যেক স্থানেই শরৎবাবু আইন অমান্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ খানা হইতে ৫০০৲ টাকা দেওয়ার কথা কিন্তু শরৎবাবু ১০০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। জনসাধারণ শরৎবাবুকে আরও অর্থসাহায্য দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

কার্যনির্ব্বাহক সভার ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

গত ২৯শে মাঘ সোমবার বিপিন চন্দ্র দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে বাখরগঞ্জ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে বাদশ পর্য্যায় প্রস্তাব পাশ হয়। তন্মধ্যে দশম প্রস্তাবে উল্লিখিত বিষয় এই—আগামী এপ্রিল মাস মধ্যে আইন অমান্য জন্য মহকুমাগুলির প্রতি অবস্থা অনুসারে অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত নিম্ন লিখিত অর্থ সাহায্য নির্দ্দেশ করিতেছেন। সদর ২৫০০৲, বালকাঠি ১৫০০৲, পটুয়াখালি ২০০০৲, পিরোজপুর ২০০০৲, ভোলা ৪০০০৲। অতঃপর শ্রীযুত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় মেহেন্দীগঞ্জ থানা হইতে আইন অমান্যের জন্য সংগৃহীত ১০০০৲ এক সহস্র টাকা নগদ জিলা সমিতির হস্তে প্রদান করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে আগামী কনফারেন্সে সভাপতি মনোনয়ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। সাড়ে নয়টায় সভার কার্য্য শেষ হয়।

সভা ১৮ই ফাল্গুন

আইন-অমান্যের অর্থ কি? ১৩২৯

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী স্থানীয় টাউন হলে বাবু মন্মথনাথ দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। প্রথম দুর্গা মোহন সেন মহাশয়কে কেন আইন অমান্য করিতে হয় তাহা বলেন, তৎপর শরৎ বাবুর বক্তৃতা। সাংখ্য বলেন, "মুক্তিরান্তরায়ধ্বংসে ন পরঃ"—অন্তরায় ধ্বংস করা ব্যতীত মুক্তির আর কোন অর্থই নাই—ভারতের মুক্তির জন্য আজ স্বরাজ সাধনা—ভারতের স্বাধীনতা নাই কোথাও। আহারে বিহারে, বাক্যে, চিন্তায়, লেখনীতে কোথাও স্বাধীনতা নাই। সংসার যাত্রা যদি নিরুপদ্রবে চলিয়া যাইত তবে আইন অমান্যের কথা কেহ চিন্তা করিতাম না। এই অন্তরায়গুলি হইল আইন। কাজেই আইন অমান্যের কথা উঠিয়াছে। এই আইন দুই ভাবে অমান্য করা যায়। সিভিল ও ক্রিমিনাল। নিজের আইন নিজে ভঙ্গ করিলে ক্রিমিনাল হয়। কারণ আইন স্রষ্টা আইন ভঙ্গ করিলে তাহাকে দণ্ড দিবার কেহই থাকেনা—বিশেষতঃ এই আত্মসৃষ্ট আইন যে মানিবার অসুবিধা ভোগ করিতে চায়না। অপরের আইন গোপনে ভঙ্গ করিলেও ক্রিমিনাল হয়। যাহারা ব্যবস্থাপক সভায় গমন করিয়া তাহা ভঙ্গ করিতে চান তাহারা গৃহস্থের গৃহে চোরের ন্যায় প্রবেশ করিয়া তাহার মাল অপহরণ করিতে চান। কারণ গৃহস্থকে মালিক স্বীকার করিয়া চলা হইল। এ ক্ষেত্রেও ব্যবস্থাপক সভার কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত হইল। কাজেই আইন অমান্য করা হইল না। The essence of Civil disobedience is that it is public. আইন অমান্যের বিশেষ কথাই হইল ইহা প্রকাশ্যভাবে করিতে হয়। গোপনে গমন করার মধ্যেই দুর্ব্বলতা আছে। নির্ভিকভাবে দণ্ডায়মান হইবার মধ্যে যে তেজ আছে, তাহাই সম্মানজনক। প্রহ্লাদ

তেমন করিয়াই আইন অমান্য করিয়াছিলেন—যখন পিতৃ আদেশ প্রতিপালন করিতে গেলে তাহাকে প্রাণের ঠাকুরের অবমাননা করিতে হয় তখন যে অগ্নি প্রবেশ, বিষপান, সমুদ্রে নিমজ্জন, হস্তিপদতলে নিষ্পেষণ সহ্য করিয়াছিলেন। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন গৌরাঙ্গ দেব কাজীর আদেশ এই ভাবেই অমান্য করিয়াছিলেন। কাজী যখন ঘোষণা করিয়াছিলেন আর খোল করতাল সহযোগে হরিনাম করিতে দেওয়া হইবেনা, তখনই প্রভু উদগ্র তেজে সে আদেশ অমান্য করিলেন। কাজীকে তখন পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। এই আইন অমান্য অহিংস ভাবে করিতে হইবে। Disobedience to be civil has to be absolutely nonviolent, the underlying principle being the winning over the opponent by suffering i. e. love. অত্যাচার সহ্য করিয়া জয়লাভ করাই হইল অহিংসভাবে আইন অমান্যের মূল সূত্র। যেদিন সকলে বলিবে আমরা কিছু পশার চাইনা সেদিন গভর্ণমেণ্টকে বিপন্ন হইতে হয়—সকল মহাল খাস মহাল হইলে সরকার শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে পারেনা। চারিদিকে আজ অন্ধকার—চারিদিক বন্ধ—আজ ধর্ম্মে বাঁধা, কর্ম্মে বাঁধা, প্রতি পদে বাঁধা; এ বাঁধা দূর করিতে হইবে। মহাত্মার আদেশ,—অহিংস থাকিতে হইবে,—হিন্দু-মুসলমানের একতা সাধন করিতে হইবে। অস্পৃশ্যতা দূর করিতে হইবে,—খদ্দর ব্যবহার করিতে হইবে। ইহাই আইন অমান্যের প্রশস্ত পথ। এই পথ ধরিয়া চলিতে হইবে। আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে কংগ্রেস নির্দ্দেশানুসারে সমগ্র দেশকে প্রস্তুত হইতে হইবে। অতঃপর সভাপতি মহাশয় লর্ড রোণাল্ডের সফলতায় কামধেনুর গল্পটী বলিয়া সকলকে শরৎবাবুর উপদেশ পালন করিতে অনুরোধ করেন।

ক্রমশঃ

অন্নপূর্ণা

॥ শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

অন্নপূর্ণা, জগন্মাতা, জগন্মাতা, ঈশ্বরী !
চরণ তব শরণ মম, জয় জননী শংকরী !
সত্য তব স্বর্গ-করে
পথ্য হয়ে বিরাজ করে।
মোর ক্ষুধা সে সুধার তরে
জাগাও দিবা-শর্ব্বরী।
অন্নপূর্ণা, জগন্মাতা, জয় জননী শংকরী।

আলোর তরে, ভালোর তরে জাগাও ক্ষুধা অন্তরে।
স্বার্থে যেন আর্ত্ত হয়ে রই না তমঃ-কন্দরে।
এই জীবন-জাহ্নবী-চারে
কম বা বেশী ফল যা আসে,
জীব-শিবেরে ভূ-কৈলাসে
তাইতে যেন দাই বলি'।
অন্নপূর্ণা, জগন্মাতা, জয় জননী শংকরি !

পুস্তক পরিচয়

।। শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ।।

দুটি আধুনিক কবিতার বই :

জীবনায়ন—শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

সীমান্ত শিবির—শ্রীবীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম গ্রন্থখানি বিভিন্ন আধুনিক কবির পঁয়ত্রিশটি কবিতার সংকলন। কবিতাগুলি স্বর্গত কবি জীবনানন্দ দাশ-কে নিবেদিত। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলাসাহিত্য জগতে জীবনানন্দের মত প্রভাবশালী কবি আর আসেন নি এ'কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। জীবনানন্দ মূলতঃ প্রকৃতির কবি ছিলেন, অথচ এক বিষণ্ণবোধে তাঁর হৃদয় আচ্ছন্ন ছিলো। তাঁর চিন্তায় ও ভাবে এক অকৃত্রিম সরলতা তাঁকে যে বৈশিষ্ট্য দিয়েছিলো তার অনুসরণ করা সহজ ছিলোনা। অথচ আধুনিক বাংলাসাহিত্যের বেশীর ভাগ কবিই জীবনানন্দের ধারায় প্রভাবিত। কবির মৃত্যুর পর বাংলা কাব্য জগতে যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হ'লো তার অনুভব বিভিন্ন কবির চিত্তে নানাভাবে দোলা দিলো।

বিলম্বে হ'লেও কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৺জীবানন্দের উদ্দেশ্যে উৎসারিত সেই কবিতাগুলিকে সংকলিত করে সকলের সামনে এনে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এই একটি সংকলন গ্রন্থের মধ্যে আমরা আধুনিক কবি মনের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাচ্ছি। কবিতাগুলির অধিকাংশই সুলিখিত। জীবনানন্দ যে বোধ ও অনুভূতিকে আপন চিন্তায় প্রত্যক্ষ করে তুলেছিলেন সেই অনুভূতির গভীরতাকে সত্যের অংশ বলে জেনেছেন কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাই তাঁর কবিতাতে—

> সেই সেই নাগরিক আর।
> সে বুঝি গিয়েছে জেনে,
> সত্য যা তা আপনাতে আপনিই ধ্রুব নয় সব
> তারে পূর্ণ করে চলে
> আমাদেরই রক্তে বওয়া
> গূঢ় এক দীপ্ত অনুভব।

এই সংকলনে যাঁদের কবিতা স্থান পেয়েছে তাঁদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত, কিরণশঙ্কর সেন গুপ্ত, অরুণকুমার সরকার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির কবিতা আমাদের ভালো লেগেছে।

কবি বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা থেকে দূরে থেকে কবিতা লেখেন। তাই তাঁর কবিতার দেহে ও মনে এখনও একটি স্নিগ্ধ উদাস সুর। শহরের জটিল ক্লান্তি তাঁর মনকে ক্ষুণ্ণ করে দেয়নি। জীবনকে তিনি হতাশায় ডুবে গিয়ে দেখেন নি। তাই তাঁর কবিতায় অবাধ উজ্জ্বলতা—

> যুব আকাশের অনেক তারার ছবি—
> দেখলুম একটি বৃষ্টির ফোঁটায়।

কবির হৃদয়ে যে সংশয় নেই বা বাধা নেই তা না, কিন্তু রুক্ষ রিক্ততার মধ্যে তিনি দেউলে হননি, তাই তাঁর চিন্তার মধ্যে প্রত্যয় আছে, নিশ্চয়তা আছে। "সীমান্তশিবির" থেকে কয়েকটি পংক্তি তুলে দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

> "আমার ঘরের কোণ পৃথিবীর সীমান্তবিস্তারে
> পৃথিবীকে জন্ম দেয় আঙিনার ফুলে বারে বারে।
> বারে বারে নিরাশ্বাস কী আশা জাগায়
> জীবনকে খুঁজে নিতে মরণের মন্ত্রণা-সভায়।"
>
> (সময়ের খেলা)
>
> এখন আকাশ-জোড়া শীতের পিপাসা,
> মাটিতে মুখর নয় সোনা-করা ভাষা,
> দিগন্তে পাখির শুধু অলস উড্ডীন
> রঙীন পাখার খেলা হয়ে গেছে ক্ষীণ
> ...এখন অন্তর শুধু তরঙ্গ মন্থর
> অতলান্তে কান পেতে আছে নিরন্তর।
>
> (এখন ও কথা নয়)

কবি বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেই জাতের কবি, যাঁরা সহজ সুরে গভীর কথা বলতে পারেন।

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী

॥ শ্রীজিতেন গাঙ্গুলী ॥

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে সর্বত্র। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে জানাচ্ছে শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য। আজ থেকে ১০০ বছর পূর্বে তিনি জন্মেছিলেন এ পুণ্য ভূমি বাংলাদেশে। ইতিহাসের গতি অনুধাবন করলে দেখা যায় যুগে যুগে মহাপুরুষগণ যুগ-সন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে গেলে বিচার করে দেখতে হবে—যখন তিনি জন্মেছিলেন তখন দেশের অবস্থা (সামাজিক রাষ্ট্রিক ধর্মীয় চেতনা ও পরিবেশ) কিরূপ ছিল? তখন দেশের মোটামুটি অবস্থা ছিল এইরকম—হিন্দুধর্ম আচারসর্বস্ব, সঙ্কীর্ণতায় সমাজ বিভ্রান্ত, দাসত্ব শৃঙ্খলে শিক্ষিত শ্রেণী ইংরেজের অনুকরণে ব্যস্ত, তদুপরি বিজ্ঞানের আবির্ভাবে বস্তুতন্ত্রবাদের পাশ্চাত্য প্রভাব ক্রমশ শিক্ষিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—দাসত্বের ফলে দেশের সব কিছুই খারাপ ও অজ্ঞানতা-প্রসূত আর পাশ্চাত্যের সব কিছুই ভাল, অনুকরণের এ ভাবটা বিদ্বৎসমাজে অনুপ্রবেশ করে। তখন সমাজের অবস্থাটা খুবই বৈষম্যপূর্ণ; একদিকে হিন্দু-সমাজ ওড়কে বাদ দিয়ে পরলোকে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সাধনায় মশগুল, অপর পক্ষে বস্তুতন্ত্রবাদের চালচলনে সমাজ-ব্যবস্থার একটা ওলটপালট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা—এই যুগ-সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের কর্ম-প্রেরণা আমাদের সামনে তুলে ধরে বললেন কর্মেই আনন্দ এবং সে আনন্দই চিদানন্দ বা ব্রহ্মানন্দে রূপান্তরিত হয়—যদি না বস্তুতন্ত্রবাদীর দৃষ্টিভঙ্গিতে একমাত্র কামনা-সিক্ত ভোগ্য রূপে আস্বাদন করা যায়। তিনি সর্বপ্রথম ভারতীয় সংস্কৃতির রসঘন সেই উপনিষদের অমৃতধারা পাশ্চাত্যের কাছে তুলে ধরেন—তাই পাশ্চাত্য জগৎ ভারতীয় কৃষ্টির স্বাদ পায় এবং উত্তরোত্তর ভারতীয় চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হয়। এভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের সেতু নির্মাণ করেন। আজ যে সহাবস্থান পঞ্চশীল প্রভৃতি ভারতীয় ভাবধারা জগতের সমক্ষে প্রচার করা হচ্ছে তার মূল রস বহু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর এ যুগের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি শুধু আমাদের দেশের কবিই নন—তিনি স্থান কালের সীমা ছিন্নিয়ে সর্বদেশের কবি—বিশ্বকবি।

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার কথা কি বলবো—তিনি যে সম্পদ রেখে গিয়েছেন—তা সম্যকরূপে অনুধাবন করতে গেলে একক জীবনে কটসাধ্য বা দুঃসাধ্য—তবে তাঁর লেখনী-নিসৃতঃ অমৃতসুধা শিশু যুবা বৃদ্ধ প্রত্যেক মনিষিজন একাধারে সকলকেই পরিতৃপ্ত করবে। তাঁর প্রতিভা অনন্যসাধারণ। তিনি শুধু কবি ছিলেন না—তিনি ঔপন্যাসিক, তিনি শিশু-সাহিত্যিক, তিনি গল্প-সাহিত্যিক, তিনি নাট্যকার, তিনি সমাজ সংস্কারক তিনি সঙ্গীতকার, সুরসাধক, তিনি চিত্রশিল্পী, তিনি দেশপ্রেমিক, তিনি বিশ্বপ্রেমিক, তিনি দার্শনিক, তিনি কর্মবিদ্, তিনি ব্রহ্মবিদ্ - একাধারে এত বৈচিত্র্যের সমাবেশ বোধহয় ইতিহাসে কোন এক ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ পায় নাই এবং তাঁর এ প্রতিভা মৃত্যুদিন পর্যন্ত অম্লান ছিল এটাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তাই বলি তিনি ছিলেন একটি ব্যতিক্রম।

আজ কাল-জয়ী মৃত্যুঞ্জয়ী সেই অমর কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছি। আজ আমাদের দেশের নানা জায়গায় নানা ভাবে তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে; কিন্তু তাঁর বাণীতে নানা ভাবে যে কথাটি প্রকাশ পেয়েছে, ভারতের শাশ্বত ভাবধারার মর্মবাণীর (স্থিতি-শীলতার) সঙ্গে পাশ্চাত্যের গতিশীলতার সমন্বয়ে যে ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে, তা যদি আমরা

আমাদের জীবন বিকাশে প্রতিফলিত করতে পারি, তাহলেই তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্যক শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। আজ আমরা সৌভাগ্যবশতঃ যে রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশে জন্মেছেন—সমগ্র পৃথিবী আজ রবীন্দ্র স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য দান করছে। রবীন্দ্র স্মরণে আমাদের দেশে রবীন্দ্র রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ ২৬ হাজারের মত ছাপানো হয়েছে এজন্য আমরা আত্মশ্লাঘা মনে করি। কিন্তু সত্যিই বিস্ময় লাগে যখন শুনি রবীন্দ্রনাথের কোন কোন বই স্বাধিনতে লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রিত হয়েছে! বাইবের চোখে রবীন্দ্রনাথ যে কত বড়, শুধু এটুকু উল্লেখেই তা বোঝা যাবে।

ব্যক্তিসত্তাকে ঘিরেই সমাজ-বোধ, জাতীয়তা-বোধ, ক্রমে আন্তর্জাতিকতা বোধ। বিশ্বনাগরিকতার কথা শুনিয়েছে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল, যত্র জীব তত্র শিব বলেছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ; কিন্তু কোথাও ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে নয়—সমষ্টির খণ্ড মিলবে অখণ্ডে, রবীন্দ্রনাথও সেই মানুষের অখণ্ড সত্তাকেই তাঁর গান গেয়েছেন, তাকে মূল্যমান দিয়েছেন মানুষ হিসাবে। এ সত্তা যতই উপলব্ধি হবে ততই মঙ্গল-দায়ক।' বিশ্বমানবতা বোধ আমাদের মনকে উদ্দীপ্ত করুক।

পরিশেষে, এ বলেই আমার বক্তব্য শেষ করবো—যে ভাবে রবীন্দ্র জন্মতিথি সর্ব্বস্তরে পালিত হচ্ছে তা খুবই উৎসাহজনক; কিন্তু এটা যদি একমাত্র নাচ গান বা নাটকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে সত্যিকার তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে কিনা সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। আমরা যদি তাঁর লেখা থেকে মনুষ্যত্বের মূল্যমান যাচাই করতে সমর্থ হই, রক্তপাতের সংঘর্ষে যে প্রাণের রস শুকিয়ে যাচ্ছিল, প্রেম প্রীতি সাম্যের মাধ্যমে তা যদি মানুষের অন্তরে সঞ্চারিত করে তুলতে পারি তাহলেই রবীন্দ্রনাথের সম্যক মর্য্যাদা দান করতে পারবো—কামনা করি কবির অমর বাণী আমাদের সকলের অন্তরে রসঘন আনন্দ সঞ্চারিত করুক।

উপনিষদে ভগবানের একটী নাম হৃদয়ম্—হৃদি অয়ম্—অয়ম্—ইনি (ব্রহ্ম) হৃদয়ে থাকেন বলে তাঁর নাম হৃদয়ম্। বর্তমানে বিশেষভাবে এই হৃদয় অবতীর্ণ হয়েছে। ভাগবত এই হৃদয়ের শাস্ত্র—সেজন্য ইহাকে গায়ত্রীভাষ্য বলেছে। বেদের অর্থ বিস্তারিত করে এই গায়ত্রীভাষ্য ভাগবত লেখা।...যখন ক্ষেত্র খুব জটিল, হৃদয় তখনই নামে—বুদ্ধি যখন জটিলতার মধ্যে আর কাজ করতে পারে না, তখন সেই জটিলতায় হৃদয় নামে। বুদ্ধি একজনকে দাবিয়ে রেখে মীমাংসা করে, হৃদয় পরস্পরের মূল্য দিয়ে চলে।...কলিযুগে প্রজ্ঞার সাধনা নেই—বর্তমানের সব জটিলতার মধ্যে কি করে পথ করা যায় তা বলতে পারবে আজ শুধু হৃদয়-পুরী।...ব্রহ্মের নাম সম—সকলের দাবী মেনে আজ সমতা আনতে হবে। বুদ্ধি একটা সমতা আনতে পারে—কিন্তু সেটা ছাটকাট দিয়ে—এতদিনের পুরুষ-প্রাধান্য সমাজে যেজন্য মেয়েদের স্বাতন্ত্র্যের কোন প্রশ্নই ছিল না। সেখানে এক রকমের সমতা ছিল। কিন্তু আজ যখন দুজনের সমান দাবী, যখন প্রজাবিদ্রোহ, প্রাণ নিপীড়িত—তখন আর বুদ্ধি দিয়ে কিছু হবে না—রাশিয়া আমেরিকা ইংরেজ সবাই ধরা পড়েছে।...হৃদয়=চিৎ×বৃৎ। হৃদয় হলে চিৎ বৃত্তের সমন্বয় হয়, আবার চিৎ×বৃৎ সমন্বিত হলে হৃদয় আসে...হৃদয় চিরকাল লাঞ্ছিত বুদ্ধির কাছে। বৃহদারণ্যক বলছেন সর্ব্বেষাম্ বুদ্ধিনাম্ হৃদয়ম্ এব একায়নম্।—সকল বুদ্ধির শেষ গতি হৃদয়।...হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, বোঝা অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা—বুদ্ধি দিয়ে বুঝলেই হবে না।... প্রেমের কোন আপীল আদালত নেই।...

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ভাষণ, ২৭, ১১, ১৯৫৬

শবরী

॥ শ্রীঅনিল কুমার সমাজদার ॥

শ্রীরামচন্দ্র শবরীর আশ্রমে উপস্থিত হয়ে এবং তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করে শবরীকে কৃতার্থ করেন। তাঁর সেবায় পরিতুষ্ট হয়ে তাঁকে তপশ্চর্যার বিষয়ে নানা প্রশ্ন করেন। তাতে শবরী উত্তর দেন, যে সময় ভগবান রাম চিত্রকূটে এসেছিলেন, তখন তাঁর পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার ঋষিগণ···যাঁদের সেবা আমি করতেন তাঁরা সব স্বর্গারোহন করেন। স্বর্গগমনকালে ঋষিরা বলেছেন যে যখন শ্রীরামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণসহ অতিথিরূপে এখানে আগমন করবেন তখন তাঁর পাদপদ্ম দর্শনান্তে "আমিও" (শবরী) স্বর্গে গমন করবো। আমি আপনাদের জন্য বনজাত ফল-মূল সংগ্রহ করে রেখেছি। "মহা তু সঞ্চিতং বন্যং বিবিধং পুরুষর্ষভ" (৭৪, ১৭); তৎপশ্চাৎ নিজ গুরুগণের প্রশংসা করতে করতে দুই ভাইকে মাতঙ্গবন দর্শন করান। অতঃপর শ্রীরামচন্দ্রের নিকট হতে বিদায় এবং অনুমতি নিয়ে জলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করেন। তখন দিব্যরূপ ধারণ পূর্বক বিদ্যুতের মত রূপ ধারণ করে মহর্ষির কাছে স্বর্গারোহণ করেন। [বিদ্যুৎ সৌদামিনী যথা, ৭৪, ৩৪]। শবরীর চরিত্রের উপর গুরুভক্তি তথা তপঃবল এর বেশী মাহাত্ম্য দেখানো হয়েছে। আর শ্রীরাম লক্ষ্মণকে মহান অতিথিরূপে দেখা যাচ্ছে।

ভট্টিকাব্যের (সর্গ—৬, ৫৯—৭১) মধ্যে শবরীর প্রসঙ্গ অন্যরূপে দেখানো হয়েছে। রামচন্দ্র শবরীকে তাঁর সাধনার বিষয়ে প্রশ্ন করেন তাঁর আতিথ্য স্বীকার করবার পর পরিতুষ্ট হয়ে। শবরীও রামকে পরমাদরে সেবা করে বলেন যে সুগ্রীবের সহায়তায় শীঘ্রই জানকীর সাক্ষাৎ পাবেন। এই আশ্বাস দিয়ে শবরী অন্তর্ধান করেন।

দাক্ষিণাত্যপাঠে শবরী শ্রীরামচন্দ্রকে "দেব-বর" উপাধি দেন (সর্গ ৭৪।১২) আর তাঁর কৃপা দৃষ্টিতে নিজে "দুহিতা" (পুতা) হন। [৭৪।১৩]। রামও তাঁর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের জন্য শবরীকে খুবই প্রশংসা করেন। বাল্মিকী রামায়ণে অবশ্য এসবের কোনও উল্লেখ নেই।

অধ্যাত্ম রামায়ণে শবরী প্রসঙ্গ আবার ভিন্ন। তাতে স্বয়ং শবরীর জ্ঞান-ভক্তির কথা উল্লেখ করেন রামকে আশ্বাস দেন যে "শবরী" সীতা বিষয়ে অনেক খবরই জানেন এবং রাম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে সে সব বলে দেবেন। রাম লক্ষ্মণসহ তাঁর আশ্রমে উপস্থিত হ'লে পর শবরী পরম যত্নে অতিথি সৎকার করেন। তাঁর নিজের সংগৃহীত ফল রাম লক্ষ্মণকে খেতে দেন। অনন্তর বলেন যে—এই আশ্রমে পূর্বে তাঁর গুরু বাস করতেন। তাঁরই নির্দেশানুসারে শ্রীরামের পাদপদ্ম ধ্যান করতে করতে এখানে প্রতীক্ষা করছেন। অতঃপর তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে একটি কঠিন প্রশ্ন করেন—আমি মূঢ়া এবং হীন অস্পৃশ্য জাতিতে উৎপন্ন হয়েও আপনার দর্শন-যোগ্যা কি করে হলাম? এর প্রত্যুত্তরে শ্রীরামচন্দ্র বলেন—পুরুষত্ব স্ত্রীত্ব, জাতি, নাম, আশ্রম ইত্যাদির কোনই মহত্ত্ব নেই। সবই ক্ষণিকের; ভক্তিই সর্বোপরি চরম সত্য। অতঃপর রাম শবরীকে নবধা ভক্তিযোগের দীক্ষা দিয়ে বলেন যে—এই ভক্তিগুণের উপরেই প্রেমস্বরূপা ভক্তির উৎপত্তি হয় যাদ্বারা ইহ-জন্মেই মুক্তি প্রাপ্তি ঘটে। (৩, ১০, ১—৪৪)

শেষে রাম শবরীর কাছে সীতার বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। "সীতা কমল লোচনা কুত্রাস্তে কেনবানীতা।" শবরী শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁর "সর্বজ্ঞতার কথা স্মরণ করান এবং বলেন যে আপনি পূর্বজ্ঞ সর্বান্তর্যামী হয়েও লোকাচার অনুসারে সীতার কথা আমাকেই জিজ্ঞাসা করছেন! তবে শুনুন জানকী শ্রীলঙ্কাতে অশোক কাননে বন্দিনীরূপে আছেন। আপনি মহাতেজা সুগ্রীবের

কাছে যান। অতঃপর শবরী প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশান্তে মোক্ষ প্রাপ্তা হন।

অধ্যাত্ম রামায়ণের রচয়িতাও শবরী প্রসঙ্গ ভক্তিবাদে পরিণত করে দেখিয়েছেন এবং অস্পৃশ্যতাও একমাত্র ভক্তি-যোগেই মোক্ষরূপ পরমার্থ লাভে বঞ্চিতা হন না, সমস্ত বর্ণের জন্যই মোক্ষের পথ সদা উন্মুক্ত। [ভক্তিমুক্তি বিধায়নী জগতঃ শ্রীরামচন্দ্রস্য—শ্লোক—৪৪]

পরবর্তী রাম কথা সাহিত্যেও শবরীর কথায় প্রায় অধ্যাত্ম রামায়ণকেই অনুসরণ করা হয়েছে। আনন্দ রামায়ণে (১, ৭, ১৮০—১৮৬); পদ্মপুরাণ (৬—২৬১, ২৬১—২৬৮) বহুল রামায়ণ, রামচরিত মানস (৩৩, ৩৪—৩৬), রাম গীতাবলী (১৭, ১—৮), রাম চন্দ্রিকা (১১, ৪৩—৭৮ । তত্ত্ব সংগ্রহ রামায়ণ (৩১৭) ইত্যাদি পুস্তকে কিন্তু শবরীর বিষয় অন্যপ্রকার দেখা যায়। তত্ত্ব সংগ্রহ রামায়ণে লিখেছেন যে,—গোদাবরী (নদী) যখন শ্রীরাম-চন্দ্রকে সীতার খোঁজ না দিয়ে মৌন রইলো তখন ক্রোধিত রাম গোদাবরীকে অভিশাপ দিলেন যে, তোর অপবিত্র সলিলে অবগাহন করবে সেই 'চণ্ডাল' হয়ে অস্পৃশ্য হবে। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তখন শ্রীরামচন্দ্রকে স্তব দ্বারা তুষ্ট করে অভিশাপ হতে গোদাবরীকে মুক্ত করতে অনুরোধ করেন। তখন রাম নিজের ধনুক দ্বারা মাটির বুকে রেখাঙ্কন করে গোদাবরীর দ্বারা ঐ বুকে যুক্ত করেন এবং বলেন আমার শাপ প্রত্যাহার করতে পারি না। তবে এইস্থানে যে স্নান করবে তার মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। শবরী প্রতিদিন ঐ বুকে (রামকৃত রেখাঙ্কিত স্থানে) স্নান করতেন।

ভক্তকবি সুরদাসই সর্বপ্রথম লেখেন যে শবরী শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণকে যে ফল অতিথি সৎকার আদে ভোজন নিমিত্ত প্রদান করেছিলেন, তা শবরী দ্বারা উচ্ছিষ্ট ছিলো। (দেব-সভা সংস্করণ ২১১)

বলরাম দাস কৃত উড়িয়া রামায়ণে লিখেছেন—রাম সেই ফলগুলি খেলেন না যে ফলগুলিতে শবরীর দংশন (দন্ত) চিহ্ন ছিলো।

আনন্দ তনয় কৃত মারাঠী শবরীধ্যান গ্রন্থেও [অষ্টাদশ শতাব্দী ইংরাজী] শবরীর উচ্ছিষ্ট ফল প্রদানের কথা উল্লেখ আছে।

ভক্তমালের প্রিয়াদাস কৃত টীকাতে (অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত) যে প্রাচীনতম রচনা আছে তাতে শবরীর পবিত্রতা রক্ষার্থে নিম্নলিখিত কথার উল্লেখ আছে—শবরী ঋষিদের সেবা সৎকারের অদম্য অভিলাষে অনু-প্রাণিতা হয়ে ভোর হবার আগেই নিশ্চুপে আশ্রমে প্রবেশ করতেন; তাঁদের যে পথে ঋষিরা প্রাতঃস্নান করতে যেতেন সেই পথ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখতেন প্রত্যহ। আর চুপচাপ যজ্ঞের কাষ্ঠ সমিধ আদি রেখে দিয়ে আসতেন আশ্রমে আশ্রমে। একবার মাতঙ্গ মুনির জানবার বাসনা হলো প্রত্যহ এসব কাজ কে করে যাচ্ছে ঋষিদের অলক্ষ্যে। অতঃপর রাত্রি জেগে শিষ্য দ্বারা জ্ঞাত হলেন যে শবরীই এসব কাজ সম্পন্ন করে। তখন তিনি সস্নেহে শবরীকে ডেকে রামভক্তির দীক্ষা প্রদান করেন; এবং তাঁকে নিজ আশ্রমে বাসস্থান প্রদান করেন। পরলোক গমনকালে মাতঙ্গ ঋষি শবরীকে আশ্বাস দেন যে নরদেহধারী অযোধ্যার দশরথপুত্র শ্রীরামের সেবা ও দর্শন লাভ করে তুমি চির মোক্ষ লাভ করবে।

একবার অজ্ঞাতে কোন ঋষির অঙ্গস্পর্শ হয়ে যাওয়াতে ঋষি রুষিত হয়ে শবরীকে খুবই অপমানিত করেন। তদন্তর তিনি স্নান করতে নিকটস্থ হ্রদে গমন করে শুচি হতে যান। গিয়ে অবাক হয়ে যান। স্নান করা আর তাঁর হলোনা কেন না তিনি যেখানকার জলই দেখেন তাতে শুধু রক্ত আর অসংখ্য ঘৃণ্য কীটানুতে পরিপূর্ণ বারি দেখতে পান। অনেক দিন পর যখন শ্রীরামচন্দ্র এসে শবরীর আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং শবরী দ্বারা উচ্ছিষ্ট ফল ভোজন করেন, তখন উক্ত ঋষি এসে রামচন্দ্রকে হ্রদের জল শুদ্ধ করবার জন্য অনুরোধ করেন। রামচন্দ্রের আদেশে শবরীর স্পর্শ দ্বারাই সেই জল পবিত্র করা হয়। [পদ্ম ২]

রঘুরাজ সিংহ কর্তৃক "রামরসিকাবলী" গ্রন্থে সরোবর পবিত্র করার বিবরণ এই প্রকার—শ্রীরামচন্দ্র প্রথম হ্রদ স্পর্শ করেন যাতে "তত্রাস্থনো দোষিত সরবারী

(পৃ ১২২—১২৩ বম্বাই সংস্করণ), তারপর রাম বলেন যে শবরীই ইহা পবিত্র করতে পারে। মুনির অনুরোধে :

শবরী সুরুচি সলিল পগ ডারী।
সুরতহিঁ লৈ নিরমল সব বারী।"

মধ্য ভারতের "কোল" জাতির লোকেরা নিজেদের শবরীর বংশজ বলে পরিচয় দেয়। তাদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে বনবাসকালে কোন একদিন রাম সীতা এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে শবরীর সাক্ষাৎ হয় তিনজনেই ক্ষুধার্ত্ত ছিলো, তখন তিন জনকেই শবরী বুনো ফুল (বরই) খাইয়ে পরিতৃপ্ত করেন। প্রতিদিনই শবরী এঁদের তিনজনের জন্য ফুল সংগ্রহ করে আনতেন একদিন অন্যমনস্কা হয়ে প্রত্যেকটি ফুল একটু একটু চেখে দেখে নিজের টুকরীর (সাজি) মধ্যে রাখেন। বাড়ী এসে ভ্রম দূর হয়। হায়! হায়!! আমি একি করলাম? সেদিন রামকে উচ্ছিষ্ট ফল দিতে দ্বিধাগ্রস্তা হলেন। রাম ফল খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, তখন শবরী এনে সেই ফল স-সঙ্কোচে দেন। রামচন্দ্র সীতাসহ সেই ফল ভক্ষণ করেন। কিন্তু লক্ষ্মণ উচ্ছিষ্ট ফল খেতে অস্বীকার করেন। কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে এক বাণ এসে লক্ষ্মণকে আহত করে; যতক্ষণ না লক্ষ্মণের মনের পরিবর্ত্তন হয় ততক্ষণ লক্ষ্মণ অসুস্থ ছিলেন। তারপর সুস্থ হয়ে তিনিও সেই উচ্ছিষ্ট ফল খান।

শবরীর আশ্রম থেকে প্রস্থান সময় প্রসন্ন হয়ে রাম শবরীকে বর দিতে চান। তিনি জিজ্ঞাসা করেন—শবরী তুমি আমার নিকট কি চাও—পরিবার-পরিজন অথবা রাজ্য? শবরী রাজ্য না চেয়ে পরিবার পরিজনেরই বর প্রার্থনা করেন। রাম তাঁকে অসংখ্য বংশধরের বর দান করে বলেন তাঁর বংশাবলিতে কখনো খাদ্যাভাব হবে না। [W. G. Grifits—The cool tribe of Central India Calcutta 1946 Page 207]। কিন্তু উক্ত পুস্তকেও শবরীর স্বামী সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ নাই। কিন্তু ঋষিদের সরোবর অপবিত্র হবার বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে। [Grefits—9]

বিদেশী রামায়ণে শবরীর পূর্ব চরিত্রের বিষয়ে কিছু উল্লেখ আছে। আতার রামায়ণে কবন্ধিনের মতে, বিষ্ণুর দ্বাদশাবতার-এর মৃত দেহ নাকি শবরী খেয়েছিলো তাই তার মুখ কালো বর্ণের হয়ে গিয়েছিলো এবং মহান কৃষ্ণ বরাহ আদি শব ভক্ষণেই নামকরণ শবরী (শব+অরি) হয়েছিলো, কিন্তু রামচন্দ্রের সেবাতে অপবিত্রা থেকে পুনঃ পবিত্রা হয়েছিলো।

শ্যামদেশের রামকিয়েন অনুযায়ী ১৮শ অধ্যায়ে জানা যায় শবরী বাস্তবিকই এক অপ্সরা ছিলো। ভগবানের সেবা কালে অসাবধানতার জন্য ভগবান অভিশাপ দেন যে সে গিয়ে এক জনশূন্য বনের মাঝে অবস্থান করবে যতদিন না ভগবান রাম রূপে ধরার বুকে অবতীর্ণ হয়ে শবরীর আশ্রয়প্রার্থী তথা অতিথি রূপে তথায় পদার্পণ করেন। রাম এসে শবরীর অনুরোধে সেই জনশূন্য অগ্নি প্রশমিত করেন এবং শবরী পুনরায় অপ্সরা রূপ ধারণ করে স্বর্গারোহন করেন।

রঘুরাজ সিংহের রামায়ণিকাবলীর মতে (পৃ ১১৮) শবরী এক মুনি পত্নী ছিলেন এবং পতিসহ উপবনে নিবাস করতেন। একদিন মুনি স্নানান্তে ফিরে আসলে পর প্রতিদিনকার মতো জল ধারা মুনির চরণ ধৌত করে দেন। কিন্তু মুনি জানতে পারেন যে সেই দিনই শবরী একটি সন্তান প্রসব করেছেন। এই অশুচি অবস্থায় তাঁকে স্পর্শ করায় মুনি শবরীকে অভিশাপ দেন যে—

"অরি—অশৌচ না মোহি বতাও।
কল পূজন ভজন কর যাও।
শবরী হোসি মহাবন জাই।"

এতে মুনি পত্নী খুবই রোদন করতে থাকেন। অজ্ঞানতা পূর্ব্বক পতি সেবা করেছেন, সামাজিক বিধান তো তিনি জানেন না, না জানেন লোকাচার। ক্রোধিত মুনি শান্ত হন। কিন্তু শাপ তো প্রত্যাবর্ত্তন করতে পারেন না। প্রসন্ন হয়ে বলেন—

করি হৈ সন্তন কি সেবা আই হৈ তুম ঘর রঘুকুল দেবা

অন্য এক প্রচলিত কথা (কিংবদন্তী) হতে জানা যায় যে শবরী উচ্চ এবং সম্পন্ন কুলে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে এবং পরে পরাধীনতার

[বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর, বার্দ্ধক্যে পুত্রের] নাগ পাশে আবদ্ধ থাকায় সৎসঙ্গ তথা সাধনার কোনই উপায় থাকে না। সংসারের পরাধীনার মধ্যে অবকাশই বা কই? অতএব প্রত্যহ তিনি ভগবানের কাছে মনে প্রাণে প্রার্থনা করতেন যেন পরবর্ত্তী জন্মে তাঁর জন্ম নীচ (অস্পৃশ্য) জাতিতে হয় এবং ভক্তি সাধনার কোন বাধা না পান! তাইই ফলে তিনি ভীল জাতে জন্ম গ্রহণ করেন পর জন্মে। বিয়ে দেবার বয়স হলো— পিতা ভীল জাতীয় প্রথার উপহারের জন্যে মোর-পাঠা আদি পশুপক্ষি পশু সংগ্রহ করছেন। জিজ্ঞাসা করে শবরী জানলো যে তার বিয়েতে এই সব পশু দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হবে! (বলি দেওয়া হবে) শুনে খুবই দুঃখিতা হলো বালা। আর এক রাত্রে সমস্ত পশুকে কারামুক্ত করে গভীর বনে নিখোঁজ হলো। পরে পম্পা সরোবরের নিকট কুটীর বানিয়ে ঋষিদের সেবা করে— তথা রামচন্দ্রের সেবা শেষে পরমধামে গমন করেন। ভাগবত দ্বিবেদীর ভক্ত শাবরী (মানস-সঙ্ঘঃ রামবন ১৯৯২ বিক্রমশতক পৃঃ ৪ এবং G. Gearson কৃত জ. রা এ. সা পৃঃ ২৭৪)।

বাংলার কৃত্তিবাসী রামায়ণের শবরী প্রসঙ্গ কারোরই অপঠিত বা অজ্ঞাত নয়।

"সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে,
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।"

—রবীন্দ্রনাথ

সাময়িকী

রবীন্দ্রজন্ম-অনুষ্ঠান : অনুষ্ঠান মানুষের জীবনের একটা প্রয়োজন—কি ব্যক্তির জীবনে, কি জাতীয় জীবনে। মানুষের সভ্য অবস্থায় অনুষ্ঠানের রকমারি বাড়িলেও অসভ্য মানুষও জীবনের দুঃখবেদনা ও আনন্দকে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া রূপ দিয়াছে। দেহবান মানুষের পক্ষে অন্তরের অনুভূতিকে বাইরে রূপ দেওয়া একটা স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম—অনুষ্ঠান অন্তরের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। যুগে যুগে ইহার রকম বদলায়—দেড়শ কিংবা একশ কিংবা পঞ্চাশ বৎসর আগেও আমরা যে রকম অনুষ্ঠান পালন করিয়াছি—আমাদের আজিকার অনুষ্ঠান তাহা হইতে আলাদা। পঞ্চাশ বৎসর আগের সাথে যদি বা কিছু মিল থাকে, তাহার আগের সঙ্গে এখন আর কোনো মিলই নাই—আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর আগেই রবীন্দ্র-প্রভাব আমাদের উপর পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। তথাকথিত ধর্মীয় ভারতবর্ষের আচার অনুষ্ঠানের স্থান গ্রহণ করিয়াছে আজ নাচ-গান, অমুকের জন্মদিন, অমুকের মৃত্যুদিন, অমুক আন্দোলন, অমুক প্রতিবাদ ইত্যাদি ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতবর্ষেরই নয়, সমস্ত পৃথিবীর মন কতখানি অধিকার করিয়া আছেন তাঁহার বর্তমান শতবর্ষ জয়ন্তী সম্পর্কে অনুষ্ঠানগুলি তাহা প্রমাণ করিবে। কিন্তু এই অনুষ্ঠানগুলি কতখানি মানুষের হৃদয়ের শুচিতা হইতে জাত? কতখানি তাহা যাহার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত তাঁহার জীবনের সঙ্গে মেলানো? রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করিয়া যতগুলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছে, হইতেছে, হইবে, সেইগুলির দিকে তাকাইয়া এই ভাবনাই হইতেছে যে, এই অনুষ্ঠান আমাদিগকে কতখানি শুচি করিবে, পবিত্র করিবে, প্রীতিপূর্ণ করিবে, রুচিপূর্ণ করিবে, কতখানি কবির ধর্ম মানবতার প্রতি আমাদিগকে অনুরক্ত করিবে। এ ভাবনাটা প্রত্যহ যেন আমরা খানিকটা ভাবি যে অনুষ্ঠানগুলি যেন প্রাণহীন না হয়, যেন তাহা আমাদিগকে কিছু আন্তরিক ধর্মে দীক্ষিত করে—অনুষ্ঠান যেন শুধু বাহ্যিক আচার আচরণে পরিণত না হয়। আমরা সাধারণতঃ আমরা একান্তভাবে বহির্মুখীন; অন্তর্মুখী ধ্যান একদিন ভারতবর্ষকে একরকম করিয়া বিশ্বে ফেলিয়া ছিল, আজ আবার বহির্মুখীনতা আর এক রকম করিয়া বিশ্বে ফেলিতেছে। কিন্তু আমরা অভিভাবকেরা যদি মনে রাখি যে অনুষ্ঠানের বহিরঙ্গ ও অনুষ্ঠানের প্রাণ—এই দুই মিলাইয়াই সার্থক অনুষ্ঠান—তাহা হইলে সে কথা আমাদের সন্তানেরাও মনে রাখিবার ও আচরণ করিবার সুযোগ পাইবে। অনুষ্ঠান-মুখর এই দিনগুলিতে আত্মবিশ্লেষণ যেন না আমরা হারাইয়া ফেলি।

আবার রক্তপাত? বিগত ১৯৬০-এর জুলাইর পরে ১৯৬১-র ১৯শে মে আসাম ভাষা সমস্যা লইয়া আবার রক্তপাত ঘটাইল! কেন্দ্রীয় সরকারও সেবারের মতই এবারেও চুপ করিয়াই আছেন বলা যায়। দেখিয়া শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া যাইতে হয়। ভাষা সমস্যা কেবল আসামে বাঙ্গালাভাষা লইয়া নাই, ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই আছে; অনেক স্থানের অনেক রকম মীমাংসা হইয়াছে বা হইতেছে, কিন্তু আসাম যে ভাবে উহা সমাধানের ভার লইয়াছে সেরূপ কি আর কেহ লইয়াছে, না আসামের পথ ভারতবর্ষের আদর্শের, গণতন্ত্রের আদর্শের অনুযায়ী হইয়াছে? শুধু রাজনীতির কূট চালেই ইহার জবাব আটকাইয়া থাকিবে, না আসাম ও কেন্দ্রীয় সরকারের কূটনৈতিক রাজনীতিজ্ঞগণ হৃদয়ের ভাষায় ইহার জবাব দিবেন—যে হৃদয়-দৃষ্টি জাতির জনক মহাত্মাজী রাজনীতির মধ্যে প্রথম প্রবেশ করাইয়া ছিলেন? রক্তপাত দ্বারা সমস্যা সমাধানের এ পথ কি ভারতবর্ষে চালান ঠিক হইবে? ১২ই মে-র সংবাদে দেখি কাছাড়ের প্রতিনিধি দলের নিকট শ্রীনেহরু তাঁহাদের অভিযোগ যে অকৃত্রিম বা প্রকৃত ইহা স্বীকার করিয়াছেন।—যে অভিযোগ বা দুঃখকষ্ট প্রকৃত তাহার সম্বন্ধে কি অভিযোগকারীর প্রতি এই পথ-অবলম্বন কোন রকম ভাবেই সমর্থন করা যায়? রাজনীতিকতার আবর্তে শ্রীজওহরলালের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া দিতে পারিয়াছে,

শ্রীরওহরলালের সহৃদয় হৃদয়ের বিগলিত হওয়ার স্বভাবকে প্রস্তাবীকৃত করিয়া দিয়াছে। খণ্ড দাবির সত্যতাকে প্রস্থাপন করিতে গিয়া ভারতীয় অখণ্ডতা যেন বিনষ্ট না হয়—এ দিকে দৃষ্টি রেখে আন্দোলনকারীদের যেমন উচিত, আসাম সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের তাহা অপেক্ষাও বেশী উচিত। তাঁহাদের অসংযত পথে ভুল না থাকিলে আন্দোলন এরকম জোরদার হইত না—এ কথা যেন তাঁহারা মনে রাখেন। জীবন মৃত্যু দুইই সমান অতএব ভাষা আন্দোলনে নিহতদের জন্য শোক করা উচিত নয়, এ কথাই যদি বলিতে হয় তাহা হইলে কোন রকম আন্দোলন করিবার সার্থকতাই বা কি? যতক্ষণ বাঁচিয়া আছি ততক্ষণ কি করিয়া সুষ্ঠু ভাবে অধিকতর সাম্যমূলক ব্যবস্থা ও চিন্তাধারা লইয়া বাঁচা যায়, ইহাই না বাঁচিয়া থাকিবার আদর্শ হওয়া উচিত? এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই তো সমস্ত আন্দোলন? তাই জীবনে চলার পথ ঠিক করিতে যদি মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি তাহা হইলে জীবনের অর্থই বদলাইয়া যাইবে—যেমন এতদিন গিয়াছিল। যে বেদান্ত জীবনকে মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে, সে বেদান্ত তো স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত নয়, স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের বেদান্তও নয়—অর্থাৎ সে বেদান্ত এ যুগের বেদান্ত নয়। এ যুগের বেদান্তের যে বজ্র নির্ঘোষ স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের ভিতর দিয়া ধ্বনিত হইয়াছে, সে আহ্বান জাতিকে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার আহ্বান—সেই মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার আহ্বানে সাড়া দিতেই তো আসামের এ ভাষা-আন্দোলন। তাই আসামের ভাষা আন্দোলনকারীদের বক্তব্য যদি যুক্তিসঙ্গত হয়, এবং সে বক্তব্য যদি শুনিতে না চাওয়া যায় তাহা হইলে তাঁহারা আন্দোলন করা ছাড়া আর কি করিতে পারেন? এই আন্দোলন করিয়াই তো অন্যান্যদের সমস্যার ব্যবস্থা হইয়াছে। আন্দোলনকারীরা তো এ পর্যন্ত শান্ত ভাবেই আন্দোলন চালাইতেছেন—আসাম সরকার যদি গুলি চালাইবার অর্ডার না দিয়া থাকেন তাহা হইলে পুলিশ কি নিজেরই দায়িত্বে কেবল গুলি চালায় নাই, বর্বরোচিত অত্যাচার করিয়াছে? নিরস্ত্র জনসাধারণের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য পুলিশ এই পথ অবলম্বন করিয়াছে—এ গুলি আত্মরক্ষার জন্য—এগুলি কি একেবারেই মামুলী কথা নয়? যাহাহউক, আমাদের কথা হইতেছে রক্তপাতের পথ ভারতবর্ষের পথ নয়—এ কথা যদি স্বাধীনতার সাধকদের মনে করাইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে সে লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিবে না। শান্তিপূর্ণ উপায়েই, আলাপ আলোচনাদ্বারাই সকল সমস্যার সমাধান করা উচিত এ কথা ঠিক, কিন্তু আলাপ আলোচনার ফল না হইলে তখন খানিকটা আন্দোলন না করিলেও তো চলে না। কাছাড়ের ভাষা-আন্দোলনকারীরা তো শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহই চালাইতেছেন—তাঁহাদের প্রতি আমাদের আবেদন এই যে তাঁহারা যেন শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণই থাকেন। পশ্চিমবঙ্গ যে শান্তভাবেই বেদনা প্রকাশ করিয়াছে, ইহাও উত্তমই হইয়াছে, কিন্তু কংগ্রেস-সভাপতিকে হত্যার প্রচেষ্টা করিতে গেলে সমস্ত আন্দোলন তাহার আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়া যাইবে, যাহারা উত্তেজিত হইতেছে, তাহাদের এ কথাটা স্মরণ রাখিতে বলি। খণ্ড সমস্যার সমাধানে জাতীয় অখণ্ডতা খণ্ডিত না হয়, ইহা দেখার দায়িত্ব আন্দোলনকারীদের মত নেতৃবৃন্দেরও এবং সমাধানকে হৃদয়ের দৃষ্টিতে দেখার দায়িত্বও তাঁহাদের বেশী। আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে জনতাকে শান্ত করিবার দূরদৃষ্টি ও হৃদয় আকাঙ্ক্ষা করি।

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম পোঃ দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
বি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

উদ্বোধন

আষাঢ়, ১৮৮৩ শকাব্দ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ ১৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫০—

(৫)

সকালে হাওড়া স্কুলগুলির ঠিকানা লিখি, সেগুলি দিয়া আসিবার জন্য যাই ও প্রেসে কিছু কথা জানিবার জন্য রেণুকে বলিয়া আসি। আরও লিখিবার জন্য খাম নিয়া আসি। আফিসে চিদানন্দ ছিল। কিছু পরেই সে চলিয়া যায়। প্রতিভা আসে ২ টার পর। আমি মেদিনীপুরের স্কুলগুলির ঠিকানা লিখি। প্রতিভা সাময়িকী : প্রশ্নের জবাব নকল করা আরম্ভ করে। রেণু ১২টার পর কলিকাতা যায়, প্রেসেও গিয়া সব কথা ঠিক করিয়া আসে। ২৪ m ছাড়া ভাল বই হয় না। প্রতি পৃষ্ঠায় থাকে ২২ লাইন। বই ৩।০ ফর্মা হইবে। কাগজ লাগিবে wastage শুদ্ধ ২ রীম। আছে ১ রীম ১৫ দিয়া, বাকিটা বীরেনবাবু কিনিয়া দিবেন। রেণু এখানে আর আসে না।…সন্ধ্যার পরই বীরেনবাবু আসেন। প্রায় ১ ঘণ্টা ছিলেন। তিনি গীতার শব্দ-সমূহের নূতন অর্থ (re-orientation) লিখিতেছেন প্রবন্ধাকারে। উদ্বোধন দিতে বলিলাম। আগামী রবিবার গীতাপাঠের কোনও বন্দোবস্ত হয় নাই। বীরেনবাবুকে খুব মনোযোগের সহিত আমাদের গীতা-ভাষ্য পড়িতে বলিলাম। কুসুমের একটা পোস্টকার্ড আসে। গোপার জ্বর সর্দি-কাশি হইয়াছে।…

প্রার্থনা আজ সকালে একটু দেরীতে হয়, ইহার পূর্ব্বেই পুলিশের ২ জন লোক ৮এ রাসবিহারী এভিনিউ-র গোটা বাড়ী তল্লাস করিতে আসে। তিন তলার সব তলাতেই যায়। আমার কোঠায় আসিয়া উদ্বোধন দেখে। ৮।১০ মিনিট পরে অন্য সব বাড়ীতে যায়। বোধহয় কোনও কমিউনিস্ট খোঁজ করে।

রেণু পাবলিসিটি কোয়ামে ফোন করিয়াছিল বিজ্ঞাপনের ম্যাটার দিবার জন্য। নমিতাও ফোন করিয়াছিল। সে শনিবার-এ দিকে সন্ধ্যার সময় আসিবে বলিয়াছে।

৮ই মার্চ

সকালে আজ 'বেন' উপনিষদের প্রুফ দেখা শেষ করি। নদীয়া, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জিলিং, কুচবিহার-এর স্কুলগুলির ঠিকানা লিখি। রেণু দুপুরের সময় এখানে আসিয়া ৪টায় 'চরিত্রহীন' প্রবন্ধ নকল করা শেষ করে ও ৪।০টায় টালায়…। ৭।০টার পর ফেরে। প্রতিভা আসে ২টার পর। পণ্ডিত নেহরুর আফ্রিকার পত্রিকায় কালিদাস বসুর উদ্বোধনের ক্ষিপ্র পদে লাফাইয়া লাফাইয়া মাঠ অতিক্রম করিয়া সাক্ষাৎ বেশ হৃদয়স্পর্শী। তাজা প্রাণের পরিচয় ইহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এখনও যৌবন আছে, বেশ কবি-জীবনের ঝলক আছে। আজ কলিকাতা ত্যাগ করেন। আগামী সপ্তাহে আবার আসিবেন বলিয়া গেলেন। এ দিকে কাহারা পোস্টার দিয়াছে—'Nehru declare war or quit'। জয়প্রকাশনারায়ণ সর্ব্ববিধ শান্ত উপায় ব্যর্থ হইলে তখন পাকিস্থানে সৈন্য প্রেরণের কথা বলিয়াছেন। ইহা দেশ-আক্রমণ হয় না, নিশীড়িতের উদ্ধারসাধনই ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু যে লৌহ বেষ্টনী পাকিস্থান তাহার

ও বিশ্বের মধ্যে খাড়া করিতেছে, তাহা তাহাকে ভাঙিয়া বাহির হইতে হইলে তাহারই যুদ্ধ করিতে হইবে। সে-ই যে বহির্জগতের আড়াল হইয়াছে তাহা নয়, বহির্জগৎও তাহার কাছে আড়ালে গিয়াছে। সে কতদিন ইহা সহ্য করিতে পারিবে? তাহাকে তো পথ কাটিয়া বাহিরে আসিতেই হইবে। পাকিস্থানের ধ্বংস আমরা চাহি না, কেন না আমরা 'ছাড়িয়া রাখা'-র দর্শনে বিশ্বাসী। কিন্তু পাকিস্থান যদি নিজের আগুনে পুড়িয়া মরে, আত্মহত্যা করে, কাহার কি বলিবার থাকিতে পারে? ধ্বংস হউক ইহা আমরা সরল মনেই চাহি না। পৃথক্ হইয়াও তো মিলিয়া মিশিয়া থাকা যায়। ৯টার পর আশ্রমে ফিরি। আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু, অনাত্মজ্ঞানীর কাছে আত্মা 'শত্রুত্বে' বর্তমান থাকে—ইহার চেয়ে বড় সত্য আর নাই। আত্মা অর্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুই-ই। আমি আমার বন্ধু না হইলে পরমাত্মা বন্ধু হইতে পারেন না। পক্ষান্তরে পরমাত্মা আত্মার বন্ধু না হইলেও আমি আমার বন্ধু হইতে পারি না। আমি ও পরমাত্মা পরস্পর বন্ধুভাবে যুক্ত না হইলে বিশ্ব বন্ধু হয় না, পক্ষান্তরে বিশ্ব বন্ধু না হইলেও আমি ও পরমাত্মা পরস্পরের কাছে ও প্রত্যেকে নিজের বন্ধু হইতে পারে না।

৯ই মার্চ

'প্রশ্নের জবাব' প্রবন্ধটী কিছু সংশোধন করি ও লিখি। ইহারে পরই শিশির আসে। সে দুই ঘণ্টা থাকে। তাহাদের ওখানে বহু পূর্বে 'রাম নবমীর দোল' নামে একটী উৎসব হইত ও মেলা বসিত। সেইটীকে revive করার ইচ্ছা। আমায় গিয়া তাহার উদ্বোধন করিতে হইবে। ৭।৮ই এপ্রিল নাগাদ। আবার আসিবে। শিশির ঘণ্টা খুলে আমাদের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার প্রচার-পত্রটী পৌঁছাইয়াছে। প্রেস হইতে 'হেন' উপনিষদের ২য় প্রুফ দিয়া যায়। ফাগুন ছাপাইবার (এষ্টিক) নিয়া যায়। রেণু এখানে হইয়া ১১ টায় পর কলিকাতা যায়। প্রতিভা ২টার পর জয়ার ওখানে যায়, ৫টায় ফেরে। ইহার মধ্যে বিবেকানন্দ সোসাইটীর পক্ষ হইতে ২রা এপ্রিলের ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সভায় (হাই-কোর্টের জজ গোপেন্দ্র নাথ দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত) যোগদানের নিমন্ত্রণ জানাইতে শ্যামাচরণ দত্ত আসেন। তাঁহার সঙ্গে পত্রিকা ও পুরুষোত্তম-কৃষ্টি সম্বন্ধে প্রায় ১ ঘণ্টা আলোচনা হয়। নূতন দর্শন প্রচারিত ও গৃহীত না হইলে স্বামী বিবেকানন্দের হুঙ্কারও, কর্ণ ও সঙ্ঘ সঙ্ঘ বলিয়া আর্তনাদ আকাশে উড়িয়া যাইবে, বোধহয় গিয়াছে। এ কথা শ্যামবাবু স্বীকার করিলেন। শ্যামবাবু মার্টিন এণ্ড কোং-তে কাজ করেন, তিনি ২৲ টাকা দিয়া ঈশোপনিষৎ নেন। যাইবার ইচ্ছা আছে বলিয়া দিলাম। আমি ও প্রতিভা ৪৷৷০ টায় পর আফিসে যাই। তাহার অনেক পর শক্তি ঔষধালয় হইতে রেণু ফেরে। সে আজ কীমার, কুমিল্লা ব্যাঙ্ক, ন্যাশনাল ইনসুরেন্স, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সী প্রভৃতি স্থানে যায়। নীলুর একটা পোস্টকার্ড আসে গীতাদের খবর জানি কি না তাহা জানিবার জন্য। রেণুর শরীরটা ভাল নয়, তবুও তো ছুটিতে হয়।...

১০ই মার্চ

সকালে 'প্রশ্নের জবাব' সাময়িকীটা কতক লিখি। রেণু ইউনাইটেড ইনডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কে বিজ্ঞাপনের প্রুফটা...দিয়া আসে। আমি সরযূকে (ছোট শ্যালিকা) দেখিবার জন্য তাহাদের বাসায় যাই, ১ ঘণ্টা প্রমথের সঙ্গে কথাবার্তা বলি। কুসুমের নিকট সহজ পড়া ১ম ও ২য় ভাগ বুকপোস্ট রেজিষ্টারী করিয়া রেণু পাঠায়, পোস্টাফিস হইতে পাবলিসিটি কোয়ার্স ও জেনারেল প্রিন্টার্সে যায়। প্রতিভা আসে ৩ টার সময়। যমুনা আসিয়াছে। সকালে সেবানন্দ আসিয়াছিল।...নমিতা আসে ৬ টায়। তাহার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক আলাপ হওয়ার পর নিত্যব্রত গিয়া খবর দেয় যে, তাহার মাসীমা মারা গিয়াছেন। নমিতা আমার সঙ্গে আশ্রম পর্যন্ত আসে, পথে কথা বলিতে বলিতে আসি। অযাচিত করুণায় রাধা ও গোবিন্দ জীবনের দুয়ারে আসিয়া

দাঁড়াইয়াছেন। কান্না আমার জীবনকে পাইয়া বসিয়াছে। আমি কাঁদিয়াই চলিয়াছি, পার তো আমার চোখের জল মুছাইও, আমার জীবনের রাধাগোবিন্দকে নিজের করিয়া লইও, বিশ্বকে সেই ছাঁচে গড়িয়া তুলিও। আমি তোমাদিগকে বিশ্বের বুকে রাণী রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। আশ্রমের দরজা হইতে নমিতা বিদায় নেয়।…

১১ই মার্চ

সকালে 'প্রশ্নের জবাব' সামন্বিকীটা লিখি। চক্ষুটায় বোধহয় একটা অঞ্জনি উঠিতেছে, বেদনা বোধ হইতেছে।

রেণু সকালে রাধাগোবিন্দ বসাকের নিকট হইতে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ নিয়া আসে। নরেন দেবের ওখানে যায়। মাখনবাবুর সঙ্গে গিয়া এন, সি, গুহর দোকান হইতে যমুনার জন্ম ১০০৲ টাকা মূল্যে একটা সাইমা ঘড়ী কেনে। ২ টার পর এখানে আসে। প্রতিভা হানিম্যান হইয়া ৩ টার পর আসে। সন্ধ্যা হইলে আমরা আফিসে যাই। মন্থর দেওয়া টাকা হইতে আমার জন্ম একটা তাওাল ৬৲ টাকা মূল্যে রেণু কিনিয়া আনে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেবানন্দ টাকা ২টী ফেরত দিয়া যায়, যাহা কাকরধা যাওয়ার জন্ম তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল। জ্ঞানবাবু প্রভৃতি তাহাকে সঙ্গে নিতে চায় না, সন্ন্যাসীর পোষাক দেখিয়া তাহাকে নিয়া বিপদ ঘটিতে পারে বলিয়া। সেবানন্দ যায় নাই। উহারা চলিয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের শিল্প-মিশনের সভাপতি পাকিস্থানের আর্থিক অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছেন, 'He (B...) said that the main reason why British Capital is shy in Pakisthan appeared to be because of the uncertain and unfortunate political position. Once the Kashmir dispute was settled, the way would be found.' একটী স্বাধীন রাষ্ট্র হাতে পাওয়ার পর পাকিস্থান এমন করিয়া নিজের হাতে তাহা নষ্ট করিল, এই দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর নাই। কি অদূরদর্শিতা, কি বুদ্ধির দৈন্ত। এত হিন্দু-বিদ্বেষ যে রাষ্ট্রের পশ্চাতে, সে রাষ্ট্র কি কখনও টিকিতে পারে? বিদ্বেষে যাহার জন্ম, বিদ্বেষেই যাহার স্থিতি, বিদ্বেষের মধ্যেই হইবে তাহার লয়।…শিশুর অজ্ঞতা শিশুর দুষ্টামি বৃদ্ধদের জীবনে রসের সঞ্চার করে, ঐ গুলিকে শিশুর অভিভাবকগণ উপভোগ করে। বাস্তবিকই অজ্ঞতা প্রভৃতির সঙ্গে 'রসে'র সম্বন্ধ রহিয়াছে। অতি বুদ্ধিমান হইলেই অজ্ঞতার রস, শিশুদের চপলতা ও দুষ্টামির রস পাওয়া যায় না। প্রজ্ঞাবাদ তাই অজ্ঞানকে বাদ দিয়াছে, চপলতাকে ছাটিয়া ফেলিয়াছে। তাহার মতে সর্ব্বজ্ঞ, নিশ্চল ব্রহ্মই সত্য বাস্তব। কিন্তু পুরুষোত্তম দর্শনে অচল-চঞ্চল, অজ্ঞ-সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মবস্তুই প্রতিপাদ্য। অজ্ঞানের রস, চপলতার রস আস্বাদন করিয়াছে ব্রজবাসী।

১২ই মার্চ

সকালে 'বেন' উপনিষদের ভাষ্যভূমিকা শেষ করি। চক্ষুতে অঞ্জনি হইবার জন্ম চক্ষুতে দেখিতে খুব কষ্ট হয়। রেণু প্রেসে গিয়া 'বেন'-র ১ম ফর্মের প্রুফ দিয়া অন্যান্য স্থানে যায়। এখানে আসে ৩টার পর নূতন জুতাটা লইয়া। প্রতিভা হানিম্যান ঘুরিয়া আসে ও 'প্রশ্নের জবাব' নকল করে। রেণু ঘরটা গুছায়। রেণু আগেই বাসায় যায়, আমি নূতন জুতা পরিয়া প্রতিভার সঙ্গে আফিসে যাই।…কুসুমের কোন পত্র আসিল না। পাবনায় গৃহে অগ্নিসংযোগের খবর পাওয়া গিয়াছে। লোকে এইরূপ বলে যে, সেখানের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহায্য করিতে গিয়াছিল, তাহাকে সেখানকার স্থানীয় লোক খতম করিয়া সরাইয়া দিয়াছে। ঠাকুর, তোমার উপর নির্ভর করিয়া তোমারই শ্রীচরণতলে উহাদিগকে ফেলিয়া রাখিয়াছি। তুমিও রক্ষা করিও। আমার জীবনেরই তো উহারা অংশ, তোমারও আদরের ধন। বর্ত্তমানে পূর্ব্ব বঙ্গে আসার পথে নানা বিপদ। এ অবস্থায় যার যে স্থান, সেখানে চুপচাপ ঠাকুরের মুখের দিকে তাকাইয়া পড়িয়া থাকা ভাল। কিন্তু দাদা আসিতে চাহেন। কি আমি লিখিতে পারি? আমার মতামত তো জানিতে চান না।…

১৩ই মার্চ

সকালে উদ্বোধনকার্যালয়ের প্রুফ দেখি। রেণু ১০।০টায় ব্যাঙ্ক ঘুরিয়া এখানে আসিয়া প্রুফ নিয়া প্রেসে যায়। সেখান হইতে ৩টায় পর এখানে না আসিয়া বাসায় দিয়া যায়। প্রতিভা ২টার পর আসে, 'প্রশ্নের জবাব'টা লেখে। পরে নকল করে কেন-উপনিষদের ভাষ্য ভূমিকা। ৪।০ টায় আমি ও প্রতিভা আফিসে রওয়ানা হই। কুসুমের একটা পোস্টকার্ড আসিয়াছে প্রতিভার পোস্টকার্ডের জবাবে। ভাল আছে।···পেপার কনট্রোলারের নিকট হইতে কেনোপনিষদের ৮ পৃষ্ঠা বেশী ছাপাইবার এবং তদুপযোগী কাগজ পাইবার অর্ডার আসিয়াছে। নীহার কাল যখন এখানে আসিয়াছিল তখন বৌদের কাছে রেণুর সম্বন্ধে বলিয়া দিয়াছে যে, 'মহিলাটি যখন এখানে আসিবেন তখন বলিবেন তিনি যেন নিঃস্বার্থভাবে রবিবার একবার আমাদের বাসায় যান'।··· ১৪ই মার্চ

সকালে 'হিন্দুমুসলমান সম্বন্ধ' সাময়িকীটা লেখা শেষ করি। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল পূর্ব্বে 'প্রশ্নের জবাব'। পরে 'কেন' উপনিষদের ২য় কর্মের প্রুফ দেখি। রেণু প্রেস হইতে ঘুরিয়া এখানে আসে ৩টায়। শেষর দাস 'কেন' উপনিষৎ ছাপাইবার জন্য ৫০৲ টাকার একটী চেক রেণুকে দেয়। ২টার পর জয়া আসে। তাহার কিছু পর প্রতিভা, তাহার পর রেণু আসে। প্রতিভা সাময়িকীটা কপি করা শেষ করে, সন্ধ্যা হয়। তাহার পর আমরা বাহির হই, জয়াকে বাসে তুলিয়া দেওয়া হয়। সুধাংশুর একটা চিঠি আসে, বৈকালে পারুল আসে। আমার সেবার জন্য ২৲ টাকা ও উদ্বোধনকার্যালয়ের ৪৲ টাকা দিয়া যায়। সে এখন চিন্নুর সঙ্গে রিফিউজী ক্যাম্পে শিয়ালদহে সেবা করে, চিন্নুর সঙ্গে আসে যায়। কেতকী সে ছিল না। জয়ার সঙ্গে পুরুষোত্তম দর্শন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়।···চিদানন্দ কেনোপনিষৎ ছাপাইবার জন্য ৪৲ টাকা সকালে দিয়া গিয়াছে···। ১৫ই মার্চ

৬

সকালে উদ্বোধনকার্যালয় পত্রিকার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রুফ দেখি। 'কেন' উপনিষদের ২য় কর্মের ২য় প্রুফ দেখি। প্রতিভা ১০।০টায় রেণুর ওখান হইতে প্রুফ নিয়া প্রেসে দিয়া ১২টায় ফিরিয়া আসে। সে প্রথমে প্রুফ দেখে। পরে সাময়িকী শেষ করে প্রায় ৫।০টার পর। রেণু প্রথমে এখানে আসিয়া প্রুফগুলি দেখিয়া ৩টার পর প্রেসে সেগুলি দিয়া আসে। এম, বি, সরকারে যায়, পরে সেখান হইতে নরেন সেন ও কার্টেলে যায়। নরেন সেন ও কার্টেলে দেখা হয় নাই। দুপুরে রেণুকে মনোরঞ্জন বসু ফোন করিয়াছিল। ৩টায় নমিতা আসে—সে প্রথমে কেনোপনিষদের ভাষ্যভূমিকা পড়ে, আমি ব্যাখ্যা করি। পরে ঈশোপনিষদের ভূমিকাটী আরম্ভ করে। আগ্রহ আছে, কিছু কিছু বোঝে। সে যে বহু কর্ম্ম করিয়াছে (যাহা আমাদের বড় বৌ-এর কাছ হইতে শোনা গিয়াছে) সেই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। সত্যই সে বহু করিতে চাহিয়াছে, ছাড়িয়াছে। আমি বলিলাম—এমন একটি কার্য্য কর, যাহার ভিতর সর্ব্ব কর্ম্ম আছে এবং যাহা সর্ব্ব কর্ম্মের আছে। বহু কর্ম্ম করিয়া ব্যর্থ হইলে মানুষের কর্ম্মের প্রতি বিরক্তি আসে, কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া মানুষ ঘরে আসিয়া বসে। তাই চাই কর্ম্মের ধারা ও কৌশল শেখা। কোথায় অকর্ম্ম-সর্ব্বকর্ম্মের সমন্বয়, তাহাই শিখিতে হইবে। Instinct যে intellect-এর চেয়েও বলবান্, মানুষ যে instinct দ্বারাই ruled হয়, ইহা সে বুঝিতে পারে। ৮।০টার পর সে চলিয়া যায়। সে বলিল যে, এইরূপ কর্ম্ম করা ও ছাড়ার মধ্য দিয়া আমার বহু অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে। আবার শনিবার সাতটায় আসিবে এবং রাত্রিতে রেণুর ওখানে থাকিবে। ৯টার পর আমি আশ্রমে ফিরি। খুব বাতাস বহিতেছিল, টিপ্ টিপ্ বৃষ্টিও পড়িতেছিল। উদ্বোধনকার্যালয়ের প্রথম কর্মের ও কাভারের ফাইল কপি আজ দিয়াছে। সেগুলি ও রেণুর ছাতা বগলে করিয়া বাতাস চিরিয়া চলিয়া আসি। খাওয়ার পর কেনোপনিষদের ২য় কর্মের ২য় প্রুফ দেখি। তাহার পর ঘুম হইতেছিল না। ঘুমাইতে ১টার পর হয়। ভোরে উঠিতে দেরী হইল।

১৬ই মার্চ

দেরীতেই উঠি। কেনোপনিষদের ২য় খণ্ডের ২য় প্রুফ দেখিয়া ও তাহা লইয়া আফিসে যাই।···রেণু ১১ টায় বাহির হয়; প্রথমে প্রেসে যাইবে, পরে বোধে মিউচুয়ালে যাইবে। প্রতিভা ২৸০ টায় আসে। ৫টার পর সুধাংশুর ওখানে যায়।···রেণু ৫টার পর ফিরিয়া আবার আধ ঘণ্টা পর নরেন সেবের ওখানে যায়, পায় না। কার্টেল-এর সঙ্গে দেখা। সে এ মাসে বিজ্ঞাপন দিবে বলিল। ফিরিতে ৮টা হয়। নমিতার সঙ্গে তাহার আফিসে রেণুর কথাবার্ত্তা হয়। পুরুষোত্তম-দর্শন লইয়া তাহার বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছা। সুধাও চাহিয়া ছিল। তবে সে পারিবে কি না এই ভয়। রেণু বলিল, 'সে নিজে চাহিলে পারিবে না'। যাহার কাজ তাহার ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলাইলে খুবই সম্ভব। রেণু তাহার নিজের কথা বলিল। পুস্তকগুলি ছাপাইবার জন্য ২ বীঘা কাগজ donation সে সংগ্রহ করিতে পারিবে বলিয়া আশা করে। সে রবিবার সকালে আমার সঙ্গে দেখা করিয়া রেণুকে সঙ্গে করিয়া 'জ্যোৎস্না' বলিয়া কোনও একটী মহিলার কাছে যাইবে। জওহরলাল আজ পার্লামেণ্টে পররাষ্ট্রনীতির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং যাহা রেডিওতে আজ সন্ধ্যায় প্রচারিত হইয়াছে, তাহা ভারতীয় সাধনারই প্রকাশ। আমরা সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত থাকিব—ভাগবতের ভাষায় প্রথমানবপু হইব—অথচ আক্রমণ করিব না। পাকিস্থান যে আগুন নির্ব্বাণ করিয়াছে, তাহাই ঘুরিয়া গিয়া তাহাকে আঘাত করিবে, পুড়িয়া মারিবে। ভারতের সাধনা অম্বরীষের সাধনা, পাকিস্থানের সাধনা দুর্ব্বাসার। অবস্থাও তাহার দুর্ব্বাসার মত হইবে।

১৭ই মার্চ

সকালে গীতার প্রুফ দেখিয়া আফিসে যাই। রেণুও আমি ১০৸০ টায় বাহির হই। রেণু প্রেসে যায়। সেখানে ৪ টারও পর পর্য্যন্ত থাকে। ইহার মধ্যে আমি একবার ফোন করিয়া জানাই যে গীতার বেন রিপ্রিণ্ট করা হয়। ৪ টার পর রেণু এখানে আসে। সে একটু আগে আফিসে যায়। পাবলিসিটি ফোরানের সিদ্ধেশ্বর বাবু জানাইয়া যান যে, নমিতার খুব অসুখ হওয়ায় সে আফিসে আসে নাই। এখানে যে আসিবার কথা ছিল, তাহাও আসিবে না।···

হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধ-সাময়িকীর প্রুফ দেখা শেষ করি। রেণু সকালে শশিবাবুর ওখানে যায় বুদ্ধদেব সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধের জন্য।···চন্দুতে গরম ভাতের সেক রেণু দিয়া দেয়। বর্ত্তমান ভাষা সম্বন্ধে কৃপালনীর বিবৃতিটী উপযোগী। ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে পাকিস্থানের আস্টে পিষ্ঠে যোগ; হিন্দু-বিতাড়ন করিলেই কি সমস্যা মিটিবে? যোগ কাটিবার বিরুদ্ধে কাজ করিতেছে যে প্রকৃতি। হয় তাহাতে সহযোগ করিতে হইবে, নয় তাহাকে পাকিস্থানেই খোয়াইতে হইবে। যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুতেই সে মীমাংসা দেখে না। এমনই জটিলতার সৃষ্টি সে করিয়াছে এবং তাহার সমুখ করিবারও আর সময় নাই। যতই দিন যাইতেছে, সে অন্ধকার দেখিতেছে। তাই সে ভারতকে খোঁচাইয়া তাহাকেই যুদ্ধে নামাইতে চাহিতেছে। ভারত যুদ্ধ করিবে না, সে নিজের ক্ষেত্রে নিজে স্থির থাকার জিতর দিয়া যুদ্ধ ঠেকাইবে। যুদ্ধ তো বাস্তবিক পক্ষে আরম্ভই হইয়াছে, যদিও তাহা ঘোষিত হয় নাই। আমার করিবার পথ যতই রুদ্ধ হইতেছে, ততই মাথা গরম হইতেছে। হিন্দু মারিয়া ও তাড়াইয়াও এবার কিছু আদায় হইল না। মার দিয়া 'আদায়' করাই উদ্দেশ্য। এবার বোধ-হয় মারিবার জন্য মারে নাই। এ হিসাবে উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়াছে।·····।

রেণু ৮টার মধ্যে প্রেস, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, বিশ্ব-বিদ্যালয় ইত্যাদিতে যাইবার জন্য বাহির হইয়া যায়। আমি ৯।০টার পর আফিসে যাই ডাক দেখিবার জন্য। ···রেণু কলিকাতা হইতে ফেরে ১টার পর।·· কে একজন

ঢাকা-আগত ব্যক্তি বলিয়াছে, ঢাকায় সমস্ত মন্দির ধ্বংস করা হইয়াছে। ভগবানের উপর আর বিশ্বাস থাকে না। নীলুও লিখিয়াছিল, অসুরদলনী কই?—অসুরদলনী আজ অসুরদলিতা। এই জন্যই হিন্দু পৌত্তলিক। 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি'—এই মন্ত্রানুযায়ী অসুরদলনীর উপাসকের অসুরদলনী হওয়া উচিত ছিল। ২।১টী মেয়েও যদি এলোকেশে উলঙ্গিনী বেশে অস্ত্র ধারণ করিয়া দাঁড়াইতে পারিত, অসুরদলন কি হইত না? আকাশ হইতে কোনও অসুরদলনী আর নামিবে না। বোল্‌চী হইয়াই বাঁচিতে হইবে। ইহাই যুগধর্ম; সাজিয়া গুজিয়া মেয়েরা আজ আর ঐ দুর্যোগের ভিতর আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। এইরূপ সাধিবাই তো চাই।···। সন্ধ্যার পর রামগোপাল আসে: সে সামরিকীটা পড়ে

সকালে কেনোপনিষদের ৩য় খণ্ডের ২য় প্রুফ দেখি, আফিসে যাই। প্রতিভা ১০৪০টার পর গিয়া প্রেসে দিয়া আসে। বৈকালে ৫টার পর গিয়া আবার ঐটী নিয়া আসে এবং কেনোপনিষদের বাকী প্রুফগুলি দিয়া আসে। প্রতিভা আজ রেণুর বাসায়ই দুপুরে ও রাত্রিতে খাইল ও থাকিল। রেণু আজ সকালে নীহারের বাসায় গিয়া এ্যান্টিক ৯ দিয়া প্রেসে পাঠাইয়া দিবার কথা বলিয়া আসিয়াছিল, পরে আর কোথায়ও রেণু বাহির হয় নাই। ···সব দিক বিচার করিয়া যখন পথের সন্ধান পাওয়া যায় না, তখন বিশ্বশক্তি ও ভগবানের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়। তখনই বিশ্বাসের স্থান। বিশ্বের ফাঁক দিয়াই তখন পথের খবর নামিয়া আসে। একান্ত বিচার বা একান্ত বিশ্বাস বাস্তব জীবনে অচল।···বিচার আর চলে না; ঠাকুরকে ও তাঁহার অভয় বাণীকে বিশ্বাস করিয়াই পড়িয়া আছি। 'ভয় কি? টেনে তুলব'—ইহাই আমারও ভরসা: সমস্ত বিপদেও তো তিনি কোলে করিয়া রাখেন—ইহাই ভরসা। রাত্রি ৮৪০টার পর আশ্রমে ফিরি।

২১শে মার্চ

সকালে···আফিসে যাই। প্রতিভা আসে ৮৪০টায়। আমি ১০টার পর চলিয়া আসি। ১২টার পর গ্রাহকের পত্রিকা সতীনাথ পোষ্ট করিয়া দিয়া আশ্রমে খাইতে আসে। ৪৪০টার পর ২য় ফর্মা যায়। প্রতিভা আজ দুপুরে ওখানে যায়। নীহার প্রেসে কাগজ পাঠাইয়াছে, নমিতার আফিস ফেরত আসার কথা ছিল। তাহার জন্য আমরা অপেক্ষা করিতেছিলাম।···অপর কোন দিন আসিবে।·····একটা স্টেট (পাকিস্থান) যে এমন দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে পারে, তাহা কল্পনার অতীত। রেলে ছয় আনার টিকিট ২০৲ টাকা। লুট, সর্বক্ষেত্রে লুট। এ রাজ্য তো গিয়াছে, তাই এই দুর্বুদ্ধি।···বাটীর বাহির হইতেই বরদা রায়ের সঙ্গে দেখা। তাহার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে সতীশ মুখার্জী রোডের মোড় পর্য্যন্ত যাই। যতটুকু পারিলাম, দেহপ্রাণমন দিয়া ঠাকুরের সেবা করিয়া গেলাম, ইহাই তৃপ্তি। তাঁহার দর্শন ও জীবন বিশ্বের সামনে কিছুটাও তো তুলিয়া ধরিতে পারিতেছি, ইহাই আমার আনন্দ। দুনিয়া কবে তাঁহাকে নিবে, নিবেই কি না, সে আশা আমি কিছুই করি না, তবে 'দিয়া যাইতেছি'—এই দিতে পারার আনন্দ আমার আছে, তাই আজও পথ চলিতেছি। মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়া

ভাগবত আস্বাদন—ইহা যে বড় বস্তু। জীবনের বাহিরেই সকলে চায়। জীবনবল্লভকে কেহ চায় না।

২৩শে মার্চ

সকালে আজ আর বাহির হই না, সাইকোএনালিসিস হইতে 'Crowd-mind'-এর সম্বন্ধীয় লেখাটা পড়ি। 'Crowd-mind'-এর তিনটী characteristics আছে: (১) Delusion of fixed ideas, (২) Delusion of grandeur, (৩) Delusion of persecution। মুসলমানদের মধ্যে এই crowd mind খুব প্রবল।... নমিতা ৬টার পর আসে। ৮টার কিছু পর যায়। শরীর তাহার ভাল নয়। তাহাকে K. S. 12×, C. P. 6× খাইতে বলা হইল।..

২৪শে মার্চ

আজ হরতাল হয় নাই, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'No Hartal' ঘোষণা করেন। ৮ টায় শিশির আসে। গ্রামে তাহাদের গোলমাল, স্থানগত্তে কায়ক্লিষ্ট। হিন্দুগণ মুসলমানদের শেষ করিবার জন্য সচেষ্ট, তাহাদের গ্রামের এক দলও এই জন্য মাতিয়া উঠিয়াছে। কি করা কর্তব্য তাহাই জানিতে আসিয়াছে। যাহারা মারিতে চায়, তাহারাও 'বিকৃত' হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুর চরম লাঞ্ছিত অবস্থায় এ প্রতিক্রিয়া আসিয়াছে, ইহা স্বাভাবিক। ইহাদের সঙ্গে যাদাহুবাদ করিয়া ফল নাই। এ দিকে সরকার হিন্দুমুসলমানে ভেদ করিতে পারে না। এই দুই দিকের মাঝখান দিয়া এক দল মানুষের ঠাণ্ডা মস্তিষ্ক লইয়া কাজ করিতে হইবে। গ্রামের মুসলমানদের পার্শ্ববর্তী মুসলমানপ্রধান গ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। শিশিরকে আমার 'সাময়িকী' পড়াইয়া দিলাম। সে একখানা নিয়া গেল। আফিস পর্যন্ত তাহাকে নিয়া গেলাম। রেণু ১১টার কিছু আগে বাহির হয়, পোস্টাফিস হইয়া হেরম্ববাবু ও ভাইজারের সঙ্গে দেখা করে। হেরম্ববাবু বাসা পর্যন্ত আসে। রেণুর সঙ্গে কথাবার্তা হয়, সাময়িকী পড়িয়া শুনায়। হেরম্ববাবু বলে উহা pious wish, উহা সাহিত্য—politics নয়। অরবিন্দের politics-এ ইংরেজ দেয় আস্থা, যুদ্ধের সময় war fund-এ ১০০০৲ টাকা দিয়াছিলেন। ইহারা গান্ধী-বিরোধী। ৩টার পর শ্যামবাবু বিবেকানন্দ সোসাইটির তরফ হইতে ২রা এপ্রিলের নিমন্ত্রণপত্র দিয়া যান। তাহাকেও সাময়িকীটা পড়াই। ইহার মধ্যেই ধীরেন ব্যানার্জী আসেন। রেণু ও প্রতিভাও তখন আসে...ভারতবর্ষ আজ স্বতন্ত্র; সে যদি তাহার স্বাভাবিক কৃষ্টির ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে, তবেই তাহার স্বাতন্ত্র্যের অর্থ হয়। বিশ্বে তাহার দিবার আছে, ইহা এ দেশের মানুষ বলিয়া আসিয়াছে। তাহাকে পাশ্চাত্যের 'দ্বন্দ্ব-পাশবিদ্ধ' politics নিলে তো চলিবে না। তাহার পর হাজার বৎসরের এই সমস্যা। বিশ্ব আজ 'One-world'ও চায়। ভারতবর্ষ ছাড়া আর কাহারও দ্বারা ইহা সম্ভব নয়। এই আবেষ্টনে ভারতের পক্ষে যে সাধনা দরকার তাহাই সাময়িকীতে দেওয়া হইয়াছে।

২৫শে মার্চ

সকালে Psycho-analysis হইতে 'Crowd Mind—এর বিষয়টা আরও পড়ি। 'Wherever the crowd-mind takes possession of a group of reaction in which all sensible discrimination and third alternatives are brushed aside, and everything is just 'utterly utter'—wholly good or wholly bad. Always the trance-motive of group behaviour is disguised. Always there is a propaganda of rationalisation by means of which the unconscious motives are made to appear as devotion to lofty patriotic and moral principles.' P 187-88। রেণু ৮।০টায় নলিনী-বাবুর সঙ্গে গ্রাহকদের টাকা আদায়ে বাহির হয়, ৩টায় টাকা আদায় করে। ১১৷০ টায় ফেরে। মাখন-বাবু ১২টার কিছু আগে আসে। খাওয়া সারিয়াই

এখানে আসিয়া পড়ে। প্রতিভাও আসে। আজ 'কেনোপনিষৎ' বাঁধা হইয়া ২০ খানা আসিয়াছে। ১ খানা ঠাকুরকে নিবেদন করা হয়। সতীনাথ আফিস হইতে লইয়া আসে। ৩।৩০টায় আমরা মঠের বাসায় যাই। নীহারকে ১ খানা কেনোপনিষৎ দিয়া আসি।...আমি বিকাশের মঠে যাই। সেখান হইতে প্রায় ৮টায় ফিরি।...

২৬শে মার্চ

সকাল ৮।৩০টায় মঠে যাই। মঠে ঢুকিবার মুখে দেখি রেণু মঠ হইতে বাহির হইতেছে। নগেনবাবু প্রভৃতির সঙ্গে কথাবার্তা হয়। ১০।৩০টায় সময় জিতেন কুণ্ডারী আফিস ঘুরিয়া রেণুকে না পাইয়া মঠে উপস্থিত। প্রায় ১১।৩০টা পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে ঢাকার ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাহাকে চৈত্রের উদ্বোধন ও কেনোপনিষৎ ১খানা দেই। জিতেনের সঙ্গে ঠাকুর মন্দিরে যাই ও কিছু পরেই বাহির হইয়া আসি। জিতেন স্ত্রী-পুত্র লইয়া চলিয়া আসিয়াছে। ১২টার মধ্যে রেণু এখানে আসে, প্রতিভা আসে ২টার মধ্যে। আমরা নন্দরাণী বসু এবং মুই-পদ্মরাণী সহ ৩টার পর মঠে রওয়ানা হই। সেখানে ৮টা পর্য্যন্ত রাখালদা, নগেনবাবু, ক্ষিতীশ চক্রবর্ত্তী ও সুধাংশু ডাক্তার প্রভৃতির মধ্যে বসিয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গ হয়। গিয়াই দেখি যে লালমোহন বসু ও নন্দলাল বসিয়া আছে। নন্দলাল ও লালুকে ১খানা কেনোপনিষৎ, নন্দলালকে ১খানা চৈত্রের উদ্বোধনও দেওয়া হয়। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে লালুর মাথা ঠিক নাই, কিছুই সে পড়িতে পারেনা বলিল। আমি বলিলাম—বর্ত্তমান সময়েই সব চেয়ে বেশী ধৈর্য্য ধরিবার প্রয়োজন। ঠাকুর উহাকে নিজ পরিচয় দিতে গিয়া 'নিত্যগোপাল বসু ওরফে জ্ঞানানন্দ অবধূত জন্মদাতা পিতা অন্নেদয় বসু' প্রভৃতি লিখিয়াছেন। একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে পরিচয়ে জন্মদাতার উল্লেখ নিতান্তই বিসদৃশ—কেন ঐরূপ পরিচয় দিলেন সেই সব কথা, তাঁহার দর্শন প্রভৃতি অনেক কিছু আলোচনা হয়। সেবানন্দ ঠাকুরের মিষ্টিপ্রসাদ আনিয়া দেয়। রেণুর সঙ্গে অনেকের আলাপ হয় আমাদের দর্শন সম্বন্ধে। একটী নূতন মেয়ের সঙ্গেও আলাপ হয়, সে তাহার সঙ্গে আফিস পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। আমি ৮।৩০টার পর আফিসে আসি। ৯টার পর আশ্রমে ফিরি।...তুপুরের প্রসাদ মঠে কোনও গুরুভ্রাতাই পান নাই। গোলাপদিদি ঠাকুরকে ৪টী পান সাজিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, হাগা-মোতা অবস্থায় থাকেন বলিয়া তাহাকে তাহা দেওয়া হয় নাই। হায়, প্রাণধর্শনের মূর্ত্ত বিগ্রহ অবধূত নিত্যগোপাল! "ক্লীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাম্। নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।"—রাখালদার কাছ হইতে লিখাইয়া আনিলাম।

সকালে বৈশাখ মাসের জন্ত 'মল, ভিড় ও উচ্ছৃঙ্খল জনতা' প্রবন্ধটী লিখিতে আরম্ভ করি।...রেণু আজ মন্মথ রায়, নিখিল রায়, সেপার বর্কেলোয়ের কাছে যায়। ২টার পর ফেরে। প্রতিভা তাহার একটু আগেই আসে। প্রতিভা কঠোপনিষৎ নকল করে ও প্রবন্ধটা নকল করে। ৫টার পর মালতী আসে। তাহার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হয়।...ইতিমধ্যে সতীনাথ আসে। ২ দিনের পরীক্ষা বন্ধ হয় নাই।...এবারকার সামরিকী হিন্দু-মুসলমান সমস্যা মন্মথ রায়ের খুব পছন্দ হইয়াছে। তিনি বলেন—সরকারের উচিত ইহার ১০।১২ হাজার রিপ্রিন্ট করিয়া বিতরণ করা। সতীশ গুহের প্রাণেও ইহা সাড়া দেয় বলিয়া জানাইয়াছে। তবে আরও কিছু practical suggestion থাকিলে ভাল হইত। সুধীর দাশগুপ্তেরও ভাল লাগিয়াছে। তবে immediate কিছু সে চায়।...

২৮শে মার্চ

ক্রমশঃ

শিল্পীয় মনোবিদ্যা

॥ ডক্টর সুরুৎচন্দ্র মিত্র ॥

বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করে পরীক্ষামূলক ভাবে মনোবিদ্যার চর্চা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আরম্ভ হয়। ওয়েবার (Weber), হেল্‌মহোলট্‌জ (Helmholtz) প্রভৃতি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ মনের ক্রিয়াকলাপের ধারা ও দেহের সঙ্গে তার সম্বন্ধ বিষয়ে অনেক মূল্যবান তথ্য বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পরীক্ষা করে তার আগেই তাঁদের অর্জিত জ্ঞান লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সেই সমস্ত তথ্য আরও বিশদভাবে আলোচনা করবার উদ্দেশ্যে মনের যাবতীয় কার্য্যকলাপ বৈজ্ঞানিক রীতিতে অধ্যয়ন করবার জন্যে ভিল্‌হেল্‌ম ভুণ্ট (Wilhelm Wundt) ১৮৭৯ সালে লাইপজিগ্‌ (Leipzig) বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিদ্যার প্রথম পরীক্ষাগার স্থাপন করেন। স্থাপন করবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ইউরোপ এবং আমেরিকা থেকে বহু জ্ঞানী, গুণী, জিজ্ঞাসু পণ্ডিতগণ ঐ পরীক্ষাগারে এসে ভুণ্ট্‌-এর নির্দ্দেশমত অথবা নিজেদের পছন্দমত নানারকমের গবেষণায় রত হন। শীঘ্রই মনোবিদ্যার বহুল তথ্য সংগৃহীত হল এবং আরও অনেক নূতন প্রশ্নেরও উদয় হল। আগন্তুকরা এখানে অধ্যয়ন শেষ করে স্ব স্ব দেশে ফিরে গিয়ে মনোবিদ্যার পরীক্ষাগার স্থাপন করলেন এবং নানারূপ গবেষণা চালাতে লাগলেন।

একদিকে যখন মনের ক্রমপরিণতি, তার কাজের প্রেরণা, ধারা প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হচ্ছিল, অন্যদিকে তখন আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটছিল—যাকে বলা হয় শিল্পীয় বিপ্লব—Industrial Revolution। পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা প্রভৃতি অন্যান্য বিজ্ঞান বহুরকমের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য আবিষ্কার ক্রমাগত করে যাচ্ছিল। লোকে ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে লাগল, এইসব আবিষ্কারগুলি কর্মজীবনে প্রয়োগ করতে পারলে মানুষের জীবন কত বেশী আরামপ্রদ করা যায়, কত দুঃখ কষ্ট লাঘব করা যায়, কত রোগ ভোগ থেকে মানুষকে বাঁচান যায়। ব্যবসায়ীরা তাই এই সব আবিষ্কার কাজে লাগিয়ে নানারকম যন্ত্রপাতি উৎপাদন করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, ঔষধপত্র তৈয়ারী করতে লাগলেন। শিল্পক্ষেত্রে একটা তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হল—সবলেই চেষ্টা করতে লাগলেন কম সময়ে, কম খরচে, বেশী দ্রব্যাদি উৎপাদন করতে। এইসব জিনিসের চাহিদা ক্রমেই বাড়তে লাগল। বহু রকমের বহু কারখানা প্রতিষ্ঠিত হল: কারখানায় দ্রব্যাদি উৎপাদন করতে হলে চাই অর্থ, ভাল যন্ত্রপাতি ও বহু কর্মী। সবেরই সমাবেশ হল কিন্তু ক্রমশ কতকগুলি সমস্যা দেখা দিতে লাগল। অনেক ক্ষেত্রেই ভাল যন্ত্রপাতি এবং বহু কর্মী থাকা সত্ত্বেও উৎপাদনের হার যে রকম হওয়া উচিত তা যে হচ্ছিল না, এ ব্যাপারটা শিল্পপতিদের নজরে পড়ল। তাঁদের ধারণা হল—কর্মীরা উপযুক্ত নয় বলেই এ রকম হয় সুতরাং অনবরতই তাঁরা কর্মী ছাটাই ও বদল করতে লাগলেন। অবস্থার উন্নতি কিন্তু তাতে কিছুই হল না। ক্রমশঃ শিল্পপতিদের দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিবর্ত্তন হতে লাগল। কর্মীরা কেন আশানুরূপ উৎপাদন করতে পারছে না সে বিষয় অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, এটা তারা অনুভব করলেন। শিল্পক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি, মালমসলা, অর্থ প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া যেমন প্রয়োজন, কর্মীদের শক্তি সামর্থ্য, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পরস্পরের প্রতি এবং উপর-ওয়ালাদের প্রতিও তাদের মনোভাব,—প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়াও ঠিক তেমনই যে প্রয়োজন, এটা তাঁরা অবশেষে উপলব্ধি করলেন। তখন থেকেই শিল্প ও মনোবিদ্যার যোগাযোগ আরম্ভ হল। শিল্পক্ষেত্রে মনোবিদ্যা কত রকমে সাহায্য করতে পারে ভুণ্ট্‌এর

ছাত্র হিউগো মুনষ্টারবার্গ (Hugo Miunsterbarg) প্রথমে বিশদভাবে তা দেখিয়েছিলেন। তাই তাঁকে শিল্পীয় মনোবিদ্যার জনক বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। অবশ্য তিনি যে সমস্ত সমস্যা সম্বন্ধে কাজ ও আলোচনা করেছিলেন এখনকার সমস্যাগুলি তার চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী এবং আরও জটিল। কিন্তু পথিকৃৎ যে তিনি, তা সকলেই স্বীকার করেন।

শিল্পীয় মনোবিদ্যার প্রথম কাজই হল উপযুক্ত কর্মী নির্বাচন। সকলেই সব কাজ করতে পারে, এই যে ধারণা শিল্পপতিদের—শুধু তাঁদের কেন, জনসাধারণেরও মনে ছিল,—সেটা যে একেবারেই ভিত্তিহীন, Galton, Cattell প্রভৃতি মনোবিদ্‌দের গবেষণার ফলে তা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়ে গেছে। কোন কাজ করতে গেলেই কয়েকটি বিশেষ মনোবৃত্তি ও শক্তি থাকা প্রয়োজন। আইন ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করতে হলে অন্যান্য গুণাবলীর সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির যথেষ্ট তীক্ষ্ণতা থাকা প্রয়োজন। এখন সকলেরই বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতা একরকম নয়; সুতরাং চর্চা করলেই সকলেই আইন ব্যবসায়ে খুব উচ্চস্তরে উঠে যেতে পারবেন, এ আশা করা সমীচীন নয়। শিল্পক্ষেত্রে কোন একজন কর্মীকে বা কর্মীসংঘকে কোন একটি বিশেষ কাজ করতে হয়। এখন সেই কর্মীর বা কর্মী-সংঘের সেই কাজ করবার শক্তি আছে কিনা সেটা আগে থেকে যদি জানতে পারা যায় তাহলে উপযুক্ত লোক নির্বাচন করে অনেক অবথা অর্থব্যয় ও অপ্রীতিকর অবস্থার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। একজনের এই বিশেষ কাজটি করবার ক্ষমতা হয়ত নেই কিন্তু অন্য কোন কাজ করবার ক্ষমতা তার খুব বেশী আছে। সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে জোর করে তাকে এই কাজেই লাগালে তার শক্তির অপচয় হয়। সেটা ত একেবারেই কাম্য নয়।

সৌভাগ্যবশতঃ মনোবিদ্যার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বহুবিধ অভীক্ষার (mental tests) সৃষ্টি হয়েছে—যার প্রয়োগের ফলে অনেকখানি নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যায় যে প্রার্থীদের মধ্যে 'খ'-এর অপেক্ষা 'ক'-এর সাফল্য অর্জন করবার সম্ভাবনা বেশী। প্রথমে কাজটি বিশ্লেষণ করে সেই কাজ করতে গেলে কি কি শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি থাকা প্রয়োজন সেটা অনুসন্ধান করতে হবে। একে বলে Job analysis-এর কাজ। তারপর প্রার্থী-দের মধ্যে ক-এর ঐ সব প্রয়োজনীয় বৃত্তি কি পরিমাণ আছে অভীক্ষার সাহায্যে তা নির্ণয় করতে হবে। একে বলে Vocational selection। এইভাবে কর্মী নির্বাচন করলে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন কিছু পরিমাণে যে বৃদ্ধি পাবে তা নিশ্চয়ই আশা করা যায়। সেই জন্যেই পাশ্চাত্ত্য দেশে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানসমূহে এখন এইভাবেই লোক নির্বাচন হয়ে থাকে। আমাদের দেশে শিল্পের ক্রমোন্নতি এবং ক্রমবিস্তার হচ্ছে। শিল্পীয় মনোবিদ্যায় বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত মনোবিদ্‌-এর সংখ্যাও, যথেষ্ট না হলেও, খুব কম নেই। দুয়ের যোগাযোগ হলে ভবিষ্যতে সুফল পাওয়া যাবে আশা করা যায়। কোন কর্মীর উপর অভীক্ষা প্রয়োগ করে, সে কোন্ কাজ শিখলে তার উন্নতি ও সাফল্য বেশী হবার সম্ভাবনা আছে—এই পরামর্শও আজ তাকে দেওয়া যায়। এই কাজকে বলা হয় Vocational Guidance।

অভীক্ষা প্রয়োগ করে উপযুক্ত লোক নির্বাচন করা শিল্পীয় মনোবিদ্যার একটা প্রধান কাজ। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি করবার এইটেই একমাত্র উপায় এটা মনে করে নিলে ভুল হবে। কারণ অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে যে, কর্মীরা পরস্পরের প্রতি কি ধরণের মনোভাব পোষণ করে, সেটারও যথেষ্ট প্রভাব আছে তাদের কর্ম চেষ্টার ওপর। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও একটি লোককে যদি প্রত্যহই এমন একদল লোকের সঙ্গে কাজ করতে হয় যাদের কাউকেই সে, যে কোন কারণেই হোক, পছন্দ করেনা। তা হলে নিশ্চয়ই তার উৎপাদন তার ক্ষমতানুযায়ী হবেনা। একটা অপ্রীতিকর মনোভাব নিয়ে কাজে যথাযথ ভাবে মনোযোগ দেওয়া যে যায় না, একথা আপনারা নিশ্চয়ই নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সহজেই মেনে নেবেন। কাজেই কর্মীদের পরস্পরের প্রতি মনোভাব কি রকম, কর্তৃপক্ষের সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন

কি করলে অবস্থার উন্নতি হতে পারে সে সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং তার উপায় উদ্ভাবন করা খুবই বাঞ্ছনীয়।

প্রত্যেক লোকেরই পছন্দ অপছন্দ একটা মনোভাব আছে। কোন একটা কাজ হয়ত একজন খুব পছন্দ করে আগ্রহের সঙ্গে করে, আবার অন্য একটা কাজ সে একেবারেই পছন্দ করে না, করবার তার কোন আগ্রহই আসে না। কোন কর্মীকে যদি প্রত্যহ এমন কাজ করতে হয় যাতে তার আদৌ আগ্রহ নেই, তা হলে উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও, সে কাজ সে ভাল করে করতে পারবে না, এটা সহজেই বোঝা যায়। যার ঐ কাজে আগ্রহ আছে তার তুলনায় এর উৎপাদন কমই হবে। উৎপাদনের হার কর্মক্ষেত্রের পরিবেশের উপরেও নির্ভর করে আলো, বাতাস, তাপমাত্রা প্রভৃতিরও এমন একটা মান আছে যাতে স্বচ্ছন্দে লোকে কাজ করতে পারে; অন্যথায় কাজে বিঘ্নের সৃষ্টি হয়, উপযুক্ত পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে আবার কাজের ব্যবস্থা এমন যে কর্মীমাত্রকেই কতকটা অযথা পরিশ্রম করতে হয়। কোন কর্মীকে হয়ত ক্ষুদ্রাকার এক একটি লৌহচক্র নিয়ে কিছু কাজ করতে হয়, যাতে তার দু'মিনিট করে সময় লাগে। কিন্তু প্রত্যেকবারেই এক একটি লৌহচক্র আনতে যদি তাকে দশ ফুট পথ যাতায়াত করতে হয়, তা হলে অনর্থক সময় নষ্ট ত হয়ই, উপরন্তু কর্মী শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। লৌহচক্রগুলি যদি তার হাতের কাছে থাকত তাহলে তার উৎপাদন আরও অনেক বেশী হতে পারত, ক্লান্তিও তার অত শীঘ্র আসত না।

সকলেরই বোধ হয় একটা ধারণা আছে যে, কর্মীরা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চায় শুধু বেশী মজুরি আর কম কাজ। কিন্তু এ ধারণা কেবল আংশিক ভাবে সত্যি। বেশী মজুরি, কম কাজ নিশ্চয়ই তারা চায়, কিন্তু ঐ দুটিই যে তাদের একমাত্র দাবী একথা একেবারেই ঠিক নয়। কারখানার অধিকারী যিনি, তিনি যেমন মানুষ, কারখানার সামান্য কর্মীমাত্রও ঠিক তেমনই একজন মানুষ, অন্যান্য সকলের মত তারও অনেক রকম মানসিক বৃত্তি, আশা আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, প্রকোপ প্রভৃতি আছে। কারখানায় প্রবেশ করবার সময় সে সেগুলিকে বাইরে রেখে ত আসে না, সঙ্গে নিয়েই আসে। কারখানার কাজের এবং পরিবেশের ক্ষেত্র দিয়ে সেগুলিকে চরিতার্থ করবার সুযোগ সে চায়। কিছুকাল আগেও কর্তৃপক্ষরা কর্মীদের কারখানার যন্ত্রপাতির সামিল বলেই মনে করতেন। তাদের ইচ্ছা আশা আকাঙ্ক্ষার কোন খবরই তাঁরা রাখতেন না, রাখবার প্রয়োজনও উপলব্ধি করতেন না। সৌভাগ্যবশত এই মনোভাবের এখন যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। কর্মীরা প্রথম চায়, ব্যক্তভাবেই হোক, আর অব্যক্তভাবেই হোক, যে, কর্তৃপক্ষরা তাদের মনুষ্যত্বের দাবী স্বীকার করুন, তাদের সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করুন। এইটেই তাদের প্রধান দাবী। তারা কাজের ক্ষেত্র দিয়ে কি কি চায় সে সম্বন্ধে অনেক মনোবিদ্, পাশ্চাত্যে এবং আমাদের দেশেও, ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করেছেন। খুব অল্পসংখ্যক কর্মীই, বেশী মজুরি, কম কাজকে প্রথম স্থান দিয়েছে তাদের চাওয়ার তালিকায়। অনেকে প্রথমেই চেয়েছে যে, কাজের উন্নততর পন্থা সম্বন্ধে তারা যদি কিছু বলে, কর্তৃপক্ষ সেটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অগ্রাহ্য না করে, অবহিত হয়ে শুনুন এবং বিবেচনা করুন। কেউ প্রথমেই চেয়েছে কাজের স্থিরতা, নিশ্চয়তা; আজ কাজে আছি, কাল থাকব কিনা তার নিশ্চয়তা নেই এটা অত্যন্ত অসহনীয় অবস্থা; এ রকম অবস্থায় লোক কাজে কিছুতেই পুরোপুরি মন দিতে পারে না। মানুষ মাত্রই, সমাজে যে তার একটা স্থান, একটা মর্য্যাদা আছে এটা অনুভব করতে চায়। প্রত্যেক কর্মী বিশাল শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, বহু কর্মীর মধ্যে তারও যে একটা বিশিষ্ট স্থান, মর্য্যাদা আছে সেটা অনুভব করতে চায়। করবার সুযোগ পেলে সে সুখে স্বচ্ছন্দে এবং প্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারে। না পেলে সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন কাজের সঙ্গে, অন্য কর্মীর সঙ্গে, উপরওয়ালাদের সঙ্গে মানিয়ে চলা তার পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়। এবং এমন সব কাজে তখন সে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে যেটা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে, বৃহত্তর সমাজের পক্ষে এবং অবশেষে

তার মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষেও বিশেষ ক্ষতিকর হয়ে ওঠে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনের কাজে মালমসলা, যন্ত্রপাতি, অর্থ ছাড়াও মানসিক ঘটনাবলীর প্রভাব যে কত বেশী এবং কত রকমের তার সামান্যমাত্র আভাস দেওয়া হল। সুখের বিষয়, এই প্রভাব আজ সবলেই স্বীকার করে নিয়েছেন, তাই শিল্পীয় মনোবিজ্ঞার উন্নতি এবং প্রসার বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশেও এই মনোবিজ্ঞার চর্চার যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা হলে আমাদের পক্ষে মঙ্গলই হবে।

ঋণ-শোধ

(রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে)

॥ শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ ॥

তাহলে কি আজ শুধু মেকি সুরে গান গেয়ে কর্তব্য সমাধা,
কটি ম্লান মালা গেঁথে, বাঁকা হয়ে সখি-সখি নৃত্যের মহড়া ?
তাই যদি কবি-কন্যা, আমাদের অসুস্থ রক্তের বিধাতা
আমাদের খুন করে মৃত্যুর ঘুমের মত বিষের পসরা
ক্ষীণ বক্ষ মেরুদণ্ডে তাহলে ছড়িয়ে যায়। সাগরী জাতির
ইতিহাস মুছে যাক প্রশ্ন কোনো সভ্যতার জিজ্ঞাসার ঘরে—
কোনো ক্ষতি নেই তাতে : এই সব তিরিশ টাকি
যৌন-যুযুৎসুর
চিঁহি চিঁহি প্রশস্তির অসহ্য ভাষণ থেকে রবীন্দ্রনাথের
অমরাত্মা মুক্তি পাবে—আমরাও বেঁচে যাব। প্রহরে প্রহরে
এ যন্ত্রণা বিবর্ণ বাঁচার ঘরে ! যন্ত্রিমুখ পাষাণেরই হাতে
কীটে-কাটা কান্নার বিলাসী হৃদয় নিয়ে অন্তহীন রাতে
আবার ঘুমিয়ে যাব, বাঙালীর বড় মন ধুলোয় বিস্তৃত।

সেদিনো শুনিনি আমরা সুখে-দুঃখে সমতার সুলভ দর্শনে
নিজেকে ভুলিয়ে রেখে, মৌতাতী মুক্তির মূল্যে আদিম
নেশার
দায়ভাগে দীর্ণ বলে বুঝিনি তোমার মন—
কী তোমার পণ—,
বুঝিনি তোমার স্বপ্ন কত বেদে গড়ে ওঠে, মুকুল-মননে
কত বড় আকাশেরে বুকে নিতে চেয়েছিলে, কোন্ প্রার্থনায়
তাকে সাড়া দিয়েছিলে, শাশ্বত সূর্যের দিকে মুখ করে করে
কেন এত পথ হাঁটা ? তা নাহলে অতীপ্সার আরেক চেতনা
তোমার শিল্পের গাঢ়ে যে আবেগে জেগেছিল,
ঢেউয়ের পাহাড়
উদ্দাম কলরোলে দুঁসে দুঁসে উঠেছিল, সমুদ্র-বন্দনা
পাষাণের বুক ছিঁড়ে পথে পথে প্রত্যাশী বেদনার ঝড়ে
সঙ্গীতে শতধা হয়ে কেটে পড়ে—ভেঙে পড়ে প্রাণের প্লাবন
আকাশেরে খুঁজেছিল,—তুমি তার প্রতিশ্রুতি—
বাণীর বাহন।
যে কথা প্রাণের নীল ছায়ানাটো উদাত্ত প্রণয়ের স্বরে
মুক্তির প্রণাম আনে,—সত্তার সাগরে সেই স্বর্গের মৌক্তিক
তুমি, তুমি। তোমার ছুঁচোটে তাই বহ্নিক্ষুব্ধ ব্যথার
লিখিক।

বিভূতি-সাহিত্যে উদ্ভিদ প্রকৃতি

॥ শ্রীকেশব কুমার ভট্টাচার্য্য ॥

যদি আমরা কোনও মহৎ ও সৎসাহিত্য পর্য্যবেক্ষণ করি তো অতি সহজে, অতি স্বচ্ছন্দেই তার মধ্যে দেখতে পাই মানব জাতির বহু বিচিত্র রূপ, সূক্ষ্ম মানসিক প্রতিচ্ছবি, জীবনের স্বচ্ছ, স্পষ্ট, সামগ্রিক প্রতিভাস কত অনাবিল স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই না মূর্ত হ'য়ে উঠেছে! নেই এতটুকুও মালিন্য, বিন্দু পরিমাণ অস্পষ্টতা। দক্ষ শিল্পীর সৃষ্টিমন্ত্র তুলির টানে টানেই রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে এই মানব জীবন, জগৎ আমার বিশ্বপ্রকৃতি।

জগৎ ও জীবনের এই প্রাণবন্ত সার্থক রূপ সাহিত্যের মাধ্যমে অবলোকন ক'রে আমরা যেমনি ভাবমুগ্ধ হই, সেই অপ্রমেয়র অপরিমাণ বিশাল শক্তি ও সীমাহীন সৌন্দর্য্য প্রাণ ভ'রেই উপলব্ধি করি, ঠিক তেমনই শ্যামল, কোমল ধরণীর বুকে বিচিত্র বিরাট উদ্ভিদ প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য দর্শনে স্রষ্টার অপার, অসীম ক্ষমতা ও অপূর্ব্ব শিল্পসৃষ্টিতেও আমরা নির্বাক, নিঃস্পন্দ হ'য়ে যাই। যে কোন সৎসাহিত্যেই সেই জন্যে অনায়াসেই দেখি মানব জীবনের অভিব্যক্তি ও রূপায়নের পাশাপাশি উদ্ভিদ প্রকৃতির তাৎপর্য্যময়, নিগূঢ়, নিখুঁত রূপটি কত সুন্দর! কত গভীর! কত ভাবব্যঞ্জক! আমরা অনুধাবন করি উদ্ভিদ প্রকৃতি ও মানব জীবন পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবেই জড়িত। সাহিত্য জীবনেরই দর্পণ এ কথা অবিসম্বাদিত ভাবেই সত্য ও সর্বজন-গ্রাহ্য। এই মূল্যবান্ দর্পণে যেমন মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের বিভিন্ন ছবিই প্রতিবিম্বিত হয়—তেমনই ঠিক অনিবার্য্য রূপেই লতাগুল্ম, উদ্ভিদ প্রকৃতি স্বকীয় পরিবেশে স্বমহিমায়ই স্থান গ্রহণ করে। জীবন এবং সত্যকে অস্বীকার ক'রে যেমন সাহিত্য হয় না এই উদ্ভিদ প্রকৃতিকে বাদ দিলেও ঠিক তাই। যেন এর একটা তাৎপর্য্য আছে, অসীম মূল্য আছে। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত প্রকৃতি-বন্দনা বাংলা সাহিত্যে যদি কেউ ক'রে গিয়ে থাকেন তো তবে তিনি নিঃসন্দেহেই বিভূতিভূষণ। প্রকৃতিবাদ (Pantheism)-এর নিরলস, একনিষ্ঠ, তন্ময়চিত্ত সাধক রূপেই আমাদের সাহিত্যে তাঁর যুগান্তকর, গুরুত্বপূর্ণ আবির্ভাব। সে আবির্ভাব যেমনই গৌরবমণ্ডিত ঠিক তেমনই তাৎপর্য্যপূর্ণ। তাঁর জীবনব্যাপী সামগ্রিক সাহিত্য-কর্মকাণ্ডে দিবালোকের মতোই সুস্পষ্ট হ'য়ে আছে ধরণী-আশ্রিত অপরূপ রূপ-লাবণ্যমণ্ডিত এই উদ্ভিদ প্রকৃতিরই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, সুস্নিগ্ধ, সুমনোহর, সর্বব্যাপক রূপ-ভঙ্গিমা ও বিষয়বৈচিত্র্য। এর প্রথম ও প্রধানতম কারণটি হ'চ্ছে তিনি মনে প্রাণেই ছিলেন একজন অন্তরঙ্গ প্রকৃতি-প্রেমিক ও বিশিষ্ট ভ্রমণবিলাসী। একজন বিশিষ্ট দ্রষ্টা হিসাবেও সাধারণ অপেক্ষা তাঁর মূল্য অনেকখানিই ছিল। এর নিদর্শন পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর ভাব-কল্পনায়, নিবিড় রসানুভূতিতে, মৌলিক বিষয়বস্তুর পরি-কল্পনায়। তাঁর এই সৃষ্টিময়ী প্রতিভা অনেক সার্থক সাহিত্যেরই জন্ম দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—পথের পাঁচালী, আরণ্যক, ইছামতী, দৃষ্টি-প্রদীপ, দেবযান। এইগুলি তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভারই জলন্ত নিদর্শন।

মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি ও উদ্ভিদ প্রকৃতির মধ্যে যে একটা নিগূঢ় স্বাভাবিক সম্পর্ক বা ঐক্য বিদ্যমান আছে, তা তিনি অতি নিপুণ ভাবেই দেখিয়ে গেছেন। যাঁরা তাঁর সাহিত্য ভালভাবেই পড়েছেন তাঁরা এই বিষয়ে বিন্দু-মাত্রও আর অনভিজ্ঞ নন। মানুষের প্রত্যেকটি বহিরঙ্গ রূপান্তর, ভাবভঙ্গী, ক্রিয়াকর্ম নিয়তই সাদৃশ্য বহন ক'রছে প্রকৃতি-জগতেরই অন্তর্নিহিত ক্রিয়াকর্ম ও বিভিন্ন ভাব-ভঙ্গিমার সঙ্গে—যা বিভূতিভূষণ অতি স্বচ্ছন্দেই তাঁর

সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমি এই বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ সহযোগে বক্তব্যটি সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট ক'রেই দেখাতে চাই। 'কেদার রাজা' উপন্যাসে নায়িকা পরং সুন্দরীর সঙ্গে তার বান্ধবী কমলার কথোপকথনটি লক্ষণীয় 'পরতের যেমন স্নেহ হয় কমলার ওপর। স্নেহের সুরেই বলে—তাই চমৎকার দেখাচ্ছে তোমায় গন্ধরাজ—সত্যি—সত্যি বলছি। কমলার মুখে লজ্জার আভাস নেই, সে যে পথে পা দিয়েছে, সে পথের পথ-চারিণীরা লজ্জাবতী লতা নয়, বনচাড়ালের পাতা—টুসি দিলে নাচে।' (পৃঃ ২১৪) এখানে এই কটি কথা প্রকাশ ক'রেছে কমলার জীবনধর্ম ও স্বভাব চরিত্রের মূলগত বৈশিষ্ট্যটুকু। কমলাকে এই উপন্যাসে বার-বিলাসিনী রূপেই দেখানো হ'য়েছে। অল্পবয়সের তাগিদে তার দেহধর্মে লজ্জা, কুণ্ঠা, পবিত্রতা বলতে এখন আর কিছুই নেই। সব ধুলিসাৎ, সব বিবর্ণ। সে শুদ্ধ রমণীর দেহ-শুচিতা, নম্রতা, সরলতা সব কিছুই যেন পরিত্যাগ ক'রেছে তার নিদারুণ দুষ্ট ভাগ্যের নির্মম পরিহাসেই। তাই তাকে এখন বলতে পারা যায় না সতী কিংবা লজ্জাবতী লতা। লেখক তাই লজ্জাবতীর সঙ্গে তার জীবনধর্ম ও স্বভাব চরিত্রের তুলনা না ক'রে বনচাড়ালের পাতার সঙ্গেই সাদৃশ্য আনয়ন ক'রতে প্রয়াসী হ'য়েছেন। আর আমরাও আনন্দিত হ'য়েছি তাঁর এই সার্থক উপমা-উদাহরণে। অতোধিক বিমুগ্ধ হ'য়েছি উদ্ভিদ প্রকৃতির স্বভাব, স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর এই গভীর ধ্যানদৃষ্টি ও সম্পূর্ণ মৌলিক ভাব কল্পনার সরস উপস্থাপনায়। বেশ বুঝলাম, বনচাড়ালের পাতা যে একটুখানি টুসি দিলেই নেচে ওঠে, লেখকের সেই বিষয়ে কী গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও নিবীড় পরিচয়! ধ্যানবিশিষ্ট চিত্তেই ঐ বনচাড়ালের পাতার দিকে চেয়েই তিনি সহজেই চিনে নিতে পেরেছেন বারবণিতা কমলার স্বভাবজ হৃদয়-ধর্মটিকে। অতি স্বাভাবিকভাবেই তাই উদ্ভিদ প্রকৃতির সঙ্গে মানব প্রকৃতির সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

বিভূতিভূষণের অপর এক বিখ্যাত উপন্যাসেও আমরা দেখতে পাবো এই ভাবটিরই সুন্দর রূপায়ন। 'দৃষ্টি-প্রদীপ' থেকে সামান্য অংশই উদ্ধৃত ক'রছি। 'বৌদিদি যেন বনে ফোটা শুভ্র কাঠমল্লিকা ফুল, তুলে এনে তোড়া বেঁধে ফুলের দোকানে সাজিয়ে রাখবার জিনিষ নয়।' (পৃঃ ১২২) এই সরল বাক্যটিতে বৌদিদি চরিত্রের সবটুকু রূপ-মাধুরিমা কত অনাড়ম্বর, সহজবোধ্য স্পষ্ট রূপেই না প্রকাশিত হয়ে উঠলো! প্রকৃতির স্নেহচ্ছায়ার নিরালা, নির্জন অরণ্য প্রান্তে যে অতুল, শোভামণ্ডিত, শুভ্র কাঠমল্লিকা পুষ্প আপন সুবাসেই আমোদিত হ'য়ে ফোটে, তার সৌন্দর্য্যের তুলনা নেই। অরণ্যের পরিবেশেই সে পুষ্পের রূপ ও সৌন্দর্য্যের সার্থকতা। দোকানে সে পুষ্পের স্তবক রচনায় তার বর্ণ-সুষমা চতুর্গুণ বর্দ্ধিতা হয় না। বরং একেবারেই ম্লান, বিবর্ণ হয়ে যায়, বেমানান ঠেকে। বৌদিদি পল্লীর কন্যা। তার সৌন্দর্য্য প্রকৃতির অরুপণ দানেই সহজ, স্নিগ্ধ। সে রূপ-সুষমা মানায় না অতিরিক্ত অলঙ্কার আবরণে—আভরণে, রূপচর্চ্চার ঐকান্তিক বিলাস-ব্যসনে। কারণ সে সৌন্দর্য্যই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। তাতে আভরণ বা রূপচর্চ্চার প্রয়োজনই নেই। বৌদিদির স্বাভাবিক দৈহিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সুতরাং বনে ফোটা কাঠমল্লিকা পুষ্পের শোভার সাদৃশ্য রচনা ক'রে আমাদের বিস্মিতই ক'রেছেন লেখক। কাঠমল্লিকার রূপ যে কত সহজ-স্নিগ্ধ হ'তে পারে এই নাতিদীর্ঘ বাক্যটিতেই তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া গেল।

অন্যত্রও এর ব্যতিক্রম নেই। অপরাজিত (২য় খণ্ড) থেকে কয়েকটি এই ভাবের অংশই উদ্ধৃত ক'রে দেখানো হ'চ্ছে। যথা (১) মধুর প্রভাতের পদ্ম ফুলের মত প্রফুল্ল ছিল দিনগুলা। (২) বাড়ীর সামনে বাঁশ-বনের তলায় চকচকে সবুজ পাতার আড়ালে বুনো আদার রঙীন ফুল যেন দূর ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নের মত সকালের বুকে। (১মটি পৃঃ ৪৭, ২য়টি পৃঃ ৩২) এই দুটি সরল, মধুর বাক্যের মধ্যেই বিভূতিভূষণের প্রগাঢ়, উচ্চ উদ্ভিদ-প্রীতি, গভীর ও নিবীড় সৌন্দর্য্য-বোধ এবং অন্তঃস্পর্শী সূক্ষ্মানুভূতি অতি সুচারুরূপেই ধরা প'ড়েছে। এতটুকু বুঝতেও আমাদের কষ্ট হয় না,

অপরূপী বিভূতি-সত্তা এই দুটি বৈপরীত্যের নির্বন্ধ প্রকাশ ভঙ্গিমায় জীবন ও প্রকৃতিকে একীভূত মিলন সত্তায় অধিষ্ঠিত ক'রেই দেখিয়েছেন। সেই এতে বিন্দুপরিমাণও শৈথিল্য কিম্বা কারচুপি। একটি সাধন-লভ্য সত্যদর্শ ও দর্শন সার্থক রূপেই সাহিত্যভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে।

এই বন চাঁড়ালের পাতা, লজ্জাবতী লতা, কাঠমল্লিকা, পদ্ম, বুনো আদার রঙীন ফুল—এইগুলির মধ্যেই তাঁর অনুপম রসকল্পনা মানব জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ও ভাবের ছবি নিপুণভাবেই ফুটিয়ে তুলেছে। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে কথাশিল্পে উদ্ভিদকে নিয়ে বিভূতিভূষণের মতো এতো গভীর, এতো ব্যাপক (extensive) ভাবে আর কেউই শিল্পচর্চা করেন নি। এই জন্যেই তাঁর সাহিত্যে আমরা দেখি, মানবজীবনের অপেক্ষা এই অনন্ত, অসীম প্রকৃতি জগতের অপার রূপ ও দৃঢ় স্থির অনন্ত বাণীই সর্বোত্তম। পাহাড়-জঙ্গল, নদী-সমুদ্র, বর্ণা, উপত্যকা—বিরাট প্রকৃতির এক একটি অংশ। এইগুলির মধ্যে পরমতম ব্রহ্মযোনির অরূপ শোভাও মূর্ত। অতীত কালব্যাপীই ধরণীর বক্ষ জুড়ে এঁদের অপরিসীম লীলা-বিভূতি। এঁদের মধ্যেই সেই সচ্চিদানন্দ নটনাভিরামের নিগূঢ় রূপতত্ত্ব রেখায় রেখায়, ছন্দে ছন্দেই রূপায়িত সে রূপতত্ত্বের কতটুকুই বা মানুষের সম্পূর্ণ চেতনবোধ? পৃথিবী ব্যাপী এই উদ্ভিদ প্রকৃতিও সেই মহাস্রষ্টা শিল্পীর এক অপূর্ব, অপরূপ, মহা শিল্পসৃষ্টি।

দেখা যায় বিভূতি-সাহিত্যে বাংলাদেশের লতা-গুল্ম-বৃক্ষরাজি, পত্র-পুষ্প-মুকুল সম্পূর্ণ উজাড় ভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। যে মাকাললতা গ্রামের জঙ্গলে, নদীতীরে, দূর মাঠের ধারে, পুকুর পাড়ে অজস্রই দেখতে পাওয়া যায় তাদের জীবনচরিত্র, আচার আচরণ কতটুকুই বা জানি আমরা? বুঝবার চেষ্টা, তাদের চেনবার চেষ্টা কখনও কি একবার ঘুণাক্ষরেও কি করেছি! তাদেরও যে জীবন-কাহিনী, স্নেহ-প্রেম, ব্যথা-বেদনা, হাসি-কান্না, উত্থান-পতন থাকতে পারে সেই বিষয়ে এক মুহূর্তও চিন্তা করেছি কি? করিনি। বিভূতিভূষণ সেই আত্মদোষ, সেই মর্মগ্লানি পূর্ণভাবেই ক্ষালন করলেন যেন তাঁর সাহিত্যে—তাঁর 'মাকাললতার কাহিনীতেই।' আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর নিরলস, ঐকান্তিক সাধনায় বিজ্ঞান জগতে সর্বপ্রথমেই প্রমাণ বা আবিষ্কার করেছিলেন উদ্ভিদের প্রাণ আছে। পরবর্তীকালে লেখনরূপী বিভূতি-ভূষণ সাহিত্যক্ষেত্রে এই প্রাণবন্তকে উপলক্ষ্য করেই সহজ সরল ভাবেই যেন প্রকাশ করলেন উদ্ভিদের জীবন পর্যায়, বিভিন্ন অবস্থা, সৌন্দর্য-মাধুর্য এবং মর্মগূঢ় পরিচয় বাণীরই কথা!

নিছক উদ্ভিদ মানুষের যে কত উপকার বা মঙ্গল করে তার একটকথায় ইয়ত্তা নেই। নিত্য ব্যবহার্য খাদ্যরূপে, কিম্বা বিভিন্ন উপাদানের সাধনায় তার তুলনা নেই। মানুষের দেহকান্তি বা জীবনীশক্তিকে তার মূল্যবান রস গ্রহণে ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী ও দীর্ঘায়ু করে। আবার শুধু এই ভাবেই নয়। আরও একটি স্বর্গীয়, অলৌকিক উপায়েও সে মানুষের পরমতম শুভ মঙ্গল ও পুতপবিত্র সাধনার্ঘ্যের মহামহান্ অর্ঘ্য করে। সেটি আর কিছুই নয়—মানুষের যে মন, যে হৃদয়, যে দরদী অনুভূতি, কিম্বা চিরকালীন সৃষ্টি রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটনের যে সদা চঞ্চল, পিপাসিত সন্ধানী সত্তা তাকে পরিপূর্ণভাবেই আরও ব্যাপকভাবেই উদ্দীপিত, উন্মীলিত, উদ্বোধিত করে—এবং জীবনকাণ্ডটিকে সাহিত্যে দর্শনে, শিল্পে বিজ্ঞানে, অধ্যাত্ম তপস্যায় প্রস্ফুটিত, সুরভিত, সুশোভিত করে তোলে।

শিল্পী বিভূতিভূষণ সাহিত্যে উদ্ভিদের এই মঙ্গল দিকটি বহুভাবেই দেখিয়েছেন। তাঁর 'অনুবর্তন' উপন্যাসেই দেখতে পাওয়া যায় এই বিষয়েরই একটি সুন্দর কথা; উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো। লক্ষ্য করুন: গাছের নাম 'পুত্রঞ্জীবরক্ষবাল্লি'—জীবপুত্রিকা বৃক্ষ। এই বৃক্ষের ফলের বীজ মৃতবৎসা নারীর গলায় পরাইয়া দিলে ছেলে হইয়া মরে না। (পৃঃ ৫০) এই কথাটিতেই লেখক উদ্ভিদ নিমিত্ত মহৌষধির মূল্যবান হিতসাধনের দিকটিই উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছেন।

অন্যত্রও একটু ভিন্নতর দৃষ্টিতেই আবার উদ্ভিদ প্রকৃতির সাক্ষ্য ও অচল এবং রহস্যময় সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব অনুভূতিও দেখবার মতো: একটা সেলগাছে বছরে

কত বেল হয় দেখেছ? একটা বেলের মধ্যে কত বীচি থাকে, প্রত্যেক বীচিটি থেকে এক এক মহীরুহ জন্মাতে পারে—কিন্তু তা জন্মায় না। একটা বেলগাছের ষাট বৎসর ব্যাপী জীবনে অত বীচি থেকে গাছ জন্মায় না—অন্ততঃ দুটি বেলচারা মানুষ হয়, বড় হয়—আবার বহু বেল ফল দেয়। বহু অপচয়ের হিসেব কষেই এই পৃথিবীর এন্‌জিনিয়ারিং দাঁড় করিয়ে রেখেছেন ভগবান। তার মধ্যেই অপচয়ের সার্থকতা (পৃঃ ২১৬)। এই খানেই তাঁর মনের বৈশিষ্ট্যটি একেবারে উন্মুক্ত হয়েই ধরা দিয়েছে।

অন্যত্র আবার দেখতে পাওয়া যাবে, উদ্ভিদ-প্রকৃতির সঙ্গে মানব প্রকৃতির যেমন সুচারু রূপে তুলনা করেছেন ঠিক তেমনিই কোনও স্থানে উদ্ভিদের সৌন্দর্যরাশির সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতিরও তুলনা করেছেন। তাঁর 'ইছামতী'তে এই ভাবটিই লক্ষণীয়: যথা—ঘেঁটু ফুলের পাপড়ির মতো সাদা জ্যোৎস্না বাইরে। (পৃঃ ১৪০) ঘেঁটু ফুলের পাপড়ির শুভ্র সমুজ্জলতার দিকে দৃষ্টিপাত করেই তাঁর মনে হলো নিশীথে জ্যোৎস্নাধবল চন্দ্রের অপরিম্লান রূপ এবং নয়ন-মন-প্লাবিত সুধা মাধুর্যের কথা। তিনি সেটির সার্থক বাণীরূপ দিলেন।

আমাদের পল্লী-বাংলায় দারিদ্র্যে, নিরক্ষরতা, নিস্তরঙ্গ সমাজ-জীবনে বহুদিন বাস করায় তাঁর গ্রাম্যজীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কিছু কম ছিল না। এই পতনোন্মুখ, জরা-জীর্ণ সমাজ-ব্যবস্থার থেকে তিনি বড় দুঃখ পেতেন, অনুভব করতেন গভীর মর্মবেদনা। এর মুক্তি, সুন্দর প্রতীকায় অতীপ্সায় নিয়তই সুগভীর প্রতীক্ষার দিনও কাটাতেন। 'ইছামতী' তাঁর শেষ জীবনেরই উপন্যাস। এর একস্থানে তিনি এই বিষয়ে তীব্র আক্ষেপেই যে কথা কটি লিখেছেন সেটি তুলে ধরছি: আলস্য ও নৈষ্কর্ম্য থেকে আসে ব্যর্থতা ও পাপ···এরা সারাদিন এখানে বসে শুধু গল্প করে ও পাশা খাবা খেলে। [চণ্ডীমণ্ডপে] জীবনসংগ্রাম এদের অজ্ঞাত, ব্রহ্মোত্তর জমিতে বছরের ধান হয়, প্রজাদের কাছ থেকে কিছু খাজনা মেলে, আম কাঁঠালের বাগান আছে, লাউ কুমড়োর মাচা আছে···এত সহজ ও সুলভ যেখানে জীবন-যাত্রা, সেখানে অবকাশ যাপনের এই সব অলস ধারাই লোকে বেছে নিয়েছে।···পল্লীবাংলার জীবনধারার মধ্যে শেওলার দাম আর কাঁজির রূপ জমে ওঠে; জলের স্বচ্ছতা নেই, স্রোতে কল্লোল নেই, নেই তার নিজের বক্ষপটে অসীম আকাশের উদার প্রতিচ্ছবি।—(পৃঃ ২০২-৩)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিটির মধ্যেই আমরা বিভূতিভূষণের মনের আক্ষেপ ও অন্তর্জ্বালাটি উপলব্ধি করলাম। আর এ জিনিসটিও খুব স্পষ্ট ভাবেই হৃদয়ঙ্গম ক'রলাম যে, আমাদের গ্রাম্যসমাজ বড় বেশী আত্মনির্ভরশীল ও পর-মুখাপেক্ষী একটি জিনিসের উপর—সেটি কি? সেটি হচ্ছে এই উদ্ভিদ প্রকৃতিরই অকৃপণ, উদার পরম করুণা ও সাহচর্য্য—যে পরম দানের প্রাচুর্য্যে ও ভালবাসায়ই তাঁরা ভুলে গেছেন জীবন সংগ্রাম, জীবনাদর্শ। একান্তই কর্মবিমুখ হয়ে গভীর আলস্যে চণ্ডীমণ্ডপে বসে বসে চেতনাহীন, স্থবির, জড়ের মতোই পাশা দাবা খেলেন। তাঁরা জানেন ক্ষেতে ধান আছে, বাগানে প্রচুর আম কাঁঠাল আছে, অঢেল পরিমাণ লাউ কুমড়োর উপচার আছে। এর একমাত্র উপযোগী কারণ এই ফল-পুষ্প, লতাপাতা, শাকসব্জী, গোলাভর্ত্তি ধান। গ্রামের অধিক উৎপাদনশীল উদ্ভিদ-প্রকৃতিই এই গ্রাম্য সমাজকে জড়, স্থবির, যেন কর্মবিমুখ ক'রেই তুলেছে। এই বিষয়ে আমাদের কোনও সংশয়ই থাকে না।

আবার একদিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটি জিনিস। পল্লীবাংলার এই অন্ধকার, অচলন, নিম্নমুখী জীবনধারার যে মর্মকরুণ পঙ্কিল অবস্থা—তার হাজামজা, মলিন জলাশয়ের শেওলার দাম ও কাঁজির রূপ ও প্রতিবন্ধকতার অতি সুন্দর তুলনা। বিভূতিভূষণের উপমা ও উদাহরণ স্বচ্ছ ও সার্থক। সুতরাং আমরা দেখলাম, সম্পূর্ণ উদ্ভিদ-ভিত্তিক দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষণেই পল্লীসমাজের দোষত্রুটি, অপরাধ অঘটনের সহজ ছবি কত স্বাভাবিকভাবেই না ফুটিয়ে তুলেছেন বিভূতিভূষণ—যার একটকথায় তুলনা নেই।

একমাত্র তাঁর সাহিত্যেই বাংলা তথা ভারতের নাম-

না-জানা, সম্পূর্ণ অপরিচিত অগণিত বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পুষ্পের পরিচয় ও ছবি পাওয়া যায়—যা অন্য কোনও লেখকের লেখায় অনেকাংশেই দুর্লভ এবং দুষ্প্রাপ্য। এর কারণ, তিনি অতিমাত্রায়ই উদ্ভিদ রসিক। একটা সুদৃঢ় প্রকৃতিপ্রেম ও তার স্বভাবই এর মূলে। বিশেষ কোনো একটি উপন্যাস কিম্বা গল্পের নাম দিলেই এর সত্যতা প্রমাণিত হবে না। তাঁর রচিত সমগ্র সাহিত্য ভাণ্ডারেই এর অপরিসীম ঐশ্বর্য্য ও সোন্দাসৌন্দর্য্য বিরাজমান। জীবনব্যাপী তাঁর সাহিত্যের পাতায়-পাতায়, অধ্যায়ে-অধ্যায়ে লিখে রেখে গেছেন এই এদেরই কত নাম, আচারবিচার, স্বচ্ছ সুগভীর আত্মপরিচয়! এই বিরাট বিপুল উদ্ভিদশ্রেণীর নাম যদি এই প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করি হয়তো পাঠক-পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি কিম্বা বিরক্তি ঘটতে পারে, সেই জন্যেই বিরত রইলাম। বারান্তরে এই নিয়েই আলোচনা করবো।

স্বর্গতঃ বিভূতিভূষণের ব্যক্তিমন ও শিল্পসত্তার প্রকৃতি-প্রভাব যে কতখানি ছিল, তার কয়েকটি উদাহরণ দিয়েই এই প্রবন্ধের যবনিকা টানছি। এইগুলির মধ্যেই জানতে পারা যাবে তাঁর নিগূঢ় প্রকৃতি-প্রীতি ও বিশিষ্ট শিল্পী মনোভাব। তাঁর সমগ্র রচনাভাণ্ডারের আসল চাবিকাঠিটি যে কি, সে বিষয়েও একটা হবে নূতন আলোকপাত। ক্রমান্বয়ে তুলে ধরলাম।

প্রথমে 'ইছামতীর' (৩৩২ পৃষ্ঠায়) নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি অনুধাবনযোগ্য: যথা—

আমার মনে হয় ফুল, নদী, আকাশ, তারা, শিশু এরা বড় ধর্মগ্রন্থ। এদের মধ্যে দিয়ে তাঁর লীলাবিভূতি দর্শন হয় বেশী করে। পাথরে গড়া মন্দিরে কি হবে, যার ভেতর তিনি নিজে থাকেন সেটাই তাঁর মন্দির। বাইরের প্রকৃতিকে ভালবাসতে হবে। প্রকৃতির তালে তালে চলে, তাকে ভালবেসে সেই প্রকৃতিরই সাহায্যে প্রকৃতির অন্তরাত্মা সেই মহান্ শক্তির কাছে পৌঁছতে হবে।

আবার 'কাঠ-বিক্রী বুড়ো' গল্পে:

আমি গাছ-বিক্রী সহজ করি না। কোনো গাছ যদি কেউ কাটে তবে আমার বড় কষ্ট হয়। লোককে পরামর্শ দিই গাছপালা দেশের সম্পদ। ধরণীর শ্রী ওরা বাড়িয়েছে ফুলে, ফলে, ছায়ায়, সৌন্দর্য্যে—ওদেরই ডালে-ডালে দিনরাত কত বিহঙ্গ-কাকলী। ওদের কেটে নষ্ট কোরোনা।

অন্যত্রও 'অভিযাত্রিকে' তাঁর মনোভাব ও মনোধর্মের নিখুঁত ছবি—

দেশ থেকে দূরে যত যাবে, তত Landscape-এর প্রকৃতি তোমার কাছে রোমাঞ্চিক হয়ে উঠবে। কতবার দূর দেশের পাহাড়ের ওপর সমুদ্রের ধারে, কিম্বা বনের ছায়ায় বসে দেশের কথা ভেবে দেখেছি—অপূর্ব্ব চিন্তা জাগায় মনে। সঙ্গে সঙ্গে চারিপাশের প্রকৃতি কি অপূর্ব্ব রূপই না ধরে চোখের সামনে! এ হোল মনের; বসাবেন, বোঝাতে পারিনে মুখে। অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝতে হয়। শুনলে বোঝা যায়না। (পৃঃ ১২৮) এবং কয়েক পৃষ্ঠা পরেই একটি স্বচ্ছ, সুন্দর বাণী:—আমার এই দৃঢ় ধারণা, যে দেশভ্রমণ করেনি প্রকৃতিকে বিভিন্নরূপে দেখেনি, কোথাও বা মোহন, কোথাও বা বিরাট, কোথাও রুক্ষ ও ঊষর—তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে অনেক বাকী। (পৃঃ ২০৪) [অভিযাত্রিক]।

সুতরাং, উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলির মধ্যেই বিভূতি-ভূষণের ব্যক্তিমন, তাঁর সাহিত্যাদর্শ, বিশিষ্ট ভাবানুভূতি এবং জীবনধর্ম সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় ধারণা লাভ করাই সঙ্গত হতে পারে এবং তাঁর সমগ্র সাহিত্য-কর্মেই উদ্ভিদ-প্রকৃতির এই অনিবার্য্য প্রভাব ও গভীর সংযুক্তিটি উপলব্ধি করা চলে।

'বরিশাল হিতৈষী' হইতে

॥ শ্রীদুর্গা মোহন সেন ॥

৪ই বৈশাখ, ১৩৩০

সুদীর্ঘ দুইমাস কাল বাংলার বিভিন্ন জিলায় ভ্রমণ করিয়া বাবু শরৎকুমার ঘোষ বরিশাল প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তিনি পুনরায় বাবু সুরেশচন্দ্র গুপ্ত সহ এই জিলার গ্রামে গ্রামে ভ্রমণার্থ বাহির হইয়াছেন—বানড়ীপাড়া, স্বরূপকাঠি, কালকাঠি ও টরকী প্রভৃতি বন্দরে তিনি ভ্রমণ করিবেন। ৩০শে এপ্রিলের পরে তিনি সহরে প্রত্যাগমন করিবেন।

বানড়ীপাড়া জাতীয় সপ্তাহ

বানড়ীপাড়া গ্রামে জাতীয় সপ্তাহ অতি সুন্দররূপে পালিত হইয়াছে। ৬ই এপ্রিল জনসাধারণের এক সভায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও সরকারের অত্যাচার সম্বন্ধে স্থানীয় বক্তাগণ বক্তৃতা করেন। বরিশালের শ্রীযুত শরৎ কুমার ঘোষ ও সুরেশ চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এই সপ্তাহে এখানে আসিয়া তিনটী সভায় বক্তৃতা করেন। দুইটী স্ত্রীলোকদের সভা হইয়াছিল। ইহাতে একজন ভদ্র-মহিলা সভানেত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন। সভায় অর্থ ও অলঙ্কার গৃহীত হইয়াছিল। এক ভদ্রমহিলা তাঁহার হাতের ১৫০৲ টাকা মূল্যের এক জোড়া বালা দান করেন। তাহারা খদ্দর পরিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। নগদ টাকা ও অলঙ্কারে ৫০০৲ টাকা শ্রীযুত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয়ের হস্তে প্রদান করা হয়। ১০জন স্বেচ্ছাসেবক ও কয়েক-জন ভদ্রমহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। কংগ্রেসের কার্য্য এখানে ভালরূপ চলিতেছে।

শরৎকুমারের পল্লীভ্রমণ

তিলকস্বরাজ্য ভাণ্ডারে অর্থ ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ।

৩০শে এপ্রিলের মধ্যে বরিশাল জিলা ১০০০০৲ টাকা ও ৫০০ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীযুত শরৎ কুমার ঘোষ মহাশয় গত দেড়মাস যাবত বাংলার নানাস্থানে ঘুরিয়া গত ৪ঠা বরিশালে পৌঁছিয়াছেন। এদিন যাবত সহরে সভা সমিতি করিয়া গত ১০ই এপ্রিল তিনি সন্ধ্যার সময়লঞ্চে বানড়ীপাড়া নৌকাযোগে পৌঁছিলে গ্রামের জনসাধারণ গভীর বন্দেমাতরম্ ধ্বনি সহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। ১১ই এপ্রিল বেলা ৮ ঘটিকার সময় সরোজিনী গুহঠাকুরতার নেতৃত্বে এক বিরাট মহিলা-সভার অধিবেশন হয়। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র গুপ্ত শরৎ-বাবুর আগমনের কারণ ও বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় বিবৃত করেন। তিনি বলেন "মহাত্মার আদেশানুযায়ী যদি আমরা প্রত্যেকে সুতা কাটি, প্রত্যেকে যদি খদ্দর পরিধান করি তবে ঐ দুর্গম পথ অনেক শান্তিময় হইতে পারে। অতঃপর শরৎবাবু তাঁহার প্রাণ-মাতান ভাষায় নারীর অধিকার ও দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দীর্ঘকালব্যাপী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় মহিলাবর্গ অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, সহসা শ্রীযুক্তা তরুলতা গুহ ব্যাকুলভাবে দাঁড়াইয়া বলিলেন "আর আমরা সহ্য করিতে পারি না, আর বক্তৃতার দরকার নাই। আজ হইতে নিয়মিত চরকায় সুতা কাটিব এবং খদ্দর পরিধান করিব।" ঐ মহিলা নিজ হাতের ৭ ভরি ওজনের বালা স্বরাজ ভাণ্ডারে দান করিয়া বলেন "স্বরাজ না হওয়া পর্য্যন্ত বালা আর হাতে দিব না"। অনেক মহিলা টাকা ও অলঙ্কার সভা-ক্ষেত্রে প্রদান করিয়াছেন। দুইদিনে আনুমানিক ৫০০৲ শতাধিক টাকা বানড়ীপাড়া ও নরোত্তমপুরে আদায় হইয়াছে। এই মহিলা আহ্মদাবাদ প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

জনসাধারণ সভা

অপরাহ্নে বানরীপাড়া জাতীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ললিতকুমার গুহঠাকুরতা মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। বাবু সুরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাত্মার আন্দোলন কি ভাবে চিরাচরিত মোহ কাটাইয়া দ্রুত গতিতে জনসাধারণের হৃদয় প্রবেশ করিতেছে তাহা বিবৃত করিয়া গয়া কংগ্রেসে আইন অমান্য বিষয়ক প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করেন। তৎপর শরৎ কুমার ঘোষ মহাশয় সুদীর্ঘকাল ব্যাপী বক্তৃতায় আন্দোলনের বিশেষত্ব, কেন স্বরাজ চাই, প্রভৃতি বিষয় ব্যক্ত করিয়া স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করেন। কিছু অর্থ ও স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হয়। সেবকগণ আহম্মদাবাদ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন।

কুমিল্লার জাতীয় বালিকা বিদ্যালয়

গত ১১ই এপ্রিল নরোত্তমপুর একটী মহিলা সভা হয়, অল্প বজায় বহুকষ্ট হইলেও মহিলাগণ বিশেষ উৎসাহে বক্তৃতা শ্রবণ ও টাকা অলঙ্কার প্রভৃতি দেন।

শরৎবাবুর ভ্রমণ তালিকা

৩০শে এপ্রিল মধ্যে ২রা বৈশাখ ঝালকাঠি, ৪ঠা কাউখালী, ৫ই ভাণ্ডারিয়া, ৭ই শিরোজপুর, ৮ই বরিশাল, ৯ই টরকী, ১০ই মুলাদী, ১২ই বরিশাল, ১৩ই বগা, ১৫ই হইতে ২৭শে বরিশাল উপস্থিত থাকিবেন। সর্ব্বত্রই সভা কংগ্রেসের নির্দ্ধারিত অর্থ ও সেবক সংগ্রহ করিবেন।

ঝালকাঠি

শ্রীযুত শরৎকুমার ঘোষ ও সুরেশচন্দ্র গুপ্ত ২রা বৈশাখ এখানে উপস্থিত হন। ২রা হইতে ৬ই পর্য্যন্ত স্বেচ্ছাসেবক ও অর্থসংগ্রহ কথা হয়। ঝালকাঠির মহাজনদের মধ্যে ৭ জন ১০০৲ টাকা করিয়া দেন। এই মহকুমায় মোট ১৪৪০৲ টাকা ও ১০ জন স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হয়। শ্রীযুত রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে ২০০০৲ টাকা পূর্ণ করিয়া দিবার সম্মতি জানাইয়াছেন।

শিরোজপুর

৬ই হইতে ৮ই বৈশাখ পর্য্যন্ত শ্রীযুত শরৎকুমার ঘোষ এখানে পুরুষ ও মহিলা সভায় বক্তৃতা ও তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। এখানে তিনি ৮৪০৲ টাকা আদায় করেন, ২৪ জন স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করেন।

টরকী ও মুলাদি

৯ই হইতে ১১ই বৈশাখ এখানে সভা করিয়া টরকীতে ৩৭৫৲ এবং মুলাদিতে ২০৬১৲ টাকা ও কতক অলঙ্কার সংগৃহীত হয়।

১৪ই হইতে ১৬ই বৈশাখ শ্রীযুত শরৎকুমার ঘোষ এখানে অবস্থান করিয়া দুই জায়গা হইতে ৮০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ১৭ জন স্বেচ্ছাসেবক আহাম্মদাবাদ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। নলছিটি, কাউখালীতে শ্রীযুত রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও সুরেশ গুপ্ত ১১১৲ টাকা সংগ্রহ করেন এবং ঝালকাঠি, বাধপুর, বারৈকরণ গ্রামে অর্থ সংগ্রহ করেন।

১৯শে বৈশাখ ১৩৩০

গত ৩০শে এপ্রিল স্থানীয় রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে দীনবন্ধু মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভা হয়। বাবু দুর্গামোহন সেন সভায় আলোচনায় বলেন—শরৎবাবুর মুখে আন্দোলনের প্রণালীতা ও গভীরতার কথা শ্রবণ করুন—তাঁহার সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ শ্রবণ করুন—তবে বুঝিবেন আন্দোলন শিথিল হইয়াছে কিনা। আমরা নিজেরা অবিশ্বাসী ও ভীরু—সমস্ত আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। সে ক্ষেত্রে যদি আমরা বিশ্বাসী কর্ম্মীকে সাহায্য করি তাহা হইলেও আমাদের কর্ত্তব্য পালন করা হয়। অতঃপর শরৎবাবু তাঁহার কার্য্য বিবরণ প্রদান করেন। তিনি যে যে গ্রামে গমন করিয়াছেন সেইখানেই লোক সকল বিপুল উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন ও যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। ১৮ দিনে ৪৫০০৲ এবং মোট ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা আদায় হইয়াছে।

২৮শে বৈশাখ ১৩৩০

অদ্য অপরাহ্নে রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে বাবু মন্মথ মোহন দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল কংগ্রেস ও স্বরাজ্য পার্টি। প্রথমে বাবু দুর্গা মোহন সেন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর আগামী বরিশাল অধিবেশন সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে বরিশাল সকল বাধা অতিক্রম করিয়া গৌরবার্জ্জন করিয়াছিল। জানিনা এবারে অধিবেশনের সঙ্গে স্বরাজ্য পার্টির আগমনে হয়ত একটু সরগরম হইবে। ইহারা কংগ্রেসের মেম্বর হইলেও কংগ্রেসের সাহায্যে এখানে আসিতেছেন না, শ্রীযুক্ত দাস মহাশয়, শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার, শ্রীশচীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর প্রস্তাবিত মন্তব্যগুলি আলোচনা করিয়া দেখান—অতিথিদের সুবন্দোবস্তের ত্রুটী না হয় সেজন্যও বলেন। তৎপর বাবু শরৎকুমার ঘোষ ঐ মর্ম্মে পরে অসহযোগিতার কারণ প্রদর্শন করিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন।

সভা

গত শুক্রবার অপরাহ্নে বাবু দুর্গামোহন সেনের সভাপতিত্বে যে সভা হয় তাহাতে তাঁহার প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলেন—অদ্যকার সভায় বাবু শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় চৌরীচৌরায় মোকদ্দমার রায় ও তোলার মুদ্রাকালুর হাটে খুনের আলোচনা করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, আমি তৎসম্বন্ধে দুটী কথা বলিব। ৩০শে এপ্রিল অবধি কংগ্রেস নির্দ্ধারণানুযায়ী অর্থ ও স্বেচ্ছাসেবক শ্রীযুত দাস মহাশয় সংগ্রহ করিবেন না। ঐ তারিখের সঙ্গেই কংগ্রেস সহিত তাহার সন্ধির কাল শেষ হইয়াছে। সি. আর. দাস কাউন্সিল প্রবেশ করিবেন ইত্যাদি বহু বিষয়ের সঙ্গে মুদ্রাকালুর এবং চৌরীচৌরার রায় স্থগিত করিতে পারিবেন কিনা বহু প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তৎপর শরৎবাবু তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা সত্যাগ্রহ-সত্যাগ্রহী মুদ্রাকালুর ঘটনা উপেক্ষা করিতে পারে না—আমাদের দেহ যেমন সত্য, সূর্য্য চন্দ্র যেমন সত্য, সমুদ্র যেমন সত্য, সমুদ্র সৈকতের লবণ তেমন সত্য, সত্যাগ্রহীকে সে সত্য রক্ষা করিতে হইবে। দুর্গামোহন বাবু মিঃ বিভারিজ সাহেবের ইতিহাস বাবরগঞ্জের লবণ প্রস্তুতের যে ইতিহাস পাঠ করিলেন তাহাতে আপনারা জানিয়াছেন, এই জিলা কি প্রকারে একটী অর্থকরী ব্যবসায় নষ্ট করিয়া (এইস্থানে মূল পত্রিকাটি পোকায় কাটিয়া ফেলিয়াছিল)···আজ তাহার জন্য রক্তপাতও হইল। আশাকরি আপনারা এই ভ্রাতৃরক্ত পাতের প্রতিবাদ স্বরূপ লবণ ব্যবহার অন্ততঃ কমাইয়া দিবেন। তাহার পর আইন অমান্য—তাহাও হয়তো এই ক্ষেত্রেই আরম্ভ হইবে—কারণ লবণ শুল্ক ব্যাপারে ভারতের সহযোগী অসহযোগী ধনী নির্ধন সব সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও বাধিত হইয়াছে—তৎপর সভা ভঙ্গ হয়।

বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় প্রাদেশিক সম্মিলনী ২রা জ্যৈষ্ঠ
আয়োজন ১৩৩০

সপ্তাহকাল পূর্ব্বে টেলীগ্রাম আসিল বরিশালে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইবে। ভগবৎ-কৃপায় সকল রকম আয়োজন খুব তৎপর চলিতে লাগিল। অধিবেশন স্থান, অতিথি আবাস স্থান, আহারাদির স্থান কংগ্রেসই করিবেন। বিভিন্ন জিলা হইতে আগত অতিথিগণকে ব্রজমোহন স্কুল গৃহ, অশ্বিনী দত্তের বাসা, জলাবাড়ী বিশ্বাসদের বাসা, কীর্ত্তিপাশার জমিদার বিনোদ বাবুর বাসা স্থির করা হইল। এই জিলার কর্ম্মীগণকে ৬০।৬৫ বাসায় রাখা হইল। গৃহকর্ত্তাগণই ব্যয়ভার বহন করিলেন। ইতিমধ্যে অমির কুমার রায় চৌধুরীর নিকট পত্র আসিল শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় সদলবলে আসিবেন। সংবাদপত্রে সংবাদ আসিল কংগ্রেস মেম্বর স্বরূপে তাহারা কতকগুলি প্রস্তাব করিবেন। ২৪ পরগণা, চট্টগ্রাম, নদীয়া, কলিকাতা হইতে মাখনলাল সেন, হারাণ ঘোষ, অক্ষয় মিত্র, মিঃ সি, আর, দাস, হেমন্ত বাবু, বিনয়কুমার বসু, কৃপেন বসু, হেমেন্দ্র মিত্র, কিরণশঙ্কর রায়, সুভাষ চন্দ্র বসু, মজিবর রহমান, কান্তিলাল পাকে,

পুরুষোত্তম রায়, নোয়াখালী, মেদিনীপুর, ঢাকা, ত্রিপুরা, বাকুড়া, পাবনা শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, রংপুর, দার্জিলিং, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী, হুগলী, বীরভূম, যশোহর, মৈমনসিংহ, বরিশাল শরৎকুমার ঘোষ ললিত মোহন দাস ত্রিতেন্দ্রনাথ দত্ত, রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ভূপতিকান্ত বক্সী, মনোরঞ্জন গুপ্ত, সুধীরকুমার দাশগুপ্ত মুর্শিদাবাদ, শ্রীহট্ট, খুলনা, রাজসাহী, বর্দ্ধমান, ফরিদপুর, হাওড়া।

অধিবেশন

বেলা একটার সময় সভা বসিল। শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সভাপতি পদে প্রস্তাব করা হইল। দাস সাহেবের পক্ষ হইতে দাস সাহেবকে সভাপতি প্রস্তাব হওয়ামাত্র দাস সাহেব দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করিলেন—কিঞ্চিৎ আলোচনান্তে মাত্র দুইটী মন্তব্য গৃহীত হয়, একটী মিউনিসিপ্যালীটি সম্পর্কে, দ্বিতীয় প্রস্তাব ইউনিয়ন বোর্ডে গমন।

তৎপরদিন আবার বেলা ১টার সময় সভা আরম্ভ হয়, সর্ব্বপ্রথমে দাস সাহেবের পক্ষ হইতে গয়া কংগ্রেসে কাউন্সিল প্রবেশ মন্তব্যের প্রস্তাবিত হয়—দাস সাহেব এ সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এবং শ্যামসুন্দর বাবুর যে আইন সম্বন্ধে জ্ঞান তাহা বারংবার বুঝাইবার চেষ্টা করেন। তিনিও বলেন—আইন জ্ঞান আমার নাই তাহা সত্য কিন্তু ইংরাজী ভাষাজ্ঞান আমার আছে তাহাতে আপনার প্রস্তাব আমি উপস্থিত করিতে দিতে পারিনা। তৎপর কার্য্য স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব শ্রীযুত দাসের পক্ষের লোক করেন ও সভাপতিকে censure দেওয়ার জন্য এক প্রস্তাব উপস্থিত করা হয় এবং উহা বে-আইনী বলিয়া সভাপতি মহাশয় নির্দ্দেশ দেন।

তখন প্রসিদ্ধ উপন্যাসিক এক হাস্যরসের অবতারণা করিবার চেষ্টা করেন ও জিজ্ঞাসা করেন ইহা কি সভা না তামাসা। সভার লোক সকল ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠে। সভাপতি মহাশয় তখন তাহাকে বাহির হইয়া যাইতে বলেন—দাস সাহেবকে সভাপতি জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি শরৎবাবুর কার্য্য সমর্থন করেন কিনা। দাস সাহেব বলিলেন 'না'; অগত্যা শরৎবাবু ও দাস সাহেবের দল গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ৪৩ নম্বর ৭৩ উভয়দিকে তখন নাম সহি গৃহীত হয়—দাস সাহেবের সঙ্গে চলিয়া গেলেন ৪৩—সভায় রহিলেন ৭৩। শেষোক্ত ব্যক্তিগণ সভার কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তৎপর আর বিশেষ কোন গোলযোগ হয় নাই। লবণ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব—মুন্সীকালুর লবণ সম্পর্কীয় হত্যার ব্যাপার লইয়া আইন অমান্যের একটী প্রস্তাব হয়—তাহা অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির ২৭শে মে তারিখের অধিবেশনে উপস্থিত করা স্থিরীকৃত হয়। তৎপর সভার অন্যান্য কার্য্য সমাপনান্তে সন্ধ্যার প্রাক্কালে সভা ভঙ্গ হয়। ঐ দিন অতিথিগণ বরিশাল ত্যাগ করেন। প্রাদেশিক কমিটির সভা ব্যতীত আরও কয়েকটী সভার অধিবেশন হয়।

"সাধারণ সভা"

কনফারেন্সের পূর্ব্বদিন রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে শ্রীযুত মন্মথনাথ দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। বাবু সুকুমার দত্ত অতিথিগণকে সসম্মানে পরিচয় করাইয়া দেন এবং মাননীয় অতিথিগণের পরিচয় প্রদান করেন। তৎপর বাবু সুরেন্দ্র চন্দ্র বসু মহাশয় তাহাদের স্বরাজ্য দলের কার্য্যপদ্ধতি ও কংগ্রেসের কার্য্যের ত্রুটী, সংবাদপত্র সমূহের মিথ্যাবাদ প্রভৃতি বিষয়ক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। শ্রীযুত প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করেন। কান্ত কুমার মজুমদার বরিশাল হিতৈষী ও আনন্দবাজার পত্রিকা পড়িয়া কয়েকদিন পূর্ব্বের একটী সাধারণ সভায় শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার মহাশয়ার মুন্সীকালুর ব্যাপার সম্পর্কে একটী কমিটি গঠনমূলক প্রস্তাবের যে সমালোচনা করা হয় তৎসম্পর্কে বক্তা লেখকগণকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। বলস্ত বাবু বরিশালের অতিথি বিশেষতঃ স্বরাজ্য পার্টির লোক বলিয়া তাঁহার বক্তৃতার প্রতিবাদ করার কোন আবশ্যকতা দেখিনা। তৎপর সভাপতি মহাশয় সুভাষ বাবুর বক্তৃতায় কংগ্রেসের অধিক সংখ্যক দল যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন তৎসম্পর্কে দু চারটী কথা বলেন। এবং সভা ভঙ্গ হয়।

ব্রহ্মমোহন প্রাঙ্গনে সভা

কনফারেন্সের প্রথম দিনে পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুসারে এক সভা হয়, বাবু শরৎ চন্দ্র গুহ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্বরাজ্য পার্টির পক্ষ হইতে শ্রীযুত শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক বক্তৃতা করেন। তাহার মূলকথা স্বরাজ আনিতে হইবে। আধ্যাত্মিকতা তিনি বোঝেননা। অনন্ত নরকেও তাঁহার ভয় নাই। যে কোন ভাবে স্বরাজ আনিতে পারিলেই তিনি প্রস্তুত। তৎপর শ্রীযুত দাস সাহেব সভাপতিকে বলিলেন বাবু শরৎকুমার ঘোষ নাকি কাউন্সিলে প্রবেশের বিরুদ্ধে একটা campaign চালাইতেছেন—তিনি তাঁহার বক্তৃতা বন্ধ করুন তারপর তিনি বলিবেন। শরৎবাবু বলিলেন আমার কথা কংগ্রেসের কথা বিরুদ্ধের চির পুরাতন। কাজেই দাস মহাশয়েরই পূর্ব্বে বলা উচিত। দাস মহাশয় বলিলেন শরৎবাবুকে প্রত্যুত্তর দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হইবে। শরৎবাবু বলিলেন দাস সাহেব বলিবেন নতুন কথা, কাজেই তাঁহার কথা প্রথম হওয়া উচিত।

ইতিমধ্যে জনকতকের বক্তৃতা হইয়া গেল, সে বক্তৃতাগুলি ছিল রসাল। শ্রীযুত মনিমোহন সাহুনী ও হেমন্ত কুমার সরকার মহাশয় দ্বয়ের বক্তৃতা বেশ হাস্যকৌতুকময় হইয়াছিল। তৎপর শরৎবাবু বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেদিনের বক্তৃতা আধ্যাত্মিকতাকে উপন্যাসের তীব্র প্রতিবাদ তৎপর অহিংসা প্রভৃতির আলোচনা করেন ও রাত্রি ১০টা বাজিয়া যায়—ঐদিন সভার কার্য্য বন্ধ হয়। তৎপর দিন আবার সভা বসে—প্রথম বাবু অনিল বরণ রায় কাউন্সিল গমন ও ভিক্ষার নামান্তর মাত্র তাহাই বলেন ও কর্ম্মফলদাতা ভগবানকে সাক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে বলেন—একদিন তিনি কর্ম্মফলে দেশকে স্বরাজ নিশ্চয়ই দিবেন। তৎপর শরৎ বাবু তাহার বক্তৃতা শেষ করেন ও দাস সাহেব প্রায় ২।০ ঘণ্টা শরৎবাবুর বক্তৃতার উত্তর প্রদান করেন। আমরা সে বক্তৃতা প্রকাশ করার চেষ্টা করিব। সে বক্তৃতায় যুক্তি গয়া কংগ্রেসের বক্তৃতারই পুনরাবৃত্তি। সর্ব্বশেষ অনেক শ্রোতা বলেন oath of allegiance সম্বন্ধে কি বলেন—তিনি বলেন, ঐ প্রতিজ্ঞায় রাজা পঞ্চম জর্জ একটা পুতুল মাত্র—উহার অর্থ—বনষ্টিটিউসন শাসন প্রণালী—তা সে রকম প্রতিজ্ঞা ত আপনারা আদালতে করিয়া থাকেন, ইত্যাদিতে রাত্র ১২টা বাজিয়া যায়। সভা ভঙ্গ হয়।

ক্রমশঃ

"কেন নিবে গেল বাতি
আমি অধিক যতনে ঢেকেছিনু তারে
আঁচিয়া বাসরবাতি,
তাই নিবে গেল বাতি।

কেন ঝরে গেল ফুল
আমি বক্ষে চাপিয়া ধরেছিনু তারে
চিন্তিত ব্যাকুল,
তাই ঝরে গেল ফুল।

কেন মরে গেল নদী।
আমি বাঁধ বাঁধি তারে চাহি ধরিবারে
পাইবারে নিরবধি
তাই মরে গেল নদী।

কেন ছিঁড়ে গেল তার।
আমি অধিক আবেগে প্রাণপণ বলে
দিয়েছিনু ঝংকার
তাই ছিঁড়ে গেল তার।"

রবীন্দ্রনাথ

সাময়িকী

৺সুরেশচন্দ্র গুপ্তের স্মৃতি ও কীর্তিরক্ষা ঃ দিন কয় হয় আমরা ৺সুরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা মায়ারাণী ঘোষের নিকট হইতে এক পত্রে জানিতে পারি যে সুরেশবাবু প্রতিষ্ঠিত বরিশালের স্বনামধন্য হরিজন স্কুলের ঘরবাড়ী সাম্প্রতিক বন্যায় নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। তাঁহাদের এতবড় দুর্যোগের দিনে যিনি যেভাবে যতটুকু পারেন সাহায্য পাঠাইবেন—এই আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমরা শ্রীযুক্তা ঘোষের পত্রটী এইখানে উদ্ধৃত করিলাম। সাহায্য করার পথে বাধা অনেক—তবু যদি কাহারও কোন সুযোগ থাকে, তিনি তাঁহার সাধ্যমত করিবেন—আমরা ইহাই অপেক্ষা করিব। সুরেশবাবু সারা জীবন গঠনমূলক কাজ করিয়া গিয়াছেন, হরিজনদের লইয়া তাঁহার দিন কাটিয়াছে। তাঁহার সুযোগ্যা কন্যা শ্রীযুক্তা মায়ারাণী ঘোষ যে পিতার আরব্ধ কাজ লইয়া পড়িয়া আছেন, ইহা অপেক্ষা আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে? শ্রীযুক্তা ঘোষ তাঁহার এই কাজ লইয়া অগ্রসর হইয়া চলিবেন—আমরা ইহা দেখিয়া সার্থক হইব। দীর্ঘদিনের অবৈতনিক হরিজন ও দরিদ্র জনসাধারণের ইস্কুলটি ভাঙিয়া গেলে যে ক্ষতি হইবে, তাহা পূরণ করা খুব সোজা কথা নয়। নূতন করিয়া কিছু গড়িয়া তোলা যে কত কষ্ট তাহা প্রত্যেক সত্যিকারের গঠনকর্মী জানেন। তাই যেটা আছে সেটা যাহাতে নষ্ট না হয়, সুরেশবাবুর এবং এইরূপ কাজের প্রতি আগ্রহশীল যিনি যেখানে আছেন তিনি সাধ্যমত সাহায্য করিবেন—ইহা আমরা বিশ্বাস করি।

পত্রটী এইরূপ—

শ্রীচরণকমলেষু,

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। আশাকরি আশ্রমের সকল সহ আপনি শারীরিক কুশল আছেন।

নিতান্ত বিপর্যস্ত মন লইয়া আপনাকে এই চিঠি লিখিতেছি। সাম্প্রতিক ঘূর্ণিবাত্যায় আশ্রমের স্কুল ঘরটির (হরিজন বিদ্যামন্দির) সকল খুঁটি ভাঙিয়া প্রকাণ্ড দোতলা ঘরটি পাটাতন সহ চাপিয়া পড়ায় স্কুলের বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি যাবতীয় আসবাব চুরমার হইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া ডাক্তারখানা ঘর, আশ্রমের বড় ঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি সব-ই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় জনসাধারণ প্রত্যেকে-ই আজ নিজেকে লইয়া বিব্রত এবং ব্যতিব্যস্ত—এ অবস্থায় পিতৃদেব ৺সুরেশ চন্দ্রের স্মৃতি ও কীর্তিরক্ষার জন্য কেহ অগ্রসর হইয়া আসিবে ইহা আশা করা যায় না। বর্তমানে আশ্রমে গঠনমূলক কর্ম বিশেষ কিছু করা সম্ভব না হইলেও হরিজন বিদ্যামন্দিরে হরিজন সম্প্রদায়ের এবং অন্যান্য শ্রেণীর বহু দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান ছাত্রছাত্রী বিনা বেতনে পড়াশুনা করিত। আমাদের একক প্রচেষ্টায় স্কুল ঘরের পুনর্নির্মাণ এবং আসবাবপত্রের সংস্কার সম্ভব নহে—বিশেষতঃ আশ্রমের একটি ঘরও যখন খাড়া নাই। আমার স্বামী স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক, সুতরাং তাঁহার সামর্থ্য নিতান্ত সীমাবদ্ধ এমতাবস্থায় ৺সুরেশ চন্দ্রের গুণগ্রাহী সমাজদরদী জন-

সাধারণ এবং সদাশয় পাকিস্থান সরকার অগ্রসর হইয়া না আসিলে শহরের একমাত্র অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়টি তাহার প্রায় ত্রিশ বৎসরের আদর্শ এবং ঐতিহ্য-সহ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

মহাপুরুষ ৺অবধূত মহারাজের আশীর্বাদ এবং সাহায্যপুষ্ট আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি আপনারও সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইবে না এই বিশ্বাস লইয়া আপনাকে চিঠিখানা লিখিলাম আপনি 'উজ্জীবন্তারত' পত্রিকায় এই প্রসংগ উল্লেখ করিলে এদিকের শুভানুধ্যায়ীদের দৃষ্টি এ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে। সকলের অবগতির জন্য বিষয়টি আপনার গোচর করিলাম।

ইতি—

সেবিকা—মায়ারাণী ঘোষ

স্বগত-বিলাপ ঃ প্রার্থনা

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

এ কথা ভাবিনি কোনদিন :
মানুষের সুখ-দুঃখে রবে উদাসীন
তোমরা সবাই ; আর আমরা দিনের
অজস্র বেদনা নিয়ে কাটাবো জীবন—
যে-জীবনে রূপ নেই, রস নেই,
বর্ণ গন্ধহীন এক ধূসর ভুবন।

শুধু ক্লান্তি অবসাদ, আর সাথে অতৃপ্ত কামনা,
বিকৃত বিভ্রান্ত পথে নিত্য আনাগোনা।
নেই শান্তি, নেই পুষ্টি ; শুধু দাহ, তারপর ছাই—
একেবারে মুছে যাওয়া। আর কিছু নাই।

এ-জীবন চেয়েছি কি ? এই জীবনের
স্বপ্ন কি দু-চোখ-ভরা ছিল সেই জীবন-যজ্ঞের
হোতাদের ? ছিল যারা ভিলে ভিলে সব কিছু—
ধন জন মান ;
দিল যারা অগণিত প্রাণ ?

তার বিনিময়ে
কী পেলাম ! সংকুচিত, সর্বরিক্ত এ-জীবন ঘরে !
চলার পথের কই ? ভেসে আসে 'বাণী'র ঝংকার
অনেক ওপর থেকে ; হায় গেছে যার
সে-'বাণী'র—মিথ্যে সে, সে তো মরীচিকা—
সে-শুধু ধাঁধায় চোখ, নেই শিখা।
আঁধার, আঁধার শুধু।
হায় ভগবান,
মুক্তি দাও, আলো দাও ; এই অপমান
দূর কর কঠিন আঘাতে ;
নামুক তোমার বজ্র, ধ্বংস হোক এ বিকৃতি—
তারপর একদিন প্রসন্ন প্রভাতে
কণ্ঠে নিয়ে সত্য-শিব-সুন্দরের চিরন্তন গান
করুক সম্মুখ পথে দীপ্ত অভিযান
আগামী দিনের যাত্রীদল :
তাদের চলার পথ সর্ব বাধা বিঘ্ন মুক্ত
হোক, শুচিস্নাত সমুজ্জ্বল।

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নয়নারায়ণ আশ্রম পোঃ দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইন্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

উদ্বোধন

শ্রাবণ, ১৮৮৩ শকাব্দ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

১৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

বিগত ১৯৫৬-র ২৩শে এপ্রিল শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার নিজস্ব স্থানে ২৪ পরগণার অন্তর্গত বাগুইআটি নামক গ্রামের নরনারায়ণ আশ্রমে আসেন। সেখানে তিনি ৯. ৫. ১৯৫৬ সন থেকে যতদিন পর্যন্ত প্রায় প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনার সময় কিছু বলিতেন। তাঁহার দ্রুত ও আবেগপূর্ণ ভাষণ হইতে সঙ্গে সঙ্গে আমি কিছু কিছু লিখিয়া রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম—মৌখিক ভাষণকে লেখায় পুরাপুরি তোলা সম্ভব নয়; তাই প্রতি দিনের ভাষণ হইতেই অনেক বাদ পড়িয়াছে। তবু যতটুকু লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাই আমাদের পক্ষে অপূর্ব ও অতি প্রয়োজনীয়। আমরা প্রথম যেদিন হইতে তিনি বলিয়াছিলেন সেদিন হইতে তাঁহার ভাষণ উদ্ধৃত করিলাম। সম্পাদিকা

৯. ৫. ১৯৫৬ (২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৩) সকাল।

প্রথমেই তিনি 'ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা, প্রভু তোমার পানে তোমার পানে…' এই গানটী করেন, তারপর বলেন, 'নিতাগোপাল, আমার প্রকৃতি তোমার মত হউক, তাহা না হইলে তোমায় পাইব না—'শিবং ভূত্বা শিবং যজেৎ'—তোমার টানে তোমায় পাওয়ার পথে সকল বাধা ছিন্ন হউক। আমার আমির উপার্জন সব নিঃস্ব হউক, আমার অহংকার দিয়া, বিচ্ছিন্নতা দিয়া যাহা কিছু সংবর্ধের মাঝে ভিক্ষায় পাইয়াছি, তাহা খালি হউক।…'আমি' মুছিয়া না গেলে তোমার দান লাভ হইবে না—'আমি' মলে ঘুচিবে জঞ্জাল'। তোমার ইচ্ছা আমার জীবনে জয়যুক্ত হউক। আমার আবার ইচ্ছা কি? আমার ইচ্ছার মত কোটি কোটি ইচ্ছা বিশ্বের আছে। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছাই থাকিবে, আমার ইচ্ছা কিছু থাকিবে না। রাবণের মাথা, কংসের মাথা উঁচু থাকে নাই—রাম ও কৃষ্ণের ইচ্ছাই জয়যুক্ত হইয়াছে।… অন্তর মম গোপনে থাক করে… তুমি যাহা দাও তাহা সম্মানের সঙ্গে দাও—মর্যাদা রাখিয়া দাও। তুমি তো অপমান করিতে জান না…তুমি তো অনেকবার বলিয়াছ, 'আমি জানি তোমরা আমারই নিকাশ'।…আমার গানে লোক উত্যক্ত হয়…তোমার গানে 'সকলই আজ বেজে উঠুক সুরে'। কি গান গাও? তোমার গানে যুগযুগান্ত ধরিয়া কত মানুষ ঘর ছাড়িল, সব ছাড়িল! উপনিষৎ বলছেন, তুমিই আমার আমি—আমার আমি মুছিয়া যাক, তোমার আমিই আমার আমি। তোমার গান জীবনে বরণ করিব। তোমার গান বিশ্বজনীন গান তোমার গান জগন্নাথের গান—তোমার গানে সকলই বাজিয়া উঠুক।…তোমারই বাঁশী শুনিয়া, তোমারই গান শুনিয়া পথে বাহির হইয়াছি, শত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছি কেবল এইজন্য যে তোমার ডাকে সাড়া দিব।…তোমার বুদ্ধি আমার হউক। জীবন সায়াহ্নে সমাধির তীরে দাঁড়াইয়া তোমার গান গাই, সে গান শুনিয়া বিশ্ববাসী তৃপ্ত হউক। একলা আমি, সারাজীবন একলা—যাহাদের লইয়া বাহির হইয়াছিলাম, তাহারা গিয়াছে, আজ যাহারা আছে তাহারা কে যাইবে, কে থাকিবে জানিনা… আমাকে চলিতেই হইবে।

৯. ৫. ৫৬ সন্ধ্যা।

শ্রীনিত্যগোপাল তখন নবদ্বীপে—নবদ্বীপ আমার দীক্ষা স্থান। তিনি একটা ছোট ঘরে খাটে বসে থাকতেন। তাতে অনন্ত ছারপোকা—একটীও তিনি মারতে দিতেন না। আমরা সামনের বারান্দায় বসতাম। আমার দীক্ষা নেবার পরের বার শোকহরণবাবু (আমার গুরুভাই) একদিন প্রশ্ন করেন, ঠাকুর, আমরা কত অপরাধ করি, আপনি কি অপরাধ নেন। ঠাকুর বললেন, পরমহংসমশাইকে * এ প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, আমি নেই না, কর্মফল আছে। শোকহরণবাবু বললেন, আমরা আপনার কথা শুনতে চাই। ঠাকুর বললেন, 'আমি অপরাধ নেই, তবে স্নেহ যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তখন সব ভেসে যায়'। পরমহংসদেব নিজে শাসন না করে কর্মফলরূপ জল্লাদের উপরে ব্যবস্থা রাখলেন। কিন্তু ঠাকুর পিতামাতা আত্মীয়ের মত শাস্তি দেবেন—বাপের হুকুমে চাকরকে দিয়ে, জজের হুকুমে পুলিশকে দিয়ে শাস্তি দেবেন না। নিজের হাতে নিজ সন্তানের শাস্তি অনেক মাত্রায় কম হয়। এইখানে শ্রীনিত্যগোপালের স্নেহ ও কৃপার অনন্ত পরিচয়। এর অর্থ এ নয় যে আমরা অপরাধ করেই চলব—আমরা না করতেই চেষ্টা করব—তবু হয়ে গেলে শাস্তি তিনি দেন—কিন্তু বেদনা নিজে নিয়ে—বুক কেঁদে ওঠে, তবু শাস্তি দেন দরকার আছে বলে।···তোমরা যারা এসেছ তারা সকলে এক দেহরূপ একটী অর্গানিজম্-এর মত হবে। তোমাদের প্রীতির মধ্যেই আমি বেঁচে থাকতে চাই। তোমরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে, পরস্পর পরস্পরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে চলো, ঠাকুরের কথা আলোচনা করে করে যেন তোমরা চলো।··· পারস্পরিক সুখদুঃখ-বোধ না থাকলে সে আবার একটা সঙ্ঘ কি? যারা তোমরী এসেছ দুইএকজন, তারা মানুষ হবে।···নিত্যগোপাল সব সময় আশীর্বাদ করছেন, তিনি আজ তাই ইউরওয়েলের পাইপ পাঠিয়ে দিয়েছেন। দুগ্ধ-ভোগ মাসখানেক করলেই তাঁর দয়া হবে।···তোমরা ভাই ভাই মিলে মিশে থেকো।···

১০. ৪. ১৯৫৬—২৭শে চৈত্র ১৩৬৩—সকাল।

যিনি বিপ্রলব্ধা বাণী কাত্যায়নী, তিনিই বৃষভানুপুরে শ্রীরাধারূপে অবতীর্ণা।...নিত্যগোপাল, আমার হৃদয়ের ধন, তুমি ছাড়া আমার কিছু নাই—সকল রিক্ততা ঘিরিয়া তুমি সঙ্গে সঙ্গে আছ। নিত্যগোপাল...আমার দিন গেল...তুমি আমি এক দেহ, এক আত্মা, এক আনন্দ... তুমি আমার জীবনের ধ্রুবতারা।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।

—শ্বেতাশ্বতর

শুষ্ক প্রত্যক্ষ জগৎ আগলিয়া থাকেন, আকাশের ভগবান প্রত্যক্ষের সমাধান দিতে পারেন না। নিত্যগোপাল, তুমি আমার প্রত্যক্ষ, তুমি আমার অন্তর্যামী, তুমি immanent, trauscendent। প্রত্যক্ষকে মানতে না পারলে ধ্যানের ভগবানকে মানা নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। তাই ব্রহ্মসূত্রে বারবার বলেছেন, প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।... অপ্রত্যক্ষ ভগবানকে ভোগ দেওয়া সহজ, প্রত্যক্ষ মানুষকে দেওয়া সহজ নয়। আকাশের ভগবানের কাছে শরণাগত হওয়া সহজ, কিন্তু প্রত্যক্ষের কাছে শরণাগত হতে হলে নিজের অহংকার, নিজের অনেক কিছু ছাড়তে হয়...প্রত্যক্ষের কাছে হার মানতে হবে, তা না হলে প্রকৃতি বদলায় না। যার জীবনে সাগরের প্রকাশ, বিরাটের প্রকাশ তেমন একজনের কাছে দেহমনপ্রাণ দিয়ে শরণাগত হতে হয়।...নিত্যগোপাল, আকাশ তোমার মাথা, দিক তোমার পা।.. প্রত্যক্ষকে মেনে বুদ্ধির দৈন্য কাটুক।...ধরার ধূলি হোক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্মমানুষ।...

সন্ধ্যারতির পর—

ঠাকুর তখন হুগলীতে—একখানা খাটের উপর বসতেন ...আমরা নীচে বসতাম—পাঠগানকীর্তন আর ঠাকুরের সমাধিতে দিন কাটত। পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ঠাকুরকে সখা-ভাবে ভাল বাসতেন। একদিন তিনি ঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন, আপনি আমাদের বাবু বলেন কেন? আপনি

* শ্রীনিত্যগোপাল শ্রীপরমহংসদেবকে পরমহংসমশাই বলে উল্লেখ করতেন।

বলেন বেন? ঠাকুর বললেন, 'ছোট ছেলেকে মানুষ খোকাবাবু বলে না? বা মানে সুন্দর, বু মানে গন্ধ—পানী শব্দ। তোমাদের সুন্দর গন্ধ—তাই তোমাদের বাবু বলি। আর আপনি? মানুষ তো নিজেকে আপনি বলে—আমি আপনি এ কাজ করেছি—আমি জানি তোমরা আমারই বিকাশ'।—এই বলে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। ঠাকুর নিত্যগোপাল, কত স্নেহ তুমি করেছ—কত কষ্ট করে তুমি মঠ চালিয়েছ, মসলার কোল খেয়ে থেকেছ, একপো ডালে পাঁচিশ জনের খাওয়াও তোমাকে চালাতে হয়েছে—কত বেঁচে ভক্তদের তুমি খাইয়েছ।...তোমার আশীর্বাদে মানুষকে আমি ভালবেসেছি...যারা আমার কাছে এল তাদের অমনি করে স্নেহ করতে চেয়েছি—সবাইকে নিজ বলে মনে করেছি—সুখের দিনে আমি কারো কেউ না হলেও দুঃখের দিনে আমি আছি।...ছেড়ে গেছে অনেকে, কে থাকবে, কে যাবে জানি না।...সঙ্ঘ গড়তেই হবে—মিলতেই হবে—আত্মা এক—মানুষ আত্মা—তাই মানুষে মানুষে মিলতেই হবে—বিচ্ছেদ হতেই পারে না।...নিজেরা বুদ্ধিমান সাজলে আমি কিছু করতে পারি না, অনুগতকে আমার জিনিস দিতে পারি—বুদ্ধি যারা চালাবে, তাদের জন্য বিরাট বিশ্ব রয়েছে।...ঠাকুর; আমার মন তোমার, প্রাণ তোমার, দেহ তোমার—আমি তোমার বিকাশ—মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ কাটিয়ে দাও, বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে দাও—আমরা তোমারই বিকাশ—তোমার এ কথা সার্থক হোক। তোমার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম—ঐ আমার যাবার দিন সামনে—কতদিন আর থাকব? আজও আমি সেবা করতে চাই—মানুষে মানুষে মিলতে পারবে না—এ আমি সইতে পারি না।... জরাসন্ধ রাবণের খেয়াল টেকেনি—কৃষ্ণ রাম আজও বেঁচে আছেন।...ধরার ধূলি হোক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্ম মানুষ।

১১. ৫. ৪৬।

৪৪০ শত বৎসর আগের গৌরগোপালই নিত্যগোপাল—তিনিই কৃষ্ণগোপাল। কৃষ্ণপ্রেমে অশান্ত গৌর নিত্যগোপালরূপে শান্ত সমাহিত।...তোমাদের প্রার্থনা হোক—আমায় সরল কর, অকপট কর, সকল অভিসন্ধি দূর কর, আমায় সহজ কর, অনাড়ম্বর কর, আমায় পরম বৈরাগ্য ও তপস্যা প্রদান কর। যে তপস্যায় তুমি দিনের পর দিন কাটাইয়াছ, পুতুলের কান্না যাইয়াও তুমি দিন কাটাইয়াছ আমি হীন হীন, তত পারিব না—তবু সাধ হয় সেই পথে চলি তুমি আমার একমাত্র সার।... আমার প্রয়োজন তুমি...তুমি আমার সব...আমি তোমার শরণাগত...তোমার বুদ্ধিতে আমি বুদ্ধিমান হইব। আমার অহংকার গলিয়া যাক।...আমি তোমারই মাঝে সত্য, তোমার বাহিরে আমি মিথ্যা...তুমি কান্না আমি ছায়া...তুমি আছ আমি নাই...তোমারই কর্ম, তোমারই আশ্রম, তোমার দুনিয়া। আমায় শুধু সেবা করিবার অধিকার দাও, যোগ্যতা দাও, আমার অহংকার কাড়িয়া লও।...নিত্যগোপাল, তুমি যেমন করিয়া আশ্রম চালাইতে, সেইরূপ যেন আমি করিতে পারি। তোমার শেষ উপদেশ সার্থক হউক।...আমার প্রাণ দাও—বুদ্ধির মোহে কিন্তু পীড়িত—আমায় প্রাণ দাও।...আমি তোমার ...আমি তো কাহারও স্বাধীনতা কাড়িয়া লই নাই—অথচ অপরে যদি স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খল হয় তবে তো উপায় নাই।...জগন্নাথ, সর্বভূতাত্মা নিত্যগোপাল জীবন সায়াহ্নে আমি তোমারই হইব।...তোমার দেহ মনপ্রাণ তোমাকে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়া যাইব.. আমার ভার আমি বহিব না।...।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫০—

(৬)

সকালে 'দল ভিড় ও উচ্ছৃঙ্খল জনতা' প্রবন্ধের আরও কতকটা লিখি।···বেণু কলিকাতা সুবোধবাবু, মন্মথ রায় ও গভর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপন বিভাগের কাছে যায়। ৫টার পর ফেরে। ইহার পূর্ব্বে প্রতিভা পোস্টাফিসে ঘুরিয়া আসে।···সতীনাথের অঙ্কের পরীক্ষা ভাল হয় নাই। মোট ৩০ নম্বর শুদ্ধ করিয়াছে। বেণু বাঙ্গলার পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়াছে।···পাবনার কোনও লোক প্রতিভার ওখানে আসিয়াছিল। একদল সেখান হইতে আসিয়াছে। রিক্সা ভাড়া বাস স্টাণ্ড পর্য্যন্ত নাকি দিয়াছে প্রত্যেক রিক্সা ১০৲ ঈশ্বরদি হইতে প্রতিটি টিকেট ৪০৲ চল্লিশ টাকা।···আফিসে এরূপ কেহ আসে না, 'কারও দেখা নাহি পাই'। বেশ মজার অবস্থার মধ্যে আছি তবু ঠাকুর বলিয়াছেন, 'শরৎ, তুমি যখন যেখানে আছ সঙ্গে সঙ্গে আছি'। আমার তাহাই ভরসা। মঠে ঠাকুরের আলোচনা নাই। শত চেষ্টাতেও সেখানে ঠাকুরের আলোচনা জমানো সম্ভব হইল না। ঠাকুর আসিয়া পড়িয়াছেন শুধু কতগুলি মুখস্থ কথা আচারের ভিতরে। জীবনে তাঁহাকে অনুভব করার কথা সেখানে ভুল হইয়া গিয়াছে। জীবনের বাহিরে তিনি। প্রাণহীন সব। কে কাহার খোঁজ রাখে? তবুও একটা অজ্ঞাত টানে এখনও ঠাকুরের আশ্রিতেরা দূর হইতে আসেন। এখানে আদর করিবার কেহ নাই। অথচ ঠাকুর ছিলেন মূর্ত্তিমান আদর।

২৯শে মার্চ

'দল, ভিড় ও উচ্ছৃঙ্খল জনতা' প্রবন্ধটা লেখা শেষ করি। বেণু আজ আর বাহির হয় না। 'চরিত্রহীন' প্রবন্ধটা লেখে। ১২টার মধ্যে এখানে আসে। প্রতিভা আসে প্রায় ১২টায়···। সেবানন্দ আসিয়াছিল মঠ হইতে নগেনদাদার এক চিরকুট হইয়া 'ভক্ত-সমিতির' একজন সভ্য হইবার অনুমতি চাহিয়া। আমি বৈকালে যাইব বলিয়া দিলাম ···সেই ভদ্রলোককে উপরে নিয়া আসি। প্রায় আধ ঘণ্টা কথাবার্ত্তা হয়। ব্রহ্মতত্ত্ব ও পুরুষোত্তমতত্ত্ব, G. C. M., L. C. M.-এর আলোচনা হয়। ব্রহ্মতত্ত্বে জগৎ ও তাহার বৈচিত্র্য বাদ পড়িয়া যায়; পুরুষোত্তম-তত্ত্বে সর্ব্ব বিশেষ সমন্বিত নির্ব্বিশেষেরই মহিমা স্বীকৃত হয়। ৬টার সময় আফিস হইয়া মঠে যাই। মঠে বেশীক্ষণ থাকি না, আবার আফিসে আসিয়া পড়ি।···তাহাকে (মালতীকে) অমৃতবাজারের কিছুটা পড়িতে বলা হইল। সে পড়িল। যে শব্দ সে জানে না, সেগুলিকে তাহার অর্থসহ লিখিয়া নিল।···

৩০শে মার্চ

সকালে 'ভিড় ও উচ্ছৃঙ্খল জনতার মনস্তত্ত্ব' প্রবন্ধটী লেখা শেষ করি, পুস্তক পরিচয়—উপাসনা—(অজিত মল্লিক) লেখা আরম্ভ করি। প্রতিভা আসে প্রায় ৩টায় পোস্টআফিস ঘুরিয়া। বেণু কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, বার্মা-শেল, বোম্বে মিউচুয়াল প্রভৃতি স্নান হইয়া ৩টার পর আসে। প্রতিভা মেটে আলু কিনিয়া নিয়া আসে। সে 'ভিড় ও উচ্ছৃঙ্খল জনতা' প্রবন্ধটা নকল করা শেষ করে, 'পুস্তক পরিচয়' আরম্ভ করে। সন্ধ্যার আগে আফিসে যাই। সেখানে পুতুল সেন ও তাহার একটী মেয়ে বন্ধু আসে। পুতুল সেনকে দিয়া 'শ্রীনিত্যগোপাল ও উপনিষদের প্রাণদর্শন' প্রবন্ধ পড়াই, আমি ব্যাখ্যা করিয়া দেই। ৮টার পর সে যায়। তাহাকে নিয়া কাল আসিবার কথা বলিয়া গেল। ইহার মধ্যে গোকুল আসে।

তাহার পর রামগোপাল আসে। সে ১টার পর চলিয়া যায়, আমিও আশ্রমে চলিয়া আসি।...রেণুর বৈশাখের 'চরিত্রহীন' লেখা আজ শেষ করে ও সন্ধ্যার পর শোনায়। ... অতসীর বোন ও স্বামী আসিয়াছিল।...ভদ্রলোকটী আমাকে সেরপুরে দেখিয়াছেন।... আমি যখন জগৎকিশোর আচার্য্যের ওখানে ভগবত পাঠ করি, তখনও সেখানে ঐ ভদ্রলোক ছিলেন।

৩১শে মার্চ

সকালে বিবেকানন্দ সোসাইটী হইতে সেই পুরাতন ব্রহ্মচারীটী আসেন আগামী কল্যের সভার খবর জানাইতে।...রেণুর ওখানে যাই ৮।৩০ টার পর। রেণু আফিসে ছিল না, সে জ্যোতিষবাবু, পরিমল সেন ও শশীবাবুর ওখানে হইয়া প্রায় ৯টায় ফেরে। আমি কিছু পরেই চলিয়া আসি। রেণু ফোরাম ট্রাস্ট ও সুনীল দাসের ওখানে যায়। সুনীল দাস পুরুষোত্তমদর্শন প্রচারের জন্য ১০৲ টাকা দেয়। নমিতার শরীর ভাল নয় বলিয়া সে আগামী ৫ দিনের বিদায় নিয়াছে ট্রপিক্যালে বেড়াইবে।... যাহির হইব এমন সময় সেবানন্দ খবর দিল যে, মহেশ্বরানন্দ দেহরক্ষা করিয়াছেন। আমি ট্রামে মঠে গিয়া একবার দেখিয়া আসি। তাহাকে গড়িয়া তাহার নিজ জমিতে সমাধিস্থ করা হইবে। মেয়েরা খুব কান্না-কাটি করিতে থাকে। আমি ফিরিব, তখন রেণু সেখানে উপস্থিত। আমি তখনই চলিয়া আসি। আমার সঙ্গে হুগলীর হরিবাবুর ভাই আফিস পর্য্যন্ত আসেন। তিনি উদ্বোধনভারতের ১ বৎসরের গ্রাহক হন, ৩৲ টাকা দিলেন। কিছু পরেই পুতুল সেন ও তাহার বাবা আসেন। পুতুলের বাবার সঙ্গে ৯টা পর্য্যন্ত কথা হয়। তাঁহাকে কেনোপনিষদের ভাষ্য পড়িতে দেই। তিনি পড়েন, আমি ব্যাখ্যা করি। পুতুল বাহির হইয়া গিয়াছিল, ৯টায় আসিয়া তাহার বাবাকে লইয়া চলিয়া যায়।...

১লা এপ্রিল

রামকৃষ্ণ-নিত্যগোপাল ছিলেন 'যুগল'। আমি নিত্যগোপালের, স্বামিজী রামকৃষ্ণের। সে হিসাবে স্বামিজী আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর। তাঁহার জীবন সমস্ত শাস্ত্র-ব্যাখ্যার বাহিরে। তাঁহার জীবনকে সামনে রাখিয়া ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনে জেলে শাস্ত্রের dynamic ব্যাখ্যা লিখিয়াছি। স্বামিজীর কনিষ্ঠ সহোদর হিসাবে আমি তাহা বাঙ্গালায় ছড়াইয়া দিব।

প্রায় ৯টায় রেণু নলিনীবাবুর সঙ্গে কল্যাণ চৌধুরী, সুনীল সেন, অবলাবাবুর ওখানে যায়। ১১টার পর ফেরে।...৪।৩০টার পর ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে স্বামী বিবেকানন্দ সোসাইটীর দ্বারা অনুষ্ঠিত স্বামিজীর জন্মদিন উপলক্ষে বক্তৃতা দিতে যাই। সঙ্গে উষাবিশী, প্রতিভা ও রেণু ছিল। সভাপতি—বিচারপতি গোপেন্দ্রনাথ দাস। বক্তাগণ—স্বামী রাঘবানন্দ, পরে মাহিলাড়ার সুধীর দাস, পরে রায় বাহাদুর নিবারণ চন্দ্র ঘোষ, পরে সুন্দরানন্দ, সর্ব্বশেষ আমি। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন প্রাচীন ভারতের সঙ্গে নবীন ভারতের যোগসূত্র। রামকৃষ্ণ ছিলেন অতীত ভারতের প্রতীক, বিবেকানন্দ ছিলেন বর্ত্তমান ভারতের। 'যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ' ইত্যাদি। বর্ত্তমানে হিন্দু মুসলমানে যে সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে, তাহার ভিতরে স্বামিজীর জীবনে কি মীমাংসা পাইব, তাহা দেখিতে হইবে। শরৎচন্দ্র কমলের মুখ দিয়া বলিয়াছেন —ভালর শত্রু মন্দ নয়। ভালর শত্রু আরও ভাল যে, সে...ইত্যাদি। পরীক্ষা আজ হিন্দুকেও দিতে হইবে, মুসলমানকেও। সেই পরীক্ষাই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন ভারত জোর দিয়াছে সত্ত্বগুণ, নৈষ্কর্ম্ম ও ব্যক্তি-সাধনার উপর। স্বামিজী জোর দিয়াছেন রজঃ, কর্ম্ম ও সঙ্ঘের উপর। রজঃ রজঃ, কর্ম্ম কর্ম্ম, সঙ্ঘ সঙ্ঘ বলিয়া কি আর্ত্তনাদই না তিনি করিয়াছেন! দুহাজার বৎসরের লড়াই। এ জন্য ঘাবড়াইলে চলিবে না। এইবার সমস্যা সমাধানপ্রায়। আপনাতে আপনি থাক। মুসলমানদের আলালো আগুনে...মরিবে, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের মধ্যে ইসলাম, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সব পরিপাক হইবে। 'শেষ' পয়গম্বর বলিয়া হজরত মহম্মদকে স্থাপন করার ফলে সে কালের কাছে অপরাধ করিল। ভবিষ্যৎ সে মানে না, কাজেই

ভবিষ্যৎ তাহার অন্ধকার। আলোচনা শ্রোতাদের খুব ভাল লাগিয়াছিল। সভার শেষে বহু শ্রোতা ফোন করিবার জন্য ঠিকানা নিয়া যায়। নেত্রকোণার অমর বাবুর পুত্র ললিত সান্যালের সঙ্গে দেখা। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে মানুষকে কিছুই দেওয়া হইতেছে না। মানুষও কিছু পাইতেছে না ভাবিবার খোরাক। ধাক্কা দিলে কলিকাতা নড়িত। কিন্তু কি অসহায় অবস্থার মধ্যে আছি। কলিকাতা হইতে আমি ও রেণু আফিসে যাই।...

২রা এপ্রিল

গতকল্যকার বক্তৃতার রিপোর্ট আজিকার আনন্দবাজার ও যুগান্তর পত্রিকায় বাহির হয়। উহা লইয়া ১টার পর আফিসে যাই।...আজ ১১টায় ত্রিপুরাশঙ্করবাবু আফিসে আসেন ও রেণুর সঙ্গে দেখা হয়। রেণু মন্মথবাবু ও লাহিড়ীর কাছে যায়। পি, টি, স্কুলগুলির উদ্বোধনভাষণের জন্য দরখাস্ত করা হয়। ৩টার পর রেণু জ্যোতিষবাবুর বাসায় যায় একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করিতে, যে মেয়েটী বলিয়াছিল, 'হয় আত্মহত্যা করিব, নয় সিনেমায় যাইব,' তাহার মনের গতি ফিরাইবার জন্য। রেণু আজ আর এখানে আসে না। মালতী আসে ৪টার পূর্বে। সে 'শ্রীনিতাগোপাল ও উপনিষদের প্রাণদর্শন' পড়িতে আরম্ভ করিতে করিতেই কালকার বক্তৃতার একজন শ্রোতা আসেন। তাহার সঙ্গে আধ ঘণ্টার মত কথাবার্ত্তা হয় বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে। তাহার পর আমি প্রতিভা ও মালতী আফিসে যাই। মালতী সেখানে 'লোকসংগ্রহ ও শ্রীগৌর সুন্দর' প্রবন্ধটী পড়ে।...যে একবার 'বাহিরে' আসিয়া বাহিরের সঙ্গে জড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে অন্তর্মুখো করা একরূপ অসম্ভব, তবে খুব অল্পক্ষণ থাকিলে পারা যায় বটে। সকালে আফিসে গিয়া দেখি পুতুল সেন আসিয়াছে,--পুতুল সরকারের নিকট উদ্বোধনভাষণের জন্য লিখিত চিঠিটা টাইপ করিয়া দিয়াছে। সে রেণুর ওখানে খাওয়া দাওয়া করিয়া আফিসে যায়। পুতুলের সঙ্গে 'ঘর ও বাহিরের' সামন্ত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়।...

৩রা এপ্রিল

সকালে 'কঠোপনিষৎ'-এর ও আগামী মাসের গীতার পাণ্ডুলিপি দেখি। রেণু আজ 'চরিত্রহীন' বর্ত্তমান মাসের জন্য শেষ করিবার জন্য বাহির হয় না। ১টার পর আসিয়া ব্যাঙ্কে ২০০৲ টাকা জমা দিয়া আসে।...মন্থ প্রতিভার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছে, 'ব্রহ্মসূত্র ছাপাইতে কত খরচ লাগিবে। বাবা তো আমার নাম রাখিয়াছিলেন 'বেদান্তপ্রকাশিনী', জীবনে তো কিছু হইল না, বইটা যদি ছাপাইয়া দিতে পারি দেখিব'। ইহা শুনিয়া প্রাণ আমার বেদনায় ভরিয়া উঠিল। বেদান্ত আমার রক্তের সমস্তীয়দের নিজস্ব দিয়া প্রকাশিত হউক, ইহা তো আমার কামনার বস্তু ছিল। হয় তো হইবে। ঈশ উপনিষৎ ছাপাইবার সময় মঞ্জ-নীহার কাগজের দামটা (প্রায় এক শত টাকা মত) সবই দিয়াছে। কেনোপনিষদের কাগজের দামও তো তাহারাই দিয়াছে। হরিপদ মুখার্জী রোড হইতে মিত্র স্কুলের ফার্স্ট ক্লাসের একটী ছাত্র দেখা করিতে আসিয়াছিল, তাহার পিতা পঞ্চানন যে প্রফেসর, তাহাকে একটা চৈত্রমাসের উদ্বোধনভাষণ দেই।...

৪ঠা এপ্রিল

বৈশাখ মাসের গীতাভাষ্যটা আবার আর একটু দেখি। ...রেণু...বাথগেট প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া ৪টার সময় আসে। প্রতিভা হানিম্যান হইয়া ৩টার মধ্যে আসে ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের পৃষ্ঠা সংখ্যা দেয়, পৃথকও করে। বীরেনবাবু আজ আসেন।...অংশুপ্রকাশ যে আজ আবার আসে এবং গতকল্য যে চৈত্র সংখ্যা উদ্বোধনভাষণ নিয়া গিয়াছিল, তাহার দাম দিয়া যায়। সে অফিস পর্য্যন্ত যায়। ৮টার পর পুতুল আসে। ৮৷৷০টার পর চলিয়া যায়।...

৫ই এপ্রিল

সকালে ব্রহ্মসূত্রের 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্'-সূত্রটি পুনরায়

লিখিবার চেষ্টা করি, ঐটী তেমন স্পষ্ট হয় নাই। ৮।০ টার পর শিশির আসে, সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিভা আসে।... রেণু ১০।১০টার পর দমদম গ্রামোফোণ কোং ও পরে রোবে আর্সারীতে যায়। ২।০টার পর এখানে আসে। ৩-২০-র গাড়ীতে আমরা চাকুরিয়া যাই। মা নীলিমার শরীর বেশ অসুস্থ...৪টার পর রামচন্দ্র স্কুল পর্য্যন্ত হাঁটিয়া বিকলায় ২নং বাসে পর্য্যন্ত। ২নং বাসে রাসবিহারীর মোড় পর্য্যন্ত। আফিসে যাই।...মাখনবাবু আসে কতগুলি তাহার নিজের বাগানের আলু লইয়া।...

৬ই এপ্রিল

সকালে ব্রহ্মসূত্রের 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' সূত্রটীর (প্রথম দিকটা) ভাষ্য নূতন করিয়া লিখি। রেণু আজ স্কুলে যে-র ওখানে যায়, ১১টার মধ্যে ফেরে।...সন্ধ্যার পর পুতুল আসে। কিছু পরে নলিনীবাবুও আসিয়া ব্যাপার জানিয়া যান। পুতুলের সঙ্গে অনেকক্ষণ আমাদের দর্শন আলোচনা হয়। 'প্রাদেশিকতা ও জাতীয়তা' প্রবন্ধটী রেণু পড়িয়া শুনায় ও তাহার উপর আলোচনা চলে প্রতি প্রদেশকে স্বয়ংপূর্ণ ও কেবল রাখিয়া এবং প্রত্যেক প্রদেশের সঙ্গে সমন্বয় করাইয়া যাহা প্রতি প্রদেশের অতীত, তাহা জাতি। নরনারীর সমকক্ষতা সম্বন্ধেও আলোচনা হয়। রাত্রি ৯টার পর ফিরি।...

৭ই এপ্রিল

সকালে আমি নিজে 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' সূত্রের ভাষ্যের প্রথম দিকটা নূতন একটী ফুলস্কেপ কাগজে লিখি। রেণু প্রায় ২টায় আসে। প্রতিভা পোস্টাফিস ঘুরিয়া তাহার পর আসে।...সন্ধ্যার কিছু পর ত্রিপুরাশঙ্করবাবু আসেন। কোনও কাজের বন্দোবস্ত এখন পর্যন্ত হয় নাই। তাহার সঙ্গে কথার মধ্যেই দশগ্রামের ঈশ্বর প্রামাণিক আসে: আমাকে লইয়া যে ফটোগুলি তুলিয়াছিল, তাহা দিয়া যায়। তাহার নিজের টাকা ও একজনের ছয়মাসের ২৲ টাকা দিয়া যায়।...রেণু ম্যাট্রিকুলেসনের বাঙ্গলার প্রথম পেপারের পরীক্ষক হইয়াছে।...

৮ই এপ্রিল

গীতার ২য় অধ্যায়ের প্রথমে 'শ্রীভগবান্ উবাচ' অংশটা পুনরায় শুধাইয়া লিখি। মালতী ও প্রতিভাকে আমার স্কেলের সমস্ত লেখাগুলি দেখাইয়াছি। তাহারা উহার ভার লইতে পারিবে কি না জিজ্ঞাসা করিলাম উহারা প্রাণপণ করিবে বলিল। কি করিয়া লেখাগুলি মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া দিব, ইহাই তো বেদনা।...

গতকাল মন্তুর মেয়ের অসুখের কথা শুনিয়া আজ সকালে সেখানে যাই।...৯টার আগেই ফিরি।...রেণু আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্‌সট্রাকসান আনিতে যায় কি ভাবে কাগজ দেখিতে হইবে তাহার। কাগজ নিয়া ৩টার পূর্ব্বে ফেরে।...ইহাদিগকে পাইলে মানুষ করাও যাইতে পারে, ঠাকুরের কাজও হইতে পারে। তবে চাই দৃঢ় সম্বন্ধ ও সরল আত্মগত্য। 'তেষাং সততযুক্তানাং' ইত্যাদি শ্লোক, 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্', 'বুদ্ধৌশরণমন্বিচ্ছ' মুখস্থ করিতে গতকালই দিয়া ছিলাম।...

গীতার 'অশোচ্যান্' শ্লোকটী আবার নূতন করিয়া প্রথম দিকটা লিখি। রেণু সকালে 'কাগজ' দেখে। দুপুরে সেফ ডিপোজিট ভল্ট ও অন্যান্য জায়গায় যায়। ৩টার পর ফেরে।...তাহারা দীক্ষা নিতে চায়। ঠাকুরের সেবায় যদি জীবন দেই, তবে দীক্ষা দেওয়া ও সঙ্গে নিবার অর্থ হয়। নহিলে দায়িত্ব নিয়া কি করিব? উহারা একরূপ অভিভাবকহীন। দুরন্ত এই সংসারের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। উহাদিগকে রক্ষা করার সমস্যা খুব। এ বিষয়ে রেণু ও প্রতিভার সঙ্গে আলোচনা করি। তাহারা যদি তাহাদের জীবনের মধ্যে ঘিরিয়া রাখে, তবে এ দায়িত্ব নেওয়া চলে। মানুষ করিতে না পারিলে, মানুষের মত দাঁড়াইয়া কাজ করিবার যোগ্য করিতে না পারিলে সঙ্গে টানিয়া লওয়ার অর্থ হয় না। উহারা আমার বইগুলি পড়িবে ও প্রচার করিবে, জীবনে আচরণ তো করিবেই—ইহাই আমার

১১ই এপ্রিল

সকালে গীতার 'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং' শ্লোকটীর ভাষ্য আবার লিখি। ইতিমধ্যে প্রেস হইতে দাবোধান রেণুর ওখান হইয়া প্রুফ—দ্বিতীয় ফর্ম—দিয়া যায় ও তাহা দেখি। প্রতিভা...আসে সাড়ে ১০।টায়, ১২টা পর্য্যন্ত থাকে। সে আজ আর বৈকালে আসে না।...রেণু কলিকাতা ঘুরিয়া ৫৸০টায় আসে।...উহাদিগকে সরল প্রাণে অকপটে তাহাদের অতীত জীবনের কথা বলিতে বলি, যেখান হইতে নূতন যাত্রাপথে রওয়ানা হওয়া সম্ভব হইবে। অতীতের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়াই তো সামনে আগাইয়া যাইতে হইবে।...রেণু বৈকালে রাধাগোবিন্দ বসাকের ওখান হইতে তাঁহার লেখা প্রবন্ধের প্রুফ নিয়া এন্ সি গুহ, নরেন সেব ও শ্রীহরি গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা করিয়া ৭টার মধ্যে ফেরে।

১২ই এপ্রিল

সকালে একবার আফিসে যাই। সাময়িকী 'ভারত-পাকিস্থান-চুক্তি'টা লিখিতে আরম্ভ করি।...মেদিনীপুরের মুহুরীরা জানা আসেন। তাহারা সেখানে একটী ঐক্য-বদ্ধ সমিতি করিয়াছেন। আগামী ৯ই।১০ই মে একটী সভা করিবেন, সে সময় আমাকে যাইতে হইবে। মন্মথবাবুর ওখান হইতে আসিতেছেন। উজ্জলভারত ১ম বর্ষ ৩৲ টাকা দিয়া নিলেন। মঠ হইতে কৃপানন্দ (মহেশ্বরানন্দের শিষ্য) আগামী রবিবার মঠে উৎসব হইবে মহেশ্বরানন্দের তিরোভাব উপলক্ষে, তাহারই নিমন্ত্রণ জানাইতে।

১৩ই এপ্রিল

পয়লা বৈশাখ ১৩৫৭

বাঁশী বাজিয়াছে, ডাক আসিয়াছে, কে আছ অভিসারিণী, চল ছুটিয়া চল, কৃষ্ণ-অভিসারে যাইবে। এই অভিসার-যাত্রায় আজ সকলে উদ্বুদ্ধ হও। আমি ছুটিয়া চলিয়াছি, অভিসারিণী শ্রীরাধা আমার জীবন-দুয়ারে ডাকিয়া গিয়াছেন। আমি বাহির হইয়া পড়িয়াছি। আমাকে তো যাইতেই হইবে, আমার অভিসার ছাড়া গতি নাই। চল আমার সঙ্গে এক দেহ, এক প্রাণ, এক মন, এক বিজ্ঞান ও একানন্দ হইয়া পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র রচনা করিতে হইবে—অভিসারের ইহাই প্রথম প্রয়োজন। দুকূল ভাসিয়া দুকূল প্লাবিয়া উন্মাদিনী বেগে ছুটিয়া চল। ঐ যে ব্রজপথ সকল পথের মধ্যে বিস্তৃরিত দেখিতেছি। ভয় নাই, পরাণ পুতলী শ্রীরাধা আমার জীবনের সবটুকু অধিকার করিয়া আছেন। তোমরাও তাঁহার অনুবর্তিনী হইয়া চল। প্রার্থনার পর উষাদিদীকে সারাজীবনের এই অভিসার সম্পর্কে কিছু বলি। ইতিমধ্যে রেণু আসে। সে কিছু পর ঠাকুরের জন্য ফুলের মালা- ১।০, ছোট ২টী মালা, মিষ্টি নিয়া আসিয়া ঠাকুরকে সুন্দর করিয়া সাজায়। ৮টার পর একা প্রণতি আসে। এ বেলা মালতী আসিতে পারিল না। সে কাঁদিতেছিল। আমাদেরও মনটা খারাপ হইয়া গেল। তাহার উপর স্নেহদৃষ্টি বেশী করিয়া পড়িল। তাহার আসিতে-না-পারা এইখানেই সার্থক হইল। সে সেখানে থাকিয়া খুব স্মরণও করিয়াছে। রাধার সার্থকতা মিলিয়াছে। ইহার পর প্রণতিকে দীক্ষাময় দেওয়া হয়। তাহার জীবনের চতুর্দিকের অবরোধকে ভাঙ্গিয়া বিশ্বের মুক্ত প্রাঙ্গনে নিয়া আসা হয়। সে আজ পুরুষোত্তম-শরণাগত। ইহার পর জিতেন কুশারী আসে। সুধাংশু ছিল...জিতেন 'স্বরাজ' পত্রিকার এডিটার হইয়াছে। ইহার পর আসে গৌরহরি দে সরকার। সে পত্রিকার গ্রাহক হইবে, দিয়া যায় ৩ মাসের ৮৲০। যাখনবাবু আসে, প্রণাম করিয়া ও প্রসাদ লইয়া চলিয়া যায়। রেণু ঠাকুর পূজার বন্দোবস্ত করিয়া বাসায় চলিয়া যায়। ১২ টায় পূর্বে আসে। মালতী আসে প্রায় ৪টায়। তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। এমনি করিয়াই তো মানুষের প্রতীক্ষা করিলাম। তখন তাহাকে দীক্ষা দেওয়া হয়। আমরা বাহির হইব এমন সময় সচ্চিদানন্দ সরস্বতী আসে।

১৪ই এপ্রিল

সকালে 'ভারতপাকিস্থান-চুক্তি'—সাময়িকীর কিছুটা লিখি। রেণু ১০টায় পর ১ম, ২য়, ৩য় কর্মের প্রুফ রাখিয়া—দমদমে হিন্দ মাস্টারস্ ভয়েস-এ যায়···আজ একটা দাঁত নড়িয়া যাওয়ায় খুব বেদনা বোধ হইতেছে।··· একই 'বিদ্' ধাতু হইতে বেদ (জ্ঞান) ও বেদনা দুই-ই হইয়াছে। বেদনাযুক্ত বেদই তো সত্য বেদ। কিন্তু জীবন যদি হয় যান্ত্রিক, তখন বেদ অর্থ শুধু জ্ঞান। জীবন dynamic হইলেই সেখানে সর্ব্ব বেদ সর্ব্ব বেদনার সঙ্গে যুক্ত হয়। দাঁতের সঙ্গে আমার যোগ যদি যান্ত্রিক হইত, তবে দাঁত নিয়া এত বেদনা বোধ করিতাম না। কিন্তু যোগ যে নিতান্তই জীবনগত, বেদনা প্রচুর। এখানে বেদনাময় হইয়াই বেদ মূর্ত্তিত হইতেছে। বেদনাময়ঘনঘন শ্রীভগবানের জীবনে জীবন মিলাইয়াই এই বেদনাকে পরিপাক করিতে হয়, সহিতে হয়। প্রতি অঙ্গের কান্নার ভিতর দিয়া মানুষ বেদনার ঘনকেই পায়। বেদেরই ঘনীভূত আস্বাদন যে বেদনা। তাহাই উপনিষদের বেদান্ত। কৃষ্ণ-বুদ্ধ-গৌর সকলেই অনন্ত বেদনার ঘন বিগ্রহ।

১৫ই এপ্রিল

সকালে 'ভারত-পাকিস্থান-চুক্তি'—সাময়িকী লেখা শেষ করি। রেণু···১টার পর এখানে আসে। প্রতিভা আসে তিনটায় পর।·····আমি ঘরে যাই।·····প্রসাদ পাই।···আমি উহাদের সামনের দুয়ার খুলিয়া দিয়াছি, যাহা একেবারে আটকাইয়া গিয়াছিল। এখন যদি আমার জীবনে জীবন মিলাইয়া চলিতে পারে, সার্থক হইবে। ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া প্রাণের ও প্রজ্ঞার আদান প্রদান না করিলে কি পথ-চলা সহজ হইবে? আবার আটকাইয়া যাইতে পারে।·····সন্ধ্যার পর আফিসে ত্রিপুরাশঙ্করবাবু আসেন। তাহাকে ১খানি কেন উপনিষৎ দেওয়া হয়। মাখনবাবু আসিয়া নম্বরগুলি কাগজের উপর লিখিয়া দিয়া যায়। আজ সকালে সর্দ্দার প্যাটেল কলিকাতা আসেন বর্ত্তমান পরিস্থিতি উপলক্ষে।···ডাগিনের অমূল্য (পাগলা) আমার বই ছাপাইবার জন্য ২৫৲ টাকা পাঠাইয়াছে বলিয়া রেণুর নিকট এক পত্র দিয়াছে।

৬টায় মবিবার পূর্ব্বে রাবণকে বলিয়াছিল—

ন তু সম্বোহবিনীতস্য কৃন্ততে কর্ম্মণঃ ফলম্।
কালোহপ্যজীর্ণতাত্রস্য শস্যানামিব পক্তয়ে।

(ত্রিপুরাবাবু বলিলেন।)

১৬ই এপ্রিল

সকালে সাময়িকীর ১৪ পৃষ্ঠা রেণুর কাছে দিয়া আসিবার জন্য আফিসে যাই। রেণু ১১টার সময় পাবলিসিটি ফোরান প্রভৃতি জায়গায় ঘুরিয়া ৪টায় প্রেসে যায়। সেখান হইতে ৬টার কিছু পূর্ব্বে তাহার বাসায় ফেরে। প্রতিভা বাসা হইতেই সাময়িকীর বাকি ১৫ পৃষ্ঠা লিখিয়া ৩টার পর আসে। মালতী আসে ৪টায়। তাহাকে সঙ্গে আফিসে যাই। পথে রমেন্দ্র ঘোষের সঙ্গে দেখা। তাহার সঙ্গে পথে হাঁটিতে হাঁটিতে চুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা হয়, সে-ই উত্থাপন করে। রেণু প্রেস হইতে গীতার প্রুফ নিয়া আসে। ৮।৩০টায় পর রেণু কতকটা দেখে, বাকীটা আমি ১১টারও পর পর্য্যন্ত দেখি। নমিতার সঙ্গে রেণুর দেখা তাহার কর্ম্মস্থলে। শরীর তাহার তেমন ভাল নয়, মনও উদ্বিগ্ন। কোনও শক্ত ক্ষেত্রে স্থিত না থাকিয়া বাহিরের পরিধি বাড়াইলে যাহা হয়, তাহাই বোধ হইবে। কাজ করিতে চাহিলেই যদি কাজ যাইত, তবে কাজ সকলেই করিত। কর্ম্ম করার কৌশল শিখিতে হয়। সেজন্য স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া, স্থিতপ্রাণ হওয়ার প্রয়োজন আছে। 'বিদ্' ধাতু হইতে বেদ ও বেদনা শব্দদ্বয় নিষ্পন্ন। বেদনাহীন বিদ্যা বা বিদ্যাহীন বেদনা কোনটাতেই স্থিত-প্রজ্ঞত্ব লাভ হয় না। বেদ ও বেদনা যেখানে সমন্বিত, সেখানেই প্রজ্ঞার স্থিতি, প্রাণের স্থিতি। এই স্থিতিভূমি লাভ হইলেই কর্ম্ম সুরু হইতে পারে। কোথায় এই স্থিতি কর্ম্মীদের? গীতার আগাগোড়া ইহারই কথা বলা হইয়াছে। 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা'? কর্ম্মের পশ্চাতে যাহার চোখের জল নাই, কর্ম্মের পশ্চাতে যাহার জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রকাশ নাই, হয় সে কর্ম্মে জড়াইয়া পড়িবে, না

কিছুদিন পর ক্লান্ত হইয়া কর্ম্ম ছাড়িয়া দিবে। যে প্রাণ-প্রধান সে জড়াইয়া পড়িবে, যে বুদ্ধি-প্রধান সে কর্ম্ম ছাড়িয়া আলগা দিবে। মুক্ত থাকিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আগাইয়া যাইবে, এমন মানুষ দুর্লভ। আমার কাছে যাহারা আসিবেন, আমি তাহাদিগকে এইরূপ কর্ম্মযোগীই দেখিতে চাই। প্রচলিত সাধনায় মুক্তের কর্ম্ম নাই, কর্ম্মীরও মুক্তি নাই। কিন্তু পুরুষোত্তমদর্শনের ইহাই প্রাণকথা—কর্ম্ম-মুক্তির সমন্বয়।

১৭ই এপ্রিল

সকালে প্রুফ দেখাটা যখন শেষ করি, তখন প্রেসের দারোয়ান রেণুর নিকট হইতে বাকী প্রুফ নিয়া আসে। কিন্তু তাহার মধ্যে ৪র্থ ফর্ম্মার শেষ ২ পৃষ্ঠা যাহা রেণুর নিকট ছিল ভুলে দেওয়া হয় নাই। তাই আমি দারোয়ান-সহ আফিসে যাই। আধ ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসি। রেণু আজ আর আসে না। সে একবার মাত্র ক্যালকাটা কেমিক্যালে গিয়া একটী বিজ্ঞাপন নিয়া আসে। প্রতিভা ৩টার পর আসিয়া ঔষধ বানাইয়া দিয়া তখনই আফিসে চলিয়া যায় র‍্যাপারগুলি লিখিবার জন্য। আমি ৫টার পূর্ব্বে আফিসে যাই। সন্ধ্যার পর মালতী প্রণতি আসে। প্রণতিকে দিয়া 'যে ফেরে নি' প্রবন্ধটী পড়াই। শ্রীরাধা (১ম বর্ষ) প্রবন্ধটীও আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে হোয়ার স্কুলের সুধাংশুবাবু আসেন। তিনি ২জন গ্রাহকের টাকা আনেন।...ইউক্লিডের জ্যামিতিতে যে-কোন বেত্রকে ঘিরিয়া ন্যূনতর পরিধিযুক্ত সহস্র সহস্র বৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবজীবনে ঐ 'বেত্র' কিন্তু 'এক' হয় না, উহাতে পরিধির ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রকেও উচ্চতরের হইতে হয়। অল্প পরিধিযুক্ত বৃত্তের কেন্দ্রের যতখানি 'শক্তি' থাকিলে পরিধিকে পরিপাক করিতে কেন্দ্র পারিত, বৃহত্তম পরিধিকে হজম করিতে কেন্দ্রের তাহা অপেক্ষা উন্নত স্তরের আরও বেশী শক্তি থাকা প্রয়োজন। নইলে পরিধির টানে কেন্দ্র বানচাল হইবে, জীবনের 'কৃত্ত'ই নষ্ট হইয়া যাইবে। জীবন অচল হইবে। বাহিরের পরিধি বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রের গভীরতাও বাড়ানো দরকার। কেন্দ্র যত গভীর হইবে, পরিধিকেও তত ব্যাপক হইবার অধিকার থাকে। গভীরতা-ব্যাপকতার এই equation-যোগ না থাকিলে বিপদ অনিবার্য্য। ৯।০টার পরে আশ্রমে ফিরি।

১৮ই এপ্রিল

সকালে প্রুফ লইয়া আফিসে যাই। কিছু পরে ফিরিয়া আসি। ১১টার পর রেণু সি, কে, সেন ঘুরিয়া আসে। কোনও কাজ হয় নাই। আমি ৩।০টার পর আফিসের দিকে যাই। পথে প্রতিভার সঙ্গে দেখা। সে এখানে ঔষধ তৈয়ারীর জন্য আসিতেছে। আধঘণ্টা পর সে আবার আফিসে যায়। সুহৃদের চিঠির জবাব দেই।...কোন মানুষ মরত পাইব না। রেণু প্রতিভারা যাহা পারে করিবে। তাহাতে যদি ঠাকুরের কাজ হয় হইবে। এখন আর 'আজি ক, খ' পড়াইবার সময় নাই। আর আসিবেই বা কে? সব ছত্রভঙ্গ। কাহারও মাথা ঠিক নাই। রেণুর যাহার সঙ্গে দেখা হয় সবাই জিজ্ঞাসা করে উজ্জলভারতে আপনার অধিকার কি, বুঝিয়া সুঝিয়া চলিবেন। কথাটা ঠিক। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলিতে চাই, যে যাহাকে বুকের রক্ত দিয়া সৃষ্টি করে, পালন পোষণ করে, সে তাহারই হইবে—ইহাই পুরুষোত্তম-বিধান। উজ্জলভারতের জন্য আমার পুত্রেরা কিছু করে নাই বা করিতে পারে নাই। উজ্জলভারতের উপর ইহাদের কোনও দাবী নাই। তাহারাও লোভী নয় যে ইহার দিকে কখনও তাহাদের লোভ পড়িবে। মেয়ে মনু উজ্জলভারতের জন্য ২৫০৲ টাকা দিয়াছে, তাহার চিন্তাও আছে। রেণুই ইহার স্রষ্টা, প্রতিভা তাহার সহযোগী। উজ্জলভারত ঠাকুরের সম্পত্তি, তাঁহারই সেবায় ইহাদের দ্বারা পরিচালিত হইবে।...ইহার উপস্বত্ব রেণু প্রতিভা ও অন্যান্য ইহার প্রতি ঋণমুক্তদের জন্য প্রয়োজনে লাগাইয়া বাকী অর্থ ঠাকুরের দর্শন প্রচারের কাজে লাগিবে। ঠাকুরের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা ছাড়া অপর কোনও কাজেই ইহার কিছু ব্যয়িত হইবে না।

১৯শে এপ্রিল

সকালে প্রুফ লইয়া আফিসে রেণুর কাছে দিয়া আসি। রেণু ১১টার পর ক্যালকাটা কেমিকালে হইয়া প্রেসে প্রুফগুলি দিয়া আশ্রমে আসে ১টার পর। প্রতিভা আসে ৩টায়।...হেরম্ববাবু আসিয়াছিল।...ইহার পর মুখার্জি ভট্টাচার্য...দিয়া যায়।...কে বলি, প্রত্যেকের জীবনে ভগবানের যে অভিপ্রায়, তাহাই তাহার আত্মা। এই আত্মাকে জানিতে হইবে—'আত্মানং বিদ্ধি।' প্রতি মানুষেরই এক একটী mission আছে, ভগবানের জন্য কেহই কাহারও মত নয়। প্রতিযোগিতা তাই নাই। কেহ কাহাকেও ডিঙাইয়া যাইতে পারে না। পায়সের মত পায়স, দুধের মত দুধ। যার যার কেবলত্ব চেনাই তো প্রয়োজন। প্রত্যেকেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। আমি আমার 'uniqueness' (কেবলত্ব) চিনিয়াছি। তোমরাও আমার জীবনের মাঝে তোমাদের 'uniqueness' চিনিয়া লও, ধন্য হইবে। অনন্ত পথ চলিবার শক্তি ঠাকুর দিবেন। ঠাকুর সর্ব্ব বিশেষের সমন্বয়, আমিও তাহাই জীবনে বরণ করিয়া লইয়াছি। এখানে কাহারও স্বাং-সত্তা হারাইয়া যাইবার ভয় নাই। ব্রজে প্রতিটী গোপী তাহার বিশিষ্টত্বের উপযোগী সেবা করিতেন। কাহারও সেবার সঙ্গে কাহারও সঙ্ঘাত আসিবার সম্ভাবনাই নাই। প্রতি বিশেষকে তার তার মর্য্যাদা দিয়া যিনি সম্বন্ধ করিতে পারেন, তিনি সর্ব্ববিশেষসমন্বয় নির্ব্বিশেষ পুরুষোত্তম-বস্তু। ৯টায় আশ্রমে ফিরি।...

২০শে এপ্রিল

...প্রতিভার ওখানে হরিদাসী আসে, তাহার কাছে শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিতমশাই'র ও ধীরেনবাবুর উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে, বিশ্বের শোককে সর্ব্বভূতের মধ্যে হজম করিলেই তাহা সার্থক হয়। ছোট একটী মানুষকে হারানোর পর তাহাকে বিরাট বিশ্বের মধ্যে না খুঁজিয়া দুঃখৈশ্বর্য্যে সারাজীবন কাটানো জীবনের উপর একান্ত জুলুম। গৌরীর মা-ও আসিয়া শুনিতেছিল।...কাজ করিতে হইলে লোক চাই, লোক আসিলে তাহাদিগকে গড়িয়াও নিতে হইবে। এমন কর্ম্ম, এমন জ্ঞান, এমন আনন্দ ও প্রেম দিয়া তাহাদিগকে আবরণ করিয়া রাখিতে হইবে যাহাতে তাহারা সঙ্ঘের ভিতর পরিপাক হইতে পারে। 'ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিকঃ এককালঃ। প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুঃ তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্।' ভাগবত ১১।২। উহাদিগকে এমন ভাবে আপন করিতে হইবে যাহাতে 'বিরক্তিঃ অন্যত্র' অন্য কোথাও যাইবার লালসা না জাগে, জীবনে তুষ্টি অর্থাৎ ভক্তি আসে, পুষ্টি অর্থাৎ পরেশানুভব হয়। ইহারা এখনও 'ইচবে পাকে' নাই, ভবিষ্যতের আশা আছে।...

২১শে এপ্রিল

সকালে বৈতালের জন্য 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে' ঠিক করিয়া রাখি।...জ্ঞান ও প্রেম ছাড়া কোনও আচরণের ফলই যে অক্ষয় ও অনন্ত নয়, গঙ্গাস্নানে কেহ যে দীর্ঘায়ুঃ, স্বর্গপ্রাপ্তি বা গঙ্গায় বিসর্জন দিল না, অথচ চিত্তের প্রসাদ ও সমতাবোধই যে ভগবানকে পাওয়া যায়, ইহাই বলিতে চাহিয়াছিলাম। সে বুঝিয়াছে, আমি গঙ্গাস্নানের বিরুদ্ধে। লক্ষ লক্ষ লোক যখন স্নান করে, তখন উহা কেন না ভাল হইবে?...তাহাকে 'ভক্তিপরেশানুভবঃ বিরক্তিঃ' শ্লোকটী, 'সর্ব্ববাদবিরুদ্ধপ্রতিরূপশীল' ও 'Spiritual life is at the same time' ইত্যাদি লিখাইয়া সেই মুখস্থ করিবার জন্য।...'মানুষ' 'মানুষ' করিয়া সারা জীবন কাঁদিলাম, মানুষ পাইলাম না। সকলেই থাকিতে চায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কার আঁকড়াইয়া, কেহই তো মুক্তি চায় না, আগাইয়া যাইতে চায় না। কি আর করিব? মানুষ পাইয়া 'সহজ মানুষ' এই সহজের দেশে প্রতিষ্ঠিত করিব—ইহাই ছিল একমাত্র কামনা। আর কিছুই তো চাহি নাই। যাহার যাহা নিয়াছি, তাহাকে তাহা 'অনন্ত' করিয়া ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছি। কাহারও 'সত্তা' চাহিলে তাহাকে ব্রাহ্মী স্থিতি দিবার পথ দেখাইয়াছি।...

২২শে এপ্রিল

* ক্রমশঃ

মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং

॥ শ্রীগৌরী বাগচী ॥

মনের যে দুটো দিক রয়েছে—একটি সংজ্ঞান বা সচেতন অংশ আর একটি নির্জ্ঞান—এ রকম একটা অস্পষ্ট ধারণা চলে আসছে অনেকদিন থেকেই। কিন্তু এই নির্জ্ঞান মনের স্বরূপটি যে কি—আমাদের প্রতিটি কাজে—আমাদের মনের রাজ্যে তার আধিপত্য যে কতখানি বিস্তৃত—এর সম্যক্ পরিচয় সম্বন্ধে আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা চরমে উঠেছিল গত শতাব্দীতে। এই আগ্রহই ইথারের স্পন্দনের মতো স্পন্দিত হচ্ছিল তখনকার মনোবিজ্ঞানীকুলের মনোজগতে। এই স্পন্দনই জন্ম দিয়েছিল ফ্রয়েডের মতো বৈজ্ঞানিকের। সমগ্র জীবনের সাধনা ও পরীক্ষার ফল স্বরূপ তিনি নির্জ্ঞান মনের স্বরূপ উদ্ঘাটনে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে যে ক'টি জ্যোতিষ্ক—মনোবিজ্ঞানের আকাশে দেখা দিয়েছিল, তার অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হলেন ইয়ুং।

ইয়ুং-এর পুরো নাম কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং। ইনি সুইজারল্যাণ্ডের লোক। ১৮৭৫ সালে বাসলে শহরে এঁর জন্ম হয়। পিতা ছিলেন গোঁড়া প্রটেস্টাণ্ট ধর্ম-যাজক। শৈশবের এই ধর্মীয় আবহাওয়া তাঁর চিন্তাধারায় আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। পিতার ইচ্ছে ছিল পুত্রও তাঁরই পন্থা অবলম্বন করবে—যাতে তাঁর অবর্ত্তমানে পুত্রই পিতার পদটি নিতে পারে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ইয়ুং গেলেন চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে। ১৯০০ সালে ইয়ুং চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করলেন। এর পর ইনি Burgholzli-র মানসিক হাসপাতালে যোগ দিলেন। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ও চিকিৎসক ব্লয়লারের কাজ করতে লাগলেন। এখানে কেটে গেল পাঁচ বছর। ১৯০৫ সালে ইয়ুং জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক পদে মনোনীত হলেন।

জুরিখে থাকবার সময়েই ফ্রয়েড-প্রবর্ত্তিত সাইকো-অ্যানালিসিস্ বা মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যাদির দিকে তিনি আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েন। যে সমস্ত ব্যাপারগুলোকে আমরা অলৌকিক বলে মনে করি—সে সমস্ত ব্যাপারে তাঁর অকৃত্রিম আগ্রহ ছিল ছেলেবেলা থেকেই। এই সমস্ত ব্যাপারে পড়াশুনো করা বা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। এই সময় ফ্রান্সে পীয়ারী জ্যানে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। Multiple personality, ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়ানো—এই সব ধরণের ব্যাপারগুলোর চিকিৎসক হিসেবে জ্যানের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল ক্রমশঃ। এ সব দিকে ইয়ুং-এর আগ্রহ ছিল। ১৯০৬ সালে তিনি ফ্রান্সে গেলেন জ্যানের কাছে কিছু শেখবার জন্য। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ঘুরে এলেন।

১৯০০ সালে প্রকাশিত ফ্রয়েড-এর 'Interpretation of Dreams' বইটি মনোবিজ্ঞান জগতে একটা আলোড়ন তুলেছিল। তাঁর বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে স্বপ্নের যে স্বরূপ উদ্ঘাটিত হোল, তা অনেক মনোবিজ্ঞানীই সহজভাবে নিতে পারছিলেন না। কিন্তু ইয়ুং-এর মনে ফ্রয়েড-এর অসীম প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে নিয়ে এল, এই বইটিই। ইয়ুং এবং ব্লয়লার একত্রে ফ্রয়েড-এর সংগে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। এই যোগাযোগ ক্রমশঃ গভীরতায় পৌঁছতে লাগলো—এবং কালক্রমে ফ্রয়েড এবং ইয়ুং আত্মীয়ের মতো ঘনিষ্ঠ হলেন। ক্রমে ইয়ুং হয়ে পড়লেন একেবারে ফ্রয়েডের 'ডানহাতের' মতো। তাঁর সমস্ত উৎসাহ ও উদ্যম নিয়োজিত হ'ল মনঃসমীক্ষণের (Psychoanalysis) প্রচারে। ১৯০৮ সালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সাইকোঅ্যানালিসিস্ কংগ্রেসের প্রথম

অধিবেশনে প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষেই তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও উদ্যম সাইকোঅ্যানালিসিসের প্রচারের পক্ষে অপরিহার্য বলে অনুভূত হোল। ফ্রয়েডও তাঁর ওপরেই এই সংস্থার সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করছিলেন ক্রমে ক্রমে। তাঁরই ইচ্ছাক্রমে ইয়ুং সভাপতির পদ গ্রহণ করলেন।

কিন্তু দুই প্রতিভার মধ্যে ক্রমশঃ দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ফুটে উঠতে লাগলো। ১৯১১ সালে তিনি ঘোষণা করলেন—ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সমস্তটুকু গ্রহণযোগ্য নয়। ১৯১২ সালে ইয়ুং-এর এই মতবাদই তাঁদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ টেনে আনলো। ইয়ুং 'Analytical Psychology' নাম দিয়ে নতুন ধরণের চিন্তাধারার প্রবর্তন করলেন। ফ্রয়েড এতে মর্মান্তিক আঘাত পেলেন তাঁর সুগঠিত দেহের একটা অঙ্গ যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।.. এর পর এই দুই মনীষীর মধ্যে আর কখনও সাক্ষাৎ হয়নি।

ব্যক্তিগত কারণ বাদ দিয়েও কেন যে তাঁদের মধ্যে এই বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছিল, ইয়ুং-এর নিজের কথা ও তাঁর রচনাবলীর মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ তাঁদের বিরোধের মূলে ছিল 'লিবিডো' এই কথাটির অর্থ ও তার প্রকৃত রূপটির ব্যাখ্যা। 'লিবিডো' কথাটি ফ্রয়েড দেহজ কাম-বাসনা তথা কাম-শক্তি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কামশক্তি বলতে সাধারণ অর্থে আমরা যা বুঝি—ফ্রয়েড তার চাইতে অনেক ব্যাপকতর অর্থে কথাটির ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন ধরণের মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর রোগের লক্ষণগুলো বিশ্লেষণ ও সেগুলি উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, এই সমস্ত রোগ উৎপত্তির মূলে রয়েছে—অবদমিত কাম-বাসনা। অনেকদিন ধরে বহুসংখ্যক রোগীর ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি দেখে তিনি নিঃসংশয়ে তাঁর তত্ত্ব প্রচার করলেন। এই তত্ত্ব তখনকার কৃষ্টিসম্পন্ন সমাজকে এবং নীতিবিদ্‌দের বিচলিত করে তুলল। বিশেষতঃ প্রটেস্টান্ট ধর্মযাজকেরা এই তত্ত্বটিকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। ইয়ুং নিজে 'প্রটেস্টানটিজম্' -এর আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছেন এবং এই ধর্মের প্রভাব তাঁর ওপরেও এসে পড়েছিল। মানুষের জীবনে কাম-শক্তির প্রভাব তিনি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে পারেননি। কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি রোগীদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনাও করতে পারতেন না। স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও তিনি কামশক্তিকে বিচার করতে পারেননি। কাম-সম্পর্কে আলোচনায় তাঁর এই কুণ্ঠা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগলো। তিনি 'লিবিডো'র পরিবর্তে আরও ব্যাপক অর্থে Mental energy অর্থাৎ মানসিক শক্তি—কথাটি ব্যবহার করতে লাগলেন। কিন্তু এতে ফ্রয়েডের সম্মতি মেলেনি। তিনি নিজেই ফ্রয়েডের মত থেকে সরে গিয়ে নিজের পৃথক মত সৃষ্টি করলেন।

এ ছাড়াও অবচেতন মনের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু নির্ধারণেও ফ্রয়েড-এর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দিল। ইয়ুং দুই রকম অবচেতনের অবতারণা করেছেন—একটি হোল ব্যক্তিগত অবচেতন বা personal unconscious ও অপরটি সমষ্টিগত অবচেতন বা collective uuconscious। ফ্রয়েড সমগ্র মনের তিনটি স্তরের কথা বর্ণনা করেছেন। একটি হোল সংজ্ঞান স্তর—এতে রয়েছে বর্তমানে আশে পাশে যা ঘটছে—যার সম্বন্ধে আমরা সচেতন আছি সেইসব বিষয়বস্তুগুলো। যে সব বিষয় বা ঘটনাগুলো আমরা চেষ্টা করলে মনে আনতে পারি—সেগুলো রয়েছে প্রাক্ সংজ্ঞান স্তরে—Pre-conscious level-এ। এ ছাড়াও আরও অনেকগুলো বিষয় আছে—যেগুলো কোন স্বাভাবিক উপায়ে মনে আনতে পারি না। সেগুলো গিয়ে জমা হয়—নির্জ্ঞান স্তরে—unconscious level-এ। ফ্রয়েডের মতে এই নির্জ্ঞানস্তরে থাকে মানুষের অবদমিত আদিম প্রবৃত্তিগুলি—প্রধানতঃ যৌন বা কামজ বাসনা গুলো—যে গুলো সমাজে স্বীকৃতি পায়না—সেই গুলোই। কিন্তু ইয়ুং-এর মতে—ব্যক্তি বিশেষের অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন ক্ষেত্রের লব্ধ জ্ঞান ও তার উপলব্ধি—যে গুলো মানুষ ভুলে গেলেও তার ছাপ থেকে যায়, তার মনে এইগুলোর একত্র সমাবেশেই হয়

ব্যষ্টিগত অবচেতনা। সমষ্টিগত অবচেতন অংশটি মানুষের জন্মসূত্রে পাওয়া। পিতৃদত্ত প্রাণটির সংগে পূর্বপুরুষের অভিজ্ঞতার একটা অংশও তার নিজ্ঞান মনে বাসা বাঁধে। কোন অভিজ্ঞতা হবার আগে শিশু যে স্বপ্ন দেখে ভয় পায়—ইয়ুং-এর মতে সেও এই সমষ্টিগত অবচেতনের ফলেই। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান হোল, 'শব্দ-অনুষঙ্গ-অভীক্ষা' ও মানসিক গঠন অনুযায়ী মানুষের শ্রেণীবিভাগ।

আমাদের প্রতিদিনের জীবনে ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হতে পারে—সে রকম ধরণের একশোটি শব্দ নিয়ে তিনি একটি তালিকা তৈরী করেছিলেন। এই শব্দগুলোকে Stmulus word—উদ্দীপক শব্দ বলা হয়। এই শব্দগুলো এক এক করে কাউকে শোনানো হলে এবং একটি কথা শোনা মাত্র সে ব্যক্তির সর্বপ্রথম যে কথাটি মনে পড়ে সেটি বলতে বলতে দেখা যায় যে, সাধারণ লোকের পক্ষে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উত্তর দিতে ১"৪"২" পর্যন্ত সময় লাগে এবং উত্তরটিও উদ্দীপক শব্দ সম্পর্কিত হয়ে থাকে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে অবান্তর উত্তর পাওয়া যায় এবং এই সময়ও ১" এর কম কিংবা ২" এর চাইতে অনেক বেশী হয়ে পড়ে। কোনো কোনো পরীক্ষায় দেখা যায় যে উদ্দীপক শব্দের কোনো উত্তরই যোগায়না। এই সব ক্ষেত্রে উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করলে ব্যক্তি বিশেষের অবচেতন মনের বৈশিষ্ট্য-ব্যঞ্জক পরিচয় পাওয়া যায়। ইয়ুং-এর মতে—আমাদের জীবনের কোন কোন ঘটনা বা অনুভূতি মনে বিশেষ প্রক্ষোভ—(Emotion)-এর উদ্রেক করে। এই প্রক্ষোভের সংগে সেই ঘটনা বা বিষয়ের একটা ভাবের (idea)ও উদয় হয়। কোনও একটা বিশেষ ঘটনা বা বিষয়ের ভাব—ঐ ঘটনাই যে প্রক্ষোভের উদ্রেক করে তার সংগে একাত্ম হয়ে ভাব প্রক্ষোভে জড়িত একটা মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করে। এই অবস্থাকেই ইয়ুং গুঢ়ৈষণা বা complex বলেছেন। কিন্তু এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকি না। কেননা এরা অবচেতনের গভীরে চাপা পড়ে যায়। যে সব ঘটনা অবচেতন মনে এই ধরণের অবস্থার সৃষ্টি করে, সেগুলোর আনুষঙ্গিক কোনও শব্দ উদ্দীপক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করলে—ঐ শব্দটি ভাব-প্রক্ষোভ জড়িত মানসিক অবস্থায় আঘাত করে। অবচেতন মন এই আঘাত থেকে আত্মরক্ষা পেতে কিছুটা সময় নেয়। অবান্তর উত্তর দেওয়া বা উত্তর খুঁজে না পাওয়াও এই কারণেই হয়। সুতরাং অবান্তর বা বিলম্বিত উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করলে অবচেতন মনের একটা আভাস পাওয়া যেতে পারে। ইয়ুং-এর এই গুঢ়ৈষণা তত্ত্বটি আজ পৃথিবী ব্যাপী সম্মতি পেয়েছে। এই শব্দ-অনুষঙ্গ-অভীক্ষাও ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে এবং জনপ্রিয় হচ্ছে।

মানসিক বৃত্তির ওপর দৃষ্টি রেখে ইয়ুং মানুষকে প্রধানতঃ দু'টি ভাগে ভাগ করেছিলেন। একটি বহির্বৃত্তিক শ্রেণী আর একটি অন্তর্বৃত্তিক শ্রেণী। যাদের সমস্ত আগ্রহ বাইরের দিকে, অর্থাৎ যাঁরা সমাজের পাঁচজনের সংগে মিশতে, প্রাণখুলে আলোচনা করতে ভালোবাসেন, চিন্তার চাইতে কাজেই যাঁদের আগ্রহ বেশী এঁরাই হলেন বহির্বৃত্তিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি। আর অন্তর্বৃত্তিক বলতে ঠিক এরই উল্টো চরিত্রের লোককেই বোঝায়। এঁরা হলেন অন্তর্মুখী। একটা কাজ করবার চাইতে চিন্তা করতে এঁরা বেশী পছন্দ করেন। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কাজ করা কিংবা খোলাখুলি ভাবে অন্যের সংগে আলোচনা করা—এঁদের স্বভাবের বাইরে। এঁদের কাছে ভাবের দাম অত্যন্ত বেশী। বিখ্যাত দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই পর্যায়ে পড়েন। চিন্তা, অনুভূতি, সংবেদন ও সংজ্ঞা—মনের এই চারটি বৃত্তির দিকে লক্ষ্য রেখে ইয়ুং প্রথম দুটি ভাগকে আরও কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। এখন অন্তর্বৃত্ত ও বহির্বৃত্ত নির্ধারণের অভীক্ষাও নির্মিত হয়েছে। শিল্প ক্ষেত্রে ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে কর্মী নির্বাচনে এই অভীক্ষা ব্যবহৃত হয়। ইয়ুং প্রণীত এক্সট্রোভার্সন-ইন্ট্রোভার্সন-এর তত্ত্ব আজ মনোবিজ্ঞানের গণ্ডী ছাড়িয়েও বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে। পৃথিবীর সমস্ত দেশের মনোবিজ্ঞানীই এ বিষয়ে তাঁকে সমর্থন করেন। ইয়ুং-এর এই দুটি মৌলিক দান

মনোবিজ্ঞানে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পৌরাণিক কাহিনীতে এবং নৃতত্ত্বেও ইয়ুং-এর পাণ্ডিত্য ছিল অপরিসীম। তাঁর আবিষ্কৃত নব নব তথ্যে মনোবিজ্ঞান সমৃদ্ধিশালী হয়েছে। ইয়ুং ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন এবং বিভিন্ন দেশের পৌরাণিক তথ্যাদির চর্চা করতেন। বয়স বাড়ার সংগে তিনি ভাব-রাজ্যে প্রবেশ করতে লাগলেন এবং ক্রমশঃ mystic হয়ে পড়লেন। তাঁর এই সময়কার তত্ত্বাদি অন্য কাজে লাগলেও মনোবিদ্যার পক্ষে গ্রহণীয় হয়নি।

জীবনের প্রথম দিকে তিনি ছিলেন ফ্রয়েড-এর শিষ্য এবং বন্ধু। কিন্তু যে মতভেদ গড়ে উঠেছিলো তা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের মতো তাঁদের মধ্যে রয়ে গেল চিরদিন। এ নিয়ে তাঁর মনে বেদনা ছিল। ১৯৩৮ সালে, Indian Science Congress-এর আহ্বানে তিনি যখন কোলকাতায় আসেন, তখনও তাঁকে এই বিচ্ছেদ-বেদনা ব্যক্ত করতে শোনা গেছে। ফ্রয়েড আর ইয়ুং—এই দুই প্রতিভা একত্রিত হলে হয়তো আজ মনোবিজ্ঞানের পক্ষে দুর্জ্ঞেয় মানব-চরিত্র-রহস্যের আরও বিস্তারিত উদ্ঘাটন সম্ভব হোত।

'একে একে নিভিছে দেউটি।' ফ্রয়েড গত হয়েছেন বহুদিন। গত ৭ই জুন মনীষী-মনোবিজ্ঞানী-অনুসন্ধিৎসু ইয়ুং ৮৫ বছর বয়সে মারা গেলেন। পেছনে রেখে গেলেন উজ্জ্বল প্রতিভার স্বাক্ষর। প্রত্যেক বিজ্ঞানী ও অনুসন্ধিৎসুর তিনি অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অন্যতম প্রবর্তক হিসেবে ফ্রয়েডের সংগে তাঁকেও আমরা চিরদিন স্মরণ করব।

পুস্তক-পরিচয়

"প্রসাদ"—ভগবান শ্রীশ্রীবিশ্বরূপ মিউর প্রিয়ভক্ত, পরহিতব্রতী, সাধকপ্রবর শ্রীযুক্ত অতীন্দ্র নাথ চক্রবর্তী সাহিত্যরত্ন, সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয় বিরচিত ও শ্রীযুক্তা নারায়ণী সরকার কর্তৃক শ্রীশ্রীবিশ্বরূপ সেবাশ্রম, দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা-৩৫ হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১·৫০ নঃ পঃ

প্রকাশিত জগৎ সংসারকে শাস্ত্র ঊর্দ্ধমূল ও অধঃশাখ বলে বর্ণনা করেছেন। এই ঊর্দ্ধমূল-অধঃশাখ সংসারকে যিনি যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন ও সেই অনুযায়ী আচরণ করেন তাঁর কাছে সংসারও সেই রূপ নিয়েই উপস্থিত হন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"। তাই দেখি সংসার কাঁহারও কাছে একান্ত বিষ, আবার কাঁহারও কাছে একান্ত ভোগানন্দের স্থান। উভয় অবস্থাতেই একদেশদর্শিতা থাকার ফলে পরিণামে ব্যর্থতাই আনে। কিন্তু আসলে সংসার বস্তুটি বিদ্যামৃতের অপূর্ব্ব মিলন স্থান। যে চোখে সংসারকে দেখলে, যেভাবে আচরণ করলে "ত্রিবিতমরূপ" এই জগৎ সংসারই "রসালনন্দনে" গড়ে উঠতে পারে সেই চোখের ভাষাই, সেই সমদৃষ্টি, সম্যক-দৃষ্টির কথা 'প্রসাদ' পুস্তিকাতে ছোট ছোট শ্লোক আকারে সহজ সরল ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করে মহাজ্ঞানী অতীন্দ্র নাথ সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করেছেন। জনসাধারণ এই পুস্তিকার দ্বারা মহোপকৃত হবেন বলে আমরা মনে করি।

অরণ্যকাল

॥ শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু ॥

প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে সুবালোক পাতে
যে উজ্জ্বল প্রসন্নতার প্রকাশ,
তোমার সুখস্পর্শের আনন্দ-আকুলতায়
তেমনি প্রসন্নতা আছেনই
আমার প্রতিক্ষণের প্রত্যাশা।
পাইনের পাতায় পাতায় আর
চেস্টনাটের পুষ্পগুচ্ছের সবুজে শাদায়
এবং নাম-না-জানা ঘাসফুলের
হলুদ-নীল হাসির স্বচ্ছতায়
আমার পবিত্র পূর্ণতার স্নান করিয়ে যাও।
ইচ্ছে হয় আমি পাহাড়ের মতো
উঁচু হয়ে দাঁড়াই,
তা'হলে যদি তোমার মুখোমুখি
হবার সুযোগ মেলে!
তুমি যে অনেক বড়ো, অনেক বৃহৎ!
ক্ষুদ্রতার খণ্ড সীমায় সেই বিরাটকে
সেই পরমকে অনুভব করাও যে কঠিন।
কিংবা সাগরের মতো ব্যাপক উদারতায়
এবং গভীর অতলতায় যদি মিলিয়ে দিতে
এবং তলিয়ে দিতে পারি নিজেকে
তা'হলেও কি তোমার সম্পূর্ণতাকে
আস্বাদন করা সম্ভব?

আজ আর চাঁদে যাওয়ায়
তেমন কোনো বাধা নেই;
তোমার সন্ধানে যে কোনো
গ্রহ-উপগ্রহে ঘুরে আসাও
আজ আর মোটেই কোনো
নির্বোধ কল্পনা নয়।
কিন্তু আপাতত সে সবের কোনটার কথাই
ভাববার আমার অবকাশ নেই,
এখন আমি মহামহিমান্বিত
এই কৃষ্ণ-অরণ্যেই—যাদের বাদের বা
তারই আশে পাশে তোমার আনন্দ-জ্যোতিকে
আশিষ্কার করে বেড়াবো,
শুধুমাত্র সেই জ্যোতির আলোকরশ্মিতে
আলিঙ্গন করে ধন্য হবার প্রত্যাশায়।

ব্ল্যাক ফরেস্ট
পশ্চিম জার্মানী
১৩ই মে, ১৯৬১

বাইশে শ্রাবণ

॥ শ্রীজগন্নাথ সাহা ॥

বাইশে শ্রাবণ। এক দুই তিন করিয়া বাইশ গুণিয়া গুণিয়া দিন মাস বছর। এমনি করিয়া মানুষ কালের পরিমাপ করিতেছে। মুখে বলিতেছে কাল অনন্ত। বিশ্বাস করিতেছে কাল অনাদি। তবুও প্রয়াস পাইতেছে অসীম কালকে দিন মাস দিয়া পরিমাপ করিয়া সসীম করিতে। সংসারের অনন্ত মায়াজালের ইহা অন্যতম গ্রন্থি। এই গ্রন্থিজড়িত বুদ্ধি দিয়াই আমরা বলিতেছি বাইশে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের তিরোধান তিথি।

যবনিকার অন্তরালে দাঁড়াইয়া মহাকাল কবিকে ডাকিয়া বলিয়াছে—

"ওরে কবি সন্ধ্যা হয়ে এলো
কেশে তোমার ধরেছে যে পাক
বসে বসে উর্দ্ধপানে চেয়ে
শুনতেছো কি পরকালের ডাক—"

কালজয়ী কবি ধ্যানগম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিয়াছেন—

"সবাই মোরে করেন ডাকাডাকি
কখন শুনি পরকালের ডাক—
সবার আমি সমান বয়সী যে
চুলে আমার ধরুক যত পাক—"

মৃত্যুর আহ্বান কবিকে বিচলিত করে নাই—কম্পিত করে নাই। মাটির মানুষের সহিত তাঁহার অন্তরের যোগ অবিচ্ছিন্ন। পরকালের ডাক শুনিবার অবসর তাঁহার নাই। তাইতো—

"—মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই—"

—বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের এই উদাত্ত ঘোষণা। তাই তাঁহার ২৫শে বৈশাখ নাই—২২শে শ্রাবণ নাই। আবির্ভাব নাই—তিরোভাব নাই। তিনি নিত্য আবির্ভূত। আপন সত্তায় তিরোভাব ঘটাইয়া তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমিক। বিদায়ের স্বাক্ষর দেওয়া মহা অঙ্গীকার চির অধিকার লিপি হাতে লইয়া তাঁহার অমর বাসনা—

"—সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে
* *
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দ লহিয়া যাবো নব নব স্রোতে—"

যে কবি নিজে মরিতে চাহেন নাই তাঁহার তিরোভাব নাই—বাইশে শ্রাবণ নাই। পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের স্থূল আবির্ভাব জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে আতুর ঘরে। বাইশে শ্রাবণ তাঁহার সূক্ষ্ম আবির্ভাব বিশ্বের মনোরাজ্যে প্রেমের বীর্য্যে সকলের ঘরে ঘরে। বাইশে শ্রাবণ আমরা দর্শন করি সেই রবীন্দ্রনাথকে যিনি দেহাতীতরূপে বিশ্ব-প্রেমের পসরা বহিয়া এই পৃথিবীকে জীবন উৎসব শেষে মৃৎপাত্রের মত দুই পায়ে ঠেলিয়া আপন কীর্ত্তি হইতেও আপনি মহত্তর হইয়াছেন। বাইশে শ্রাবণ তাঁহার নব আবির্ভাব তিথি যিনি জানিতেন—

"—হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা"

তাই যাঁহার শঙ্কিত হৃদয়

"—চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ
সৌন্দর্য্যে ভুলায়ে—"

আর তাই যিনি মহাকালের কণ্ঠে প্রেমের মালা দোলাইয়া নির্ভয়ে বরণ করিলেন—

"—রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে"

পঁচিশে বৈশাখের রবীন্দ্রনাথকে নবকলেবরে রূপায়িত করিয়াছে বাইশে শ্রাবণ ধরার বুকে সৌন্দর্য্যের মৃত রূপে —প্রিয়তম রূপে। পৃথিবীকে তিনি ভালবাসিয়াছেন। মোহ তাঁহার মুক্তিরূপে জন্মিয়া উঠিয়াছে—প্রেম তাঁহার

ফলিয়া উঠিয়াছে ভক্তিরূপে। আত্মপর ভুলিয়া তিনি বিশ্বের কাছে নিজেকে বিলাইয়াছেন—তাঁহার বিশ্বতা তাঁহাতে জাগিয়াছেন। পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথকে ডাক দিয়েছিল—বাইশে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে ডাকিয়া বলিয়াছেন :—

—তুমি ঘুমাইছ নিমীল নয়নে
জাগিয়া উঠিছ বিরহ স্বপনে
প্রভাতে জাগিয়া শূন্য শয়নে
নীরবে চাহিয়া রবে

প্রেমপুরুষ রবীন্দ্রনাথের বিরহ স্বপনে বাইশে শ্রাবণ প্রভাতে আমরা জাগিয়া উঠিয়াছি—শূন্য শয়নে নীরবে চাহিয়া আছি। মুখ নীরব—কণ্ঠ স্তব্ধ—বাঁশী সঙ্গীত-হারা। আজ আমাদের অন্তরের নীরব অনুভূতি—হে কবি বাইশে শ্রাবণেও তুমি আছ—

"—ক্ষয়হীন অস্তদিন তোমার উৎসব
বিচ্ছিন্ন না হয় বন্ধু না হয় নীরব—"

তাই—সৌন্দর্য্য-পূজারী তুমি যুগ যুগ ধরি বিশ্বপ্রিয়াকে ডাকিয়া

—কহিতেছ এক স্বরে
চির বিরহীর বাণী নিয়া
ভুলি নাই ভুলি নাই ভুলি নাই প্রিয়া—"

আমরাও তাই—"নবনব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে—"

বাইশে শ্রাবণ কবিগুরুর তিরোধান নহে—আমাদের ঐ যাত্রাপথের নবপর্য্যায়।

হিংসা ও অহিংসা

॥ শ্রীপ্রশান্ত কুমার লাহিড়ী ॥

অত্যাচারে গর্জে ওঠা হিংসা বস্তু নয়,
অহিংসা হয় মিথ্যা যদি ভীরুর বুকে রয়।
দুর্বলেরই হিংসা-ভীতি সংকুচিত মন,
শক্তিশালীর চরণে তার আত্ম নিবেদন।
এ জগতের বিবর্তনে যে জন অতি ভালো,
উৎপীড়কের আঘাতে তার নিববে মনের আলো।
শান্তিপ্রিয় হয় নিরীহ, শান্ত সহজ প্রাণে,
দুঃখে তাকে বুকের কাছে ভালবাসার টানে।

পীড়ন আসে সেই সুযোগে আগুন ওঠে জ্বলে,
অনেক শুভ নাশ করে সেই দুষ্ট হিংসানলে।

এই সমাজের বাসনা যা সেই ছাঁচেতে গড়,
ব্যক্তি, মনের ভেদের ছাঁচে সমাজতো নয় বড়।
অত্যাচার আর অনাচারের সকল বাধা ঠেলে,
এগিয়ে যদি চলতে পার স্বার্থ অবহেলে।
সমাজ তবে বাঁচবে আবার হাসবে সমস্বরে,
অহিংসা সে গর্বভরে দীপ্ত হবে জয়ে।

সমাজবিদ্যা শিক্ষায় নিয়ন্ত্রিত পাঠ

॥ শ্রীসুবোধ কুমার সেনগুপ্ত ॥

নিয়ন্ত্রিত পাঠ বিদেশে পদ্ধতি হিসাবে মর্যাদা পাইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশে নিয়ন্ত্রিত পাঠের বিশেষ ব্যবস্থা নাই। কিন্তু আমেরিকা এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে নিয়ন্ত্রিত পাঠের দ্বারা সুফল লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। আশা করা যায় আমাদের দেশেও ঐ পদ্ধতি অনুসরণ করিলে সুফল পাইতে বিলম্ব হইবে না। অন্যান্য দেশে ইহা বিশেষ করিয়া গ্রহণযোগ্য হইয়াছে তাহার কারণ এই পদ্ধতির সঙ্গে অন্য কোন পদ্ধতির কোনরূপ দ্বন্দ্ব নাই, বরং অন্যান্য পদ্ধতির পরিপূরক হিসাবে নিয়ন্ত্রিত পাঠ বিশেষ কার্যকরী বলিয়া ইহাকে সকলে সাদরে গ্রহণ করিয়াছে।

নিয়ন্ত্রিত পাঠ সম্বন্ধে বেশী কিছু আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্বে নিয়ন্ত্রিত পাঠ বলিতে কি বুঝিতে পারা যায় তাহা আমরা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারি। নিয়ন্ত্রিত পাঠ বলিতে আমরা বুঝি যে, কয়েকজন ছেলেমেয়ে বা ছেলেমেয়ের এক দল নিজ নিজ আসনে বসিয়া পড়াশুনা করিতেছে এবং শিক্ষক তাহাদিগকে তত্ত্বাবধান করিতেছেন। এই পদ্ধতিতে আমরা দেখিতে পাই, ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকের বা শিক্ষিকার দেওয়া পাঠ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতেছে। যখন তাহারা কোনও সমস্যার সমাধান নিজেরা করিতে পারে না, তখন তাহারা শিক্ষকের সাহায্য বা নির্দেশ লইয়া থাকে। তত্ত্বাবধানকারী শিক্ষক বা শিক্ষিকা সর্বদা ছাত্রছাত্রীদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন যাহাতে তাহারা পাঠপদ্ধতির কোনরূপ নিয়ম লঙ্ঘন না করে। শিক্ষক শিক্ষিকা সর্বদা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকেন।

উপরে নিয়ন্ত্রিত পাঠের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইল, তাহাই নিয়ন্ত্রিত পাঠের একমাত্র রূপ বলিয়া অনেক শিক্ষাবিদ্ মনে করেন না, যদিও কাঠামোটি তাঁহারা ঐরূপই রাখিতে চান। অনেক উচ্চ বিদ্যালয়ে বড়বড় গ্রন্থাগার আছে, সেখানে অনেক ছাত্রছাত্রী দুই তিন জন শিক্ষকের অধীনে নিয়ন্ত্রিত পাঠের অভ্যাস করিয়া থাকে। অনেক শিক্ষাবিদ্ বহু ছাত্রছাত্রীর একত্র নিয়ন্ত্রিত পাঠাভ্যাসের শিক্ষাগত কোন মূল্য আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহশীল। কিন্তু বেশীর ভাগ শিক্ষাবিদ্ই স্বীকার করেন যে যদিও বহু ছাত্রছাত্রী বহু বিষয় একসঙ্গে পড়ে, তাহা হইলেও উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে যদি ঐ পাঠাভ্যাস নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা হইলে ভাল ফল পাওয়া যাইবেই।

বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকে। এই ব্যক্তিগত পার্থক্যের জন্য যে সমস্যার উদ্ভব হয়, সেই সমস্যার সমাধানের জন্য নিয়ন্ত্রিত পাঠ বিশেষ উপযোগী। বাস্তব পক্ষে যাঁহারা এই পদ্ধতির সমর্থক তাঁহারা এই পদ্ধতির ব্যক্তিগত শিক্ষাদানের সার্থকতার উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়া ইহার সমর্থন করিতেছেন। মামুলি শিক্ষাদান পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত পার্থক্যকেও কখনও গুরুত্ব দেখান হয় নাই। শ্রেণী শিক্ষায় শিক্ষক বা শিক্ষিকা একটি মান অবলম্বন করিয়া পাঠ দিয়াছেন। সাধারণতঃ শ্রেণীর তিন রকমের ছাত্র ছাত্রী থাকে—সাধারণ স্তরের, এবং সাধারণের উপরে ও নীচের স্তরের। বলা বাহুল্য শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাদানকালে সাধারণের স্তরের উপযুক্ত শিক্ষার মান অবলম্বন করেন, ফলে যাহারা সাধারণ হইতে নীচু তাহাদের জন্য পাঠ দান হয় দ্রুত এবং যাহারা সাধারণের চেয়ে উপরের স্তরের ছেলেমেয়ে তাহাদের জন্য পাঠদান হয় অত্যন্ত মন্থরগতি। ফলে একদল শিক্ষাদানে উপকৃত হয়, অন্যান্য দলগুলি পাঠদানে উপকৃত হয় না। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। পুরাতন পদ্ধতি এখনও চলিয়া আসিতেছে। এই পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীরা

স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার সুযোগ পায় না এবং ইহাতে ছাত্রছাত্রীরা স্বাধীনভাবে পড়িয়া অর্থবোধের সুযোগ পায় না। শিক্ষা করিবার দায়িত্ব ছাত্রছাত্রীদের উপর দিতে হইবে। শিক্ষালাভ হইবে ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব অনুসন্ধানের বিষয়। ইহাতে ছাত্রছাত্রীরা নিজস্ব ক্ষমতার স্তরের উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইবে। এই কারণেই নিয়ন্ত্রিত পাঠের প্রয়োজন। নিয়ন্ত্রিত পাঠে ছাত্রছাত্রীরা নিজস্ব দায়িত্বে পড়িবে, কিন্তু যাহাতে তাহারা কোনরূপ ভুলপথে না যায় তাহার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা থাকিবেন তাহাদিগকে সুপরিচালিত করিবার জন্য।

পুরাতন পদ্ধতিতে শ্রেণীপাঠনায় আর একটি ত্রুটি দেখা যায়। ইহাতে সময়ের অপব্যয় হইয়া থাকে। শ্রেণীতে শিক্ষকের পাঠদান শুনিয়া ছাত্রছাত্রীরা কিছু উপকৃত হইলে ভুল সংশোধনের জন্য যে সময় ব্যয়িত হয়, তাহাতে অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রীই উপকৃত হয়। বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীর কাছে ঐসময় কোন উপকারই আসে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোন প্রশ্নের উত্তর যদি কোন ছাত্র বা ছাত্রী সঠিকভাবে না দিতে পারে, তাহা হইলে শিক্ষক বা শিক্ষিকা তাহার সেই ভুল সংশোধন করিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ প্রশ্নের উত্তর যদি শ্রেণীর আর সব ছাত্রছাত্রীদের জানা থাকে, তবে ঐ প্রশ্নের উত্তর যতক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করা হইল, সেই সময়টুকু অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে সার্থকরূপে ব্যয় হইল কি? মোটেই তাহা হয় না। পক্ষান্তরে যদি কোন খুব কঠিন প্রশ্নের উত্তর লইয়া শিক্ষক বা শিক্ষিকা মেধাবী ছাত্রদের সঙ্গেই আলোচনা করেন, তাহা হইলে সেই সময়টুকুও অপরাপর ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে বিফলে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ছাত্র বা ছাত্রী অন্যের ভুলের সংশোধন সম্বন্ধে হয়ত আলোচনা শোনে, কিন্তু তাহার নিজস্ব যেসব ত্রুটি আছে তাহা হয়ত শিক্ষক বা শিক্ষিকার দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। তাহা হইলে দেখা যায় শিক্ষকের পাঠনা সেই সব ছাত্রছাত্রীদের কাছে সময়ের অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। একটি উদাহরণ এই প্রসঙ্গে দেওয়া যাইতে পারে। নীচের শ্রেণীর একটি বালিকাকে অঙ্কে খুবই অমনোযোগী দেখা গেল। বালিকাকে প্রতিদিন বাড়ী হইতে ১০।১২টি করিয়া অঙ্ক করিয়া আনিতে দেওয়া হইত, কিন্তু বালিকাটির অঙ্কে কোনরূপ উন্নতি দেখা গেল না। শ্রেণীতে নানা ধরণের ভুল সম্বন্ধে আলোচনা করা হইত। কিন্তু সেই বালিকাটি যে ধরণের ভুল করিত, সেই ধরণের ভুল লইয়া কখনও আলোচনা হইত না। কিছুদিন পরে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে বালিকাটি সাধারণ নিয়মের খুব সাধারণ ভুল করিত। ঐ ধরণের ভুলের সমাধান যদি বালিকাটি করিতে পারিত তাহা হইলে সে আর অঙ্কে অত ভুল করিত না। তাহা হইলে দেখা যায় শ্রেণী পাঠনায় ব্যক্তিগত সাহায্যের ব্যবস্থা না হইলে ছেলেমেয়েদের অনেকটা সময়ই বিফলে যায়। নিয়ন্ত্রিত পাঠের ফলে এই ব্যক্তিগত সাহায্যদান পাওয়া যাইবে, এবং ছাত্রছাত্রীরা বিশেষভাবে উপকৃত হইবে বলিয়া বিশ্বাস।

গৃহে অধ্যয়নের সমস্যা

নিয়ন্ত্রিত পাঠের সঙ্গে আর একটি সমস্যার বিশেষ যোগাযোগ রহিয়াছে। শ্রেণীর বাহিরে গৃহে অধ্যয়নের সমস্যা বর্তমান সময়ে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা যাঁহারা সমর্থন করেন, তাঁহারা এই মত পোষণ করেন যে, শ্রেণীর বাহিরে গৃহে অধ্যয়ন, একেবারে বন্ধ যদি না করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেও ইহাকে যথাসম্ভব কম করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে যদি নিয়ন্ত্রিত পাঠের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে গৃহে পড়াশুনা বা গৃহকাজের কোন প্রশ্নই আসিবে না। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় প্রতি বিদ্যালয়েই গৃহকর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে শিক্ষনীয় বিষয় সম্বন্ধে সামান্য ইঙ্গিত দেওয়া হয় এবং ছাত্রছাত্রী-দিগকে গৃহ হইতে ঐ পাঠটুকু আয়ত্ত করিয়া আনিতে বলা হয়।

পিতামাতা এবং অভিভাবকবৃন্দ বিদ্যালয়ের এই ব্যবস্থাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। শিক্ষকের দেওয়া

পাঠ ছাত্র বা ছাত্রীকে গৃহে ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে হয় এবং পিতামাতা ও অভিভাবককে ছাত্রছাত্রীদিগকে পাঠ আয়ত্ত করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে হয়। ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি অনেক অভিভাবকই সন্দিহান হইয়া পড়েন।

শিক্ষক শিক্ষিকারা গৃহকাজ কেন দেন? তাঁহারা ছাত্রছাত্রীদের নিকট হইতে কতটুকু আশা করেন? গৃহকাজ দেখিবার গতানুগতিক নিয়ম আছে, সেইজন্যই কি তাঁহারা গৃহকাজ দেন? না, তাঁহাদের গৃহকাজ দেওয়ার মধ্যে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিহিত আছে? গৃহকাজের জন্য সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা কতটা সময় ব্যয় করে, তাহা কি শিক্ষক শিক্ষিকা খোঁজ রাখেন? ছাত্র-ছাত্রীরা গৃহকাজ করিতে যাইয়া যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তাহা কি শিক্ষক শিক্ষিকারা জানিবার প্রয়াস করেন? গৃহকাজ সম্পর্কে এক শিক্ষাবিদ্ একটি উদাহরণ দিয়াছেন। এক শিক্ষক ভূগোল পাঠের উপর কতগুলি প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া আনিতে শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বলিয়াছিলেন। প্রশ্নগুলি ভূগোলের বইয়ের একটি অধ্যায়ের শেষে লিখিত ছিল। ঐ প্রশ্নগুলি ঐ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া রচিত বলিয়া নির্দেশ দেওয়া ছিল। ছাত্রীটি গৃহে ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর লিখিতে লিখিতে এমন একটি প্রশ্নে যাইয়া উপস্থিত হইল যে, সে প্রশ্নের উত্তর সে ঐ অধ্যায় পড়িয়া লিখিতে পারিল না। পূর্ব অধ্যায়গুলি সে দেখিল, তাহাতেও উত্তর দেওয়া সম্ভব হইল না। পিতা বাড়ী আসিলে ছাত্রীটি পিতার সাহায্য প্রার্থনা করিল। পিতা পুস্তক দেখিয়া উত্তর বলিয়া দিতে পারিলেন না, শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে Encyclopediaর সাহায্য লইয়া উত্তর বলিয়া দিতে হইল। এইরূপ ঘটনা বিরল সন্দেহ নাই, কিন্তু গৃহকাজ যে অনেক অপচয়কারী ইহা তাহার একটি নিদর্শন।

এই প্রসঙ্গে অন্য একটি প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা কি চিন্তা করিয়া দেখেন যে ছাত্রছাত্রী কি ভাবে তাহাদের গৃহকাজ সম্পন্ন করে? সময়ের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিয়া কি ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের গৃহকাজ করে? যে কাজ পনের মিনিটে করা যায়, সেই কাজ সে অনেকক্ষণ ধরিয়া করে কেন? অধ্যয়ন করিবার বা সমস্যা সমাধানের কৌশল কি ছাত্রছাত্রীরা জানে? তাহা ছাড়া ছাত্রছাত্রীরা যখন কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তখন তাহারা কি করে? বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা অনেক সময় কঠিন বিষয়ের সমস্যা সমাধানের কাজ গৃহকাজের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের উপর চাপাইয়া দেন। ফলে ছাত্রছাত্রীরা অসুবিধায় পড়িয়া যায়। পিতামাতা অভিভাবক বা গৃহশিক্ষকের সাহায্য তাহাদের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অনেকেই হয়ত গৃহশিক্ষক রাখিতে পারে না। ফলে অনেক পিতামাতা অভিভাবকই সময়-সংক্ষেপ করিবার জন্য ছেলেমেয়েদের গৃহকাজটি করিয়া দেন, ভালভাবে বুঝাইয়া দিতে বা ছাত্রছাত্রীদের দিয়া করাইয়া লইতে সময় পান না। তাহা ছাড়া পিতামাতা বা অভিভাবক অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষিকা নহেন, তাঁহারা হয়ত সমস্যার সমাধান করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু যে কৌশল অবলম্বন করিয়া ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিলে শিক্ষা স্থায়ী হয়, তাহা তাঁহারা জানেন না। পিতা-মাতা অভিভাবকদের দোষ দেওয়া যায় না। এখন বিবেচনা করিয়া দেখা করা যাইতে পারে যে, এইরকম গৃহকাজের দ্বারা ছাত্রছাত্রীরা সত্যসত্যই সমৃদ্ধ হয় কি না। তাহা ছাড়া গৃহকাজে আরও একটি ত্রুটি দেখা যায়। ছাত্রছাত্রীরা অনেক সময় বই দেখিয়া নকল করিয়া আনে। কিংবা পরের অঙ্ক দেখিয়া নকল করিয়া আনিয়া শিক্ষক শিক্ষিকাদের দেয়। ইহা ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়ক নয়, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়।

গৃহকাজ প্রসঙ্গে আর একটি সমস্যা দেখা যায়। বর্তমান গৃহগুলি কি গৃহকাজের জন্য উপযুক্ত? শহর-গুলিতে বর্তমানে যে ভাবে পরিবার সমূহ বাস করিতেছে, তাহাতে ছাত্রছাত্রীদের গৃহে পড়িবার মত কোন আবহাওয়াই নাই। স্বল্প-পরিসর গৃহ, তাহাতে অধিবাসী-দের সংখ্যা খুব বেশী। ছাত্রছাত্রীদের নিশ্চিন্তভাবে পড়াশুনা করিবার মত কোন জায়গা নাই। গ্রামগুলিতে প্রায় একই অবস্থা। গ্রামে গৃহের বাহিরে জায়গা আছে

বটে, কিন্তু গৃহে আবহাওয়া নাই। বহুলোকের মধ্যে মনোনিবেশ করিয়া পড়া সম্ভব নয়। অতএব গৃহকাজ শিক্ষক শিক্ষিকারা যাহা দেন, তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারে না।

গৃহকাজে ঐসকল সমস্যা ছাড়াও আরও একটি সমস্যা দেখা যায়। সকল শিক্ষকই যদি বেশী করিয়া গৃহকাজ দেন তাহা হইলে পড়িবার সময় কোথায়? প্রতিদিন শ্রেণীতে চার পাঁচটি মুখ্য বিষয় পড়ান হয়, সেই চার পাঁচটি বিষয়ের উপরই যদি গৃহকাজ থাকে, তবে ছাত্রছাত্রী উহা শেষ করিবে কখন?

এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া শিক্ষাবিদ্‌গণ শিক্ষাদান পদ্ধতি ও গৃহকাজ সম্বন্ধে নূতন পন্থা অবলম্বন করিবার কথা বিবেচনা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান এবং তাহার সম্বন্ধে গৃহকাজ দেখাতে সময়ের অপচয় হয় এবং শিক্ষাও ভালমত হয় না। এই কারণে নিয়ন্ত্রিত পাঠের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিদ্যালয়ই হইতেছে সবচেয়ে ভাল স্থান যেখানে অধ্যয়ন ভাল ভাবে হইতে পারে। অধ্যয়নের কৌশল ছাত্রছাত্রী অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে আয়ত্ত করিতে পারিবে এবং পঠিতব্য বিষয়গুলি সহজেই বুঝিতে সক্ষম হইবে। গৃহে অধ্যয়নের ব্যবস্থাও থাকিবে কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা গৃহে শুধু সাধারণ সহজ বিষয়গুলিই পড়িবে, যাহা ছাত্রছাত্রীরা সহজে শিক্ষক শিক্ষিকার বিনা সাহায্যেই বুঝিতে পারে। অবশ্য বিদ্যালয়ে শ্রেণী ছাড়া মুখ্য বিষয়গুলি পড়াশুনার জন্য যে ব্যবস্থা করা হইবে, তাহাতে সমগ্র বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন করিতে হইবে। উহাতে বিদ্যালয় শিক্ষার দৈনিক সময়কাল বৃদ্ধি পাইবে এবং অর্থেরও ব্যয়াধিক্য হইবে।

নিয়ন্ত্রিত পাঠের পরিকল্পনা নিয়ে দেওয়া হইল।

ক্রমশঃ

পুস্তক-পরিচয়

তোমায় কী দিয়ে বরণ করি: শ্রীশান্তশীল দাশ; প্রকাশক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, সাহিত্য সদন। এ-১২৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০।

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীতে কবি শান্তশীলের পঁচিশটী কবিতা সম্বলিত এই রবীন্দ্র-প্রণামখানি নিঃসন্দেহে কবিশ্রেষ্ঠের চরণে পৌঁছেছে। রবীন্দ্রনাথ মানুষের কবি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—কিন্তু সুখে দুঃখে ভালয় মন্দে ঘেরা মানুষের এক রূপ নয়—অনেক রূপ; তার নোংরামিরও সীমা নেই, তার সৌন্দর্যেরও সীমা নেই; প্রতিদিনের দৈনন্দিনতা দিয়ে ঘেরা যে মানুষকে দেখি আর কল্পনায় যে মানুষের আনন্দ-মধুর ছবি আঁকি সব নিয়ে মানুষ বহুরূপী। রবীন্দ্রনাথ এই সব মানুষেরই কবি। সে কথা শান্তশীল বলেছেন। 'মাঝে মাঝে বড় ভয় পেয়ে' দিয়েও কবি শান্তশীল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন যে 'জীবনের সন্ধান', তাতেই বলতে পারছেন 'ফিরে ফিরে যেন আসি এই পৃথিবীর বুকে, যেথা বাজে নানা সুরে নানা বাঁশি'। এই কথা বলতে পেরেই রবীন্দ্রনাথ কালজয়ী বিশ্বজয়ী; আর সেই কথা যদি আমরা ধরতে পেরে থাকি তাহলেই মরণের মধ্যে অমৃতের সন্ধান পেয়ে জীবনের দরবারে আমরা বোকা বনে যাব না। শান্তশীলবাবুর পঁচিশটী কবিতাতেই 'ক্লান্তি অবসাদে ঘেরা ক্ষয়ে-ক্ষয়ে-যাওয়া' অবস্থার মধ্য দিয়েও অসীমের ইঙ্গিতবাহী একটী স্নিগ্ধ অচপল আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। বইটী, একটু ভাবতে যারা অভ্যস্ত, তাদের ভাল লাগবে বলে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় আছে। এর ভাষার মধুরতা সম্বন্ধে নূতন করে বলার নেই, কেননা শান্তশীলবাবু সর্বত্র পরিচিত।

সাময়িকী

জগন্নাথের রথযাত্রা ঃ সূর্যের আলো দিয়েই সূর্যকে দেখতে হয়, জগন্নাথ আমাকে চান বলেই আমি তাঁকে চাইতে পারি, মানুষের অভিসারে তিনি বের হন বলেই মানুষ তাঁকে খুঁজতে বের হতে পারে। জগন্নাথের রথযাত্রার অর্থ তিনি বেরিয়েছেন পথে মানুষের খোঁজে, তিনি এসেছেন নেমে জন কোলাহলের অরণ্যে। জগতের যিনি নাথ, তিনি আমাকে চান, তিনি আমার খোঁজে বের হন—ভাবতে দেহমনপ্রাণ পুলকিত হয়! আমার বাইরে যে বিরাট শক্তি, তিনি শুধু শক্তিমান নন, তিনি প্রেমময়ও, আমাকে বাদ দিয়ে তিনি পরিপূর্ণ নন, তাঁকে পরিপূর্ণ হতে আমাকে তাঁকে স্বীকার করে নিতে হয়—তাঁতে আমাতে মিলিয়ে তিনি আমি সত্য, অখণ্ড—এই বোধ জন্মানর জন্যই তাঁর রথযাত্রার প্রয়োজন। স্রষ্টার এই প্রয়োজন-বোধকে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে ভাষা দিয়েছেন —'তিনি রূপ ভালবাসেন, তাই কেবলই রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে; আমরা বদ্ধ, সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। ···গান যে করে সে আনন্দের দিক হইতে রাগিনীর দিকে যায়, গান যে শোনে সে রাগিনীর দিক হইতে আনন্দের দিকে যায়। একজন আসে মুক্তি হইতে বন্ধনে, আর একজন যায় বন্ধন হইতে মুক্তিতে. তবে তো দুই পক্ষের মিল হয়। তিনি যে গাহিতেছেন, আর আমরা যে শুনিতেছি। তিনি বাঁশিতে বাঁশিতে শোনান, আমরা ধূলিতে ধূলিতে শুনি'। জগন্নাথ যিনি, তিনি জগৎকে চাইছেন, তিনি রথযাত্রায় রওয়ানা হয়েছেন—'বেঁকে বেঁকে আবার এঁকে এঁকে চলছে নিরাকার'। সৃষ্টি বলছে জগন্নাথকে —'ওগো আমার প্রলয়, আপনাকে আমি তোমার মধ্যে চরমার করিতে থাকিব—চিরকাল ধরিয়া! বন্ধন আমার নয় বলিয়াই কোনো বন্ধনকে ধরিয়া রাখিতে পারি না, আর বন্ধন তোমারই বলিয়াই অনন্ত কালে তুমি সৃষ্টির বাঁধন ছাড়াইতে পারিলে না। থাকো, আমার রূপ লইয়া তুমি থাকো, আমি তোমার অরূপের মধ্যে ডুব মারিলাম'। সৃষ্টি স্রষ্টাকে পেতে চাওয়ার সাধনায় ডুবতে চায়, স্রষ্টা সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে দেখতে চাওয়ার জন্যে পথে বের হন। আমার নয়নে তাঁর বিশ্বছবিকে দেখে নিতে না পারলে তাঁর আনন্দ খণ্ডিত হয়ে যায়, আমার চোখে তাঁর সূর্যোদয়কে কিনে নিয়ে তিনি সুখ —এইজন্যই তাঁর নেমে আসা। এ নেমে আসাকে যে উপলব্ধি করতে পারল সেই বুঝল তাঁর আমার মিলন-স্থল এই বিশ্ব কেন এমন মহাপুণ্যভূমি। এই তত্ত্বকে ভক্ত আস্বাদন করেছেন কোনো একটী বিশেষ ক্ষেত্রে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে, শ্রীক্ষেত্রে, পুরীধামে। রথযাত্রার দিনে পুরুষোত্তমের জগতে যাত্রা করার দিন—তাই তা এমন পুণ্য তিথি।

কিন্তু এ তত্ত্বকে বিশ্বের সর্বত্র আস্বাদন করবার ডাক এসেছে আজ। এ ডাক যেমন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় পেয়েছি, তেমনি পাশ্চাত্ত্যের বৈজ্ঞানিক দার্শনিক হোয়াইট-হেড যখন বলেন '...It is as true to say that the world is immanent in God, as that God is immanent in the world. It is as true to say that God transcends the world, as that the world transcends God. It is as true to say that God creates the world, as that the world creates God,' তখন তার মধ্যেও সেই সুরই দেখতে পাই। জগতের বুকে জগন্নাথের রথযাত্রার ভক্ত গণতন্ত্রবাদের শেষ পরিণতি —সেইজন্যই পুরীক্ষেত্রে জাতিভেদ নাই, ছোটবড়র মধ্যে ব্যবহারের অসামঞ্জস্য নাই, শুচির কৌলীন্য

ন'ই, সেখানের আনন্দবাজারে সকলের সব অবাধ নিমন্ত্রণ—মহা আনন্দের হাট। এই আনন্দের হাট আজ সর্বত্র সৃষ্টি করতে হবে সকল দিনের জন্য—শুধু একটী বিশেষ স্থানে একটী বিশেষ দিনে তার আস্বাদন নয়। আমরা জগতের বুকে পুরুষোত্তমের অবতরণের ফলস্বরূপ এই আনন্দতত্ত্বকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে প্রয়াসী হয়ে এই রথযাত্রার দিনে পুরুষোত্তমকে ধ্যান করি, অনুধ্যান করি।

হরিজন আশ্রম ঃ গত সংখ্যার উদ্বোধনে আমরা বরিশালে সুরেশগুপ্ত মহাশয় প্রতিষ্ঠিত হরিজন আশ্রমের বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্তা মায়ারাণী ঘোষের শেষ পত্রে তিনি জানাইতেছেন, 'শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত দুর্গামোহন সেন মহাশয় জানাইয়াছেন যে, ওঁদিকে কেহ যদি হরিজন আশ্রমের জন্য সাহায্য দিতে চাহেন, তবে তাহা বিধান পল্লীতে তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিলে তিনি আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করিতে পারিবেন'। আমরা আমাদের পাঠক বা যে কেহ এ সম্বন্ধে আগ্রহশীল তাঁহাদের সকলের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। দুর্গামোহন সেন মহাশয়ের ঠিকানা—বিধান পল্লী, পোঃ গড়িয়া, জেঃ ২৪ পরগণা। আমরা আশা করিয়া রহিলাম এ সুযোগ কাজে লাগান হইবে।

গুরুপূর্ণিমা ঃ আজ গুরু পূর্ণিমার তিথি, গুরু পূজার দিন। দীর্ঘদিন পূর্বে নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ কর্তৃক এই গুরু পূজার প্রবর্তন হইয়াছিল, সেই হইতেই ভারতবর্ষে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সকল সম্প্রদায়ের মঠ ও আশ্রমাদিতে এই গুরুপূজা হইয়া থাকে। আমরা আজ নরনারায়ণ আশ্রমের সেবকবৃন্দ এই পুণ্য তিথিতে শ্রীগুরুর পুণ্য সমাধি তলে সমবেত হইয়াছি তাঁহার শ্রীচরণে সমবেতভাবে অর্ঘ্য নিবেদন করিবার জন্য। তিনি আজ আর আমাদের সামনে প্রত্যক্ষভাবে নাই, যেমন ছিলেন তিন বৎসর পূর্বে; কিন্তু তিনি প্রতি নিয়ত এমনভাবেই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া জীবনের প্রতি মুহূর্তটুকু তাঁহার জীবনস্মৃতি দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, মনে হয় যেন তিনি প্রতিনিয়তই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষই আছেন। প্রত্যক্ষ ও অনুমান দুই মিলিয়াই গুরু। "শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ লিখিতেছেন—"যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।" দেব আছেন প্রত্যক্ষের ওপারে অনুমানের রাজ্যে আদর্শের ক্ষেত্র আগলাইয়া, গুরু আছেন এপারে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র আগলাইয়া প্রত্যক্ষের বেশে। সৌভাগ্য বশতঃ যাহার এই দেবগুরু সমন্বিত কোনও পুরুষোত্তম বস্তুর সান্নিধ্য লাভ হইয়াছে, তাঁহার প্রতি ভক্তি জন্মিয়াছে, তাহারই এ জগৎ ও জগতের নানাত্ব বুদ্ধি কাটিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার কাছেই উপনিষদের সমগ্র অর্থ সহজভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষের সমন্বিত ভজনের জন্যই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে একটি আদর্শধন প্রত্যক্ষ পুরুষের সান্নিধ্য।"—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ। আমরা শ্রীভগবানের কৃপায় এমনই একজন প্রত্যক্ষ ও অনুমান সমন্বিত পুরুষকে গুরুরূপে পাইয়াছিলাম যাঁহার জীবনে কোন কোঠা ভাগ ছিল না, এপার ওপার প্রত্যক্ষ অনুমান প্রেমে গলিয়া গিয়া একাকার হইয়াছিল। আদর্শ ও বাস্তবের প্রতি ক্ষেত্রকে তিনি ব্রহ্মমূল্যে আস্বাদন করিয়া গিয়াছেন এবং আমাদেরকে সেই পথে পরিচালিত করিবার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। "মেষপালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মেষপালক থাকে কোন মেষ বিপথগামী হইলে তিনি তাহাকে ধরিয়া প্রকৃত পথে চালান। গুরু শিষ্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মেষপালকের ন্যায় থাকেন। তাঁহাদের কেহ বিপথগামী হইলে তিনি টেনে এনে প্রকৃত গন্তব্যপথে চালান।"—সর্বধর্মনির্ণয়সার, শ্রীনিত্যগোপাল। আমাদের গুরুদেব আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সর্বদা তাঁহার অমৃতময়ী বাণী দ্বারা এবং তাঁহার স্নেহের আকর্ষণ দ্বারা আকর্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজও রাখিয়াছেন। ইহা মানুষের সাধনার অতীত বস্তু, ইহা একমাত্র ভগবানের অহৈতুকী কৃপাতেই মানুষ পাইতে পারে। আমরা ভগবানের সেই করুণার পাত্র; তাই এই দুরত্যয়া মায়ার রাজ্যে পাইয়াছিলাম এমন প্রত্যক্ষ গুরুর

আজন্ম যাঁহার চরণতলে শরণাগত হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারিলে এই দুর্গম সংসার পথ অতিক্রম করিয়া এই সংসারেরই গোপন প্রদেশে যে ব্রহ্মরস লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহা আস্বাদনের অধিকারী হইতে পারিব।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখিতেছেন—"সৌভাগ্যবশতঃ দেবগুরু সমন্বিত জীবনের সান্নিধ্য যদি কাহারও লাভ হয় এবং সেই গুরুতে অহৈতুকী ভক্তি হয় তবেই তাহার জীবনে "আমি আছি" এই আনন্দঘন গুরুর প্রকাশ হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে বলিতেছেন—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" দেবগুরু সমন্বিত জীবন পাইলেই তো হইবে না তাহার নিকট প্রপন্ন হওয়া চাই, তবেই তিনি এই দুরত্যয়া মায়ার বাধা অতিক্রম করাইয়া শিষ্যকে যোগমায়ার রাজ্যে পৌঁছাইয়া দেন। আমাদের গুরুদেব তাই প্রায়ই বলিতেন—আমি যে মাটি দিয়া শিব গড়িব সে যদি নরম মাটি না হয়, কি করিয়া শিব গড়িব? মাটি যদি শক্ত হয়, মাটি যদি নড়াচড়া করে তবে যে শিব গড়িতে বাঁদর তৈরী হইবে। তাঁহার দুইটী কথা ছিল—একটি, শরণাগত হও আত্ম সমর্পণ কর। অপরটি সঙ্ঘবদ্ধ হও, অদ্বৈত হও। আজ তাই আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাঁহার চরণে শরণাগতি প্রার্থনা করি।

প্রত্যক্ষ ভজন যেমন সহজ তেমনই আবার কঠিনও খুবই, অনুমান দেবতাকে প্রত্যক্ষের মাঝে সর্ব্বদা রাখিয়া তাঁহার নির্দ্দেশ মত চলা খুবই কঠিন। আবার প্রত্যক্ষ দেবতার চরণে তাঁহার স্নেহের আকর্ষণের ভিতর দিয়া নিজকে হারানোও খুব সহজ। যদি কোন মানুষের জীবনে সেই সৌভাগ্য হয়, তাহার খণ্ডিত আমিত্বটুকু প্রত্যক্ষ গুরুর চরণতলে সমর্পণ করিতে পারে তবে সে এই সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যায়। শুধু আনুমানিক দেবতার আরাধনায় মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তিতা লাভ হয় না, কেননা, সে যাহা কিছু করে, ভাবে তাহা তো নিজেরই খেয়াল মত করে বা ভাবে; তাহাতে নিজের জীবনের আনাচে কানাচে কত অজ্ঞাই না লুকাইয়া থাকে, একদিন সে সুযোগ সুবিধা বুঝিয়া জীবনকে আক্রমণ করে। এই জন্যই একজন প্রত্যক্ষ গুরুর প্রয়োজন যাঁহার জীবন অনুমানের দেবতা ও প্রত্যক্ষ গুরুর সমাবেশে উজ্জ্বল। শিষ্যের যত কিছু লুকানো মলিনতা প্রত্যক্ষ গুরুর ধাক্কায় ধাক্কায় মুছিয়া যায়; সে তখন সকল সংস্কার-মুক্ত নির্ম্মল জীবন লাভ করে। বর্ত্তমানে আমাদের গুরু অনুমানের রাজ্যে চলিয়া গেলেও তিনি তাঁহার নয়নারায়ণ আশ্রমে সঙ্ঘরূপে প্রত্যক্ষ আছেন। আমাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতেই হইবে; সঙ্ঘের ভিতর গুরু প্রত্যক্ষ ও অনুমান রূপে রহিয়াছেন। প্রত্যেক গুরু ভাই ভগিনীদের ভিতর আমার অনুমানের গুরু এক রূপেই বর্ত্তমানে রহিয়াছেন। আবার প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে এই গুরু ভাই বোন প্রত্যেকেই আমরা আলাদা অর্থাৎ বহু, প্রত্যেকের চাল চলন আচার ব্যবহার আলাদা কিন্তু এক জায়গায় আমরা এক। এই একের দিকে তাকাইয়া বহুর সঙ্গে মিলিতে গেলেই আমাদের প্রত্যেককে প্রত্যেকের মর্য্যাদা দিতে হইবে, স্বীকার করিতে হইবে, ভালবাসিতে হইবে। এই স্থানে প্রয়োজন বহু তপস্যার—অর্থাৎ সংযম, সহনশীলতা ও ত্যাগ স্বীকারের। এমন করিয়াই গুরুর এই সঙ্ঘবদ্ধ জীবন যাপনের নির্দ্দেশ অনুকরণ করিয়া চলার পথে আমাদের আসিবে জীবনে পরিতৃপ্তিতা। এই নয়নারায়ণ আশ্রমের সঙ্ঘজীবন যাপনের মধ্যেই রহিয়াছে নিত্যগোপাল দেবের এক ও বহু সমন্বয় করিবার শিক্ষা। বুদ্ধদেবও এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন—আনুমানিক দেবতার কথা তিনি বলেন নাই, তিনি বলিয়াছেন—সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি-র কথা। সঙ্ঘের ভিতর দিয়াই জীবনের পরিতৃপ্তিতা লাভ করিয়া ভাগবত জীবন যাপনের কথাই তিনি বলিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও সঙ্ঘের দেবতা; সঙ্ঘ ছাড়া কিছু তিনি করেন নাই। বৃন্দাবনে গোপগোপী সঙ্ঘ রচনা করিয়া আনুমানিক জগতের ব্রহ্ম গোপাল সেই সঙ্ঘের ভিতর লীলা রস আস্বাদন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের গুরুদেবও বার বার এই সঙ্ঘের কথা, একপ্রাণতার কথা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র দাবীই ছিল আমাদের নিকট, তোমরা আমার জীবনে ও সঙ্ঘজীবনে সংহত হও, সমাহিত হও।

তাঁহার সেই ইচ্ছাকে পূর্ণ করিবার প্রচেষ্টাই আমাদের এই আশ্রমের সাধনা। আবারও তাঁহার সেই দুইটী কথা বলি—তোমরা শরণাগত হও, আত্ম সমর্পণ কর, নম্রশির হও, অদ্বৈত হও। সদ্গুরু শ্রীনিতাগোপাল, শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ, আর নরনারায়ণ আশ্রমের সেবক সেবিকাগণের প্রাণের আহুতিরা প্রণাম গ্রহণ কর

গত আষাঢ়ী পূর্ণিমায় গুরুপূর্ণিমা দিনে শ্রীযুক্তা প্রতিভা রায় যে ভাষণ পাঠ করিয়া ছিলেন, তাহাই গুরুপূর্ণিমা নিবেদনরূপে প্রকাশিত হইল। গুরুপূজার এই অবসরে শ্রীযুক্তা প্রতিভা রায়ের নিকট শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখিত একটী পত্র আমরা আস্বাদন করিব, যাহাতে শিষ্যের উপর গুরুর কৃপা সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে।

কলিকাতা

৩১শে শ্রাবণ-১৩৪৭

নারায়ণেষু,

তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমরা তোমাদের কাজ করিয়া যাও। সামনে খোলা আছে, বাধা দিবার কেহ নাই, তার লইবারও কেহ নাই। সেখানে আমরা একত্ব নির্জ্জন, ভিড় করিবার কেহ নাই। শতকলা শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন গিয়াছে। লোকের দৃষ্টি সেদিকে খুব। একটী ছেলে কাল এখানে আসিয়াছিল। তাহার সহিত অনেক আলোচনা হইল। আমরা যে অরবিন্দেরও সামনের আলোচনা করিতেছি···তাহার অনেকটা আলোচনা হইয়াছিল। তুলনমূলকভাবে অরবিন্দ ও আমাদের মধ্যে সাধন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইবে। অরবিন্দের বই পড়া দরকার। ওখানে পাইলে পড়িও, উহা বাংলায় ছাপা আছে। অরবিন্দের সঙ্গে আমাদের খুব সাদৃশ্য আছে, কিন্তু পার্থক্য আছে প্রচুর। সিদ্ধান্তাংশে তাঁহার মত আমাদের সঙ্গে একই রূপ, কিন্তু যে সাধনায় তিনি চলিয়াছেন কিম্বা মানুষকে চলিবার উপদেশ দিতেছেন, তাহাতে অন্তর্মুখী সাধনার উপরই ঝোঁক বাড়িবে, বাড়িয়াও উঠিতেছে। তাহার ফলে পূর্ব্বেকার যোগীদের অবস্থাই বাস্তবিকভাবে দাঁড়াইবে যদি তিনি বলেন যে সেই ভাগবত স্তর হইতে নামিয়া এই মানুষকে দেব মানবরূপে রূপান্তরিত করিবেন। বাকী সাক্ষাৎ আলোচনা করার বিষয় রহিল। সম্ভব হইলে তাঁহার মতের সঙ্গে পরিচিত হইবার চেষ্টা করিও। তাঁহার ২১ খানা বই পড়িও···আমি সকল দিক দিয়া দুর্যোগের পথের যাত্রী। তোমরা প্রস্তুত হও। তোমরা সব বুঝিয়া লও।

সেদিন একটী হিন্দী প্রবন্ধ পড়িতেছিলাম। বেশ সুন্দর। তাহার কথাই আজ কিছু লিখিব। সেটী ভগবানের "শক্তিপাত" সম্বন্ধে লেখা। "শক্তিপাত" শব্দটী তন্ত্রের। 'শক্তিপাত" অর্থ উপর হইতে ভগবৎ কৃপা শিষ্যের উপর পাত অর্থাৎ অবতরণ। শক্তি অর্থে কৃপাশক্তি। এই পাত বা অবতরণ তিন স্তরে হয়—(১) কর্ম্মদ্বারা (২) মনদ্বারা (৩) স্পর্শন। ভগবান নামিয়া আসিতেছেন, ভক্ত তাঁহাকে বরণ করিয়া লইবেন। এখানে ভগবানেরই সাধনা, ভক্তের এরূপ সাধনা নাই বলিলেই হয়। শুধু তাঁহার অবতরণকে বাঁধা না দিয়া ঠিক ঠিক রূপে যেমন তেমনটী নিজের জীবনে আপনার করারই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। ভগবৎ কৃপা "সম"। একটী "সম" বস্তুকে যদি কোন উচ্চ-নীচ আধারের উপর রাখিতে হয়, তখন যেমন উঁচু জায়গাকে কাটিয়া নীচুর সঙ্গে সমান করিয়া ছাটিয়া ফেলিতে হয়, ঠিক কৃপা সেখানেই অবতরণ করিতে পারে যেখানে জীবনে কোনও গুণ, বা কোন বৃত্তির একাধী প্রাবল্য নাই। একটী অঙ্গের প্রবলতা থাকিলে জীবনের একদিক উচ্চ হইল, সে অপর দিকগুলিকে চাপিয়া রাখিবে। কৃপাবতরণের আর কোনও সম্ভাবনা নাই। প্রচলিত সাধনায় সত্ত্বগুণকে প্রবল করিয়া দেওয়ার নিয়ম, তাহাতে ফল হয় রজঃ ও তমকে সত্ত্ব দাবাইয়া রাখিয়া নিজে প্রবল হয়। সত্ত্ব প্রাবল্যে শক্তিপাত সাধনার হানি হয়। এই সাধনায় সেই সত্ত্বগুণকে ছাটিয়া অন্য গুণের সমান করার প্রয়োজন। এই ছাটিয়া ফেলিবার জন্য প্রয়োজন হয় উহাকে বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে চড়াইয়া দেওয়া। জীবের কিন্তর শুভ বাসনার অর্থাৎ সত্ত্ব গুণের, শুভাশুভ বাসনার অর্থাৎ রজোগুণের, অশুভ বাসনার অর্থাৎ তমোগুণের ক্ষেত্র রহিয়াছে। সত্ত্বগুণের ক্ষেত্রেই প্রথম

জীবের সঙ্গে ভগবৎ কৃপায় দেখা হয়। উহার নামই "কর্ম্ম সাম্য"। এখানে সদ্‌গুরু ও শিষ্যের জ্ঞান পূর্ণরূপ সম মিলন, সম কর্ম্ম, সম সুখ দুঃখ সম সম্ভব। সমস্ত শুভ বাসনাকে বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিয়া সদ্‌গুরু ও শিষ্য দুইজন দুইজনের মধ্যে পাইয়া যেন সাম্য আস্বাদন করিতেছেন। শক্তিপাত সাধনার দৃষ্টান্ত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন। শ্রীকৃষ্ণ "শক্তিপাত" করিতেছেন আর অর্জ্জুন গ্রহণ করিতেছেন। শক্তিপাত সাধনার দ্বিতীয় স্তর মলপাকের স্তর। এখানে ভগবৎ শক্তি শুভাশুভ বাসনার স্তরে অর্থাৎ রজোগুণের স্তরে বিরাট কর্ম্মের স্তরে অবতরণ করেন। এখানে রজোগুণের সব "মল" পাক অর্থাৎ হজম হয় বলিয়া এই স্তরের নাম মল পাকের স্তর। এখানে সদ্‌গুরু নির্দ্দেশ দিতেছেন, শিষ্য করিয়া যাইতেছেন। এখানে সদ্‌গুরু শিষ্যের কাছে কাছে থাকেন না। অবলম্বন শিষ্যের শুধু গুরুর নির্দ্দেশ। যেমন মহাপ্রভুর নির্দ্দেশে নিত্যানন্দ সংসার করিতেছেন। এখানেও সমস্ত শুভাশুভ সম্মিলিত বাসনাকে বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিলেই, রজোগুণের প্রাবল্য আসিয়া অবতরণের ক্ষেত্র ঐ শিষ্য-হৃদয়কে উঁচু-নীচু করিয়া দিবে না। ইহার পর পতনের স্তর। তৃতীয় স্তর। ইহা সমস্ত অশুভের স্তর। মানুষের ভিতর অশুভ বাসনাও রহিয়াছে, কেন না তাহাও সনাতন। এই অশুভ বাসনাকে চাপিয়া রাখিয়া শুভ বাসনার উপর জোর দেওয়াই ছিল এতদিনের সাধনা। কিন্তু উহাতেও শিষ্য-জীবনের সাম্য নষ্ট হয়, চোট পড়ে। এই অশুভ বাসনাকেও কেমন করিয়া বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায়, তাহাই তো ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্ত ব্রজগোপী, অজামিল প্রভৃতি। পতনের ক্ষেত্রে সদ্‌গুরু থাকেন শিষ্যের ভিতর হৃদয় হইয়া, এক হইয়া। এই "পতন" যখন বিশ্ববাসীর পতনের স্তরে নামিয়া "সম" হয়, এবং যখন উহা কর্ম্মজ্ঞান সহায়ে অবতরণ করে, তখন উহা দিব্য পতন। শিষ্য তাহার পতনের ভিতর দিয়া দুনিয়ার পতন অনুভব করে এবং সদ্‌গুরু সহায়ে এই পতনকে কি করিয়া উর্দ্ধানে গড়িয়া তোলা যায় তাহার কলাপূর্ণ কৌশল শিখিয়া দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ 'পতিত' নর-নারীর সামনে অগ্রসর হইবার পথ খুলিয়া দেন এই জন্যই অহল্যার পতন, বিশ্বমঙ্গলের পতন। পতন তখন উর্দ্ধানের ঘন রূপ হয়। সত্ত্বগুণের ক্ষেত্রের অবতরণের নাম "কর্ম্মসাম্য"; দৃষ্টান্ত বহু আদর্শবাদী জ্ঞানী ও ভক্ত। রজোগুণের ক্ষেত্রে অবতরণের নাম "মলপাক" দৃষ্টান্ত অর্জ্জুন প্রভৃতি। তখনকার বাণীই "মৎ কর্ম্মো পরম ভব" —আমার কর্ম্মই তোমার কর্ম্ম হউক। এখানেই কর্ম্মের বিশ্বরূপতা। তমোগুণের ক্ষেত্রে অবতরণের নামই "পতন"। দৃষ্টান্ত অহল্যা ব্রজগোপী প্রভৃতি। গীতা ভাষ্য হইতে (১৭৩ পৃঃ) "ময্যেব মনো আধৎস্ব"—শ্লোক হইতে ১৭৮ পৃষ্ঠা খুব মনোযোগের সহিত পড়িয়া দেখিও। দেখিবে কেমন করিয়া ভগবান ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিতেছেন। যাহা শক্তিপাত সাধনায় 'কর্ম্মসাম্য'। সেটাই গীতার "অভ্যাস"—অভ্যাগের অসনম্—সমানভাবে থাকা। যাহা শক্তিপাত সাধনার মলপাক, তাহাই গীতার জ্ঞান ও ধ্যান। যাহা "পতন" তাহাই গীতার কর্ম্মফল ত্যাগ। এখানেই পরাশক্তি। যখন ভক্ত হৃদয়ের সব রঙ্গ তম সব বিশ্বরূপের সঙ্গে বিশ্বরূপী হইয়া বিশ্বের সকলের সঙ্গে 'সম' হইবার যোগ্যতা অর্জ্জিত হইবে, তখনই "সম" কৃপার অবতরণ ক্ষেত্র গঠিত হইবে। এই সাধনা হয়ই না, যদি না একটী প্রত্যক্ষ সদ্‌গুরুর সঙ্গে যুক্ত না থাকে। অর্জ্জুনের তাহা জুটিয়াছিল, ব্রজগোপীর তাহা জুটিয়াছিল, অহল্যার তাহা জুটিয়াছিল। এমন একটী সদ্‌গুরুর শরণ লইলেই সম্ভব হয় সমস্ত গুণের সমতা, সমস্ত বৃত্তির সমতা, সমস্ত কর্ম্মের সমতা, সমস্ত অবস্থার সমতা—কাহারও উপর বেশী জোরও নয়, কম জোরও নয়। ইহারই নাম "জীবন"। এই জীবনব্রত শ্রীকৃষ্ণ, পুরুষোত্তম। ইহাই পূর্ণ সংযমের ক্ষেত্র, পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্র। আমার স্নেহ জানিও।

পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীরেণু মিত্র কর্ত্তৃক নয়নারায়ণ আশ্রম পোঃ দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি ক্রিষ্ট ইণ্ডিয়া ৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

শ্রীনিত্যগোপাল-বাণী

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরোত্তম শ্রীঅর্জুনের প্রতি বলিয়াছিলেন—'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'। ...গুণকর্মানুসারে জাতি নির্ণয় করিতে হইলে ব্রাহ্মণের গুণকর্ম সকল যাঁহাতে থাকিবে তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে। ক্ষত্রিয়ের গুণকর্ম সকল যাঁহাতে থাকিবে তাঁহাকেই ক্ষত্রিয় বলিতে হইবে। বৈশ্যের গুণকর্ম সকল যাঁহাতে থাকিবে তাঁহাকেই শূদ্র বলিতে হইবে। কোন প্রকার বর্ণসংকরের গুণকর্ম সকল যাঁহাতে থাকিবে, তাহাকেই বর্ণসঙ্কর বলিতে হইবে।...

ভগবান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রাহ্মণের সমস্ত গুণকর্ম দ্বারা বিভূষিত ছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তিজনক পরমজ্ঞানও ছিল। তাঁহার কৃষ্ণানুরঞ্জিত প্রাণ পরাভক্তি দ্বারা অভিসিক্ত হইয়াছিল। তাঁহাতে যে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণতা লক্ষিত হইত। সেইজন্যও যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ দ্বিজত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি তাঁহার নিজ মতানুসারে জন্মানুসারে অব্রাহ্মণ চণ্ডাল হইলেও ব্রাহ্মণোপযোগী গুণকর্ম সকল লাভ দ্বারা, ব্রাহ্মণত্বসূচক পরম জ্ঞান লাভ দ্বারা, শ্রেষ্ঠ দ্বিজত্বদায়িনী বিষ্ণুভক্তি লাভ দ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া, মহামুনি হইয়া, জীবন্মুক্ত আত্মজ্ঞানী হইয়া, শ্রেষ্ঠ ভক্তাচার্য্য হইয়া, পরম প্রেম নির্ণায়ক হইয়া বেদবিভাগাদি কার্য্যে শক্তি লাভ করিয়াছিলেন।..."

—জাতিদর্পণ—পৃঃ ২০১-২০২

CALCUTTA UNIVERSITY

উদ্বোধন

১৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(২)

১১. ৫. ১৯৫৬—সন্ধ্যারতির পর।

ওঁ নমো তত্ত্বমূর্ত্তয়ে ভক্ত-ভগবতে নিত্যগোপাল'ঙ্ক জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তুরীয়-তুরীয়াতীতায় ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবৎ-পুরুষোত্তমায়…।

আমরা এই নরনারায়ণ আশ্রমে শ্রীনিত্যগোপালের চরণতলে সমবেত হয়েছি। নূতন কর্মী যারা আছেন, তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় স্বল্প—দু'এক বৎসরের ও নয়। আমি কি আদর্শ নিয়ে এখানে এসেছি, সে সম্বন্ধে তোমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। শ্রীনিত্যগোপাল নূতন কথা নিয়ে এসেছেন—এ কথা যদি মেনে নিতে না পার, তাহলে আশ্রম চলবে না। পুরাতন যুগ চলে গেছে। নূতন যে যুগ আসছে তার জন্য নূতন বেদ ও চরিত্র নিয়ে নিত্যগোপাল এসেছেন—এটা বিশ্বাস করতেই হবে। কুমার বলেছিল—স্বামিজীর দারিদ্র্য স্বেচ্ছাকৃত—কথাটা অনেকাংশে সত্য। আমি সুবিধা-সুযোগ নেই নি—তাহলে ঘেরের টিন দিয়ে জল পড়ত না। তোমাদের জানতেই হবে যে, পুরাতন যুগের কথা বলতে আমি আসি নি। মানুষকে আমি বিশ্বাস করি, ভালবাসি—শত অপরাধ (কৃষ্ণের মত) ক্ষমা করব। মানুষকে মানুষ হিসাবে ভালবাসি।…তোমরা পড় শুনি—কি পড় জানি না, কিন্তু প্রশ্ন তো কিছু কর না। সব বোঝে তা তো নয়—কিন্তু প্রশ্ন না জাগলে তো বোঝা হয় না কিছুই।…নিত্যগোপাল কত বড় প্রাণের সাধনা নিয়ে এসেছিলেন শোন। তাঁর শিষ্য বলাইবাবু বেন্তাবাড়ী যেতেন। আমায় ঠাকুরকে ভালও বাসতেন। একদিন কি মনে হল—বেন্তাবাড়ী থেকে বেরিয়ে এক ঠোঙা অমৃতি নিয়ে ঐ কাপড়েই সোজা হুগলী চলে গেলেন ঠাকুরের কাছে। দুয়ারে দাঁড়িয়ে বললেন, ঠাকুর আমি ভেতরে আসব কি? ঠাকুর বললেন, এসো। বলাইবাবু বললেন, আমি বেন্তাবাড়ী থেকে সোজা আসছি। ঠাকুর শুনে একটু গম্ভীর হয়ে একটু পরে বললেন, এসো। তুলিকে (ঠাকুরের সেবিকা) বললেন, তুলি খাবারটা নে। তুলি খাবার নেয় না। তখন ঠাকুর নিজেই কয়েকটা অমৃতি খেয়ে ফেলে বললেন, এইবার নে। বলাইবাবু বিস্মিত হলেন, ভিতরে ঢুকলেন—এতখানি হৃদয় তাকে বিচলিত করল, জীবনে আর তাঁকে বেন্তাবাড়ী যেতে হয় নি। এ ঘটনাদ্বারা প্রমাণ করে ঠাকুরের সাধনা হৃদয়ের।…বুদ্ধির সাধনা হলে এত সহজে ক্ষমা হত না। যিনি হৃদয় নিয়েই এসেছেন, তাঁকে হৃদয় দিয়েই গ্রহণ করতে হবে… ফাঁকি দিলে ফাঁকিতে পড়তে হয়, কেননা আত্মা এক—ডিপ্লোম্যাসি রাজনীতির ক্ষেত্রে চলে—স্বামীস্ত্রী-গুরুশিষ্য-পিতাপুত্রের সম্বন্ধে এ ডিপ্লোম্যাসি চলে না…সহজ সরল পথ, সত্যের পথ, দুঃখের পথ আমি বেছে নিয়েছি—এই ১৩ বছরে সহস্র সহস্র শিষ্য করতে পারতাম—কিন্তু সুবিধাবাদের মধ্যে আমি নেই। আমি টাকা কুড়াতে আসি নাই…নিত্যগোপালের প্রসাদে আমার হৃদয় আছে—তেনে ব্রহ্ম হৃদা—আমি তোমাদের পার্থিব অপার্থিব সকল রকম মঙ্গলের জন্য ব্যগ্র।…

মানুষকে আমি বিশ্বাস করি ··সিরাজগঞ্জের বিদ্যা·· -কে বিশ্বাস না করার কথা অনেকে বলেছিল···আমি বলেছিলাম তাকে অবিশ্বাস করতে আমি পারব না—সে আমাকে ঠকালেও তাকে আমি অবিশ্বাস করতে পারব না · আমি নিজেকে বিশ্বাস করি, আশ্রিতকে বিশ্বাস করব।···বর্তমান যুগের জটিল সমস্যার সমাধান করতে বুলগানিন আইসেনহাওয়ার হিমশীম খাচ্ছে—আজ তাই হৃদয়ের পথ দরকার···চালাকী রাবণের মাথায় দশগুণ খেলত···বর্ণ আঁকি দিয়ে পরশুরামের কাছে শিখতে গেলেন—তুমি যা না, তুমি তা প্রকাশ করেছ—এ পথে সুবিধা হবে না···ভারতবর্ষ সত্যের পথ নিয়েছিল ···আজকের ভারতবর্ষ সুবিধাবাদ অনেকটা শিখেছে নিত্যগোপাল এলেন এই সংকটে পথ দেখাতে একটা উজ্জ্বল ভারতের ছবি আমার বুকে লেগে আছে নিত্যগোপাল তার দেবতা। তোমাদের কাছে আবেদন নিবেদন করি—তোমরা যদি সত্যই এসেছ তাহলে শিখতে চাও, জিজ্ঞাসা কর—বিশ্বাস কর তোমাদের চেয়ে আমি বেশী কিছু জানি।·· রামচন্দ্র ভাবাগদ্গদ্রায়ান, রাজ্য ছেড়ে দিয়ে বনে চলে যান—তবু তাঁরাই ভারতের দেবতা ছিলেন—কিন্তু পাশ্চাত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয় নি...সেই সামঞ্জস্য রক্ষা করতেই নিত্যগোপাল এসেছেন।...নিজের কথা আর একজনের উপর চাপিয়ে দুঃখ পেয়েও লাভ নেই, দুঃখ দিয়েও লাভ নেই ...আমার পথ হৃদয়ের পথ—বুদ্ধি থাকলে শোষণ করতে পারতাম—কিন্তু হৃদয়ের পথেই চিরদিন আমাকে চলতে হবে—পারস্পরিক আলাপ আলোচনা এ পথের সহায়।...ঠাকুর বলতেন, একেলা যাইব দূর না পাইব।...তোমরা নিজেরা বুদ্ধি চালিও না...এখানে থাকলে মানুষ করে দিতে পারব—এ দেশের মানুষ পা টিপতে পারে, সম্মান দিলে তার যোগ্য হতে চায় না।...নিত্যগোপাল যা এনেছেন তা তোমাদের ধন—তোমাদের ধন তোমরা রক্ষা করো—নূতন বিশ্বে নূতন পথ তোমরা রচনা করতে পার।...বিচ্ছেদ আমি বুঝি না, আমি মিলেমিশে থাকা বুঝি।...ফাঁকি দিয়ে আমি টাকা আনতে চাই না—একলা চলে যাব—গড়ি যদি কোনদিন আশ্রমের মত আশ্রম গড়ব—যেখানে এসে মানুষ শান্তি পাবে, যেখানে ডিপ্লোম্যাসি, ডুপ্লিসিটি চলবে না—শান্তি আনন্দ আদর্শ—পথের বিশুদ্ধিতা এখানে একান্ত প্রয়োজন।...রাজনীতিক্ষেত্রে এই নিয়েই মতভেদ হয়েছিল—একদল বলতেন end justifies the means —কিন্তু এ আমার পথ নয়। গান্ধীজীরও পথ নয়—আমাদের কথা means justifies the end—রাজনীতিক্ষেত্রে এ কথা গান্ধীজীই প্রয়োগ করবার প্রয়াস পেলেন—তাই না রাজনীতিতে যোগ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল? অথচ সেই তিনিই একদিন অপর পক্ষের সঙ্গে সন্ধি করলেন—সেইদিন তাঁকেই বলেছিলাম I will fight with Gandhi in order to maintain his Gandhism—জোটবাঁধা—মিথ্যা ভোট জোগাড় করে আমাকে হারান যেতে পারে... নীতির বালাই নেই যেখানে, সে জগত বয়ে গেছে।... ভারতবর্ষ আজ নিত্যগোপালের চরণতলে নূতন জগতের পথের খোঁজ পাবে—নিজের বা অন্যের পেয়াল চালিয়ে সঙ্ঘ গড়ে না ...জগন্নাথ নিত্যগোপাল.. ধরার ধূলি হোক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্মমানুষ।...

শনিবার সকাল।

[তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা—এই গানটীর লাইনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের কথা বলিয়া বলিয়া গাহিয়াছেন]...আমি যেমন করিয়া চলিলে তোমার আনন্দ হয় আমি তেমন করিয়াই চলিব—তোমাকে আনন্দ দেওয়াই আমার একমাত্র কাজ...তোমার ছন্দানুবর্তী হইয়া চলিব।...মাটির জগতে পথ দেখাইতে মাটির মানুষ ছাড়া হয় না—নিত্যগোপাল আমার মাটির ভগবান।... নিত্যগোপাল, তোমাকে দেখিয়াছি, তোমার কথা শুনিয়াছি, তোমার পাদপদ্ম আমার মাথায় বুকে স্থাপন করিয়াছি—আমার মহানির্বাণ নিত্যগোপাল, আমার অদ্বৈতবনসিদ্ধি নিত্যগোপাল—হৃদয়ের সাধনা তুমি দিয়া গিয়াছ—তোমাকে বিশ্বাস করিব, তোমার বিশ্বকে বিশ্বাস করিব।...তোমার চরণে রাখিও—তোমার সেবায় রত রাখিও। তোমার প্রতিষ্ঠান তুমি করিও—আমার সাত-

রাজার ধন এক মানিক, আমার নিতাগোপাল—বহু কষ্টে বহু সাধনায় তোমায় বুকে লইয়া চলিয়াছি, বেদনা-মথনধন আমার নিতাগোপাল, আমার দুঃখের ঠাকুর :—ধরার ধূলি হোক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্মমানুষ।...

শনিবার সন্ধ্যারতির পর।

ওঁ নমো...। আমি কদিন থেকেই একটা কথা বলবার চেষ্টা করছি যেটা নরনারায়ণ আশ্রমের নিজস্ব কথা; সেটা এই যে, আমরা কোন বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত নই। আমরা শঙ্করপন্থী নই, আমরা বৌদ্ধও নই, ন্যায়-বৈশেষিকও নই···আবার একান্ত কর্মীও নই, একান্ত জ্ঞানীও নই, একান্ত ভক্তও নই,...পাশ্চাত্ত্যও নই, প্রাচ্যও নই। শ্রীনিত্যগোপাল মধুমাখা হরিনাম আবার নূতন করে নিয়ে এসেছেন...কর্ম বলি, কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের কর্ম বলি না, ভক্তি বলি, কিন্তু কর্ম-জ্ঞাননিরপেক্ষ বা বহির্ভূত একান্ত ভক্তি বলি না, জ্ঞান বলি, কিন্তু যে জ্ঞান কর্ম ও ভক্তিকে নস্যাৎ করে দিয়ে একান্ত, সে জ্ঞান বলি না...কোনটাই কোনটা থেকে বড় নয়···। মানুষের এক একটা বিশেষত্ব থাকে সেটা তার স্বধর্ম, কিন্তু অপরটার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা চলবে না... স্বধর্ম থেকেই ভগবানের সেবায় রওয়ানা হতে হবে। চাষা বৃন্দাবনে ছোট নয়...বি-এ, এম, এ-র বিরুদ্ধে বলি না, কিন্তু বি-এ এম-এ পাশ না করলেই যে ভগবৎলাভ হবে না, তা নয়। বয়স চলে গেলে cat pat পড়তে সংসার দিবে না...চাষাকে তুমি শিখিয়ে নাও, আপত্তি নেই—কিন্তু চাষ যদি কেউ না করে তাহলে সংসার চলবে? গোবিন্দ কোন কর্মকে ছোট বলেন নি।... যুধিষ্ঠির নারদকে জিজ্ঞাসা করছেন শিশুপাল কৃষ্ণনিন্দা করেছে, তার জিহ্বায় তো সিত্রযোগ হওয়া উচিত, কিন্তু সে মুক্ত গেল কেন? নারদ বললেন,...কেনোপ্যোপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়—যে কোন উপায়ে মন কৃষ্ণে নিবেশিত কর...ভগবান বিদ্যায় লাভ হয় না—পাণ্ডিত্যদ্বারা ভগবান লাভ হয় না।...শিক্ষা ভাল, জ্ঞান ভাল—কিন্তু বি-এ এম-এ পাশ হতেই হবে—তার অর্থ কম। পুঁথি পড়েও এতটুকু অনুভূতি নেই—এও তো হয়—তাতেই ভগবান লাভ আটকায়।.. আমি তো বি-এ এম, এ পাশ করি নি, অথচ বড় বড় পণ্ডিতের মধ্যে বসে এসেছি...নরনারায়ণ আশ্রমের প্রত্যেক কর্ম ব্রহ্মকর্ম—নিত্যগোপাল ভরকারী কুটতেন...জন্ম থেকে মরণ পর্যন্ত সমস্ত কর্মই ভগবৎ সেবা-কর্ম...। ইংরাজী God উচ্চারণ তাহার প্রতিটী অক্ষর উচ্চারণ করলেই হয় না—জি-এর একরকম উচ্চারণ, ও-এর আর একরকম, ডি-এর আর একরকম—সব মিলে একটা তৃতীয় উচ্চারণ।...কিন্তু সংস্কৃতে তা নয়, সেখানে ব্যাকরণ শব্দ উচ্চারণ করতে এর প্রত্যেকটী অক্ষর উচ্চারণ করে গেলেই শব্দটী উচ্চারিত হবে—এখানে অক্ষরের উচ্চারণের মধ্য দিয়েই শব্দের উচ্চারণ—সারাদিনের কাজের ছন্দ দিয়েই ভগবান লাভ—সারাদিন কাজ করবে এক রকমে সেটা ভগবৎ ছন্দ নয়—আর রাত ৯টায় চলবে ভগবান লাভের নামজপ—এটা আজকের দিনের কথা নয়।...আজকালকার দিনে শিখতে কিছু সবাইকেই হবে...বর্তমান যুগধর্ম সামঞ্জস্যের পথে...কিন্তু লেখাপড়া কারো যদি না হয়েই থাকে, তাই নিয়ে মনমরা হবার দরকার নেই।...

ক্রমশঃ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫০—

(৭)

সকালে পত্রিকার প্রকাশের উপযোগী করিবার জন্য গীতাভাষ্য দেখিতেছি, এমন সময় ৮।০ টায় হেমন্তবাবু… উপস্থিত হন।…মালতী আসে। তাহার সঙ্গে অনেক কথা হয়। গীতাজয়ন্তীর কিছুটা সে পড়ে, আমি ব্যাখ্যা করিয়া দেই। মেট্রোপলিটান কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন এন, এন, ঘোষ। তিনি এথিক্স্ পড়াইতেন। একদিন তিনি বলিলেন, দেখ, তোমার হাতে একটী ও আমার হাতে একটী রসগোল্লা। তুমি তোমারটী এবং আমি আমারটী খাইলাম। আবার তুমি তোমারটী আমাকে খাওয়াইলে আমি আমারটী তোমাকে খাওয়াইলাম। দুইবারই আমরা এক একটী রসগোল্লা খাইলাম। দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? নিজেরটী নিজে খাইলে খাওয়া বন্ধই হইয়া যায়। কিন্তু বদলাবদলী করিয়া খাইলে খাওয়া ও না-খাওয়ার সমন্বয় হয় বলিয়া খাওয়া চির অব্যাহত থাকে। ইহাই কর্ম নৈষ্কর্ম্মের সমন্বয়। এমনি করিয়াই ভগবান নেন ভক্তের নাম, ভক্ত নেন ভগবানের নাম। ভক্ত করেন ভগবানের কর্ম, ভগবান করেন ভক্তের কর্ম। ভক্ত-ভগবান দুই-ই নিজকে ভিন্নাইয়া পরস্পরকে পান। ভক্ত নিজকে ভিন্নাইয়া ভগবানের মধ্যে নিজকে পান, ভগবানও নিজকে ভিন্নাইয়া ভক্তের মধ্যে নিজেকে পান। ইহাই মালা-বদল। ভগবানের দেহ ভক্তের, ভক্তের দেহ ভগবানের। গুরুর দেহ শিষ্যের, শিষ্যের দেহ গুরুর। ৪।০টার পর আমরা বাহির হইয়া পড়ি। ৪।০টায় হেমন্তবাবুরা চলিয়া যায়।…সন্ধ্যার পর রামগোপাল আসে।…

২৫শে এপ্রিল

সকালে জ্যৈষ্ঠমাসের 'পুস্তক-পরিচয়' জগদীশচন্দ্রের গীতা লিখিতে সুরু করি। রেণু ১।০টার পর বাথগেট গিয়া মাঘ মাসের ৩০৲ টাকার চেক নিয়া আসে। প্রতিভা ব্যাঙ্কে খাতা জমা দিয়া অফিস হইতে র‍্যাপার নিয়া আসে। আমরা দুইজনে মিলাই।…প্রণতি আমার সামনে গীতা জয়ন্তী শেষ করে। প্রাণ সারাজীবন খুঁজিলাম। প্রাণ পাইলে প্রাণবল্লভকে ধরার মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতাম। কেন তিনি আমার জীবনের মধ্যে প্রকট হইয়া এমন ধনহীন জনহীন অবস্থায় ফেলিলেন! রামগোপাল আসে। প্রতিভার সঙ্গে র‍্যাপার কিছুটা মিলায়। প্রায় ১০টায় আশ্রমে ফিরি।…

২৪শে এপ্রিল

সকালে একবার অফিসে যাই পত্রিকা আসিল কিনা জানিবার জন্য। তখনও আসে নাই।…কিছু পরেই শিশির আসে তাহার গ্রাম হইতে সোজা। গ্রামে উদ্বাস্তুরা জায়গা দখল করিতেছে এরকম জোর করিয়াই। কেননা সেখানের স্থানীয় লোক যে-সব মুসলমান উদ্বাস্তুদের জন্য কিছু জমি ছাড়িয়া দিবে বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়া ভঙ্গ করিয়াছে তাহারা এখন উদ্বাস্তুদের জায়গা দিতে চাহিতেছে না। শিশিরের পক্ষে এ দাঙ্গার পথে যাওয়া উচিত নয়, কেননা ইহার মধ্য দিয়া হিন্দু-মুসলমান সঙ্ঘর্ষেরই সৃষ্টি হইতে পারে। মীমাংসাদ্বারাই যাহা-কিছু করিতে হইবে। শিশির 'কেন' উপনিষদের ভূমিকা কিছুটা অংশ পড়িয়া বুঝিয়া নেয়। ২টার পূর্বে আমি নিত্যব্রতের ছাতা লইয়া অফিসে যাই। ১টার সময় রিকশায় পত্রিকা দিয়া গিয়াছে।…মালতীকে 'ন

কামমেহহম্' ও 'হস্তাবৃৎক্ষিপা' শ্লোকদ্বয় লিখিয়া দেই। প্রণতির সঙ্গে তাহার মান অভিমানের পালা শেষ করিয়া অগ্রগমনের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হইতে বলা হয়। যাহার জীবনে এত বড় দায়িত্ব রহিয়াছে, সে কি ছোটখাট ব্যাপার নিয়া মেজাজ খারাপ করিতে পারে?...

২৫শে এপ্রিল

সকালে আফিসে যাই। কুমার আসে ৮টার মধ্যে। সে-ও ব্যাপার লাগায়।...সুধাংশু আসে। সে ব্যাপার লাগায়।... আমি প্রায় ৬টায় আফিসে যাই। ইতিমধ্যে কুমার ও ধীরেনবাবু আফিসে আসিয়াছেন।...মহাশয়া ও প্রণতির সঙ্গে রেণু ও আমি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কথা বলি। জীবনে অগ্রগামীর পক্ষে ছোট ছোট ব্যাপার লইয়া মান-অভিমানের কোন স্থান নাই। আগাইতে হইলে সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া। প্রত্যেক দিন কর্মে, জ্ঞানে, প্রেমে কতটা আগাইয়াছি, ক'টা শ্লোক মুখস্থ করিয়াছি, হিসাব খতাইয়া দেখিতে হইবে।...

২৬শে এপ্রিল

৯টায় কুমার আসে। 'কেন' উপনিষদের ভূমিকাটি পড়ে, আমি ব্যাখ্যা করি।...প্রতিভা অফিস হইতা ঘুরিয়া প্রায় ২।০টায় আসে। রেণু কীমারে হিদীপ গুপ্তের সঙ্গে দেখা করিয়া ৩টার পর ফেরে।...আফিসে যাই। গিয়াই দেখি জানকী গোস্বামী (ভ'মাপদ ইন্‌স্টিটিউশনের হেডমাস্টার) আসিয়াছেন তাঁহারই স্কুলের ছাত্র তাঁহার পুত্রের একটি প্রবন্ধ (মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধীয়) দিতে। তিনি তাহার পুত্রের নামে উজ্জল-ভারত নিলেন। 'কেন' উপনিষদও ১খানি নিলেন। তিনি ১৯২০-তে কুমিল্লায় আমার বক্তৃতা শুনিয়াছেন। আমার চোখের জল আজিও তাঁহাকে প্রেরণা দেয়। আমি বেদান্তকে কেমন করিয়া জীবনের ছোট ছোট ঘটনায় ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম, তাহাই তিনি বলিলেন। কুমার বিলগুলি ঠিক করে।...কুমার এখানে খায় ও রাত্রিতে আমার ঘরেই শুইয়া থাকে। তাহার সঙ্গে কিছুটা কথা হয়। পুরুষোত্তম নামের জাগ্রত রূপ নিজ জীবনে আস্বাদন করিয়া বিশ্ব সত্যতায় তাহার প্রতিষ্ঠার পথ নির্দেশ করিয়াছেন তিনি জাতি-কুল-শীলছাড়া। জাতির গণ্ডী, কুলের গণ্ডী, শীলের গণ্ডী চূর্ণ করিয়া বিপ্রবন্ধনরূপে বাহির হইয়াছিলেন। আমি সকলের সৎ-টুকুই চাই, সৎ-টুকুকে গড়িয়া তুলিবার জন্য, বিশ্বজনীন-রূপে দিব্যরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য। কুমার বুধবার লেকের বৃন্দমন্দিরে আমার বক্তৃতা শুনিয়া শুক্রবার যাইবে কথা হইল। সেখানেও আসিবে ৪ কপি বৈশাখ সংখ্যা উজ্জলভারত নেয়। রাত ১০টার পর হাওড়ার অজিত মল্লিকের পুত্র আসে।...

কুমার সকালে জল খাইয়া বাসায় যায়, আমিও আফিসে যাই। তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয় জীবনে 'যোগ্য' না হইয়া কিছু চাই নাই। বর্ত্তমান যুগ যোগ্যতার উপর দাঁড়াইতে চায়। সার্থক স্বামী হইবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছি, একতিলও ফোপ করি নাই। স্ত্রীর মর্য্যাদা দিয়াছি। তাঁহার অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশের খোরাক দিবার জন্য সারাজীবন প্রয়াস পাইয়াছি, তাঁহার বিশ্বরূপের দিক-টীকে বিকশিত করিবার জন্য তাঁহাকে নিয়া পথে বাহির হইয়া কংগ্রেসের সেবায় নামিয়াছিলাম, ১৯২০ সনের লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া-ছিলাম। স্বামীত্বের দাবীতে স্বামী হইতে কখনও চাই নাই। সকলের জন্যই হৃদয় খুলিয়া রাখিয়াছি, অপেক্ষা করিয়াছি, বিশ্বাস করিয়াছি, আমার সব কিছুকে তাহাদের দিবার জন্য উন্মুখ রহিয়াছি। জীবনে একটা তৃপ্তি আমার আছে, আমি কাহাকেও exploit করি নাই, একটী কাণাকড়িও নেই নাই সেখানে একটী মোহর রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা না করিয়া। আমার যাহারা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিয়াছি, কর্ম্মে থাকিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহাদের নাম জপ করিয়াছি, তাহাদের বিপদ সামলাইতে চাহিয়াছি। আমিই আগাইয়া গিয়াছি

তাহাদিগকে ধরিয়া বুকে তুলিয়া লইবার জন্য। ইহাই আমার জীবনব্রত। প্রতিদিন প্রায় তিনটায় পোস্টাফিস হইতে আসে।

...কিতীশ আমার এখানে বসে। সন্ধ্যার কিছু আগে আফিসে আসি। মালতী ও প্রণতি আসে নাই। মালতীর অসুখের অবস্থা জানিতে পারিলাম না। সামরিকী (ভারত-পাকিস্থান চুক্তি) পড়িয়া সুধীর দাসগুপ্তের উচ্ছ্বাসময় চিঠি পাইয়াছি। অজিত মল্লিকও 'উপাসনা'র সমালোচনা পড়িয়া তৃপ্ত হইয়া এক চিঠি দিয়াছে। গোকুল আসে। প্রায় ২ ঘণ্টা থাকে। ৯টার পর চলিয়া আসি। কুমার তাহার পুত্র-কন্যাসহ আফিসে গিয়া বেণুর সঙ্গে দেখা করিয়া মঠে গিয়াছে। সে রাত্রিতে এখানে শুইবে কথা ছিল, আসে নাই। সকালে আফিস হইতে ফিরিবার পথে শিশিরের সঙ্গে দেখা। সে আমার কাছেই আসিয়াছিল। সরোজ মাইতীর বেনোপনিষদের ১৲ টাকা দেয়। তাহার রাহুতার খবর শুনি। তাহাকে দিয়া সামরিকীটা পড়াই। ২ ঘণ্টারও বেশী সময় থাকে।

২৮শে এপ্রিল

সকালে পুস্তক-পরিচয় (ভগবদ্গীতা) শেষ করি। বেণু আমার খাওয়ার মধ্যে আসে ও কাপড় দেখে।... যাহারা আমাকে ঘিরিয়া আছে ও থাকিবে, তাহারা এক-দেহ, এক-প্রাণ, এক-মন হইয়া থাকিবে, ইহাই তো আমি দেখিয়া নয়ন জুড়াইতে চাই। ছোট হইলেও একটী পাকা সঙ্ঘ গড়িতে চাই। বৃন্দাবনে যেন প্রত্যেকে প্রত্যেকের গা ঘেঁষিয়া থাকিত, তবে না সেখানে পুরুষোত্তম বিহার করিতেন? অদ্বৈত ক্ষেত্রছাড়া পুরুষোত্তম বিহার করেন না। প্রতিভা আসে ২টার পর।...সত্যিই, রোগে যেন আমার গায়ে কাঁটা দেয়। নিতান্ত ঠেকা না হইলে, কিছুই ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে না। না খাইলে নয়, তাই খাই, কাপড় একখানা না পরিলে নয়, তাই পরি। কি প্রয়োজন বেশীর?...শ্লোকগুলি লিখিবার জন্য একটী খাতা কিনিয়া আনিয়াছে। শ্লোক উহারা নিজেরাই লিখিবে অর্থ বুঝিয়া বুঝিয়া। তাহাতে ব্যাকরণ শিক্ষাও হইবে। অন্ততঃ বি, এ, পর্যন্ত পাশ তো করা চাই। নহিলে কাজ ঠিকমত করিতে পারিবে না। উহাদিগকে ঠাকুরের সেবায় লাগাইবার জন্য যথেষ্ট খাটিতে হইবে।... -কে সামরিকীটা পড়িতে বলি, সে পড়ে। শেষ না হইতেই সময় হইয়া যায়। প্রত্যহই কিছু না কিছু এখান হইতে সংগ্রহ করিয়া নিতেই হইবে—ইহা আমি বলিয়া দিয়াছি।...

২৯শে এপ্রিল

এই বিশ্বের মাঝখানে যে তাহাদিগকে দাঁড়াইতে হইবে, ইহাই জোর দিয়া বলা হয়।... অন্তত বি, এ পাশটা না হইলে বাহিরের দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয়লাভ সম্ভবপর হয় না। বাহিরে ছড়াইয়া পড়িতে হইলে যেমন যেমন করিয়া চলা প্রয়োজন, এখন হইতেই তাহা সুরু করিতে হইবে। আর দেরী করিলে চলিবে না, অনেক সময় কাটিয়া গিয়াছে। প্রতিটী মুহূর্ত্ত সার্থক করিতে হইবে। পুরুষোত্তম ও তাঁহার দর্শন ও জীবনই হইবে ধ্যান-জ্ঞান। আর কিছু নয়।...

৩০শে এপ্রিল

পুস্তক পরিচয়টা শেষ করিবার পরই ৭।০টায় কুমার ...আসে। সে ১১টার পর বাসায় যায়। তাঁহার সঙ্গে অনেক কথা হয় জীবনপথে আমার চলিবার ছন্দ বিষয়ে। সকলের সব অন্তরের ও বাহিরের শক্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিকশিত করিয়া, self-life ও cosmic life-এর সামঞ্জস্য করিয়া বুকে লইয়া আগাইয়া যাইতে প্রাণপণ করিয়াছি—ইহাই আমার সারাজীবনের ইতিহাস। উদ্বোধনীর cosmic life-এর আস্বাদন দিবার জন্য রাজনীতিতে নামাইয়া ছিলাম, সবল আইন অমান্যের সঙ্গে নিয়েছিলাম, শত শত ছেলের মা হওয়ার সুযোগ করিয়া দিয়াছিলাম। যাহার যাহা-কিছু পাইয়াছি, সব যোগ্য করিবার ব্রত ছিল আমার। আমি লোভী নই, শোষক নই। নল-দময়ন্তী, শৈব্যা-হরিশ্চন্দ্র, সীতা-রাম

যেমন সারা ভারত ভ্রমণ করিয়া প্রথমে হারাইয়া পরে পাইয়া সার্থক হইয়াছিলেন, প্রত্যেক মানুষকেই তেমন সমগ্র জগতের বুকে দাঁড়াইয়া পরস্পরকে পাইতে হইবে। আমি 'সংসার' সত্য বলি, কিন্তু উহা বিশ্বরূপ মানবের সংসার। বিশ্বকে মাঝখানে না রাখিয়া কেহ কাহাকে পাইবে না। একান্ত ছাড়িলেও ছাড়া হইবে না, একান্ত রাখিলেও রাখা হইবে না। রাখা-ছাড়ার সমন্বয় সম্ভব হয় বিশ্বের বুকে, বিশ্বেশ্বরের হৃদয়ে স্থান নিলেই। বেণুর ওখানে আজ ত্রিপুরাবাবু, শেখর দাস আসে। মাখনবাবু কাগজপত্রদেখিয়া দিয়া যায়। ১২টার পর বেণু আসে। তাহাকে বলা হয়—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই তিনের সমন্বয়েই বুদ্ধ-তর্পণ সম্ভব। বুদ্ধকে ধরিলে ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ ছাড়ায় না, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘকে না ধরিলেও বুদ্ধ ছাড়েন না। যতই সঙ্ঘকে আপন করা যাইবে, বুদ্ধের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ ততই জমিয়া উঠিবে। যতই বিস্তার আসিবে, ভগবান ততই গভীর হইবেন। মনের কাছেই গভীর বিস্তীর্ণের স্বপ্ন। সঙ্ঘ বুদ্ধের শরীর। সঙ্ঘ-শরীরে আমাকে না পাইলে আমাকে বা আমার ধর্ম্মকে পাওয়া হইবে ভাবুকতা। আমি, আমার ধর্ম্ম ও আমার সঙ্ঘ একই পর সত্যের তিনটী আস্বাদন। সঙ্ঘের প্রতিটী ব্যক্তি হইবেন সমসুখদুঃখ, সমপ্রাণ, সমমর্য্যাদা। তবেই আমার বুক জুড়াইবে। সেই সমপ্রাণতার বুকেই আমার প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা আমার আপনজনেরা যেন সারা জীবন ধ্যান করেন, জীবনে পরিপাক ও আস্বাদন করেন।...

১৯ মে

'পুস্তক-পরিচয়টার মধ্যে একটা ভুল ছিল, সেটা হঠাৎ ধরা পড়ে। লেখা ছিল 'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ যদি অজ্ঞান-কৃত, হইবে 'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ যদি অজ্ঞানকৃত'। দশগ্রামের প্রবন্ধটী পড়ি।...

২১ মে

সকালে 'দশগ্রাম সতীশচন্দ্র নিকাশদন' শীর্ষক প্রবন্ধে আমার সম্মতিটুকু লিখিয়া ফেলি। ইতিমধ্যে কুমার আসিয়া পড়ে। সে প্রায় ২ ঘণ্টা থাকে। তাহার কাছে ব্রজগোপীদের দুইটী স্তরের কথা বলি—একদল বাহির হইতে সমাজকে ধাক্কা দিবে, অপর দল প্রতি বর্ষে ভিতর হইতে বিপ্লবের পথে সমাজকে চালিত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। প্রথম দল আচারমূলক, দ্বিতীয় দল প্রভাব প্রধান জীবন যাপন করিবেন। জীবন দুইয়েরই উপাস্য। তাহার স্ত্রী কাল কালীপূজা দিতে আসিয়া ছিল, এই উপলক্ষেই কথা উঠে। কালী যতদিন জীবনের বাহিরে, লক্ষ্মী যতদিন জীবনের বাহিরে, ততদিন কালী-লক্ষ্মী মানুষকে পরাস্তই করিবেন। চাই জীবনে কালী-লক্ষ্মী হইয়া কালী-লক্ষ্মী পূজা করা। এই কথাই ভিতর বাহির হইতে আস্বাদন করিতে হইবে।...আমি কুমার, উষারিণী, বৌ-ঠাকুরুণ, প্রতিভা, রেণু, প্রণতি স্টেট বাসে গরিয়াহাটা ছাড়াইয়া যাই। ৮টার পূর্ব্বেই বুদ্ধমন্দিরে উঠি। সেখানে ৯॥০টায় সভা আরম্ভ হয়। সভাপতি মহেন্দ্র সরকার।...আমি বলিয়াছিলাম, আড়াই হাজার বৎসরেও যাহাকে নিতে পারা যায় নাই, তাঁহাকে আজও নেওয়া সম্ভবপর হইবে না, যদি না ভারতীয় বৈদিক সমাজকে ঢালিয়া সাজা হয়, যদি না প্রচলিত বর্ণাশ্রমকে কৃষ্ণের বর্ণাশ্রমে গড়িয়া তোলা যায়। বুদ্ধের গতিধর্ম্মকে নিতে হইলে ভারতের প্রস্থান-ত্রয়কে নূতন ছাঁচে ঢালিতে হইবে। সভাপতি বলেন—বুদ্ধ ও শঙ্কর এক নির্ব্বাণতত্ত্বই দিয়াছেন। যদি এক কথাই তাঁহারা বলিয়াছেন, তবে ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধমূলের অর্থ কি? প্রচলিত বর্ণাশ্রম মানেন না বলিয়াই বুদ্ধ অপাংক্তেয় হইয়াছিলেন। কেহই ভিতর তলাইয়া দেখিতে চান না ...মালতী প্রণতিকে কি করিয়া পুরুষোত্তমের সেবা লাগান যায়, তাহা নিয়া মনটা চিন্তাকুল।...

...ঠাকুরের 'আমি অদ্বৈতবাদীও বটি, দ্বৈতবাদীও বটি' বাক্যের-ব্যাখ্যা করা হয়। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, আত্ম ও প্রকৃতি দুই থাকিয়াও এক, আবার এক হইয়াও দুই—ইহা ভারতীয় সভ্যতার আমূল বিপ্লব ছাড়া আর কিছু

নয়। যেখানে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ অন্ধ পশুর সংযোগের মত নিতান্তই অভিসন্ধিপূর্ণ, সেখানে পুরুষোত্তম-জীবন ও দর্শন স্থাপন করিয়াছে প্রাণখোলা বিনিময়ের ভিত্তিতে এক নিরবচ্ছ প্রাণ-সংযোগ, প্রেম-সংযোগ। কি গুরুতর ব্যাপারের মধ্যেই না ঠাকুর টানিয়া আনিয়াছেন। এইখানেই ঠাকুর বিশ্বেশ্বর হইয়াছেন। কুমার আসে। তাহার সঙ্গেও এই আলোচনা হয়। বেণু ডানলপ ব্যাণ্ড হইয়া এখানে আসে ১টার পর। প্রতিভা আসে ৩টার পর।...পুরুষোত্তম-দর্শনে দুঃখ ও বাসনাক্ষয়ের অর্থ অন্তরূপ। দুঃখকে স্বীকার করিয়া, বরণ করিয়া যে দুঃখ ক্ষয়, তাহাই পুরুষোত্তমের দুঃখ ক্ষয়। প্রকৃতি-পুরুষের আত্মীয়তায় 'রস'কে সুকৌশলে আস্বাদন করা—প্রত্যেক অংশের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বয়ং মূলাধারে অংশমাত্রের সমন্বয় রস আস্বাদন করাই সত্য বাস্তব বাসনাক্ষয়। বুদ্ধের বাসনাক্ষয় analytical, negative; পুরুষোত্তমের বাসনাক্ষয় synthetical, positive। কামের মুক্তিই মানুষের চরম মুক্তি।

৪ঠা মে

সকালে সাময়িকী—'কোটিপতিদের শপথ গ্রহণ' লিখি। পরে একবার আফিসে যাই। কিছু পরে আমি ও বেণু বাহির হই।...আমার জীবনে বহিঃপ্রকৃতির তেমন কোন appeal নাই। কিন্তু মানুষের সাথী প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করিয়া, বিশ্লিষ্ট সেই সবটুকুর মধ্যে অবগাহন করিবার জন্য, নিশ্চিহ্ন হইয়া মিশিবার জন্য কি হাপাহাপিই না করিলাম। আমি কাহাকেও জীবনে ভালোবাসা ভাবে ভালবাসি নাই, গা বাঁচাইয়া ভালবাসি নাই। 'হিয়া ধরধরি পরাণ পোড়নি' প্রেম আমার ছিল। উপাধিগুলির অন্তরতম সত্তার সঙ্গে মিলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, কামের মধ্যে মদনমোহনকে খুঁজিয়াছি, খোঁজ পাইয়াছিও। তাহাকে কোলে বুকে লইয়া বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছিলাম। নল-দময়ন্তী, শৈব্যা-হরিশ্চন্দ্র, চিন্তা-শ্রীবৎস, সীতারাম—ইহারা তো বিশ্বচক্রের মধ্য দিয়া হারাইয়া আবার পাইয়াছেন। ইহাই তো পাওয়ার সনাতন পথ। আমিও এই পথের পথিক। কামের বন্ধনত্বকে জীবনের মাঝে গলাইয়া মুক্তির রূপে আস্বাদন করিবার জন্যই বিশ্বরূপ হইতে চাহিয়াছি। যিনি বিশ্বরূপ, তিনিই মদনমোহন। মদনমোহনের দেশে ভোক্তা স্বাধীন, কেবল; ভোগ্য স্বাধীন কেবল। ভোক্তা-ভোগ্যের সংযোগও স্বাধীন কেবল। এই কৈবল্যই আমার জীবনের সাধ্য। যে কাম ভয়ে বিশ্ব ভীত, মদন-মোহন নিত্যগোপালের কৃপায় সেখানে মুক্তির আস্বাদন পাইয়াছি। এই কৌশলই বিশ্ব মদনমোহন কৃষ্ণজীবনে শিখিবে। তাই তিনি বিশ্বের জগন্নাথ। কৃষ্ণলীলার মধ্যেই বিশ্ব তাহার আত্ম-সাক্ষাৎকার, আত্মক্রীড়ার খোঁজ পাইতে পারে।...মালতীকে ভিকটেশন দেই। সে বিষ্টা লিখিয়া আনিয়াছিল। বেণু তাহা শুদ্ধ করিয়া দেয়।...

৫ই মে

মেদিনীপুর হইতে মৃত্যুঞ্জয় জানার লোক আসিয়া সেখানে নিয়া যাইবার কথা ছিল, কিন্তু কেহ আসে নাই বা খবরও দেয় নাই। সকালে সাময়িকী—বৈশাখী পূর্ণিমা লিখি। মহাভারত হইতে শ্রীবৎসচিন্তার উপাখ্যান পড়ি। বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রতি অণু, প্রতি ঘটনার মধ্যে 'ছিদ্র' রহিয়াছে, কিন্তু একান্ত ব্যক্তি-সাধক বা একান্ত সমষ্টিসাধক তাহা না দেখিয়া তাহাকে নিশ্ছিদ্র ও নিরেট করিয়া ফেলে; তখন বিশ্ব যান্ত্রিক হইয়া পড়ে। কিন্তু জীবন্ত বিশ্ব তখন প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার জীবন-ধর্ম্মকে প্রচার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে এবং যে-কোন ছুঁতা অবলম্বন করিয়া তাহা কার্য্যকর হইয়া উঠে। ইহাই প্রচলিত শাস্ত্রে 'শনির কোপ' বলিয়া কথিত হয়। 'The Law of Indeterminism-ই শনির কোপ। সকলের সব নিশ্চিন্তি ভাবকে সে ভাঙিয়া চুড়িয়া কোথায় যে কাহাকে ছুটাইয়া নিবে, ইহাই ঘুটিয়া উঠিয়াছে সীতা-রাম প্রভৃতির জীবনে। কি ঝড় ইহাদের জীবনে। ঝড়ও যে বিশ্বের একটী factor, মানুষ যে স্বরূপতঃ বিশ্বরূপও, ইহাই শনির কোপের মূল রহস্য। শনি বিশ্বের dynamic force, সকল যান্ত্রিক স্থিতিকে জীবনগত

ব্রাহ্মীস্থিতিতে গড়িয়া তুলিবার উপযোগিনী মহাশক্তি, বিশ্বশক্তি। যাহাদের সাধনার প্রথম হইতেই ব্যক্তি-জীবন ও সমষ্টি-জীবন সমন্বিত হয়, তাহাদের আর শনির কোপে পড়িতে হয় না; শনিকে তো তাহারা জীবনের মধ্যে পরিপাক করিয়াই নিয়াছেন, শনি তাহাদের জীবনে লীলাসহচর। তাই রামসীতা প্রভৃতি মহামানব-মহা-মানবীর গৌরব লাভ করিয়াছেন। ১১টার পরই বেণু আসে, তখনও আমার স্নান-আহার হয় নাই। প্রতিভা আসে ২টার পর, সেই আমের আচার লইয়া। বীরেন ব্যানার্জী আসেন ৩টার পর। তাহার সঙ্গে গীতার অদ্বৈতবাদ ও প্রত্যেকবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে 'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরম্' শ্লোকটীর আলোচনা হয়। 'মাত্রা-স্পর্শাঃ' অর্থ 'ভূতমাত্রার সঙ্গে প্রজ্ঞামাত্রার স্পর্শ' করিলে ভাল হয় না? 'তান্ তিতিক্ষস্ব'-এর অর্থ 'প্রাণে'র ভিতর দিয়া সহ্য করা। আজ গভর্ণমেণ্টের ৪০টী উচ্চপদস্থ অফিসার আসে। মালতী-প্রণতি কেহ আসে না। সন্ধ্যার পর সুবোধ দে ও তাহার বন্ধু ডাক্তার আসে। তাহারা ২ খানা কেনোপনিষদ্ নেয়। টালিগঞ্জ বস্তি হইতে কেশব চক্রবর্ত্তী ও অপর একটি ছেলে (সুবোধ) আসে সেখানের রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে আগামী সোমবার যোগ দিবার জন্য। যাইব বলিয়া যেই। কালীদাসবাবু আসেন।

৬ই মে

প্রার্থনার পর মন্থর বাসায় যাই।...ব্রহ্মসূত্র ছাপাইবার কথা হয়। ছাপাইতে ৩ বৎসর লাগিবে ও আন্দাজ মোট ৩ হাজার টাকা। বৎসরে এক হাজার টাকা দিতে পারিবে বলিয়া বলিল এবং কাজ আরম্ভ করিতেও বলিল।...আশ্রমে আসিয়া 'পঙ্কভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে ফাঁদে' (২) লিখিতে আরম্ভ করি। খুব অল্পই লিখি।... এখন সেবাসদনের কাজ ছাড়া তাহার ইচ্ছা নয়। যাহা একবার আরম্ভ করা গিয়াছে, তাহার একটা পরিসমাপ্তি ভাল। 'সর্ব্বগুহ্যতমম্ ভূয়ঃ' ইত্যাদি ৩টী শ্লোক লিখিয়া নেয়। তাহাদের জন্য ঠাকুরের ২ খানি দাঁড়ানো ফটো বাঁধিতে দেওয়া হইয়াছে দুইদিন আগে। ১১টার পর কেশব গাঙ্গুলী আসিয়াছিল। সে তাহার ও বীরেনবাবুর টাকা দিয়া যায়। তাহার সঙ্গে বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমার কতকগুলি কথা বলি। আমি জানি বর্ত্তমান পরিস্থিতি পুরুষোত্তম-দর্শন-প্রতিষ্ঠার পক্ষে কতটা বাধা দিবে। কিন্তু ছোট একটী দল যদি nucleus হিসাবে এক-দেহ এক-মন হইয়া গড়িয়া উঠিত, আমি নিশ্চিন্ত থাকিতাম, ইহাই একদিন সমাজ-শরীরকে প্রভাবান্বিত করিতে পারিবে। বেণু-প্রতিভাকে ইহা আমি বারবার বলিতেছি। ইহা না করিলে আমরা ব্যর্থ হইব। তবে ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে ইহা সার্থক হইবেই। ইহা তিনি চান। কোটি কোটি লোকের মধ্যে আমাকে কেন তিনি এ কাজের জন্য চাহিয়া লইলেন, ভাবিয়া পাই না। তবুও চলিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ মানুষের সবখানির কথা শুনাইয়া গিয়াছেন বলিয়া মানুষ তাঁহাকে এত আপন মনে করে। তাঁহার সহস্র জীবনের সঙ্গে যুক্ত যাহারা, তাহারাই 'যুক্ততম'। তাঁহার জীবন ও বাণী সর্ব্বযুক্ত-তম। আজ 'যুক্ততম' শব্দটী খুব ভাল লাগিতেছিল। আমি 'যুক্ততম' হইবই।

৭ই মে

সকালে ৮টার মধ্যে নলিনীর পুত্র গোপাল আই-এ-এর ইংরেজী ও বাঙ্গলার বইগুলি সহ আসে। সে ও আমি বইগুলি সহ বেণুর ওখানে যাই। শরীর আমার ভাল ছিল না। ১ ঘণ্টা পর রিক্সায় আসি। বেণু বোম্বে মিউচুয়াল ও ফুলিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক (দক্ষিণ কলিকাতা) হইয়া আসে। প্রতিভা পোষ্টাফিস হইয়া আসে ফুলগুলির পত্রিকা পাঠাইয়া। ৩টার আগেই প্রণতি আসে। তাহাকে 'অহো বকীয়ং' ও 'কাহম্ দরিদ্র পাপীয়ান্' ইত্যাদি শ্লোক লিখাইয়া দেওয়া হয়।... আজ টালীগঞ্জ বস্তিতে ৫০টার সভা হইবে। ৪টার সময় লোক আসে। আমি ও উষাদিদি রিক্সায় যাই, ভাড়া উহারা দেয়। মালতী ও প্রতিভা হাঁটিয়া যায়। ৬০টার পর সভা আরম্ভ হয়। অনেক অল্প ছেলেমেয়ে

সেখানে আসিয়াছিল। তাহারা আরম্ভ-সঙ্গীত গাহিল। আমি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলিলাম। ছোটরও একটী ইতিহাস হইতে পারে, ছোটও যে বিশ্বের ইতিহাস রচনা করিতে পারে, এবং ছাড়িয়াই যে রাখিতে হয়—ইহা বলা হয়। ৭॥০টার মধ্যেই আমি রিক্‌সায় আজিমে যাই।...হেরম্ববাবু আসিয়া কেনোপনিষদের জন্য ২০৲ টাকা রেণুর কাছে দিয়া যায়। রেণু সভায় যায় না। উমাদিদীর সঙ্গে রিক্‌সায় আসিতে আসিতে বলি—আমি তোমাকে লইয়াই সন্ন্যাসী হইয়াছিলাম। কামড়ে মানুষ স্ত্রী পরিত্যাগ করে, আমি করি নাই। কামের ভিতর কোন্ কৌশলে মদনমোহনের খোঁজ পাওয়া যায়, আমি সে কৌশলের খোঁজ পাইয়াছি। কামের ধর্ম কামাংশের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া ভোগ করা। আমি তো কোনদিন তোমার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করি নাই। মনে পড়িতেছে একদিনের ঘটনা। ২৪.২৫ সাহানগর রোডের নরনারায়ণ আশ্রম। পরমহংসদেবের স্ত্রী মা'ঠাকুরের একটী সৈরিন্ধ্রবেশধারী শিষ্য আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বলিলেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, আপনি কিছু মনে করবেন না তো? আমি বলিলাম, খোলা প্রাণে প্রশ্ন করুন, উত্তর দিব। কি প্রশ্ন করিবেন, আমি অনুমান করিয়াছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঐ যে স্ত্রীলোকটী দেখিতেছি, উনি আপনার কে হন'? 'উনি আমার স্ত্রী।' 'আপনি সন্ন্যাসী হইয়া স্ত্রী নিয়া থাকেন?' 'আপনারা প্রশ্ন করিবেন, আর আমরা জবাব দিব, এই জন্যই মূর্ত্তিমতী প্রশ্নরূপে সঙ্গে রাখিয়াছি। উনি জবাব দিবেন যে আমরা স্ত্রীলোক স্বামীর সাধনায় বাধা দিবার জন্যই বলিয়া নাই, আর আমি জবাব দিব কেমন করিয়া স্ত্রী থাকিলেও ভগবৎ-প্রাপ্তির অন্তরায় হয় না। গৃহীর বেশে থাকিলে প্রশ্ন উঠিত না। প্রশ্নটী জাগাইয়া রাখিবার জন্যই স্ত্রীকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছি। যতদিন বিশ্বকে mechanical বলিয়া ধারণা ছিল, ততদিনই স্ত্রীলোক 'দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী'। বিশ্ব যখন organism, তখন নারী নারায়ণী।—বৈকালে বক্তৃতায় যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, তাহাতে শরীরের অবসাদটা কাটে, শরীর ঝরঝরে হয়। ভাল লাগে।

৮ই মে

আজও শরীরটা একেবারে সুস্থ হয় নাই। ৯টায় ময়মনসিংহের ডাক্তার ধীরেন চৌধুরী আসে। ১১টার পর যায়।...প্রাণস্পর্শ নাকি তাহার দরকার, তাহার স্ত্রীরও ইচ্ছা আমার সঙ্গে দেখা হয়। আমি তো মানুষকে আমার প্রাণের গভীরতম স্পন্দন দিয়াই ভালবাসিয়াছি। সারা বাঙ্গলা ঘুরিলাম প্রাণসঙ্ঘ গড়িয়া তুলিবার জন্য। মেলামেশার মধ্যে কোনও অভিসন্ধি ছিল না, প্রাণ ঢালিয়া মিশিয়াছি—ইহা ধীরেনকে বলিলাম। সে-ও স্বীকার করিল। আজ সে আমাকে তাহার বাসায় নিতে চায়।...'রাজার ছদ্মবেশে রাখালের প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছে' বলিলাম। রেণু আমার খাওয়ার আগে আসে। রেণুর ইচ্ছানুযায়ী প্রতিভা আমার জন্য নূতন পাটশাক নিয়া আসে। পাটশাক আমার প্রিয়। কেন জানি না, ছোট ছোট এই জিনিষগুলি আমার প্রিয়। বচুর শাক আমার এত প্রিয় ছিল যে তাহা দিয়া সব ভাত খাইতে পারিতাম। বন্ধুগণ আমাকে বচুশাকের নিমন্ত্রণ দিতেন। সে সময়ে আমি বরিশালে। তখনই জীবনে রাধা-গোবিন্দের একটী প্রকাশ অনুভূত হয়। আমার বৈবাহিক শরৎবাবু বলিতেন, কারণ বুঝিতেছি। অচ্যুত শাক, যাহা খাইলে বাড়ে কৃষ্ণ অনুরাগ। বচু শাকের নাম অচ্যুত শাক। কৃষ্ণ ছোটর ঠাকুর, তাই বুঝি তাঁহার করুণা পাইলে ছোট মানুষ, ছোট বৃত্তি, ছোট শাকসব্জী, ছোট কাজ সব ভাল লাগিতে থাকে। ছোটও যে ব্রহ্ম, ছোটরও যে বিশ্বজনীন ইতিহাস আছে, তাহার অনুভূতিই বুঝি কৃষ্ণজনের ফল.....মালতী আসিলে লজিক পড়াইব বলিয়া লজিক নিয়া গিয়াছিলাম। সে আসে নাই, আবার লইয়া আসিয়াছি।

৯ই মে

সকালে ৯॥০টায় প্রেস হইতে জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথম ও

দ্বিতীয় ফর্মের প্রুফ দিয়া যায়। ১১টা পর্যন্ত প্রুফ দেখি। বেণু স্যার এস্. এন্. রায়ের ওখানে ঘুরিয়া ১১।০টার মধ্যেই ফেরে। প্রতিভা যাহাতে চেক জমা দিয়া ও ছানিমানে ঘুরিয়া ২টার পর আসে। আজও পেটটা সুস্থ হয় নাই।...মনটা ভাল লাগিতেছে না। পুরুষোত্তম-দর্শন বর্ত্তমান আবেষ্টনের মধ্যে কি ভাবে যে আগাইয়া যাইবে, ঠাকুর জানেন। বর্ত্তমান মাসের 'বৈশ্লেষিক দর্শন' নিয়া আমাদের মধ্যে আলোচনা হইল। জীবনের দৈনন্দিন সমস্যার সঙ্গে কেমন করিয়া যে ভগবানকে খাপ খাওয়াইয়া নেওয়া যাইবে—যে সম্বন্ধে এ দেশের লোক কোন প্রয়োজনীয়তাই ধরিতে পারিতেছে না, তাহা ঠাকুর জানেন। পথও তিনি, পথের সুবিধাও তিনি। শত শত লোক ঠাকুরের কাছে যায়, গুরুদর্শনে যায়, কিন্তু কিসের জন্য যায়? সংসার-জ্বালা জুড়াইতে? সংসার হইতে পলাইয়া হাঁফ ছাড়িবার জন্য? কিন্তু ইহা তো পুরুষোত্তম-দর্শনের প্রতিপাদ্য নয়? সংসারকে পুরুষোত্তমার্পণে গড়িয়া তুলিয়া সংসার ও ব্রহ্মের ভেদের জ্বালা ঘুচানো ও জুড়ানোই না সত্যবাস্তব সংসারজ্বালা জুড়ানো? কিন্তু কি করিয়া মানুষকে ইহা বোঝানো যাইবে, যেখানে লক্ষ লক্ষ সাধু সংসারের অনিত্যত্ব, অশুচিত্ব, দুঃখদত্ব বুঝাইয়া ব্রহ্মের নিত্যত্ব শুচিত্ব ও সুখরূপত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন?...কেহ তো 'ইহৈব ব্রহ্ম সমশ্নুতে' করিতেও চাহে না। সব ওপারের ব্রহ্ম পাইবার নেশায় মশগুল।...নোঙর ফেলিয়া থাকিলে যেমন করে নৌকার কিছু হয় না, কোনও আদর্শ-জীবনে যুক্ত থাকিলেও ঝড় তাহার কিছু করিতে পারে না। সে ঝড় উৎরাইবেই—ইহা সুধাংশুকে বলিয়া দিলাম। আমার জীবনে স্থিত-প্রজ্ঞ, স্থিত-প্রাণ থাক, ভয় নাই। প্রাণ-চুম্বিত প্রজ্ঞায় স্থিত না হইলে কোনও স্থিতপ্রজ্ঞা হইতে পারে না।

১৮ই মে

সকালে 'পঙ্কজের ফাঁদে ভৃঙ্গ পড়ে কাঁদে' প্রবন্ধটী প্রথম হইতে আবার লিখিতে থাকি।...ভিউটীর এমন সময় পড়ে যে আসিবার আর ফাঁক নেলে না। বিষয়ের যে পথের খোঁজ ঠাকুর দিয়াছেন, প্রাণ খুলিয়া ঠাকুরকে স্মরণ করিলে নিশ্চয়ই সে পথ উহারা পাইবে, ধন্য হইবে। আমি উহাদিগকে সংসারের বুকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই, পুরুষোত্তমকে প্রতিষ্ঠা করিতেছে দেখিতে চাই। এজন্য অতীত ও বর্ত্তমান যুগের শিক্ষাদীক্ষা ও ইহাদের সংমিশ্রণের ক্রমবিবর্ত্তনের ধারার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া চাই। অন্ততঃ বি, এ এর কোর্সের সহিত পরিচিত হওয়া দরকার। দৃঢ় সংকল্প ও সরল প্রাণ লইয়া লাগিয়া গেলেই হইবে। প্রতিভা...অনেকগুলি ব্যাপার লিখিয়াছে, বেণু প্রুফ দেখা শেষ করিয়া 'চরিত্রহীন' লিখিতে আরম্ভ করে ও শোনায়। প্রতিভা 'মাতৃদর্শন' নামক আনন্দময়ী মা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ হইতে কিছুটা পড়ে। যাহারা সম্প্রদায় চালাইতেছেন, তাহাদের সম্বন্ধে মোটামুটি খবর রাখা ভাল। দেখিলাম উহার আগাগোড়া বিশ্বাস ও ভাবের উপর দিয়া লেখা। ভারতের সব সম্প্রদায়ই তো এই পথের পথিক। বাস্তব জগতের day-to-day problem-এর কোন চুল-চেরা মীমাংসা ইহারা দেন না। 'একমুখী' হওয়ার নামে বহুকে চাপিয়া দেওয়া ছাড়া ইহারা কিছু বলেন না। বহুর বহুত্ব বজায় রাখিয়া একের কোন কথা ইহাদের মাথায় নাই। সকলেই বাহিরের দিকটাকে রুদ্ধ করিয়া ভিতরে যাইতে বলেন। যাহারা কতকটা যেন বাহিরকে মানেন, তাহারাও এইজন্য মানেন যে একেবারে না মানিলে উহারা ক্ষিপ্ত হইতে পারে, তাই উহাদিগকে একরূপ মানিয়াই না-মানার 'সাধনার' উপদেশ দেন। ইহাদের সাধন শুধুই দার্শনিকের। বৈজ্ঞানিকের কোনও স্থান এখানে নাই। ৬টার আফিসে গিয়া দেখি ধীরেনবাবু আসিয়াছেন। প্রতি বুধবার অবধূত ভাষ্কের তীব্রপ্রদীপ পাঠ হইবে, এইরূপ কথা হইল।

ক্রমশঃ

পনরই আগষ্ট

॥ জনাব রেজাউল করিম ॥

আজ স্বাধীনতা দিবসের পুণ্য প্রভাতে স্বাধীন ভারতকে অন্তর দিয়া অভিনন্দন করি। প্রায় দেড়শ বছর ধরিয়া আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কত মহাপ্রাণ ব্যক্তি স্বাধীনতার যূপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রাণপণ সাধনা এতদিনে সার্থক হইল। যাঁহারা এইভাবে আত্মবলিদান করিয়াছেন আজ বার বার তাঁদেরকে স্মরণ করি। আমরা যে আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি তাহা কখনই পাইতাম না যদি আমাদের পূর্ব্বসূরীগণ বুকের রক্ত দিয়া দেশমাতৃকার সেবা না করিতেন। কে তাঁহারা, কবে, কেমন করিয়া তাঁহাদের অন্তরে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত হইয়াছিল, কবে তাঁহাদের স্বাধীনতার ব্রতে প্রথম জয়যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল, সে এক সুদীর্ঘ কাহিনী। সে কাহিনীর আরম্ভ হইয়াছিল সিপাহী বিপ্লবের যুগে—তারপর নানাপথে চলিতে চলিতে, নানাভাবে সংগ্রাম করিতে করিতে পরিশেষে সেই মহান সংগ্রাম পরিসমাপ্তি লাভ করে ১৯৪৭ সালের পনরই আগষ্ট। তাই ওদিন জাতির নিকট অত্যন্ত পুণ্যের দিন। আমাদের সমস্ত সংগ্রাম সার্থকতায় ভরিয়া উঠিল এই পুণ্য দিনে। সিপাহী-বিপ্লবের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পনরই আগষ্ট পর্যন্ত এই দীর্ঘ যুগের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আজ আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে। কি সে দিন ছিল যখন বিদেশী বণিক হঠাৎ কেনা বেচার ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া রাজদণ্ড হাতে লইয়া ভারতের ভাগ্যবিধাতার কর্ত্তা হইয়া পড়িল। সেদিন বাঙ্গলার তথা ভারতের জনগণ একটুকুও বুঝিতে পারে নাই কি ভয়ানক বিপদ তাহাদের ভাগ্যে ঘনাইয়া আসিতেছে। এক পা এক পা করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল বিদেশী শাসক-গোষ্ঠী। সেদিনের রসনা বিস্তার করিয়া এই বণিকজাতি শোষণ করিতে লাগিল দেশের সমস্ত সম্পদ। সেদিন সহজে কেহই তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিতে সাহসী হয় নি। অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল বিদেশী বণিকের শাসনের ও শোষণের অধিকারকে। দেশের মধ্যে এমন লোকও ছিল যাহারা স্বীকার করিতে লজ্জিত হয় নাই ভারতে ব্রিটিশ-শাসন বিধাতার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। সেদিন নৈতিক দিক দিয়া দেশের চরম অধঃপতনের সূচনা হইয়াছিল। এইভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেল। অবশেষে দেশের মধ্যে একটি বিদ্রোহ দল গঠিত হইল। তাহারা মানিয়া লইতে সম্মত হইল না ব্রিটিশের অধিকারকে। তাহারা বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিল। তাদের অনুপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত হইয়া সারা ভারতের উপর উড়িতে লাগিল বিদ্রোহের পতাকা। সেদিনের সে বিদ্রোহ যদি সার্থক হইত তবে ভারতের ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত। কিন্তু সে বিদ্রোহ ব্যর্থ হইয়া গেল। অন্ততঃ তার আশু উদ্দেশ্য সফল হইল না। সেদিনের সে ব্যর্থতার জন্য আমাদের দেশবাসীরাই বহুলাংশে দায়ী। কারণ বহুলোকের চৈতন্য তখনও জাগ্রত হয় নাই। উচ্চশ্রেণীর বহুলোক বিদেশী সরকারকেই সাহায্য করিয়াছিল। জনগণ তখনও বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয় নাই। গণচেতনা তখনও জাগ্রত হয় নাই। ইউরোপে ১৮৩০ সালের বিপ্লব যে কারণে ব্যর্থ হইয়াছিল, এ দেশে সিপাহী বিপ্লবও সেই কারণে ব্যর্থ হইয়া গেল। ইউরোপে ১৯৪৮ সালে যে গণবিপ্লব আত্ম-প্রকাশ করিল তাহা বহু দিক দিয়া সফল হইয়াছিল। কিন্তু সিপাহী বিপ্লবের পর ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ-প্রভুত্বের বিরুদ্ধে উত্থিত হইতে কত সময় লাগিয়াছিল। তবে একটা কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, সিপাহী বিপ্লবটা ছিল বিদ্রোহের প্রথম সূচনা। ইহার পরবর্ত্তী যুগের বৈপ্লবিক নেতারা তার থেকে অনেক প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। সিপাহী

বিদ্রোহ দমনের পর ব্রিটিশ সরকার আরও কঠোরভাবে দেশ শাসন করিতে লাগিল। কোম্পানীর হাত হইতে ভারতের শাসনভার অর্পিত হইল ইংলণ্ডের রাজশক্তির হাতে।

অব্যাহত গতিতে ও দোর্দণ্ড প্রতাপে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের রথ ভারতের উপর চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে দেশের একদল লোক বুঝিলেন যে সিপাহী বিদ্রোহীদের পন্থায় দেশ স্বাধীন হইবে না। তাঁরা নিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করিলেন। যাঁরা এই পন্থায় বিশ্বাসী তাঁরা একদিন ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেদিন কংগ্রেস-নেতারা কল্পনা করিতে পারেন নাই যে এই কংগ্রেস একযুগে নিয়মতান্ত্রিক পন্থা পরিত্যাগ করিয়া নূতন ধরণের সংগ্রাম আরম্ভ করিবে। বাঙ্গলাদেশের সন্ত্রাসবাদী নেতারাও গান্ধী-প্রবর্তিত অহিংস সংগ্রামের শক্তির কথা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। গান্ধীজির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারা পথ পরিবর্তন করিল। তিনি জাতির হাতে তুলিয়া দিলেন অহিংস সংগ্রামের সার্থক অস্ত্র। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সত্যই অহিংসা প্রেম ও সেবার পথেই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিল।

কিন্তু ভারতের আকাশে স্বাধীনতার সূর্য্য আত্মপ্রকাশ করিলেও সে আকাশ মেঘাবৃত হইয়া দেখা দিল। ১৫ই আগষ্টের আনন্দের দিনেও সে মেঘ কাটে নাই। বৃটিশের ভেদনীতির কৌশলে ভারত দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেল। কিন্তু কবি আশ্বাস দিয়াছেন 'কেটে যাবে মেঘ নবীন রশ্মি ভাতিবে আবার ললাটে তোর।' বহু আত্মত্যাগ ও রক্তদানের পর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিল—এখন প্রধান কাজ স্বাধীন ভারতকে গড়িয়া তুলা। অতীতে আমরা এক ধরণের সংগ্রাম করিয়াছি। আজ স্বাধীন ভারতে অন্য ধরণের সংগ্রাম করিতে হইবে। মানুষের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কবি ম্যাথু আরনল্ড যাহা বলিয়াছেন আমাদের সামনে সেই আদর্শ তুলিয়া ধরিতে হইবে—কবি প্রকৃতি জননীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, হে জননি, আমাদেরকে একটি বিষয় শিক্ষা দাও—

One lesson of two duties served in one
Though the loud world proclaim their enmity.
Of toil unseveled from tranquility.

কর্ম্মচাঞ্চল্য ও প্রশান্তি এই দুইটি বস্তুই একই কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। কেবল হৈ চৈ করিলে চলিবে না—তৎসঙ্গে চাই স্থিরভাবে কর্ম্মপ্রচেষ্টা। এদেশে উত্তেজনা, চাঞ্চল্য, হৈ চৈ, আইন অমান্য, সত্যাগ্রহ বহু হইয়াছে। আজ ধীর মস্তিষ্কে শান্ত হৃদয়ে সতর্ক পদবিক্ষেপে সুস্থ মন লইয়া সংগঠনের কাজ, রচনাত্মক কাজ করিতে হইবে। এসব কাজ too great for haste, too high for rivalry. এসব কাজ এত বিরাট যে তাড়াতাড়ি করিলে চলিবেনা, এত মহৎ যে এখানে অর্থহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশ নাই। স্বাধীনতা ছেলেখেলার বস্তু নয় যে যদৃচ্ছা ইহার অপব্যবহার করিব। একটু ভ্রান্তির পথ অবলম্বন করিলে এতদিনের সমস্ত সাধনা পণ্ড হইয়া যাইবে। সাম্প্রদায়িকতার কুফল আমরা দেখিয়াছি। আজ তার চেয়েও মারাত্মক এক মনোভাব ভারতের ঐক্যবোধকে ব্যাহত করিতে উদ্যত হইয়াছে। এর নাম প্রাদেশিকতা। প্রাদেশিকতা যে ভাবে নগ্নমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাকে অচিরেই দমন করিতে না পারিলে দেশে ভীষণ ক্ষতি হইতে পারে। জাতীয় ঐক্য সমূলে ধ্বংস হইতে পারে। আজ পনরই আগষ্ট তারিখে স্বাধীনতা দিবসে আমাদিগকে সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে, কিছুতে প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় দিব না। স্বাধীন ভারত জয়যুক্ত হোক। তার আশাআকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোক। মহাত্মাদের গণের প্রাণপণ তপস্যা সার্থক হোক। স্বাধীন ভারতের জয় হোক!

স্বাধীন রাষ্ট্র

॥ শ্রীনলিনীকিশোর গুহ ॥

বর্তমানে ভারত স্বাধীন দেশ—স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বৃটিশ শাসনের অবসান হইয়াছে। উহা অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশের ভারত শাসনের ক্ষমতা বিধিমতে হস্তান্তরিত হইয়াছে ভারতবাসীর উপর। একটা পরাধীন পরবশ জাতি বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ও সংগ্রাম করিয়া—সেই সংগ্রামে বিজয়ী হইবার ফলে যে ভাবে স্বাধীনতা বা দেশের শাসনক্ষমতা করায়ত্ত হয়, ভারতে তাহা হয় নাই। কিছুটা রক্ত কিছুটা আপোষ করিয়া তাহা সম্ভব হইয়াছে। স্বাধীনতাকামী ভারত-বাসীর সংগ্রাম-দীর্ঘ-পথে মাত্র এই স্বাধীনতা অর্জিত হইলে, ভারত খণ্ডন হইত না। তথাপি ভারত খণ্ডনের ভিত্তিতে বৃটিশ ক্ষমতা ত্যাগ করিয়াছে। খণ্ডিত ভারতের দুই অংশ পাকিস্থান ও ভারত স্বাধীন হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীগণ ইহা কখনো চাহে নাই, কংগ্রেস কখনো কল্পনা করে নাই; অহিংস সংগ্রামী মহাত্মা গান্ধী ভারত খণ্ডনকে অন্যায় অপরাধ মনে করিতেন, সম্ভবপর সকল উপায়ে প্রতিরোধ করিতেও চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি শেষপর্যন্ত ভারত খণ্ডন হইয়া গেল। মুসলিমলীগের সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টা ও প্রচারণা, কলিকাতার 'গ্রেট কিলিং' এবং অন্যত্র সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবের পর—সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও তাণ্ডবের অবসানের জন্য মুসলিমলীগের কাম্য ভারত-বিভাগই মন্দের ভাল হিসাবে মানিয়া লওয়া হইল। তখন মনে করা হইয়াছিল—এইরূপ বিরোধ অপেক্ষা ওরা স্বতন্ত্র হইয়া থাকুক, প্রার্থিত বস্তু পাকিস্থান পাইয়া ওরা শান্ত হউক। শুধু কংগ্রেসই নহে, দেশখণ্ডনের ফলে ভারতের যে ক্ষতি হইবে, বিশেষ করিয়া বাংলার যে বিপত্তি দেখা দিবে, ইহা অকংগ্রেসী নায়ক শ্যামাপ্রসাদ প্রভৃতিও সে সময় উপেক্ষা করেন এই জন্য যে, মুসলিমলীগের সাম্প্রদায়িক কুশাসন ও সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব হইতে বাংলা মুক্ত হইবে। পশ্চিমবঙ্গ তো থাকিবে,—পূর্ববঙ্গের লোক পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে চলিয়া আসিবে। সেদিনের মানসিকতার দৌর্বল্য—সাম্প্রদায়িকতার আঘাত হইতে আশু মুক্তিলাভের আগ্রহে, উল্লেখযোগ্য কোন নেতাই দেশ-বিভাগ রুখিবার জন্য দাঁড়ান নাই। সংবাদপত্রে বিভাগের ভিত্তিতে মুক্তির বাণীতে 'গ্যালোপস পোল্' লওয়া হইয়া গেল! একদা মৃত্যুঞ্জয়ী সংকল্প লইয়া যাহারা স্বাধীনতার সংগ্রামনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন,—যাহার অন্যতম ফল-শ্রুতি বঙ্গ-বিভাগ-রদ,—সেই বাঙালীরাও ভারতখণ্ডন রুখিবার জন্য মৃত্যুঞ্জয়ী সংকল্প লইয়া সেদিন দাঁড়ান নাই। দেশ-বিভাগ হইল। ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইল। কিন্তু এই উপলক্ষে পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে যে সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব দেখা দিল,—দেখা দিল লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর সমস্যা, উহার আঘাত হইতে ভারত আজও মুক্ত হইতে পারে নাই। ১৯৪৭ সালে পাকিস্থান কাশ্মীরও আক্রমণ করিয়া বসিল। বিভাগ-পূর্বে সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবের যতটা আঘাত দেশকে সহিতে হইয়াছিল—ভারত-বিভাগের ফলে সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবের আঘাত আরো অধিক সহিতে হইয়াছে। এ-ছাড়া মুসলিমলীগ পাকিস্থান পাইয়াও শান্ত হয় নাই। প্রতিবেশী ভারতের প্রতি পাকিস্থান প্রতিবেশীসুলভ শান্ত মনোভাব অর্জন করে নাই। অখণ্ড দেশকে খণ্ডিত করিয়া যে পাকিস্থান সৃষ্টি হইল,—তাহা আজও সেদিনের ভারত-বিদ্বেষ লইয়াই ভারতের বিরুদ্ধে শত্রুতাসাধনে তৎপর। এই ধরণের একটি প্রতিবেশীরাষ্ট্র—ভারতের পক্ষে নিত্য কিরূপ 'শূল' ও 'শাল' হইয়া রহিয়াছে, তাহা আজ আর যুক্তি-তর্কের বিষয় নহে। ভারতের শান্তি—আভ্যন্তরীণ শান্তি, ভারতের শক্তি-সমৃদ্ধি—ভারতের মান মর্যাদা পাকিস্থানের

অসহ্য। তাই প্রতিবেশী ভারতের বিরুদ্ধে শত্রুতা-সাধনের কোন উপায়ই পাকিস্থান ত্যাগ করে না, করিবে না। স্বাধীন-ভারতকে এ-হেন একটি নিকৃষ্টতম প্রতিবেশী লইয়া দীর্ঘকাল চলিতে হইবে। স্বাধীন ভারতের পক্ষে পাকিস্থান একটি কণ্টকবৎ থাকিতেছে ও থাকিবে। দেখা যাইতেছে স্বাধীনভারতের ইহাই নিয়তি। স্বাধীনভারতের বহু সময় ও শক্তি এই পাকিস্থানী ঝামেলায় অথথা ব্যয় করিতে হইতেছে। কেবল বিদেশে নহে—ভারতের অভ্যন্তরেও লীগ-মার্কা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ পাকিস্থান ছড়াইতে কোন সুযোগই ছাড়িতেছে না। স্বাধীন ভারতের প্রসঙ্গ তুলিলে, তাই সেই প্রসঙ্গে প্রতিবেশী পাকিস্থানের বিষয়টা স্মরণ রাখিতে হয়।

ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে আজ চতুর্দশ বৎসর। একটা জাতির জীবনে ১৪ বৎসর খুব বেশী সময় নহে; কিন্তু নিতান্ত কম সময়ও নহে। ভারত নিজস্ব সংবিধান রচনা করিয়াছে; অনেকটা আদর্শসম্মত গণতান্ত্রিক সংবিধান। সর্বজনের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত। প্রাপ্ত বয়স্কের ভিত্তিতে ভারতের ২১ কোটি নরনারী ভোটাধিকার পাইয়াছে। অস্পৃশ্যতা দণ্ডনীয় অপরাধ। বৈষয়িক উন্নতির জন্য দুইটির পর তৃতীয় পরিকল্পনার ভারত প্রবেশ করিতেছে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ রাষ্ট্রের আদর্শরূপে স্বীকৃত—। কিন্তু ভারত রাষ্ট্রের আদর্শ ও অভিপ্রায় যত বড় ও মহানই হউক, তাহা ৪০ কোটির অধিক নর-নারীর জীবনে কতটুকু প্রতিফলিত দেখা যায়? সাধারণ লোকের অভাব-অভিযোগ আজও পুঞ্জীভূত। ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মান আজও নিম্নস্তরে রহিয়াছে। জনগণ আজও দারিদ্র্য-পীড়িত। কর্ম সংস্থানের যতটা ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা অতিক্রম করিয়া প্রতি বৎসর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া বেকার সমস্যা দুরূহ করিয়া তুলিতেছে। ইহার উপর অভাবিত আত্মঘাতী সমস্যা মাথা তুলিতেছে। ভাষাগত দ্বন্দ্ব, ভাষাগত দাবী, প্রাদেশিকতা, জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ! সংবিধানের আদর্শ রক্ষিত হইতেছে না; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থচেতনায় অখণ্ড দেশ ও জাতির চেতনা বিড়ম্বিত হইতেছে। ইহার উপর অর্থ-সামর্থ্যের উর্দ্ধে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সমস্যা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটিতেছেনা তাহা নহে, কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া ভারতের সমস্যাগুলির বাস্তবতার ভিত্তিতে বিচার করিলে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, ভারত রাষ্ট্র ভারতের বৈষয়িক-সামাজিক সমস্যাসমূহ নিরাকরণের চেষ্টা করিয়াছেন, করিতেছেন। ভুল-ভ্রান্তি ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয় স্বীকার করিয়াও রাষ্ট্র পরিচালকগণের জন-কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা ও প্রয়াস অস্বীকার করা চলে না। তথাপি বিরাট ও বিচিত্র এই দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা এখনো গুরুতর সমস্যা হইয়াই রহিয়াছে। এবং অভাবী জনগণের অভিযোগ ও নালিশ এবং তজ্জনিত ক্ষোভ অবাস্তব নহে।

একদা স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী ভারত পরাধীনতাকে অসহনীয় অভিশাপ মনে করিয়াছিল। পরাধীনতার শৃঙ্খলপাশ ছিন্ন করিবার জন্য জীবন পণ করিয়া সংগ্রামব্রতী হইয়াছিল। সেদিনে দেশের স্বাধীনতাই ছিল বড় কথা; 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়!' কিন্তু ইহাও সত্য, কোন দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতাই সর্বসিদ্ধি আনিতে পারে না। ভারত যখন বৃটিশের অধীন—তখনও "চীন-ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান" স্বাধীন। আরো কত দেশ ছিল স্বাধীন। কিন্তু তেমন স্বাধীনতা সত্ত্বেও ঐসকল দেশ দরিদ্র অনুন্নত। সুতরাং যেমন করিয়া হউক রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়া বা থাকাই যথেষ্ট নহে। আবার ইহাও সত্য—স্বাধীনতা ভিন্ন একটা জাতির সহজ ও স্বাভাবিক সমুন্নতি অসম্ভব। সেই কারণে পরাধীন জাতি আমাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইয়াছিল স্বাধীনতার। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতাকামীগণ কেবলমাত্র বিদেশী শাসনের অবসানের জন্যই স্বাধীনতা চাহে নাই। স্বাধীনতার দৌলতে জাতিকে স্বীয় আদর্শে মনোমত করিয়া গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব বহনের অধিকার অর্জনের জন্যই চাহিয়াছিল স্বাধীনতা।

সুতরাং ইহাও প্রমাণিত সত্য যে, শুধুমাত্র একটি

জাতির রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা থাকিলেই একটা জাতি স্বতঃই বড় হইয়া উঠে না; রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা জাতির বড় হইবার একটা উপায়। স্বাধীনতা লাভের পর চৌদ্দ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। বিচার করার প্রয়োজন স্বাধীনতার সুযোগ পাইয়া আমরা জাতি হিসাবে কতটা বড় হইয়াছি, বৈষয়িক সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছি, অথবা ভারত জাতির চেতনায় কতটা সংহত ও শক্তিশালী হইয়াছি; ব্যক্তিগত স্বার্থকে জাতির স্বার্থের নিকট খর্ব করিবার জাতীয় চরিত্র আমাদের কতটা দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

দেশে অভাব আছে, অভাব অনটনের দুঃখ আছে; আছে অভিযোগ। তাই এই কথাই আজ বড় হইয়া উঠিতেছে, 'কৈ স্বাধীনতা তো হইল, কিন্তু আমরা পাইলাম কি?' কিন্তু একটা স্বাধীন ও উন্নত জাতির মতো কথা ইহা নহে। এই কথাও তাহাদের বলিবার ও ভাবিবার, স্বাধীন রাষ্ট্রকে আমি দিলাম কি? দেশের জন্য, জাতির জন্য, রাষ্ট্রের জন্য আমি কতটুকু কি করিয়াছি, কতটুকু সময় শক্তি ব্যয় করিয়াছি, কতটুকু স্বার্থত্যাগ করিতে পারিয়াছি। ঠাকুরের আবির্ভাব হইল, দর্শন লাভ করিয়া ভক্ত প্রশ্ন করিলেন, "কৈ ঠাকুর, স্বর্গে সুখ কোথায়?" উত্তরে ঠাকুরই ভক্তকে বলিলেন, 'সুখ? তা তুমি ঘোল খাইলেই ঘোলে!' সাধারণভাবে ভারতের জনগণের মধ্যে এমন চেতনার অভাব আছে যে, জাতির ভালমন্দ করিবার দায়িত্ব আমারও আছে। এই চেতনার অভাবের জন্য শুধু সাধারণ মানুষই দায়ী নহে; জননায়কগণও দায়ী। আমরা জনগণকে কেবলমাত্র ইহাই শুনাইয়াছি যে, বিদেশী শাসনই আমাদের সর্বদুঃখ-দৈন্যের ও অনৈক্য দুর্বলতার কারণ। একবার বিদেশী শাসনের অবসান ঘটিলেই আমাদের গোলা ভরা ধান, পাইয়ের বাটে অফুরন্ত দুধ ও পুকুরে অফুরন্ত মাছ দেখা দিবে। সব অভাব অনটন দূর হইয়া যাইবে। জনগণও ধরিয়া লইয়াছিল,—একবার যে করিয়াই হউক স্বাধীনতা আসিয়া গেলেই হইল, অমনি সর্ব দুঃখের অবসান ঘটিবে। তাই, যখন তাহারা দেখে স্বাধীনতা পাওয়ার পরও অনেক কিছুর অভাবই তাহাদের পীড়িত করিতেছে, তখন ক্ষোভে বলিয়া উঠে, কি হইল স্বাধীনতা পাইয়া?—পাইলাম কি? জাতির সামগ্রিক সমৃদ্ধি সৃষ্টির জন্য যে জাতির প্রতিটি মানুষেরই করণীয় আছে, তাহা মনে হয় না বলিয়াই সাধারণতঃই জনগণ নিষ্কামমুখর হইয়া উঠে, আত্ম-বিশ্লেষণ কদাচিৎ করিয়া থাকে।

একদিন পরাধীন ভারতে আমরা বৃটিশের মুখাপেক্ষী থাকিতাম। যাহা পাই নাই, উহার জন্য ইংরেজকেই দায়ী করিতাম, আবার সুখের সন্ধানে ইংরেজের দয়া লাভের চাতুর্যকেই বরণ করিতাম। কিন্তু তেমন ফাঁকিতে ব্যক্তি বিশেষের সাময়িক স্বার্থ সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু এমন পর-প্রত্যাশার পথে, ফাঁকির পথে কোন জাতি বড় হয় না। সেই বিকৃত মানসিকতা হইতে, পরমুখাপেক্ষিতা হইতে আজ স্বাধীন ভারতেও আমরা মুক্ত হইতে পারি নাই। দায়ী করি, আমাদের সর্বদুঃখ দূর করার কাণ্ডারী প্রীনেহরু —অথবা বিধান রায়। কিন্তু এতো বড় একটা জাতির সর্বকল্যাণ সাধনের, সর্বদুঃখ মোচনের ভার কোন নেতার হাতেই ভারতের ভাগ্য বিধাতা ন্যস্ত করেন নাই। দেশ-প্রাণতা, জাতির প্রতি মমতাই জাতিকে জাতি ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালনের প্রেরণা দেয়। এই যে আমাদের মধ্যে জাতি-ভেদ, সম্প্রদায়-ভেদ, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিস্বার্থ প্রবল হইয়া উঠে ইহার কারণ দেশ ও জাতিকে আমরা আজও সর্ব অন্তর দিয়া ভালবাসি না। এই ভালবাসাই দেশপ্রেম। তাই, দেশপ্রেমের প্রভাব সম্পর্কে এই সত্য উক্তি স্মরণ করিবার—'Patriotism is a correction of superstition, the more we feel for our country, the less we feel for our sect." দেশ-প্রেম জেন বুদ্ধির কুসংস্কার দূর করে। দেশ ও রাষ্ট্রকে যত ভালবাসিব, আমাদের ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক চেতনা ততই তুচ্ছ হইয়া যাইবে।

মনে রাখিবার, গণতন্ত্রে গণেশের স্থান নাই। সেখানে গণেশ—গণপতি জনগণের ভাগ্যবিধাতা নহে; তাহার হাতে সর্বময় কর্তৃত্বের ডিক্টেটারী চাবুক নাই। গণতন্ত্রের গণেশ বড় জোর সীমাবদ্ধ নেতৃত্ব দিতে পারেন, প্রেরণা বা বাণী দিতে পারেন—কিন্তু জনগণের স্বাধীন ইচ্ছা,

অনিচ্ছা মতি-গতি প্রবৃত্তির বিভিন্ন অস্তিত্ব আছে। এই মতিগতি ও প্রবৃত্তি কল্যাণের ক্রমপথ গ্রহণ না করিতেও পারে। তবে জনগণের দেশপ্রাণতা সত্য হইলে জনগণ দেশের সঙ্গে রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে। তখন পাওয়ার কথা, স্বার্থের কথা বড় হইয়া উঠে না, দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্য পালনের প্রেরণা কার্যকরী হয়।

বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্র মার্কিন। মিঃ কেনেডি উহার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়া জাতির নিকট যে প্রথম বাণী দান করেন, তাহাতে বলেন—রাষ্ট্রের নিকট আপনারা কি পাইয়াছেন, পাইতে চাহেন—তাহাই বড় কথা নয়, আমেরিকার প্রতিটি নরনারীকে আজ ইহাই ভাবিতে ও জানিতে হইবে, রাষ্ট্রের প্রতি তাহারা কতটা শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করিয়াছেন, কতটা ব্যক্তি-স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছেন অর্থাৎ পাওয়ার ক্যাঙ্গলামো নয়, দেওয়ার মহত্ত্বও অর্জন করিতে হইবে। রাশিয়া বড় হইয়া উঠিতেছে। একি শুধু ষ্ট্যালিনের নির্মম নিষ্ঠুর শাসনে, নিকিউশিপনে, অথবা ক্রুশ্চেভের নরম-গরম নূতন কৌশলে! তাহা নহে, জনগণের ধর্মনিষ্ঠা ও রাষ্ট্রের প্রতি একাত্মতা বোধ, উহার জন্য সর্বদুঃখ বরণের প্রস্তুতি এবং তেমন চরিত্রই রাশিয়ার সামগ্রিক শক্তি অর্জনের মূল। নিতান্ত সাম্প্রতিক কালের সংবাদ: বার্লিন প্রশ্নে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, উহারই পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়ার শ্রমিক সংঘ সরকারের নিকট এই মর্মে প্রস্তাব পাঠাইয়া অনুমতি চাহিয়াছেন যে, উৎপাদন-বৃদ্ধির প্রয়োজনে তাহারা নির্দিষ্ট সময়ের পর অতিরিক্ত এক ঘণ্টা বেশী কাজ করিতে চাহে। কেহ বলিতে পারেন কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র বলিয়াই ইহা সম্ভব। কিন্তু ইহা নিতান্তই ফাঁকির কথা। গণতান্ত্রিকরাষ্ট্র আমেরিকা এমন কি বৃটেনের জনগণও এমন কথাই বলিবে ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য নিজ স্বার্থ ত্যাগের জন্য প্রেরণা দিবে। ভারত রাষ্ট্রের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের ৪০ কোটি নর-নারীর জাতীয় চরিত্রের উপরই নির্ভর করিতেছে। ভারতের প্রতি মমতা ও একাত্মতা বোধ চরিত্রে যত দানা বাঁধিবে, জাতি হিসাবে আমরা তত শক্তিশালী হইব। মানুষের মধ্যে আছে স্বার্থ চেতনা, আছে লোভ, আছে চুরি-জুচ্চুরি দুর্নীতির পাপবুদ্ধি—তাহা দূর হয় ধর্মপ্রাণতায়, যাহা দেশ-প্রাণতা তথা দেশ-ধর্ম বলিয়াই বুঝিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

সেই কত কাল আগে ভাদ্র মাসের এক অষ্টমীতে একজন মানুষ এসেছিলেন এই মাটির বুকে, যিনি এই কয়েক হাজার বৎসরেও ফুরিয়ে যান নি! পৃথিবীর এই দীর্ঘ কালের সময়ে কত মানুষ আসল, কত মানুষ নিঃশেষে মুছে গেল, কিন্তু খুব স্বল্প কয়েকজনই কালের তরী বেয়ে পরবর্তী কালে এসে পৌঁছালেন। আবার যারা পৌঁছালেন, তাঁদের সকলকেই মানুষ একই রকম করে স্মরণ করেন না—ভাদ্রের ঝড়বাদলের ঘনঘটা আর রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মেঘকে সঙ্গে করে যেদের রাজার কারাগারে সেই কয়েক হাজার বৎসর আগে যে মানুষটি এসেছিলেন, আজকের দিন পর্যন্ত মানুষ তাঁকে বুদ্ধি দিয়ে স্মরণ করে, চেতনা দিয়ে স্মরণ করে, হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়ে আনন্দ দিয়ে স্মরণ করে—তাই তিনি যে কেবল ফুরিয়ে যান নি তাই নয়, তিনি এমন করে বেঁচে আছেন যেন তিনি আজকের মানুষ। আজ আমরা যেমন করে ভাবি, তিনি যেন তেমন করেই ভাবতেন, আজ আমাদের

যে সব সমস্যা, সে সব সমস্যার সমাধান দিতেই যেন তিনি এসেছিলেন—তিনি তাই পুরাতন হয়েও চির-কালের নবীন। তাঁকে যে কত মানুষে কত রকম করে এই দীর্ঘ কালে ভালবাসল, তা হিসেব করে বলে শেষ করা যায় না। রাজাও তাঁকে ভালবাসল, ভিখারীও তাঁকে ভালবাসল, সংসারীও তাঁকে ভালবাসল, সন্ন্যাসীও তাঁকে ভালবাসল, সতীও তাঁকে ভালবাসল, অসতীও তাঁকে ভালবাসল—সব রকম লোকের মনকে আকর্ষণ করতে পারেন, তাঁর মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল—এইখানেই তাঁর অনন্ত বৈশিষ্ট্য—তাই তিনি কৃষ্ণ।

নিজেকে তিনি 'সমগ্র' বলেই বলেছেন—'সমগ্রম্ মাম্'; সমগ্র বলেই সকলেই যে যার মত তাঁকে পেতে পারল—প্রত্যেকেই যে তার মত করে তাঁকে পেতে পারবে সে কথা তিনিই বলে দিচ্ছেন—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'—তাই সবলেই তাঁকে ভালবাসল, তাই তিনি 'সর্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীল'। তিনি এমনই ছিলেন বলেই এত হাজার বৎসর পরেও ভাদ্র মাসের ঐ কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে আজও তাঁকে সহস্র সহস্র লোক নানা ভাবে স্মরণ করছে। আমরাও তাই আজ আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে তাঁকে স্মরণ করি।

এমন যে কৃষ্ণ সেই কৃষ্ণ জীবনে সুখী ছিলেন, কি দুঃখী ছিলেন? তাঁর জীবন সার্থক হয়েছিল, না ব্যর্থ হয়েছিল? প্রশ্নগুলোও বেয়াড়া, উত্তরও দেওয়া সহজ নয়। কৃষ্ণ-জীবনে সুখও ছিল অনেক, দুঃখও ছিল ভূরি ভূরি—সুখের চেয়ে দুঃখের মাত্রা বেশীই ছিল, একথা প্রমাণ করাও একেবারেই অ-সহজ নয়। কারাগারে যার জন্ম—তাঁর সুখ কোথায়? জন্মের পরেই যাঁকে পিতৃমাতৃ কোল ছেড়ে স্থানান্তরে ঘর খুঁজে নিতে হয়, তাঁর সুখ কোথায়? বৃন্দাবনে বন্ধুবান্ধব গোপ আর গোয়ালা গোয়ালিনী নিয়ে দিনগুলি যখন আনন্দে উপচে পড়ছিল, তখন সেই ভরা দিনগুলির মাঝখান থেকে চাঁদের হাট ভেঙে দিয়ে যাঁকে স্থানান্তরের কর্তব্যের ডাকে সেড়িয়ে পড়তে হয়—তাঁর সুখ কোথায়? তারও পরে আরও কত কি? কিন্তু এ সবই যে দৃষ্টিকোণ থেকে বলা সেটা স্থিতিধর্মপ্রধান, অনেকাংশেই বৈষয়িক, তথা-কথিত চিরাচরিত অভ্যস্ত মনোবৃত্তি।

আমাদের মত লোকেরা যারা চিরাচরিত ধারণা নিয়ে জন্মাই, সেই মূলধন খাটিয়েই বেঁচে থাকি—তাঁদের অনেক কিছু ধারণা বদলে দিতেই ঐ মানুষটির আবির্ভাব। পৃথিবী বহু পুরাতন, আবার দেখি নূতনও—জানাশুনা কথাও মানুষ ভুলে গিয়ে বসে থাকে—তাই তাকে আবার নূতন করে শেখাতে হয়—তাই অমন আশ্চর্য সুন্দর মানুষদের কালে ভদ্রে জন্ম নিতে হয়। যাঁর ঔরসে আর যাঁর গর্ভে জন্মলাভ তাঁরাই শুধু আমাকে সত্যিকারের স্নেহ করবেন, তাঁরাই শুধু আমার কল্যাণ বুঝবেন—এমন কথা যে সত্যি নয় এই কথাটা প্রমাণ করতেই শ্রীকৃষ্ণ জন্মেই বওয়ানা হয়ে এলেন তথাকথিত পরের ঘরে—তাঁর মধুর জীবন দিয়ে দেখালেন যে 'পরের ঘর' তাঁর কত আপন, কত আদরের, কত কল্যাণকর। আমাদের ধারণা এক এক মানুষ এক এক রকমের হয়ে থাকবে—রাজা রাজাই হবে, সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীই হবে, বিষয়ী বিষয়ের কীটই হবে, ভাল যে বাসবে সে শুধু ভালই বাসবে, কর্মী যে সে শুধু কাজই করবে, জ্ঞানসাধনা তার জন্য নয়, জ্ঞানী যে সে নড়ে বসে এতটুকু কাজ করবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর জীবন দিয়ে প্রমাণ করে দেখালেন যে, রাজা হয়েও পা ধুয়ে দেবার কাজ নেওয়া যায়; সন্ন্যাসী হয়েও রাজত্ব করা চলে, বিষয়ের মধ্যে থাকলেও বিষয়ের কীট না হয়ে পাকা যায়, ভাল বাসলেও মস্ত কর্মী হওয়া সম্ভব, আবার তারই জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্যে দিক উদ্ভাসিত হয়। এমনি করে আমাদের তথাকথিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কৃষ্ণ এমন একটা মুক্ত, স্বচ্ছ, ঝরঝরে জীবন চালিয়ে গেছেন—যেখানে তাঁর অনেক করা, অনেক না-করা, অনেক সঙ্কল্প, অনেক অপচয় মিলে শেষ পর্যন্ত কী যে হয়ে উঠল, কী যে হয়ে দাঁড়াল—সে কি সার্থকতা, না ব্যর্থতা, সে কি সুখের, না দুঃখের—আমাদের হিসেবে তার আর কিছুই মিলল না। তিনি এত সব কাজ করেছেন, আমাদের মতে যা

অথচ এমনও কম করেন নি—সব মিলিয়ে যুগ যুগান্তের চিত্তে তা বিস্ময় হয়ে আছে, কোন একটা রকম কিছু হয় নি।

হয় নি বলেই তাঁকে এত ভাল লাগে, হয় নি বলেই তিনি চিরকালের, সর্ব জনের। তিনি সর্ব জনের বলেই সর্ব কি তাঁকে স্মরণ করল?—না করল না, কিন্তু করার সার্থকতা ও প্রয়োজন আছে। বাষ্পীয় পৃথিবী তার বাষ্প অবস্থাকে যে ভাবে নানা রূপে পরিণত করে তুলেছে, তারই একটা রূপ হয়ে রয়েছেন জ্যান্ত মানুষের প্রেরণা অঙ্গনকে রূপ দেওয়ার। এক একটা মানুষের সমগ্র সত্তায় এত শক্তি বা প্রেরণা ওতপ্রোত হয়ে আছে যে, কি করে কোন্ পথে যে তা বিচ্ছুরিত হবে, তার হদিশ পাওয়াই মানুষের পক্ষে দুরূহ হয়ে ওঠে। সে কি করবে, কোন্ পথে যাবে, কোন্ কথা বলবে, বুকের ভিতরের এত আবেগকে কেমন করে প্রকাশ করবে—এ কথা জানে না বলেই তার যত বেদনা—শক্তিহীনতার বেদনা মানুষের নয়। কিছু নিয়ে সে থাকতে চায়—অনেক কিছু নিয়ে—বড় কিছু নিয়ে, সেই আবেগেরই প্রকাশ বিজ্ঞানের আবিষ্কারে, চিত্রকলার বিকাশে, সঙ্গীতের ঔৎকর্ষে, আরও কত রকমে। এই-ই যখন তার অবস্থা, তখন তার দৃষ্টিতে যদি প্রতিভাত হয় এমনই কোন দৃষ্টান্ত যাঁর জীবন এমন বহুমুখী প্রকাশে উজ্জ্বল, তবে সে তার পরম ভাগ্য।

শ্রীকৃষ্ণ সেই দৃষ্টান্ত। তাই তাঁকে স্মরণ করার প্রয়োজন আছে—কেবল বহুমুখী বিকাশকে প্রস্ফুটিত করতে নয়, মানুষের বহুমুখীনতাকে সামঞ্জস্যের সুষমা দান করতে আর তাকে সামগ্রিক কল্যাণে প্রযুক্ত করতে। মানুষের প্রকাশোন্মুখিনতাকে সাধারণতঃ ঠেকিয়ে রাখা সহজ নয়, বাইরে সে বেরিয়ে আসবেই—কিন্তু পথ যখন কেউ দেখিয়ে দেয় না, ছন্দ যখন কেউ শিখিয়ে দেয় না—তখন সে প্রকাশে থাকে না সামঞ্জস্য, থাকে না সামগ্রিক কল্যাণ আর সেই জন্যেই থাকে না শান্তি ও সোয়াস্তির আনন্দ অথচ সমাজবদ্ধ মানুষের পক্ষে এগুলো সবই অপরিহার্য। সামঞ্জস্য, সামগ্রিক কল্যাণ-বোধ ও জীবনের স্থিতি না হারিয়ে জীবনের বহুমুখীনতার সুষ্ঠু প্রকাশের যে সুন্দর দৃষ্টান্ত, তাই-ই শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করার প্রয়োজন আছে। সমগ্র পৃথিবীর ব্যক্তি ও জাতির জীবনে তাকালে দেখা যাবে এই সামঞ্জস্যের সুষমার আর সামগ্রিক কল্যাণবোধের অভাব। ব্যক্তিই হোক বা জাতিই হোক শক্তিকে বা ভোগকেও তারা ভোগ করে, অ-শক্তি বা ত্যাগকেও তারা ভোগই করে। এমনটি হয় এই জন্যই যে, ব্যক্তি বা জাতি সকলেরই ত্যাগ করা বা ভোগ করার কেন্দ্র অর্থাৎ যা তাকে প্রণোদিত করে তা এমন কিছু নয় যা একই সময়ে transcendent ও immanent—অতীত ও জগৎ—একই সঙ্গে ব্যাপক ও গভীর, অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী। নয় বলেই তা একান্ত হয়ে পড়ে, কোনও দিকে অতিরিক্ত ঝুঁকে পড়ে আর তখনই তা সৌন্দর্য হারায়। সামঞ্জস্যের সঙ্গতি ও কল্যাণ-বোধই যদি মানুষের থাকত, তাহলে কি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে এত বিবাদ, এত কাড়াকাড়ি, হানাহানি, লোভ, পরস্বাপহরণস্পৃহা এমন করে মানুষের মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে থাকত? এত সমস্ত অসৌন্দর্য নিয়ে মানুষ বাঁচবে কেমন করে—মানুষেরই অন্তরাত্মার এ আকুল প্রশ্নের জবাব দিতে, বাঁচবার ছন্দ ও পথ দেখিয়ে দিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজন, তাঁর জন্ম নেওয়া সার্থক। আমাকে আমি সৃষ্টি করি নি এ কথাটা যখন ঠিক, তখন স্রষ্টাকে খুঁজে বের করতেই হয়। সেই খোঁজার পথে আকাশ পাতাল ঘুরে বিশ্বভুবনের স্রষ্টার দেখা মিলল শেষে মর্ত্যের মাটির ঘরে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে। সমস্ত সৌন্দর্য সমস্ত অসৌন্দর্য দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করে 'তদেবানুপ্রাবিশৎ' হয়ে 'পুরুষোত্তম' জন্ম লাভ করে এত পরস্পরবিপরীত সৌন্দর্য অসৌন্দর্যের মধ্যে কস্তুরীমৃগসম নিজেরই নাভিগন্ধে কিংকর্তব্যবিমূঢ় মানুষকে তিনি দেখালেন এই পরস্পর বিপরীতের মধ্যে বেঁচে থাকবার ছন্দ শুধু সামঞ্জস্য-বোধ আর সামগ্রিক কল্যাণবোধ বা ভূতহিত। এ ছাড়া এ সংসারে এই বহু চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন, বহু বৈচিত্র্য অথচ একের মধ্যে যা বিধৃত এমন অদ্ভুত মানুষ-জীবনে পথ চলার কোনো নির্দিষ্ট

মাপকাঠিই নেই। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা অষ্টমী দিনে 'অজ' 'অমলাত্ম' করে সাধনস্ত ও কৃত-হিতার্থযোধের পরিমাপটা শুধু দেখিয়ে গেলেন তাঁর সারা জীবন ধরে, শিখিয়ে গেলেন পরস্পর বিপরীত এত ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে কোন্‌টাকে কত পরিমাণে নিলে জীবনে সঙ্গতির সুষমা ও কৃতহিত রক্ষিত হয়ে জীবনের আনন্দাস্বাদন অব্যাহত থাকে। বিশ্বের স্রষ্টা মানুষ হয়ে এলেন মানুষের মধ্যে—এর থেকে সুন্দরতর মুহূর্ত আর কি হতে পারে? যে বহু হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় স্রষ্টার পক্ষে একদিন সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল, স্রষ্টার সেই বহুত্বের আকাঙ্ক্ষা যে সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছে; তাই তো তার সমস্যা এত জটিল, তাই তো পুরুষোত্তম বিশ্বরূপ কৃষ্ণ-জীবন দেখে তাকে শিখতে হয় নয়নমোহন হতে গেলে, বহুর ক্ষেত্রে চিহ্নিত করতে গেলে কেমন করে বিশ্বরূপ হতে হয়, কেমন করে মানুষের কল্যাণবোধকেই শুধু সম্বল করে বহুর ক্ষেত্রে বিশ্বরূপ হয়েই শুধু বিচরণ করতে হয়। সৃষ্টিটাকে তিনি এই যে-কৌশলে গড়েছেন, কৃষ্ণ-জন্মে স্রষ্টা নিজে এসে সেই কৌশলই শিখিয়ে গেলেন—তাই শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করার প্রয়োজন খুব বেশী করেই আছে। স্মরণ না করেও যারা ভালই আছেন বলে বোধ করেন তাঁরা কোন একটা কিছু দিয়ে নিজেদের ব্যাপৃত রাখেন বলেই আছেন—কিন্তু কোন একটা কিছু যাদের কাম্য নয়—যাদের কাম্য সৃষ্টির সমগ্রতা, কৃষ্ণকে তাদের বড় প্রয়োজন। আধুনিক কালে ভারতবর্ষের অনেকেই তাঁকে স্মরণ করে না, অনেকে আবার তাঁর কোন একটা দিক নিয়ে বেশ আছে, ভারতবর্ষের বাইরের বিরাট পৃথিবীরও কেউ তাঁকে স্মরণ করে না। করে না ঠিকই—কিন্তু না করে কি তারা বেশ আছে? তারা কি শান্তিতে আছে? তারা কি সকলকে ভালবেসে আছে? তারা কি বিশ্বের সকলকে, যে যেখানে আছে সকলকে, আত্মা বলে, নিজ বলে দেখে? দেখে না, তাদের তারা নেই। সেইজন্যেই আধুনিক কালেও এক এক জাতি অপর জাতিকে বা শত্রু বলে যাকে মনে করে তাকে এবং এমনি অগণিত সংখ্যাকে পশুর মত মেরে ফেলতে পারে, যে কোন রকম অত্যাচার চালাতে পারে—এ যেমন বিদেশে, তেমনি দেশে, এ যেমন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, তেমনি জাতিতে জাতিতে।

বিশ্বজোড়া সকলেই যদি সেবা বুদ্ধিতে নিজের সকল যোগ্যতা অযোগ্যতাকে কাজে না লাগায়, জ্ঞানে হোক, কর্মে হোক, অর্থে হোক বা যা দিয়ে হোক—অপরের থেকে নিজের উৎকর্ষ দেখাবার মনোবৃত্তিকেই যদি ভোগ করে চলে—তাহলে বিশ্বে শান্তি হবে না কোনদিন। তবে অশান্তির এ ঝঞ্ঝাট যেমন থাকবেই—অতীতেও শুম্ভ নিশুম্ভ রাবণ কংস শিশুপাল প্রভৃতি ছিলেন—তেমনি এরই পাশে পাশে থাকবে সাধনস্তের সুষমাধন, বিশ্বরূপ পুরুষোত্তমের প্রাণচঞ্চল, প্রেমঘন জীবনের আকর্ষণে স্নিগ্ধ হবার, তৃপ্ত হবার, শান্ত হবার, রেষারেষির প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথ পরিত্যাগ করে নিজে প্রণমানবপু হয়ে অপরকে হৃদয় করে আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার জীবন-ঘন দৃষ্টান্তের চিরন্তন আহ্বান। আমরা আজ তারই তাঁকে মিলেছি।

তাই এই দিনে সেই প্রেমময় অচ্যুত পুরুষের জীবন-কাহিনী স্মরণ করি। জীবনের মধ্য দিয়েই জীবন লাভ হয়—তাই সে জীবনবৃত্তান্ত আমাদের শুদ্ধ জীবনকে পথ দেখাবে। তাঁর জীবনী-চিত্রকর তাঁকে

> মল্লানামশনি নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
> গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা
> স্বপিত্রোঃ শিশুঃ মৃত্যুর্ভোজপতেঃ বিরাডবিদুষাং
> তত্ত্বং পরং যোগীনাম্ বৃষ্ণিনাম্ পর দেবতেতি
> বিদিত রঙ্গং গত সাগ্রহঃ

বলে উল্লেখ করে তাঁর বিরাট জীবনের অগণিত কাহিনী লিখলেন। মহাভারত ও ভাগবত জুড়ে সেই অগণিত কাহিনীর মধ্য দিয়ে যে বিরাট জীবন চিত্রিত হয়েছে, তা যতই বিরাট হোক আমাদের মত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষও তাঁকে প্রিয়জন বলে অন্তরের আনন্দের মধ্যে বোধ করতে পারে—এইখানেই তাঁর অনন্যত্ব। তিনি বিরাট হলেও ক্ষুদ্রের কাছে ধরা দিতে পারেন—তাই তিনি এত সুন্দর, এত অনুরাগ—তাই তাঁকে মনে করে চিত্ত দ্রবীভূত হয়, তাই তিনি সমস্তটুকু গ্রহণ করে সমস্তটুকুকে ভাগবত করে তোলেন—তাই মানুষ হয়েও 'অখিলরসামৃত-মূর্তি' তিনি

'অখিলাত্মার আত্মা', 'সর্বভূতাত্মভূতাত্মা', 'বিশ্বাশ্রয়'। তাঁকে আমরা স্মরণ করতে চাই যাতে করে বর্তমান যুগের পরস্পর বিপরীত সত্যের প্রকাশ-দ্বন্দ্বের মধ্যে সত্যের সমগ্র মূর্তিকে, কল্যাণ মূর্তিকে লাভ করে আমরা জ্ঞানে, কর্মে, প্রেমে, ভক্তিতে—ব্যক্তিতে ও জাতিতে—স্থিতি লাভ করতে পারি, বিশ্ব সুস্থ হতে পারে, অথচ তার অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। জয় হোক তাঁর, জয় হোক মানুষের!

শ্রীমতী রাধা

॥ শ্রীজগন্নাথ সাহা ॥

গোবিন্দ অধিকারীর শারী পাখী কৃষ্ণচূড়ার শিখি পাখার দেখিয়াছিল রাধা নাম। তাই গর্ব করিয়া বলিয়াছিল—"আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা", শারী তাহার গর্ব খর্ব করিয়া উত্তর দিয়াছিল—

"আমার রাধার নামটী তাতে লেখা
ঐ যে যায় গো দেখা—"

শারীর অঙ্গুলী নির্দেশে দৃষ্টি তুলিয়া বাংলার নরনারী সেদিন দেখিয়াছিল রাধানাম পাখার পাতায় বনে বনে, শুনিয়াছিল রাধানাম যমুনার কলস্বনে। বৃন্দাবনের ধূলি দিয়া রাধানাম অঙ্কে লিখিয়াছিল বাংলার বৈষ্ণব—'জয় রাধে' বলিয়া অন্তরের গোপন সুর ঘরে ঘরে নিবেদন করিয়াছিল ভিখারিণী বৈষ্ণবী।

কে এই রাধা? বিশ্ব মুগান্ত সাহিত্য দর্শন শাস্ত্র পুরাণ যাঁহার ছবি আঁকিয়াছে—কবির সুন্দর সৃষ্টি যাঁহাকে রসময়ী জানে রস নিবেদন করিয়াছে—ভক্তজন-হৃদয় যাঁহাকে আহ্লাদিনী শক্তি বলিয়া আহ্লাদিত হইয়াছে—কে তিনি? কি তাঁহার পরিচয়?

"জগত-মোহন কৃষ্ণ—তাঁহার মোহিনী
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী—
রাধা পূর্ণশক্তি—কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান
দুই বস্তু ভেদ নাহি—শাস্ত্র পরমাণ"

শ্রীমতী রাধার এই পরিচয়। কৃষ্ণ জগতকে মোহিত করিয়াছেন—রাধা মোহিত করিয়াছেন কৃষ্ণকে। রাধা শক্তি—কৃষ্ণ শক্তিমান। পরস্পর ভেদ নাই—দুই বস্তুই এক। শাস্ত্র ইহার প্রমাণ।

রাধা শক্তির উৎস কোথায়? কি এই শক্তি স্বরূপ? ভগবান সর্ব শক্তিমান—অনন্ত শক্তির অধিকারী তিনি। শক্তি ভোগে তাঁহার তৃপ্তি নাই—শক্তি প্রয়োগে তাঁহার আনন্দ নাই। হিরণ্যকশিপু, বলী, দশাননকে পরাজিত করিয়া—পরশুরামরূপে বিশ্বকে এক বিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া সর্ব শক্তিমান ভগবান অতৃপ্ত। তাইতো শক্তি-ভোগকে আনন্দ-ভোগে রূপায়িত করিবার কামনায় নিজে বিভক্ত হইয়া এক অংশ হইলেন প্রেমের আশ্রয় রূপিণী শ্রীমতী রাধা—অপর অংশ হইলেন প্রেমের বিষয় রূপ শ্রীকৃষ্ণ। অনন্ত শক্তি রূপান্তরিত হইল অনন্ত প্রেমে। শ্রীমতী রাধা এই রূপান্তরিত অনন্ত শক্তির ঘনীভূত প্রেম-মূর্তি। যাহা শক্তিরূপে কৃষ্ণের করায়ত্ত ছিল, প্রেমরূপে তাহাই কৃষ্ণকে অতিক্রম করিল। প্রেম শ্রেষ্ঠ শক্তি। ভগবান প্রেমকে নিজ বাক্ষস দেওয়া মহা-অঙ্গীকার চির অধিকার লিপি দিয়া নিজে নিঃস্ব হইলেন। শক্তি প্রেমের কাছে শুধু পরাজিত হইল না,—নিশ্চিহ্ন হইল। তাই রাধা-শক্তির স্বরূপ প্রকাশ করিয়া

কৃষ্ণ বলিলেন—

"পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব
রাধিকার প্রেম আমারে করায় উন্মত্ত
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল
যে বল আমারে করে সর্বদা বিহ্বল—"

ভগবানের অনন্তশক্তি-রাধারূপ প্রেমে রূপায়িত; আর প্রেম শক্তি হইতেও শক্তিশালী।

রাধানাম শুধু কৃষ্ণচূড়ায় ছিলনা। প্রলয়ের জলে যেদিন ভাসিয়া গিয়াছিল পৃথিবী—সেদিন মীনরূপধারী কেশব রক্ষা করিয়াছিলেন যে বেদকে—তাহারও এক স্থানে লিখিত আছে 'রাধো বিশাখে'। রাধাষ্টমীর কাহিনী আছে পদ্মপুরাণে। ভাগবত পুরাণ বহন করিতেছে রাসলীলার যুগল পদচিহ্ন। মহাভারতের যুগেও রাধানাম অনুকরণ করিয়াছে অধিরথ-ঘরণী রাধা। তাই মহাঋষি কর্ণও রাধেয়। বেদ পুরাণ মহাভারতের কোণে কোণে চরণস্পর্শ মাত্র দিয়া শ্রীমতী নৃত্য করিয়াছেন বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে—তাঁহার নূপুর নিক্কণ দোলা দিয়াছে বৈষ্ণব কবি জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মনে। তাইতো বৃন্দাবনের প্রতি ধূলিকণা রাধারাণীর চরণ-স্পর্শে ধন্য হইয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনেশ্বরী রূপে বরণ করিয়াছে।

কৃষ্ণের শতনাম রাখিয়াছে শতজনে। যেই নাম সেই কৃষ্ণ বলিয়াছে কৃষ্ণভক্তজনে। রাধা নাম কে রাখিয়াছে? যেই রাধা সেই কৃষ্ণ কে বলিয়াছে? আমার 'রা' (শব্দ) শ্রবণে যে আমার প্রতি 'ধা'-র (ধাবিত হয়) সেই রাধা—সকল বাঁধা ভাঙিয়া যে আমার কাছে ছুটিয়া আসে সেই তো রাধা—বলিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ নিজে। বিশ্বের ধারণাধার বলিয়াই বিশ্বপতি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর নাম রাখিলেন রাধা—নিজের নাম রাখিলেন রাধাকান্ত। আহ্লাদিনী প্রেমে আহ্লাদিত হইয়া কৃষ্ণের বাঁশী বাজিয়া উঠিল—

প্রেমেতে রাধিকা স্নেহেতে রাধিকা
রাধিকা আরতি পাশে
রাধারে ভজিয়া রাধাকান্ত নাম
পেয়েছি অনেক আশে

শক্তির নাম হইল রাধা—শক্তিমানের নাম হইল রাধাকান্ত।

গোলোকের সহস্রদল কমলের প্রতি পত্র কৃষ্ণলীলাভূমি। বৃন্দাবন-ধাম এই সহস্র পত্রের অন্যতম। দেবর্ষি নারদ আসিলেন বৃন্দাবনে নারায়ণের অনুসন্ধানে—দেখিলেন মোহন মুরলীধারী কৃষ্ণকে। বুঝিলেন—এইখানে আছেন নারায়ণী। বৃন্দাবন-লীলা শক্তি ও শক্তিমানের যুগল-লীলা। প্রেমের আশ্রয় রাধিকা ও বিষয় কৃষ্ণ এইখানে পরস্পর আলিঙ্গনে বাঁধা। খুঁজিতে খুঁজিতে নারদ নারায়ণীর সন্ধান পাইলেন বৃন্দাবনে অন্য গোপের ঘরে। দেখিলেন সোনার প্রতিমা শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী। সর্বজ্ঞ ঋষি হাসিয়া স্বর্গে পাড়ি দিলেন।

বস্তুর সূক্ষ্মতম অণু নগ্ন চোখে ধরা পড়ে না—প্রয়োজন অণুবীক্ষণের। বৃন্দাবনে যুগল রূপের দেহ'তীত সূক্ষ্মরূপ দেখিতে হইলেও ভক্তের চোখে প্রয়োজন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের। ঘনীভূত ভক্তির আতস কাঁচের ভিতর দিয়াই রাধা-তত্ত্ব প্রতিভাত। রাধা-তত্ত্ব না বুঝিলে বৃন্দাবনের রাসলীলার আস্বাদন অসম্ভব। শ্রীমতী রাধা নারী নহেন—পুরুষও নহেন। রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বান্ধবী নহেন, সখী নহেন। প্রেমিকা নহেন, প্রাণেশ্বরীও নহেন। তিনি শুধু প্রেমযাত্রী। প্রেম তিনি চাহেন না। ঘনীভূত প্রেমের মূর্তি রূপে তিনি কেবলি কৃষ্ণ-প্রেমের আশ্রয়। সমগ্র বিশ্বই রাধা—সমগ্র জীব-জগত শ্রীমতী রাধিকা। ভগবান আত্মশক্তিকে অপরাজের প্রেমে রূপান্তরিত করিয়া রাধারূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এই রাধা সমস্ত জীবকে শাশ্বত নারীত্ব শিক্ষা দিয়া বলিয়াছেন—মানুষ পশু পাখী কীট পতঙ্গ সকলেই নারী—একমাত্র পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই শাশ্বত পুরুষ। রাধার সাধনা নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিবার সাধনা। বিশ্বের মানুষকে এই সাধনায় দীক্ষা দিতেই ভগবান তাঁহার প্রেমগুরু শ্রীমতীকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সমগ্র বিশ্বই ব্রজধাম। যশোদা শ্রীদাম সুবল সখাদি জীবের প্রতিচ্ছবি। ইহারা সকলেই কৃষ্ণ-প্রেমের আশ্রয়। সকলেই নারী। সকলেই রাধা। আমরাও রাধা। ইহাই রাধা-তত্ত্ব। শ্রীমতীর নূপুর-ছন্দে বৃন্দাবনের আকাশ বাতাসে এই

রাধা-তত্ত্বের সর্ব্ব শুদ্ধতম কথাটী ঘোষিত হইয়াছে। রাধাপ্রেমে কামনা নাই, ক্রন্দন নাই। আছে শুধু দেওয়ার কথা—নিজেকে দান করিবার কথা। 'দেগা দাও' 'দেগা দাও' বলিয়া কখন প্রার্থনা রাধা-তত্ত্বে নাই। আছে শুধু শ্রীকৃষ্ণ নিজে আসিবেন—এই আত্মবিশ্বাস। আত্মদানের উপরেই এই আত্মবিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা।

শ্রীবৃন্দাবন ভগবানের লীলা-ভূমি। রাধাতত্ত্বের অণুবীক্ষণ চোখে বৃন্দাবনের প্রবেশ পথে আমরা এই লীলা বুঝিবার প্রয়াস পাইব। বুদ্ধি দিয়া লীলা বিশ্বাস না করিলে বৃন্দাবন দর্শন হইবে অন্ধের গজ দর্শন। ভগবৎলীলা-অবিশ্বাসীর চোখে বৃন্দাবন রসভূমি নয়,—মরুভূমি। শ্রীমতী রাধা ভগবানকে আহ্লাদিত করেন বলিয়াই আহ্লাদিনী। শক্তি ভোগে অতৃপ্ত ভগবান আনন্দ ভোগের কামনায় প্রেমরূপী রাধাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আনন্দের গোড়ার কথা প্রেম। প্রেমের আসল ছন্দ ভাব। ভাবের মূল সুর মহাভাব। প্রেম যখন শোভার সম্পদে পূর্ণ প্রস্ফুটিত, তখনই মহাভাবের বিকাশ শ্রীমতী রাধা এই মহাভাবের সহস্রদল বিকশিত কমল আপন শক্তি যখন প্রেমে রূপান্তরিত হইয়া রাধারূপে সহস্র চক্ষু মেলিয়া চাহিয়াছে—শ্রীভগবান তখন প্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন শ্রীবৃন্দাবনে। ইহাই লীলার কথা। প্রেমদাত্রী রাধাও শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ করিয়াছেন—লীলার সঙ্গিনী হইয়াছেন। ইহাই লীলার মূল সুর।

কর্ম্মচঞ্চল সংসারে আমরা কর্ম্মপাগল। কর্ম্মশক্তি নিঃশেষিত হইলেই মন প্রেম চাহে—আমরা প্রেমের বিষয় খুঁজিয়া মরি। শক্তি ভোগে অতৃপ্ত আমাদের অন্তর ডাকিয়া বলে—

"মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে আমি আর বাইতে
পারলাম না—"

আমরা তখন কর্ম্মশক্তির বোঝা বহিতে চাই না—ভালবাসিতে চাই। তাই তো নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়া আমাদের শেষ নিবেদন—

"—তুমি যে আমার আমি যে তোমার
সবলের চেয়ে বেশী আপনার
সবলের কাছে লাজনা সয়ে
এবারে তোমারে চিনেছি—"

বিশ্বের মানুষকে এই নিবেদন শিক্ষা দিতেই ভগবান যুগলরূপে বৃন্দাবনে আবির্ভূত। শ্রীমতী রাধা এই শিক্ষাদানের গুরু। বৃন্দাবনের রাধা ভক্তিরূপে জীবকে ভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন—রসময়ী রূপে ভগবানকে রস পরিবেশন করিয়াছেন। রাধা প্রেমে ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই—আছে শুধু বঁধুকে হারাইবার আশঙ্কা। তাই তো কাল মাণিকের মালা গলায় পরিয়া কানু-গুণ-যশগান কুঙ্কুমে বাঁধিয়া শ্রীমতী দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া সদর্পে গাহিয়াছেন—

"—আমার যখন করম যাউক তাহেনা ডরাই
মনের ভরমে পাছে বঁধুরে হারাই—"

ইহাই প্রেমের পথে মুক্তির সাধনা। শ্রীবৃন্দাবন এই সাধনার মহাপীঠস্থান। শ্রীমতী রাধা এই সাধনার অধিষ্ঠাত্রী মহাদেবী। বৃন্দাবনে আমরা কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিব না; রাধারাণীর চরণে দৃষ্টি ফিরাইলেই দেখিতে পাইব—'যেহি পদ পঙ্কজমুদারম্' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধূলি-বিলুণ্ঠিত। তাই তো বৃন্দাবনের মাটি শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলি নয়—রাধারাণীর পদরজঃ। বৃন্দাবন ধাম—রজঃধাম।

রাসলীলা রাধাতত্ত্বের পূর্ণরূপ। চক্রমণ্ডলের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া একাকী শ্রীমাধব। সুদর্শন নাই, ধনুর্ব্বাণ নাই, কুঠার নাই—আছে মোহন মুরলী দুই হাতে। কালো সঙ্গে পীত বসন, আরক্ত অধরে মৃদু হাসি। অনন্ত শক্তির অধিকারী আজ যাঁহার বাঁশীমাত্র হাতে অনন্ত প্রেমের বিষয়রূপে মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া। চতুর্দ্দিকে তাঁহার মণ্ডলাকারে পরিক্রমারত রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি।—

"অঙ্গনাম্ অঙ্গনাম্ অন্তরে মাধব
মাধবম্ মাধবম্ চান্তরে অঙ্গনা—"

প্রতিটী রাধিকার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ, প্রতিটী শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে শ্রীমতী রাধা

হথমে কল্পিতে মণ্ডলে মাধবঃ
বেণুনা সংযোগো দেবকী নন্দনঃ

মণ্ডলের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বেণুর সুরে ঐকতান গাহিতেছেন শ্রীমাধব। তিনি দেখিতেছেন—নিজে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। এক অংশ রাধা, অপর অংশ কৃষ্ণ। প্রেমের আশ্রয় ও প্রেমের বিষয়। শাশ্বত পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ নরনারীরূপে বিভক্ত হইয়া আলিঙ্গনাবদ্ধ। নিজের লীলা দেখিয়া নিজে হাসিতেছেন। বাঁশীর সুরে গাহিতেছেন 'যেই রাধা সেই রাধাকান্ত। আমারই শক্তি রাধারূপে প্রেমে রূপান্তরিত'। শক্তি ভোগে অতৃপ্ত মাধব তাই ছিন্নমস্তার মত নিজের প্রেমরসধারা নিজে আকণ্ঠ পান করিয়া তৃপ্তি পাইতেছেন। ইহাই রাসলীলার রহস্য। ইহাই রাধাবাদ। অন্ধ মানুষ ইহা না দেখিয়া হাসে—রসগ্রহণে অসমর্থ হইয়া অবিশ্বাস করে। নিত্য সুদর্শন-চক্রধারী নারায়ণ নিজে রসচক্রের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বংশীধারীরূপে বৃন্দাবনের মাটিতে যে লীলার চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছেন, কালের প্রচ্ছদ পটে তাহাই পুরুষোত্তমের শাশ্বত স্বাক্ষর। জটিলা কুটিলার দল এই স্বাক্ষর পড়িতে পারে না—।

বিশ্বের মানুষকে কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দিতেই ভগবান আপন শক্তিকে প্রেমময়ী রাধারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন—বৃন্দাবনের মাটিতে রাসচক্রের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়াইয়া মোহন মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিয়া মাটির মানুষকে রাধা হইবার আহ্বান জানাইয়াছেন। মানুষের কানে বাঁশীর সুরমাত্র পৌঁছিয়াছে—সুরের ভাবমিশ্রিত তত্ত্বকথাটী হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। শ্রীমতী রাধা ভক্তিরূপে মানুষের শিক্ষাগুরু—রসময়ীরূপে শ্রীকৃষ্ণের বাহ্যাবলম্বন। শ্রীবৃন্দাবন এই শিক্ষার মহাবিদ্যালয়। আমাদিগকে এই শিক্ষার দীক্ষা লইতে হইবে—রাধা হইবার সাধনা করিতে হইবে। রাধা গোবিন্দকে ভালবাসে—গোবিন্দও রাধাকে ভালবাসে। ভালবাসাই রস। গোবিন্দও রস। রাধাও রস। আমরা এই রসে ডুবিয়া যাইব। সব রসে রসময় হইবে। শ্রীবৃন্দাবন এই রসময় রসের অনুভূতি পূর্ণাহুতি। কৃষ্ণ রাধিকাময়। বৃন্দাবন রাধিকাময়। বিশ্ব রাধিকাময়।

ক্রমশঃ

আমড়া-দর্শন

॥ শ্রীমহীদাস ॥

শ্রাবণ মাসের সকাল বেলা, অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল। চা-পানের পর বোনটি এসে বললো, দাদা বাজারে যাও। আমি দূরান্তরের নেপথ্য দর্শনের দিকে চোখদুটো রেখেই বললাম, সে কি রে! আজ যে কেমন বৃষ্টি হচ্ছে, না গেলে চলেনা? আজকের দিনটা কোনরকমে চালিয়ে নে না।

হুঃ—তোমার আবার বৃষ্টি! সাইকেল করে চলে যাওনা, কতক্ষণ লাগবে? বলে থলেটা আমার কাছে রেখে দিয়ে চলে গেল।

একটু পরে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার বাঁধা দোকানী শচীনদার কাছ থেকেই আমি বেশী তরকারী কিনে থাকি। তাই পিছনে রোজের মত সেদিনও সাইকেলটা রেখে শচীনদার দিকে তরকারী কিনবার জন্য এগুলাম।

—আরে ও শচীনদা আমড়া কি দরে দিচ্ছেন?

—আট আনা সের বাবু।

—কি বললেন, আট আনা সের? হুঃ, বার আনা সের বললেই তো ভাল হতো। আর দু'দিন বাদেই একটা

সিকি বাড়িয়ে দিয়ে টাকা টাকা সের হাঁকাতে পারতেন। কথায় বলে, 'আমড়া আঁটি আর চামড়া, নেই কোন শাঁস', তারই আবার এত দাম?

—তা বাবু আর কইতে লাগবোনা। আর দুদিন পরেই টেকা টেকা সেরই খাওন লাগবো। মালই কিনতে পারতেছিনা কোনখানে। বার আনা সের ত বাজারে হইয়াই গ্যাছে। আমার নাগতা একটু বাসি; হেই লাগিল্ দিয়া দিতাছি। আইজই আবার কোলের বাজারে মাল আনতে যামু।

—তা আমড়ার এত দর বাড়লো কেন বলুন তো? গতবার যে চার আনা সের কিনে খেয়েছি।

আর বাবু, কোন্‌টার দাম না বাড়ছে; বেবাক জিনিষেরই ত দাম বাড়ছে। আমড়ার আর ক্ষতিটা কি করল? বলে দাঁত দু'পাটি বের করে হাসতে হাসতে আমার দিকে চেয়ে রইল।

শচীনদা লোকটাকে আমার মন্দ লাগেনা। কোন রকম খারাপ মাল ও আমাকে কোনদিন দেয়নি। খারাপ হ'লে আগেই বলে দেয়, এইডা আপনেরে দিমুনা বাবু। দিয়া তারপরে গাইল শুদম্ ক্যান। এর খরিদ্দার আলাদা আছে বাবু, এইসব বলেই বিদায় করে দেয়।

ওর পাশেই বসে আর এক তরকারীওয়ালা। সে আমায় ডেকে বললে, বাবু—এখানে আমার একটা কথা আছে, সেটা যদি শোনেন তো বলি।

আমি খানিকটা ওর দিকে এগিয়ে বললাম, হ্যাঁ মাখন, যদি কথা শুনতে দাম না দিতে হয় তবে বলতে পারো।

—না বাবু, দাম লাগবে না তবে দু'টো মিনিট বসতে হবে।

শচীনদা একখানি তরকারীর খালি বস্তা দু'ভাঁজ করে দু'জনের মাঝখানে পেতে দিয়ে বললো, স্থান বাবু, এ'ডাতে উপরে বসেন। ঘটি আর কত কারে? বাবুরে বইতে কইছস্ কিন্তু বওনের দিছস নি? কমু আর কি বাবু, ঘটিগো আর বুদ্ধি-টুদ্ধি অইবনা।

মাখন আমার দিকে চেয়ে যেন একটা নালিশের সুরেই বললো, দেখুন বাবু—কেমন করে ও আমাকে ঘটি ঘটি বলে; অথচ ওকে একবার বাঙ্গাল বললেই কিন্তু রেগে টেগে একেবারে আগুন।

—আরে ব্যাটা, আমরা বাঙ্গালই হই আর যাই হইনা, আমাগো মতন ভদ্রতা শিখতে তরগো আর একশ বছর লাগবো।

যদিও ওদের মধ্যে একটা কৃত্রিম ঝগড়া হচ্ছিল, তবুও আমি তৃতীয় পক্ষ নিয়েই বললাম, থাক্ শচীনদা, এখানে আর মিছেমিছি ঝগড়ার দরকার কি? ওদের দেশ নিয়ে বলতে নেই শচীনদা। আর এটা তো আপনার বাড়ী নয়, বাড়ী গেলে না হয় বসতে দিয়ে, চা-পান দিয়ে বেশ করে ভদ্রতা করবেন। তারপর আমি পেতে দেওয়া ওই বস্তাটার ওপর গিয়ে বসে বললাম, বল মাখন, এবার তোমার কি নালিশ শুনি।

—আচ্ছা বাবু, আপনারা তো বলেন, আমড়া আঁটি আর চামড়া, নেই কোন শাঁস! আমি বলি কি ওর ভিতর যদি কোন শাঁস না থাকবে, তবে আপনারা আমড়া কেনেন কেন? আর আমড়ার এত দরই বা বাড়ে কেন?

হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—মাখন! এই কথাটার জন্যে বলবার এত তোড়-জোড়! আমি ভাবছিলাম তুমি কি জানি একটা বলে বসবে আমাকে। তা শাঁস যে নেই এ কথাটা আমি অস্বীকার করবো কি করে? এ যেন তুমি একটা শিশুর মত প্রশ্ন করলে।

আমার হাসি ও হাব-ভাব দেখে মাখন আগের থেকে কিছুটা দমে গেল। নীচু গলায় বললে, না বাবু—আমি তো বুঝতে পারছিনা,—আমড়ার কি করে শাঁস নেই।

—কেন তুমি একটা আমড়ার খোসা ছাড়াও, দেখবে ওর আঁটিটা বেরিয়ে পড়েছে; শাঁস বলে কিছুই দেখতে পাবেনা। এটা তো আর বিদ্যে-বুদ্ধির প্রয়োজন নেই,—ইচ্ছা করলে এখনই দেখতে পার।

বেশ তাই যদি হয়, তবে আপনারা আমড়া কেনেন কেন? আমড়া যে আপনারা খান ওটা তাহলে মিথ্যা? এবং আমড়ার কোন গুণ নেই এটাই সেদিবালে বলতে হয়? বলে দাঁত বের করে সে হাসতে লাগলো।

আমি বললাম, না—ঠিক তা নয়। তবে ওটার গুণও

যে খুব একটা আছে তাও নয়।

বেশ, তবে ওটার রস আছে বলুন। এটা আপনার বলতেই হবে।

হ্যাঁ,—রস আছে। রস না থাকলে তো মানুষে ওটা খেতোই না। বলতেই মাখন সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিয়ে বললে, হয়েছে শচীনদা, এবার বাবু স্বীকার করলেন তো?

ওর শেষের দিকের হাসি ও কথাগুলো আমার ভাল লাগছিলো না, মনে মনে এই মূর্খের ওপর বেশ রাগ হচ্ছিল। কিন্তু আমি বেশ বিজ্ঞের মতোই উত্তর দিলাম, মাখন,—এই জগতটাও যে মায়া, এই সংসারটাও যে মিথ্যা, একথা আমরা বেশ ভাল করেই জানি। অথচ এই মায়া ছাড়তে পারছি না। আমড়া বস্তুটাও ঠিক তাই।

ওসব সংসার-টংসারের কথা রাখ দিন বাবু, আমি ওসব বুঝি না। আপনার সঙ্গে তর্ক করে পারবো না। ওর কথা শেষ হতে না হতেই শচীনদা হঠাৎ জোর করে একটা হাততালি দিয়ে, ডান হাতের তর্জনীটা নাড়িয়ে, চোখ দুটোকে বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, এইবার আমি একটা কথা কইমু বাবু, আপনে মোডেও রাগব্যাইন না কইয়া লন আগে।

—না আমি রাগবোনা, আপনি বলুন।

—সাধু-সন্ন্যাসীরা হইছে সব ব্যাটা বেইমান, নিমক-হারাম। এরা খালি বুজরুগি কথা কয়। এখন বামুনেরাও তেমনি বজ্জাত হইছে। বামুনের ছাওয়ালরা গলায় সুদাই একটা সুতা রেয়। গায়ত্তিও জানে না, সন্ধা-আহ্নিকও করে না। রেষ্টুরেণ্টে খায়, মদ খায়, আর মায়াগোলগে বস্তু পাতে। এজা ঠিক কথা জানবাইন, এখন সাধু-সন্ন্যাসী-বামুন সব ব্যাটাই বজ্জাত।

শচীনদার এই কড়া কড়া কথা ঠিক ভাল লাগল না। আমার নীরবতা দেখে শচীনদা বলে চলল—

আমি কই কি বাবু, আপনারা যে জগতটারে মিথ্যা কন, মায়া কন, তবে এই জগতের যেবাকই ত মিথ্যা। আপনের আমার গ্যান-কম্ম-ভক্তি সবই ত মিথ্যা। আপনের আমার কথাডাও মিথ্যা? কি কন ঠিক কইলাম, কি বেঠিক কইলাম? বলে তারা হাসির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি ওর সব কথাই শুনছিলাম, কিন্তু নিমকহারাম—বেইমান কথাটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না। আস্তে আস্তে গম্ভীরভাবে উত্তর দিলাম, এতো বাজারে বসে ঠিক উত্তর হয় না। আপনি যেরকম করে সকলকেই নিমকহারাম বেইমান বললেন সাধু-সন্ন্যাসীর নামে, তাকি ভালো হলো? সকলকেই একদলে ফেলা অন্যায়। শচীনদা আমাকে শান্ত করবার জন্যেই বললো, হুঃ বাবু, এডা তো অন্যায়ই, বড় অন্যাই কইয়া ফেলাইছি। তবে আমি মহাপুরুষগো নামে কমু ক্যান্। আমি কইতেছি কি—এই জগতে থাকমু, খামু, এই জগতের সবই নিমু আর এই জগত ছাড়া যখন কোনখানে যাইবার পারমু না, তখন এই জগতটারে মিথ্যা কই ক্যান? বামুনেরা আমাগো লগে আমাগোরো মতই থাকব, চলব, অথচ কইব যে তারা আলাদা। এগুলা মিথ্যা বুজরুগী না?

আমার আর বেশী কথা বলবার ইচ্ছা ছিল না। তবুও শচীনদার পীড়াপীড়িতে বলতেই হলো। না—শচীনদা, মহাপুরুষদের বাণী কখনও লঙ্ঘন করতে নেই। তাঁরা সারা জীবন সাধনা করে, সিদ্ধিলাভ করে এসব বাণী দিয়ে গিয়েছেন। তাঁরা আপনার আমার মতো সাধারণ মানুষ নন একথা আপনার মানতেই হবে। বলে আমি উঠবার উপক্রম করতে মাখন জোড়হাত করে বললো, বাবু, আমাদের কথায় যেন রাগ করবেন না। আমরা মূর্খ মানুষ, কিবা বুঝি?

হ্যাঁরে মাখন, বাবুরে একটা চা আইন্যা দেনা। বাবু যে আবার বিড়ি-সিগেরেট খায় না। বলে ক'টা পয়সা মাখনের দিকে ছুড়ে দিল।

এদিকে বৃষ্টির জন্য বাজার একরকম বন্ধ। খরিদ্দার একেবারেই নেই বলতে হয়। তাই শচীনদা আমাকে আরও পেয়ে বসলো। আমাকে জোর করেই আবার টেনে বসিয়ে বললো, বাবু, আপনাদের লগে দুইডা ধম্ম-কথা কইলে, একটু গল্প করলে ভাল লাগে। বেশ লাইগ্যাই একটু বইতে কই আর কি। আর এই বৃষ্টিতে কিজ্যা বাড়ীতেই যাইবেন ক্যান, বসেন।

না—বৃষ্টি হলেও যেতে তো হবে। কাজেই বাজারও

দরকার। তবে আপনার চা আসুক, খেয়েই যাবো, বলে আবার বসে পড়লাম।

শচীনদাও আবার আরম্ভ করলো—আমি কই কি বাবু, আমড়া যখন আমার না অইলে চলে না, তখন আমি এইভারে আঁটি আর চামড়া কইমু ক্যান? কোন জিনিষের ভিতরে শাঁস না থাকলে কি হেইডা কামে লাগে না? হেই রকম আপনে আমড়াই কন, আর সংসারই কন, সার পদার্থ সবডার ভিতরেই আছে, কোনডা আমরা চক্ষে দ্যাখতে পাই, আর কোনডা দ্যাখতে পাই না। এমন সময় মাখন চা-হাতে এসে বললো, আপনি বাবুর সাথে আবার ঝগড়া আরম্ভ করেছেন? না বাবে বাবে ঝগড়া করমু ক্যান, কেবল তত্ত্বকথা কইতাছি। এর পর আমি চায়ে চুমুক দিতে সে আবার আরম্ভ করলো, এমন কি আমরা যে বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান পাই হেইগুলিওতো এই জগতের? কি কন?—

হাঁ, তাও ঠিক কথাই বলেছেন।

বেশ, তা কন, এই মিথ্যা জগত অইতে পাইছি যে বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান হেইয়াও মিথ্যা? তাই কই এই মিথ্যা সংসারে পাওয়া মিথ্যা জ্ঞান দিয়া যে কথাডা কইমু হেইডা মিথ্যা, না সংসারডা মিথ্যা?

আচ্ছা—আজ অনেক হয়েছে শচীনদা এখন উঠি। চা-ও শেষ হলো, বৃষ্টিও থামলো আর কি?

হুঁ-বাবু এখন ত যাওন লাগেই। তা আমার আমড়া লইয়া যান না, যে আমড়া লইয়া এত কথা কইলাম। স্থান, আপনে না নিলেও আমি দিমু; আপনের লগে ত আর আমার দামের সম্পর্ক না। এই বলে একসের আমড়া আমার থলিতে দিয়ে বললো, এখন যান গিয়া, পরসা এখন দিমুনা। ওখান থেকে বিদায় নিবার সময় মাখন অনুনয়ের ভাবেই নমস্কার জানালো। তার পর দু'এক পদ অগ্রসর হয়ে ভাড়াতাড়ি থলেটা পৌঁছে দিয়ে সাইকেলে আবার চললাম অবধূত মহারাজের আশ্রমে।

গুরুদেব আরও দুই তিন জনের সঙ্গে তখন কথা বলছিলেন, আমাকে দেখেই একটা বিশেষ কিছু প্রসঙ্গের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে চেয়ে রইলেন। আমি বসে হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁর কাছে শচীনদাদের কথা আনুপূর্বিক জানালাম। তিনি ধীর-স্থির ও সশ্রদ্ধ মূর্তিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, এর জন্য তুমি বৃষ্টিতে ভিজে এসেছো এখানে? এ তো অনেক কথা—এটা তো ঠিকই যে, তুমি যদি পচা জিম খেয়ে হজম করতে পার, তবে সে জিমকে পচা না বলে তোমার পক্ষে ভাল বলাই সঙ্গত? হজম করতে না পারলেই সংসারকে মিথ্যা বলতে হয়,—দোষটা সংসারে নেই, দোষটা রয়েছে হজম শক্তিতে।—

সাময়িকী

জন্মাষ্টমী ঃ শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম ভারতবাসীর জীবনে একটী অতি স্মরণীয় ঘটনা। স্মরণীয় ঘটনা সন্দেহ নাই, কিন্তু এমন একটী বীর্যবান মানুষকে যে আমরা সত্যিকার স্মরণ রাখি নাই, ইহাতেও সন্দেহ নাই। তাহা হইলে আমরাও বীর্যবান হইতাম। আজও আমরা সচেতন হই যেন—শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ আমাদের যেন কতকগুলি শুধু আচার অনুষ্ঠানমাত্র না হয়। সমস্ত ভারতবর্ষ নানাভাবেই আজ তাঁহাকে স্মরণ করিবে—শ্রীকৃষ্ণকে যেন আমরা শুধু আধ্যাত্মিক বা পারলৌকিক মুক্তির জন্য স্মরণ না করি। বহু সমস্যাময় এই বাস্তব জীবনটাকে কি ভাবে চালাইতে তাহাই শিখিবার জন্য যেন তাঁহার জীবন হইতে লাভ করি—আজিকার দিনে ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। কেন না পারলৌকিক মুক্তি অপেক্ষা এই বাস্তব জীবনে সজ্ঘবদ্ধ, মুক্ত ও আনন্দময় জীবন কি ভাবে লাভ করা যায় তাহার কৌশল শিক্ষা দিতে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর দ্বিতীয় বান্ধব নাই—কৃষ্ণ-জীবনের এই প্রয়োজনের কথাটাই আজকের দিনে আমাদের নিকট তুলিয়া ধরিলেন শ্রীনিত্যগোপাল, শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ। নরনারায়ণ আশ্রম তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বদরবারে পৌঁছাইয়া দিবার দুরূহ ব্রত আজ আবার গ্রহণ করিতেছে।

জন্মাষ্টমী দিনে নরনারায়ণ আশ্রমে শ্রীকৃষ্ণ-কথা শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ যেভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আস্বাদিত ও আলোচিত হইয়াছে। শ্রীমান যোগেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী স্বরচিত যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিল, তাহার অনেকখানি নীচে উদ্ধৃত করিলাম—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ভগবানের আবির্ভাব হয় তখনই, যখন ধরার মানুষ দিক্‌ভ্রান্ত প্রপীড়িত, যখন চারিদিকে অরাজকতার সৃষ্টি হয়, শাসন ব্যবস্থা বিফল হইয়া পড়ে, মানুষ অন্ধের পূজারী হয়। ঠিক তেমনি এক অবস্থার মধ্যে এই ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা-অষ্টমী তিথীতে যখন প্রবল ঝড়-বাদল হইতেছিল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত হইতেছিল, তটিনী তরঙ্গের শব্দ নগরের কর্ণগোচর হইতেছিল, নগরবাসী গৃহহীন হইবার আশঙ্কায় জাগা গণনা করিতেছিল, তখন কংসের কারাগারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন। কেন? তাঁহাকে তো আমরা সকলে ভগবান আখ্যা দিই, তিনি তো সবই করিতে পারিতেন, তিনি এই দুর্যোগের সময়ে অবতরণ করিলেন কেন? রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া তিনি শত্রুর কারাগারে দেখা দিলেন কেন? পূর্ণিমা চন্দ্রের কথা কি তিনি জানতেন না? বসন্ত কোথায় ছিল তখন? তাঁহার আবির্ভাবের সময়ে প্রপীড়িতা—আতুরা জননী কারাগারে শৃঙ্খল বন্দিনী কেন? কেনই বা মুহুর্মুহুঃ বজ্রপাত ও বারিবর্ষণের মাঝে তিনি আসিলেন? যশোদার গৃহে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিতে যমুনার উত্তাল তরঙ্গে রাজা বসুদেব পর্যন্ত দিক্‌ভ্রান্ত। কেন? তাঁহার জন্য কি কিছুই ছিল না? ছিল, সবই ছিল। তবে কেন তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানুষের সৃষ্ট দুর্যোগের রূপটী বাছিয়া লইয়াছিলেন এইটাই আজ আমাদের বিশেষ করিয়া লক্ষণীয়।

যিনি সকল দুর্যোগকে দুর্যোগ রাখিয়াই সুযোগের সন্ধান দিতে পারেন, তিনিই ভগবান, তিনিই কৃষ্ণ। তাঁহার জীবনই দুর্যোগঘন, বিপ্লবঘন। ভিতরের ও বাহিরের সকল দুর্যোগকে কেমন করিয়া হজম করা যায়, এই তত্ত্বই তাঁহার আবির্ভাবের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আবির্ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তর্ধান পর্যন্ত সারা জীবন বিপ্লব করিয়া তিনি ধরার মানুষকে একটা নূতন তত্ত্ব দিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক মানুষ আমরা তাঁহার এই তত্ত্ব আজও পর্যন্ত লইতে পারিয়াছি কি? কয়েক হাজার বৎসর ধরিয়া এই বিশ্বের বুকে কত মহাপুরুষ, কত অবতারই তো আসিয়াছেন, কত আলোই না ছড়াইয়াছেন আমাদের মাঝে! ফুলের রূপে, বর্ণে

ও গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া কীট আসে ফুলকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিবার জন্য। আমরাও তাঁহাদের আলোকে আকৃষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়কে শাইবার লোভে তাঁহাদের উজ্জ্বল-আলোক স্বরূপ জীবন-বাণী-গুচ্ছকে খণ্ড খণ্ড করিয়া মাথে মাংসে প্রাচীর গাঁথিয়া বসিয়া আছি। ফলে আমাদের মস্তকোপরি হাইড্রোজেন আজ দোদুল্যমান। আমরা ভারতবাসী হইয়াও এইটা বুঝিনা যে, সূর্যের অন্তরে আলোদানের মত ব্রহ্মলীলাতত্ত্ব কেমন করিয়া বিশ্বের বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিশ্ব-শান্তির বীজ ব্রহ্মেই প্রথম রোপন করা হয়। জমিদারের জমিদারী প্রথা আজ নাই। ধনীত্ব, জাতিত্ব, কুলীনত্ব, ব্রাহ্মণত্ব ইত্যাদি আজ আর কেহ স্বীকার করে না। রাজতন্ত্র একেবারে না থাকিলেও নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আজ শাসন-যন্ত্র হাতে পাইয়াছে। অবহমান কালের শোষিত নারীর নারীত্ব আজ স্বীকৃত হইয়াছে। শিক্ষায় ও চাকুরীতে আজ তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সমস্তের পিছনেই রহিয়াছে কৃষ্ণ-প্রেরণা।

আমরা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মাঝে অসংখ্য আড়াল-প্রাচীর গড়িয়া তাঁহাকে কেহ দেখি অর্জুনের রথের সারথি-রূপে, কেহ দেখি দ্বারকার রাজা, কেহ গোপীগণের চূড়ামণি-রূপে, কেহ বা কংস-শিশুপালের সংহারকরূপে, কেহ বা দেখি শ্রীরাম-সুদামের সঙ্গে খেলায় রত আবার কেহ বা দেখি ননীচোরারবেশে যশোদার শাসনে দৃঙ্খল-বন্ধী অবস্থায় দুষ্টু শিশুটীর মতন। "কৃষ্ণ কেমন? যার কাছে যেমন।" খুবই সত্য যে, আমরা খণ্ড দৃষ্টিতেই তাঁহাকে সাজাইয়া থাকি। কিন্তু এক কৃষ্ণই যে সব, তিনি যে সর্ব্ব বিশেষিত এই ধারণা আমাদের মনে জাগিলেও জীবন দিয়া বুঝিতে চাহি না। তাই আমরা কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্মী, আর কেহ বা ভক্ত। জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমন্বয় রূপই যে কৃষ্ণ ইহা আমরা মুখে স্বীকার করিলেও জীবন দিয়া মানিতে চাহি না। বিদ্যার দেশ, জ্ঞানের দেশ ভারতবর্ষ; আর কর্মের দেশ, অবিদ্যার দেশ ইউরোপ এই বলিয়াই না আমরা বাহাদুরী করি? তবে এত জ্ঞান-ভক্তি থাকিতে আমরা সুদীর্ঘ দুই শত বৎসর ইংরাজের পাদুকা বহন করিয়া আসিয়াছি! কেন? কি ইহার কারণ? ইহার উত্তর কি আজ ভারতবর্ষ দিতে পারিবে? 'অয়নপাত ধর্ম্মস্য ব্রাহ্মতো বহতো ভয়াৎ'—এত জ্ঞান-ভক্তির দেশ ভারতবর্ষের মাথেরা আজও অতীতের দুঃস্বপ্নের আতঙ্কে শিশুদের "বর্গী এলো দেশে" ছড়ায় ঘুম পাড়ান। বর্গীর আতঙ্ক কি আজও আমাদের নাই? কোথায় ভারতবর্ষ, তোমার এত অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন? ধর্ম্মের নামে এত অষ্ট প্রহর নামকীর্ত্তনে মহাভয়ের স্থলে কিঞ্চিৎ ভয়ও কি ভারতবর্ষের দূর হইয়াছে? আর এত ধার্মিক হইয়া ভারতবর্ষ ম্লেচ্ছের পাদুকা শিরে বহন করিল? এই সমস্যা সমাধান-কল্পে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ এক নূতন পুরুষোত্তম পথ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু 'সত্ত্বগুণের দুরাধারী' ভারতবর্ষ কুসংস্কার ত্যাগ করিবে কি প্রকারে? রাজনীতিতে আমরা নূতন নূতন সাম্যবাদের বুলি আওড়াইতে পারি। কিন্তু ভারত-বর্ষের শ্রীকৃষ্ণের সাম্যবাদের খোঁজ না রাখিয়া আজ আমরা লক্ষ্য-ভ্রষ্ট, পথভ্রষ্ট। তাই না আমাদের কৃষ্ণনীতি ও রাজনীতি পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। এই খানেই স্বামীজীর জিজ্ঞাসা, 'কয়জন এ জগতে সত্ত্বগুণ লাভ করে, এ ভারতে কয়জন'? আবার এঁরাই তমগুণকে একেবারেই দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়াছেন। 'নিদ্রালস্য প্রমাদোত্থং তৎ-তামসমুদাহৃতম্।" আমাদের দেশের সত্ত্বগুণীরা কি নিদ্রাও পরিত্যাগ করিয়াছেন? এই রকম কথাও নাকি তাঁহারা প্রচার করেন যে, "জ্ঞানীর চক্ষু দিয়ে কখনও জল পড়বে না; আগুন বেরোবে। যাঁদের চোখ দিয়ে জল বের হয় তাঁরা মায়ায় আবদ্ধ।" কেন? বৃন্দাবন ত্যাগের প্রাক্কালে কি কৃষ্ণের অশ্রুপাত হয় নাই? গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কি নেত্রানলেই নবদ্বীপে প্লাবন তুলিয়াছিলেন? তাঁহাদের কি জ্ঞান ছিল না? আজ চাই আমাদের সত্ত্বগুণ, চাই রজোগুণ চাই তমোগুণ। চাই সহভাবে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি।

আমরা কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্মী, কেহ বা ভক্ত হইতে চাই। জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সহযোগে সেই এক 'মানুষ'

হইতে চাই না, যাহা হইলে সব হওয়া যাইত। এই একদেশদর্শীতার ফলে বিশ্ব আজ আঘাতে আঘাতে প্রান্ত-ক্লান্ত। তাই আজ আমাদের মানুষ হইবার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। এই সুদিন ও দুর্দিনের মিশ্র শুভ লগ্নে পূর্ণতম এক-মানুষ শ্রীকৃষ্ণ-জীবনকে অনুসরণ করিয়া আমরা ধন্য হইব।

পনেরই আগস্ট

১৫ই আগস্ট, ১৯৬১ ভারতবর্ষে তাহার চতুর্দশ স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিনটীকে পালন করিয়াছে। ভারতবাসী প্রত্যেকের কাছে এই দিনটী কতটা মূল্যবান, তাহা সে-ই স্মরণ করিতে পারিবে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা না-থাকার জ্বালা যাহার স্মরণ আছে। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাই সবখানি কথা নয়, এ যেমন অতি সত্য কথা তেমনি ইহারও মূল্য অনেকখানি একথা মনে রাখিয়া আমরা আমাদের সকল চলাফেরাকে নিয়ন্ত্রিত করিব। এই স্বাধীনতা যাহাতে আমাদের কোন কর্ম-ধারাই ব্যাহত না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আমরা সেই সংকল্প গ্রহণ করি; সেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দরকার, যে সামগ্রিক ভাবে একটা স্বাধীন ও যোগ্যতাসম্পন্ন চালচলন চিন্তাধারা দরকার, তাহাও যাহাতে জাতীয় চরিত্রে পরিস্ফুট হয়, তাহারও সংকল্প গ্রহণ করি।

বিগত ১৫ই আগস্ট তারিখে নরনারায়ণ বয়স্কা মহিলা শিক্ষাকেন্দ্রের মেয়েদের লইয়া সকাল ৮টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। মেয়েদের দ্বারা 'জনগণমনঅধিনায়ক' গান গাওয়ানো হয় এবং ১৫ই আগস্ট তারিখটী কি জন্য আমাদের নিকট এত আনন্দের তাহা তাহাদিগকে আদ্যোপান্ত বুঝাইয়া দেওয়া হয়। পরে তাহাদিগকে সামান্য মিষ্টি খাওয়ান হয়।

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম পোঃ দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

উদ্ধারত

শারদীয়া সংখ্যা

আশ্বিন, ১৮৮৩ শকাব্দ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

শ্রীশ্রীদুর্গা

শ্রীনিত্যগোপাল

শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা বল, দুর্গা দুর্গতিনাশিনী,
শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা বল, দুর্গা দুঃখনিবারিণী।

ভয়হরা ভবদারা ভৈরবী ভবানী,
হৈমবতী, হেমাঙ্গিনী, হরবিলাসিনী,
সাকারা আকারা তারা দুর্গা নিস্তারিণী।

মৃন্ময়ী চিন্ময়ী দুর্গা, দুর্গা মধুমর্দ্দনী,
চিদানন্দময়ী দুর্গা, দুর্গা দাক্ষায়ণী!

শুম্ভনিশুম্ভনাশিনী, মহিষ-মর্দ্দিনী,
শম্ভু-হৃদয়বাসিনী মুণ্ডমালিনী,
কৈলাসবাসিনী বামা, কৈবল্যধামিনী।

বিশ্বময়ী বিশ্বেশ্বরী গৌরী ভাগীশ্বরী,
দয়াময়ী দিগম্বরী শাম্ভবী শঙ্করী,
হরমনোরমা উমা, শ্যামা, শিবরাণী।

মহামায়া, যোগমায়া, যশোদানন্দিনী,
বিন্ধ্যাচল-নিবাসিনী, গণেশজননী,
রাজবালা, গিরিবালা, গিরীশমোহিনী।

গৌতমীয় তন্ত্রমতে (দুর্গা) শ্রীকৃষ্ণরূপিনী,
নারদপঞ্চরাত্র মতে (দুর্গা) শ্রীকৃষ্ণমোহিনী,
আনন্দময়ী অভয়া, দুর্গা আহ্লাদিনী।

'নমো নমঃ'

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
• • •
যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
• • • •
যা দেবী সর্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
• • • •
যা দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
• • • •
যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপরোক্ত মন্ত্রগুলির সঙ্গে আমরা বিশেষ-ভাবে পরিচিত। মন্ত্রগুলি খুবই সরল। ইহাদের মধ্যে কিরূপভাবে পুরুষোত্তম-কৃষ্টির গূঢ় তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমরা সর্বমঙ্গলা এই শারদীয়া মহাপূজার অবসরে আস্বাদন করিতে প্রয়াস পাইব। বর্ত্তমান যুগ পুরুষোত্তম-কৃষ্টিরই যুগ। পুরুষোত্তম-জীবনের ছাঁচে বিশ্বকে গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব আজ বিশ্ববাসী প্রতি মানবের উপর আসিয়াছে, বিশ্বসৃষ্টির দায়িত্ব আজ স্রষ্টার হাত হইতে সৃষ্টের হাতে বর্ত্তাইয়াছে। এই গুরুভার বহন করিবার পক্ষে উপরোক্ত শ্লোকগুলি মন্ত্রস্বরূপ।

দেবগণ হিমাচলে গেলেন এবং সেখানে দেবী বিষ্ণু-মায়ার স্তব করিলেন। সেই স্তবের মধ্য হইতেই আমরা কয়েকটি শ্লোক উপরে উদ্ধার করিয়াছি। যিনি দেবী বিষ্ণুমায়া, তিনিই গীতা-ভাগবতে 'যোগমায়া'; গীতায় ইনি 'আত্মমায়া' শব্দেও অভিহিতা। হিন্দুদর্শনে মায়া, মহামায়া ও যোগমায়া একার্থবাচক নহে। ঐ তিনটি শব্দ মনতত্ত্বের ভিন্ন পর্যায়ের ছোতনাই করে। ব্রহ্মের শক্তি মায়া, পরমাত্মার শক্তি মহামায়া, এবং ভগবানের শক্তি হইতেছেন যোগমায়া। ভগবান যোগমায়া উপা-শ্রয়েই রাসলীলা করিয়াছিলেন; মায়া বা মহামায়ার আশ্রয়ে রাস সম্ভব নয়। মায়ার স্তরে এই সৃষ্টির স্বাভাবিক মূল্য ছাড়া অপর কোনও মূল্যই থাকে না; ব্রহ্ম-জ্ঞানে তাই জগৎ 'মিথ্যা'। মায়া হইতেছেন ভগবান পুরুষোত্তমের যান্ত্রিকী (mechanical) প্রকৃতি; আর যোগমায়া হইতেছেন ভগবান পুরুষোত্তমের জীবনভূতা পরাপ্রকৃতি (organic nature)। মায়ার স্তরে পুরুষোত্তমই 'ব্রহ্মপদবাচ্য', যোগমায়ার স্তরেই মাত্র তিনি ভগবান পুরুষোত্তম। এই দুয়ের মধ্যবর্তী পর্যায়ে রহিয়াছেন পুরুষোত্তমের মহামায়া আলিঙ্গিত পরমাত্মরূপ। ইহাই বিভূতির ক্ষেত্র, ঐশ্বর্য্যের ক্ষেত্র। মায়ার স্তরে 'বুদ্ধির' কোনও পারমার্থিক মূল্য নাই; কাজেই ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছু প্রতি সাধকের পক্ষে নিদ্রা-ক্ষুধা-ছায়া-শক্তি-তৃষ্ণা হইতে আরম্ভ করিয়া ভ্রান্তি পর্যন্ত সবগুলিই হেয়, অতএব নিরোধ-যোগ্য; অথচ চণ্ডীর দেবতারা তো প্রাণ খুলিয়া ঐ সব বৃত্তিকে দেবী জ্ঞানে স্তব করিয়াছেন, উহাদের সর্বাত্মক রূপের সামনে পাঁচ পাঁচটি বার মস্তক অবনত করিয়াছেন। তিনি যেমন 'চেতনা ইতি অভিধীয়তে', তেমনি তিনি সর্বভূতের বুদ্ধিও বটেন, সর্ব ভূতের নিদ্রাও বটেন, সর্ব-ভূতের ক্ষুধা-তৃষ্ণাও বটেন, সর্বভূতের সর্ব বৃত্তিও বটেন। সর্বভূতের ভ্রান্তিরূপে আবার তিনিই সংস্থিতা। তাঁহাকে 'চেতনা' বলিয়া অভিহিত করিলেই চলিবে না; তিনি যে অচেতনও। তাই তিনি সর্বভূতের নিদ্রা। একাধারে তিনি চেতনা ও অচেতন, তিনি একাধারে বুদ্ধি ও ভ্রান্তি। তিনি একাধারে অতিসৌম্য ও অতিরুদ্র বলিয়াই তিনি 'জগৎপ্রতিষ্ঠা'। দেবগণ নমস্কার করিয়া বলিতেছেন:

অতি সৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ॥

তিনি মূর্তিমতী জগৎপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু একান্ত ব্রহ্মজ্ঞানে তো জগতের কোনও প্রতিষ্ঠা নাই। গতিধর্মই জগতের ধর্ম। ব্রহ্মজ্ঞান তো অগতি; সেখানে জগৎ কোথায়? একমাত্র যোগমায়ার স্তরে, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রেই স্থিতিগতির সমপ্রতিষ্ঠা, জগৎপ্রতিষ্ঠা।

যাহারা ব্রহ্মকে শুধু 'চৈতন্য' বলিয়া উপলব্ধি করেন, তাঁহারা বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া ভ্রান্তি পর্যন্ত সর্ব্ববৃত্তিরই নিরোধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীর আদর্শ পৃথক্। এমনই একটি স্তরের ধরণ চণ্ডী পৌঁছাইয়াছেন, যেখানে দাঁড়াইয়া চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভ্রান্তি সবই 'সর্ব্বাত্মিকা' ব্রহ্মময়ী রূপে উদ্ভাসিত হইতে পারে। সেখানে বুদ্ধি পারমার্থিকী, নিদ্রা পারমার্থিকী, ক্ষুধাতৃষ্ণা পারমার্থিকী, জীবনের সর্ব্ববৃত্তি পারমার্থিকী; এমন কি জীবনের সব ভ্রান্তিগুলি পর্য্যন্ত পারমার্থিকী।

কিন্তু সর্ব্বাগ্রে মনে রাখিতে হইবে যে, এই স্তরের সাধনা একটি ব্রহ্ম-মানুষের সংস্পর্শেই হইতে পারে। চণ্ডীতে দেবগণ তাই প্রত্যক্ষ জগতের বুকে প্রত্যক্ষ হিমালয় পর্ব্বতের কোলে লালিতপালিত স্বচ্ছন্দ জীবন লইয়া ক্রমবর্দ্ধমান একটি মানুষী মেয়ের শ্রীচরণ-তলেই এই অপরাজিতা সাধনার খোঁজ পাইয়াছিলেন। হিমালয়-দুহিতা পরব্রহ্ম-মহিষী উমাই অপরাজিতা। তাঁহারই উপাসনা কেনোপনিষদে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইনি হৈমবতী। মানুষী উমার বাহিরের সব সাধনা, সব সিদ্ধিই পরাজিতা; কেন না উহা ঐবদেশিকতা দোষে দুষ্ট। দ্বন্দ্বাতীতা ও দ্বন্দ্বসমন্বিতা মূর্ত্তির খবরই চণ্ডী বিশ্বদরবারে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

এই যোগমায়ার উপাসনা তখনই সম্ভব হয়, সাফল্যমণ্ডিত হয়, যখন মানুষ তাহার জীবনের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয় ও তুরীয়াতীত স্তর দ্বারা নমস্কার করে, ঐ সকল স্তরকে নোয়াইয়া দিয়া পরাশক্তিময় হইয়া পুরুষোত্তমের সঙ্গে দিব্যমৈথুন যোগে যোগী হয়। এই পাঁচটি স্তরের নমস্কার-সাধনা বুঝাইবার জন্যই স্তবের মধ্যে পাঁচবার নমঃ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে—'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ'। জাগ্রতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তোমায় নমস্কার, স্বপ্নের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তোমায় নমস্কার, সুষুপ্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী তোমায় নমস্কার, তুরীয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তোমায় নমস্কার, তুরীয়াতীত মানুষ-ঘন উমা তোমায় নমস্কার। তুরীয়াতীত মানুষী তনুর মধ্যেই জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তুরীয় সমন্বিত; দিব্য মানুষী তনুরই চারিটি দৃষ্টিকোণ ঐ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি ও তুরীয়। তুরীয় অর্থ চতুর্থ। যেখানে জাগ্রৎ-স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিনটি স্ব স্ব অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহাই তুরীয় চতুর্থ অবস্থা। আর তুরীয়াতীত অবস্থা হইতেছে সেই অবস্থা, যেখানে ঐ তিনটি পরস্পরের মধ্যে হারাইয়া এবং পরস্পরের মাঝে পরস্পরকে পাইয়া সমন্বিত। এই মহা-সমন্বয় সম্ভব হয় মানুষী তনুকে আশ্রয় করিয়াই। মানুষী তনুর গৌরব তাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। 'অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতম্'। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি ও তুরীয়ের দ্বন্দ্বমোহে মূঢ় যাহারা, তাহারা পুরুষোত্তমের মানুষী তনুর অবজ্ঞা করিবেই।

শ্লোকগুলির মধ্যে 'সর্ব্বভূতেষু' পদটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি যখন সর্ব্বভূতাস্থিতা হয়, তখনই তাহা হয় চিন্ময়ী। ব্যক্তিগত ক্ষুধা-তৃষ্ণাই জড়া। কিন্তু চণ্ডী জীবনের যে বা যে সর্ব্ববৃত্তিকেই 'সর্ব্ব-ভূতেষু' আস্বাদন করিবার ইঙ্গিত দিয়াছেন। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সব 'সর্ব্বভূতেষু' হইলেই হয় ব্রহ্মময়ী বৃত্তি।

এই মানুষী তনুকে স্থূলদেহ দ্বারা নমস্কার করিলে স্থূলদেহ বিশ্বরূপে গড়িয়া উঠে, বৈশ্বানরদেহতা প্রাপ্ত হয়, সাধক স্থূলভুক্ হয়। এই মানুষী তনুকে সূক্ষ্ম দেহ দ্বারা নমস্কার করিলে সাধকের দেহ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসদেহতা লাভ করে। এই মানুষী তনুকে কারণ শরীর দ্বারা নমস্কার করিলে এই দেহ আনন্দভুক্, চেতোমুখপ্রজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়। এই মানুষী তনুকে তুরীয় স্তর দ্বারা নমস্কার করিলে তাহা প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, শিব, অদ্বৈত, অব্যবহার্য্যরূপতা প্রাপ্ত হয় এবং তুরীয়াতীত স্তর দ্বারা নমস্কার করিলে প্রপঞ্চোপ-শম অব্যবহার্য্য স্তরই আবার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই প্রপঞ্চের দেশে সর্ব্বরূপ সর্ব্বরস সর্ব্বগন্ধ সর্ব্বস্পর্শ সর্ব্বশব্দ নিংড়াইয়া ঘনতমরূপে প্রকট হন। 'এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা সর্ব্বে ব্যাখ্যাতাঃ'—ব্রহ্মসূত্র। এই মানুষী তনুর মধ্যেই বিশ্বের সব মিলন, সব বিরোধ ব্যাখ্যাত হয়। মানুষের মধ্যে স্বর্গ-নরক ব্যাখ্যাত, মানুষের মধ্যে ইহকাল-পরকাল ব্যাখ্যাত। আমরা সর্ব্ব ব্যাখ্যানমূর্ত্তি পুরুষোত্তম-মহিষী, সচ্চিদানন্দময়ী, কৃষ্ণমন্ত্রেরও অধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীকে রক্তপ্লাবিত বিশ্বের নরনারী আজ সকল দেহ দিয়া নমস্কার করিতেছি, বরণ করিতেছি। মা, বিশ্বের বুকে তোমার রাতুল শ্রীপাদস্পর্শ বিশ্বকে ব্রহ্মরূপে গড়িয়া তুলুক। বন্দেমাতরম্ *

---

* ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা উদ্বোধন হইতে উদ্ধৃত।

মায়ের পূজা

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

ঘরে ঘরে মাতৃহৃদয় সন্তানের 'মা' ডাক শোনবার জন্য যেমন আকুল হয়, বিশ্ব-মায়ের হৃদয়ও বিশ্ব-সন্তানের 'মা' ডাক শোনবার জন্য এমনই আকুল হয়ে ওঠে। প্রতি ঘরের মা তার আপন সন্তানের 'মা' ডাক শুনতে চায়—বিশ্বমাতৃ-হৃদয় বিশ্বের সকল সন্তানের মা ডাক শোনবার জন্য ব্যাকুল। বিশ্ব-মায়ের সেই বিশ্ব-ক্ষুধা মেটাবার প্রয়াসে ভারতবর্ষের সাধকের মাতৃ-আরাধনা। কত যুগ ধরেই এ পূজা চলে আসছে। জীবন্ত সাধনার প্রয়োজনেই প্রথমে এ প্রচলন, কিন্তু কালের কালিমায় এর জীবন্ত সত্তা যায় লোপ পেয়ে, অর্থহীন আচারের বোঝা বয়ে সে তখন ভার হয়ে গড়িয়ে চলে।

তবু এ কল্পনাকে ত্যাগ করব না—বিশ্ব-মাতৃত্বের কল্পনা—বিশ্ব-মাতৃত্বের পূজা। মাতৃত্ব ক্ষুদ্র গৃহকে যেমন ঘরে রাখে, বিশ্ব-ভুবনকে তা ঘরে আছে, তাই বিশ্ব-মাতৃত্ব। এই বিশ্ব-মাতৃত্বের কল্পনা না থাকলে ঘরের কোণের মাতৃত্ব আসক্তি-জর্জরিত অসুন্দর চিত্তবৃত্তি। যে মাতৃ-হৃদয় আপন সন্তানকে নিজ মরণ দিয়ে রক্ষা করে, সেই হৃদয় যখন যে কারও সন্তানত্বকে কল্যাণকর অগ্রগতির মধ্যে নিজ মরণ দিয়ে রক্ষা করতে প্রয়াস পায়, তখন সে মর্ত্যে স্বর্গের সুষমাকে জন্মদান করে। এ পারা সহজ নয়, সাধারণও নয়, তবু এ প্রয়াস মানুষের মধ্যে না থাকলে মনুষ্যত্বের মানদণ্ড হীনতর হয়ে পড়ে। তাই বিশ্ব-মায়ের কল্পনা, বিশ্ব-মায়ের পূজা।

মানুষ যত বড়ই হোক, জ্ঞানে গুণে কর্মে নৈষ্কর্মে, নেতি-বাচক মনোবৃত্তিতেও—তবু যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ সেই শৈশবের অসহায়ত্ব তার মধ্যে নিঃশেষে মুছে যায় না। কখনও না কখনও শ্রান্ত ক্লান্ত অসহায় চিত্ত মাতৃ-হৃদয়ের ব্যাপকতর আশ্রয়ে নিজেকে স্থাপনা করতে চায়ই। চায় প্রত্যেকেই—তাই বিশ্ব-মাতৃত্বের কল্পনা, বিশ্ব-মায়ের পূজা। তাই যদিও প্রথম প্রচলনের জীবন্ত সৌন্দর্য আর এতে আজ নেই, তবু তাকে ফিরিয়ে আনবার প্রয়াসে এ বিশ্ব-মায়ের কল্পনাকে আমরা ধ্যান করব, অনুধ্যান করব, তৃপ্ত হব, শক্তিলাভ করব। মাতৃ-হৃদয়ের মাতৃত্বরূপানে একদিন যে অসহায় শিশু নিজের মধ্যে বিশ্বের মধ্যে দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করে নিয়েছিল, আজ জ্ঞান-বৃদ্ধ চিরন্তন শিশু বিশ্ব-মাতৃত্বে অবগাহন করে ব্যাপকতর গভীরতর জীবন-চেতনার শক্তি লাভ করে এগিয়ে চলবে।

তাই মায়ের পূজা। বৎসরে বৎসরে মায়ের পূজা—

বৎসরে একবার মাকে ভাল করে, বেশী করে পেতে চাই বলে বৎসরে একবার বড় করে ঘটা করে মায়ের পূজা করি। পূজা করার মধ্যে দেওয়ার কথা নিহিত আছে—মাকে পূজা করা অর্থ মাকে দেওয়া। কী দেওয়া? ফুলপাতা চন্দন, ধূপধূনগন্ধ, বস্ত্র বস্তু জিনিষপত্র দেওয়া? দেব, ক্ষতি কি? কিন্তু আরও কিছু দেবার আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পূজা কিন্তু আমরা ভারতবর্ষীয়েরাই করি, অথচ দিতে আমরাই ভুলে গেছি বলা চলে। পৃথিবীর অন্যান্য মানুষেরা নিজের জাতির জন্য কেবল যে প্রাণ দিতে পারে তা নয়, তার ব্যক্তিগত স্বার্থকে হাসিমুখে জাতীয় স্বার্থের কাছে বলি দেয়। নিজের জাতিকে সব দিক দিয়ে বড় করে তুলবার জন্য তারা যেমন অমানুষিক কায়িক শ্রম স্বীকার করতে পারে, তেমনি জাতিকে বড় করার জন্য জাতীয় চরিত্রে যে সব গুণ অপরিহার্য,—যেমন নির্লোভতা, সত্যনিষ্ঠতা, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলারক্ষা, সময়ানুবর্তিতা, পূজ্য ও শ্রদ্ধার্হকে সম্মান করার মত চরিত্রের বল প্রভৃতি—সেই সবও তারা আয়ত্ত করার জন্য প্রাণপণ করতে পারে। আর আমরা? আমরা ভারতবাসীরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত জীবনের যা কিছু যোগ্যতা অর্জনকে ধরে নিয়েছিলাম পারমার্থিক মুক্তিলাভের প্রয়োজনে—সংসারে

দশজনকে নিয়ে শান্তিতে সুখে আনন্দে বাস করবার জন্য দশজনের নানা যোগাযোগের প্রয়োজন হয়, এ কথা ভারতবাসী আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। তাই আমাদের অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে চরাচরমিদং সর্বংকে ব্রহ্মভাবে দেখার কথা জানলেও বাস্তব জীবনে নিকটতম প্রতিবেশীকেও আমরা আত্মা বলে দেখি না, আপন বলে জানিনা, নিজ বলে মনে করি না—এই যে অসামান্য ব্রহ্মসাধনার ক্ষেত্রে ও বাস্তব জীবনে ভারতীয় সমাজে দীর্ঘদিন চলে এসেছে, তার ফলে আজকের আমরা যেমন আত্মকেন্দ্রিক, তেমনি স্বার্থপর, তেমনি জাতীয়ত্ব চেতনাবিহীন, তেমনি সর্ব পাপের আকর। এই আমাদের দিয়ে বিশ্ব-মায়ের কী পূজা হবে? তবু 'ন শয়ানঃ পতত্যধঃ'—শুয়েই যারা আছি, তাদের আর পতনে ভয় কিসের? আমাদের আর পতন হবে না, এইবার আমরা উঠব। আর ভারতের তথা বিশ্বের প্রাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মতে মানুষের এমন কোনো পতন হতে পারে না, যেখান থেকে সে আবার না জীবন-পথে রওয়ানা হতে পারে। তাই আবার আমরা মানুষ হব—তাই মায়ের পূজা আমাদের করতেই হবে। মাকে দিতে হবে!

কী দেব?

সেই কত দিন আগেই ঋষি বঙ্কিম উপলব্ধি করেছিলেন মায়ের পূজার জীবন বলির থেকেও যা আরও প্রয়োজনীয়, তা হচ্ছে মাকে ভক্তি করতে হবে। মাকে ভক্তি করতে গেলেই নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও বিশ্বজনীন জীবনকে ঢেলে সাজতে হবে, আবার নতুন করে প্রথম থেকে রওনা হতে হবে একই সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান ও বাস্তবজীবনকে সমন্বিত রেখে। ভক্তি করতে তখনই পারব যখন নিজেকে দিতে পারব। দিতে পারা অর্থ নিজের বুদ্ধি, নিজের ভাল লাগা বা খেয়াল দিয়ে যেটাকে ভাল লাগল সেটাকেই একমাত্র শুদ্ধ জ্ঞানে হৈ হৈ না করা, বা তাতে লিপ্ত-বুদ্ধি না থেকে বৃহত্তর ও ব্যাপকতর জীবন-বোধকে গ্রহণ করা। এ যেমন ব্যক্তিগত জীবনে, তেমনি জাতীয় জীবনে। নিজেকে দিতে জানলেই অর্থাৎ ভক্তি করতে পারলেই জীবনে পূর্ণতা আসে, সমন্বয়বৃত্তিতা আসে, কর্মকে ফাঁকি দিয়ে, এড়িয়ে গিয়ে বা বাঁচিয়ে চলে মুখে আত্ম-শ্লাঘা বিস্তারের মনোবৃত্তি লোপ পায়, স্বার্থবোধের সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হয়ে বিশ্বের সকলকে আত্মবোধে দেখে, সকলের স্বার্থকে নিজ স্বার্থ বলে দেখবার প্রেরণা বোধ করে।

মাকে পূজা করার সময় এই সকল বোধ জাগ্রত করার সাধনা নিয়ে পূজা করতে হবে। এই ভক্তি করার, নিজেকে দেবার বোধ যদি জাগ্রত না হয়, তাহলে আমার ক্ষুদ্র আমিত্ব দিয়ে মাকে বুঝব কেমন করে? তিনি তো ক্ষুদ্র নন। আমার ঘরের মাকে যদি না আমার বুদ্ধি দিয়ে বুঝি বিশ্বমাতৃত্বকে আমার একেবারে ছোট্ট আমি দিয়ে কিছুই বুঝব না। তাই নিজেকে বড় করে চলতে হবে। শুধু আমার ব্যক্তি-আমির কাছে আমার মা যতটুকু ধরা পড়েছেন, তার থেকে আমার আমিত্বের সঙ্গে যখন আমার প্রতিবেশীর বা আমার ভাই-এর আমিত্ব যুক্ত হয়ে আমি খানিকটা বড় হব, তখন মা আমার কাছে আরও একটু বেশী প্রতিভাত হবেন। এমনি করে যতই নিজেকে বড় করে করে নিতে পারব, ততই দেখব, মাকে বুঝতে পারছি। যাঁর মধ্যে সর্ব বিধৃত আছে তিনিই তো বিশ্ব মা। এই মায়েরই কল্পনা করেছেন ভারতের সাধক—মানুষের সে কল্পনা যেমন ব্যাপক তেমনই গভীর। সমস্ত কাহিনী চুইয়ে এই কথাটাই ব্যক্ত হল যে, বিশ্ব থেকে, সর্বভূত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যারা বড় হতে চায় তারাই শুম্ভ নিশুম্ভ নামধেয়—খানিকটা দূর পর্যন্ত তারা ওঠে বটে, কিন্তু যে বিশ্বাত্মিকা সর্বভূতস্বরূপা শক্তি বা মাতৃত্ব সর্বভূতে চেতনা রূপে আছেন, যিনি সর্বভূতে বুদ্ধিরূপে আছেন, যিনি সর্বভূতে নিদ্রা-রূপে আছেন, যিনি ক্ষুধারূপে আছেন, ছায়ারূপে আছেন, সর্বভূতের যিনি শক্তি, সর্বভূতে যিনি তৃষ্ণারূপে আছেন, ক্ষান্তিরূপে আছেন, জাতিরূপে যিনি আছেন, আছেন লজ্জারূপে, শান্তিরূপে, শ্রদ্ধারূপে, কান্তিরূপে, লক্ষ্মীরূপে, বৃত্তিরূপে, স্মৃতিরূপে, দয়ারূপে, তুষ্টিরূপে, মাতৃরূপে, ভ্রান্তিরূপে আছেন অর্থাৎ সর্বভূতের সব কিছুতে যিনি ওতপ্রোত হয়ে আছেন, সর্বভূতকে ঘুরে রাখতে গিয়ে

সেই তাঁকেই অস্বীকার করে ফেলে তাঁর কাছে তাদের —সেই শুম্ভ নিশুম্ভদের—পরাজয় হবেই। 'সদসদ্ ব্যক্তিলাস্ত্রিকা' এই শক্তি 'অতিসৌম্যাতিরৌদ্রা', তিনিই 'জগৎ প্রতিষ্ঠা'র কারণ, আবার 'মুক্তের্হেতুভূতা' হয়ে তিনিই 'সংসারবন্ধহেতুশ্চ'। পরস্পর বিপরীত সমস্ত কিছু এই শক্তিই 'সর্বদেবশরীরজম্'—'ততঃ সমস্ত দেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবম্'।

—এতখানি ব্যাপক গভীর এই মাতৃত্ব কল্পনার মধ্যে যে বিশ্ব-বোধ ছিল, তা হারিয়ে ফেলেছিলাম বলেই বিশ্বের কাছে আমরা পরাজিত। এ মা শুধু পারমার্থিক মুক্তিদাত্রী মা নন—জগৎ প্রতিষ্ঠার কারণও যে তিনিই ছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁর এতখানি ব্যাপকতাকে ভুলে গিয়ে তাঁকে মুক্তির হেতুই করে রেখে ছিলাম, তাই জগতে আমাদের প্রতিষ্ঠা নেই, তাই ব্যক্তিগত লোভ, আসক্তি বিষের মত আমরা জর্জরিত, মায়ের অতিরূপের কল্পনা ধুয়ে মুছে গিয়েছিল কবে কোন্‌কালে। তাই আমরা 'মা' 'মা' করি বটে, বৎসরে বৎসরে পূজাও করি—কিন্তু মানুষ হই নি, হই না। হাজার বছরের পূজাতেও হই নি, আজ পঁচিশ বৎসর ধরে যে পূজা করছি, তাতেও হচ্ছি না। আমাদের ভিতরকার শুম্ভ-নিশুম্ভকে—আমাদের বিচ্ছিন্ন অহংকৃতভাবকে সর্বভূতের সেবায়, সর্বভূতের ধ্যানে, সর্বভূতের সংগঠনাত্মক মনোবৃত্তিতে মায়ের কাছে তুইয়ে দিতে না পারলে মানুষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আজকের বিশ্বের সাধনা ব্যক্তিগত নয়—সমাজ বা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই কেবল এ সত্য নয়—ধর্মের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত ধর্ম বলে কিছু নেই। ভারতবর্ষের কল্পনায় যে মাতৃমূর্তি উদ্ভাসিত হয়েছিল সেই কবে কোন্ সুদূর কালে, সে মাও ব্যক্তিগত মা নন, অথচ এ মায়ের ধ্যানেও বুক ভরে যায়। এমন একটী বিরাট কল্পনা আমরা বৎসরে একদিনও যদি সত্যি করে করি এবং করাই, তাহলেও আমাদের ক্ষুদ্রতা দূর হয়—তাহলেও জগতে মায়ের সন্তান বলে পরিচয় দেবার যোগ্যতা আমরা ভারতবাসী আবার লাভ করব। নইলে মা পুতুল হয়েই থাকলেন—আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে যার কোন সঙ্গতি ও প্রয়োজন থাকবে না। সে মায়ের পূজায় তাই এতকাল হয়ে এসেছে কুসংস্কারের কতকগুলি আচার আচরণ, আজকাল হয়ে আসছে হৈচৈ, বিশৃঙ্খলা, অর্থহীন, প্রাণহীন ঐ আচার আচরণই। তফাৎ খুব বেশী নেই।

কিন্তু সাধকের মাতৃত্বের কল্পনায় ত্রুটি ছিল না—আমরা বিরাট গভীর সেই মাতৃত্বকে বুঝতে চাই যিনি বিশ্বের মা হতে পারেন, যাঁর মধ্যে বিশ্বের সংঘর্ষমুখর জাতিগুলি মিলনের খোঁজ পেতে পারেন।

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতি

মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী—এই মায়ের মধ্যে সে মিলনের কথা আছে।

'মানুষ যখন জন্মায়, তখন তারি কোমল, তারি দুর্বল; কিন্তু যখন মরে তখন সে শক্ত ও কঠিন। অসুর ভঙ্গুর; কিন্তু মড়া গাছ যাতসহ ও সুকঠিন। সুতরাং কাঠিন্য ও দুর্মনীয়তা মৃত্যুর লক্ষণ; কোমলতা এবং দুর্বলতা জীবনের সহচর।'

—লাওৎসে

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৩)

১৩.৭.১৯৭৩—রবিবার সকাল

নিত্যগোপাল, সকল ছোটর মূল্য তুমি প্রকাশিলে, বিশ্বের ব্রহ্ম-মূল্য তুমি প্রকাশিলে। যাহা কিছু ছোট—কুলে শীলে জাতিতে—তুমি তাহার মূল্য দিয়াছ।...সতীর পাশাপাশি অসতও স্থান পাইয়াছে, স্থান পাইয়াছে সেই গোলাপ গয়লানীও···সমাজের সকল ছোট মানুষ তোমার দয়া পাইয়াছে। তুমি দয়াল, তুমি পতিতপাবন; সেই গরুর গাড়ীর গায়োয়ানকে কোল দিয়াছ—যাহা কিছু ওছা, উহ—সেই আলু-কুমড়া-কলার খোসা—তুমি ভালবাসিতে। তুমি বুঝিয়াছ, বুঝাইয়াছ সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম যদি দেখা ও ধরার কৌশল জানিয়া করা যায়—কোন শুদ্ধকর্মকৌলীন্য স্থাপন কর নাই। যাহাদের লইয়াছ তাহারা পচা গোবর—সেই পচা গোবরেই তুমি ঘুঁটে দিতে চাহিয়াছ, তুমি পচাগোবর কেবল ঘাটিয়া গিয়াছ—আমাদের প্রকৃতির বদল হয় নাই, সেই নোংরা, সেই নোংরাই রহিয়া গিয়াছি। তুমি সোনার মানুষ—আমায় মানুষ করিয়া দাও। আমি ব্রহ্ম-মানুষ হব। কত অনাদরে অযত্নে তুমি চলিয়া গিয়াছ, আমরা আদর করি নাই, যে যাহার পেয়ালে ছিলাম; জয় নিত্যগোপাল, জয় নিত্যগোপাল। যারা কোথাও আশ্রয় পায় নাই, তুমি তাদের আশ্রয় দিয়াছ। কত তারাপদ তোমার পায়ে আশ্রয় পাইয়াছে। তুমি যে স্নেহ করিয়াছ, যদি আমরা মানুষ হইতাম, তবে বর্তিয়া যাইতাম; আমরা পাষণ্ড, তাই মানুষ হই নাই।···তুমি আমাদের জন্য বসিয়া থাকিতে। নগেন প্রামাণিক···রাত···বারোটায় হুগলী পৌঁছায়, তুমি তার জন্য বসিয়া ছিলে। তুমি বিশ্বের গুরু, তুমি প্রাণ, তুমি প্রাণ। বুদ্ধিমান মানুষ প্রাণের কাছে ধরা দেয় না।···সকলে যদি সকলকে ডাকি দেয়, তাহলে কি সিস্ক চলে?···তুমি বিদ্যাভাস্কে, আততায়ীকে ক্ষমা করিয়াছ। কে কবে কয়ে?···এই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে আমি দিশেহারা—তুমি সারথী; দেহ শ্রান্ত, মানুষের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত। তুমি আমায় চালাও। বর্তমান বিশ্বের সারথী, মানুষকে সরল কর, মানুষকে অকপট কর, আমার জীবন, বিশ্বজীবন সহজ-হউক··ধরার ধূলি হউক ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম-মানুষ।···

সন্ধ্যা

ওঁ নমঃ তত্ত্বমূর্ত্তয়ে ভক্ত-ভগবতে নিত্যগোপালায়···

বৃন্দাবনে একদিন কুসুম সরোবরে—ঠাকুর তখন হুগলীতে, তাঁর অনুমতি নিয়েই বৃন্দাবন গিয়েছিলাম—গৌরক্রপে তিনি আদেশ দিলেন, চলে যাও, কাজ আছে। থাকব বলেই বৃন্দাবন গিয়াছিলাম, আসব বলে তো যাই নি। তবু পাঠালেন।—তোমারই আদেশে রহিব এ দেশে তোমারি কার্য সাধিব। (গান গাইলেন)

আমার হাত ধরে নিয়ে বেড়ায়
যেথা যাই সে যায় পিছে বলতে হয় না
মুখখানি সে ঘরে মুছায়
হাসলে হাসে, কাঁদলে কাঁদে
আমি জানতে এলাম তাই
সত্যি মিথ্যা

—আমার হাত ধরে তুমি চলেছ, সারা বাংলার ঘরে ঘরে নিয়ে চলেছ—বলেছিলে নিজ মুখে—'শরৎ, যখন যেখানে আছ সঙ্গে সঙ্গে আছি'। হাত ধরে তুমি নিয়ে চলেছ, তাই পথ থেকে বিচ্যুত হই নি—রাজনীতির জটিলতায়ও স্থিতি হারাই নি। নিত্যগোপাল, তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার সঙ্গে থেকো।···তোমরা যারা আমার সঙ্গে

আছ মানতে শিখো—প্রাণকে অস্বীকার করা সহজ, সে তো অভিশাপ দেবে না—আমি তোমাদের প্রাণভরে ভালবাসতে চাই।…তোমরা বুঝি চাইও না। নরনারায়ণ আশ্রম একটা পরিকল্পনা নিয়ে এখানে এসেছে—আমি প্রাণে প্রাণে বেতারে এই গ্রামের সকল মানুষকে ডাকছি—আমি মেথরের কাজ করতে এসেছি, ভাড়ারের কাজ করতে এসেছি—সকলের দায়িত্ব বইতে চাই তোমরা-কারো প্রাণে-মনে লেশ বিদ্বেষ সংগত হও…পর আলোচনা কখনও আমি ভালবাসি না।—শিশু যেমন প্রাণ-যোগে মায়ের রস খেয়ে বেড়ে ওঠে, আমি তেমনি প্রেমের সকলের প্রাণে যুক্ত হয়ে বেড়ে উঠতে চাই।… রাধা রাধা হয়ে উঠবে।…রাধারাণী, শ্যামসুন্দর—আমি তো তোমাদের চাই নি—তোমরা এসেছ, আমাকে গ্রাস করেছ—তোমাদের বাসস্থান সকলের মধ্যে রচনা করব, এই গ্রামকে বৃন্দাবনে পরিণত করবো …বৃন্দাবন গোবর্ধনধারী—সকল পরিবার বৃন্দাবন হউক …জগন্নাথ নিত্যগোপাল,সংঘর্ষে ও বিচ্ছেদে বিক্ষোভে ক্ষয় হতে চলেছে বিশ্ব বুক এসেছিলেন…।

সোমবার সকাল।…পতিতের ঠাকুর, দুঃখীর ঠাকুর, পদদলিত যারা, লাঞ্ছিত যারা, তারা তোমার স্নেহ পাইয়াছে।…তোমাদের প্রার্থনা হোক—আমায় সংযত কর, শান্ত কর, সজ্ঞবদ্ধ কর, তোমার সঙ্গে চলিবার মত যোগ্য কর।… নিত্যগোপাল, সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া আমি তোমারই চরণ-তলে পড়িয়া রহিব; তোমার জীবনধারা আমার সকল শিরা-উপশিরায়, সকল আণুতে প্রবাহিত হউক সকল হৃদয়ে তোমার বাসস্থান গড়িয়া তুলিব…কিন্তু পারিলাম না তো। সজ্ঞরূপে দেখা দাও…সখা সুহৃৎ স্বামী, আমি তোমারই, আমি তোমারই।…তুমি আমি, আমি তুমি… নিত্যগোপাল, জাগো, জাগো।…সমন্বয়রূপী তুমি জাগো, দেখা দাও, যেমন এসেছিলে, দেখা দিয়েছিলে…আমি তোমারই মত বিষ পরিপাক করিয়া নীলকণ্ঠ হইব।…ধরার ধূলি হোক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্ম মানুষ।…

মঙ্গলবার, ১৪ই মে ১৯৪৬ ১লা জ্যৈষ্ঠ

(যার যেন মোর সকল ভালবাসা এই গান করেন)…তুমি পূর্ণ, আমি শূন্য; তোমার আদরে আমার দেহ মন প্রাণ পূর্ণ হউক।…তুমি যাহা দাও তাহার মাঝে অপমান নাই।…দেহতন্ত্রী, প্রাণতন্ত্রী তোমার সুরে বেজে উঠুক। আমার বেসুরা বিচ্ছিন্ন গলায় গান বন্ধ হউক। তোমার সঙ্গে আমার পৃথক-বুদ্ধি ঘুচিয়া যাক।…আমার স্ত্রীপুত্র-কন্যা তুমি, আমার ধনজন সহায়-সম্পদ্ তুমি, আমার আমি তুমি।… ধরার ধূলি হোক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্মমানুষ।…

সন্ধ্যা

শ্রীনিত্যগোপালকে বুকে লইয়া পথ চলিয়াছি, আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন তিনি।…এই বিরাট বিশ্বে কে কি জানে? আমি কিছুই জানি না। আমি যদি কর্তা হই, সব আমার ব্যর্থ হবে…তাঁর অনুগত হয়ে যখন থাকব, তখনই আমি নির্ভয়।…মানুষ বিবেকের গর্ব করে, কিন্তু নিজের বিবেক কি করে সম্ভব? নিজে কি নিজের জ্ঞান ও বিবেক স্ফুরণ করতে পারে? জ্ঞান ও বিবেক সকলের মধ্যেই আছে কিন্তু তাকে তো ফুটিয়ে তুলতে হবে। অহংকারী প্রত্যেক ঘটনাঘাতই সঙ্ঘর্ষ সৃষ্টি করে তোলে। তাই ঠাকুর, তোমাকে অবলম্বন করে চলব। তোমার আশ্রম তুমি গড়ে তোল। আমার কিছু নেই, আজ জীবন সায়াহ্নে তোমাকে আহ্বান করি।… প্রাণের স্পর্শে দেহ বদলায়, মন বদলায়, বুদ্ধি বদলায়।…অবস্থায়, ঠেলায় পড়লেও অনেক সয়। আমি যে সহস্র মানুষের বিষের জ্বালা সয়েছি, সে কি আমি সয়েছি? বাল্যকালে মা নাক টিপে ধরে দুধ খাওয়াতেন, আজ তো দুধ সয়। ঠাকুরের শরণাগত হওয়ার পর থেকেই তো আমার এই জীবন। তিনিও তো কত কিছুই সইতেন, তিনি যে ব্রহ্মবস্তু।… শুচিবাই, অশুচিবাই কোনটাই যেন আমার না থাকে…নিত্যগোপাল, যারা আমার সেবা করছে, তোমার সেবা করছে, আশ্রমের সেবা করছে, তাদের তুমি আশীর্বাদ করে সহজ মানুষ করে তোল। আমার তো কিছু

দেবার নেই, তুমি দাতা, তুমি তাদেরকে দিও।...তাদের প্রকৃতি বদলে দাও। প্রকৃতি না বদলালে তো কোন সাধনাই সার্থক হবে না। সংসারে অনেকের অনেক কিছু আছে, কিন্তু আমার তুমি না হলে দিন চলে না; তুমি আমার থেকো। আর সব কিছু যার যার তুমি আমার ভাবৈতে ক্রিয়াতৈতে, ভব্যাতৈতে থেকো। আমি তোমার...জগন্নাথ নিত্যগোপাল.....

মঙ্গলবার সকাল—

...শ্রীরাধা পরাপ্রকৃতি—বৈষ্ণব প্রকৃতির ব্রহ্ম রূপ...তিনি ব্রহ্মধামে মানময়ী...আমার সকল প্রকৃতিকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত কর—শ্রীরাধা আমার পরাণ পুতলি...উমাদিনী কালী...চম্পকবরণী রাধা নিত্যগোপাল সেজেছে.... নিত্যগোপাল আমার রাজাধিরাজ, আমার ভাঙ্গা কুটীরে তুমি রাজা—আমার সকল দেহমনপ্রাণ তোমায় দিব—ভিখারী আমার, তুমি আমার হৃদয়ের ধন।...আমার জীবনের সকল কর্মে, সকল জ্ঞানে তোমায় চাই—আমার সব কিছুতে তোমার প্রতিষ্ঠা গড়িয়া উঠুক—নিত্যগোপাল নিত্যগোপাল নিত্যগোপাল নিত্যগোপাল—তোমার চরণতলে নবীন বিশ্ব জন্ম লভিবে—আমার নিত্যগোপাল সোনার মানুষ—ভুবনবল্লভ, ভুবনমঙ্গল তোমার ঐ নাম—নিত্যগোপাল। শোনো বিশ্ব, ভুবনমঙ্গল ঐ দর্শন শোন। নিত্যগোপাল, তুমি আমার প্রাণ, তুমি মহাপ্রাণ, বিশ্ব প্রাণ—সকল প্রাণোপাসকের অন্ন, সকল সম্প্রদায়, সকল মতবাদ, সকল কর্ম প্রাণেরই—বিশ্বপ্রাণ তোমায় চায়। প্রাণ—মহামিলন মূর্ত্তি তুমি—তাই সকল ভেদ, সকল কাটাকাটি ঘুচাইয়া বিশ্বমঙ্গল গড়িয়া তোল।...জগন্নাথ নিত্যগোপাল—।

সন্ধ্যা—ওঁ নমঃ ভবমূর্ত্তয়ে...

নরনারায়ণ আশ্রমের ঘোষণা ব্রহ্ম নিত্যগোপালকে সৃষ্টি করা। প্রভুপাদ বিজয় কৃষ্ণের সেই স্বোপার্জিত ধনের কাহিনী—নিজের উপার্জন কিছু আছে কি জীবনে? যা কিছু পেয়েছি, তার কিছু কি অর্জন করেছি? পৈতৃক শ্যামসুন্দরকে আমি নিজের জীবন দিয়ে সৃষ্টি করব। সৃষ্টি করাটাই সবচেয়ে বড় যোগ্যতা—সেই সৃষ্টি নানা রকমের—তার মধ্যে ভগবানকে সৃষ্টি করাই সব চেয়ে বড় কথা। ...উপনিষদ্ বলছেন, ভগবান তপস্যা করেই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। God creates man, Man creates God—ব্রহ্মকে সৃষ্টি করতে হলে বিশ্বের সঙ্গে এক হয়ে সৃষ্টি করতে হবে—নরনারায়ণ আশ্রমের আদর্শ এই ব্রহ্মকে সৃষ্টি করা। নিত্যগোপাল কে? তিনি কৃষ্ণ, তিনিই গৌর—আমার বাবার সেই শেষ বয়সের গল্প...তিনি বললেন যেই নিত্যগোপাল সেই কালাচাঁদ, সেই কালাচাঁদ সেই নিত্যগোপাল...জীবত্বের নির্বাণ হলেই শিবত্ব জয়লাভ করে। ভগবানকে সৃষ্টি করতে হলে বিশ্বের সব কিছুকে একত্র করতে হবে, একাত্ম হতে হবে, সঙ্ঘ করতে হবে—বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিশ্বের মধ্যে নিত্যগোপালকে, গোবিন্দকে সৃষ্টি করব...এই বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হয়ে এই সৃষ্টির সাধনাই নরনারায়ণ আশ্রমের আদর্শ।... গোবিন্দ আমার ও বিশ্বের জীবনে জয়যুক্ত হউন; এই দশজনের মধ্য দিয়া বৃন্দাবন গড়ে উঠুক—মাটির জগতে বৃন্দাবন। মায়ের পক্ষে ছেলে যেমন সখের নয়, নিত্যগোপালও আমার সখের মন; ঠাকুরঘরের ঠাকুর করে রাখবার জন্য আমার ঠাকুর নয়; তাঁকে স্বোপার্জিত করে গড়ে তুলবার মরণ পণ করে নরনারায়ণ আশ্রম এই ক্ষুদ্র পল্লীতে বসিয়াছে। ধরার ধূলি হউক বিশ্ব ধূলি, ধরার মানুষ হউক বিশ্ব মানুষ।

১৭.৫.১৯৫৬

.. কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব রক্ষ মাম্।
রামরাঘব রামরাঘব রামরাঘব পাহি মাম্॥

আমার বিশ্বময় ছড়ানো আমিকে পাইবার জন্য জীবের অন্তরে যে সনাতন আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, তাহারই সার্থক রূপ তিনি।...আমি বিশ্বরূপ—তাই নিজেরে পাইবার জন্য নিজে পাগল।...

ক্রমশঃ

গান্ধীজীর উপবাস ও রবীন্দ্রনাথ

॥ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত ॥

মহাত্মা গান্ধী অনেক সময়ই উপবাসের সময় রবীন্দ্রনাথের শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথও এ-সব সময়ে অত্যন্তভাবে বিচলিত হইয়া পড়িতেন; তিনি শুভেচ্ছা প্রেরণ করিতেন, সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাপন্ন লোকজনদের নিকটে চিঠি-পত্র লিখিতেন, পত্রিকায় বিবৃতি দিতেন, আবেদন জানাইতেন; শেষবারে তো নিজের অসুস্থ শরীর লইয়াই পুণা যারবেদা জেলে অনশনরত গান্ধীজীর পাশে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও দেখিতে পাই, নীতির দিক হইতে এই উপবাস জিনিসটিকে রবীন্দ্রনাথ ঠিক ঠিক সমর্থন করিতে পারেন নাই। ১৯৩৩ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন তাঁহার অনশনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন তখন গান্ধীজীর নিকটে রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং হইতে পরপর দুইখানি পত্র লেখেন, একখানি ৯।৫।৩৩ তারিখের, অপরখানি ১১।৫।৩৩ তারিখের। প্রথম পত্রে কবি লিখিয়াছেন,—

"প্রিয় মহাত্মাজি,

আপনি যে কার্যপন্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা দ্বারা আপনি একটা পরম দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন; এই ব্যাপারে আমি যদি আপনার সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে না পারি তবে আমাকে দোষ দিবেন না। এ বিষয়ে আপনার নিজের বিচার-সিদ্ধান্তের তাৎপর্য ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে, এই বিচার-চিন্তার পটভূমিরূপে যে সকল চিন্তা-ভাবনা ও তথ্যাদি রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবে আমার সামনে নাই। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে কুৎসিত এবং অন্যায় জিনিসগুলি চলিয়াই আসিতেছে; এগুলি হইল অস্তিত্বের নঞর্থক দিক। অপর দিকে আছে কতকগুলি আদর্শ, যেগুলি হইল সদর্থক এবং শাশ্বত। এই সদর্থক শাশ্বত আদর্শগুলিই সত্যের বার্তাবহগণ কর্তৃক আমাদের সম্মুখে স্থাপিত হইবার জন্য অপেক্ষা করে; এইরূপ সত্যের বার্তাবহগণের কোনোদিনই এমন কোনো অধিকার নাই যে তাঁহাদের চারিদিকের পরিবেশে অপবিত্রতা এবং অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে বলিয়া নৈরাশ্যে ও বিরক্তিতে তাঁহারা তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের কথা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার পক্ষে ঔদ্ধত্য। যে অজস্র দুঃখ-বেদনার দ্বারা সমস্ত সংসার ক্লিষ্ট সে-বিষয়ে বুদ্ধদেব যখন প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তখন তিনি সকল ক্লেশ স্বীকার করিয়া মুক্তির পথের কথা শিক্ষা দিয়া চলিলেন, তাঁহার জীবন-ব্রতের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাহাই করিয়াছেন।"

চিঠিখানি পড়িলেই মনে হয়, পারিপার্শ্বিক বিক্ষোভিতা বা গ্লানি-কলুষের মুখে উপবাসের দ্বারা আত্ম-বিসর্জনের সঙ্কল্পকে রবীন্দ্রনাথ সাধু সঙ্কল্প বলিয়া মনে করিতেন না; স্বীয় আদর্শে আরও দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হইয়া এই সকল জয়ের জন্য বা এই সবলের প্রতিকারের জন্য তাঁহাকে অমিতবীর্যে কাজ করিয়া যাইতে হইবে, ইহাই হওয়া উচিত যথার্থ বীর-জীবনের লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দ্বিতীয় পত্রখানিতে এই কথাটি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।—

"প্রিয় মহাত্মাজি,

আপনার সর্বশেষ যে বাণীটি আজ জগতের সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে ইহার অর্থ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার আমি চেষ্টা করিতেছি। বুদ্ধদেব তাঁহার জীবনের প্রত্যেকটি মূল্যবান কর্মের ভিতর দিয়া সর্বভূতের প্রতি অসীম প্রেমের কথা প্রচার করিয়াছেন। খ্রীষ্ট বলিয়া

লিখছেন, "তোমার শত্রুদের ভালোবাস।" তাঁহার এই শিক্ষা। ইহাই চরম প্রকাশ লাভ করিয়াছিল তাঁহাকে যাঁহারা হত্যা করিয়াছে তাহাদের প্রতি যে ক্ষমার বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহার ভিতর দিয়া। আমি যতটা বুঝিতে পারি তাহাতে আপনি যে উপবাস আরম্ভ করিয়াছেন তাহার পিছনকার উদ্দেশ্য হইল আপনার দেশবাসীর পাপের জন্য চরমমূল্য দান করা। কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, এ বিষয়ে আমি বলিতে চাই যে এই চরমমূল্য অন্যরূপে দান করা যায়। এই মূল্য ঠিক ঠিক দান করা যায় এবং বীরের মতন দান করা যায় শুধু প্রতিদিনের চেষ্টা দ্বারা—যে সব হতভাগ্যেরা তাহারা কি করিতেছে তাহা জানে না তাহাদের জন্য প্রতিদিনের কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা। যে উপবাসের দ্বারায়া দুষ্কৃতকারী তাহাদের আচরণের উপরে কোনো প্রত্যক্ষ ফল নাই, অন্যদিকে যে উপবাস সাহায্যপ্রার্থী লোকদিগকে আরও দেনা করিবার শক্তিকে সহসা শেষ করিয়া দিতে পারে —সে উপবাস কিছুতে সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে না; বিশেষ করিয়া যে ব্যক্তির সমস্ত মানবতার প্রতিনিধিত্ব করিবার দায়িত্ব তাঁহার পক্ষে এই-জাতীয় উপবাস আরও বেশিভাবে গ্রহণের অযোগ্য।"

রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি লক্ষ্য করিলে বোঝা যাইবে, তিনি মনে করিতেন, একটা গভীর নৈরাশ্য এবং বিরক্তি লইয়া কর্মক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া আত্মঘাতী হইবার স্পৃহা যেন গান্ধীজীর এই উপবাসের মধ্যে নিহিত ছিল। অবশ্য উপবাসের বিশুদ্ধিকরণের দিকটাকে তিনি উপেক্ষা করেন নাই। গান্ধীজী এ ক্ষেত্রে উত্তর দিতেন, নৈরাশ্য এবং বিরক্তির উপাদান নিশ্চয়ই রহিয়াছে, কিন্তু তাহা হই ত আত্মঘাতী হইবার ইচ্ছাতেই তাঁহার উপবাসের স্পৃহা দেখা দিত না, উপবাস ছিল মহাত্মাজীর নিকটে আত্ম-বিশুদ্ধির ভিতর দিয়া অন্যের অধ্যাত্ম-শক্তিলাভের প্রকৃষ্টতম উপায়। যেখানেই গান্ধীজী একটা বিরাট অসাফল্যের সম্মুখীন হইয়াছেন সেইখানেই আত্মবিশ্লেষণে নিযুক্ত হইতেন; সেই আত্ম-বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া তাঁহার মনে হইত, এই অসাফল্যের মুখ্য কারণ তাঁহার শক্তির অভাব; তখনই তিনি নূতন করিয়া আত্মিক শক্তিলাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিতেন, তাহা হইতেই আসিত তাঁহার উপবাসের অন্তঃপ্রেরণা। গান্ধীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, উপবাসের ভিতর দিয়া আমাদের দৈহিক শক্তির যে ক্ষয় হয় তাহার ভিতর দিয়া আমাদের আত্মিক শক্তিই অনুপাতিকভাবে বাড়িয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন, "It is my firm belief that the strength of the soul grows in proportion as you subdue the flesh." (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৩।১০।২৪)

আমরা বুদ্ধদেবের মুখেও অনেক সময় এই কথা দেখিতে পাই; তিনি বলিয়াছেন, 'মংসেসু নীয়মানেসু ভিয্যো চিত্তো পসীদতি', মাংস সমূহ ক্ষীয়মান হইলেই চিত্ত আরও অধিক প্রসাদ লাভ করে। গান্ধীজী অন্যত্র বলিয়াছেন, "My religion teaches me that whenever there is distress which one cannot remove, one must fast and pray,"

(ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৫।৯।২৪)

—আমার ধর্ম আমাকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছে যে যখনই এমন কাহারও কাছে এমন কোন বেদনাকর অমঙ্গল দেখা দিবে যে তাহাকে আর দূর করা যাইতেছে না, তখনই উপবাস ও প্রার্থনা করা উচিত। গান্ধীজীর জীবনেও আমরা বার বার দেখিয়াছি, যখনই জীবন-পথে এমন কোনো অমঙ্গল আসিয়া দেখা দিয়াছে যাহা তাঁহার শুধু দেহ-মন নয় আত্মাকেও ক্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে, তখনই তিনি তীব্রভাবে অনুভব করিতেন উপবাসের প্রয়োজনীয়তা। তাঁহার মনে তখন এইরূপ একটা ভাব প্রবল হইয়া উঠিত যে নিজের দেহ-মনের ময়লা আরও দূর হইয়া নিজে উজ্জ্বল হইয়া না উঠিতে পারিলে বাহিরের ময়লাও দূর হইবে না। চৌরীচৌরার ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া যেখানে গান্ধীজী উপবাস গ্রহণের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার ভিতরেই এ-সব ক্ষেত্রে গান্ধীজীর জীবনে উপবাসের তাৎপর্য কি ছিল তাহা অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, দেহের উপরে আত্মার আধিপত্য বিস্তারের জন্য গৃহীত যে উপবাস তাহা অপেক্ষা মানুষের আত্ম-বিবর্তনের পক্ষে অধিক শক্তিশালী উপাদান আর নাই।

— — —

ম্যাক্‌ডুগাল ও "হরমিক্" মনোবিদ্যা

॥ শ্রীমনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ॥ এম. এ., বি. টি., ডি. এস্. ই।

বৃটিশ মনোবিদগণের মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা স্বপরিচিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হইতেছেন ম্যাক্‌ডুগাল (১৮৭১—১৯৩৮)। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন জীব-বিদ্যা ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ছাত্র। মনুষ্যতত্ত্ব (anthropology) লইয়াও তিনি অনেক আলোচনা করেন। পরে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ২৯ বৎসর বয়সের সময় তিনি মনোবিদ্যায় আকৃষ্ট হন। শিক্ষা-দীক্ষার দিক দিয়া তিনি ছিলেন জড়-বিজ্ঞানের ছাত্র। কাজেই মনোবিদ্যায় তাঁহার স্বাভাবিক গতি ও প্রবণতা ছিল ব্যবহারিক, জীবন-মুখী ও সমাজ-সচেতন। হইয়াছিলও তাহাই। মনোবিদ্যা যে নিছক দর্শন বা অন্তর্দর্শনের (introspection) বিষয় নহে, তাহা যে আত্মাতত্ত্ব, চৈতন্যতত্ত্ব বা নিছক মনস্তত্ত্ব নহে, এসব তিনিই প্রথম বলিয়াছিলেন। তাঁহার ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত—"Physiological Psychology" নামক গ্রন্থে তিনি "চেষ্টিতবাদীদের" (Behaviourist) দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারেই মনোবিদ্যার সংজ্ঞা লিখিয়াছিলেন। "Psychology may be best and most comprehensively defined as the positive science of the conduct of living beings".

চেষ্টিতবাদী বা আচরণবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া মনোবিদ্যার এই সংজ্ঞাটি তিনিই প্রথম প্রচার করেন। ওয়াট্‌সনের চেষ্টিতবাদ তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে ছিল।

ম্যাক্‌ডুগালের "পরিবাহ প্রকল্প" (Drainage Hypothesis)

বিংশ শতকের গোড়ার দিকের অন্যান্য অনেক মনোবিদের মতই ম্যাক্‌ডুগালও স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়া মনের তত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার "Physiological Psychology" (1905) নামক গ্রন্থে তিনি একটি নূতন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই তত্ত্বটিকে আমরা "পরিবাহ প্রকল্প" (drainage hypothesis) বলিতে পারি। পরিবাহ প্রকল্পের মূল কথাটি হইল প্রাণীদের আচরণের পরিবর্ত্তনগুলি বাহিরের অন্তস্তর বিরোধী শক্তির বাধার জন্য তত্টা হয় না, যতটা হয় স্নায়ুর অন্তঃস্রোতের বিভিন্নমুখী ধারার পরিবাহের (drainage) জন্য; অর্থাৎ "বাধ" (inhibition) হইতেছে একটা ধনাত্মক (positive) শক্তির ঋণাত্মক (negative) লীলা মাত্র। খুব ঘরোয়া একটা উপমাদ্বারা ব্যাপারটাকে বুঝান যাইতে পারে। উপর তলার গৃহস্বামী তাঁহার স্নানঘরে জলের ট্যাপে যত জোরে জল পাইতেছিলেন, হঠাৎ তাহাতে একটা 'বাধ' আসিল, জলের তোড় কমিয়া যাইল। ট্যাপের আচরণের পরিবর্ত্তন কেন হইল? ব্যাপারটা আর কিছুই নহে, নীচের ভাড়াটেরা স্নান-ঘরে স্নান করিতেছে, তাই উপরে পর্য্যাপ্ত স্রোতে জল যাইতে পারিতেছে না। এখানে উপরের জলের 'বাধ'টা কোনও বিরোধী শক্তির ফল নহে, অন্তস্তর পরিবাহ (drainage) প্রবাহের ফল মাত্র। অন্য দিকে জলের প্রবাহ ছুটিতেছে বলিয়াই আর একটা দিকে তাহাতে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং এই 'বাধ'টা (inhibition) আসিয়াছে পরিবাহের জন্য। দেখা যাইতেছে স্নায়ুস্রোতের দিগন্তরে যাত্রা (পরিবাহ) এবং তজ্জনিত তাহার শক্তির তারতম্যের জন্যই আমাদের আচরণের বৈচিত্র্য সাধিত হয়। এই মতবাদ অনুসারে স্নায়ুশক্তির বণ্টন ও পুনর্বণ্টনের (re-distribution) তারতম্যের জন্যই আমাদের কার্য্যকর্ষের, বিশেষতঃ আগ্রহ, অভিনিবেশ প্রভৃতির তারতম্য ঘটে। ইহারই ফলে ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যায় "অভিক্রান্তি" (displacement) "উন্নতি" (sublimation) প্রভৃতি ঘটে।

প্যাভলভ্ প্রবৃত্তির "সাপেক্ষ প্রত্যাবর্তক" ক্রিয়া (conditioned reflex) প্রবৃত্তির ব্যাখ্যাও এই মতবাদ দিয়া সম্ভব হয়। কিন্তু "তাগাং ফলতি সর্ব্বত্র"—ম্যাক্‌ডুগালের এই ব্যাখ্যা তেমন ভাবে গণ-স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই।

ম্যাক্‌ডুগালের মৌলিক তত্ত্ব—"হরমিক্" মতবাদ—

মোটামুটি বলিতে পারা যায় স্নায়ুস্রোতের লীলা-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া এই ভাবে মনের তত্ত্বের (তথা আচরণের) বিচার করার ব্যাপারে ম্যাক্‌ডুগালের সহিত অন্যান্য আচরণবাদীদের বিশেষ কোনও মত-বিরোধ ছিলনা। কিন্তু বিরোধ আসিল অন্য ব্যাপারে। প্রাণীদের আচরণটা নিছক যান্ত্রিক ব্যাপার মাত্র, এ কথা ম্যাক্‌ডুগাল স্বীকার করিতে চাহিলেন না। ম্যাক্‌ডুগালের মতে প্রাণীদের সমস্ত আচরণের মধ্যেই একটা "উদ্দেশ্যমুখিতা" (purposiveness) আছে, একটা লক্ষ্যবস্তু আছে, একটা "পরিণামদৃষ্টি" আছে। তাহা যন্ত্রের অন্ধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মাত্র নহে। এই মতবাদটিই হইল ম্যাক্‌ডুগালের "হরমিক্" মতবাদ।

"হরমিক্" কথাটি আসিয়াছে গ্রীক শব্দ "horme" হইতে। তাহার অর্থ হইতেছে "জৈব প্রেরণা "(animal urge)। রোমানরা এই শব্দটির অনুবাদ করিল "instinctus"; ইহা হইতেই ইংরাজী instinct বা "সহজাত প্রবৃত্তি" শব্দটি তৈয়ারি হইয়াছে। ম্যাক্‌ডুগাল এই "হরমিক্" শব্দটির মধ্যে একটা নূতনতর ব্যঞ্জনা দান করিলেন। তাঁহার "হরমিক্" মতবাদ প্রাণীদের আদিম জৈব প্রেরণা বা instinct-কে স্বীকার করিল বটে, তবে এই instinctগুলি ম্যাক্‌ডুগালের মতে একেবারে অন্ধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মাত্র নহে। সেগুলি পরিণামমুখী, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত, তবে সেই উদ্দেশ্যটা হয়ত সব সময়ে সচেতন মনের কাছ নাও হইতে পারে। ম্যাক্‌ডুগালের বিখ্যাত Introduction to Social Psychology (1908) নামক গ্রন্থে এই মতবাদটি ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

প্রবৃত্তি (instinct) তত্ত্ব

ম্যাক্‌ডুগালের মতে প্রাণীদের সমস্ত আচরণের চরম উৎস হইতেছে সহজাত প্রবৃত্তি (instincts) গুলি। তিনি বলিয়াছেন "Directly or indirectly the instincts are the prime movers of all human activity." (Social Psychology P. 44. 1908)। তবে এই প্রবৃত্তির সংজ্ঞার ব্যাপারে তাঁহার সহিত অন্যান্য মনোবিদ্‌দের পার্থক্য আছে। আমরা জানি যে সর্প-শিশু জীবনে কখনও নেউল দেখে নাই, সেও নেউল দেখিয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করে, মোরগ শিশু খাদ্য-কণা দেখিলেই চঞ্চুদ্বারা তাহা খুঁটিয়া খাইতে চেষ্টা করিবে, মোহেল শালিক বুলবুল প্রভৃতি পাখীরা পিতামাতার নিকট হইতে শিক্ষা না পাইলেও তাহাদের গোষ্ঠীগত প্রথায় বাসা তৈয়ারি করিবে। এই জাতীয় কাজগুলি অভিজ্ঞতা দ্বারা অথবা "ট্রেনিং"এর দ্বারা আয়ত্ত করিতে হয় না। এই জাতীয় স্বয়ংসিদ্ধ অশিক্ষিত-পটু আচরণগুলিকেই প্রবৃত্তি (instinct) বলা হয়। প্রবৃত্তির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে James সাহেব বলিয়াছেন "Instinct is the faculty of acting in such a way as to produce certain ends without foresight of the ends and without previous education in the performance." এই প্রবৃত্তিগুলির বিশেষত্ব হইতেছে (১) প্রবৃত্তিগত আচরণগুলি বিশেষ বিশেষ পরিবেশে বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হয়, (২) এগুলি সহজাত অর্থাৎ অভিজ্ঞতার দ্বারা এগুলি শিখিতে হয় না, (৩) এগুলি গোষ্ঠীর প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই কাজ করে।

প্রবৃত্তিমূলক কাজগুলি যে অভিজ্ঞতা দ্বারা শিখিতে হয় না, সেগুলি যে প্রাণীদের জন্মগত "স্বভাবের"ই (disposition) অভিব্যক্তি, একথা ম্যাক্‌ডুগালও স্বীকার করিয়াছেন। তবে তাঁহার মতে প্রবৃত্তিগত কাজগুলির মধ্যে কয়েকটি পর্ব্ব আছে, যথা (১) জন্মগত স্বভাবের জন্য বিশেষ একটা জিনিসকে বিশেষভাবে লক্ষ্য (perceive) করা বা তাহার সম্বন্ধে মনোযোগ দেওয়া, (২) ফলে

বিশেষভাবে প্রক্ষোভ (emotion) অনুভব করা, এবং (৩) শেষ পর্যন্ত বিশেষভাবে প্রতিক্রিয়া করা। তাঁহার মতে প্রবৃত্তির সংজ্ঞা হইতেছে "An innate disposition which determines the organism to perceive (to pay attention to) any object of a certain class and to experience in its presence a certain emotional excitement and an impulse to action which find expression in a specific move of behaviour in relation to that object."

প্রবৃত্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে ম্যাক্‌ডুগালের মতের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হইতেছে প্রবৃত্তির সহিত প্রক্ষোভের (emotion) অচ্ছেদ্য সম্পর্কের স্বীকৃতি। তাঁহার মতে প্রত্যেক প্রবৃত্তি-মূলক আচরণের মূলেই আছে একটা প্রক্ষোভ; যেমন পলায়ন প্রবৃত্তির মূলে আছে ভয়ের প্রক্ষোভ, যুযুৎসার মূলে আছে ক্রোধ, অপত্য প্রবৃত্তির মূলে আছে স্নেহ, ইত্যাদি।

এই মতবাদটি লইয়াই তাঁহার সহিত অন্যান্য মনোবিদ্‌দের খুবই বিরোধ হইয়াছে। এমন কি হরমিক্ সম্প্রদায়ের "ট্রেডার" তাঁহার "Instinct in man," গ্রন্থে ম্যাক্‌ডুগালের বিরোধিতা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন প্রক্ষোভ জিনিসটা অনেক সময় প্রবৃত্তির অনুগামী ত নয়ই, বরং প্রবৃত্তির কাজ ব্যাহত হইলেই প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। যেমন পলায়ন প্রবৃত্তির কথাই ধরা যাক্। পলায়ন রাস্তাটা যখন বিনা বাধায় করা যায়, তখন ভয়ের প্রক্ষোভ থাকে না, কিন্তু পলায়নে বাধা পড়িলেই ভয়ের সৃষ্টি হয়।

আচরণবাদীদের সহিত ম্যাক্‌ডুগালের বিরোধ মৌলিক ব্যাপার লইয়া। তাঁহারা কোনও সহজাত প্রবৃত্তির অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন জীবনের চলতি পথের অর্জিত অভিজ্ঞতা লইয়াই প্রাণীদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। তাহা সব সময়েই উদ্দীপক (stimulus) প্রতিক্রিয়া (response) এবং কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার (conditioned reflex) ফল মাত্র।

ইঁহাদের মতে সহজাত প্রবৃত্তির স্বীকৃতির মধ্যে এমন একটা অতি-প্রাকৃতবাদ বা অধ্যাত্মবাদজনিত রহস্য আছে, যাহা ঠিক বস্তুনিষ্ঠ জড়-বিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু হইতে পারে না। ইহা ছাড়া প্রবৃত্তিমূলক আচরণ আর অভ্যাস মূলক আচরণগুলির মধ্যে পার্থক্যের সীমা রেখাগুলিও খুব স্পষ্ট নহে।

হরমিক্ মনোবিদ্যার মূল কথা হইতেছে প্রবৃত্তিমূলক আচরণের মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে, একটি বিশিষ্ট পরিবেশে প্রাণীরা এমন ভাবে প্রতিক্রিয়া করিবে, যাহাতে তাহাদের বিশেষ একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। বিশেষ একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই যে প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্র্য, ইহার ফলেই আদিম প্রবৃত্তিগত আচরণগুলি অনেক সময় পরিবর্তিত (modified) হইয়া যায়। উদ্দীপকের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার এই পরিবর্তনগুলিকেই প্যাভলভ্ "কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া" বা "সাপেক্ষ প্রত্যাবর্তক" (conditioned reflex) হিসাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আচরণবাদীদের মতে এই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার মূল প্রেরণা হইতেছে উদ্দীপক বা পরিবেশ, আর হরমিক্ মনোবিদদের মতে তাহা হইতেছে একটা "উদ্দেশ্য মুখিতা" বা "পরিণাম দৃষ্টি"; তাহা উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার যান্ত্রিক পৌর্বাপর্য্য মাত্র নহে।

সেন্টিমেন্ট্ (Sentiment) তত্ত্ব

ম্যাক্‌ডুগাল তাঁহার প্রবৃত্তিবাদের উপর ভিত্তি করিয়া কর্ম্মপ্রয়াস, সংবেদন, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, নীতিবোধ, প্রভৃতি সম্বন্ধে একটি চমকপ্রদ তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছেন। তিনি বলেন মানুষের আচরণের মূল উৎস হইতেছে প্রবৃত্তি ঠিক কথা, কিন্তু এই প্রবৃত্তির সংখ্যাও অল্প নহে এবং তাহাদের নির্দ্দেশে যে সব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয়, তাহার সংখ্যাও অল্প নহে। তাহা হইলে কোন্ প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের ব্যক্তিত্ব দানা বাঁধিবে? আমাদের চরিত্র বিশেষ একটা রূপ নিতে পারিবে? এই প্রশ্নের উত্তর ম্যাক্‌ডুগালের Social Psychology গ্রন্থে যতটা নিপুণ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ততটা বোধ হয় অন্য কোনও মনোবিদ্ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হয় নাই।

ফ্রয়েড্, হুম্, এ্যাড্‌লার প্রভৃতিও মানুষের ব্যক্তিত্ব চরিত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে সার্থক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারাও এক হিসাবে প্রবৃত্তিবাদের উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহাদের মতবাদ গড়িয়া তুলিয়াছেন। তবে তাঁহাদের ব্যাখ্যাটা খানিকটা একদেশ-দর্শী। ফ্রয়েড্ বলিয়াছেন মানুষের আচরণের মৌলিক প্রেষণা হইতেছে "লিবিডো" বা "কাম প্রবৃত্তি"; এ্যাড্‌লার বলিয়াছেন তাহা হইতেছে "ক্ষমতা লিপ্সা প্রবৃত্তি" (will to power)।

ম্যাক্‌ডুগাল কিন্তু বিশেষ একটা প্রবৃত্তির উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তাঁহার মতে যে কোনও একটা প্রবৃত্তিই অন্যতর প্রবৃত্তির সহিত একত্র হইয়া একটা "যৌগিক প্রবৃত্তি" জাতীয় জিনিস হিসাবে গঠিত হইতে পারে। তখন তাহার শক্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে সেই সংহত প্রবৃত্তির সমবায়ী শক্তিতে মানুষ অন্যান্য প্রবৃত্তির প্রেষণাকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে। ইহার ফলে সেই "যৌগিক প্রবৃত্তি"কেই কেন্দ্র করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব দানা বাঁধিতে থাকে এবং বিশেষ একটা রূপ পরিগ্রহ করে। দুই তিনটি প্রবৃত্তির (বা প্রবৃত্তি-সংশ্লিষ্ট প্রক্ষোভের বা emotion-এর) মিশ্রণে যে যৌগিক প্রবৃত্তি (বা যৌগিক প্রক্ষোভের) সৃষ্টি হয়, তাহাকে ম্যাক্‌ডুগাল নাম দিয়াছেন "সেন্টিমেন্ট" (Sentiment) বা "রস"। এই সেন্টিমেন্টের জন্যই মানুষের আচরণগুলি একটা স্থায়ী রূপ নিতে থাকে এবং এই সেন্টিমেন্টের শক্তিতেই সে অন্যতর প্রবৃত্তির আবেদনকে উপেক্ষা করিয়া নিজের পথে চলিতে সমর্থ হয়।

ম্যাক্‌ডুগালের মনোবিদ্যায় "সেন্টিমেন্ট" কি ভাবে গঠিত হইয়া মানুষের চরিত্রকে স্থায়ী রূপ দেয়, তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

ধরা যাইতে পারে একটি ছেলে রেডিওতে একটি গান শুনিল। গানটি তাহার ভাল লাগিল। ফলে ঐ গানকে কেন্দ্র করিয়া তাহার আগ্রহ হইল "কৌতূহল প্রবৃত্তি।" পরে ঐ গানটি সে গাহিতে চেষ্টা করিল এবং খানিকটা পরিমাণে সমর্থও হইল। তখন বার বার চেষ্টা করিয়া গানটি আয়ত্ত করিল। গানটি তাহার নিজস্ব হইল। এখন এই গানটিকে লইয়া পরিতৃপ্ত হইল তাহার "দক্ষতা প্রবৃত্তি," "বাহাদুরির প্রবৃত্তি" এবং "সৃজনী প্রবৃত্তি"। উন্মুক্ত হইল তাহার আত্ম-প্রচারের দ্বার। এই আত্ম-প্রচারটা সে পড়াশুনার মধ্য দিয়া করিতে পারে নাই, খেলাধুলার মধ্য দিয়াও নহে। কাজেই এখন হইতে তাহার কাছে পড়াশুনা বা খেলার চেয়ে গানটাই প্রিয়তর বলিয়া মনে হয়। গানকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার "সেন্টিমেন্ট" গড়িয়া উঠে, তাহার চরিত্র একটা বিশিষ্ট রূপে দানা বাঁধিতে থাকে। এখন সে গান শুনিবার সুযোগ পাইলে খেলাধুলার আকর্ষণকে প্রত্যাখ্যান করিবে, হয়ত গানের সাধনার জন্য তাহার কাছে অন্যতর প্রবৃত্তির আকর্ষণ ব্যর্থ হইবে। এখন তাহার চরিত্র গানকে ঘিরিয়া একটা স্থায়ী রূপ লইয়াছে, তাহার চরিত্রের তরলতা কাটিয়া গিয়াছে, চরিত্রটি দৃঢ়তা লাভ করিয়াছে। এ দৃঢ়তা আসিল কোথা হইতে? গানকে ঘিরিয়া বিভিন্ন প্রবৃত্তির সমবায়ে যে শক্তিশালী "সেন্টিমেন্ট" গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই "সেন্টিমেন্ট" হইতেই তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা আসিয়াছে।

এই সেন্টিমেন্ট হইতেই গড়িয়া উঠে ব্যক্তিত্ব, নীতিবোধ, প্রভৃতি। অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত ম্যাক্‌ডুগাল এই সমস্ত তত্ত্বগুলির আলোচনা করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

বিনোবাজির দৃষ্টিতে শিশু-শিক্ষা

॥ জনাব রেজাউল করীম ॥

ভূদান যজ্ঞের ছোতা আচার্য বিনোবা ভাবে যে একজন উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষাবিদ্ সে কথা অনেকেই হয়ত অবগত নন। তাঁর শিক্ষানীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তার মধ্যে বৈপ্লবিক পন্থায় সমাজ-কল্যাণের ইঙ্গিত নিহিত আছে। আজ তাঁর শিক্ষানীতির একটা দিক নিয়ে আলোচনা করব। এই প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ করেছি তাঁরই ভাষণ ও প্রবন্ধ থেকে। বিনোবাজি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে দেখেছেন যে এদেশের ছেলেরা বিদ্যার্জন করে কিন্তু জীবিকার্জন করতে পারে না। তার কারণ তারা এমন একটা অবাস্তব পরিবেশের মধ্যে লেখাপড়া শেখে যেখানে জীবিকার্জনের পন্থাটা শিক্ষা দেওয়া হয় না। ফলে ছেলেরা লেখাপড়া শিখে পঙ্গু হয়ে পড়ে। চাকরী ছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকে না। বিনোবাজি বলতে চান যে শিক্ষার্জন ও জীবিকার্জন, এ দুটো কাজই একসঙ্গে দেওয়া দরকার। নতুবা প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা দেশে বেকার সমস্যাকে আরও গুরুতর করে তুলবে। তাতে সমাজের কোন কল্যাণ হবে না। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় জীবনের ঐক্যকে দু-ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—শিক্ষালাভ করা ও জীবিকার্জন করা। বর্তমান ব্যবস্থা অনুসারে একটি ছাত্র প্রথম পনর কি ষোল বছর কেবল মাত্র শিক্ষালাভের জন্য ব্যয় করে। সে সময় অন্য কোন দিকে তার লক্ষ্য থাকে না। তারপর যখন তার শিক্ষালাভ সমাপ্ত হয় তখন সে সমস্ত শিক্ষাকে ঘুরে পরিত্যাগ করে জীবিকার্জনের জন্য চেষ্টা করে। একটা চাকরী পাওয়া মাত্র জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি সে আর পড়াশুনার সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না। হয় সে জীবন ভোগ করে, অথবা চাকরীর উন্নতির জন্য চেষ্টা করে। এত পরিশ্রম ও সাধনার দ্বারা যে বিদ্যালাভ করল সে, তার সহিত সমস্ত সম্পর্ক একরকম ছিন্ন হয়ে যায়।

বিনোবাজি বলেন 'শিক্ষালাভ ও জীবন-চর্যা এ দুটো বস্তু স্বতন্ত্র' এই প্রকার ধারণা ভ্রমাত্মক। প্রকৃতি এমন শিক্ষা দেয় না। সামান্য একটি ছোট্ট খোকা ক্রমান্বয়ে পূর্ণ বয়স্ক হয়ে উঠবে। এই খোকার দেহ পলে পলে দিনে দিনে কালকেতুর মত বেড়ে উঠবে। আমরা হয়ত লক্ষ্যই করি না যে আমাদের ঘরের খোকা বাড়ছে। এই খোকা যখন বড় হ'বে তখন তার উপর সংসারের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়বে। কিন্তু বিদ্যালয়ে তাকে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাতে তার মনে কোনও প্রকার দায়িত্ব-বোধ জাগে না। এই শিক্ষা-পদ্ধতিতে জীবনের বিবিধ সমস্যার ব্যাপারে বছরের শেষ দিন পর্যন্ত ছাত্রের মনে কোন দায়িত্ব-বোধ শিক্ষা দেওয়া হয় না। তার শিক্ষা সমাপ্ত হলে যখন সে সংসারে প্রবেশ করে তখন তার স্কন্ধে নানারকম কাজের দায়িত্ব চেপে পড়ে। দায়িত্ব-হীনতার জীবন থেকে হঠাৎ সর্বপ্রকার দায়িত্বের জীবনে এই যে হনুমানের মত লম্ফ-প্রদান, তা অত্যন্ত অশোভন ও অস্বাভাবিক। বিনোবাজি বলেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই। কিন্তু এর ফলে ছেলেদের অস্থি চুরমার হয়ে ভেঙ্গে যেতে পারে।

কুড়ি বছরের একজন তরুণ যুবকের কথা স্মরণ করা যাক। সে পড়াশুনা করে, আর কত আকাশ-কুসুম স্বপ্ন দেখে—আমি দেশ-সেবা করব, বড় হব, বাল্মীকির মত অথবা নিউটনের মত বড় হব। এইভাবে সে কত স্বপ্ন দেখে। কিন্তু এই সুখ-স্বপ্নের শেষ পরিণতি কি?

পাস করার পর যুবকটির সামনে কত সমস্যা উপস্থিত হয়। সংসার পালনের সমস্যা, দৈনিক জীবিকার্জনের

সমস্যা, প্রাণধারণ ও আত্মীয় পোষণের সমস্যা—এত সব সমস্যার সামনে সে উপস্থিত হয়। পাঠাভ্যাস কালে সে এসব কথা দিনেকের তরেও ভাবেনি। বাস্তব জীবনের প্রকৃত দায়িত্ব কি এ বিষয়ে তার কোন ধারণা ছিল না। ছাত্র-জীবনের বড় বড় কথা এখন তার দৃষ্টি-পথ থেকে সরে গেছে। কেমন করে একটি চাকরী যোগাড় করব, তারপর বিয়ে করব—সন্তানাদি হলে তাদের লেখাপড়া শিখা দিব, বয়স হলে তাদের বিয়ে দিব, তারপর নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করব—এইসব চিন্তা তখন তাকে পেয়ে বসে। হনুমানের লম্ফ দানের এই হয় শেষ পরিণতি।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এমন একটি তরুণ ছেলেকে বিনোবাজি জিজ্ঞাসা করলেন "তারপর তুমি কি করতে চাও"। ছেলেটি উত্তর দিল, "তারপর? কেন, এখন আমি কলেজে পড়ব"। বিনোবাজি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কলেজে ত পড়বেই, কিন্তু কলেজের শিক্ষা শেষ হলে কি করবে?" ছেলেটি উত্তর দিল, "হাঁ, এক সময় আমাকে এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত করতে হবে। কিন্তু এখন এ বিষয়ে কেন অনর্থক মাথা ঘামাতে যাব"। এইভাবে তিন বছর কেটে গেল। সেই ছেলেকে বিনোবাজি আবার জিজ্ঞাসা করলেন "এখন কি করবে?" সে উত্তর দিল, "না, এখনও কিছু স্থির করতে পারি নি। এখনও কিছুদিন বাকী আছে। পরে ভেবে একটি ব্যবস্থা করে নেব।"

"পরে দেখা যাবে" এই কথাটি সে ছেলেটি তিন বছর পূর্বেও বলেছিল। কিন্তু তখন সে সহজভাবে ও ভাবনা চিন্তাশূন্য মনে তা বলেছিল। কিন্তু এখন তার উত্তরের মধ্যে আছে একটা বিষাদ ও হতাশার সুর। আজ তার মন চিন্তা ও দুর্ভাবনার দ্বারা আক্রান্ত। আরও কিছুদিন পরে সেই একই ছেলের সঙ্গে বিনোবাজির পুনরায় সাক্ষাৎ হ'ল। তাকে প্রশ্ন ক'রে বিনোবাজি জানতে পারলেন যে সে এখন বিবাহিত, কিন্তু তার মুখে দেখলেন চিন্তার ছাপ। একদিন প্রভাতের আলোর মত তার মুখে যে সৌন্দর্য্য ও আনন্দ দেখেছিলেন, আজ তা কোথায় উড়ে চলে গেছে। তার কণ্ঠে সেই উদাত্ত সুরের মধুর ছন্দ নাই। শঙ্করাচার্য্যের বিখ্যাত প্রশ্ন "ততঃ কিম্"—তারপর কি—এই প্রশ্নের কোন মীমাংসা তার জীবনে হ'ল না।

জীবনের দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন জিনিষ। কিন্তু তবুও তাকে ভয় করলে চলবে না। তা থেকে পিছিয়ে পড়লেও চলবে না। জীবনের দায়িত্ব ত আনন্দের অপরিহার্য্য অংশ স্বরূপ। জীবন যাপনের জন্য বিধাতা মানুষকে কতকগুলি স্বাভাবিক বিধি দিয়েছেন। জীবনের দায়িত্ব ঈশ্বরের সেই বিধিগুলি সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন ক'রে তোলে। এইসব দায়িত্ব একদিকে অপার আনন্দপূর্ণ আবার অন্যদিকে নানাপ্রকার শিক্ষায় পূর্ণ। যা জীবনের দায়িত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন তার মধ্যে মানুষকে শিক্ষা দিবার কিছু নাই। অনেকে মনে করেন যে যদি আমরা শিশুদের মনে জীবনের দায়িত্ব-বোধ জাগ্রত করতে চেষ্টা করি, তাহলে তাদের আনন্দানুভূতিকে নষ্ট করে দিব। কিন্তু বিনোবাজির মতে তা ঠিক নয়। তিনি আরও বলেন যে বাস্তবতা-বোধ যদি জীবনের আনন্দকে নষ্ট করতে পারে তবে সে জীবনের কোন সার্থকতা নাই। সে জীবন জীবনই নয়। শিশুদের মনে দায়িত্ব-বোধ জাগ্রত করার প্রয়োজন নাই, এ কথা যাঁরা বলেন তাঁরা ভুল কথা বলেন। লোকে যে এরূপ ভুল ধারণা করে তার প্রধান কারণ জীবন সম্বন্ধে তাঁদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই। আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে জীবন মানে সংগ্রাম ও বিরোধ। কিন্তু জীবন যদি কেবল অবাঞ্ছিত ক্লান্তিকর সংগ্রাম হয় তাহলে শিশুদেরকে এ সম্পর্কে কোন শিক্ষা না দেওয়াই ভাল। শুধু তাই নয়—এই ধরণের বিরোধ ও সংগ্রামপূর্ণ জীবন যাপন করা কারুরই উচিত নয়। কিন্তু বিনোবাজি মনে করেন জীবনের অর্থ আরও ব্যাপক ও মহান। জীবন মহামূল্যবান। জীবন-যাপন নিশ্চয় প্রয়োজনীয়। জীবনের একটা সার্থকতাও আছে। সেইজন্য শিশুদেরকেও এই জীবনের সহিত পরিচিত করে দেওয়া দরকার। কারণ জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যতীত শিশুর প্রকৃত শিক্ষালাভ হবে না।

অর্জুনের শিক্ষালাভের একটি উদাহরণ দিয়ে বিনোবাজি বিষয়টিকে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মধ্যেই অর্জুনকে জগদ্বিখ্যাত গীতা শিখিয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে কোথাও গীতার আদর্শ শিক্ষা দিয়ে পরে যুদ্ধবিদ্যা তিনি শিক্ষা দেননি। যুদ্ধের বাস্তবক্ষেত্রে অর্জুনের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁকে সব কিছু শিক্ষা দেন। আমাদের দেশে ঠিক এর উল্টোপথে শিক্ষা দেওয়া হয়। আগে থিওরী পরে কর্মশিক্ষা দেওয়া হয়। শ্রীকৃষ্ণের পন্থা অনুসারে শিশুকে বাস্তব-জীবনের কর্মক্ষেত্রের মধ্যেই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা দরকার। গ্রামের শিক্ষার্থী শিশুদেরকে মাঠের মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে। সেখানে তারা কৃষকদের সাথে মাঠের কাজ শিখবে, কৃষিসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। তাদেরকে খাদ্য উৎপাদনের কৌশল শিক্ষা দিতে হবে। সেই সঙ্গে তারা বিশ্ব-তত্ত্ব ও বিজ্ঞানের বিষয়ও শিখবে। তত্ত্বমূলক কথা সে ত শিখবেই, কিন্তু সেই সঙ্গে তাকে প্রত্যক্ষভাবে বাস্তব-জীবনের দরকারী বিষয়গুলিও শিখতে হবে, সাক্ষাৎভাবে সেগুলির সহিত পরিচিত হ'তে হবে। এক কথায় শিশুকে বাঁচতে দাও। যে মানুষ বাস্তব-জগতে কাজ করবে সে প্রত্যহ কিছু না কিছু শিখবেই। ছেলেমেয়েরা খেলাধূলা করতে ভালবাসে, তাতে বাধা দেওয়া উচিত নয়। তাদেরকে স্বাধীনভাবে খেলতে দাও। ছোট ছোট শিশুরা যা করতে চায় তাকে তাই করতে দিয়ে তারই মধ্যে শিক্ষালাভ করার সুযোগ সুবিধা করে দিতে হ'বে। কেবল লক্ষ্য রাখতে হবে তাদের নিরাপত্তার দিকে। শিশুদেরকে প্রয়োজন মত কিঞ্চিৎ উপদেশ দিবার জন্য তাদের এইসব কাজকর্মের সময়, খেলাধূলার সময় কেউ যদি থাকে তবে তা মন্দ নয়। তবে যিনি তাদের সঙ্গে থাকবেন, তিনি উপদেষ্টা হবেন না, শিক্ষক হবেন না। তিনি হবেন প্রকৃত প্রস্তাবে তাদেরই কর্মের ও খেলার সাথী তিনি কেবল তাদেরকে গাইড করবেন। তাদের সঙ্গী হবার উপযুক্ত সেই ব্যক্তি যিনি বাস্তব জগতের সহিত পরিচিত। যিনি শিশুদের সঙ্গে কথাবার্তা খেলাধূলার মাধ্যমে জীবনের বিবিধ কাজের পদ্ধতি শিক্ষা দিতে সমর্থ হবেন।

এই ভাবে যদি শিশুদেরকে পরিচালিত করা হয়, তা হ'লে আলাদাভাবে "শিক্ষক" বলে কোন বস্তুর প্রয়োজন হবে না। আবার অন্যদিকে "ছাত্র" বলেও কোন একটা স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব থাকবে না। শিশুকে যখন কেউ জিজ্ঞাসা করবে, "তুমি কি করছ" তখন তার উত্তরে সে একথা বলবেনা যে "আমি শিখছি", আর গাইডও একথা বলবেন না যে "আমি শিক্ষা দিচ্ছি"। জীবনের বাস্তব ক্ষেত্র থেকে উত্তর আসবে যে "আমি জমি চাষ করছি, আমি তাঁত বুনছি।" যে শিশু যে কাজ করবে সে সেইমত উত্তর দিবে। "থিওরী" শিখছি এ কথা কেউ বলবে না। এই ভাবে শিশুকে কর্মের মধ্যে গড়ে তুলতে হ'বে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখলে বলতে হবে যে রাম ও লক্ষ্মণ ছিলেন আদর্শ ছাত্র। আর বিশ্বামিত্র ছিলেন আদর্শ গাইড বা পরিচালক। একদা বিশ্বামিত্র একটি যজ্ঞের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। রাক্ষসগণ তাঁকে বাধা দিতে এল। বিশ্বামিত্র রাজা দশরথকে বল্লেন, তাঁদেরকে ও তাঁদের যজ্ঞকে রাক্ষসদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য রাম ও লক্ষ্মণকে তাঁদের নিকট প্রেরণ করুন। রাজা তাই করলেন। বালকদ্বয় বুঝলেন যে তাঁরা একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়ে ঋষিদের নিকট যাচ্ছেন।—সে কাজ ঋষিদের যজ্ঞকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। তাঁরা ত শিশু মাত্র। তাঁদের জন্য কি অদ্ভুত শিক্ষাব্যবস্থা! কিন্তু কেউ তাঁদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করত "তোমরা কি করছ," তবে তাঁরা নিশ্চয় একথা বলতেন না যে তাঁরা শিক্ষা-লাভ করছেন। বরং তাঁরা বলতেন যে তাঁরা ঋষিদের যজ্ঞকে রক্ষা করছেন। যজ্ঞকে রক্ষা করার জন্য তাঁদের যে শিক্ষার দরকার তা তাঁরা কাজ করতে করতে শিখে ফেলেন। এই প্রকার উদাহরণ উপস্থিত করে বিনোবাজি বলেন যে শিক্ষাটা আর কিছুই নয়,—এ হচ্ছে প্রাকটিকাল কাজের বাইপ্রোডাক্ট বা উপজাত ফল। যে ব্যক্তি কোন ফলদায়ী (useful) কাজে নিযুক্ত হয় সে কাজ করতে করতে কাজের মধ্যেই শিক্ষালাভ করে। শিশু-

দেরকে কাজের মধ্যে এই ভাবে শিক্ষা দিতে হবে। ভুল তারা করবে—ভুল সকলেই করে। বয়স্ক লোকেরা ভুল করে করেই নিজেদের ভুল সংশোধন করে নেয়। ভুলের দ্বারা পথের সন্ধান পায়। শিশুরা হয়ত এখনও শক্ত হয়নি সুতরাং তাদের জন্য এমন ব্যবস্থা করতে হবে, এমন একটি আবহাওয়ার মধ্যে তাদেরকে ফেলে দিতে হবে যেন তারা ক্রমে ক্রমে ভুল ধরতে পারে, আর যদি ভুলই করে তবুও তারা ভুলের মধ্যেই আত্ম-নির্ভরশীল হবার কৌশল শিক্ষালাভ করতে পারবে।

শিশুরা কাজ করবে, এবং কাজের মধ্যেই শিখবে। কিন্তু দেখতে হবে, তারা একথা যেন ভেবে না বসে যে শিক্ষালাভের জন্য অথবা কিছু লাভের জন্য তারা কাজ করছে। শিক্ষালাভ করছি, এই মনোভাব নিয়ে কাজ করলে একপ্রকার প্রলোভনকে উৎসাহ দেওয়া হবে। "আজ কাজ করে এতটা শিখলাম, কাল কাজ করে আরও কিছু শিখবো"—ইত্যাদি মনোভাব প্রলোভনকে জাগ্রত করে। এই প্রকার মোহের পরিণতি শুভ নয়। যে এই প্রকার প্রলোভনের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে, মনে করতে হবে সে একটা ভাল শিক্ষা লাভ করেছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। মনে করুন কোন ছাত্রের জননী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ছাত্রটি প্রাণপণে জননীর সেবা করে যাচ্ছে। অবশ্য এই সেবার মধ্যে তার অনেক বিষয় শিক্ষালাভ হবে। কিন্তু শিক্ষা-লাভের প্রলোভনের জন্য মায়ের সেবা করছি এরূপ মনোভাব গর্হিত। মায়ের সেবা করাটাকে একটি পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতে হবে।—এখানে মাতৃ-সেবার পশ্চাতে কোন স্বার্থগত বোধ থাকা উচিত নয়। এই ভাবে প্রতিটি কাজ করে যেতে হবে। অবশ্য প্রত্যক্ষ-ভাবে তাতে বহু শিক্ষালাভ হবে।

এদেশে ও বিদেশে বহু শিক্ষাবিদ্ আছেন যাঁরা মনে করেন যে শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে ফলপ্রদ কাজেরও (useful work) একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার। এটাকে তাঁরা শিক্ষালাভের উপায় হিসাবে গ্রহণ করতে চান। শিক্ষার এই ফলপ্রদ বা ব্যবহারযোগ্য কাজকে "জীবিকার" উপায় হিসাবে গ্রহণ করতে সম্মত নন। "উদর পূর্তি"—"ক্ষুধা নিবৃত্তি" এই ধরণের কথার সহিত বহু অপ্রীতিকর চিন্তার স্মৃতি যুক্ত আছে। এই ভয়ে তাঁরা শিক্ষার সহিত জীবিকার্জনের কথাকে যুক্ত করতে চান না। বিনোবাজি এ কথা অস্বীকার করেন না যে তাঁদের এই অভিমতের মধ্যে কিছুটা সত্য আছে। কিন্তু তবুও এ কথাটাও ভাবতে হবে যে ঈশ্বর মানুষকে উদর দিয়েছেন। তার নিশ্চয় একটা উদ্দেশ্য আছে। যদি মানব সমাজ সংস্কারে উদর ভরণের কাজ করে তবে সমাজের দুঃখ দুর্দশার অবসান হবে। সমাজ থেকে বহু পাপ চিরতরে বিলুপ্ত হবে। মানুষ যদি সুদৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যে যার জীবিকার্জনের উপায় পবিত্র সে নিশ্চয় পবিত্র—তবে তাতে জগতের বহু উপকার হবে। জীবন-যাপনের পদ্ধতি যত ছোট ও নগণ্য হোক না কেন—পবিত্র হওয়া চাই। কোন প্রকার ছোট কাজকে ঘৃণা করা উচিত নয়। পৃথিবীর বুকে প্রতিটি মানুষ তীর্থযাত্রী। মহৎ ও সৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখে এই তীর্থযাত্রা করতে হবে। সৎ উপায়ে জীবন যাপন করতে পারলে আমাদের একটা আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে। এ দেশের ঋষিগণ যাকে বলেন "যজ্ঞ" তা আর কিছুই নয়—তা একপ্রকার পরিশ্রম যা মানুষকে তার দৈহিক জীবনের উপযুক্ত করে তোলে। খাদ্য সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিত বলেছেন, জেনে রেখো খাওয়ার কাজ কেবল পেট ভরা নয়—এ একটা "যজ্ঞীয় কাজ"। মানুষ পার্থিব-জীবনের জন্য কাজ করছে এ ত তার একটা স্বাভাবিক অনুভূতি। কিন্তু সেই সঙ্গে তাকে মনে রাখতে হবে যে তার এই পার্থিব-জীবনের তীর্থযাত্রাকে মহৎ অর্থে গ্রহণ করতে হবে। এটা মনে করা চলবে না যে এ জীবনটা ত ব্যক্তির দেহের নিজেরই জীবনযাত্রা। বরং প্রত্যেককে মনে করতে হবে যে এ সমগ্র মানব জাতির জীবনযাত্রা। যদি প্রত্যেক মানুষ মনে করে আমার দেহের তীর্থযাত্রা হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির সেবা—এ যদি মনে করতে পারে তবে সে দেখবে যে তার প্রতিটি কাজই ভগবৎ আরাধনার পূর্ণ পরিণতি লাভ করবে। প্রত্যেক মানুষকে এই ব্রত গ্রহণ করতে হবে যে সে তার দেহকে ঈশ্বরের

সেবায় নিযুক্ত করবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যেন তাদের মনে উক্ত প্রকার মহৎ ভাব জাগ্রত হয়। এবং এই উদ্দেশ্যে তাদেরকেও সাধারণ জীবনের অংশ গ্রহণ করার উপযোগী শিক্ষা দিতে হবে। তাদের শিক্ষা এই আদর্শকে কেন্দ্র করে রচনা করতে হবে। যদি এরূপ করা হয় তবে শিশুদের জীবন পূর্ণভাবে গড়ে উঠবে। তাদের জীবনে অবিরত অবচেতন ভাবে জ্ঞান সংগৃহীত হবে। তখন ছাত্র ছাত্রীগণ শিক্ষায় মাথায় বিভ্রান্ত হবে না। তারা সেই নিস্পৃহ মনোভাব প্রাপ্ত হবে যার জন্য সে পরিশ্রম করবে, কাজ করবে কিন্তু কাজের বা শ্রমের ফল ও পরিণতির দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে না। তখন দেশে সত্যকার মানুষ সৃষ্টি হবে যারা আনবে সমাজের মধ্যে আসল বিপ্লব। বিনোবাজি এইরূপ নৈপ্লবিক শিক্ষার কথাই বার বার বলে থাকেন।

"আমার সোনার বাংলা..."

॥ শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ॥

গ্রামের মাঠ শুকিয়ে ফাটি, ফসলে মাটি কাঁপে
রোদের তাপে, বুকের বুকে একটুও নেই আশা ;
নদীতে হাঁস মুরগী চড়ে, পাথরগুড়ি দিয়ে
বালিতে ঘর বানাই ব'সে। মাটির ভালোবাসা

আমায় ঠেলে দিলো এবার শহর কলকাতায়।
গাছেতে ছায়া নেই, ঘরেতে বসার নেই ঠাঁই,
তাকিয়ে চোখে পড়েনা মাটি, পথের ক্লেদ ঘেঁটে
ভীড়ের বুকে বাতাস খুঁজি ; আঁধারে হাতড়াই

কোথায় একটু আলো, কাশগলির শেষ কই ?
কোথায় বলো আকাশ আবার নতুন ক'রে দেখি ?
ক্যাম্পে জুটে দলে দলে হাত্‌টা পেতে আছি,
জীবন যাবার তপস্যাতে জীবন হ'লো মেকি।

আমার দেশ বাংলা, তোমায় তবুও ভালোবাসি ;
তাই ত' তোমার একটু ঘরে লোকের ঠাঁসাঠাসি।
ঘর ছেঁটিয়ে আগন্তুকে বসাই আসন পেতে ;
ভাইয়ের বুকে আগুন, আমি আনন্দে রই মেতে।

ভাবান্তর

॥ শ্রীক্ষুমুদরঞ্জন মল্লিক ॥

অনেকে চায় বস্তু পশুর ওই জীবন,
মনুষ্যত্বে মানুষ কি আর তৃপ্ত নন ?
যে সব জিনিষ চিরদিনের আনন্দ—
মানুষ কি তা করছে নাক পছন্দ ?

মানব মনের মুক্তা মাণিক কালজয়ী—
বন্য হ'ল মহাকাল যার ভাব বহি',
ভগ্ন করে ধ্বংস করে সেই সবই
অভিশপ্ত দগ্ধ জীবন বইবে কি ?

যুগের যুগের বর্ব্বরতার পলিতে—
দেখছি মোরা সোনার ফসল ফলিতে
উপপ্লব তো আসে ও যায় নয় স্থায়ী
আমরা এখি কৃষ্টি ধারার গুণ গাহি।

বিপুল বিশাল নর-দেবের এই সমাজ
শোভন শোভন নোতুন করাই শ্রেষ্ঠ কাজ
দুর্গতি আর বুকিনা তো কার হবে ?
দুঃশাসনের বাধ্য করার গৌরবে।

হিন্দু রাজত্বে ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা

॥ শ্রীমোহিত কুমার সেনগুপ্ত ॥

ধর্মপ্রাণ ভারতবাসী। তাই তাহাদের জীবনের সমস্ত স্তরেই ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান। পুরাতন কালে ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থাও ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়ানোই শিক্ষার উদ্দেশ্য। অর্জ্জিত গুণাবলী ও পরিবেশের প্রভাব এই দুইটি বিষয়ই শিক্ষার ধারা নির্দ্ধারিত হয়। একটি শিক্ষিত পরিবারের দুইটি শিশু শিক্ষায় দীক্ষায় একই রকম না হইতে পারে। আবার ইহাও দেখা যায় যে একেবারে অশিক্ষিত পরিবারের ছেলে পরিবেশের প্রভাবে সুনাম ও যশের অধিকারী হইয়াছে।

আর্য্যগণ ভারতের আদিম অধিবাসী নহেন একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আর্য্যগণ ভারতের উত্তর সীমান্তের গিরিপথ দিয়া দলে দলে ভারতে প্রবেশ করিয়া উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে প্রথমে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা নানাগুণ সমন্বিত বুদ্ধিমান জাতি ছিলেন। ভারতের আদিম অধিবাসীগণ প্রতিযোগিতায় তাঁহাদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া ক্রমশঃ ক্রমশঃ দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে হটিয়া যাইতে লাগিল।

আর্য্য ঋষিগণ বেদের মন্ত্র রচনা করিয়া এবং যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ধার্ম্মিক ক্রিয়াকাণ্ড করিয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিতেন না, তাঁহারা চাষ আবাদ করিতেন এবং আক্রমণকারীদের সহিত যুদ্ধও করিতেন। কিন্তু তাঁহারা যখন উত্তর ভারতের বিশাল প্রান্তরে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহাদের যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় নাই। সেই কারণেই দেখা যায় যে যুদ্ধবিদ্যা ও অন্যান্য দুঃসাহসিক কার্য্যের প্রতি অনুপ্রেরণা তাঁহাদের মধ্যে ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে থাকে। ধীরে ধীরে তাহারা অলস হইয়া উঠেন। চরম নিরাপত্তা বোধই ইহার একমাত্র কারণ। ভূমির উর্ব্বরতা, দেশের উষ্ণ আবহাওয়া এবং পর্বত ও সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত থাকায় বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেশবাসী নির্ব্বিঘ্ন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছে এবং এইরূপ জীবন যাত্রার ফলেই হিন্দু সভ্যতা ও কৃষ্টি একটি বৈশিষ্ট্য লইয়া গড়িয়া উঠে।

খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজাগণ শিক্ষা বিস্তারের জন্য কি করিয়াছেন তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। অবশ্য দেশে পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এই পদ্ধতি অনুসারে ছাত্রদিগকে ছয় বৎসর বয়স হইতে এগার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গুরুগৃহে থাকিতে হইত। কোন কোন শিক্ষাকেন্দ্রের এরূপ নিয়ম ছিল যে পাঠ্যাবস্থায় ছাত্রদিগকে একবারও পিতামাতা বা অভিভাবকের নিকট যাইতে দেওয়া হইত না। গুরুগৃহে অবস্থানকালে ছাত্রদের গুরু-গৃহের সকল কাজই করিতে হইত, এমন কি গুরুর জমিতে আবাদ করাও তাহাদেরই কাজের মধ্যে গণ্য হইত। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে চালাইবার জন্য ছাত্রেরা অনেক সময় ভিক্ষা করিতেও বাহির হইত। তাহাদিগকে তরুণ সন্ন্যাসী জ্ঞানে জীবন ধারণের জন্য অর্থ সাহায্য করা হইত এবং খাদ্য দ্রব্যও দেওয়া হইত। ইহা ভিন্ন রাজা ও জমিদারগণ কখনও কখনও বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য অর্থ সাহায্য করিতেন। এই সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-গুলিকে বাঁচাইয়া রাখা জনসাধারণ তাহাদের অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। এখানে একটী কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল না।

হিন্দু রাজত্ব কালে ভারতে তিন প্রকার বিদ্যালয়

ছিল—পরিষদ, টোল ও পাঠশালা। সমাজের বহুত ব্যক্তিগণের এবং বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণদের মিলনস্থল ছিল এই পরিষদগুলি। বিভিন্ন প্রকার বিধি ব্যবস্থা সম্বন্ধে রাজাদের পরামর্শ দান করাই এই পরিষদগুলির কাজ ছিল। ইহাকে এক কথায় আইন পরিষদ বলা যাইতে পারে। এখানে কিছু সংখ্যক ছাত্রদের দর্শন, তর্ক ও আইন শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা ছিল। ইউরোপে যে শিক্ষক-সংস্থা ছিল এবং যাহা পরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় তাহার সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে।

টোল ছিল আবাসিক বিদ্যালয়। টোলে কেবল মানী ব্রাহ্মণের ছেলেরাই ভর্তি হইতে পারিত। দশবৎসর বয়সে ভর্তি হইয়া ছাত্রেরা টোলে আট হইতে দশ বৎসর পর্যন্ত থাকিত। পাঠ্য বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে ছাত্রগণের মধ্যে কাহাকে কতদিন টোলে থাকিতে হইবে তাহা স্থির করা হইত। ছাত্রেরা ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরে বাস করিত। শিক্ষকগণই নিজ ব্যয়ে এই কুটীরগুলি নির্মাণ করিয়া দিতেন ও তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণও করিতেন। কোন কোন টোলে শিক্ষক মহাশয় স্বয়ং বাস করিতেন না কিন্তু সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত সারাদিন ছাত্রগণের সহিত থাকিতেন। শিক্ষকের অনুপস্থিতি কালে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের দেখাশুনা করার ভার লইত। টোলের ছাত্রদের কোন বেতন তো দিতে হইতই না উপরন্তু তাহাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থাও শিক্ষক মহাশয়ই করিতেন। এক একটি টোলে সর্বাধিক পঁচিশ জন ছাত্র থাকিত। জন-সাধারণের সাহায্যের দ্বারাই শিক্ষকগণ এ ব্যয়ভার বহন করিতে সমর্থ হইতেন। শিক্ষকের সুনামের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ধনী ব্যক্তি ও রাজাগণ অর্থ সাহায্য করিতেন। বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র ভিন্ন কলা ও বিজ্ঞানশাস্ত্র শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও এই সকল টোলে ছিল।

অতীতে ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেই হিন্দুসভ্যতা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই কারণেই বোধহয় কাশ্মীর বদরীকাশ্রম হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আধুনিক পেশোয়ারের নিকট তক্ষশীলা নামক স্থানে একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। তক্ষশীলা শিক্ষাকেন্দ্রে রাজা বিম্বিসার অর্থ সাহায্য করিতেন। শুনা যায় যে রাজা বিম্বিসার একবার কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলে তক্ষশীলার বিখ্যাত চিকিৎসক জীবকের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করেন।

অশোকের রাজত্বের পূর্বে ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার কোন বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। অশোকের রাজত্বকালে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কি করা হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ ইংরাজ ঐতিহাসিক Vincent Smith-এর লিখিত পুস্তকে পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—অশোক তাঁহার রাজ্যের বিভিন্নস্থানে, পর্বত গাত্রে, বৃক্ষ এবং স্তম্ভের উপর রাজকীয় নির্দেশ ও স্মারক লিপি খোদাই করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বোঝা যায় যে সে সময়ে সাধারণ লোকে মোটামুটি লেখাপড়া জানিত। আরও একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে যে এই লিপিগুলি সাধারণ লোকের পাঠের উপযোগী করিয়া সহজ ভাষায় লেখা এবং স্থান ভেদে ভাষারও কিছু তারতম্য রহিয়াছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক বৌদ্ধমঠ স্থাপিত হইয়াছিল এবং ইহা খুবই স্বাভাবিক যে মঠের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরাই গ্রামে গ্রামে শিক্ষা বিস্তার করিয়াছিলেন। অশোক যে সন্ন্যাসিনীদের উৎসাহ দান করিতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রিটিশ রাজত্বকালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিতের হার অপেক্ষা অশোকের রাজত্বে শিক্ষিতের হার বেশী ছিল—একথা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ১৯০১ সালের পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় যে অযোধ্যা ও আগ্রা প্রদেশে হাজার জন পিছু শিক্ষিতের হার ছিল পুরুষদের মধ্যে ৭৭% এবং মেয়েদের মধ্যে দুইজন মাত্র। ঠিক একই সময়ে ব্রহ্মদেশে হাজার প্রতি শিক্ষিতের হার ছিল পুরুষের মধ্যে ৩৭৮ এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে ৪৫ জন। যখন বৌদ্ধধর্মের সমধিক প্রসার ছিল এবং দেশে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সন্ন্যাসিনীদের প্রভাব বিদ্যমান ছিল তখন দেশের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইয়াছিল।

প্রাচীনকাল হইতেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রাজাদের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সাহায্য পাওয়া যাইত। এই বিদ্যায়তনের ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে বালাদিত্যের রাজত্বকালে। চীনা পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ অষ্টম শতাব্দীতে যখন ভারত ভ্রমণ করিতে আসেন তখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে। তখন বিদেশ হইতে অনেক ছাত্র এখানে শিক্ষালাভ করিতে আসিতেন। হুয়েন সাঙ-এর জীবন-চরিত রচয়িতা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। নালন্দা একটি বৌদ্ধমঠ। এই মঠের দক্ষিণে আমরা উদ্যানের মাঝখানে ছিল একটি ক্ষুদ্র জলাশয়। এই জলাশয়ে ছিল 'নালন্দ' নামে একটি নাগ বা সাপ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি সেই জলাশয়ের নিকটেই স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াই ইহার নাম নালন্দা।

আরও শুনা যায় যে তথাগত বোধিসত্ত্ব অবস্থায় একটি বিশাল রাজ্যের রাজা ছিলেন এবং নালন্দায় তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। অনাথ শিশু ও দুস্থদের দুঃখে অভিভূত হইয়া তিনি তাঁহার সর্ব্বস্ব তাহাদের মঙ্গলের জন্য দান করেন। এই মহৎ কার্য্যের জন্য লোকে ইহার নাম দিয়াছিল 'অখণ্ড দানশীলতা'। এই স্থানটি প্রথমে ছিল প্রভু অম্বের উদ্যান। ৫০০ শত জন বণিক দশ লক্ষ মুদ্রা মূল্যে ইহা ক্রয় করিয়া বুদ্ধকে উপহার দেন। বুদ্ধ তিন মাসকাল এই স্থানে নীতিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, এবং অধিকাংশ বণিক ইহাদ্বারা উপকৃত হইয়াছিল। বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভের পর শক্রাদিত্য নামে একজন রাজা বুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে এখানে একটি মঠ স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বুদ্ধ গুপ্তরাজ পিতার আরব্ধ কাজে হাত দেন এবং দক্ষিণ দিকে আর একটি সঙ্ঘারাম স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র তথাগত রাজ পূর্ব্বদিকে আর একটি সঙ্ঘারাম স্থাপন করেন। তাহার পুত্র মতান্তরে তাহার উত্তরাধিকারী উত্তর পশ্চিমদিকে আরও একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করান। তাঁহার দান গ্রহণ করিবার জন্য চীন হইতে কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ ভিক্ষুক আসিয়াছেন দেখিয়া রাজা আনন্দিত হইলেন এবং নিজে রাজত্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। তাহার পুত্র বজ্র পিতার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া উত্তরদিকে আরও একটি সঙ্ঘারাম স্থাপন করিলেন। তাহার পর মধ্য ভারতের আর একজন রাজাও আরও একটি সঙ্ঘারাম স্থাপন করিয়াছিলেন। পর পর ছয়জন রাজা এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

"অসীমের দান
ক্ষণিকের করপুটে, তার পরিমাণ
সময়ের মাপে নহে।
কালব্যাপি রহে নাই রহে
তবু সে মহান্ ;
যতক্ষণ আছে তারে মূল্য দাও পণ করি প্রাণ।
যায় যবে বিদায়ের রথ
জয়ধ্বনি করি তারে ছেড়ে দাও পথ
আপনারে ভুলি।
যতটুকু ধূলি
আজ তুমি করি অধিকার
তার মাঝে কি রহে না, তুচ্ছ সে বিচার।
বিরাটের মাঝে
এক রূপে নাই হয়ে অন্য রূপে তাহাই বিরাজে।
ছেড়ে এস আপনার অহংরূপ
মুক্তাকাশে দেখো চেয়ে প্রলয়ের আনন্দ স্বরূপ।
ওরে শোকাতুর, সেবে
শোকের বুদ্‌বুদ্ তোর অশোক সমুদ্রে যাবে ভেসে।"

—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫০—

(৮)

'অযোগ্যানঙ্গ-শোচত্বম্' শ্লোকটী কেন 'ব্যক্ত' হইল, তাহার আলোচনা হয়। 'দেহী নিত্যমবধ্য'—শ্লোকটী-দ্বারা কি ভাবে আত্মা অনাত্মা সমন্বয় ব্যাখ্যা করা সম্ভব, ইহা জিজ্ঞাসা করেন 'নাসতঃ বিদ্যতে ভাব' শ্লোকে ভাবুকের ও রসিকের দৃষ্টিতে দুইটী সৎ ও দুইটী অসতের 'অস্ত' দেখিবার কথাই আছে। ১১ টার পর চলিয়া আসি। শরীরটা আজ ভালোর দিকে।···

১১ই মে

সকালে ৮টার পর শিশির আসে। রাহুতার খবর বলে। হিন্দু ও মুসলমান দুই-ই হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্য কিছু জায়গা দিতে রাজী হইয়াছে। তাহার নিজের সম্বন্ধে কথা হয়। তাহার সম্বল কিছু নাই, সব হারাইয়াছে।··· সুযোগ সে অনেক পাইয়াছিল, কিছুই কাজে লাগাইতে পারে নাই, তাহার দো-টানা মনোবৃত্তিই ইহার কারণ সে বলে। রাহুতা ও ব্যবসার ক্ষেত্র, এক দিকে গেলে অপরটী হয় না। কর্মক্ষেত্র ছাড়িলে তাহা দাঁড়ায় না, রাহুতা না গেলেও তাহা থাকে না। আমি বলিলাম—এমন একটী কর্ম, এমন একটী সঙ্ঘ গড়া উচিত ছিল, যাহার ভিতর পরস্পর-বিরোধী কর্মও মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে। রেণুকে সেক্রিংস সার্টিফিকেটের বড়বাবু সেখানে মোটা মাহিয়ানায় চাকুরী নিয়া উজ্জল ভারতের সাহায্য করিতে বলে। কিন্তু উহারা যে পৃথক ক্ষেত্র, একটে ধরিলে অপরকে রাখা যাইবে না, সে বোধ তো তাহাদের নাই। কিন্তু 'উজ্জলভারত' পত্রিকা এমন একটী ক্ষেত্র হইতে পারে যেখান হইতে যতদূর ইচ্ছা যাওয়া যাইতে পারে, যত ব্যাপক কর্ম ইচ্ছা হউক করা যাইতে পারে, শত শত মানুষের মিলন-কেন্দ্র হইতে পারে। যে কর্মের বিশ্বকর্ম হইবার যোগ্যতা যত বেশী, সেইরূপ একটী কর্ম আশ্রয় করিলে কর্মবিভ্রাটে পড়িতে হয় না। কিন্তু সে কর্ম সাধারণ মানুষের হাতে নাই। কিন্তু শিশিরের তো ছিল। সে যদি ইহার সঙ্গে যুক্ত থাকিত তবে সামনের পথ তাহার খোলা থাকিত, অতীতের সব-কিছুর ব্যাখ্যা মিলিত। কিন্তু এখন তাহার অতীত তাহার কাছে অন্ধকার, শুধু নির্বুদ্ধিতারই পরিচয়। সব ভুলকে যিনি শুদ্ধ করিয়া দিতে পারেন, সব পতনকে যিনি উত্থানের পর্যায়ে গড়িতে পারেন, তাঁহার কর্ম ও আশ্রয় নেওয়ার কথাই শিশিরকে বলিলাম। সত্যাগ্রহীর কাছে কোন সময়ই 'too late' নয়। প্রত্যেক মুহূর্তেই গোড়া থেকে আরম্ভ করা যায়।···

১২ই মে

মালতীর ভিভাকটিভ লজিকটা একটু পড়ি। ৯টার কিছু পূর্বে জিতেন কুশারী আসে। সে গত ১০ই মে রেডিও টক দিয়াছে বর্তমান চুক্তির উপর। তাহা সে পড়িয়া শুনাইল। বৈশাখ মাসের সাময়িকীটা তাহাকে পড়াইয়া দিলাম। নিউ দিল্লীর এক ভদ্রলোক তাহার আফিসে গিয়াছিল, সে কোথাও হইতে উজ্জলভারত পড়িয়াছে, উহার নূতন গ্রাহকদের উল্লেখ করিয়াছে—জিতেন বলিল। তাহার নাম রেণুর কাছে আছে। রেণু ১০৪ টায় আসে। তখন জিতেন ছিল। রেণু ও জিতেন প্রায় একত্রই বাহির হইয়া যায়। রেণু যায় কলিকাতা। সে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং-এর বিজ্ঞাপনের ব্লক আনিয়াছে, মেট্রোপলিটানের ব্লক আনিয়াছে, কুমিল্লা ইউনিয়নের চেকও আনিয়াছে। এখানে আর সে আসে না।···আমি ৪টার পর আফিসে যাই। তখন মাখনবাবু আসিয়া পরীক্ষার

খাতা ঠিক করিতেছে।…সে (মালতী) বলে, ঘর করিতে লজ্জা করে। পুরুষোত্তম-দর্শনে ইহার স্থান নাই। বোকার মত ঠকা চলিবে না। বিবেকানন্দ বলিতেন, সাধু কি বোকা নাকি রে? একটা হাঁড়ী কিনসি তো তিনটা টোকা দিবে কিনবি'। ভাল মানুষি-ও পুরুষোত্তম-দর্শনে একটা কুসংস্কার। তাহাকে কিছুটা রিডিং পড়িতে দেওয়া হয় পি, ই, এন্-এর পত্রিকা হইতে। কালিদাসবাবু আসেন, পরে সুবোধ আসে তাহার ডাক্তারবন্ধুসহ ছাদুবাবু নামে অপর এক বন্ধুসহ। ছাদুবাবু দর্শনে interested। তাহার সঙ্গে সামান্য কথা হইল। রবীন্দ্রনাথের 'কলেবর' সম্বন্ধীয় একটী লেখা (যাহা ধীরেন-বাবু দিয়া গিয়াছেন) তাহা পড়িয়া শুনান হইল। বেণু 'ভাষ্যপ্রদীপ' হইতে উহার সমজাতীয় অংশ শুনাইল। 'নিরাকারই অনন্ত' ইত্যাদি। তখন ৯টা। তাহারা চলিয়া যান। সুবোধ ও জনের বাবদ ১২ টাকা দিয়া যায়।…আজ একটা দাঁত পড়িল।

১৩ই মে

খুব সকালে ৬টার মধ্যে বেণুর ওখানে গিয়া উজ্জল-ভারতের অন্তর্গত গীতার 'হৃত্বাহর্থকামান্' স্থানে 'হৃত্বার্থ-কামান্' হইবে, ইহা বলিয়া দিয়া আসি। আজই সকালে প্রুফ দিয়া যায়। তখনই চলিয়া আসি।…সে (বেণু) ১ টায় আসে ও চতুর্থ ফর্মের প্রুফ দেখে। ৩ টায় সে চাকুরিয়ার ব্রজেনবাবুর বাড়ীতে প্রুফ দেখাইতে চলিয়া যায়। প্রায় ৩৪টায় মালতী আসে। তাহাকে আজ লজিক পড়ানো আরম্ভ করি।…প্রতিভার লেখাটা পড়িলাম। লিখিবার হাত আছে মনে হইল। লিখিলে পারিবে। তাহাকে 'নুদেহমাদ্যম্' শ্লোক ও 'যস্ত দেবে পরাভক্তি' মন্ত্র বলিয়া দেওয়া হয়, সে নিজে লিখিয়া নেয়।…সন্ধ্যার পর বেশ বৃষ্টি হয়। ৯ টার পর পথে রিক্সা ধরিয়া আসিব বলিয়া খালি পায়ে বাহির হই। কিন্তু মোড়েও না-পাওয়ায় হাঁটিয়াই আসি। তখন বৃষ্টি একরূপ নাই বলিলেও হয়।…

১৪ই মে

খুব সকালে ৬।০টার মধ্যে বেণু এখানে আসিয়া আমার জুতা দিয়া যায় ও তাহার ছাতাটী নিয়া যায়। বেণু ১০।০টার পর কলিকাতা যায়…৩টায় চলিয়া আসে।—বাবুর সঙ্গে অনেক কথা হয়।—বাবুর জীবনের ঘটনা লইয়া। Social sanction না থাকিলে যে কাহারও কোন বৈপ্লবিক ব্যক্তিগত জীবন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, সেজন্য যে সমাজবিধি ও সমাজ-কাঠামো গড়িবার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং আমরা সে দায়িত্বই লইয়াছি, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করা হয়। প্রতিভা পোস্টাফিস ও ব্যাঙ্ক ঘুরিয়া ২টার পর আসে ও 'পঞ্চভূতের ফাঁদে' নকল করে।…আমরা ৩জন বাসীগঞ্জ গিয়া সেখান হইতে বাসে চাকুরিয়া যাই। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। ধীরেনবাবু দাঁতের বেদনায় কাতর।…৭-৮ মিনিটে রওয়ানা হই। পথে ঝড়ে পায়। ঝড় ঠেলিয়া ২এ বাসে উঠি। তখন বর্ষা নামে। আমরা রাসবিহারীর মোড়ে নামি। …৯।০টায় আমি ও প্রতিভা বাহির হই।…

১৫ই মে

সকালে আফিসে যাই—খাতাগুলির নম্বর ঠিক আছে কিনা দেখিবার জন্য। চিদানন্দও আসে। ১০টায় চলিয়া আসি। বেণু ১১টার পর কলিকাতা যায়। ফেরে ২টার পর। প্রতিভা প্রায় ৩টায় আসে। পাবনা হতীন বাবুর কাছ হইতে এক এনভেলাপ পাই। ওকালতনামা দস্তখত করিয়া পাঠাইবার জন্য উহা পাঠাইয়াছে। ধীরাজীর জায়গা পূর্ব্ব আলোচনা মত আমার নামেই কেনা হইবে—কুসুমের ইচ্ছা।…চিদানন্দ যাওয়ার পর আসে, অনেকগুলির নম্বর মিলাই। সন্ধ্যার পর ঝড় হয়।… সত্যই, আমার বিশ্বরূপকে না পাইলে আমার স্বরূপকে কেহ পাইবে না, গায়ে গা' লাগাইয়া থাকিলেও না। কেহই কাহাকে একান্ত স্বরূপ বা বিশ্বরূপ দ্বারা পায় না। দুইকে সমন্বয় করিয়াই পাইতে হয়। বেণু ও প্রতিভার মাঝে এই কথা আলোচনা হইয়াছিল। পাকিস্থান যদি এই চুক্তির সদ্ব্যবহার না করে, দুষ্ট বুদ্ধি লইয়া ফাঁকি দেয়, সে অধিকতর আগুনের, বিপর্য্যয়ের

ভিতর ডুবিবে। যে প্যাঁচের মধ্যে সে পড়িয়াছে, সে প্যাঁচ খুলিতে গেলে সরল হওয়া চাই। বুদ্ধির ভিতর প্যাঁচ থাকিলে প্যাঁচ আরও প্যাঁচ লাগিবে। কে জানে, তাহার পরই সে করিতেছে কি না। 'ইসলাম'-ই তাহাকে ডুবাইবে। বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম তো একান্ত ইসলাম নয়। একমাত্র পাকিস্থানই যুগের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করিতেছে। ৫ম ফর্ম্মা নিয়া আসি। রাত্রিতে ৫ম ফর্ম্মা দেখি। গীতার রিপ্রিন্টের ফর্ম্মাটাও আনি।...

১৬ই মে

সকালে ৮টায় আফিসে যাই। রেণু আজ খাতা শশীর ওখানে শেষ করিয়া দিয়া আসে। প্রতিভা আসে ১০টার পর। আমরা উভয়ে বাহির হই। প্রতিভা প্রুফ নিয়া প্রেসে দিয়া ১২টার মধ্যে ফেরে। ফিরিবার পথে রেণুর সঙ্গে দেখা। রেণু কলিকাতা যায় সেফ ডিপজিটে, পরে প্রেসে। রেণু ফেরে ৩টায়। তালপাঁস নিয়া আসে।...আমরা ৪টার পূর্ব্বে আফিসে যাই। রেণু ৭টার প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার প্রবন্ধগুলি লইয়া প্রিয়রঞ্জন বাবুর ওখানে যায়। পরে 'চলোস্মি' সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। ৮টার পর ফেরে। ইতিমধ্যে শশীনবাবু তাহার ও তাহার বন্ধুর ৮৲ টাকা দিয়া যায়। প্রেস হইতেও বাকি শেষ প্রুফ দিয়া যায়। বেশ জল ঝড় হয়। বৃষ্টির মধ্যেই প্রতিভা যায়। আমিও ৯টার পর বৃষ্টির মধ্যেই চলিয়া আসি হাঁটিয়া রেণুর ছাতি লইয়া।—বাবু রেণুকে বলিয়াছেন, স্বামিজী বেশী কৃষ্ণের কথা বলেন, কাহারও অন্য কোন আদর্শও তো থাকিতে পারে। আমরা কৃষ্ণকে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ সার্থক প্রকাশরূপে আলোচনা করিয়া থাকি। জীবনের যত দিক আছে, যত বৃত্তি আছে, সবগুলির সার্থকতা যাহাতে তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি কত হইয়াছেন, কত হইবেন। 'হওয়ার' কোন চরম রূপ নাই। 'সর্ব্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীল'—ইহাই তো তাঁহার বিশেষণ। যতখানি ব্যাপকতা ও গভীরতা আজ পর্য্যন্ত মানুষ কল্পনা করিতে পারে, সে কল্পনা যদি কোথাও বাস্তব হইয়া থাকে, তবে তাহা শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ তাই বিজ্ঞানসম্মতই সার্ব্বজনীন, সার্ব্বভৌম। যদি অন্য কোথাও সর্ব্ব বৃত্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ গভীরতর ও ব্যাপকতরভাবে পাই, তবে তাঁহাকেই জীবনে বরণ করিব, তাহাও পুরুষোত্তমেরই আস্বাদন। যাহার জীবনে প্রতিটী অংশ পূর্ণ, সব পূর্ণ অংশগুলির সমন্বয়মূর্ত্তি তিনি, তাঁহার বিশেষ কোন পাত্রে আটকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা কোথায়? তবে যদি বলা হয় যে সমগ্রের প্রয়োজন কি? যে কোন একটী নিলেই কি চলে না? না, বর্ত্তমান যুগে চলে না। 'যে কোন একটী, -গুলির যোগসূত্র কি বা কে হইবেন? সেগুলি কি 'আমি-প্রধান' হইয়া সঙ্ঘর্ষ লাগাইবে, না সমন্বিত হইবে? একই বিন্দে থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ব রচনা করিয়া এক-বিশের ব্যর্থতা আনয়ন করা বর্ত্তমান যুগে চলিবে না। যিনি সর্ব্বদ্বন্দ্ব-সমন্বিত, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। অপর যে-কোন নামে এই আদর্শ ও জীবন আস্বাদিত হইতে দিতে আমার কিছু বলিবার নাই। কৃষ্ণ সকলের অথচ কাহারও নহেন।

১৭ই মে

সকালে একবার আফিসে যাই। বিজ্ঞাপনগুলি ঠিক হইল কিনা দেখিয়া আসি। ১০টার পর আমার মা বালীগঞ্জ হইতে...আম...তাহাদের দেশের পাঠাইয়া দেন। একটী ছোট পত্রও দেন। আমি পত্রদ্বারা জানাইয়া দেই যে, মাথায় করিয়া তাহার এই স্নেহমাখা জিনিষগুলি লইলাম। কত সেবাই নিজের রাখা-করা জিনিষ দ্বারা তুমি করিয়াছ, কিন্তু আড়ালে থাকিয়া। আমার উপর ঠাকুরের যে 'দয়া', তাহা তোমাদের হউক। কাহারও স্নেহের ঋণ, অন্নের ঋণ শোধ না করিয়া ঠাকুরকেও পাইতে চাই না। ১০টার পর প্রতিভা আসে। সে ব্যাঙ্কের পাশ বই ঠিক করিয়া আনে ও প্রেসে শেষ ফর্ম্মার শেষ প্রুফ দিয়া আসে। রেণু পূর্ব্বেই কলম্বিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রেসে দিয়া গিয়াছিল। সে সেখানে ব্লক দিয়া সি. সি. কোম্পানী, পাবলিসিটি কোয়ার্স, বাঘবেটে যায় ও ৫টার মধ্যে তাহার বাসায় ফেরে। এখানে আসে না।

…প্রতিভা 'পঞ্চভূতের ফাঁদে' প্রবন্ধটার নকল করে। —মুর্শিদাবাদ হইতে রেণুর নিকট দুঃখ করিয়া এক পত্র দিয়াছে, তাহার exterenment-এর কালে বন্ধুদের ব্যবহারে সে দুঃখিত। রেজাউল করীমের নিকট পত্রিকা পাঠাইবার জন্যও লিখিয়াছে। উজ্জ্বলতারও নাকি তিনি পড়িবার জন্য -এর কাছ হইতে নিয়াছেন। সন্ধ্যার পর সুধাংশুর ছেলে শচীন একটী গ্রাহকের ৬ মাসের ২৲ টাকা দিয়া যায়। এই ভদ্রলোক তাহার অফিসে কাজ করে। শচীন তাহার মায়ের কাছ হইতে পত্রিকা নিয়া পড়ে, বাঁধাইয়া রাখে। পত্রিকার উপর তাহার রুচি আছে।

১৮ই মে

সকালে আফিসে যাই। কিছু পরেই আসি। রেণু ১০টার বোনেরার কোম্পানীতে গিয়া রাজেনবাবু সহ হাওড়া কুমারেশে যায়। জুলাই হইতে কণ্ট্রাক্ট করিবে। তিন-মাসের মধ্যে টাকা পাওয়া যাইবে না। রেণু এখানে আসেনা।.....প্রতিভা ব্যাঙ্ক ও ছানিম্যান ঘুরিয়া ৪টার পর আসে।..... মানুষের বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলা হয়, তাহার প্রতিবাদ বাক্যদ্বারা করিলে কথা কাটাকাটিই হয়। প্রতিবাদ করিতে হয় জীবনকে বাড়াইয়া, অগ্র-গতির ভিতর দিয়া। 'চরৈবেতি'। মানুষের জীবনে যখন অগ্রগতি থামে, তখনই ঈর্ষা বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। অমুকের তেতলা দালান দেখিয়া আমার ঈর্ষা হয়। আমি ঐরূপ পারিলাম না, অথচ ঐ লোক পারিল—এই তুলনা-মূলক চিন্তার ভিতর দিয়া উহাকে টানিয়া নামাইতে চাই, অথচ আমার আত্মশক্তির উন্মেষের দিকে দৃষ্টি নাই—ইহাই তো ঈর্ষার মনস্তত্ত্ব। 'আমার মত আমি ফুটিয়া উঠিব, আমার মতই আমি হইতে পারি, অন্যের মত নয়, তাহাতে আমি তেতলা পাইতে না পারি, অন্য কিছু শ্রেষ্ঠ স্থানও তো দখল করিতে পারি'—ইহা বুঝিলে ঈর্ষার মূল নষ্ট হইয়া যায়। নিজের অক্ষমতাই প্রতিফলিত হইয়া ঈর্ষার আকারে পরিণত হয়। 'চরৈবেতি, চরৈবেতি'—ইহাই জপ কর। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। পথে দাঁড়াইয়া নিজের ভাগ্য লইয়া কাহারও সঙ্গে কাড়াকাড়ি, টানাটানি, বোঝাপড়া করিও না। যতটুকু ব্যবহার না করিলে পথ-চলা অসম্ভব হয়, ততটুকু ব্যবহারই পাশের মানুষদের সঙ্গে করিবে। সামনের দিকে আগাইয়া গিয়া, কাহাকেও আঘাত না করিয়া অথচ সকলের সঙ্গে জীবন-গত সহযোগিতা রক্ষা করিয়া আগাইয়া চল। 'অহম্' ও 'সর্ব্ব' দুইটী দৃষ্টিকোণ। দুই দৃষ্টির সমন্বয় যেখানে, সেখানেই পুরুষোত্তম। সর্ব্বকে পুরুষোত্তম-সর্ব্বে সৃষ্টি করিবার আকাঙ্ক্ষা যদি না থাকে, তবে সকলের সব মর্য্যাদা স্বীকার করিয়া লইলে জীবনে অচল অবস্থা আসে। ইহাই এ দেশের ব্রহ্ম-ভাব। 'সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম'। সকলকে স্বীকার করিলে সব ইন্দ্রিয় স্তব্ধ হইবেই, যদি গড়িয়া তুলিবার উন্মাদনা তাহার সঙ্গে না থাকে। সকলের সবটুকুকে পুরুষোত্তম-স্তরে গড়িয়া তুলিবার তীব্র লালসা লইয়া যে সকলের প্রতি সমভাব, তাহাই পুরুষোত্তম-জীবনের স্ব-ভাব। ৯টার পর আশ্রমে ফিরি। প্রণতিকে ৮–১০ মিঃ রেণু পৌঁছাইয়া দিয়া আসে।

৯টার পর.....রেণুর ওখানে হইয়া এখানে আসে। .....রাখিয়া যায়। তাহাকে অন্ততঃ ৭দিন প্রতিভার ওখানে থাকিয়া আমাদের দর্শন সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিবার জন্য বলা হয়। যদি কোনদিন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে, খালি হাত না লইয়া আসিলেই তো সেখানে স্থান হয় না? সে বয়সে, আমার সহিত পরিচয়কালে ছিল সকলের চেয়ে বড়। তাহারই যোগ্য হইয়া সকলকে আবরণ করিয়া রাখিবার অধিকার ছিল। কিন্তু সে অধিকার লাভের জন্য কোন চেষ্টাই নাই। মাসে ২।১ দিন শুধু দেখা দিয়া গেলেই কি এই অধিকার তাহার থাকে? অধিকার অর্জ্জন করিতে হয়, দাবী করিলেই পাওয়া যায় না। যতটা আগ্রহ এখানের জন্য থাকা উচিত ছিল, তাহা নাই। তাহাকে 'কার্পণ্য' ও 'ক্লৈব্য' শব্দের অর্থ গীতাভাষ্য হইতে পড়িতে বলা হয়। সে পড়ে। 'টাকা নাই' বলিয়া সে আসিতে পারিবেনা, বলিয়াছিল। সারা বৎসর করিয়া এজন্য টাকা রাখা উচিত ছিল।

রেণু এখানে আসে ১টায়। প্রতিভা আসে ২টার পর। শরীরটা ঠিক সুস্থ নয়। আমরা ৪টার মধ্যেই বাহির হই আফিসে যাইবার জন্য। পথে বাস স্টপেজে ধীরেন-বাবুর সঙ্গে দেখা, তিনি এখানে আসিতেছিলেন। তিনিও সঙ্গে আফিসে যান। রেণু অবধূত-ভাষ্য—ভাষ্য-প্রদীপের প্রথম হইতে পড়া সুরু করে। সম্পাদকের নিবেদন, নিত্যচন্দ্রিকা, ও মূল পুস্তকের ৩।৪ পৃষ্ঠা পড়া হয় ও তাহার সম্বন্ধে বক্তব্য বলা হয়। ইহার পর ব্যাপার মিলাইতে প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত।.....

সকালে ৭।০টার মধ্যে নলিনীর একটা চিঠি পাই (কালই আসিয়াছিল), হেমন্তবাবুর খুব অসুখ। সেই চিঠি লইয়া রেণুর ওখানে তখনই যাই। ৯টার পূর্বে দেশপ্রিয় পার্ক হইতে রওয়ানা হইয়া ১০টায় নলিনীর বাসায় পৌঁছি। হেমন্তবাবুর অবস্থা একটু ভাল। পা' বুকে লইয়া কাঁদিতে লাগিল। সেখানে নলিনী ও হেমন্ত-বাবুর আগ্রহাতিশয্যে অভ্যাস অবস্থায়ও·· খাইতে বাধ্য হই। কোনও নিয়মই তো প্রাণের দাবীর সামনে মানি নাই। জীবন হিসাবে বেহিসাবে চালাইয়া আসিয়াছি। আসিতেই হইবে···দেখা করা চাই-ই। আবার নলিনীদের আগ্রহও উপেক্ষা করা চলে না, হেমন্তবাবু মুমূর্ষু।···১১টায় রওয়ানা হইয়া শিয়ালদহ হইতে ডালহৌসীর ট্রাম ধরিয়া ১২টায় আশ্রমে পৌঁছি। আসিয়া স্নান করিয়া শুইয়া পড়িতেই সুধাংশু আসে। সে ১০টা হইতে রেণুর ওখানে বসিয়া ছিল। রেণুকে আজ এখানে আসিতে ট্রামের মধ্যেই মানা করিয়া দেওয়া হয়। প্রতিভা আসে ২টায়।··· তেতলার উপর ৪টী শিশু নিয়া সকলেই বিব্রত, উহারাও বিব্রত। উহারা চায় ছুটিতে, কিন্তু আবেষ্টন যে পরিচ্ছিন্ন, তাহাদের চারিদিকে যে পাষাণ প্রাচীর। সর্ব্ব বৃত্তির উন্মেষ তাই রুদ্ধ হইতে বাধ্য প্রাকৃতিক নিয়মে। আচার্য্য শঙ্কর ঠিক এই শক্ত আবেষ্টনের মাঝেই জ্ঞানপূর্ব্বক চিত্তবৃত্তি নিরোধের পথ দেখাইয়াছেন। উপায় নাই। কিন্তু তেতলাকে যদি রাস্তার মাঠে পুকুরপাড়ে ছড়াইয়া দেওয়া যাইত, শিশুদের ছুটিবার সাথ মিটিত, খেলার ভিতর ছন্দ ফুটাইয়া দিতে পারিলে সংযমও আসিত। প্রথম আবেষ্টনই 'মায়া'। দ্বিতীয় আবেষ্টন 'যোগমায়া'। শঙ্কর-দর্শন ও পুরুষোত্তম-দর্শনের তফাৎ এইখানেই। স্বল্প পরিসর শক্ত পরিস্থিতির মধ্যে মদনকে suppress করিতেই হইবে। যদি তাহাকে খেলা দিয়া বশে আনিতে হয় বিশ্বরূপের ক্ষেত্রেই তাহা সম্ভব। বিশ্বরূপই মদনমোহন। সন্ধ্যার পর জলঝড় হয়।···সন্ধ্যার পর উজ্জ্বলভারত আসে।

২১শে মে

৭টার পূর্ব্বেই প্রতিভা ও সুধাংশু আফিসে আসে। সুধাংশু প্রতিভার সঙ্গে রাত্রিতে ছিল। আমি ৭।০টার পর যাই। ১০টার পর এক দফা পত্রিকা প্রতিভা-সুধাংশু পোস্টাফিসে দিয়া আসে। রেণু পি, টি, স্কুলগুলির বিল ঠিক করিয়া রাইটার্স বিল্ডিংএ দিয়া আসে।···অমল হোম, মন্মথবাবু, নিখিলবাবুদের সঙ্গে দেখা করে।···জয়া ৪টায় আশ্রমে আসে।·· জয়ার কাছে 'নাম' করিবার কৌশল কি তাহা বলি। যেমন তেমন করিয়া নাম লইলেই যে প্রেম হয় না, তাহা মহাপ্রভু বলিতেছেন—'যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়। তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রাম রায়।' 'অতঃ শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি' এবং প্রহ্লাদের শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া বলি।···ভারতের কোনও দার্শনিকই এপারে ব্রহ্মের আসন স্থাপন করেন নাই। তাহাদের পক্ষে মানবের সর্ব্বেন্দ্রিয়, সর্ব্ববৃত্তির সঙ্কোচ ও নিরোধ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তাহারা এই জগতের সংযোগের মূলেই অজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন সংযোগকে absolutely হেয়-হেতু বলেন নাই। দ্বন্দ্ব না-জানার জন্য সংযোগ হেয়-হেতু হয়, technique-এর খোঁজ পাইলেই সর্ব্ব সংযোগ হয় ব্রহ্ম-আস্বাদন। শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবে বিশ্বসৃষ্টির মূল প্রেরণার অর্থ মানুষের কাছে খুলিয়া ধরিলেন। আমরা এই সম্পদের অধিকারী হইয়াছি। যাহারা এই দর্শন বুঝিবেন ও আয়ত্ত করিবেন, তাহারা আগামী যুগের পুরোবর্ত্তী থাকিবেন, তাহাদের কাছে লক্ষ লক্ষ মানুষ পথের খোঁজ পাইবেন। আমাকে ঘিরিয়া যাহারা আছেন,

তাহাদের সম্বন্ধে আমার ইহাই দাবী রহিল। ...১০টায় চলিয়া আসি। প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় প্রবন্ধ রেণু পড়ে। হেরম্ববাবু কিছু কালের জন্য আসেন। রামগোপালও প্রবন্ধ শোনে।

২২শে মে

সকালে একবার আফিসে যাই। সুধাংশু প্রতিভার ওখান হইতে আসে। রেণু ও সুধাংশু প্রায় ৮৷৷০টার পর পত্রিকা পোস্টাফিসে দিয়া আসে। বাকীগুলি রেণু দুপুরে দিয়া আসে। আমরা একত্র হইয়াই বাহির হই। উহারা পোস্টাফিসে যায়, আমি আশ্রমে আসি। রেণু দুপুরে ব্যাঙ্ক ও পোস্টাফিস ঘুরিয়া এখানে আসে ১টার পর। প্রতিভা-সুধাংশু আসে ৩টার কিছু আগে। প্রবন্ধগুলি পড়া হয়। আমার পাগল প্রাণ লইয়া আমি বিব্রত। কাহারও জন্য কিছুই হয়তো করিতে পারিব না, তবুও তো প্রাণ চায়। এই চাওয়ার মূলে যদি গড়িয়া তুলিবার একটা ইচ্ছা না থাকিত, তবে ইহা চণ্ডীর সুবর্ণ-সমাধির মত আত্মীয়স্বজনের জন্য ভাবনামাত্রই হইত। এক তরফা কি কিছু করা যায় যদি অপর দিক হইতে সাড়া না পাওয়া যায়, নিতে না চাহিলে দেওয়াই কি যায়? নিতে না চাহিলে দিতে যাওয়ার বিপদই আমাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। এক একবার ভাবি—মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াই। বিশ্বের বিশ্বেশ্বর আছেন, আমি কে মানুষের জন্য ভাবিবার? যাহার মন তিনিই তাহার জন্য উপযুক্ত লোক দিয়া যাহা হয় করিবেন। এমন সর্ব্বতোভাবে ফকিরের দ্বারা এ সংসারে কিছু হয় না। আমার তো ঐশ্বর্য্য—না দৈহিক, না মানসিক, না আর্থিক—কিছুই নাই, লোক কেন আমার দিকে তাকাইয়া থাকিবে? তাহাদের জীবনের যাবতীয় ঘটনার মধ্যে শৃঙ্খলা আনিবার জন্য, একটা সমাধান আনিবার জন্য আমার যাবতীয় প্রচেষ্টা। তাহারা আড়াল দিয়া চলিতে গেলে যে অবস্থা হয়, তাহাই আমার হইয়াছে। আমার প্রাণ, আমার কথা আমি বুঝাইতে পারিলাম না। আমার মনের মধ্যে অবগাহন করিয়া কেহ আমার মনের কথা বুঝিয়া সেই অনুসারে আমার ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করিতে শিখিল না, কেহই বুঝি শিখিল না।

সকালে 'সফলতের কাঁধে' ও প্রতিভার বিষয়গুলি আষাঢ় মাসের শেষ প্রুফ দেখিয়া রাখি। রেণু দুপুরে ডি, ডে, কীমারে ব্লক দিয়া আসে। দিলীপ গুপ্ত বলেন যে, আপনাদের সাময়িকী খুব আনন্দের সহিত পাঠ করি। মণীন্দ্রগোপাল বসাক বলেন দক্ষিণ কলিকাতার intelligentia সকলেই 'উজ্জলকারক' জানে। রেণু আসে ১৷৷০টায় কলিকাতা ঘুরিয়া। প্রতিভা আসে ৩টায় পোষ্টাফিস হইতে। সুধাংশু আসে ৪টার পর। মালতী আসে ৪টার পর। নন্দরাণীর চক্ষু দেখাইবার জন্য রেণু তাহাকে নিয়া যায়।...মালতী আবার একটি থারমোমিটার ভাঙিয়াছে, তাহার জন্য ৪৲ টাকা নিয়া গেল। আমার সমস্ত জীবন ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। কলেজ ছাড়িয়া ছাব্বিশদিন রোডে প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের বাড়ীর একতলায় আমার দোকান, তাহাতে সুবিধা না হওয়ায় একদম বৃন্দাবনে ৩।৷০ মাস, সেখান হইতে আসিয়া হুগলীতে ঠাকুরের কাছে, পরে বাড়ীতে এক বৎসর, (মা তখন নাই), তৎপরে ৮ বৎসর ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে মাস্টারী, পরে তাহা ত্যাগ করিয়া নিতাইবাবুদের অনুপ্রেরণায় বরিশালে বসিয়া একবৎসর বেদান্তের ভাষ্য সমাপ্ত করা (তাঁহারা মাসে ৫০৲ টাকা পাঠাইতেন), তাহা লইয়া বেদান্ত প্রচারে কলিকাতা, তখন কলিকাতা কংগ্রেসে অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত এবং বরিশালে প্রাদেশিক কনফারেন্সের বৈঠক বসে সেই বৎসর। তাহাতে কায়মনোবাক্যে যোগদান, প্রাণ খুলিয়া কংগ্রেসে সেবা, ফাঁক না রাখিয়া সেবা। পরে দেশবন্ধুদ্বারা সতীন সেনের সাহায্যে কংগ্রেস অধিকৃত হওয়ায় বাহিরে আসিয়া স্বরাজসেবকসঙ্ঘ গঠন, (গোপেন্দু সাহা ১০০০৲ টাকা ঘর তুলিতে দেন), সেখান হইতে কলিকাতায় সৌরাষ্ট্র-গোষ্ঠী গঠন, তাহা ছাড়িয়া আবার ২৷৷০ বৎসরের জন্য বৃন্দাবনে অবস্থিতি, সেখান হইতে ১৯৩০ সনের লবণ

আইন অমান্যে যোগদান ও ৩ মাস কারাবরণ। স্বরাজ-সেবকসঙ্ঘ সুরেশ গুপ্তদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় আসা ও নরনারায়ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা। সঙ্গে স্ত্রী পুত্রকন্যাগণ। আমি আগাইয়া চলিয়াছি বিশ্বের ভিতর দিয়া। কর্মী দলে দলে আসিয়াছে, গিয়াছে। সকলেই আমার বুকে রহিয়াছে। আজ 'উজ্জয়ন্তীবাস্তু' নিয়া চলিতেছি, সঙ্গে রেণু-প্রতিভা প্রভৃতি। এই যাত্রা কি এখানেই এবার শেষ? না আবার তাজন আসিবে? সকলেই যেন আমার বুকে থাকেন।.....গোপাল গুপ্তের পুত্র ফোন করিয়াছিল তাহাদের ওখানে যাইবার জন্য, গোপালবাবু আসিয়াছেন, তিনি অসুস্থ।.....

২৪শে মে

সকাল ৭টার মধ্যে গোপাল গুপ্ত মহাশয়ের পুত্রের আসিবার কথা ছিল আমাকে তাহাদের বাসায় নিয়া যাইবার জন্য। আসে নাই।.....রেণু আসে ৪টার পর। কলিকাতায় অনেক জায়গায় সে যায়। নন্দরাণী ও যমুনাকে বেণু চলমার দোকানে নিয়া যায়। সন্ধ্যার পর গোকুল আসে। গোকুল দেহ রক্ষার জন্য আসনাদি করে, জলতপও ভাল লাগে। কিন্তু সকাল বেলা সময় থাকিলেও তাহার স্টেনোগ্রাফি বা এম. এ-এর বই পড়িতে ভাল লাগে না। কেন, তাহা জিজ্ঞাসা করে। আমি বলি—হয় সারাদিনের খাটুনি খাটিবে বলিয়া মন বিশ্রাম নিতে চায়, নয় তো মনের স্বাভাবিক কর্মবিমুখতা বশতঃ যাহা না-করিলে নয় অর্থাৎ চাকুরী সেটাকে মনে ইচ্ছার অনিচ্ছায় মানিয়া লয়, আর বিহুর দিকেই সে এগোতে চায় না, কিম্বা একা থাকার জন্যও হইতে পারে। একা থাকিলে মানুষের কর্ম কমিয়া আসিতে থাকিবে। যাওয়া-আসায়, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া ইহা সারিয়া যাইবে বলিলাম।.....প্রতিভা ভাবদবাবুর বিবেকানন্দ (যাহা সমালোচনার জন্য দেওয়া হইয়াছে) পড়িয়া শুনায়। ...জীবনের গভীরতম সমস্যা-সমাধানের ও জনসমাজের কাছে উপস্থাপিত করার যে গুরুদায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা বিবেকানন্দ হইতে গুরুতর। বর্ণাশ্রম ও বর্ণাতরঙ্গ-সহজিয়াদের সমন্বয় যে কি বিরাট ব্যাপার, তাহা ভাবিয়া আনন্দও পাই, আকুল হইয়াও পড়ি। ১টায় পর ফিরি।

সকালে একবার আফিসে যাই। গোকুল তখন সেখানে ছিল, ৭টার পূর্বে আসিয়াছিল। সে তাহার দিদিকে বলিয়াছে, তোমার কাজের ভার আমাকে দেও। রেণু কলিকাতা ঘুরিয়া ৩।৩০টার পর আসে। প্রতিভাও প্রায় ৪টায় আসে পোষ্টাফিস হইয়া। ৬টার পর বীরেন বাবু আসেন। তাহার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (পুস্তক পরিচয়) ভাল লাগিয়াছে।.....সমগ্র বিশ্বের বুকে জীবনের সমস্ত দিক বিকশিত করিয়া দাঁড়াইবার উপযোগী পথের খোঁজ তো পাইয়াছি, কিন্তু কে সেই পথে চলিবে? তাহাতে যে সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত হইতে হয়। কে সাধের সংস্কারের পুটলি ছাড়িয়া ফকির হইবে? এ-পথে ফকিরেরাই যাতায়াত করে। গায়ে গায়ে ঠোকাঠুকি হইবে না, অথচ সকলে গায়ে গা' লাগাইয়া, বুকে বুক লাগাইয়া, চলিবেন। কি সহজ মুক্ত অবস্থা! ইহাই তো পুরুষোত্তম-সৃষ্টির প্রাণ-কথা। 'উজ্জয়ন্তীবাস্তু' বাহিরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়াছে রেণুর ভিতর দিয়া। তাহার জীবন ও পথ-চলা যত সহজ, সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে, ততই বাহির ঘরে আসিবে।.....নিজ যোগ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিধি সমানতালে বাড়িলে কোনও দিক হইতে কোন বিপদ আসিবার সম্ভাবনা থাকে না। সম্ভাবনা রোধ করাই তো সাধনা। 'মাত্রা'-র দিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এ পথ খুব জটিল। এ পথে প্রাচীনেরা পা দিতে চান নাই। কিন্তু বর্তমান যুগ 'সিনান করিবি কেন না ভিজাবি'-র যুগ। এই পথে···প্রথম প্রবর্তকদের খুব হুঁসিয়ার থাকিতে হইবে। ১টার পর ফিরি।

২৬শে মে

আজ আর সকালে বাহির হইনা, সাময়িকী—'চুক্তির পরে' লিখি। রেণুর ওখানে গোকুল আসে, শেখরবাবু

আসেন। -র ব্যক্তিগত জীবনে যে বিপ্লব আসিয়াছে, তাহার একটা বিজ্ঞানসম্মত 'আইন' স্থাপন না হইলে কি করিয়া সমাজে তাহা প্রযুক্ত হইবে, কি করিয়াই বা তাহার কার্যাবারা সমাজে প্রভাবান্বিত হইবে, যদি তিনি মনে করেন যে তাহার এইরূপ বিপ্লবাত্মক কর্ম্ম সমাজের মধ্যে চালু হওয়া উচিত? ইহার সামাজিক অনুমোদন না থাকিলে উহা ব্যক্তিগত জীবনে থাকিত। এই সামাজিক অনুমোদন ও তদনুযায়ী সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্যই আমাদের অভিযান। রেণু ১১০টার পর আসে। ইহার পূর্ব্বে বৃষ্টি হইতেছিল। প্রতিভা আজ আর আসে না। হয়তঃ বৃষ্টির জন্যই আসিতে পারে নাই।.....অন্নার মা এক পোষ্টকার্ডদ্বারা তাহার ওখানে গিয়া খাইবার নিমন্ত্রণ জানাইয়াছে আগামী সোমবার ২৯শে মে।.....চিঠিটুকু বেশ মিষ্টি হইয়াছে।.....'তবে মেয়ের একটা কথা শুনুন—ঐ ভাল জিনিষটা আমার কাছে বসে খাবেন। বাবা, এটা আমার অনেক দিনের ইচ্ছা জানিবেন।.....আপনার চোখের দোষ—সেজন্য যেন একলা আসিবেন না.....।' মনে পড়িতেছে সৌদামিনীর (হিজলতলার সতীশ দাসের মা) কথা। সে কেমন করিয়া নিজের হাতে খাওয়াইয়া দিত, তারপরে মুখ ধোয়াইয়া দিত, আমি গোপালের মত বসিয়া খাইতাম। সেইজন্যই সতীশের বাবা আমায় 'বাদু-গোপাল' বলিয়া ডাকিতেন এবং এইভাবে খাওয়া-খাওয়ানোর রস আস্বাদন করিতেন। বউরাও আনন্দে পরিবেশন করিত। কি স্নেহপূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি ছিল আমার পিছনে পিছনে। অমন করিয়া আমাকে তো কেহ আবরণ করিয়া রাখে নাই। রেণু সন্তোষ অধিকারীর বাসায় যায় ও দেখা করিবার জন্য একটা চিঠি রাখিয়া আসে।

২৭শে মে

সকালে একবার আফিসে যাই। নলিনী দত্ত আসেন ৮৷০ টায়। রেণু গ্রাহকদের কাছ হইতে টাকা সংগ্রহে বাহির হয়। ৪ জনের কাছে যায়। তাহারও সঙ্গে দেখা হয় নাই।...বলিল,—বলেন, 'আমি অনেক তপস্যা করিয়াছি, এখন ভোগ করিবার যোগ্যতা হইয়াছে। আচ্ছা, উনি (শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ) কিছু ভোগ করেন না কেন? রেণু বলিল, ভোগ্যবস্তুকে বিশ্বরূপের সঙ্গে মিলাইয়া বিশ্বরূপ করিয়া রাখিয়া ভোগ করাই পুরুষোত্তম-ভোগ। আমার গণ্ডীর মধ্যে আটকাইয়া ভোগ করা ভোগের ব্যর্থতা। বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে ভোক্তা-ভোগ্যের উপাধি ছাড়াইয়া ভোগ করাই ভোগকে হজম করা। মুখে 'হজম করিতেছি' বলিলেই তো হজম হয় না। উহাই পরিপাক করার কৌশল। আমাদের স্বামীজী এই ভোগের কথাই বলেন। যে ভোগে ভোগ্য বস্তু মুক্তি না পায়, ভোগ্য যদি ভোক্তার মত স্বতন্ত্র, কেবল না হয়, তবে সে ভোগ জীবনে দুর্ভোগই আনয়ন করে। পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের ভোগই একাধারে যোগ ও ভোগ।...আমি কাহারও মর্য্যাদাহানিকর কিছু না করিতে বা না বলিতে প্রাণপণ করি। তবুও আমার ও তাহার কাছে বিষয়টা পরিষ্কার করিবার জন্য আলোচনা করিতে হয়। না হইলে ভুল বোঝা আসে। জিজ্ঞাসা করিতে গেলে যদি কেহ দেখা না পায়, বা অবাক্ হইয়া পাল্টা প্রশ্ন করে, তখন আর আলোচনার সার্থকতা থাকে না। সত্যই আমি, সংসারে ক্ষত-বিক্ষত আমি, চাই যে, একদল আমার মার দেওয়াও হাসিমুখে আহ্লাদের সহিত আশীর্ব্বাদজ্ঞানে বরণ করিয়া লউক। শ্রীকৃষ্ণ যদি একাধারে পূর্ণ ও অপূর্ণ, আমিও তো অপূর্ণ। অপূর্ণতা আমার থাকিতে পারে ও আছে, তাহা সত্ত্বেও কি নির্ব্বিচারে মানিবার দাবী কাহারও নিকট করিতে পারিব না? কি করিয়া তাহা হইলে শরণাগত হইবে এবং নিজ অস্তিত্বই বা সিদ্ধ করিবে?...

২৮শে মে

ক্রমশঃ

তামিল বৈষ্ণব কবি আণ্ডাল্

॥ অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ॥

তামিল বৈষ্ণব সাহিত্যে আণ্ডাল্ একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারিণী। দ্বাদশ আলোয়ারদের অন্যতম পেরিয়া-আলোয়ারের পালিতা কন্যা এই ভক্ত কবির কাব্য ও জীবন দুই-ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব পদ সংকলন 'দিব্য-প্রবন্ধম্' গ্রন্থে তাঁহার যে ১৭৩টি পদ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ৩০টি পদ "তিরুপ্পাবৈ" নামে পরিচিত। বাকি ১৪৩ পদ লইয়া গঠিত হইয়াছে "নাচ্চিয়ার্ তিরুমোলি"। কবির এই দুইটি অংশ স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপেও প্রচলিত এবং ইহার মধ্যে "তিরুপ্পাবৈ" অংশে বলা হইয়াছে কৃষ্ণপ্রেম-প্রার্থিনী গোপীদের ব্রতকথা আর "নাচ্চিয়ার্ তিরুমোলি"তে কবিই স্বয়ং নায়িকা। নায়ক তাঁহার কৃষ্ণ।

তামিল সাহিত্যের একটি অতিপ্রসিদ্ধ রচনা "তিরুপ্পাবৈ" (১)। মাত্র ত্রিশটি স্তবকে সম্পূর্ণ এই কাব্যখানির বিষয়বস্তু এইরূপ: মার্গলি (২) মাসের পূর্ণিমার দিনে অতি প্রত্যূষে উঠিয়া গোপ-পল্লীর কুমারী মেয়েরা চলিয়াছে কৃষ্ণের ঘুম ভাঙাইতে। কৃষ্ণ যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তাহাদের প্রার্থনা পূরণ করিবে! তখনও ভালো করিয়া অন্ধকার কাটে নাই, টুপ্‌টুপ্ করিয়া শিশির বিন্দু ঝরিতেছে। অগ্রহায়ণ (বাংলাদেশের পৌষ) মাসের প্রবল শীতে তখনও সবলে শয্যা ত্যাগ করিতে পারে নাই। আগের দিন যাহারা কথা দিয়াছিল বাড়ি বাড়ি গিয়া সকলকে ডাকিয়া তুলিবে, তখনও তাহাদের ঘুম ভাঙে নাই। কিন্তু সখীদের ডাকাডাকিতে আর শুইয়া থাকা সম্ভব হইল না। 'তিরুপ্পাবৈ'র এই অংশকে বলা যাইতে পারে 'ঘুমভাঙানিয়া' সংগীত। অতঃপর সকল কুমারী মেয়ে সম্মিলিত হইয়া চলিল নন্দগোপের গৃহাভি-মুখে। সেখানে কৃষ্ণকে ঘুম হইতে ডাকিয়া তুলিয়া গোপীরা তাহার বন্দনা গান করিয়া তাহাদের প্রার্থিত বস্তু সমেত ফিরিয়া আসিল। ইহাই কাব্যখানির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

কাব্যের আরম্ভ হইয়াছে এইরূপে: আজ মার্গলি মাসের শুক্ল পূর্ণিমা তিথি। হে অলঙ্কার-ভূষিত গোকুলবাসিনী কুমারীবৃন্দ! তোমরা সকলে স্নান করিতে যাইবে কি? সেই যে কৃষ্ণ, তীক্ষ্ণধর্মাধারী কঠোর পরিশ্রমী নন্দগোপের পুত্র কৃষ্ণ, সুচারু-নয়নী যশোদার সিংহশিশু, চাঁদের মত যাহার মুখখানি, সেই যে রক্তিমনয়ন মেঘশ্যাম নারায়ণ—সে যে আজ আমাদের প্রার্থিত বস্তু দান করিবে। (৩)

অতঃপর দ্বিতীয় স্তবকে বিশ্ববাসীকে সম্বোধন করিয়া তাহারা নিজেদের কর্তব্যের কথা বলিতেছে।—হে জগদ্‌বাসী, আমরা আমাদের ব্রতপালনের জন্য যে সকল কাজ করিব, তাহার বিবরণ শুনিবে কি? ক্ষীর সমুদ্রে মৃদু নিদ্রায় মগ্ন সেই যে পরমপুরুষ, আমারা তাহার চরণ

---

(১) 'পাবৈ' কথাটি পুতুল, প্রতিমা, রমণী, ব্রত প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং 'তিরুপ্পাবৈ' বলিতে আমরা পবিত্র প্রতিমা (বা মূর্তি), পবিত্র নারী বা পবিত্র ব্রত যে কোনো একটি অর্থ বুঝিয়া লইতে পারি।

(২) 'মার্গলি' মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণকে বুঝাইলেও ইহা বাংলাদেশের পৌষমাসের সমকালীন। এই প্রসঙ্গে "মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্" গীতোক্ত এই কৃষ্ণ-বাণীটি স্মরণীয়।

(৩) মার্গলিত্ তিঙ্গল্ মদিনিরৈন্দ্ নন্নালাল্,
নীর্ আডপ্ পোহুমীর্! পোহুমিনো, নেরিழৈയীর্!
শীর্ মল্গুম্ আয়্প্পডিক্ কেল্লুক্ কিরৈবন্ কাল্!
কূর্ বেল্ কোডুম্ তোழিলন্, নন্দগোপন্ কুমরন্,
এর্ আরুম্ কণ্ডি ঙলোমৈ ইলম্ সিংগম্,
কার্ মেনিচ্ চেল্ কন্ কদিরমদিयম্ পোল্মুগত্তান্,
নারায়ণন্ নম্মৈ পর়ৈ তরুবান্,
পারোর্ পুহழ প্পডিন্দু এলোরেম্ পাবায়্।

—স্তবক ১

বন্দনা করিব। প্রত্যূষে স্নান করিয়া আমরা আজ আর দুগ্ধ-ঘৃত খাইব না, চোখে কাজল পরিব না, ফুল দিয়া আজ আর কেশ-সজ্জা করিব না, অনুচিত কোনো কাজ করিব না, কাহারও কাছে গিয়া কটু কথা বলিব না। আজ গৃহস্থকে ও সন্ন্যাসীকে দু'হাত ভরিয়া যথাসাধ্য ভিক্ষা দিব এবং ব্রতউদ্‌যাপনের এই পথের কথা ভাবিয়া আনন্দ লাভ করিব। (৪)

এইরূপে প্রথম পাঁচটি পদে ব্রতচারিণীদের কর্তব্য এবং সেই কর্তব্যপালনের সুফলের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। ষষ্ঠপদ হইতে শুরু হইল, আমরা যাহাকে বলিয়াছি 'ঘুমভাঙার গান'। কাব্যাংশে এই অংশকেই আমরা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করি। পঞ্চদশপদক পর্যন্ত এইরূপ বর্ণনা চলিয়াছে। আমরা কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি:—ঐ শোন, পাখিরাও জাগিয়া উঠিয়া গান গাহিতেছে। গরুড়-বাহন দেবতার মন্দিরে যে শুভ্র শঙ্খ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মহান্ শব্দ তোমার কর্ণগোচর হয় নাই কি? ওগো মেয়ে, ঘুম হইতে ওঠ।.....(৫)

পরবর্তী পদটিতে গোপপল্লীর একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। গোপকুমারীরা এক বাড়ি হইতে আর এক বাড়িতে গিয়া সখীকে ডাকিয়া কহিতেছে —"ওগো কুম্ভো মেয়ে, চারিদিকে যে আনেচ্ছাত্তন্ পাখী (তরদ্বাজ পাখী?) একসঙ্গে মিলিয়া কিচির্ কিচির্ শব্দে মুখর হইয়া উঠিয়াছে তাহা তুমি শোন নাই কি? গোপ-বধূরা তাহাদের চুলের গন্ধ ছড়াইয়া মন্থন-যষ্টির সাহায্যে দধি-মন্থন করিতেছে, তুমি তাহার শব্দ শোন নাই কি? মন্থনকালে হাত নাড়িবার ফলে অলঙ্কারের যে 'কল-কলপ্‌স' শব্দ হইতেছে তুমি তাহাও শোন নাই কি? ওগো সিঙ্গি মেয়ে, আমরা যে নারায়ণের বন্দনা-গীতি গাহিতেছি, তাহা শুনিয়াও তুমি ঘুমাইয়া আছ? লক্ষ্মী মেয়ে, দুয়ার খোল। (৬)

এইরূপে গান গাহিতে গাহিতে বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া গোপকুমারীদের পল্লীপরিক্রমার চিত্রটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ইহার মধ্যদিয়া পল্লীবালার ব্রতনিষ্ঠা ও তাহাদের পারস্পরিক হৃদ্যতার যে পরিচয়টুকু পাওয়া যায় তাহার আবেদন কিছু উপেক্ষণীয় নয়। ইহা বৃন্দাবনের ব্রজ-রমণীদের আলেখ্য হইলেও, ইহার পটভূমি যে তামিল-নাদের পল্লীপ্রকৃতি তাহা বুঝিতে কষ্ট হয়না। যাহাদের কথা বলা হইয়াছে, তাহারাও তামিলনাদেরই কন্যা। মনে হয় আণ্ডাল এমন একটি ব্রত-অনুষ্ঠানের কাব্যরূপ দিয়াছেন, যাহা তাঁহার জন্মভূমিতে পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল এবং যাহার সঙ্গে আলৈশব কবির পরিচয় ছিল বলিয়া আমরা মনে করি। আজও যেমন মার্গাঈল মাসের প্রত্যূষে তামিল-কুমারীরা আণ্ডালের সঙ্গীত কণ্ঠে লইয়া সখীদের ডাকিয়া তোলে, স্বয়ং কবিও একদিন এইরূপ কোনো লোক-সঙ্গীত গাহিয়া গাহিয়া শ্রীবিল্লি-পুত্তুর্ গ্রামে তাঁহার সখীদের ঘুম ভাঙাইতেন এইরূপ অনুমান মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। এগারো সংখ্যক পদে বলা হইয়াছে—"তোমার প্রতিবেশিনী বন্ধুরা যখন

(৪) বৈরত্ বাল্‌বীরকাল্! বায়ুম্ বন্ পাবৈকল্
চেয়ুম্ কিরিচৈকল্ কেলীরো? পায়ক্কলুল্
পৈয়ত্ তুলিত্ পরবন্ অচিনাচি,
নেয় উট্রোম্, পাল্ উট্রোম্, মাচ্‌কালে নীর্ আডি,
মৈয়িট্ এলুত্তোম্, মলর্ ইট্ট বায় মুচ্চিনোম্,
চেয়াদন চেয়োম্, তীক্করৈচ্ চেত্তুণ্ডোম্,
ঐয়মুম্ পিচ্চৈয়ুম্ আম্‌তৈয়ুম্ কৈকাট্টি,
উন্ বুত্তারো এরি উকল্, এলোরেম্‌পাবায়্!

—পদ সং ২।

(৫) পুন্‌ম্ চিরুবির কাল্। পুলম্বরৈন্ কোরিগিল্
বেল্‌লৈ বিলি শঙিন্ পের্ অরবম্ কেট্টিলৈরো?
পিল্লায়! এলুন্‌দিরায়।... পদ সং ৩।

(৬) "কীচু কীচু" এন্‌ড্রু এঙ্গুম্ আৰৈচ্চাত্তন্ কলম্
পেচিন পেচ্চু অরম্ কেট্টিলৈরো? পেরু পেণ্ণে!
কাওম্ পিরম্ম্ মলকলন্দৰ্ কৈপেরত্
বালবরম্ কুলল্ আর্ চ্চিনম্ মডিবাল্
ওচৈপ্ পডুত্ত তয়ির্ অরবম্ কেট্টিলৈরো?
নংকৈকল্ পেণ্ পিল্লায়। নারায়ণন্ মূর্ত্তি
কেশবৈপ্ পাডুম্ নী কেট্টে কিডত্তিরো?
তেচম্ উডৈয়ায়! তির, এলোরেম্‌পাবায়!

চারিদিক হইতে আসিয়া তোমার আঙিনায় প্রবেশ করিয়া মেঘবর্ণ কৃষ্ণের নাম কীর্তন করিতেছে, তখনও তুমি কোনো সাড়া দিতেছনা। ওগো বড় মানুষের মেয়ে, তোমার এই ঘুমের অর্থ কী?" (৭)

সখীদের ডাকাডাকিতে অগত্যা এই বড় মানুষের মেয়েকে আসিয়া দল ভারী করিতে হইল। কিন্তু পাশের বাড়িতে গিয়াও দেখা গেল অনুরূপ অবস্থা। আঙিনার প্রবেশের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। শীতের প্রভাবে কতক্ষণ আর বাহিরে বৃথা অপেক্ষা করা যায়? তাই সখীরা ডাকিয়া বলিতেছে—"দেখ, আমাদের মাথার গাছের পাতা হইতে শিশির ঝরিয়া পড়িতেছে। আমরা তোমার বাড়ির সদর দুয়ারে আসিয়া রাবণ-সূদন আমাদের প্রিয় দেবতার গান গাহিতেছি, কিন্তু এখনও তুমি মুখ খোল নাই। আচ্ছা, এখন অন্ততঃ শয্যা ত্যাগ কর। সকল গৃহস্থ যখন আমাদের গান শুনিয়া আসিয়া উঠিল, তখন ইহা তোমার কিরূপ মহানিদ্রা?" (৮)

ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক সময় কাটিয়া গেল। অন্ধকার দূর হইয়া পূবের আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তখনও সকলের সমাবেশ হয় নাই, আরও কয়েক বাড়ি যাইতে হইবে। যে মেয়েটি সকলের আগেই ঘুম হইতে উঠিবে বলিয়া গর্ব করিয়াছিল, এখনও তাহার ঘুম ভাঙে নাই।—"ঐ দেখ, তোমাদের খিড়কির বাগানের পুকুরে রক্ত-কুমুদগুলি প্রস্ফুটিত হইয়াছে, কুমুদকুলগুলি ধীরে ধীরে বুজিয়া যাইতেছে। শুভ্রবস্ত্র সৈরিকবস্ত্রধারী সন্ন্যাসীরা তাঁহাদের পবিত্র মন্দিরে শঙ্খধ্বনি করিতে গিয়াছেন। ওগো মেয়ে, তুমি বড় উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলে, আমাদের আগেই ঘুম হইতে উঠিয়া তুমি আমাদের ঘুম ভাঙাইবে। এখন দেখিতেছি তোমার যত জোর কেবল জিহ্বায়, লজ্জা তোমার কিছুই নাই। ওগো কন্যে, শয্যা পরিত্যাগ কর।" (৯)

আরেক বাড়িতে গিয়া তো রীতিমত তর্কযুদ্ধ শুরু হইয়া গেল। সমাগত রমণীরা যতই সখীকে বাহিরে আসিতে আহ্বান করে, সে ততই বিছানায় শুইয়া শুইয়া তাহাদের সহিত কথা কাটাকাটি করিতে থাকে। আলোচ্যপদের চরণগুলিতে এইরূপ সকৌতুক উক্তিপ্রত্যুক্তির সমাবেশ ঘটিয়াছে। বাহিরে মেয়েরা শয্যাগত সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—"ওগো সখী, ওলো মোদের ছোট্ট টিয়ে পাখি, এখনও তোমার ঘুম ভাঙে নাই? এখনও শুইয়া আছ?" অমনি ভিতর হইতে রুক্ষ জবাব আসিল—"চুপ, তোমরা অত ডাকাডাকি করিয়া আমাকে বিরক্ত করিও না, আমি আসিতেছি।" সখীরা কিন্তু চুপ করিয়া থাকিল না। তাহারা বলিল—"অয়ি চতুরে, তোমার সত্য কথা (প্রতিশ্রুতি) এবং তোমার ধারালো জিহ্বাখানির কথা আমরা পূর্ব হইতেই জানি।" "কী বলিলে? চতুর জিহ্বা আমার না তোমাদের?" এই বলিয়াই উত্তর-কারিণীর বোধ করি কিছুটা লজ্জাবোধ হইল এই ভাবিয়া যে বাহিরে অপেক্ষমান কৃষ্ণভক্ত কুমারীদের প্রতি কটূবাক্য প্রয়োগ করা সমীচীন হয় নাই। তাই সে নিজেকে সংশোধন করিয়া বলিল—"আচ্ছা, আচ্ছা, আমিই না হয় চতুর-রসনা।" "তবে, এখন শীঘ্র বাহিরে আস। সকলে আসিতে পারিল, আর তুমি পারিলে না; কেন, তোমার কি অন্য কোনো বিশেষত্ব আছে?" "বল কি, সকলেই

(৭) চুট্টন্তুত্ জেলিমায্ এল্লারুম্ বন্দু, নিন্
মুট্টুম্ পুলুম্বু মুক্কিল যান্ পোয্পাড,
চিট্টামে পোমে চেল্বম্মা পেণ্ডাট্টি, নী
এট্টু উণরুম্ পোরুল্, এলোরেম্পাবায়!

(৮) পালিত্ তলৈ বীল, নিন্ বাচল্ কডৈ পট্টি,
চিলিরিপান্ চেন্ ইলঙ্কৈ কোম্বা নৈচ চেট্টি
মলর্ত্তু ইনিয়াবেল্ পাডুম্ নী বায্ তিরবায়,
ইনিয়ান্ এনুদিয়ায়, ইন্দে, পেয্ উরঙ্গু?
আবেত্তিরবায়ুম্ অল্লি, এলোরেম্পাবায়।

—পদ নং ১২।

(৯) উঙ্গল্ পুলক্কটৈয়ে তোট্টু বায়িলুল্
চেঙ্গল্ কলুনীর্ বায় বেরিন্দু, আম্বল্ বায় কুবিন্, কান্;
চেঙ্কল্ পোডিক্ কুবি বেগ্পল্ তবত্তবর্,
তঙ্গল্ তিরুক্কোয়িল্ শঙ্গু ইডুবান্ পোন্দবায়,
এঙ্গলৈ মুন্ন এল্লু যান্ বায় পেচুম্
বলায়! এনুদিয়ায়, বামীয়ায়, নাউডৈয়ায়।

—পদ নং ১৩।

আসিয়া দিয়াছে ?" আসিয়াছে ; নিজে আসিয়া শুণিয়া দেখ। ১০

এইভাবে সকল গোপকুমারী মিলিত হইয়া চলিল কৃষ্ণের গৃহাভিমুখে। কৃষ্ণ-বধূ নন্দিয়ৈ-কেও ডাকিতে ভুলিল না। ১৮ সংখ্যক পদে নন্দিয়ৈ-প্রসঙ্গ রচিত হইয়াছে এইভাবে—"হে নন্দগোপের পুত্রবধূ নন্দিয়ৈ, ১১ হে সুগন্ধ-কেশিনী, দুয়ার খোল। বাহিরে আসিয়া দেখ চারিদিকে রোগ ডাকিতেছে। বাঁধনীকুলে কোকিলের দল মধুর সুরে ডাকিয়া ডাকিয়া সারা হইতেছে। হে কন্দুক-হস্তা (কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার জন্য নন্দিয়ৈ বোধ করি হাতে 'বল' রাখিতেন), আমরা তোমার পতির নাম কীর্তন করিতেছি, তুমি তোমার কমল হস্তের কাঁকন বাজাইতে বাজাইতে সানন্দে আসিয়া দরজা খুলিয়া দাও। ১২

১০ "ওল্‌লে! ইন্‌ন্‌ কিলিয়ে! ইন্‌ন্‌ উরঙ্গু দিরো ?"
"চিল এল্ল অলৈন্‌ন্‌ মিন্‌ নঙ্গৈমীর্! পোদ্‌গিত্তু।"
"নঙ্গৈ, উন্‌ কট্টু বৈকল্‌ পত্তে উন্‌ মাম অল্লিয়ন্‌ "
"নল্লীরকল্‌ নীরাদে, নালেদান্‌ আড়িচুক।
"ওরৈ নী পোরায়, উনক্কু এন্ন বেক উটৈয়ৈ ?"
"এন্নালুম্‌ পোন্‌ন্নালো ?" "পোন্‌নার্‌, পোন্‌ এরিকোল।"
—পদ সং ১৪

১১ 'নন্দিনী' কথাটির বিশ্লেষণ করা যায় এইভাবে : নন্দ (অর্থাৎ উত্তর) + নিয়ৈ (অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভগিনী)।

১২। নন্দগোপালন্‌ মরু মগলে! নন্দিরায়।
পন্দল্‌ কলন্দু তুলসী! কটৈ তিরন্দায়;
বন্দু এন্নৈ কোল্লি অলৈক্কের, কনি; নাধিপি,
পন্দল্‌ মেল্‌ পলকাল্‌ তুলিল্‌ উন্নৈপ্পল্‌ তুদিপ কান্‌
পন্দার্‌ তিরন্দি! উন্নৈমত্তুম্‌ নম্‌ পেরুমাট্ট
চেন্‌ তামরৈক্‌ কৈয়াল্‌ চীরিয় বৈল ওলিপ
নম্মু তিরবায় মৈকিলম্মু, এলোরেম্‌ পাবায়।

অপরাজিতা

॥ শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ॥

জানি জানি তুমি একাগ্র মনে অনলস সাধনায়
চৈতন্যের গভীরে জ্বেলেছ প্রাণের প্রদীপটিরে,
মগ্ন তোমার দিবসরাত্রি অনুপ মূর্চ্ছনায়
প্রতিধ্বনিত দেবতা পূজার স্বর্ণ-বেষ্টন ঘিরে।

সাজায়ে দিয়েছ পূজার বেদীতে অর্ঘ্য কুসুমরাশি
চির অম্লান, সুগন্ধ তার মন্থর বায়ুভরে
নিকট হইতে দূরে ভেসে চলে বিষাদে ফুটায়ে হাসি
নির্মাল্যের শতদল সেথা রাখিয়াছ থরে থরে।

বহু উপচারে সাজানো তোমার নৈবেদ্যের থালা
পরমাত্মের ভোগের প্রসাদ বিতরিয়া জনে জনে,
পূজারিণী তব মেটেনিক সাধ ব্যাকুল মনের জ্বালা,
খুঁজিতেছ তাই হৃদয়ারণ্যে শেষ আহুতির ক্ষণে
কোন্‌ সে শ্রেষ্ঠ অপরাজিতার স্বর্গ-সুষমা আছে
দিবে তুমি তাই তোমার ইষ্ট দেবতার পদতলে,
সেই বর তুমি মাগিবে তাহার কাছে
যে বরে হৃদয়ে আহিতাগ্নির সহস্র শিখা জ্বলে।

আমি জানি তব অন্তরে আছে সেই সে অপরাজিতা,
শাশ্বতী সমা রূপে অনুপমা ধ্যানযোগ-সমাহিতা।

যম

[একাঙ্কিকা]

॥ শ্রীমন্মথ রায় ॥

॥ ১ম দৃশ্য ॥

[নবদ্বীপ। জ্যোতিষাচার্য ভাস্কর মিশ্রের গৃহ-সংলগ্ন উদ্যান। অশোক তরুমূলে বসিবার জন্য একটি প্রশস্ত বেদী। প্রভাত। ভাস্কর মিশ্র ও তাঁহার পত্নী মহামায়া দেবী উদ্বিগ্ন চিত্তে বেদীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন]

মহামায়া। এমন কি গোপন কথা প্রভু, যা বলার জন্যে আমাকে নিয়ে এলে নির্জন এই উদ্যান-বীথিকায়?

ভাস্কর। ধৈর্য ধর মহামায়া, ধৈর্য ধর।···চন্দ্রা কোথায়?

মহামায়া। কেন? সে তো শিব মন্দিরে। তুমি কি ভুলে গেছ প্রভু, চন্দ্রার বয়স আজ পনেরো বৎসর পূর্ণ হলো? আজ তাই সে নিজে শিব পূজা করছে। কাল তার ষোড়শ জন্মতিথির উৎসব।

ভাস্কর। এ উৎসব বন্ধ কর মহামায়া।

মহামায়া। সে কি প্রভু! আমাদের একমাত্র সন্তান—আমাদের চোখের মণি—বুকের ধন—শিবরাত্রির সলতে আমাদের ঐ চন্দ্রা। পনেরোটি জন্মতিথি তার পালন করেছি কী সমারোহে! আগামীকাল তার ষোড়শ জন্মতিথি—সে উৎসব বন্ধ রাখতে বলছো তুমি কোন প্রাণে?

ভাস্কর। বলছি—আমি বলছি। ভুলো না—বলছে কে। বলছে ভাস্কর মিশ্র—রাজজ্যোতিষী—যার গণনা আজ পর্যন্ত কখনো, কোনো ক্ষেত্রে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়নি। এই নবদ্বীপের সেই নিমাই—সে যে একদিন দেশ-বিখ্যাত পণ্ডিত হবে—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামে লক্ষ লক্ষ লোকের পূজা পাবে—অবশেষে পুত্রগতপ্রাণা মায়ের স্নেহবন্ধন, স্বামীগতপ্রাণা পত্নীর প্রেম বন্ধন ছিন্ন ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণ করবে—তাঁর জন্মপত্রিকা রচনা করে এ ভবিষ্যদ্বাণী আমিই আমিই করেছিলাম। মিথ্যা হয়েছে আমার গণনা?

মহামায়া। না। নবদ্বীপবাসী সেজন্যে তোমাকে অভিশাপই দিয়েছে। কিন্তু এসব কথাই আজ এখন কেন? তোমার অভ্রান্ত গণনা সম্পর্কে কেউ কি সন্দেহ প্রকাশ করেছে প্রভু? আর যদি তা করেও থাকে, তা' আমাকে বলবার এই কি তোমার সময় হলো?

ভাস্কর। যে কথা বলবার জন্যে তোমাকে এখানে ধরে এনেছি আমার তা বলা হয়নি মহামায়া। তুমি ধৈর্য ধর। (উত্তরীয়তে একখানি জন্মপত্রিকা বাঁধা ছিল, তাহা মহামায়ার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া) এই দেখ তোমার কন্যার জন্ম-পত্রিকা। নবজাত কন্যার জন্ম-পত্রিকা রচনা যখন শেষ হলো, শিরে যেন আমার বজ্রাঘাত হলো।

মহামায়া। কেন—কেন প্রভু? কন্যা-মুখ দর্শন করে তুমিই তো বলেছিলে কন্যা আমার সর্বলক্ষণা।

ভাস্কর। মিথ্যা বলিনি মহামায়া। সর্বলক্ষণা সে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার গণনা অভ্রান্তই প্রমাণিত হয়েছে। কন্যা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী কিন্তু—কিন্তু—

মহামায়া। (নিদারুণ আশঙ্কায়) তুমি কি বলতে চাইছো, আমি বুঝতে পারছিনে প্রভু!

ভাস্কর। বলতে যে আমারও বাঁধছে মহামায়া। এই পনেরোটি বৎসরই বেঁধেছে। বলতে গিয়েও আমি তোমাকে বলতে পারিনি মহামায়া।

মহামায়া। তুমি বল—তুমি বল—কি বলতে চাও তুমি—

ভাস্কর। পঞ্চদশ বর্ষে কন্যার বিবাহ যোগ। কিন্তু ষোড়শ বর্ষে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তার অকাল মৃত্যু।

মহামায়া। (আর্তনাদ) মৃত্যু!

ভাস্কর। হাঁ মৃত্যু। কন্যার এই অভাবনীয় ভাগ্যলিপি—আমারই হাতে লিপিবদ্ধ হলো তার জন্ম-পত্রিকায়। বার বার গণনা করেও এই চরম নিয়তির কোনো পরিবর্তন পেলাম না আমি।·· একি! তুমি চলে যাচ্ছো?

মহামায়া। যাচ্ছি উৎসবের আয়োজন করতে। আর বিলম্ব করা আমার চলে না।

ভাস্কর। (রুখিয়া) দাঁড়াও! এ কথার অর্থ?

মহামায়া। তোমার জীবনে যা কখনো হয়নি, আজ তাই হয়েছে। তোমার গণনা ভুল!

ভাস্কর। ভুল! আমার গণনা ভুল?

মহামায়া। কন্যার বয়স আজ পঞ্চদশ বৎসর পূর্ণ হলো। জন্ম-পত্রিকায় তুমি লিখেছো, পঞ্চদশ বর্ষে তার বিবাহ। আজো যখন কন্যা আমার কুমারী, তার ষোড়শ জন্মতিথির উৎসবও সুসম্পন্ন হবে। হবে না কেন বলতে পারো প্রভু?

[প্রস্থানোদ্যত]

ভাস্কর। দাঁড়াও—দাঁড়াও। রূপবতী, গুণবতী তোমার ঐ কন্যাকে বিবাহের জন্য প্রার্থীর অভাব হয়নি কোনো দিন—বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে বহুলোক আমার কাছে এসেছে। কিন্তু তা আমিই প্রত্যাখান করেছি ষোটক বিচারের নামে। এই পঞ্চদশ বর্ষে বিবাহযোগ কন্যার এসেছে—এসেছে মহামায়া।

মহামায়া। কিন্তু তা পূর্ণ হয়নি প্রভু! আর তোমার প্রথমাংশ যখন সত্য হয়নি, দ্বিতীয়াংশও সত্য হবে না। (কঠোর হইয়া) এতে তোমার দুঃখ হতে পারে, কিন্তু আমার হচ্ছে আনন্দ।

[প্রস্থান]

ভাস্কর। তবে কি—তবে কি আমারই ভুল?

[উন্মত্তবৎ জন্ম-পত্রিকাটি বেদীর উপর পাতিয়া উহা পুনরায় পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। শিব মন্দিরের পূজারী ভৈরব ঠাকুরের প্রবেশ।]

ভৈরব। আচার্য!

ভাস্কর। (চমকিয়া উঠিয়া) কে? (ভৈরবকে দেখিয়া) ভৈরব ঠাকুর—তুমি এখানে?

ভৈরব। শিব মন্দিরে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছে, আচার্য।

ভাস্কর। চন্দ্রার শিব পূজায় কি কোনো ব্যাঘাত ঘটেছে, ভৈরব?

ভৈরব। না আচার্য। চন্দ্রা মা শিব পূজা সুসম্পন্নই করেছেন। বিপদ ঘটেছে এক অপরিচিত অতিথিকে নিয়ে। আরতির বাদ্যে আকৃষ্ট হয়ে মন্দির দ্বারে উপস্থিত হয় বিদেশী সেই অতিথি। অপরূপ তার রূপজ্যোতিঃ। কিন্তু পথশ্রমে সে যেমন ছিলো ক্লান্ত, তেমনি ছিলো ক্ষুধার্ত। চন্দ্রা-মা তাকে পরম সমাদরে আহার্য দেন শিবের প্রসাদ। পরম তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন সমাধা করে দেবাকৃতি সেই অতিথি ভোজন-দক্ষিণা রূপে চন্দ্রা-মার পাণি-প্রার্থনা করেন।

ভাস্কর। সে কি! তুমি কি বলছো ভৈরব? তারপর?

ভৈরব। এ প্রার্থনা পূর্ণ না করে চন্দ্রা-মার উপায় ছিলো না, আচার্য! শাস্ত্রমতে ভোজন-দক্ষিণা অবশ্য দেয়। তার ওপর অতিথি হলেন নারায়ণ। অসম্পূর্ণ অতিথি সৎকারে ধর্মহানি হবে বলে চন্দ্রা-মা অতিথির ভোজন দক্ষিণার দাবী প্রত্যাখ্যান করেন নি।

ভাস্কর। ভৈরব! ভৈরব!

ভৈরব। হাঁ, আচার্য। মহাদেব সাক্ষী রেখে সেই দেব-অতিথি আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করেছেন।

ভাস্কর। নিয়তি—নিয়তি—দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি!—

॥ ২য় দৃশ্য ॥

[বাসর রাত্রি। নব বধূ বেশে চন্দ্রা বাসর শয্যায় নিদ্রিতা, পার্শ্বে তাহার স্বামী উপবিষ্ট—দেবদুর্লভ তাঁহার রূপ—অপরূপ তাঁহার জ্যোতি।]

স্বামী। (চন্দ্রার উদ্দেশে) প্রিয়া! জাগো, ওঠো। (কিন্তু কোনো সাড়া না পাইয়া অধিক অপেক্ষা করিয়া পুনরায়) চন্দ্রা! চন্দ্রা!

[চন্দ্রা জাগ্রত হইয়া সলজ্জভাবে উঠিয়া বসিল]

স্বামী। রাত্রি শেষ হয়ে এলো। আমাদের যাত্রার সময় হয়ে এসেছে, প্রিয়া!

চন্দ্রা। যাত্রা! কোথায়?

স্বামী। তোমার পতিগৃহে। বিয়ে হলো—স্বামীর ঘর করবে না প্রিয়া?

চন্দ্রা। ও। কিন্তু রাত্রি তো শেষ হয়নি। এখনি?

স্বামী। হ্যাঁগো। অনেক দূরের পথ যে!

চন্দ্রা। আচ্ছা, কোথায় তোমার দেশ? তাতো এখনো তুমি আমায় কিছু বললে না!

স্বামী। বলবার আগেই তুমি ঘুমিয়ে পড়লে যে! এত ঘুমোও কেন তুমি? বলতে পারো? বাসর-রাতে কেউ বুঝি ঘুমোয়?

চন্দ্রা। আমিও তাই ভাবছি। অথচ আমার ঘুম ছিলো না। এতদিন সারারাত বসে ভাবতাম, সবারই বিয়ে হয়—আমার কেন হয় না? সব মেয়েই মনের মত স্বামী পায়, আমি কেন পাবোনা? ভাবতে ভাবতে যদিও বা ঘুমিয়ে পড়তাম, স্বামীর স্বপ্নই দেখতাম।

স্বামী। সে স্বপ্নে আমাকে কোনোদিন দেখনি? দেখনি? দেখেছিলে চন্দ্রা?

চন্দ্রা। দেখেছিলাম, দেখেছিলাম। তোমারই মত রূপ—তোমারই মত জ্যোতি—কাকে যেন আমি দেখতাম। তাই আজ যখন তোমাকে দেখলাম, মনে হলো তোমাকে আমি চিনি—তোমাকে আমি জানি। হ্যাঁ, তোমারই জন্যে যেন আমি বসেছিলাম এতদিন—এত কাল।

স্বামী। কিন্তু আমি যে কে, তাতো তুমি এখনো শোনো নি—এখনো তুমি জান না চন্দ্রা।

চন্দ্রা। শুধু এই জানি, তুমি আমার বর—আমি তোমার বধূ। শিব পূজা করে আমি তোমাকে পেয়েছি। জানি, তোমার পথই আমার পথ—তোমার ঘরই আমার ঘর। এখন আর যা কিছু সব তোমারই ইচ্ছা। বলতে হয় বলো, না বলতে হয় বলো না।

স্বামী। তবে শোনো কোথায় আমার দেশ। দূরে—বহু দূরে—যদি বলি ঐ আকাশেরও পরপারে—যেতে ভয় হচ্ছে তোমার?

চন্দ্রা। তুমি আমার সঙ্গে আছো। যেখানে যাবে, আমি যাবো। ভয় না গো, আনন্দ। তোমার সঙ্গে যাবো, এ আমার কত আনন্দ!

স্বামী। আনন্দ! পিতামাতার একমাত্র সন্তান তুমি। তুমি তাদের চোখের মণি, বুকের ধন। আর তাঁরাও হলেন গিয়ে তোমার সর্বস্ব। এ বাঁধন ছিঁড়ে যাওয়া—সে যে কী কষ্ট, তুমি হয়তো এখনো বুঝছো না চন্দ্রা।

চন্দ্রা। হ্যাঁ-হ্যাঁ বুঝছি—আমি বুঝছি। তাই তো, তাঁদের ছেড়ে আমি কি করে যাবো—কেমন করে থাকবো? ওগো, তাঁদেরও তুমি নিয়ে চল আমার সঙ্গে। হ্যাঁ গো, আমার কথা রাখো।

স্বামী। (হাসিয়া) তা কি কখনো হয়? তা কি কেউ যায়? এমন কি কেউ কখনো গেছে? তোমারই তো কত সখী বিয়ের পর স্বামীর ঘরে গেছে, বাপ মাকে কেউ সঙ্গে নিয়ে গেছে?

চন্দ্রা। না, তা যায় নি।

স্বামী। তা যায় না। চোখের জল ফেলে, কিন্তু তবু একাই যায়।

চন্দ্রা। আমিও যাবো। আমারো চোখে আসছে জল, কিন্তু বুকের ভেতর জমে উঠছে এক অজানা আনন্দ। (ম্লান হাসিয়া) সে যে কী এক শান্তি, আমি বুঝছি না—বলতে পারছি না।

স্বামী। তোমার মুখে হাসি, চোখে জল। যাবার সময় কী এক অপরূপ রূপে তুমি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছো চন্দ্রা।...এইবার যেতে হয়।

[উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।]

চন্দ্রা। চলো। যাবার আগে এসো মা বাবাকে প্রণাম করে আসি।

স্বামী। (চুপি চুপি) না; তাতে তাঁদের বাধাটা আরো বাড়বে। আমাদের যেতে হবে পালিয়ে—চুপি চুপি, দিনের আলো ফোটবার আগে।

চন্দ্রা। তুমি ঠিকই বলেছো। তাই হবে। চলো।

স্বামী। চলো কি গো? যাত্রার জন্যে তৈরি হও। বাপের বাড়ির ঐ শাড়ী, ঐ গহনা—জীর্ণ ঐ বসন ভূষণ, এও তো তোমাকে রেখে যেতে হবে চন্দ্রা। হাঁা, চন্দ্রা, তুমি তো বলে কয়ে যাচ্ছো না। তুমি যাচ্ছো পালিয়ে। পালিয়েই যদি যাবে, কেন তুমি এ সব সঙ্গে নেবে? লোকে বলবে, তাঁদের জিনিস তুমি চুরি করে পালিয়েছো। সে অপবাদ কেন তুমি সইবে?

চন্দ্রা। না। তা কেউ বলবে না। সে অপবাদও কেউ দেবে না। এ সব জিনিস তাদের স্নেহের দান। এ সব জিনিস আমার—আমার। আমার জিনিস আমি নিয়ে গেলে কেউ আমাকে কিছু বলবে না। কিন্তু তবু আমি এ সব নেব না। এ সব আমি রেখে যাবো—তাদের জন্যে। নইলে আমি চলে গেলে কী নিয়ে তারা বাঁচবেন! থাক্, এসব থাক্। গিয়েও এরই মধ্যে আমি তাদের কাছে থাকবো, তাদের কাছে বাঁচবো। ওগো আমি তৈরি হচ্ছি। তুমি ঐ প্রদীপ নিভিয়ে দাও।

স্বামী। দিচ্ছি। (একটি ফুৎকারে প্রদীপটি নিভাইয়া দিয়া) অন্ধকার! কিন্তু এ অন্ধকারে তুমি ভয় পেয়ো না প্রিয়া।

চন্দ্রা। না, তুমি আমার পাশে আছো—তবু আমার চলে গেছে। কিন্তু কে যেন কাঁদছে—কারা যেন কাঁদছে। যাবার বেলায় কারা যেন আমায় পিছু ডাকছে।

স্বামী। শুনতে নেই—ও সব শুনতে নেই। বধূ যখন বরের ঘরে যায়, সে এ সব শোনে না। চোখে আসে তার জল, কিন্তু মুখে থাকে তার হাসি। যাত্রার লগ্ন আমাদের বয়ে যায়। এসো প্রিয়া—এসো—

চন্দ্রা। অন্ধকারে আমি যে কিছুই দেখছি না হাত ধরে তুমি আমায় নিয়ে চলো···আঃ! কী ঠাণ্ডা তোমার হাত! কী শীতল তোমার পরশ! কি শান্তি! কি আনন্দ! আঃ—আলো আলো—চারিদিকে এ কী আলো!

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা। ঘরে গভীর অন্ধকার বিরাজ করিতে লাগিল। পরে, উষার আলো ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিল। দেখা গেল, বধূবেশে সজ্জিতা, সালঙ্কারা চন্দ্রা একাকিনী জমাট, নিশ্চলভাবে বাসর শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। দ্বারটি উন্মুক্ত রহিয়াছে। দ্বারের বাহিরে চন্দ্রার মাতা মহামায়া আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং ডাকিলেন—]

মহামায়া। চন্দ্রা! চন্দ্রা!

[কোনো সাড়া না পাইয়া কম্পিত বক্ষে চন্দ্রার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং পুনরায় ডাকিলেন]

মহামায়া। চন্দ্রা! চন্দ্রা! মা আমার! (তাহার সাড়া না পাইয়া দেহ স্পর্শ করিলেন। কিন্তু তাহাতে জীবনের সাড়া না পাইয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন) ওগো, শীগ্‌গীর এসো।

[ডাক্তার মিত্রের প্রবেশ]

মহামায়া। দেখ, দেখ চন্দ্রার কোন সাড়া নেই। আর ওঁকেও তো দেখছি না!

ডাক্তার। আমি জানতাম—আমি জানতাম। বরবেশে এসেছিল যম—যাকে নেবার নিয়ে সে পালিয়েছে।

॥ যবনিকা ॥

নিয়ন্ত্রিত পাঠের পরিকল্পনা

॥ শ্রীসুবোধ কুমার সেনগুপ্ত ॥

পূর্বানুবৃত্তি

নিয়ন্ত্রিত পাঠের জন্ত নানারকম পরিকল্পনা এপর্যন্ত করা হইয়াছে। ঐ পরিকল্পনাগুলিকে আমরা দুইভাগে ভাগ করিতে পারি। (১) যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিতে অসুবিধা বোধ করিতেছে, তাহাদের জন্ত নিয়ন্ত্রিত পাঠের ব্যবস্থা, (২) শ্রেণীর কাজের পরিচালনা হিসাবে নিয়ন্ত্রিত পাঠের ব্যবস্থা। আমরা দুইটি ব্যবস্থা সম্পর্কেই বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনা নিয়ে পেশ করিতেছি।

(১) The Conference plan.—যদিও নিয়ন্ত্রিত পাঠ কথাটি নূতন, তাহা হইলেও যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে একটু পিছাইয়া আছে, তাহাদের শিক্ষক কর্তৃক সাহায্যদানের বিষয়টি মোটেই নূতন নয়। অনেক শিক্ষক শিক্ষিকাকেই দেখা গিয়াছে, তাঁহারা ছাত্রছাত্রীদিগকে শ্রেণীর মানে উন্নত করিবার জন্ত ব্যক্তিগত সাহায্য করিয়াছেন। এই রকম কাজ হইতেই Conference plan বা আলোচনা পরিকল্পনার উদ্ভব হইয়াছে এই পরিকল্পনায় শিক্ষকগণ প্রতিদিন স্কুলের কাজ শেষ হইবার পরও কিছুক্ষণ সময় বিদ্যালয়ে থাকেন। ঐ সময় অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা বা জানিতে ইচ্ছুক এমন ছাত্রছাত্রীরা আসিয়া শিক্ষকের নিকট হইতে ব্যক্তিগত সাহায্য লাভ করিয়া থাকেন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় এইরূপ পরিকল্পনা ঐচ্ছিক, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকও ছাত্রছাত্রীদের জন্ত আবশ্যিক নিয়ন্ত্রিত পাঠের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি আবশ্যিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ঐচ্ছিক। Conference plan অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত পাঠ সুফলপ্রদ হইয়াছে বলিয়া দেখা গিয়াছে।

(২) The special teacher—বিশেষ শিক্ষক—Conference plan-এর সাথে যুক্ত বিশেষ শিক্ষকের কাজ। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী একজন বিশেষ শিক্ষক ছোট ছোট দলে, এবং ব্যক্তিগতভাবে অনগ্রসর ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াইতে সাহায্য করিয়া থাকেন, বিশেষ শিক্ষকের এই একমাত্র কাজ। তাঁহাকে প্রতি শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর জন্ত সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিবার জন্ত প্রস্তুত থাকিতে হয়। বিশেষ শ্রেণীর জন্ত নির্দিষ্ট সময় থাকে। শিক্ষক বা শিক্ষিকা সেই সময়ে শ্রেণীর অনগ্রসর বা ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ন্ত্রিত পাঠের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বলাবাহুল্য এই জাতীয় শিক্ষা দান ব্যাপারে শিক্ষকের শিক্ষা ও পারদর্শিতা উচ্চ ধরণের হইতে হইবে। শুধু তাহাই নয়, এই জাতীয় শিক্ষাদানে শিক্ষকের সমবেদনা-মূলক মনোভাব থাকা প্রয়োজন। অন্যান্য সব ব্যাপার ছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের একটি বিষয়ে অসুবিধার জন্ত তাহাদিগকে অনগ্রসর হইতে দেখা যায়। তাহা হইতেছে পড়িবার উপযুক্ত কৌশল আয়ত্ত না করার জন্ত অসুবিধা। শিক্ষক যদি সেই দিক হইতে ছাত্রছাত্রীদের নির্দেশ দেন, তাহা হইলেও অনেক উপকার হইতে পারে।

উপরে যে দুইটি পরিকল্পনার কথা বলা হইল যথা Conference plan কিংবা Special teacher plan —এই দুটি plan-এ অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীদের বা ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের জন্ত পাঠের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী ব্যাপক বলিয়া মনে করিয়া অনেক শিক্ষাবিদ্ সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্ত নিয়ন্ত্রিত পাঠের ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন। পরি-কল্পনাগুলিও ঠিক সেইভাবেই রচিত হইয়াছে। সমস্ত

ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে উপকৃত হইতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য করিয়া যে সমস্ত পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

নিয়ন্ত্রিত পাঠ ও পাঠগৃহ—প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটি করিয়া বড় রিয়াট হল বা পাঠগৃহ থাকিবে। পাঠগৃহে পড়িবার জন্য সময়পত্রে সময় নির্দেশ থাকিবে। যখন যে শ্রেণী সেই পাঠগৃহে আসিবার সুযোগ পাইবে, সেই শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ঐ পাঠগৃহে বসিয়া তাহাদের পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে যে কোন বিষয় পড়িতে পারিবে। যে বিষয় ছাত্রছাত্রীরা পড়িবে, সেই বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া দল গঠন করিয়া ছাত্রছাত্রীরা বসিবে এবং তাহারা নিম্নস্বরে আলোচনা করিয়া সেই বিষয়টি পড়িবে। এমনভাবে তাহারা পড়িবে যাহাতে অপরের কোন অসুবিধা না হয়। যদি কেহ ইচ্ছা করে তবে সে ব্যক্তিগতভাবেও পড়িতে পারে। প্রয়োজনবোধে একাধিক শিক্ষক পাঠগৃহে থাকিবেন। তাঁহার বা তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য হইবে ছাত্রছাত্রীরা ঠিকমত পড়িতেছে কি না দেখা, যে সময়টা পড়িবার জন্য সময়পত্রে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা যেন ছাত্রছাত্রীরা উপযুক্তভাবে পাঠে ব্যয় করে তাহাই হইতেছে এই পাঠগৃহে বসিয়া নিয়ন্ত্রিত পাঠের উদ্দেশ্য। গৃহে নানা কারণে পড়ার সুবিধা নাই, তাই এই নিয়ন্ত্রিত পাঠ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে কল্যাণকারী হইবে বলিয়া মনে হয়। এইখানে শিক্ষক বা শিক্ষকদের প্রধান কাজ শুধু পাঠ কার্য্য যথাযথভাবে সম্পাদিত হইতেছে কি না তাহা দেখা হইলেও, প্রয়োজন বোধে তিনি বা তাঁহারা দলকে ও ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রছাত্রীকে সাহায্য করতে পারিবেন।

পাঠগৃহ ছাড়া শ্রেণীকক্ষেও নিয়ন্ত্রিত পাঠের ব্যবস্থা থাকিবে। ইহার জন্যও বিভিন্ন রূপ পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

(ক) নিয়ন্ত্রিত পাঠে সময় ভাগ করিয়া পাঠদানের ব্যবস্থার কথা কোন কোন শিক্ষাবিদ্ বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে যদি সমাজ-বিদ্যার পাঠের জন্য ৪০ মিনিট সময় নির্দিষ্ট থাকে, তবে ২০ মিনিট সময় শিক্ষক পাঠদান করিবেন এবং বাকী ২০ মিনিট সময় তিনি নিয়ন্ত্রিত পাঠের ব্যবস্থা করিবেন। এই সময় পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয় অন্যান্য পুস্তক হইতে পাঠ চলিতে পারিবে। পাঠের একই মূল হইতে উৎপন্ন অথচ সমান্তরাল বিষয়-সমূহই অন্য পুস্তকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে লেখা থাকিতে পারে। শিক্ষক মহাশয় সেইসব পুস্তক ছাত্রদিগকে দিতে পারেন এবং এক একজন ছাত্রছাত্রীকে ঐ সমস্ত সমান্তরাল অংশসমূহ শ্রেণীর কাছে পড়িতে বলিতে পারেন। একজন পড়িবে, অন্য সকলে শুনিবে ও নোট করিবে। এইভাবে পড়া হইলে শ্রেণীতে যাহা পাঠদান করা হইল, তাহার জন্য গৃহে খুব বেশী পরিশ্রম করিতে হইবে না।

(খ) নিয়ন্ত্রিত পাঠ সম্বন্ধে আর এক পরিকল্পনা দেওয়া গিয়াছে। এই পরিকল্পনাকে Batavia plan বা বাটাভিয়া পরিকল্পনা বলা হয়। বাটাভিয়া সহরের একটি স্কুলের সুপারিন্‌টেনডেন্ট John Kennedy এই পরিকল্পনার মূলে ছিলেন। তিনি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি বৃহৎ শ্রেণী কক্ষ উপযুক্তভাবে কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে একটি শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দুইজন শিক্ষকের উপর তাহাদের পাঠনার ভার ন্যস্ত করেন। একজন শিক্ষক এক শ্রেণীর একদল ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠদান করিলেন, অপর শিক্ষক অপর দল ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ন্ত্রিত পাঠের ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে খুব ভাল ফল দেখা গিয়াছিল। অনগ্রসর শিশুরা এইরূপ ব্যবস্থায় বিশেষভাবে উপকৃত হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা সুপারিন্‌টেনডেন্ট লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে শ্রেণীতে দুইজন শিক্ষকের ব্যবস্থার ফলেই যে শ্রেণী পাঠনার উন্নতি হইয়াছে তাহা নয়, উন্নতি হইয়াছে নিয়ন্ত্রিত পাঠের জন্য। এইরূপ ব্যবস্থা অন্যান্য শ্রেণীতে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও অবলম্বন করা হয়। বলা বাহুল্য, সর্বক্ষেত্রেই ইহার উপকারিতা পরিলক্ষিত হইয়াছে।

(গ) তৃতীয় প্রকারের পরিকল্পনাও নিয়ন্ত্রিত পাঠের ক্ষেত্রে দেখা যায়। ইহা অনেকটা প্রথম পরিকল্পনার ন্যায় বলা যাইতে পারে। প্রথম পরিকল্পনায় একটি শিরিয়ডকে

দুইভাগে ভাগ করিয়া পাঠদান ও নিয়ন্ত্রিত পাঠের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইখানে ব্যবস্থা একই রূপ, কিন্তু পার্থক্য শুধু সময়ে। প্রথম ক্ষেত্রে একটি পিরিয়ডে দুই অংশ এবং এই পরিকল্পনায় দুইটি পিরিয়ডে দুইটি অংশ। প্রথম পিরিয়ডে শ্রেণীতে শিক্ষক পাঠদান করেন, দ্বিতীয় পিরিয়ডে শ্রেণীতে নিয়ন্ত্রিত পাঠের ব্যবস্থা হয়। কোন কোন স্কুলে ব্যবস্থাটা উল্টা করিয়া করা হয়। প্রথম পিরিয়ডে থাকে নিয়ন্ত্রিত পাঠ, পরের পিরিয়ডে থাকে পাঠদান। দুইটি পিরিয়ডে দুইরকম ব্যবস্থার মধ্যে কোন্‌টি ভাল তাহা নিয়া অনেক আলোচনা করা হইয়াছে। অনেকে বলেন প্রথমে পাঠদান, পরে নিয়ন্ত্রিত পাঠই উপযুক্ত ব্যবস্থা। কিন্তু কেহ কেহ নিয়ন্ত্রিত পাঠকে অগ্রাধিকার দিয়াছেন। যাঁহারা প্রথম ব্যবস্থাকে পছন্দ করেন, তাঁহারা বলেন পাঠদান হইয়া গেলে ছাত্র-ছাত্রীর মনে ঐ পাঠ সম্বন্ধে যে সমস্ত সন্দেহ থাকে, তাহা নিরসনের জন্য পরবর্তী সময়েই নিয়ন্ত্রিত পাঠ উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু পক্ষান্তরে দ্বিতীয় মতকে যাহারা সমর্থন করেন, তাঁহারা বলেন যে পাঠদানের পর, কিছুটা সময় বিষয়টি খিতাইয়া দিবার জন্য প্রয়োজন হয়। সময় পাইয়া বিষয়টি মনের মধ্যে খিতাইয়া গেলে বিষয়টি অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসে এবং যদি কোন সন্দেহ থাকে, তবে সেটা স্পষ্টভাবেই জানা যাইয়া উঠিবে এবং তখন নিয়ন্ত্রিত পাঠের ব্যবস্থা হইলে জিনিসটা ভাল ভাবে বোঝপমা হইবে। তাছাড়া প্রথমে নিয়ন্ত্রিত পাঠ হইলে উহা পূর্বজ্ঞান হিসাবে পরের পাঠের জন্য প্রস্তুতির কাজও করিবে। যে ব্যবস্থাই হউক না কেন ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে এইরূপ নিয়ন্ত্রিত পাঠের ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে কার্যকরী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু একদল শিক্ষাবিদ্ এইরূপ Double period plan-এর বিরোধিতা করেন। তাঁহারা বলেন যে পাঠ্যক্রমে যত বিষয় রহিয়াছে, প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য যদি দুইটি করিয়া পিরিয়ডের ব্যবস্থা করা যায়, তবে পাঠাসূচী শেষ হবে কখন? যেমন ষষ্ঠ শ্রেণীতে ইংরেজী, বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, হিন্দি, সংস্কৃত ইত্যাদি রহিয়াছে। কোন কোন বিষয়ের অন্তর্গত আবার অন্যান্য শাখা-বিষয় আছে, যথা ইংরেজী, ইংরেজী অনুবাদ, ইংরেজী ব্যাকরণ, ইংরেজী রচনা ইত্যাদি। এতগুলি বিষয় ও শাখা-বিষয় থাকিলে, প্রত্যেক বিষয়ের জন্য দুই পিরিয়ড করিয়া আবার লইলে সমস্ত বিষয়ের উপর উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হইবে কিনা, সে বিষয়ে শিক্ষাবিদেরা প্রশ্ন করেন। তাঁহারা বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ছাত্রছাত্রীরা যে সময়ের জন্য বিদ্যালয়ে আসে, সেই সময়ে উপরের পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থা অসম্ভব। কিন্তু আমরা পূর্বে দেখিয়াছি গৃহে পাঠাভ্যাসও সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, অতএব বিদ্যালয়েই যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত পাঠের ব্যবস্থা থাকিবে। অতএব বিদ্যালয়ের সময়কাল আরও দুই ঘণ্টার মত বৃদ্ধি করিতে হইবে। দুপুরে 'টিফিন' খাওয়ার বন্দোবস্ত ধীরে ধীরে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করিতে হইবে। আশা করা যায়, তাহা করা হইলে দিনে দুই ঘণ্টা বেশী সময় বৃহৎ মঙ্গলের জন্য কেহই আপত্তি করিবেন না।

(৪) আর একদল শিক্ষাবিদ্ আছেন, যাঁহারা নিয়ন্ত্রিত পাঠকে স্বীকৃতি দেন, কিন্তু পূর্ববর্তীদের মত গুরুত্ব দেন না। তাঁহারা অনেকে বলেন যে একদিন অন্তর একদিন নিয়ন্ত্রিত পাঠের ব্যবস্থা থাকিলেই যথেষ্ট। তাঁহারা পিরিয়ডকে ভাগ করা, কিংবা দুইটি পিরিয়ডে একটি বিষয় নিয়ন্ত্রিত পাঠসহ পড়ান পছন্দ করেন। আবার একদল শিক্ষাবিদ্ আছেন, তাঁহারা প্রতি সপ্তাহে একটি বিষয়ের জন্য একটি করিয়া নিয়ন্ত্রিত পাঠের ব্যবস্থাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন।

ক্রমশঃ

কল্যাণধর্মী সাহিত্য

॥ শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় ॥

শব্দব্রহ্ম আর পরব্রহ্ম উভয়ই মানুষের কাম্য ধন।

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে তু শব্দ ব্রহ্ম পরং চ যৎ
শব্দ ব্রহ্মণি নিষ্ণাত পরং ব্রহ্মধিগচ্ছতি
গ্রন্থমভ্যস্ত মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞান তত্ত্বতঃ
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেৎ গ্রন্থমশেষতঃ।"

—শব্দব্রহ্ম আর পরব্রহ্ম এই দুই বিদ্যাই বরেণ্য। কিন্তু পরব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম সারাৎসারকে উপলব্ধি করবার অধিকার জন্মায় শব্দব্রহ্মে ব্যুৎপত্তিলাভের পর। শব্দব্রহ্ম স্বরূপ গ্রন্থাদি পাঠ করে মানুষের মন যখন পরব্রহ্ম লাভের পথে অগ্রসর হয় তখন ঐ গ্রন্থ—ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞান সব দূরে ফেলে দাও, যেমন ধানগুলো কেড়ে নিয়ে বিচুলি বা খড় অনাদরেই দূরে নিক্ষেপ করা হয়।

ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদ হতে এই গভীরার্থক বাণীটি আমরা লাভ করি। ঠিক অনুরূপ না হলেও তারী সুন্দর কথা বলেছেন জনৈক পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিত: Print is the pass-port to truth. It opens the richest empire mau knows—the empire of the heart and mind. Men die, devices change; success and fame run their course. But within the walls of even the smallest library lie the treasures, the wisdom, and the wonder of man's greatest adventures on this earth.

এ জাতীয় উক্তির অভাব নেই প্রায় কোন সাহিত্যেই। কিন্তু এই উক্তির সার্থক রূপায়ণ তখনই সম্ভব হয় যখন সাহিত্য-সৃষ্টির পিছনে থাকে কোন মহান আদর্শ এবং মহতী অনুপ্রেরণা। সাহিত্য-সরস্বতীর ক্ষেমঙ্করী রূপ প্রকটিত হয় সাহিত্য-সাধকের নিষ্ঠাযুক্ত তপস্যায়।

আদর্শচ্যুত, অর্থকরী সাহিত্যের স্কন্ধে ভর দিয়ে দুষ্টা-সরস্বতী আবির্ভূতা হন, এবং সমাজমানসের অধোগতি ঘটান। সাহিত্যোৎকর্ষের সঙ্গে জাতীয় উজ্জীবনের নিবিড় সম্বন্ধ। ইতিহাস এর প্রচুর সাক্ষ্য দেয়। সেই বৈদিক ঋষি-কবি হতে শুরু করে হোমর, দান্তে, বাল্মীকি, বেদব্যাস, হাফিজ, শেক্সপীয়র, গোটে, পুশকিন, ইব্‌সেন, রবীন্দ্রনাথ, ইয়েটস্ প্রমুখ মহাজনগণ সবাই আদর্শানুসারী। পরমেশ্বর, প্রকৃতি আর মানুষ—এই ত্রিজ্ঞের রহস্যত্রয় এঁদের মুগ্ধ করেছে, বিস্মিত করেছে এবং অনুপ্রাণিত করেছে। যুগে যুগে মানুষের প্রজ্ঞার আলোর ইন্ধন জুগিয়েছে এই তিনটি বস্তু। সভ্যতার বনিয়াদ রচনা করেছেন এই মহাজনগণ। এঁদের সাহিত্যকীর্তি সভ্যতা-সৌধের আলোকোজ্জ্বল নীর্দেশ। দুস্তর কাল-সমুদ্রের ব্যবধানেও এঁরা পরস্পরের সহিত হাত মিলিয়েছেন আদর্শের ঐক্য-বন্ধনে।

পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার অব্যাহত সম্প্রসারণের ফলে পুস্তক-প্রকাশন ও মুদ্রণের ক্ষেত্রেও প্রচুর ফলন হচ্ছে। আর এই ফলনের একটা মোটামুটি খতিয়ানও আমরা পেয়ে আসছি। বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার যুগে পৃথিবীর কয়েকটা দেশ আজ এক বিষম প্রতিযোগিতায় ব্যাপৃত। এই প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবল রাজনীতি তথা পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎকর্ষলাভই বলাধানের শ্রেষ্ঠ পন্থা। তাই আজ শিক্ষা-ক্ষেত্রেও কে কাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে তারই জন্যে চলেছে আপ্রাণ চেষ্টা।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েট ইউনিয়ন—এই দেশ দুইটি আজ একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী।

KTO KVO (Who wins?)—সংক্ষিপ্ত এই কথা দুইটির মধ্য দিয়ে এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক

মনোভাবটি ব্যক্ত হয়েছে। পাশাপাশি দুইটি রেল-ইঞ্জিনের ছবি—একটি কাল এবং অপরটি লাল রঙে চিত্রিত। কলকাতায় রচিত এই প্রাচীর পত্রটির ইঙ্গিত অতি সুস্পষ্ট। পুস্তক-প্রকাশ ও মুদ্রণ এই বহুমুখী প্রতিযোগিতার একটা বড় রকমের দৃষ্টান্ত। ইদানীং কোন একবৎসরের একটা হিসাবে আমরা দেখতে পাই যে, ঐ বৎসরে পৃথিবীর কয়েকটি দেশে কি সংখ্যক বই ছাপানো হয়েছিল।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র—১৩ ৪৬২

ভারত— ১১ ৪৩৩

ইংলণ্ড— ২২ ১৪৩

সোভিয়েট রাশিয়া—৬৩ ৪৬১

সংখ্যা বা পরিমাণের দিক দিয়ে সোভিয়েট রাশিয়া অন্য দেশগুলির উপর বেশ টেক্কা মেরেছে। এর মধ্যে পরিসংখ্যানের কারসাজি কিছু আছে কিনা জানা যায় নি। তবে এই হিসাবের একটা দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, ৬৩৪৬১ বইয়ের মধ্যে ৩৪০০০ হাজার বই বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা বিষয়ক। সোভিয়েট রাশিয়ার সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও অগ্রগতির সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ক বইএর এত প্রচলনের একটা যোগ থাকাই সম্ভব। নেহাৎ পরিসংখ্যানিক বাহাদুরি বলে সোভিয়েট দেশের এই কৃতিত্বের প্রতি কটাক্ষ যুক্তিসঙ্গত নয়। ইংলণ্ডের বইয়ের বাজারে একটু ঘুরে আসা যাক। ইংরাজী বইয়ের বাজার সব চাইতে বড়। ইংরাজী বই চলে পৃথিবীর সর্বত্র।

১৯৬০ সনে ইংলণ্ডে নানা বিষয়ে যত বই ছাপান হয়েছিল তার সর্বসমেত কপির সংখ্যা ছিল ৯৫ ০০০ ০০০ (নয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ)। ঐ বৎসর ইংলণ্ডে যে বইখানা সর্বাধিক বিক্রীত হয়েছিল, যাকে বলে বেস্ট-সেলার (best-seller) তা একখানা রসায়ন বিদ্যার বই। বইয়ের লেখক ইয়র্ক স্কুলের শিক্ষক অ্যালবার্ট হোল্ডারনেস (Albert Holderness)। বইখানার তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কপি এক বৎসরে বিক্রীত হয়েছিল।

অন্যান্য আরও কয়েকটি দেশের বইয়ের চাহিদা ও কাটতির হিসাব নিলেও দেখা যায় যে বর্তমানে পুস্তক-পাঠক এবং ক্রেতাদের ঝোঁক হচ্ছে বিজ্ঞানের দিকে। এ দেশে বই-প্রকাশের একটা সাম্প্রতিক এগার বৎসরের হিসাব তৈরি করেছিল জাতীয় গ্রন্থাগার। এই হিসাবে দেখা যায় যে এই এগার বৎসরে ভারতীয় নানা ভাষায় যত বই অনূদিত হয়েছে তার মধ্যে বাংলা বই সব চাইতে বেশী সংখ্যায় ভাষান্তরিত হয়েছে :

বাংলা বই—৩৪৮

সংস্কৃত —১৭৪

হিন্দি —১২৩

মারাঠি —১১১

পক্ষান্তরে অন্য ভাষার বই বাংলায় অনূদিত হয়েছে :

বাংলা—৪২৯

হিন্দি—৬৩৪

এ ক্ষেত্রে হিন্দি এগিয়ে আছে। কিন্তু হিন্দির কথা একটু স্বতন্ত্র, তার কারণ হিন্দি ভারতের রাষ্ট্র ভাষা—এর প্রচলন পশ্চিমে দিল্লী হতে পূর্বে বিহার এবং রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ ব্যাপী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। এই অঞ্চলের অধিবাসীগণ হিন্দিভাষী, তা'ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার এবং উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের রাজ্য সরকার হিন্দির প্রসারে অতিমাত্রায় উদ্যোগী। এ বিবেচনায় হিন্দি অপেক্ষা বাংলায় অপরাপর ভাষা থেকে অনূদিত বইয়ের সংখ্যা কিছুটা কম হলেও তা বাংলা ভাষার পক্ষে খুব অগৌরবের কারণ নয়। বরঞ্চ ভারতের অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা বাংলা যে অনেকখানি এগিয়ে আছে নানাভাবে, তারই সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় গ্রন্থাগারের উক্ত হিসাবটি বলছে যে, এই অনুবাদ প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান এবং যন্ত্রবিদ্যা বিষয়ক বইয়ের অনুবাদ খুব কমই হয়েছে। ভাববার কথা। হালে বাংলা বই প্রকাশের ক্ষেত্রে যে রুদন হচ্ছে তাকে খুব অপ্রচুর বলা যায় না। সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাষার স্থান ইংরেজী এবং হিন্দির কিঞ্চিৎ নীচেই।

প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্য এবং অভিনবত্বের দিক দিয়েও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও মনোহারিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাইকেল-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের যুগ তো কবেই গত হয়েছে। সেদিনের রবীন্দ্রনাথ তাঁকেও যেন কখনো

কখনো মনে হয় অনাধুনিক। হালে যারা বাংলাসাহিত্যের নামকরা লেখক তাঁদের শব্দসম্ভার এবং রচনাশৈলী কতই বিচিত্র, কতই বিস্ময়কর! ভাষার সাবলীলতা ও প্রকাশ-ক্ষমতা শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কত জটিল বিষয়, কত দুরূহ ভাব আজ অতি সহজে বাংলা ভাষায় পরিবেশিত হচ্ছে সমসাময়িক সাহিত্য, সংবাদপত্র, বেতার ভাষণ ইত্যাদির মাধ্যমে। আজ প্রতিশব্দের বা পরিভাষার অভাবে কোন কথাকে বাংলায় বলা বা লেখা যায় না—একথা মেনে নেওয়া দুষ্কর। কত নতুন নতুন শব্দ, নব নব শব্দ-বিন্যাস আর নতুন ঢংয়ের রচনায় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হচ্ছে।

যাঁরাই বাংলা সাহিত্যের প্রগতির খোঁজ খবর রাখেন তাঁরাই এ-কথার সত্যতা স্বীকার করবেন। বাংলা গদ্য-রচনার রীতি এক দ্রুত বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে চলেছেন। অবশ্য এখানে বলে রাখা ভাল যে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নতুন রূপ পরিগ্রহ করছে, কিন্তু এখনও আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারেনি। বাংলা নাটা-সাহিত্যেও নব নব সৃষ্টির প্রচুর প্রয়াস চলেছে।

বাংলা ভাষার অজ্ঞাত প্রাগৈতিহাসিক জন্মলগ্নে কোন্ অনামা কবির কণ্ঠে একটি সার্থক ভবিষ্যবাণী উচ্চারিত হয়েছিল :

ঘন রসময়ী বক্রিমো সুভগো
উপজীবিতা কবিভিঃ।
অবগাঢ়া চ পুণ্যৈতে গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ॥

ঘনরসময়ী বাংলা ভাষা পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর স্নিগ্ধ বারি-ধারার মতই এই প্রান্তীয় ভূখণ্ডের মনোভূমিকে লালন করছে। সেদিনকার অর্থাৎ দু'হাজার বৎসর পূর্বেকার সেই আদিম ও অনাড়ম্বর বাংলা ভাষার বিরাট ভবিষ্যৎ যিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন তাঁকে আজিকার সাহিত্য-সম্মেলনের দিনে অভিনন্দন জানায় বঙ্গভাষী মাত্রেই। ঠিক এরিতর আর একটি আশাপ্রকাশিনী উক্তি করেছিলেন রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা প্রাচ্যবিদ্যাপারদর্শী মনীষী স্যার উইলিয়ম জোন্স। সেও আজ থেকে দু'শ বছর আগেকার কথা। তখনও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাথমিক অবস্থা। This language current through an extent of country nearly equal to Great Britain, when properly cultivated, will be inferior to none in elegance and perspecuity.

সেদিনকার বাংলাভাষার প্রাথমিক রিক্ত অবস্থা আর আজকের সমৃদ্ধিশালিনী, ঘনরসময়ী বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্যের কথা ভেবে দেখলেই এই ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা উপলব্ধি করা সহজ। বাংলা সাহিত্যের এখন ভাল ফলনের যুগ। যদিও বাংলা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ অখণ্ড বঙ্গভূমির মাত্র তিনভাগের একভাগ, যদিও পূর্ব পাকিস্তানের দুয়ার পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত বইয়ের পক্ষে রুদ্ধ এবং যদিও প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মনোভাব বাংলা এবং বাঙালীর প্রতি অপ্রসন্ন, তবুও আশ্বাসের কথা এইটুকু যে, এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলার লেখককুল ও প্রকাশকেরা হতোদ্যম নহেন।

দেশে শিক্ষার প্রসার হচ্ছে এবং তারই সঙ্গে তাল দিয়ে চলেছে সাহিত্য-সৃষ্টি। তাই যাবতীয় প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলা ভাষার ফলন আজ ভারতের অন্যান্য ভাষার পিছনে পড়ে নেই। নানা ক্ষেত্রেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আধুনিক যুগে মানুষ সব চাইতে বেশী পড়ে খবরের কাগজ। ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত খবরের কাগজগুলির বেশীর ভাগই পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত বাংলা কাগজ।

কিন্তু এই ফলন-প্রাচুর্যের সবটাই যে সারবান তা নয়। অসার আগাছা যেমন শস্যের হানি ঘটায়, সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রেও অসার সাহিত্যের আধিক্য ক্ষতিকর। ভারতের নানা ভাষা-ভাষী লোকেরা কি ধরণের বই বেশী পড়ে এরও একটা পরিসংখ্যা সংগ্রহ করেছেন জাতীয় গ্রন্থাগার। বাঙালী পাঠকেরা সব চাইতে বেশী পড়ে উপন্যাস আর গল্প। পূজার বাজারে সামরিক অনেক পত্রিকারই বিশেষ পূজা সংখ্যা বের হয়। এর মধ্যে সব চাইতে বেশী কাটতি সিনেমা-পত্রিকাগুলির। কলকাতার রাস্তায় ঘোড়ে, আর রেল স্টেশনের স্টলে

ঘরে ঘরে সাজান থাকে লাস্যময়ী চিত্রতারকাদের মনোরমা ছবি সম্বলিত নানা প্রকারের সিনেমা-পত্রিকা। বহু পাঠক-পাঠিকা গোগ্রাসে পড়ে এই সব পত্রিকার চটুল গল্প আর অভিনেতা-অভিনেত্রীর যত অসার কীর্তি-কাহিনী। সিনেমা-পত্রিকার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে গত ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে। এর ফলে বাংলার সাহিত্য-পত্রিকাগুলি খুবই নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। প্রাণের দায়ে এরাও বাধ্য হয়েছে থিয়েটার সিনেমা নিয়ে বিস্তর খুলতে।

দৈনিক কাগজগুলিও বাদ পড়ে নি। এরাও সপ্তাহে একদিন পুরোপুরি একটি পৃষ্ঠা ভরে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নানা ঢংয়ের ছবি আর খবর-প্রচার ক'রে পাঠক-পাঠিকার মনোরঞ্জন করে। অন্তঃসারহীন সাহিত্যের আজ ছড়াছড়ি, আর এর পাঠক-পাঠিকা বেশীর ভাগই কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতী। এ শ্রেণীর অপকৃষ্ট সাহিত্যের দৌলতে হয়ত জনকয়েক লোক বেশ মোটা লাভ করছেন। কিন্তু সমাজের এবং জাতীয় মানসের যে অপরিসীম ক্ষতি সাধিত হচ্ছে এই শ্রেণীর চিন্তা-লেশহীন, অসংযমী-সাহিত্য দ্বারা সে কথাটা গভীর ভাবে ভেবে দেখবার বিষয়। পরিতাপের বিষয় এই যে, টাকার লোভে আজ নামকরা সাহিত্যিকরাও এই শ্রেণীর সাহিত্যের পরিপোষক হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

পূজা আসবার বেশ কিছু আগে থেকেই লেখা সংগ্রহের হিড়িক পড়ে যায়। লেখার বেশীর ভাগই গল্প। গল্পের চাহিদাই বেশী। যারা নামকরা লেখক তারা এই মরশুমে বেশ মোটা টাকা পেয়ে থাকেন বলে শোনা যায়। পত্রিকা-ওয়ালারা আগাম টাকা দিয়ে উপন্যাস ও গল্পের বায়না করেন। তারপর কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপনের হড়োহুড়ি। অনেক গল্পলেখকের কথা শুনলাম। ভদ্রলোক আফিস থেকে এই সময়টা মাসখানেকের ছুটি নিয়ে পূজাসংখ্যার জন্য গল্প লিখতে বসেন। তিরিশ দিনের ছুটিতে মোট আটাশটি গল্প লিখেছেন, অর্থাৎ পড়ে দৈনিক প্রায় একটি গল্প। কি সাংঘাতিক ব্যাপার!

লেখক যত বড় প্রতিভাধর ব্যক্তিই হউন না কেন, তিরিশ দিনে লেখা আটাশটি গল্প যে অশ্বত্থামার দুধের মত পিটুলির গোলার চাইতে উৎকৃষ্টতর পদার্থ কিছু নয় সে কথা হলপ করে বলা যায়। উৎকর্ষের চাইতে সংখ্যা বা পরিমাণের দিকেই ঝোঁক বেশী। এক একজন লেখক এক বছরে ৪।৫ খানা মোটা মোটা উপন্যাস বাজারে ছাড়েন। গল্প আর উপন্যাস না লিখলে আবার বিশেষ সাহিত্যিক! তাই গল্পলেখকেরা যে যত পারে তারী তারী গল্প আর উপন্যাসের বই লিখে তাড়াতাড়ি সাহিত্যের বাজার জাঁকিয়ে বসতে বদ্ধপরিকর। অতি-ফলনের কুফল সহজেই অনুমেয়। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ছাপান্ন বৎসর বয়স বেঁচেছিলেন, আর তার মধ্যে উপন্যাস লিখেছিলেন মাত্র তেরখানা। বর্তমানের যে কোন লেখকই একে নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর ফসল বলে মনে করবে।

পরিমাণে অকিঞ্চিৎকর কিন্তু গভীরতা এবং সারবত্তার দিক দিয়ে মূল্যবান সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন প্রতিভাধর বঙ্কিমচন্দ্র।

"বঙ্গের সাহিত্যাকাশে অপূর্ব ভাস্কর
যা-কিছু মঙ্গলধর্মী সত্য ও সুন্দর,
বঙ্কিম তাহারি নাম;"
"ধর্ম যার মর্মকথা, কর্ম যার বাণী
বক্ষে প্রেম, চক্ষে ক্ষেম, সব্যসাচী পাণি
বঙ্গের বঙ্কিম সেই শাশ্বত সুপ্রিয়,
—সে শুধু সম্রাট নয়, সে যে অধিতীয়।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার মূল প্রেরণা এসেছিল গভীর জীবনবোধ এবং শুভচিকীর্ষা হতে। তাঁর সৃষ্টি তাই কল্যাণধর্মী, ক্ষেমঙ্করী, সুন্দর এবং শাশ্বত। বঙ্কিম-চন্দ্রের অনুসৃত আদর্শ এবং পন্থাই সাহিত্যসাধনার দিকদর্শী স্বরূপ।

এর পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে মনীষী বার্নার্ড শ'র কথায়: "Art was for life's sake. For art's sake alone I would not face the toil of writing a single sentence,"

আদর্শ নিরপেক্ষ, প্রেরণাবিহীন সহজ অর্থাগমের উপায় হিসাবে সাহিত্যসেবা দ্বারা যে অনাসৃষ্টি এবং অকল্যাণের আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে, সে সম্বন্ধেই আজ সমাজকে হুঁশিয়ার হতে হবে। বাংলা সাহিত্যে ফলন-প্রাচুর্যকে স্বাগত জানাব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখব যে আগাছার প্রাচুর্যে শস্যের যেন শ্বাসরোধ না হয়। A zero multiplied by a thousand is still a zero.

বেলভিডর রোড ধরে

॥ শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ ॥

এখনো কুয়াশা ভোরে—শঙ্খের কলহংস
আলো নাড়ী কান্নার কলকাতা
এখনো মেলেনি চোখ, ট্রামছাড়া তীক্ষ্ণ আকাশের
মুখ দেখে মনে পড়ে কী তার যন্ত্রণা !
এখুনি এখানে এসে বড় হৃদয়ের
মানে তুমি খুঁজে নাও, কটি নত নিভৃত চারণা
তোমাকে অনেক দেবে। সময়ের হাত সে তো পাতা
পল পল শুনে তাকে দিতে হবে সব।
বুক ভরে শ্বাস নাও, মুক্ত হবে স্বপ্নত বিপ্লব
পীচগলা পথে পথে—ইস্পাতের রোলারের
ক্রম অপঘাতে
বিপন্ন দিনের দাহ ক্ষিপ্রিষ্ণু সন্ধ্যার শ্মশানে।

মৃত-বৎসা সহরের অবসন্ন প্রাণে
এখনো ঘুমের স্মৃতি ; ঘুম থেকে উঠবার আগে
চকিত চেতনা নিয়ে পার হয়ে চলে যাও
অন্ত কোনোখানে :
ডানায় ডানায় তাখো রুপোলী লেগেছে
রহস্যের পথ ধরে চলো তবে তীর্থ-অনুরাগে।
নির্জন গোলাপী তারা সেও তাখো নেমেছে নীচোয়,
ঘাসেরা পাতারা যেন দুচোখে মেলেছে
প্রাণের প্রথম কথা,—হিস্‌কাস্ হাওয়ার আদরে···,
তারা তো দুহাত ভরে জীবনের অমৃত বিলোয় ;
সব জীতে স্বপ্ন দেয়—আরোগ্যের নাম ধরে ডাকে।
তোমারই পথের দিকে রোজ ভোরে যেন চেয়ে থাকে
বলে, "মানুষের শিশু কাছে এসো
—আরো কাছে—হৃদয়ের ঘরে···"

"বেলভিডর রোড" ধরে রেস কোর্স ছাড়িয়ে ওপাশে
আকাশ অনেক নীচু, তারারা শরীরী হয়ে আসে
রুপোলী নরম তারা—জীবনের সব কথা জানে।
যখন সবাই ঘুমে, হাওড়ার ব্রীজের ওপরে
যখন চলে না কেউ, চুপি চুপি এসো না এখানে !
তখন তোমাকে ঘরে—বহু মন—ঢেউ-নদী
ঘাস-পাখী পাতার মর্মরে
তুমিও আকাশ হবে সম্বন্ধের গূঢ় অধিকারে।
আমি তাই রোজ ভোরে একবার ফিরে আসি
কান্নার এপারে ॥

ঋষি রবীন্দ্রনাথ

॥ অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

রবীন্দ্রনাথের শতাব্দী জয়ন্তী আজ বিশ্বব্যাপী উৎসবে পরিণত হয়েছে। দেশ-কাল-ভাষার সীমা অতিক্রম করে বিশ্বমানবের অন্তরের গোপন কথাটী সুন্দর করে ব্যক্ত করেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, তাই এই জগদ্ব্যাপী উৎসব আয়োজন। বাঙলাদেশে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব বাঙলা ভাষার পক্ষে, বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে, বাঙালী জাতির পক্ষে যে কতবড় গৌরবের কথা, আমরা এখনও তা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি।

শতাব্দী জয়ন্তীকে উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন সাহিত্য সমাজ বিভিন্ন দিক থেকে নানাভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচিত্র চরিত্র কথার আলোচনা করছেন; কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রের প্রভাব নিয়ে আলোচনা এ পর্য্যন্ত পৃথক ও ব্যাপকভাবে কিছু হয়েছে বলে আমার জানা নেই। অথচ রবীন্দ্রনাথের উপর উপনিষদের প্রভাব, রামায়ণ মহাভারতের প্রভাব মোটেই সামান্য নয়। কবির মন-জীবনের অনেকখানি জুড়ে আছে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ।

রবীন্দ্রনাথ এত বড় এবং আমরা এত ছোট ও তাঁর এত নিকট যে তাঁকে আমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারি না। আমরা সমসাময়িক, খুব কাছে বলেই আমরা তাঁকে ঠিক উপলব্ধি করতে পারি না। মনুমেন্টের তলদেশে দাঁড়িয়ে তার উচ্চতা ঠিক বুঝা যায় না, খানিক দূরে সরে গিয়ে দেখলে বুঝতে পারি মনুমেন্ট কত উঁচু। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও ঠিক তাই। তবে আপশোষ করবার কিছু নেই, এই রকমই হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের সত্য অবদান যত দিন যাবে ক্রমশ তা আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে। রবীন্দ্রনাথকে সম্যক বুঝতে পারি না বলেই তাঁর আশ্চর্য মধুর ছন্দময় ভাষার মায়াজালে মুগ্ধ হয়ে তাঁর গান গেয়ে, কবিতা আবৃত্তি ও নাটক অভিনয় করে এই মায়াশক্তিধর মহাকবির জন্ম শতবার্ষিক উৎসব পালন করছি। সাহিত্যিক বলতত্ত্বের আলোচনা সভাতেও বেশী শ্রোতা মেলে না, ভীড় জমে ওঠে নৃত্য-গীত-বাদ্য-অভিনয় ক্ষেত্রে।

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনাবলী সুস্পষ্টভাবে দুইভাগে বিভক্ত—কবি রবীন্দ্রনাথ ও ঋষি রবীন্দ্রনাথ। এই যে চারিদিকে এত নৃত্য-গীত-বাদ্য-অভিনয়ের সমারোহ বা সাহিত্য সভা, তা মূলত কবি রবীন্দ্রনাথের কথা। ঋষি রবীন্দ্রনাথের আলোচনা অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের উপর ভারতীয় অধ্যাত্ম শাস্ত্রের প্রভাব নিয়ে আলোচনা যে আদৌ হয় না তা নয়। বিবাহ-বাসরের উৎসব-মুখর রজনীতে স্ত্রীআচার-দীক্ষাচার নিয়েই যেমন সকলে ব্যস্ত, বিবাহের বৈদিক মন্ত্রপাঠ শুভস্থান পূরণ হিসাবে যেমন অতি সামান্য, ঋষি রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা সেই রকম ছিটে ফোঁটা, নাম মাত্র। বর্তমান প্রবন্ধে কেবল দিক্‌দর্শন হিসাবে ঋষি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দু একটী কথা বলবার চেষ্টা করলাম।

ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অলৌকিক প্রতিভাশালী পুত্র উপনিষদের প্রভাব অতিক্রম করে যেতে পারেন না। শিশুজীবনে জননীর প্রভাবই মানুষের উপর বেশী পড়ে, কারণ মায়ের সাথেই, তাঁর সেবাযত্নে শৈশব ও বাল্যাবস্থার অনেকখানি কেটে যায়। জননী স্বাস্থ্যহীনা বলে তাঁর সঙ্গে শিশু রবীন্দ্রনাথের মেলামেশার সুযোগ আদৌ হয় নি। রবীন্দ্র-জীবনে পিতার প্রভাবই সর্বাধিক। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক জীবনের ভিত্তি মহর্ষির নিজের হাতে গড়া। বাল্যাবধি রবীন্দ্রনাথের কর্ণে প্রবেশ করেছে উপনিষদের মহামন্ত্র ও ব্রহ্মসাধনার আলোচনা। উপনিষদের যে বাণী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে প্রতিফলিত হয়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠায় ব্রাহ্মসমাজ গঠনে প্রকাশ পেয়েছে, সেই বাণীই আরও গভীর ও সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে রবীন্দ্র-জীবনে, গানে,

কবিতায়, প্রবন্ধে, ধর্মীয় আলোচনায়। রবীন্দ্রনাথের উপর উপনিষদের প্রভাব যে কিরূপ সুদূরপ্রসারী তা দেখা যায় 'শান্তিনিকেতন'এর অসংখ্য প্রবন্ধাবলীতে। অধ্যাত্ম-ভাবের কবিতা ও ভক্তিপ্লুত সঙ্গীত রবীন্দ্রসাহিত্যে অসংখ্য এবং তা সহজ সরল ও সুন্দর; শুধু মুখের কথা হলে, অনুভূতি-লব্ধ না হ'লে—তা যত কবিকই হোক—তা এমন করে মানুষের মন স্পর্শ করতে পারত না। এই ব্রহ্মানুভূতির কথা জীবনস্মৃতিতে এইভাবে লেখা আছে—"একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ীর ছাদের উপর অপরাহ্নের শেষে বেড়াইতেছিলাম। দিবাবসানের ম্লানিমার উপরে সূর্যাস্তের আভাটি জড়িত হইয়া সেদিনকার সেই সন্ধ্যা আমার কাছে বিশেষভাবে মনোহর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। পাশের বাড়ীর দেয়ালগুলি পর্যন্ত আমার কাছে সুন্দর হইয়া উঠিল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, পরিচিত জগতের উপর হইতে এই যে তুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠিয়া গেল একি সায়াহ্নের আলোক-সম্পাতের একটী যাদু মাত্র? কখনোই তাহা নয়। আমি বেশ দেখিতে পাইলাম, ইহার আসল কারণটী, সন্ধ্যা আমারই মধ্যে আসিয়াছে, আমিই ঢাকা পড়িয়াছি। দিনের আলোতে আমিই যখন অত্যন্ত উগ্র হইয়াছিলাম তখন যাহা কিছুকেই দেখিতে শুনিতেছিলাম সমস্তকে আমিই জড়িত করিয়া আবৃত করিয়াছি। এখন সেই আমি সরিয়া আসিয়াছে বলিয়াই জগৎকে তাহার নিজের স্বরূপে দেখিতেছি। সে স্বরূপ কখনই তুচ্ছ নহে, তাহা আনন্দময়, সুন্দর।...চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্য্যে সর্বত্রই তরঙ্গায়িত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।...আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গী, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে আজি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইত, সকলেই যেন নিখিল সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মত বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম।"

বিশ্বমানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক ভাবতের একনিষ্ঠ সাধক। সাহিত্য-জীবনের অরুণোদয় হতে আরম্ভ করে জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত অসংখ্য কবিতায় গানে প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে অধ্যাত্ম অনুভূতির নিগূঢ় রহস্য। অপূর্ব তার ভাষা, অপূর্ব তার ছন্দ। প্রথম জীবনে লিখলেন—

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে,
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে রয়েছ হৃদয়ে গোপনে।
বাসনার বশে মন অবিরত
ধায় দশ দিশে পাগলের মত
স্থির-আঁখি তুমি মরমে সতত
জাগিছ শয়নে স্বপনে।

ইহা কেনোপনিষদের কথা—কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ ইত্যাদি—কাহার ইচ্ছায় আদিষ্ট হয়ে মন-প্রাণ নিজ বিষয়ের প্রতি যুক্ত হয় চক্ষু দেখে কান শোনে? ঋষি উত্তর দিলেন—তিনি প্রাণ-মন-চক্ষু-কর্ণের পিছনে লুকিয়ে আছেন। দিব্য চক্ষু না হলে তাঁকে দেখা যায় না। তিনি প্রাণের প্রাণ, মনের মন, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ—অর্থাৎ তিনি এগুলির আদি প্রবর্তক। কিশোর রবীন্দ্রনাথের মাতার এই গান শুনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বিস্ময়ে অভিভূত হলেন, পুত্রকে পুরস্কৃত করলেন—জীবনস্মৃতিতে এ ঘটনার উল্লেখ আছে। কতদিন পরে, রবীন্দ্রনাথের তখন অনেক বয়স হয়েছে, এই সুর ভক্তিরসে সিক্তিত হয়ে আবার ধ্বনিত হল—

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাই নি।
তোমায় দেখতে আমি পাই নি।
বাহির পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয় পানে চাই নি।
ইত্যাদি—

ব্রহ্মানুভূতির বাধক সম্পর্কে মৃত্যুর কিছু পূর্বে লিখলেন—

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে হে ছলনাময়ি—

তাই ঋষি-কবির আকুল প্রাণের ব্যাকুল প্রার্থনা—হে ছলনাময়ী, মায়ার মোহন আবরণ সরিয়ে আমাকে দিব্য সত্য দৃষ্টিতে সব কিছু দেখতে দাও—

হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম
রূপ অপাবৃত,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত।

ইহা ঈশোপনিষদের মন্ত্র—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

হে পূষন্ (সবিতা), তোমার মোহন আবরণ সরাও, আমি তোমায় দেখি।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবতার পূজারী। উপনিষদেরই একটি বিশেষ কথা বিশ্বপ্রেম। নিজেকে যেমন ভালবাস, পরকেও তেমনি ভালবাসবে। কিন্তু কেন? এ প্রশ্নের উত্তর জগতের কোন ধর্মশাস্ত্রে নেই কিন্তু উপনিষদে আছে। সর্বভূতে ভগবৎ সত্তার অনুভূতি—উপনিষদের এই তত্ত্বই বিশ্বপ্রীতির মূল উৎস। মানুষের ধর্ম, বিশ্ব-প্রেম বলে যদি কোন বস্তু থাকে, মানবের একত্ব, মহা-মানবতা বলে কোন বস্তু থাকে, তবে তার মূলে এই তত্ত্বই আছে। বর্তমান জগতে প্রীতি, মৈত্রী, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রয়াস বিফল হবে যতদিন না তা এই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। য়ুরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি—অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ। স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ। মহামানবতার জয় গান করে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

হেথা একদিন বিরাম বিহীন
মহা ওংকার ধ্বনি

হৃদয়-তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি। ইত্যাদি। অন্যত্র তিনি লিখেছেন—এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মিথ্যার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে সে কেবল মহান একের উপলব্ধির অভাবে। যত ক্ষুদ্রতা, নিষ্ফলতা, দৌর্বল্য, সে একের থেকে বিচ্যুতিতে। যত মহাপুরুষের আবির্ভাব, সে এই একত্বকে প্রচার করতে।

বর্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদিক চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ বাহক ও প্রচারক। উপনিষদের সুপরিচিত 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা' মন্ত্রটির প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

——শোন বিশ্বজন
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।

ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাহীন বর্তমান ভারতবাসীকে দেখে ক্ষুব্ধ চিত্তে প্রশ্ন করেছেন কবি—

আর বার এ ভারতে কে দিবে গো আনি
সে মহা-আনন্দমন্ত্র সে উদাত্ত বাণী
·····অনন্ত অমৃত বার্তা।

অনেক স্থলে উপনিষদ মন্ত্রের অংশ বিশেষ অবলম্বন করেই বিকশিত হয়েছে অপূর্ব সঙ্গীত। মন্ত্রে আছে—নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্। রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন—

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে
প্রাণ করে হায় হায়।
নদীতটসম কেবলি বৃথাই
প্রবাহ আবরি রাখিবারে চাই
একে একে বুকে আঘাত করিয়া
ঢেউগুলি কোথা যায়। ইত্যাদি

উপনিষদের মন্ত্রে আছে—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি—আনন্দ হতে ভূতসমূহ জন্মে, আনন্দের দ্বারাই জীবিত থাকে, অন্তে আনন্দেই প্রবেশ করে। এ জগৎ তাঁর আনন্দ-লীলা। রবীন্দ্রনাথের বাণীতে এই আনন্দলীলার গান ধ্বনিত হয়েছে।

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হ'ল ধন্য হ'ল মানব জীবন।

তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার
বাজাই আমি বাঁশি।
গানে গানে যোরে বেড়াই
প্রাণের কান্না-হাসি।

উপনিষদের মন্ত্রে আছে—ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ইত্যাদি—জগতের সর্বত্র সর্বদা ঈশ্বর অনুস্যূত আছেন। আবার বলছেন—

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে বিশ্বভুবনে ওষধিতে বনস্পতিতে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, সেই দেবতাকে বারংবার নমস্কার করি। ভারতাত্মার বাণী-ব্যাখ্যাতা রবীন্দ্রনাথ সেই পরম দেবতার অখণ্ড অক্ষয় ঐক্যের কথা উপলব্ধি করে লিখছেন—

——সবার উপরে
অগ্নিতে জলেতে এই বিশ্বচরাচরে
বনস্পতি-ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য। ইত্যাদি

ঈশ্বর আনন্দময়, শান্তি-নিকেতন। সংসারে সুখ শান্তি আনন্দ পেতে হলে তাঁকে চিন্তা করতে হবে, তাঁকে উপলব্ধি করতে হবে। সেই পরমানন্দস্বরূপ ঈশ্বরকে যদি আমরা না পাই তবে এ পৃথিবীর সব পাওয়াই বৃথা হবে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

কী লয়ে বা গর্ব করি ব্যর্থ জীবনে।
তব গৃহে শূন্য আমি তোমা বিহনে। ইত্যাদি

অন্যত্র লিখছেন—

এ সংসারের হাটে আমার যতই দিবস কাটে
যতই দু'হাত ভরে উঠে ধনে।
তবু কিছুই আমি পাই নি যেন
সে কথা রয় মনে
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।

কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা জানতে চাই না কেন, কে বাধা দেয়? মানুষের অহংকার প্রবল বাধা। অহংমূর্তির সাধনার কথা কবির অনেক গানে প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে। ইহাই গীতাঞ্জলির প্রথম অঞ্জলি—

আমার মাথা নত করে দাও হে
তোমার চরণ ধূলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

নিরহংকার হওয়া নির্লোভ হওয়া খুব সহজ কথা নয়, তাঁর প্রসাদ-পবন সঞ্চারিত হলে সম্ভব। কিন্তু তোমার কৃপা কেমন করে চাইতে হয় তাও তো জানি না। সাধক রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

না হয় আমার নাই সাধনা,
করলে তোমার কৃপার কণা
তখন নিমেষে কি ফুটবে না ফুল
চকিতে ফল ফলবে না।

আবার লিখলেন—

তোমার দয়া যদি চাহিতে নাহি জানি
তবুও দয়া করে চরণে নিও টানি। ইত্যাদি

তাই আকুল প্রার্থনা—

তাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে আশা করি প্রাণপণে
নিবিড় প্রেমের সরস কথা যদি নেমে আসে মনে।
সহসা একদা আপনা হইতে
ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে,
এই ভরসায় করি পদতলে শূন্য হৃদয় দান
সংসার যবে মন কেড়ে লয় আসে না যখন প্রাণ।

বিষয়-বাসনায় প্রমত্ত হয়ে তোমার দিকে যদি ফিরে না চাই, কাতর প্রাণে তোমাকে যদি না ডাকি, যদি তুমি মনে ক'র তোমার কৃপা পাবারও যোগ্য নই, তবে আমাকে দুরন্ত বিপদের মধ্যে ফেলে দাও। দুঃখ দিয়ে তুমি আমাকে অনুগ্রহ করো। দুঃখের আঘাতই বোধ হয়

বিষয়াসক্ত জীবের চৈতন্যোদয়ের একমাত্র পথ। এ-ভাবের রবীন্দ্র-সঙ্গীত অসংখ্য। মাত্র কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত হ'ল।

১। বাসনা যখন বিপুল ধূলায় অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র, রুদ্র আলোকে এস।
যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার
আঘাত সে যে পরশ তব সেই তো পুরস্কার।
বজ্রে তোল আগুন করে আমার যত কালো।
দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করে ধরিব হে।
আমি রহ বাসনার প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভ'রে।

জীবনে দুঃখ শোকের অনেক আঘাত পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ধারাবাহিক এই সব মৃত্যু শোক তাঁর জীবনকে পবিত্র করেছে, তাঁর সত্তাকে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের রহস্যালোকে নিয়ে গেছে, প্রথম জীবনের ব্রহ্মসঙ্গীত শেষ জীবনে ভক্তিরসে সিক্তিত হয়ে অপূর্ব সুষমায় বিমণ্ডিত হয়েছে। দুঃখের আঘাতে রবীন্দ্রনাথের জীবন-বীণায় শতছিদ্র হয়েছে বলেই তা বিচিত্র সুর-সহযোগে ঝঙ্কৃত হয়েছে। তাই তিনি লিখলেন—

কত তীব্র তারে তোমার বীণা সাধাও যে
শতছিদ্র করে জীবন বাঁশী বাজাও হে।

আবার লিখছেন—

আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

বিচিত্র রহস্যে ভরা মৃন্ময়ী বসুন্ধরার কোল থেকে বিদায় নেবার কালে মৃত্যুঞ্জয়-প্রপীড়িত মানবকুলের জন্য কবি যে আশ্বাসবাণী রেখে গেছেন মানুষ তা কোন দিনও ভুলবে না। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুঞ্জয়। মরণকে সম্বোধন করে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছেন—

তোরে নাহি করি ভয়;
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য, এ-বিশ্বাসে প্রাণ দিব রেখ,
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।

বিরহ

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

সব কালো ঢেকে দিয়ে একটি আলোর রেখা কবে
আমার জীবনসাথী হবে?

এ হৃদয় ক্লান্ত বড় আঁধারে আঁধারে ঘুরে ঘুরে:
আলোর রেখাটি শুধু হাতছানি দেয় বহু দূরে—
নাগাল পাইনা তার, বেদনায় ভ'রে ওঠে মন;
দিনগুলি একে একে শেষ হয়ে আসে ওই,
মিছে বুঝি হ'ল এ জীবন।

সে-আলো রয়েছে জানি: সেই আলো
মেখে সাধা গান,
মনপ্রাণ ভ'রে নিয়ে সে-আলোকে এই মৃত্তিকায়
এসেছিল সে-মানুষ—নয় তারা দুই এক জনা—
অনেক অনেক জন—ভীরু, উদাসীন, আনমনা
ব'লে তারা খ্যাতি পেল; সরে গেল দূরে, বহু দূরে:
সে-আলোর গান কত শুনেছি তাদের সুরে সুরে।
সে-সুরে কী আছে জানি, যখনি সে মনে এসে বাজে,

কী মধুর আনন্দের প্রস্রবণ বহে যায় সাথে দেহে,
হৃদয়ের মাঝে !
কী উদার, কী প্রণয় সে-আলোর স্নিগ্ধ স্পর্শখানি !
ধুয়ে মুছে দিয়ে যায় নিমেষে এ জীবনের
সব ব্যথা, বেদনার গ্লানি।

সে থাকে না, সে বড় ক্ষণিক।
অনেক অনেক কালো ঘিরে ফেলে দেয় চারিদিক :
আবার সে ক্লান্তি নামে, প্রাণ মন উতলা ব্যাকুল
হয়ে ওঠে—পেতে চায় পরিপূর্ণ আলোকের কূল।

দুঃসহ এ জীবনের তিলে তিলে ক্ষয় ;
এই অপমৃত্যু, এই বিরহ-বেদনা, পরাজয়।
শেষ চাই : কোথা শেষ ? চিরন্তন আলোকের রেখা
কবে চির সাথী হয়ে এসে দেবে দেখা
অমর জীবন মাঝে ; সব সংশয় হবে লীন—
একটি অমৃতবীণা, একটি অমর্ত্য সুরে
জীবনে ধ্বনিবে নিশিদিন।

নাম ও নামী

॥ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ॥

কতজনে সমুদ্ধারে করিয়াছ হরি ধরি দেহ
প্রাণ ধরি কাহো কারো করিয়াছ নাহিক সন্দেহ
ধরণীরে লঘীয়সী। কিন্তু তব নাম মহাবলী
কাহারেও বধে নাই,—অদ্যাপিও দেখি কুতূহলী
কোটি কোটি নরনারী করিয়াছে করিছে উদ্ধার
তোমা হ'তে নাম বড় তাহাতে সন্দেহ নাহি আর।

শিশুপাল দন্তবক্র কংসাদিরে নাশিলে সমরে
জগাই মাধাই ধন্য নামে প্রেমামৃত পান করে।
পান দোষ ছিল যারা,—নাম দোষ হল হরিনামে,
আদর্শ-পাতকী হল আদর্শ-প্রেমিক পরিণামে।
যেথা হতে পুনঃ কেহ প্রত্যাবৃত্ত নহে পুণ্যধামে,
অকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠধামে রহে তারা তব পদাশ্রয়ে।

কেহ করে শ্বাস রোধ কেহ তীর্থ করে পদব্রজে
কেন তারা গড়াগড়ি নাহি দেয় ভক্ত পদরজে ?
ভক্ত পদধূলিকণা,—ধূলি নয় পরমাণুগুলি,
পাপনাশে আধিক অক্ষম যেন নাহি ভুলি।
হাতে তাই কাজ কর,—মনে মনে কর তাই নাম,
নামী হতে নাম বড়,—নামে পূর্ণ হবে মনস্কাম।

তাই বল হরিনাম জনে জনে বলাও শ্রীনাম
চিত্ত ধরে নাকো ধ্যান অপূর্ব সে হরে কৃষ্ণ রাম।
নামীরে নামেই পাবে,—সেই নাম বিলাবে সবারে,—
কলনায় গান করি স্নান করি সুধা পাবাবারে।
নীরস সংসার পথে তৃষার্তের তাহাই অমৃত
অজপার অপমালা নাড়ীচক্রে ধ্বনিত ও ধৃত।

সাময়িকী

পথ ঃ—ঘরে বাইরে সর্বত্র সমস্যা, সমস্যার নানা রূপ। কিন্তু অনেক ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় সমস্ত সমস্যার মূল মানুষের বহির্মুখীন চিত্তবৃত্তির সঙ্গে অন্তর্মুখীন মনোভাবের সামঞ্জস্যের অভাব। মানুষ ব্যক্তি হিসাবে ও জাতি হিসাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা চায়—চাহিবেই। এটা যুগধর্ম—এটাকে আজ অস্বীকার করা যাইবে না। কিন্তু দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, যে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিল না, তাহাকে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার সুযোগ দিতে হইবে, শিক্ষা দিতে হইবে—সে ব্যক্তি হউক, বা জাতি হউক—এ কথা যেমন সত্য, কিন্তু যেমনই কোন ব্যক্তি বা জাতি আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিল তখনই যে অন্যকে দাবাইয়া অন্যের উপর প্রভুত্ব করিবার তাহার ভিতরকার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল—তখন তাহার সেই আকাঙ্ক্ষাকে দমন করিবে কে? সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া ব্যক্তি ও জাতির ক্ষেত্রে তো এই-ই চলিতেছে—কেহ আত্ম-স্বাতন্ত্র্য বা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করিতেছে, আবার কেহ আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অপরকে কুক্ষিগত করিবার, অপরের উপরে প্রভুত্ব করিবার চেষ্টায় নানা কৌশল অবলম্বন করিতেছে—কাহাকেও বা সাক্ষাৎ আক্রমণ, কাহাকেও বা সাহায্য করার অছিলাতে নীচু করিয়া রাখার সুযোগ—এইভাবে সোজাসুজি না পারিলেও কলে কৌশলে অপরের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের প্রয়াস করিতেছে। সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া এ যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চলিতেছে, তেমনি অর্থনীতির উৎকর্ষ লইয়া বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানালের চেষ্টার বড়র মধ্যে বা ছোটর মধ্যে এই-ই চলিতেছে। ছোট গ্রামের মধ্যেও যেমন, ইস্কুল কলেজের নানা ব্যাপারেও তেমনি—সর্বত্র, সকলের মধ্যে কোথাও আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা, কোথাও বে মোটামুটি আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছে, তাহার আরও আরও-র আকাঙ্ক্ষায় সেই আত্মপ্রতিষ্ঠার মনোভাবই অপরের উপরে প্রভুত্বের মনোবৃত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তাই মনে হয় সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া রোগ একটা—জীবনের বহির্মুখীন দিক অর্থাৎ ঐ আত্মপ্রতিষ্ঠার মনোবৃত্তি জীবনের অন্তর্মুখীন দিক অর্থাৎ অপরের উপর প্রভুত্ব না করার মনোবৃত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যের অভাব। আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইতে হইবে, একটা স্বাতন্ত্র্য লইয়া ফুটিয়া উঠিব এ যেমন সত্য, তেমনি অপরকে পরাভব করিব না, অপরকে অভিভব করিয়া দাবাইয়া রাখিয়া নিজের আত্ম-প্রতিষ্ঠা খুঁজিব না—এ কথা ব্যক্তি বা জাতি জানে না—এও সত্য, এ কথা আজ বিশ্বকে শিখিতে হইবে। ঐ রোগের এই চিকিৎসা, ঐ সমস্যার এই পথ।

সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া অনেক কিছু হইতেছে—অন্য বহু দিকে যে কত রকম কি হইতেছে, তাহা বাদ দিয়াই বলি জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে যে কত অভূতপূর্ব ঘটনা চলিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। হাতের কাছে পড়িয়া থাকা এক টুকরা ছেঁড়া কাগজ হইতেই একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি—সোভিয়েত দেশের সংবাদ—(আগেরটুকু ছেঁড়া) 'পাঠগৃহের নম্বর ও আসনের নম্বরটি বলে দিলেই কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি যান্ত্রিক পরিবহণ ব্যবস্থা মারফতে বইটি যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। এক সঙ্গে প্রায় ১৩০০ পাঠক এই গ্রন্থাগারে বসে পড়াশোনা করতে পারবেন।'—এই সাধারণ দৃষ্টান্তটী দিয়া এই বলিতে চাই যে, লেখাপড়া করাইবার, মানুষের জ্ঞান বাড়াইবার কত রকম ব্যবস্থাই যে আজকাল হইয়াছে, হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এ যেমন সোভিয়েত দেশে, তেমনি আমেরিকাতেও এমনি কত কত ব্যবস্থা; অন্যান্য দেশেও কমবেশী আছেই। আমাদের মত দেশে এক সময়ে যেখানে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের বিজয় পতাকা উড়িয়াছে—জ্ঞানে

বিজ্ঞানে যাহার ঔজ্জ্বল্য আজও গর্বের বস্তু—যদিও তাহা অতীতের বস্তু—অথচ যেদিন সর্বসাধারণের কোন সুযোগ বা অধিকার ছিল না জ্ঞানচর্চা করিবার—এই সেই আমাদের দেশেও আজ সকলের—জাতি বর্ণ ধর্ম নরনারী নির্বিশেষে সকলের কেবল অধিকার-প্রাপ্তিই নয়, দেশে কত কত ইস্কুল, কলেজ, গ্রন্থাগার, সমিতি—কত কিছু।

অবশ্য এইখানে এ কথাটা উল্লেখযোগ্য যে, সর্বসাধারণের এই যে অধিকার প্রদান—এই যে স্বীকৃতি ইহা তাঁহারা দেন নাই যাহারা ইহা হরণ করিয়াছিলেন। এতকাল পর্যন্ত—অর্থাৎ ইংরেজী শাসনের ফল স্বরূপ পাশ্চাত্ত্য জীবনধারা দ্বারা প্রভাবিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত—ভারতবর্ষের সমাজ ধর্ম-ক্ষেত্র হইতে ধর্মের নীতির অন্তর্গত অনুশাসন দ্বারা শাসিত হইয়াছে। সেদিন নিয়ম করা হইল সাত্ত্বিকতা বড়, রাজসিকতা তামসিকতা ছোট, হেয়; তাই সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণেরাই অধ্যয়ন অধ্যাপনারূপ সাত্ত্বিক-বিদ্যাচর্চার অধিকারী। ব্রাহ্মণেতর জাতি—ইহার মধ্যে জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও নারী অন্তর্ভুক্ত—মানুষ নামের যোগ্য ছিল না, মানুষ হিসাবে তাহার কোন স্বাতন্ত্র্য বা মর্যাদা ছিল না আজিকার যুগের যেটা প্রধান ও প্রথম কথা। তাই ভারতবর্ষে জ্ঞান বিদ্যা আধ্যাত্মিকতা যাহা কিছুরই চরম বিকাশ হউক না কেন, সর্বসাধারণকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া সে বিকাশ চিরদিন বঞ্চনার কালিমা গায়ে মাখিয়া চলিবেই। তাই আজ সর্বসাধারণ যে স্বীকৃতি, স্বাতন্ত্র্য বা মর্যাদা রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে লাভ করিল ইহাতে ভারতবর্ষের কলঙ্ক একরূপ দূর হইলেও প্রশ্ন এই থাকিয়া যায় যে, যাহারা অধিকার হরণ করিয়াছিলেন তাঁহারা যদি স্বীকৃতি না দিলেন, তাহা হইলে তাহা সত্যিকারের স্বীকৃতি হইল কিনা এবং এ স্বীকৃতি কালের দরবারে এবং আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে টিকিতে পারিবে কিনা। এ প্রশ্নের সমাধান দিতে দর্শনের জগতে, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ব্রাহ্মণেতর জাতি ও নারী কি করিয়া অধিকার পাইতে পারে তাহার তত্ত্বমূলক আলোচনা রাখিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, আজ ভারতবর্ষেও লেখাপড়া শেখার, নানা জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার কত বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু ঘরে বাইরে, দেশে বিদেশে, সকলের কাছেই সমস্ত মানব জাতির হইয়া এই প্রশ্ন করি—অপরকে অস্বীকার না করিয়া নিজে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার এবং আত্মপ্রতিষ্ঠ হইলে অপরের উপর প্রভুত্ব করিবার মনোবৃত্তিকে সংযত করিবার শিক্ষা কি কোথাও দেওয়া হইতেছে?

প্রশ্ন শোনা মাত্র অনেক ভারতবাসী উত্তর দিবেন যে ভারতবর্ষ এই সংযমের কথাই বলিয়া আসিয়াছে। না, ভারতবর্ষ বহির্জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আত্ম-সংযমকে সামাজিকভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে শিক্ষা দেয় নাই। যে সংযম সে শিখাইয়াছিল আজিকার মনোবিজ্ঞান বা মনোবীক্ষণের নিকট তাহা আত্ম-নিগ্রহমাত্র, সর্ববৃত্তিকে প্রস্ফুটিত হইবার সুযোগ দিয়া মাত্রার মধ্যে তাহাকে সংযত করা হয় নাই, ময়ালিটি ও আর্টের বিবাদ মিটাইয়া উভয়কে উভয়ের যথাস্থানে মূল্য ও মর্যাদা দিয়া উভয়ের মাত্রা সমাজ-জীবনে বাঁধিয়া দেওয়া হয় নাই। আজও হইতেছে না। Art invites the free play of all our forces—অথচ ময়ালিটি বলিবে—রাজসিক ও তামসিক বৃত্তিগুলিকে অস্বীকার করিয়া বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক হও। রাজসিক ও তামসিক বৃত্তিগুলি যদি একান্তই হেয় হইত, তাহা হইলে ভগবান একান্ত হেয় এই বস্তুগুলিকে সৃষ্টি করিলেন কেন? অথচ দেখা যাইতেছে নিছক বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকতা বলিয়া কোন বাস্তব বস্তু নাই—যে কোন জীবন্ত মানুষ শুধু সাত্ত্বিকতা দ্বারা বাঁচিয়া নাই, কোনো জীবন্ত সমাজ শুধু সাত্ত্বিকতা দ্বারা বাঁচিতে পারে না। সুস্থ মনুষ্যত্বের কল্পনা করিতে হইলেই সাত্ত্বিক রাজস ও তামস বৃত্তিসমূহকে বিশ্বজনীনতার পটভূমিকায় ছন্দবদ্ধ করিতে হইবে। এ বিশ্বে একান্ত হেয় বা একান্ত উপাদেয় বলিয়া কোন সৃষ্ট বস্তু নাই—প্রতি বস্তু এক দৃষ্টিকোণে হেয় কিংবা ছন্দবিহীন হইলে, মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে হেয়, সেই বস্তুই অন্য দৃষ্টিকোণে কিংবা মাত্রার মধ্যে স্থাপিত হইলে উপাদেয়, জীবন-সংগঠক, জীবন্ত সমাজ-সংগঠক। ভারতবর্ষ নিছক সাত্ত্বিকতা দিয়া সমাজ গড়িতে চাহিয়াছিল কিংবা

সাত্ত্বিকতাকেই পারমার্থিক মূল্য দিয়া অপরগুলিকে ব্যবহারিক বা সামাজিক মূল্য মাত্র দিয়াছিল বলিয়াই প্রতিক্রিয়ায় ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা আজ কোন্ অতলে তুবিয়া গিয়াছে—সে আজ নেংরা রাজসিক, নেংরা তামসিক, ক্লীব। আবার পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতা আজ পর্যন্তও রাজসিক ও তামসিক বৃত্তিগুলির উৎকর্ষের উপরেই দাঁড়াইয়া আছে—তাহারা সামগ্রিক প্রয়োজন বোধে, বিশ্বমনীনভাব পটভূমিকায় তাহাদের রাজসিক ও তামসিক বৃত্তি, অপরকে পরাভব অভিভব করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার বৃত্তিকে কিছুতেই সংযত করিতে পারিতেছে না, মাত্রার মধ্যে আনিতে পারিতেছে না; তাই আর এক রকমভাবে তাহারাও ক্লীব বনিয়া গিয়াছে—তাহারাও নিজেদের বিশেষ চিত্তবৃত্তির নিকট পরাজিত, রাজসিক বা তামসিক বৃত্তিকে সংযত করিবার শিক্ষা তো তাহারা পায় নাই। জীবনের বা মানসিকতার এক স্তরে অপরকে অভিভব না করিয়া আর একজনের আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়—সাধারণ মানুষ ইহাই জানে। কিন্তু এই মানসিকতারই আর একটা স্তর আছে যেখানে একে অপরকে অভিভব না করিয়াও প্রত্যেকে যাহার যাহার অন্তর্নিহিত যোগ্যতা লইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে। এই স্তরটা প্রাণের স্তর। এই বিরাট বিপুল বিস্ময়কর বিশ্বে প্রত্যেক মানুষ এক একটা যোগ্যতা লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এমন বোধহয় হইতেই পারে না যে তাহারও মধ্যে কোন যোগ্যতাই নাই। হয়তো প্রকাশিত বা বিকশিত নাই—ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। প্রত্যেকের ভিতরে একই ভগবান রহিয়াছেন—তাই প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে। অপরকে দাবাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয় না—প্রত্যেকের ঐ স্বাতন্ত্র্য ফুটাইয়া তুলিলেই প্রত্যেকেরই এ সংসারে একটা বিশিষ্টতা লাভ করিবার মানুষের মধ্যেকার চিরন্তন খোঁচা তৃপ্তি লাভ করিবে। এই প্রাণের স্তরের খবর বিশ্ব রাখিত না বলিয়াই এতদিন পারস্পরিক অভিভব করিবার পথেই আজ পর্যন্ত বিশ্ব চলিয়াছে, চলিতেছে। কিন্তু এই পারস্পরিক হানাহানি আর সে নিজেই সহ্য করিতে পারিতেছে না—তাই ইউ-এন্-ও-তে এত আলাপ আলোচনা, এত বোঝাপড়ার প্রচেষ্টা। তথাপি কেহ পথ পাইতেছে না।

তাই আজ প্রয়োজন—শিশু বয়স হইতেই প্রতি মানুষকে এই চিন্তাধারা দিতে হইবে যে, যার যার নিজস্ব যোগ্যতা লইয়া ফুটিয়া উঠিবার প্রচুর অবকাশ বিশ্বে আছে—নিজেকে বাড়াইয়া তোল, প্রথমানংপু হও, তুমি কোন্ বৈশিষ্ট্য লইয়া এ বিশ্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছ—সেইটি যাহাতে বুঝিয়া লইয়া তাহাই বিকশিত করিয়া তুলিতে পার—তাহারই চেষ্টা কর। বিশ্বময় ঐ পরস্পরকে অভিভব করিবার দ্বন্দ্ব-মূলক, প্রতিযোগিতামূলক পথে স্থিত থাকিয়া যতই আলাপ আলোচনা করা যাউক, বিশ্ব-শান্তির কোন পথ কিছুতেই পাওয়া যাইবে না। আগে শিখিতে হইবে, শিখাইতে হইবে যে, সুন্দর এই বিশ্বে প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য লইয়া ফুটিয়া উঠা যায়। তাহাতে আমি অন্যের মত না হইতে পারি, কিন্তু বিশিষ্টতা নিশ্চয়ই অর্জন করিতে পারিব। বিশ্বময় ঐ এক রোগের এই একমাত্র নিদান এই চিন্তাধারা সমাজের সকল স্তরে বিশেষতঃ একেবারে শিশুদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করাইতে না পারিলে বিশ্বশান্তির যেমন কোন সম্ভাবনাই নাই, তেমনি এত লেখাপড়া জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, এত ব্যবস্থা বন্দোবস্ত কিছুই সত্যিকারের সামগ্রিক কল্যাণ দান করিবে না।

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম পোঃ দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

উদ্বোধন

কার্তিক, ১৮৮৩ শকাব্দ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

১৪শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৪)

জয় রাধে···নিত্যগোপাল! প্রতি মানুষকে সর্বভূতের বুকে নিজেকে খুঁজিয়া পাইতে হইবে।···আমি কে? লক্ষ লক্ষ মানুষকে দিয়ে আমি গড়ে উঠেছি—এই সবাইকে যদি আমি আমার কর্মে জানে এক করে না দেখি, তবে আমার চলার সার্থকতা নাই—কৃষক, রাজমিস্ত্রী, তাঁতী থেকে আরম্ভ করে কত যে মানুষের সঙ্গ আমার অপরিহার্য।··· এই সবাই তাই ভক্তিশ্রী দিতে এলেন—নিজেকে ভক্তি করা মানেই বিশ্বকে ভক্তি করা। মানুষের কাছে এই ঋণ স্বীকার সাধারণ মানুষে করে না—বাবণ করে না, কুকর্ম করে না—রাম করেছেন, কৃষ্ণ করেছেন। এই ঋণ স্বীকার করার পথ যিনি দেখাতে পারেন, তিনিই গুরু। জল সর্বত্রই আছে, তবু যেমন টিউবওয়েল লাগে, তেমনি ভগবানের প্রকাশ, ভক্তির প্রকাশ যেখানে, যার জীবনে আছে, তেমন একজনের সঙ্গ অবশ্য প্রয়োজন। এ প্রয়োজন যে অস্বীকার করে সে দাম্ভিক, অহঙ্কারী, অসত্য।···নিজের খেয়াল ডুবিয়ে বিশ্বের সঙ্গে ভাবাদ্বৈত ক্রিয়াদ্বৈত ও দ্রব্যাদ্বৈতে এক হতে হবে। সকলের সঙ্গে সকল দ্রব্য এক সঙ্গে ভোগ করবার জন্য রওয়ানা হয়েছিলাম—তাই আমার কিছু নাই—আমি নিজের বলে কিছু রাখি নি। এমন কি আমার প্রতি ঠাকুরের যে সেই অভয় বাণী—'ভয় কি, টেনে তুলব, যখন যেখানে আছ সঙ্গে সঙ্গে আছি'—সেই অভয় মন্ত্রও আমি তো সকলেরই জন্য দিয়ে দিয়েছি।··· কোন কর্মই ছোট নয়—রান্না থেকে লেখাপড়া সবই বিশ্বের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এক। এ না বুঝলে বিশ্বকে ভালবাসা যায় না। নিত্যগোপাল, তুমি আমিতে নেই, নিরামিষে নেই,···।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা—

বিশ্বসঙ্ঘ রচনা করতে ভগবান তিন রকম অদ্বৈতসিদ্ধির কথা বলেছেন—ভাবাদ্বৈত, দ্রব্যাদ্বৈত, ক্রিয়াদ্বৈত। দেহের হাত পা নাক চোখ মুখ যদি সহযোগিতা না করে চলত, তাহলে কি দেহ চলত? হাত হাতের কাজ করে বটে কিন্তু দেহের মনগ্রন্থি বজায় রেখে। একজন যখন কাজ করে, তখন আর সবাই তার অনুগমন করে।...শাস্ত্র বলছে, তুলো সুতো আর কাপড় যেমন এক—তেমনি ব্রহ্ম ঈশ্বর ও জীব এক, তেমনি সঙ্ঘকর্তা ও সঙ্ঘের সত্তারা এক। সঙ্ঘ যদি খাবার দিতে না পারে, অমনি হার মার মত চলে গেলাম—এটা সত্তাগত একত্বের পরিচয় নয়। খেতে না পেলে দেহের হাত তো চলে যায় না—সব শুদ্ধই শুকিয়ে মরে। তেমনি সঙ্ঘের এটা প্রথম সূত্র যে, তুমি আছ, আমি আছি—কোনদিন কোনমতেই যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।···আমার কর্মকে যদি তোমরা নিজের কর্ম মনে করতে না পার, তাহলে সেবা হবে না। পাশ্চাত্যের কর্ম আর কৃষ্ণের কর্ম আলাদা—অর্জুন নিজের কাজ করতে

গিয়েছিলেন—কৃষ্ণ বললেন, তোমার কাজ ছেড়ে আমার কাজ কর—অর্থাৎ কৃষ্ণ-সেবা করতে হবে—কৃষ্ণ-সেবা করতে গেলে ভীষ্মকে বধ করতেই হবে।'' আমি চাই শোষণ—তারা (ভীষ্মরা) শোষণ করছে বা শোষণ সমর্থন করছে। সর্বাবস্থ পরিত্যাগী হয়ে কর্ম করতে হবে—নিজের খেয়াল মত কর্ম কর্ম নয়। সঙ্ঘকর্তার সেবাবুদ্ধিতে তাঁকে খুশী করবার জন্য কর্ম সেবা ক্ষেত করা, বাজার করা, রান্না করা, প্রেসে যাওয়া—এগুলি আমার কাজ—তোমাদের কাজ হচ্ছে আমাকে এটা করতে না দিয়ে তোমরা করে নেবে—আমারই কাজ তোমরা করে দিলে সেটাই সেবা। করার ভিতর অহংকার থাকলে চলবে না। যে যা করছে আমার কাজ করছে—এ বুদ্ধি থাকলে ঝগড়া নেই—সেবার সেবার ঝগড়া নেই—ঝগড়া কর্তায় কর্তায়। এটা ক্রিয়াদ্বৈত। এর পরে দ্রব্যাদ্বৈত—সকলের এক তহবিল—যে যা বুদ্ধি ও সামর্থ্যমত সেবা করবে, তবে সবটুকু মিলিয়ে সেটা সকলের—এটাই কম্যুনিজম্।''' একজন ৫০০টাকা পায়, একজন ২০টাকা—সবশুদ্ধ ৫২০টাকা'''এটা সমগ্রের সকলের দ্রব্য এক। প্রত্যেককে তার তার ক্ষেত্রে কাজ করে যেতে হবে।—এই ত্রিবিধ অদ্বৈত রক্ষা করে সঙ্ঘ রচনা করতে হবে। ব্যক্তিগত খেয়াল অহংকার নিয়ে সঙ্ঘকর্তাকে কেবলই আঘাত করছে। কিন্তু তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ—নির্দেশ বললেই ভাল শোনায়—তোমরা যেন কখনও এই তিন অদ্বৈত সিদ্ধিতে ভুল না কর। দেহের রক্ত সকলের—হাতেরও না, পায়েরও না। লক্ষ্মী বিষ্ণুর—রাবণেরও নয়, ভক্তেরও নয়। ধন বিশ্বের···তোমার আমার নয়। বিশ্বের সকলের ধন সকলের।···প্রয়োজনমত পাবে। ভিখারীর মত নিয়ো না—তপস্যা করতে হবে, মানুষ হতে হবে—দিনরাত্রির প্রার্থনা মানুষ হতে হবে। ···নরনারায়ণ আশ্রম থেকে ভবিষ্যৎ বিশ্বের দর্শন প্রচারিত হবে—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। নিত্যগোপাল নূতন তত্ত্ব নিয়ে এসেছেন—প্রকৃতি বদলাতে হবে—যে প্রকৃতি নিয়ে ভারতবর্ষ দু হাজার বৎসর চলেছে, তা দিয়ে ভারতের কল্যাণ নেই...।

শুক্রবার ১৮, ৫, ১৯৫৬—সকাল

নিত্যগোপাল···তোমার সত্তা আমার সত্তা এক হউক—আমি তুমি বলিয়া যাই—তুমি আমি কর্মে জ্ঞানে প্রেমে এক—তুমি কায়া আমি ছায়া'''তুমি ছাড়া আমি কিছুই নই—মধুর শ্রীজগন্নাথ—মৎগুরু শ্রীজগদ্‌গুরু—আমি বিশ্ব—আমি আমার পাইবার লাগি সকল বিশ্ব ছুটিয়া বেড়াই। তোমার কর্ম আমার হউক—আমার খাওয়া দাওয়া চলাফেরা কথাবলা সব বিশ্বকর্ম হউক। এই বিশ্ব খেলাঘর—তুমি আমি খেলিব'''।

ঠাকুর, তোমায় ফেলিয়া আমি যাইব না, তোমার চরণে সুখে দুঃখে পড়িয়া থাকিব। তুমি আছ, তাই আমি আছি, তোমার কর্ম আছে, তাই আমার কর্ম আছে—আমি তোমার কর্ম করিব।···নিত্যগোপাল, জাগো, নরনারায়ণ নিত্যগোপাল জাগো···ধরার ধূলি হউক ব্রহ্ম ধূলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম-মানুষ।···

শুক্রবার সন্ধ্যা—পুরুষোত্তম শব্দ ভাগবতের। ভগবান যখন ইতিহাসের বুকে নেমে আসেন, তখন তিনি পুরুষোত্তম।—অন্তঃ পুরুষরূপেন কালরূপেন যো বহিঃ। সমন্বেত্যেষ ভূতানাম্ ভগবান্ আত্মমায়য়া।···এদেশের প্রাচীনেরা কালকে মায়া বলে, কাল ছেড়ে দিয়ে কালাতীত ব্রহ্মকে পেতে চেয়েছে। এতে হয়েছে এই যে, মানুষ আর কালের মর্যাদা দিতে শেখে নি।···যে ছেলে জানুয়ারী মাসকেই ডিসেম্বর মনে করে, কাল তার কাছে কাল হয়ে দাঁড়ায় না, তার কাছে ডিসেম্বর প্রাইজের মাস—অপদের কাছে তা মৃত্যুর মত ভীষণ। পুরুষোত্তম জানেন কোন্ কাজ করতে হবে—প্রত্যেক বয়সের, প্রত্যেক কালের বিশেষ বিশেষ কাজ আছে—নইলে পুরুষোত্তম-ছন্দ ঠিক থাকে না।···এখনই তোমার কাজ কর।···অরবিন্দ বলেছেন, eternal present, নিত্যগোপাল বলেছেন, বর্তমান ভজন। বর্তমানকে যে অগ্রাহ্য করে সে কোনদিন কালের নাগাল পায় না। সারা জীবন এই ছন্দের কথা বলে যাচ্ছি—যতখানি পেরেছি করেছি, টাকা দিয়ে, দেহ দিয়ে; কিন্তু পরম কল্যাণ বোধহয় কারো করতে পারি নি—কেননা কেউ তো

ছন্দের মধ্যে এস না।...যতটুকু নিজে পার নিজে করবে—তারপরে জীবনের প্রয়োজনে যতটুকু না নিয়ে না পার, ততটুকু সাহায্য বাইরে থেকে নেবে। minimum demand—এই হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতা।...ত্যাগীরই ভোগে অধিকার আছে। লোভীকে কেউ খেতে দেয় না—লোভীর ভোগে অধিকার নেই।...কালের কাছে অপরাধ করো না। জীবনে আমি কালের কাছে অপরাধ করি নি। তাই আজও আমার কাজ আছে—আমার বেতালে পা পড়ে না। তোমাদের কাছে আমার আবেদন—ছন্দ দেখ, কালের কাছে অপরাধ করো না।...মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন বলে এত উচ্ছৃঙ্খল হতে হবে? মুক্তি দিয়েছেন বলে সংযম রক্ষা করাই তো সম্মান। পশুপাখী প্রাকৃতভাবে সংযমী শৃঙ্খলাবদ্ধ। কিন্তু স্বাধীন মানুষকে সাধনা দ্বারা যোগ্য হতে হবে। সেই সাধনা তোমরা নাও। নিজের জীবনের মধ্যে ঠিক হও। খুব হুঁশিয়ার হয়ে চলো—নিজের হজমশক্তি বাড়াও। নিজের হজমশক্তিদ্বারাই মানুষকে হজম করতে পারবে।...পুরুষোত্তম সেই পুরুষ যিনি কালকে পায়ে মেখে, কালের মর্যাদা দিয়ে চলেছেন।...বৃন্দাবনে গানে বাজনায় চলায় ফেরায় ছন্দ ছিল।...

১২, ৫, ১৯৫৬—শনিবার সকাল।

(তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা—এই গানটি করেন।)

নিত্যগোপাল,...পরস্পরবিরোধী ঘটনাবহুল সংসার-সমুদ্রে তুমি ধ্রুবতারা।...তোমার পথই আমার পথ।...অগ্রগামী দেবতা, এই সমুদ্রের পথে এ যাবৎ কেউ চলে নাই—তুমি চলিয়াছ।...তুমি ছিলে, তাই এত দীর্ঘ ঘটনাবহুল পথে পথ হারাই নাই।...তুমি কেমন করিয়া স্নেহ করিয়া কথা বলিতে, কেমন করিয়া কাছে রাখিতে চাহিতে, কেমন করিয়া আদর করিতে—সবই আজ মনে পড়ে। কতদিন তোমার কথা শুনি নাই, কতদিন তোমার স্পর্শ লাভ করিতে পারি নাই! কতটুকুই বা তোমার সঙ্গ করিতে পারিয়াছিলাম—তবু তারই মধ্যে তোমার মধুর স্নেহ স্মরণ হয়। সেই-ই আমার সম্বল—তাই অধিকার দিও যে কটা দিন আছি তোমার স্নেহ যেন স্মরণ করতে পারি।... ঋণ শোধের কথা বলি না, কিন্তু তোমার স্নেহ যেন স্মরণ করতে পারি।...তুমি একদিন বৃন্দাবনে ব্রজগোপীদের নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছিলে—তারা কোন অভিসন্ধি না রাখিয়া তোমাকে ভালবাসিয়াছিল। আমি অকৃতজ্ঞ—তাই তোমার আদরে পাগল হইয়া যাই নাই।...অযত্ন করিয়া ছোটখাট ব্যাপারে এমন আদর যত্ন কে করিয়াছে? ...হৃদয়ের ধনকে হৃদয় দিয়া পাইতে হয়। জীবনে জীবনে জনমে মরণে তুমি আমার, আমি তোমার। তোমার অতবড় স্নেহের কাছে আমি যেন লুপ্ত হইয়া যাই—আমি যেন বিকাইয়া যাই। বলেছিলে, শরৎ, তুমি কি জাননা ভগবান অন্তর্যামীরূপে তোমার যখন যা প্রয়োজন বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তুমি ভালবেসেছিলে—এই কথাটাই যেন বলে যেতে পারি—প্রাণ দিয়ে যেন স্বীকার করে যেতে পারি—ভালবাসার মূলাই যদি না বুঝলাম, ভালবাসার সামনে যদি প্রাণ ঢেলে দিতে না পারলাম—তাহলে কি আর করলাম? ...তোমার চরণস্পর্শের কি আমি অধিকারী?... আমি ছিলাম কুণো—তাকে তুমি রাস্তায় বের করেছ—তোমার চরণস্পর্শের পূর্ব্বের শরৎ ঘোষ মরে গেছে—তুমি আমায় রক্ষা করেছ—বিক্ষুব্ধাত—তোমার স্নেহের কোলে এসে সংসারের সকল অনাদর যেন ভুলে যাই। দয়াল, আমার করুণার ঠাকুর, আমার নীলকণ্ঠ—বুদ্ধরূপে তুমিই শূকরের মাংস খেয়েছিলে, নিত্যগোপালরূপে তুমিই বিধাতাকে কিছু বলতে নিষেধ করেছিলে।...তোমার করুণার মধ্যে আমায় আমি নিতে থাক।...নিত্যগোপাল, তুমি জগন্নাথ...মানুষকে বুকে নেতে চাই বলেই সহস্র মানুষের সহস্র অনাদর গায়ে মাখি না—আজও তাদের স্নেহ করি। ...পথিক, তুমি আছ নিত্য—পথ আমার নিত্য—সে পথের অগ্রগামী তুমি নিত্য—তোমার করুণা আমার জীবনে সার্থক হোক—'তোমার কথা কি টেনে তুলব' বাণী সার্থক হয়েছে—টেনে তুমি তুলেছ—সহস্র বিপদ থেকে তুমি টেনে তুলেছ, ভয় আমার না করলেই ভাল। তুমি তোমার কথায় অচ্যুত থেকেছ। তোমার স্নেহের কাছে নত হই।

যাহারা আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাদেরও আমি ভুলিতে পারি নাই—এই পাগল প্রাণ লইয়া আমি কি করিব? ইহা তোমাকে দিব—তুমি নাও—কারো কোন চরম কল্যাণ করিতে পারি নাই—চরম কল্যাণ মাগল হওয়া—তোমার মত হওয়া। মানুষের কিছু করিতে পারি নাই—যা হয় তুমি করো—আমার সকল প্রচেষ্টার নির্বাণ হোক্—জগন্নাথ নিত্যগোপাল! ··

ক্রমশঃ

বাঁশীর ব্যথা

॥ শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় ॥

আমি নাম-হারা, আমি শ্যাম-হারা বিলোল বেণু।
আমার রবেতে গোঠে মাঠে আর চরে কি বেণু?
ব্রজের রাখাল শুকোমল করে
ডাকারে আমারে আর কি যে ঘরে
আজো মন-পথে ছড়ানো স্মৃতির স্বর্ণ রেণু।

কীচক বুকে ছিলাম বিলীন সবার মাঝে।
বাতাসে বাজিত বুকের বেদনা সকাল সাঁঝে।
শাখায় বসিয়া কত ছোট পাখী
বিচিত্র সুরে যাইত যে ডাকি
পুরাতন কথা সে-দিনের আজো হৃদয়ে বাজে।

বাঁশ নাম ছাড়ি প্রথম যে-দিন হ'লাম বাঁশী
খুশীর জোয়ার হঠাৎ লাগিল হৃদয়ে আসি।
ঘর ও বাহির নিকট সুদূর
সুর তরঙ্গে হ'ল তরপুর
রাধা অনুরাধা ললিতা বিশাখা উঠিল হাসি।

কোথা আজ কানু, কোথা সেই বেণু, তুচ্ছ আমি।
বুকে বুকে সে সুর লহর গিয়াছে থামি।
আজি আর কোন গোপ-ললনার
করায় কি বাঁশী নয়ন-আসার
যমুনা সিনানে বিরহিনী কেউ রহে কি থামি?

বাঁশরী বাজায়ে বনমালী আজো কাহারে ডাকে?
রব শুনি মোর শিহর জাগে কি কদম শাখে?
বসি শাওনেতে নিবীর পাখায়
আর কেহ কিরে পুলক মাখায়
নূপুরের রুনু ঝুনু রব উঠে পথের বাঁকে।

আমার সে-দিন অতীতে বিলীন, হয়েছে স্মৃতি।
ব্রজের রজেতে মিলিবে কি আর হারানো গীতি?
আমি শুধু বাঁশী, বাঁশের বাঁশরী
কেমনে সে কথা আজিকে পাশরি
আছে অবসাদ, সুখ সাধ সবে হয়েছে ইতি।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫০—

(৯)

সকালে টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছিল। পীতাম্বর দেখি। ১২ টার মধ্যে রেণু আসে, ২টায় কলিকাতা যায় শক্তি ঔষধালয়, নালন্দা প্রেস প্রভৃতি স্থানে। ৪টায় ফিরিয়া আসে। প্রতিভা আসে ২টার পর।...আমি রেণু সহ জয়ার বাড়ী যাই। বাস স্ট্যাণ্ডে নবীন গোপাল বসাকের সঙ্গে দেখা। জয়ার মায়ের সঙ্গে অনেক কথা হয়।...তাহার স্বামীই তাহার গুরু। তাহার স্বামী দেহত্যাগের সময়ে ঠাকুরের যে নাম লইয়াছেন, তাহাই সে জপ করে। ইহাতে কাজ হইবে কি না, ইহাই তাহার সংশয়। আমি বলিলাম—ভগবৎ-কৃপাই মূল, যে কোনও নামে যে কোনও মানুষ ধরিয়া সত্তা-বস্তুকে লাভ করা যায়। তবে তিনি যে আজ নাই, আজ ভাবের বিষয় হইয়া পড়িয়াছেন। তাহার মন্ত্র ও গুরুকে চেতন করিতে হইলে নরদেহধারী বাহিরের এমন একজন জীবন্ত পুরুষোত্তম মানুষের প্রয়োজন আছে, যাহার আমির মধ্যে নিজ আমি গলাইয়া দিয়া চলিতে পারে—তাহা হইলে তাহার এই সাধনা সফল হইবে। মানুষের প্রাণ কিছুতেই প্রাণস্পর্শ ছাড়া জুড়াইবে না, বড় বড় তত্ত্বেরও প্রাণ জুড়াইবার সামর্থ্য নাই। সে আমার মা, আমি তাহার পুত্র ও পিতা—এই সম্পর্কের ভিতর দিয়া সে চলিবে—ইহা জানাইল।.. বৈকালে রেণু প্রতিভার সঙ্গে কথা হইতেছিল—বুদ্ধিদ্বারা মানুষ গুরু বা ভগবানকে ষোল আনা জানিতে পারে না। ষোল আনা জানিতে হইলে জানাকে হৃদয়গম করা দরকার। হৃদয়দ্বারা না-জানার রাজ্য জয় করা যায়। বুদ্ধির বিচারে না-মানার দিকই প্রবল হয়, জীবনের 'অতীত' অবস্থার দিকটাই স্পষ্ট হয়। হৃদয়ের মানা অন্ধ বিশ্বাসের মানা। অন্ধ বিশ্বাসের মানা যদি বুদ্ধির না-মানার সঙ্গে সমন্বিত না হয়, বুদ্ধির একান্ত না-মানা বা হৃদয়ের একান্ত মানা কোনটাই সমাধান আনিতে পারিবে না। না-মানারও তো কূল নাই। হৃদয়ের মানা, নির্বিচারে মানা ছাড়া গতি নাই। বুঝিয়া মানা ও না-বুঝিয়া মানার সমন্বয়েই সমগ্র মানা স্থাপন করিতে পারে। প্রায় ১০ টায় ফিরি, আশ্রমে আসি। রেণু মোড় হইতে বাসায় যায়। জয়ার ওখানে বেলা নামে তাহাদের পরিচারিকার সঙ্গে দেখা হয়। সে একটী আম আমাকে দিয়াছে। জয়ার মা আমার জন্য আনা একটি আম সঙ্গে দিয়া দিয়াছে।

২৯শে মে

সকালে সন্তোষের ওখানে রেণুসহ যাইবার জন্য আফিসে যাই। কিন্তু পরেই মাখনবাবু আসেন। মলিনারও আসার কথা। তাই যাওয়া হইল না, কাল যাওয়ার কথা হইল। রেণু ১০।১০ টার মধ্যে মোড় হইতে রায়চৌধুরীর সঙ্গে ডালহৌসী যায় মিঃ চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা করিতে। মণিলাল ব্যানার্জীর ওখানে যায়। তিনি আগের চেয়ে কিছুটা শান্ত হইয়াছেন। কলিকাতা হইয়া বাসা হইতে রেণু এখানে আসে ১টার মধ্যেই। পাট পাতা ও মাখনবাবুর দেওয়া ২টী আম লইয়া আসে।... প্রতিভা আসে প্রায় ৩টায়। সে সাময়িকী লেখে।... রেণু বলিল, 'মানুষ এক জায়গায় স্থিতি লাভ না করিলে ভাবিবে বা চলিবে কি করিয়া'? ঠিক কথা। দুইটী স্থিতি রহিয়াছে—প্রাণ-স্থিতি ও প্রজ্ঞা-স্থিতি। হৃদয়দ্বারা লাভ হয় প্রাণ-স্থিতি, তখন শুধু রূপের আস্বাদন, বুদ্ধি থাকে এখানে পশ্চাতে শুধু সহায়করূপে। এই প্রাণ-

স্থিতি আবার কাড়িয়া যায়, তখন আসে একে স্থিতি, বহুকে বিশ্লেষণ করিয়া আসে স্থিতি, একে স্থিতি। এখানে প্রজ্ঞা তৃপ্ত। এইভাবে একবার প্রাণ-স্থিতি, তাহার পর আবার প্রজ্ঞা-স্থিতি। দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় আছে বলিয়া তখনও প্রজ্ঞা মুখ্য, তখনও বা গৌণ হইতে পারিতেছে। দেশ-কালের একটা পরম সমন্বয় আছে বলিয়াই "কোন বিশেষ ঘটনা 'এখানে' অতীত বা ভবিষ্যৎ কালে ঘটা সম্ভব। কিন্তু এখন' নয়। পরম যৌগপদ্য বুঝিলে বলিতে পারি যে কোন বিশেষ ঘটনা 'এখন' ঘটিতে পারে, কিন্তু 'এখানে' নয়।"—উজ্জ্বলভারত, ৩য় বর্ষ, পৃঃ ৩৮১। 'এখন' ও 'এখানে'র সমন্বয়ের মত প্রাণ-স্থিতি ও প্রজ্ঞা-স্থিতির সমন্বয় সমগ্র জীবনে রহিয়াছে, আত্মা-অনাত্মার সমন্বয় জীবনে সম্ভব হইতেছে। আত্মা-অনাত্মার সমন্বয়ের মধ্যে (১) যেন অনাত্মার স্পর্শশূন্য আত্মা (২) অন্তোন্যসক্ত আত্মা-অনাত্মা (৩) যেন আত্মাস্পর্শহীন অনাত্মা—এইরূপ তিনটি রূপ আস্বাদিত হয়। প্রজ্ঞার স্থিতি বোধ স্বরূপ, প্রাণের স্থিতি আস্বাদন স্বরূপ। বালক আস্বাদন স্বরূপ, একাত্মানুভূতি এখানে সুপ্ত, কেবল ক্ষণে ক্ষণে আস্বাদন মাত্র। বৃদ্ধদের আস্বাদন অপেক্ষা একত্বের জ্ঞান প্রবল। তখনকার আত্মা অনাত্মাবিমুক্তির পথে অনেকটা অগ্রসর। ইহাই"—'। সন্ধ্যার পর সুধাংশু যায় 'ভাজা' লইয়া। সে সন্ধ্যায় আশ্রমে আসিয়া ছিল। রেজাউল করীমের একটা চিঠি আসিয়াছে—বেশ ভাল চিঠি। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতেছেন একজন মুসলমান।

৩০শে মে

সকালে রেণুকে সঙ্গে করিয়া সন্তোষের বাসায় যাই। সন্তোষ তখন বাজারে গিয়াছিল। তাহার শ্বশুরের ঘরে বসিয়া কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল উজ্জ্বলভারত সম্বন্ধে। উহা তিনি পড়েন। তবে সাধারণের পক্ষে বুঝিতে কষ্ট হয়, সহজ ভাষায় লিখিতে বলেন। আমার লেখা দার্শনিক, প্রচলিত মতবাদের সঙ্গে একটা লড়াই আছে, কাজেই ইহার মধ্যে আমার আত্মরক্ষামূলক যুক্তি ও নজির রাখিতে হয়, যে জন্য উহা কষ্ট হইতে বাধ্য। রেণুর লেখা তো সহজ হয়। রেজাউল করীমের কথাও হয়। তাহার উপর ইহাদের আস্থা ও প্রীতি আছে। সেখান হইতে আফিস হইয়া আশ্রমে ফিরি।···পাকলের সঙ্গে অনেক কথা হয়। তাহাকে যে এখানে আসিয়া আমার কার্য্যের অংশ গ্রহণ করিতে হইবে, সংসারে তাহার কপাট নাই বলিয়া তাহার ভগবৎসেবা করিবার যে প্রচুর সুবিধা রহিয়াছে, প্রতি মানুষে যে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, মেয়েরা যদি একাকিনী উনজিনী মূর্ত্তিতে দাঁড়ায়, অসুর যে ধ্বস্ত হইয়া যায়, ইত্যাদি অনেক কথা হয়। নারীকে আজ আত্মসম্মানের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া স্বমহিমাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে—পুরুষোত্তম তাহাই চান।···

৩১শে মে

সকালে সাময়িকী 'চুক্তির পরে' লিখি।···১১৫০টায় রেণু পোষ্টাফিস ও কলিকাতা যায়।···আমরা একত্র হইয়া আফিসে যাই। মাখনবাবু আসেন ও সমস্ত কার্ড-এর নিকট ছাপানো সেই কর্ম্মগুলি পূরণ করিয়া পাঠাইবার জন্য লিখিতে থাকেন। রেণু আগামী শনিবার শ্রীনিকেতন যাইবে, সোমবার সকালের দিকে আসিবে। কেহ কাছ হইতে যায়, ভাল লাগে না। সারা জীবনই তো এই অবস্থা। উষাজিনীকে কাছ ছাড়া করিতে চাই নাই। কাছে কাছে রাখিয়াছি, কাছে কাছেই থাকিতে চাই। আমার প্রাণ কাহাকে বুঝাইব? ভাবাদ্বৈত, কর্ম্মাদ্বৈত, দ্রব্যাদ্বৈত সাধনায় সিদ্ধ কতগুলি সহজ মানুষ লইয়া একত্র থাকার কল্পনা করিতে প্রাণটা জুড়াইয়া যায়। সকলেই প্রাণ খুলিয়া সবটুকু দিয়া, সবটুকু পাইয়া একই সত্তায়, একই কর্ম্মে, একই দ্রব্য ভোগ করিয়া, এক হইয়া চলিবে, কি মধুর! সকলের গায়ে সকলের গা মিলিয়া থাকিবে, অথচ ঠোকাঠুকি হইবে না। এমন মানুষ লইয়া এমন ভাবে থাকিবার সৌভাগ্য কি হইবে না? এমন 'কাল্‌ব্যাহ' রচনায় খবরই বৃন্দাবন পৌঁছাইয়াছেন। গোধূলি রাত্রি ৭টায় পর আসে। বলিলাম—আমাদের

গতি কর। মনে পড়িতেছে চণ্ডীদাসের পদ—'রাই, তুমি সে আমার গতি' ইত্যাদি। কি গভীর আস্বাদন। এই ভাষায় কথা বলিবার জন্ত আমার প্রাণ আকুপাকু করে। এ ভাষা যেন আমার কত পরিচিত। নিজের পরিচিত ভাষা। Static 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ' যিনি তাঁহাকেই গতি দান করিবেন রাধা। বিশ্বের চরম দর্শন এখানে আস্বাদিত হইতেছে। ভগবানের গতি ভক্ত, গুরুর গতি শিষ্য, ধনিকের গতি শ্রমিক, উচ্চ বর্ণের গতি নিম্নবর্ণ, বুদ্ধির গতি হৃদয়, প্রজ্ঞার গতি প্রাণ, স্বামীর গতি স্ত্রী, সন্ন্যাসের গতি সংসার, আকাশের গতি মাটি। ২॥০ টার পর আশ্রমে ফিরি। বেণু তাহার তহবিল হইতে নন্দরাণীর চশমা কিনিবার জন্ত ৩০৲ টাকা দেয়।

১লা জুন

সকালে সাময়িকীটা একরূপ শেষ করি।...শেখর দাস আসিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে 'কথং কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী' এই প্রসঙ্গটী ও 'কর্ম্মকর্ম্ম' শ্লোকটীর আলোচনা হয়। কোনও ব্যক্তির বিশেষ কোন ঘটনা যদি সমাজের কল্যাণপ্রসূ না হয়, তবে তাহাকে General Law-তে পরিণত করিতে না পারা পর্য্যন্ত সমাজ তাহাকে গ্রহণ করিবে না। উহা ব্যক্তিগত ব্যাপারই থাকিবে এবং সমাজের বাহিরেই সে থাকিবে। এইভাবে বুদ্ধ-মতবাদ, বৈষ্ণব মতবাদ মূল সমাজ কাঠামোকে পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই। ২৫০ হাজার বৎসরের সাধনা এইভাবে সমাজ-কাঠামোতে বিপ্লব আনিতে পারে নাই। একদল লোক ভাবাবতারিত হইয়া বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। যেই সনাতন সেই সনাতন ধারা চলিতে লাগিল। প্রায় ১০টায় চলিয়া আসি।...পারমার্থিক ও ব্যবহারিক, heaven and earth কোন্ যোগে যুক্ত হইতে পারে, তাহারই খোঁজ পাইয়াছি, ইহাকে বিশ্বদরবারে পৌঁছানোই আমার জীবনের প্রয়োজন। ইহার জন্ত বড় বড় মানুষের দরকার নাই। চাই ছোট ছোট মানুষের ছোট ছোট অনন্ত প্রাণগুলির সংহতি, তবেই পরম ব্রহ্ম, সকল বড়র যিনি বড়, তিনি সেখানে নামিয়া আসিবেন। কাল কোরের গাড়ীতে বেণু শ্রীনিকেতন যাইবে। আজ দুপুরে তাহার সঙ্গে আমার জীবনের ১০৲ অনেক ঘটনার আলোচনা হয়। কোন্ কোন্ খাত বহিয়া জীবন চলিয়া আসিয়াছে, ভাবিলে অবাক হই। নিতাইবাবুর সঙ্গে থিয়েটারে যাওয়া, মেয়েদের নাচ দেখিয়া ব্রজের রাসনৃত্য মনে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্না ও লোকদের পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন ও নিতাইবাবুর উত্তর ইত্যাদির কথা উঠে। বাজারের মা'দের কাছে আমার জীবন ঋণী।

২রা জুন

আজ কোরের গাড়ীতে মণিদাসহ বেণু শ্রীনিকেতনে গিয়াছে, সোমবার আসিবার কথা। নীলুর একটা ও সুধীরের একটা পত্র আসে।...প্রতিভা তিনটার পর আসে। ধীরেনবাবু আসেন ৪টার পর। তাহাকে 'চুক্তির পর' সাময়িকী পড়িয়া শুনানো হয়।...আমরা একত্র হইয়া আফিসের দিকে রওয়ানা হই। ধীরেনবাবু সতীশ মুখার্জি রোডের মোড় হইতে ফেরেন। আপিসে কেহ আসে নাই। আমরা ৮টায় তালা বন্ধ করিয়া বাহির হই, আশ্রমে চলিয়া আসি। বেণু নাই, কোন কাজই যেন নাই। আমার জীবনের আশেপাশে কত মানুষই না আসিয়া জুটিয়াছিল, তাহারা সকলেই ছিটকাইয়া পড়িয়াছে, আমি আজও আগাইয়া চলিতেছি, কোথাও আটকাইয়া যাই নাই। ঠাকুরের অপরিসীম কৃপা ও তাঁহার সাক্ষাৎ স্পর্শ ছাড়া ইহা সম্ভব হইত না। সকলকেই বুকে তুলিয়া লইয়াছি, কেহ আমাকে পথচ্যুত করিতে পারে নাই। ইহাই তো ব্রজের পথ, পুরুষোত্তমের পথ। আমার কোনও প্রয়োজন-বোধ ছিল না, অভিসন্ধি ছিল না, শুধু বিশ্বরূপ পুরুষোত্তমের সেবায় তাহাদিগকে লাগাইব, ইহাই ছিল বাসনা। সকল প্রাণ দিয়া অকপটে ভালবাসিবার জন্তই ভালবাসিয়াছি, তাই বন্ধন সৃষ্টি হয় নাই, বাহির হইয়া আসিতে পারিয়াছি। তাহাদের প্রয়োজন বোধ ছিল, তাহারা অপ্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্ক

রাখিতে পারে নাই। চলিয়া গিয়াছে। আমি আজিও দাঁড়াইয়া আছি, নূতনের খোঁজে চলিয়াছি।...

২রা জুন

আজ সকালে 'অহমী'টা একটু পড়ি।.....প্রতিভা আসে ১টার পর। সাময়িকীর প্রথম অংশ rewrite করে ও শেষ করে। ৪৯০টায় আমরা আফিসে যাই। ...পুরুষোত্তম-দর্শনে 'পাওয়া' আগে, তারপর পাওয়ার অধিকারী, পাওয়ার যোগ্য হইবার জন্য অনন্তকাল না পাওয়ার বুক চিরিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। 'পাওয়ার' তৃপ্তিতে যাহার বুক ভরা, তাহারই না-পাওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতার অভাবে মন ভাঙিয়া যায় না, অবসন্ন হয় না, ব্যর্থতার জন্য নিজকে ধিক্কার দিতেও হয় না। যোগ্যতা তো কেহ শেষ করিয়া পাইতে পারে না। সেবার অধিকার আছে মানুষের ষোল আনা; যে যাহার যোগ্যতানুরূপ সেবা করিবে। অধিকারেই মানুষ পূর্ণ, যোগ্যতায় অনন্ত কালেও কেহ পূর্ণ হইবে না; সেখানে সে নিত্য অপূর্ণ। পাওয়ার অধিকারে যাহার বুক ঠাণ্ডা, না-পাওয়ার ক্ষেত্রে অল্প যোগ্যতায় তাহার হৃদয় বিষণ্ণ হয় না। আমি জানি আমি কত বিষয়ে ঠাকুরের সেবার অযোগ্য, তবুও তাঁহাকে আমার 'পাওয়া'য় আমার বুক শীতল, আমি আত্মতৃপ্ত। আমি তো না-পাওয়ার জন্য হাহাকার করি না। যতটুকু পাইয়াছি, আমি নিত্যতৃপ্ত। অনন্তকাল বসিয়া পাইব, পাওয়া তো ফুরাইয়া যাইবে না। যিনি কালীর উলঙ্গ সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন, তিনিই কমলার আবৃত সৌন্দর্য্য আস্বাদন করিতেছেন। যোগ্যকেও তিনি ভোগ করেন, অযোগ্যকেও করেন। যোগ্য-অযোগ্যের ক্ষেত্রই প্রকৃতি। যোগ্য অযোগ্যের অতীত ক্ষেত্র পুরুষের। অধিকার যোগ্যের আছে, অযোগ্যেরও আছে। পূর্ণ অধিকার আছে প্রত্যেকের, যোগ্যতার তারতম্য আছে। আমাকে পাইবার অধিকার আছে সকলেরই, যে যাহাকে মত সেবা করিবে। কাছে কাছে থাকিলে, কথাবার্ত্তা শুনিলে, জীবনে জীবন মিলাইলে পাওয়া জমিয়া উঠে, না-পাওয়ার ক্ষেত্র অল্প করা যায়। প্রতিভার সঙ্গে উপরোক্ত আলাপ আফিসে বসিয়া হয়। ৮৪০টার পর আমরা তালা বন্ধ করিয়া চলিয়া আসি, চিদানন্দ কয়েক মিনিটের জন্য আফিসে আসিয়াছিল।

৪ঠা জুন

প্রতিভা সকাল ৯টার আগে আসিয়া ব্যাঙ্কের পাশবই লইয়া আফিসে যায়, ডাক দেখিয়া ব্যাঙ্কে বই দিয়া আসে। এখানেই দুপুরে খায়। ৪টার পর গিয়া ব্যাঙ্ক হইতে বই নিয়া আফিসে যায়। রেণু শ্রীনিকেতন হইতে আসে ১২৪০টায়,.. সন্ধ্যার সময় মালতী প্রভৃতি আসে।...তিন তিনকে এবং পাঁচ পাঁচকে এবং পরস্পরকে পনের-র মধ্যেই পাইতে পারে। ১৫-র বাহিরে কেহই কাহাকে পাইবে না। পুরুষোত্তম-জীবনের মাঝেই সকলের সঙ্গে সকলের অনন্ত আলাপ দেখা শুনা হইতে পারে। আমার কাছে না-থাকার অর্থ আপন জন হইতে দূরে থাকা। 'প্রাণবুদ্ধি মনঃস্বাস্থ্য' ও 'ভাবভ্রাগাদৃক' শ্লোক দুইটী লিখিয়া দেই। ৮৪০টার পর সন্তোষ আসে, কিছুকাল থাকে।...-র উপর তাহার মায়ের মনের ভাব পূর্ব্বের অপেক্ষা সহৃদয়তাপূর্ণ—ইহাই তাহার ধারণা। তাহা হওয়াই তো অন্তরের লক্ষণ। নিজ জীবনের অগ্রগতিদ্বারা সবলকে বশীভূত করিতে পারিলেই তো পুরুষোত্তম-দর্শনের সার্থকতা।...দিদির খুব অসুখ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট হইতে লোক খবর দিয়া যায়।

৫ই জুন

সকালে আফিসে আষাঢ়ের ১ম প্রবন্ধ 'সাময়িকী—চুক্তির পর' দিয়া আসি, কত পৃষ্ঠা হইবে তাহাও গণনা করাইয়া আসি। আশ্রমে ফিরিবার পর দিদিকে দেখিবার জন্য রৌদ্রের ভিতরই যাই। সেখান হইতে ১০টার পর রিক্সায় আসি, ভাড়া বীজ দিয়া দেয়। আজ বার বার মনে হইতেছে ঠাকুর কত কত রকমে আমাকে মহা দুর্যোগের ভিতর কোলে করিয়া রাখিয়াছেন, গায়ে আঁচড়টী লাগিতে দেন নাই। আমি যদি সংসারের প্রতিটী ঘটনাকে, প্রতিটী সম্পর্ককে, প্রতিটী মানুষকে তার তার

মূল্যে আস্বাদন করিতে পারি, যোগমায়া আমাকে রক্ষা করিবেন। রক্ষা না করেন, তাহাও তাঁহার ইচ্ছা বলিয়া মনে করিতে চেষ্টা করিব। 'ননদিনী রসে যা তুই নগরে, ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-প্রেমসাগরে,' 'কুটিলা করবি আমার কি, কুটিলা করবি আমার কি, কৃষ্ণপ্রেম-কলঙ্ক হার গলায় পরেছি।' এই অগ্রাহ্য করার মনোবৃত্তি না থাকিলে প্রেমে নিত্য স্থিতি...মিলিত? সেখানেও মদনের ধ্বজরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাহাকেও অগ্রাহ্য না করিয়া, আবার অতিমাত্রায় গ্রাহ্য না করিয়া ধীর সাধক আগাইয়া চলিবেন। মানুষের কথা বলবার বাইরে সে। প্রতিভা মঠে চিদানন্দের কাছ হইতে ঠাকুরের ফটো নিয়া প্রায় ৩টায় আসে। রেণু আসে কলিকাতা ঘুরিয়া তাহার পর। ব্যাঙ্কার্স ইউনিয়ন, পাবলিসিটি ফোরাম, অমিত দত্ত প্রভৃতির ওখানে যায়।...আমি যাহা, তাহা লইয়াই আমি ঠাকুরের। কোনও দাবী আমার নাই, কোনও কৈফিয়তও আমি চাই না। না-পাওয়ার হাহাকার আমার নাই। যাহা দরকার, তিনি দিবেন; যাহা অযাচিত করুণায় দিয়াছেন, আমি কি তাহারই জন্য প্রস্তুত ছিলাম, না আমি তাহার যোগ্য? বর্ত্তমান যুগের নবীন দর্শন আমাকে দিয়াছেন, কি আর চাহিব? 'যা দিয়েছ, তাই নিয়ে নাথ সুখে আছি আছি হরষে।' জ্যোতি দেখিবার লোভ আমার নাই, সমাধির জন্য আমার ব্যাকুলতাও নাই। আমি মানুষকে ভালবাসিতে চাই। প্রত্যেককে তার তার মূল্যে তার তার স্থানে রাখিয়া হৃদয়ের মণি কোঠায় রাখিতে চাই। এই চাওয়ার আনন্দ আমার আছে, না পাই, বেদনা লইয়া যাইব। ঠাকুরের কাছে আমি কি চাহিব? রাত্রি প্রায় ১০টায় ফিরি। যদি ঠাকুরের জীবনে এতটুকু স্থিতি লাভ না হইত, কোথায় ভাসিয়া যাইতাম। জীবনভর যে ঝড়ের মধ্যে দিয়া চলিয়াছি, সব বন্ধুরাই তো ছিটকাইয়া পড়িয়াছেন, আমি এক জায়গায় দাঁড়াইয়া আছি—ঠাকুর!

৬ই জুন

...মালতী...আসিলে বলিলাম, ও রূপ যান অভিমান লইয়া জীবনে অগ্রগতি চলে না। ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের বাঁশী শুনিয়া 'অন্যোন্যমনক্ষিতোদ্যমা' হইয়া একই পথে বাহির হইয়াছিলেন, পথে দল হইয়াছিল। দল বাঁধিয়া বাহির হওয়া যায় না, কোনও আদর্শের টানে বাহির হইয়া পথেই দল গড়িতে হয়। শরীর তোমার ভাল নয়। খাওয়া-দাওয়ার ওরূপ প্যাচাইয়া চলা সঙ্গত নয়। প্রয়োজন হইলে যে-যার মত খাইয়া লইবে। সুবিধা হইলে সঙ্গে খাইবে। সুধাংশু আসিয়াছিল সন্ধ্যার পর। সে-ও ৮।০ টায় যায়। তারপর হেরম্ববাবু আসে, টেলিফোনের বাঙ্গালী মেয়েরা যে কর্মে স্বার্থতা প্রদান করিতেছে, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা হইল। সুকুমার লাহিড়ীর কাছে 'আর্থিক জগৎ' প্রেসের বীরেনবাবু বলিয়াছেন যে, উজ্জ্বল-ভারত ছোট পার্টি হইলেও টাকাপয়সার আদানপ্রদানে এত ভাল যে, যেন তাহারা টাকা দিবার জন্যই বসিয়া আছে। আমি চাই সর্ব্বব্যাপারে এমন সুশৃঙ্খলভাবে, এমন আদর্শ রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যাওয়া যাহাতে মানুষ শিখিবার সুযোগ পায় কেমন করিয়া 'কাজ' করিতে হয়। রেণু প্রতিভার কাছে বলিয়াছি,—তোমাদের চেয়ে ভাল পাইব, এ আশা আমার নাই। তোমাদিগকেই চাই, তবে আরও উন্নত, আরও অগ্রগমনশীল জীবন চাই।—তাই গালমন্দ করি, তোমাদিগকে ছোট করিবার জন্য নয়। ৯৷০টায় ফিরি। বিষয়ের একটা পোষ্টকার্ড আসে।

সকালে দিদিকে দেখিতে যাই, তাঁহার অবস্থা তো ভাল নয়। একরূপ বেহুঁস, ডাকিলে কখনও সাড়া দেন, কখনও বা দেন না। সেখান হইতে ফেরার কিছু পরেই রেণু নীহারের বাসা হইতে রেণুকে এখানে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য আসে। সে সকালে নীহারের ওখানে গ্রাহকগুলির টাকার জন্য গিয়াছিল। ৩০ টাকা আনিয়াছে। রেণু এখান হইতে ১০টার কিছু পূর্ব্বে বাসায় যায়। বাসা হইতে মণিলাল ব্যানার্জি, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, যোগে মিউচুয়াল, শেখর দাস প্রভৃতির

তখানে যায়। সে আর এখানে আসে না। আমরা গিয়া দেখি সে আসিয়াছে মাত্র। আমি ও প্রতিভা ৪৫০টার পর যাই। ব্রহ্মসূত্র ছাপাইবার কথা নীহারও বেণুর কাছে বলিল, একটী হিসাবও দিতে বলিল।··· কোন মাহিনা করা লোকদ্বারা বিজ্ঞাপন সংগ্রহ সম্ভব হইবে না এবং ব্রহ্মসূত্র ছাপানোই সঙ্গত, উদ্বোধন ভারত একরকম চলিয়া যাইবে, ইত্যাদি মনে করিয়া ব্রহ্মসূত্র ছাপাইবার প্রস্তাব বেণু স্বীকার করে।···উহারা যেরূপ আত্মহারা, তাহাতে আর দেরী করা উচিত হইবে না। ঠাকুরের দায় যখন উহাদের কাঁধে চাপিয়াছে, তখন শীঘ্র আরম্ভ করাই উচিত।

আজ মনে পড়িতেছিল অতীতের কত কথা। ১৯১৯ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী ব্রজমোহন স্কুলের শিক্ষকতা ইস্তফা দিয়া জগদীশবাবুর কাছে না বলিয়াই যখন চিরকালের জন্য পরের চাকুরী করা শেষ করিয়া কলিকাতা পাঁচু-খানসামার লেনে নিতাইবাবুর বাটী থাকি, একদিন হ্যারিসন রোড ও আমহার্স্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়াইয়া জন-স্রোত দেখিতেছি, আর মনে হইতেছে সকলেই কর্মব্যস্ত, আমারই শুধু কাজ খসিয়া পড়িয়াছে। অথচ আমার সঙ্গে স্ত্রী, তিন পুত্র ও এক কন্যা আছে! বুক চিরিয়া 'হায়ে' ধ্বনি বাহির হইল। সেদিন কি-জানি কেন নিতাইবাবু আমাকে 'ব্রহ্মসূত্র' লিখিবার কথা বলেন এবং আমার ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে আলোচনার পর বলিলেন, 'তুমি পারিবে, তুমি লেখ'। কিন্তু লিখিতে গেলে এক জায়গায় বসিয়া লিখিতে হয়, খাওয়া-খাওয়ার টাকা লাগে। তাহা কোথায়? আমি তো বেকার। তখন নিতাইবাবু বলিলেন, 'শুনিয়াছি সি, আর, দাস খুব বদান্য লোক। তাহার কাছে গেলে হয় না'? আমি বলিলাম, 'আমি যখন প্রার্থী হইয়া সি আর দাসের কাছে যাইব, তখন তিনি কিছু না-জানিয়াও বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। আমার তাহা ভাল লাগিবে না। তিনি বড় ব্যারিষ্টার, বেদান্তের তেমন কি জানিতে পারেন? বিশেষতঃ তাঁহার কাছে যাওয়ার অর্থ আমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতিকুটুম্ব কিছু করিলেন না, ইহা আমি তাঁহার কাছে প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করি'। তখন নিতাইবাবু বলিলেন, 'তবে থাক'। তিনি আমাকে নিয়া প্রথমে গুরুভ্রাতা ধনীবাবুর কাছে গেলেন। যা বলিবার তিনিই বলিলেন। ধনীবাবু এককুনে ২০০৲ টাকা দিতে রাজী হইলেন, ডাক্তার আদ্য ১০০৲, কালীধন দে ১০০৲, নিতাইবাবু ১০০৲—এইভাবে ৬০০৲ টাকায় যোগাড় হইল। আমি বরিশাল চলিয়া যাই। মাসে মাসে ৫০৲ টাকা এখান হইতে পাঠান হইত। বরিশালের ৪০৲ টাকা ৫০৲ টাকায় উন্নীত হইল। লিখিবার কাগজ ১মীম নিতাইবাবু কিনিয়া দেন। প্রায় ১ বৎসরে শেষ হয়।

৮ই জুন

··ব্রহ্মসূত্রের পাণ্ডুলিপিগুলি বীরেনবাবুকে দেখাইয়া একটা হিসাব আনিবার জন্য বেণু নিয়া যায়। ছাপাইতে আর দেরী করা চলিবে না। মন্থ খুব তাগিদ দেয়। আমরা একত্র হইয়া বাহির হই। বেণু-প্রতিভা আফিসে যায়, আমি মোড় হইতে মহিম হালদার ষ্ট্রীটে যাই। গিয়া দেখি দিদির অবস্থা খারাপ, নাড়ী sink করিতেছে। আমি প্রায় ১ ঘণ্টা নাম করি—বাবা নীলকমল, মা মুক্তকেশী—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ·· রাম রাম হরে হরে। নারায়ণ নারায়ণ।·····যাহাদের সামনে আলো থাকে, তাহারা অনায়াসেই যাইতে পারে। যাহাদের ভবিষ্যৎ closed, কোন আদর্শ ও পথ যাহাদের সামনের দিকে নাই, তাহাদের খুব কষ্ট হয়। মনে হইতেছিল, যাইতে তো একদিন হইবেই। পাঠ-কীর্তন-আলোচনার ভিতর দিয়া যেন আরামে নিঃশব্দে চলিয়া যাইতে পারি। ঠাকুর আমার জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। তিনি আমার নিত্যসঙ্গী। যখন রিক্সা হইতে নামিয়া আফিসের দিকে যাই, তখন রাসবিহারী এভিনিউয়ের মোড়ে একজন 'জয় নিতাগোপাল' বলিয়া হাক দিল। লোকটী প্রণাম করিল, বলিল, 'আমি হরিশ্চরণানন্দের শিষ্য'। সে আমাকে তাহার ছাতার মধ্যে লইয়া চলিল। আফিস পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিল।···পুরুষোত্তম-দর্শনে অকাল মৃত্যু

নাই, সেখানে রহিয়াছে কাল পুরুষের সনয়ন। অকাল মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতেই হইবে।

২৪ জুন

ঝড় চলিতেছে। সকালে দিদির ওখানে যাই।··· প্রতিভা আসে নাই। ঝড় সমানে চলিতেছে। রেণু ইহার মধ্যেও ব্রহ্মসূত্রের পাণ্ডুলিপি লইয়া প্রেস ও পেপার কণ্ট্রোলারে যায়। ১১৫২ পৃঃ ব্রহ্মসূত্র হইবে, খরচ লাগিবে ৩৭১৫৲ টাকার মত। দরখাস্ত দিয়াও আসিয়াছে। এখানে ফেরে ৩টায়। রেণু প্রবন্ধ পড়ে ও পরে বাসায় যায়। উষাঙ্গিনীর সঙ্গে উজ্জলভারতের অংশীদার হওয়া নিয়া রেণুর অভিভাবকগণ রেণুর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিল, তাহা আলোচনা করি। উষাঙ্গিনীও শীঘ্র লেখাপড়া করিয়া রেণুকে দিয়া দেওয়া সম্বন্ধে বলে। রেণু প্রতিভাই তো করিয়াছে। এখানে কেহ দাবী না করিলেও করিয়া দেওয়া উচিত। আজ ভাবিতেছিলাম—সকলকে ব্রহ্মমূল্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, ব্রহ্মমূল্যে মূল্যদান করিয়া জগতের বুকে দাঁড় করাইবার জন্যই প্রাণ-পণ করিয়াছি। কিন্তু কয়জন সে মূল্যে নিজের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে চাহিল? আমি কোলে করিয়াই পুরুষোত্তমের রাজ্যে নিতে চাহিয়াছি, তাহারা কোল হইতে নামিয়া নিজের আমিকে সার্থক করিতে চাহিল। আমি কাঁদিয়াছি, বেদনায় ছটফট করিয়াছি। সকালে ও বৈকালে দিদির কাছে বসিয়া নাম করি।·· সন্ধ্যার পর ঝড়ের মধ্যেই দিদির ওখান হইতে রিক্সায় আফিসে যাই। পায়ে কি একটা বসিয়াছিল, রেণু লক্ষ্য করিয়া দেয়। খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে হাঁটিয়াই ৯।০টায় আশ্রমে ফিরি। রাইচরণ চক্রবর্ত্তী আফিসে আসেন ৮।০টায়। তাঁহার সঙ্গে কথা হয় উজ্জলভারতের আদর্শ সম্বন্ধে। গ্রাহক হন।···

১০ই জুন

আজ সারাদিনেও ঝড়বৃষ্টির জন্য কোথাও বাহির হই না, আফিসেও না। খুব ভোরে প্রতিভা রেণুর ওখানে গিয়া রেণুকে তাহার ওখানে যাওয়ার কথা বলিয়া আসে। রেণু সকালে (ব্রহ্মসূত্রের) হিসাবটা লইয়া মন্থর বাসায় যায়। নীহারের ইচ্ছা যাহাতে ব্রহ্মসূত্র এক বৎসরের মধ্যেই ছাপা হয়। ৭।০টায় রেণুকে তাহার ছাতাটা ও ঝড় থাকার দরুণ কোথাও বাহির না-হইবার কথা জানাইয়া একখানা চিরকুট দারোয়ান দিতে যায়। রেণুকে পায় না। সে ইহার পূর্ব্বেই মন্থর ওখানে চলিয়া গিয়াছে। রেণু-প্রতিভা একত্র হইয়া ১টার পর আসে।

৪টায় রেণু জলের মধ্যেই চলিয়া যায়। কিছু পরেই গোকুল আসে। রেণু আমার জন্য করা মিশ্রির সরবৎ গোকুলকে দিয়া পাঠাইয়া দেয়। প্রস্তাবটা যেন বেশ পরিষ্কার হইতেছিল না। নীলুর নিকট একটা পত্র দেই। সন্ধ্যা হয় তখন প্রতিভা যায়। গোকুল তাহার পর যায়। তাহার সঙ্গে কিছুটা কথাবার্ত্তা হয় উজ্জলভারতের বক্তব্য সম্বন্ধে। আজ রেণু শশীর ওখানে গিয়াছিল। সে বলিয়াছে, উজ্জলভারত একদলের মধ্যে একটা market create করিয়াছে।···প্রতিভার দুপুরের খাওয়ার বন্দোবস্ত এদিকে না করিলে ব্রহ্মসূত্র কিছুতেই এক বৎসরের মধ্যে ছাপা হইবে না। অন্য কোনরূপ বন্দোবস্ত না হয়, আফিসে লুকায়ে রান্না করিয়া লইবে। একটা স্রোত আসিয়াছে, এই সুযোগে প্রাণপণ আগাইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। মহাত্মাজীর সাত্ত্বিক স্তরের আন্দোলন যে নিম্নৈগুণ্যের স্তর হইতেই সফল হইতে পারে, সগুণের স্তর হইতে নয়, ইহা গোকুলের সঙ্গে আলোচনা হয়। কংগ্রেস এইজন্যই আটকাইয়া গিয়াছে। নির্গুণ স্তরের সঙ্গে সত্ত্বগুণ যুক্ত না থাকিলে সত্ত্বগুণ static হইয়া যায়।

১১ই জুন

সকালে রেণুর ওখানে কিছু সময় অপেক্ষা করিয়া (কেননা কাল সন্ধ্যায় বৃষ্টির দরুণ যাওয়া হয় নাই) পরে দিদির ওখানে যাই। অবস্থা ভাল ছিল না। কিছুক্ষণ পরে চলিয়া আসি। আসার ১ ঘণ্টা পরই খবর আসে যে দিদি চলিয়া গিয়াছেন। তখনই রিক্সায় যাই। দীনেশ রায়, দেবপ্রসাদ প্রভৃতি ধীরে ধীরে আসে। অনেকক্ষণ

প্রায় ঘণ্টা দুই—দিদির কাছে বসিয়া সেবারের মত নাম নেই।···এখান হইতে উমাদিদী রেণু ও প্রতিভা শ্মশানে যায়। শ্মশানেও মেয়েদের সঙ্গে আমি 'হরে কৃষ্ণ' নাম গান করি। শ্মশানে সব উঠাইলে আমরা চলিয়া আসি। যে স্নেহ এতদিন খোঁজখবর নিত, কিছুদিন না গেলেই নিজের হাতে চিঠি লিখিয়া মানুষ পাঠাইয়া দিত, কত ছোটখাট তরকারী পাঠাইত, কত অসুবিধার মাঝেও ভাইফোঁটা দিত, উমাদিদীকে ডাকাইয়া এটা-ওটা খাওয়ার কথা বলিত, সে স্নেহ আজ দরিয়া হইয়াছে। আমি এ-পার হইতে সেই স্নেহের দিকে তাকাইয়া আমাদের জীবনের সকল নিবেদন, সকল প্রার্থনা, সকল স্বীকৃতি জানাইতেছি। 'আনন্দাহ্যেব খল্বিমানি' মন্ত্রও আবৃত্তি করিয়াছিলাম। আনন্দের এই মহাপ্রয়াণের সঙ্গেও আমরা আমাদের আনন্দের পাথেয় দিয়া দিতেছি। ভবিষ্যৎ অগ্রগতি নিরাময় হউক, অব্যাহত হউক, সার্বজনীন হউক। এ জীবনে অনেক দুঃখ পাই, অনেক অবিচার, অনেক লাঞ্ছনা সহিয়াছে, মানুষের মাঝে সব তাহা পরিপাক হউক। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। শ্মশান হইতে ফিরিবার কিছু পরেই মালতী আসে। সে ৭৮-টার যায়। প্রণতির জ্বর। চোখের যন্ত্রণাও ছিল। সে বলিয়াছে, 'চলমার এত টাকা কোথায় পাইব? গিয়া কি হইবে?' আমি বলিলাম, 'পাঠাইয়াছি আমরা, আনিয়া শুনিয়াই তাহার টাকা নাই। আজ যে কথা মনে হইতেছে যাওয়ার সময় আলোচনা করিলেই তো হইত। একবার যেন দেখা করে। টাকা আমরাই দিব, এতটুকু আপন তাহাকে আমরা মনে করি। গরম ভাত রাঁধিয়া দেয়, তাহাই সন্ধ্যার কিছু আগে খাই। রেণু বাসা হইতে ইতিমধ্যে সরবৎ নিয়া আসে। রেণু চলিয়া যায়, পরে প্রতিভাও যায়। রেণু রাইটার্স বিল্ডিং, গ্র্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডস্ট্রাইকিং ও বিশ্ববিদ্যালয় যায়। সাংখ্যকারিকা নিয়া আসে। সুধাংশু এখানে আসে ৭টার পর।

১২ই জুন

সকালে আফিসে যাই। কিছুক্ষণ থাকি। আমার জীবনের সাধনা 'অধিকার দেওয়ার পর অধিকারের যোগ্য করা'। অধিকার দিলেই তো মানুষ অধিকারী হয় না? অধিকার যোগ্যতা দিয়া অর্জন করিতে হয়; কিন্তু 'অধিকার' দিয়া রাখিতে হইবে। অধিকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে 'যোগ্য' হইবার ভিত্তি হইবে কি? কিন্তু প্রচলিত বর্ণাশ্রম চায় 'যোগ্য' করিয়া অধিকার দেওয়া, অর্থাৎ অধিকারকে ঘুরে সরাইয়া রাখিয়া এবং গড়াইয়া পিটাইয়া যোগ্য করিয়া তবে অধিকার দেওয়া। 'যোগ্যতা' যাহারা অগ্রে চায়, তাহারা ত্রুটি বিচ্যুতিকে আঘাত করে, সেখান হইতে সরাইয়া আনিবার জন্য শাসন করে, কিন্তু অধিকার দান যাহারা অগ্রে করেন, তাহারা বন্ধুর মত, সহযোগীর মত অধিকারের ধনকে পাওয়াইতে পাওয়াইতে আগাইয়া লইয়া যাইতে চান। তাঁহারাও বিশ্লেষণ করেন, কিন্তু আঘাত করেন না। উহা বাহিরের দৃষ্টিতে ত্রুটি ধরিবার মত, দোষ দেখিবার মত। যোগ্যতাবাদীরা কিন্তু আরম্ভ করেন না-পাওয়ার ক্ষেত্র হইতে পাওয়ার ক্ষেত্রে পৌঁছিবার জন্য; অধিকারবাদীরা রওয়ানা হন পাওয়ার ক্ষেত্র হইতে না-পাওয়ার ক্ষেত্রকে অধিকার করিবার জন্য। যোগ্যতার উপাসক নেতিবাদী, অধিকারের উপাসক ইতিবাদী। যোগ্য পিছনে সরিয়া যোগ্য হয়, অধিকারী সামনে আগাইয়া যোগ্য অধিকারী হয়। শ্রীকৃষ্ণ যোগ্যতা ও অধিকারের সমন্বয় তাঁহার বর্ণাশ্রমে বিধান করিয়াছেন; 'ভক্তি' তাঁহার সাধনা। ভক্তিতেই মানুষ যোগ্য হয়, অধিকারী হয়। প্রাণপ্রজ্ঞা-সমন্বয়ই ভক্তি, বিদ্যা-অবিদ্যাসমন্বয়ই ভক্তি, ব্রহ্মবিদ্যা।··· আফিসে সরবৎ খাই। প্রেসার ঠিক সরল হয় বলিয়া মনে হয় না। N. S. 30x, S. 30x ও C. P. 30x+N. P. 30x alternately ৩ বার করিয়া ৬ বার খাই।

১৩ই জুন

ক্রমশঃ

হিন্দুরাজত্বে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীমোহিত কুমার সেনগুপ্ত

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারদিক ইটের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। একটি ফটকের ভিতর দিয়া কলেজে প্রবেশ করিতে হয় এবং ইহার একটু দূরে আটটি বিরাট হলঘর আছে। সুদৃশ্য পর্বত শিখরের ন্যায় চূড়া বিশিষ্ট সুসজ্জিত গম্বুজগুলি শোভা পাইতেছে। এই গম্বুজগুলির উপরে পবীয় মূর্তি খোদাই করা আছে। মানমন্দিরগুলি প্রভাতে বাষ্পের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায় এবং ইহার উপরের ঘরগুলিতে মেঘ ছড়াইয়া পড়ে। মানমন্দিরের জানালা হইতে মেঘ, চন্দ্র ও সূর্য্যের গতিবিধি অবলোকন করা যায়।

সে সময়ে ভারতে বহু সহস্র সঙ্ঘারাম ছিল, তাহার মধ্যে নালন্দাই শ্রেষ্ঠ। এই সঙ্ঘের পুরোহিত ও বিদেশ হইতে আগত ছাত্রদের সংখ্যা প্রায় সকল সময়েই দশ হাজারের বেশী থাকিত। ছাত্রগণ ধর্মশাস্ত্র ভিন্নও জ্যোতিষশাস্ত্র, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, অথর্ববিদ্যা ও সাংখ্যদর্শন পাঠ করিত। ইহা ভিন্ন তাহারা অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাও করিত। নালন্দায় এক সহস্র পণ্ডিত ছিলেন, যাঁহারা সূত্র ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন; পাঁচশত জন পণ্ডিত পারিতেন দশখণ্ড গ্রন্থের এবং প্রধান আচার্য্য সমেত দশ জন পণ্ডিত পারিতেন পঞ্চাশ খণ্ড গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিতে। একা শীলভদ্রই সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স ও গুণের জন্য তাঁহাকে নালন্দা পণ্ডিত সমাজের প্রধান বলিয়া গণ্য করা হইত। মন্দিরে দৈনিক প্রায় ১০০ বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইত এবং ছাত্রেরা সকল আলোচনা চক্রেই যোগদান করিতে পারিত। এই মঠের ছাত্রেরা সকলেই এমন সুশীল ও সৌজন্যবোধযুক্ত ছিলেন যে, এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময় হইতে সাতশত বৎসর পর্য্যন্ত শৃঙ্খলাভঙ্গের একটি অভিযোগ পাওয়া যায় না। রাজা পুরোহিতদিগের সম্মান রক্ষার্থ নিকটবর্ত্তী একশত গ্রাম দান করিয়াছিলেন যাহার রাজস্ব হইতেই মঠের ব্যয় নির্বাহ হইত। এই এক শত গ্রামের দুইশত গৃহস্থ দৈনিক মঠের চাউল ও দুগ্ধ যোগাইত। এই মঠের সন্ন্যাসী ও ছাত্রের অন্ন, বস্ত্র, শয্যা ও চিকিৎসার কথা ভাবিতে হইত না। এই কারণেই নিশ্চিন্ত মনে থাকিয়া তাঁহারা বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিতেন।

ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে বিশেষ করিয়া শিক্ষার প্রসার খুব বেশী ছিল। রাজাদের নিকট বিদ্বান ব্যক্তিরা যথেষ্ট সম্মান পাইতেন। রাজা হর্ষ কেবলমাত্র বিদ্যোৎসাহীই ছিলেন না, তিনি একজন হস্তলিপী পারদর্শী ও প্রতিষ্ঠাবান লেখক ছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগে বাংলা দেশের রাজা গোপাল ওদন্তপুরী মঠের তত্ত্বাবধানে কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজা ধর্মপাল বিক্রমশিলায় একটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার অধীনে ছিল দশটি মন্দির ও ছয়টি কলেজ। এই সকল কলেজে ব্যাকরণ, দর্শনশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র ও ধার্মিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল। রাজা বৌদ্ধভিক্ষু ও ছাত্রদের ভরণ-পোষণের জন্য অর্থ দান করিয়াছিলেন। এই সময় রাজ সভায় তর্ক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইত এবং যে সকল মেধাবী ছাত্র ইহাতে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিতেন তাঁহারা সরকারী চাকুরী পাইতেন। বিদ্বান ব্যক্তিদের রাজারা পণ্ডিত উপাধি দান করিতেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাদ্রাজের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ যে সকল আবিষ্কার করিয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজা এবং জনসাধারণ হিতকর সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ-

দান করিতেন। মাদ্রাজ প্রত্নতাত্ত্বিকের রিপোর্ট হইতে জানিতে পারা যায় যে একাদশ শতাব্দীতে প্রথম রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বকালে 'রাজশতবেদী মঙ্গলম্' নামে গ্রাম্য পরিষদ দ্বারা একটি কলেজ পরিচালিত হইত। এই কলেজে বেদের অধ্যাপনা হইত ইহার অন্তর্ভুক্ত একটি ছাত্রাবাসও ছিল। এখানে তিনশত চল্লিশজন ছাত্রের এবং দশজন অধ্যাপকের থাকিবার ব্যবস্থা ছিল। এই মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপকদিগকে কাজের অনুপাতে বেতন দিবার ব্যবস্থা ছিল। ব্যাকরণের অধ্যাপক একটি অধ্যায়ের পাঠদানের জন্য একটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা পাইতেন।

বিভিন্ন স্থানের শিলালিপি হইতে জানা যায় অতীত কালে গ্রামীণ সমিতি নিজ নিজ এলাকায় স্কুল ও কলেজ স্থাপন করিত। বিজাপুরে এখন পর্যন্ত একটি পুরাতন মস্জিদের স্তম্ভ বিদ্যমান আছে এবং ইহার কলেজ-গৃহের ভগ্নাবশেষ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। এই কলেজ-গৃহটি এখনকার জনসাধারণ অতি পবিত্র বলিয়া মনে করেন কারণ ইহা দক্ষিণ-ভারতের হিন্দু রাজত্বের একটি নিদর্শন।

গাণ্টুর জেলার মালখাপুরমে একটি স্তম্ভের খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে কাকতীয় বংশের রাজারা একটি বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও একটি ভোজনাগার স্থাপন করিবার জন্য প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন। কোন কোন স্থানে গ্রামীণ সমিতি বিদ্যালয় পরিচালনা করিবার জন্য ট্যাক্স আদায় করিতেন। প্রত্ন-তত্ত্ব বিভাগের একটি বিবরণী হইতে জানিতে পারা যায় যে, টিরুভোরিয়ার উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগে স্কুল ও মন্দির পরিচালনা করিবার জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে ট্যাক্স আদায় করা হইত।

অতীত কালে পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষাদান করা হইত। এই সকল পাঠশালায় লেখা, পড়া ও গণিত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এই প্রকার পাঠশালা এখনও ভারতে প্রচলিত আছে। গ্রামীণ সমিতি আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থা সুরু হইয়াছিল এ কথা বলা যাইতে পারে। শিক্ষক মহাশয় ছিলেন গ্রামীণ সমিতির একজন কর্মচারী। কোন কোন জায়গায় শিক্ষক মহাশয়কে নিষ্কর জমী দেওয়া হইত। আবার কোন কোন জায়গায় উৎপন্ন শস্যের একটা অংশ দেওয়া হইত।

প্রথম যুগে কেবল ব্রাহ্মণেরাই শিক্ষকতা করিতেন। শিক্ষক মহাশয়ের একটি প্রধান কর্তব্য ছিল গ্রামের লোকের মঙ্গলের জন্য গ্রামদেবতার নিত্য পূজা করা। তাঁহার দ্বিতীয় কাজ ছিল গ্রামের উচ্চশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষাদান করার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক শিক্ষাদান করা। উচ্চশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রদের ব্যাকরণ, অভিধান ও সংস্কৃত কাব্য পড়ান হইত।

পাঠশালার শিক্ষকগণ ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন কিছা সিধা লইতেন। হিন্দুদিগের গ্রামে সমিতিদ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হইত এবং সেখানে শিক্ষা ছিল ধর্ম-নিরপেক্ষ।

আর্যগণ যখন ভারতের দক্ষিণ ও পূর্বদিকে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন তখন তাঁহারা সেই সকল অঞ্চলের অধিবাসী অনার্যদের নিজেদের মধ্যে লইয়া আসিয়া হিন্দু ধর্মাবলম্বী করেন। হিন্দুদিগের দেবদেবীর সহিত অনার্যদের দেবদেবীও পূজিত হইতে লাগিল ও অনার্যগণ আর্যগণের সহিত মিলিত হইয়া এক নূতন জাতির সৃষ্টি করিল।

অনার্যদের মধ্যে যাহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত ছিল, তাহাদের হিন্দুসমাজের উন্নত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। গ্রাম্য পাঠশালাগুলি উচ্চ শ্রেণীভুক্ত সকল ছাত্রের জন্য উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু নীচু জাতি, অস্পৃশ্য ও আদিবাসীদের সন্তানদের এই পাঠশালায় প্রবেশাধিকার ছিল না। ভারতে শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করিলে এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না যাহাতে বলা যাইতে পারে যে, নিম্ন শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতে ছিল।

প্রাচীন ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মের কোন স্থান ছিল না। ইহা অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে পারে। ইহার কারণ এই যে যদিও পুরোহিতই গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষক ছিলেন তথাপি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য শ্রেণীর ছাত্রদের

শাস্ত্র শিক্ষা দিবার অধিকার তাঁহার ছিল না। পাঠশালাগুলি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য উচ্চজাতির ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এই কারণেই সেখানে ধর্মশিক্ষা দেওয়া সম্ভব হইত না। তবে বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রার্থনার ব্যবস্থা ছিল এবং নীতিশিক্ষাও দেওয়া হইত।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদের কঠোরতা হ্রাস পায় এবং শিক্ষায় ধর্ম্ম নিরপেক্ষতার উপর আরও জোর দেওয়া হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধির ফলে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের আধিপত্য কমিয়া আসে। এমন হইতে দেখা যায় যে পূর্ব্বে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ পুরোহিতই শিক্ষকের কার্য্য করিতেন কিন্তু পরে সেই প্রথা রহিত হইয়া ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিরাও শিক্ষকতার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরিবর্ত্তন বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব কমিয়া যাওয়ার পরও ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অঙ্গরূপে পরিগণিত হইল। আজও তাহা অপরিবর্ত্তিতরূপে চলিয়া আসিতেছে।

পুস্তক-পরিচয়

শিশু মনের সহজ কথা ঃ দীপিকা পাল। মূল্য : দুই টাকা।

Child is the father of the man. আজকের শিশুই আগামীকালের মানুষ হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করবে। কাজেই শিশুকে শিশু বলে উপেক্ষা করার মধ্যে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই বরঞ্চ ভবিষ্যতের মানুষ হিসেবে সে যাতে প্রতিষ্ঠিত ও আত্ম-নির্ভরশীল হ'তে পারে তার জন্যে প্রথম থেকেই গড়ে তোলার কাজে আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত।

শ্রীমতী দীপিকা পাল শিশুশিক্ষার প্রকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করে একটি প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য পালন করেছেন। একশ' পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটিতে লেখিকা বংশগতি, পরিবেশ (heridity aud environments), শিক্ষা ও শিশু-মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। বস্তুতঃ অবাধ্য ও দুরন্ত শিশুকে শাসন করা অনেক বাপমা'র কাছেই এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। শ্রীমতী পাল তাঁর ঝরঝরে ভাষায় এই সমস্যাকে সমাধান করেছেন : তাঁর বইখানি বাংলাদেশের বাপ মায়ের কাছে একখানি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বই হ'য়ে উঠবে বলে মনে করি।

অধ্যাপক শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র'র মূল্যবান ভূমিকাটিও এই পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন।

—সাধনা অধিকারী।

ম্যাক্‌ডুগাল ও 'হরমিক' মনোবিদ্যা

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ॥ এম.এ., বি.টি., ডি, এস্. ই

অন্যান্য তত্ত্ব (ক) গণমন সম্বন্ধে :

এই সেন্টিমেন্টের তত্ত্ব ছাড়াও মনোবিদ্যায় ম্যাক্‌ডুগালের অনেক দান আছে। "গণমন" সম্বন্ধে আজকাল অনেকেই অনেক কথা কহিয়া থাকেন। এই গণ-মন সম্বন্ধেও তিনি তাঁহার "Groupmind" (1920) নামক গ্রন্থে মূল্যবান্ কথা বলিয়াছেন। লি বো (Le Bon) প্রভৃতি অনেকেই গণ-মন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মনে হয় ম্যাক্‌ডুগালের আলোচনা আরও ব্যাপক এবং যুক্তির পারম্পর্যে সুন্দরতর। জনতার গণনের যুক্তিহীন অভিব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া "সংঘচেতনা" "সংঘানুভূতি" "সংঘাদর্শ" বিভাবে ক্রমশঃ "জাতীয়তা-বোধ" প্রভৃতিতে পরিণত হয়, তাহাও ম্যাক্‌ডুগাল অপূর্ব কৃতিত্বের সহিত দেখাইয়াছেন।

(খ) সমাজ বিজ্ঞান সম্বন্ধে :

তাঁহার পরবর্তী রচনা "National welfare and national Decay" নামক পুস্তকে তিনি তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা-লব্ধ তথ্যগুলিকে সমাজতত্ত্ব Eugenics প্রভৃতির সমস্যা সমাধানের জন্য কাজে লাগাইয়া ছিলেন।

(গ) বংশগতি ও অর্জিত বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণ সম্বন্ধে :

বংশগতি (heredity) ও অর্জিত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও তাঁহার গবেষণার অবদান সামান্য নহে। বিবর্তনবাদী পণ্ডিত ল্যামার্ক বলিয়াছিলেন যে, প্রাণীজগতের মধ্যে এমন একটা জীবন-প্রেরণা (Life-urge) কাজ করিতেছে, যাহার ফলে প্রাণীদের বিবর্তন ঘটে। অতীত যুগে হয়ত একদিন খাদ্যের প্রয়োজনে হরিণ জাতীয় কোনও প্রাণী দীর্ঘতর গ্রীবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিল। ফলে সৃষ্ট হইয়াছিল "জিরাফ" নামক প্রাণী। পরে এই দীর্ঘ-গ্রীব প্রাণীর বংশধরেরা আজও তাহাদের গ্রীবাটি রাখিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ গ্রীবার দীর্ঘতর রূপ বৈশিষ্ট্যটি তাহাদের বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হইয়াছে। ম্যাক্‌ডুগাল এই সঞ্চারণে বিশ্বাস করিতেন। এই ব্যাপারে তিনি ২৩ পুরুষ ধরিয়া শিক্ষিত ইঁদুর লইয়া পরীক্ষা চালান। কতকগুলি ইঁদুরকে জলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া বিভিন্ন পথ দিয়া পলায়নের সুযোগ দেওয়া হইত। কয়েকটি পথ দিয়া যাইলে বৈদ্যুতিক শক্ লাগিত। ক্রমাগত ভুল করিতে করিতে ইঁদুরগুলি নিরাপদ পথগুলি বাছিয়া লইবার কৌশল আয়ত্ত করিল। পরে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইল যে তাহাদের পুত্র-পৌত্রদের মধ্যেও ঐ কৌশলটি সঞ্চারিত হয় কিনা। তেইশ (২৩) পুরুষ ধরিয়া পরীক্ষা চলিল। দেখা যাইল পরবর্তী বংশের ইঁদুরগুলির ভুলের সংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। ২৩ (তেইশ) পুরুষ পরে দেখা যাইল, যে ইঁদুরের পূর্ব পুরুষদের শিক্ষা দেওয়া হয় নাই, তাহাদের ভুলের সংখ্যা ছিল গড়ে ১৭৩, অথচ ট্রেনিং প্রাপ্ত ইঁদুরের বংশধরদিগের ভুলের গড় হইয়াছে ২৫ মাত্র।

(ঘ) অস্বভাবী মনোবিদ্যা সম্বন্ধে :

অস্বভাবী মনোবিদ্যা (Abnormal Psychology) সম্বন্ধেও ম্যাক্‌ডুগালের নিজস্ব মতবাদ আছে। তাঁহার "Out line of Abnormal Psychology" নামক গ্রন্থে (১৯২৬) তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

কিন্তু ম্যাক্‌ডুগালের শ্রেষ্ঠ পরিচয় অন্বয়ী মনোবিদ্ হিসাবে নহে, আধ্যাত্মিক মনোবিদ্ হিসাবেও নহে, মন-মনের ব্যাখ্যাতা হিসাবেও নহে, প্রাণিতাত্ত্বিক মনোবিদ্ হিসাবেও ততটা নহে, যতটা হইতেছে সমাজতাত্ত্বিক মনোবিদ্ হিসাবে। বহু গ্রন্থের লেখক হইলেও মনস্তত্ত্বে তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবদান হইতেছে "Introduction to Social Psychology"। এই গ্রন্থটির যত সংস্করণ হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত অন্য কোনও মনোবিদ্যার গ্রন্থের তত-গুলি সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। এই গ্রন্থেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাঁহার "হরমিক্" মতবাদ, এই গ্রন্থেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে সহজাত প্রবৃত্তি সম্বন্ধে সুনিপুণ ও মার্মিক তত্ত্ব, এই গ্রন্থেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাঁহার সেন্টিমেন্ট্ তত্ত্ব এবং সেন্টিমেন্টের পদক্রমিক বিবর্ত্তনে (hierarchic evolution) "আমিত্ববোধ", "নীতিবোধ", চরিত্র, বিবেক, প্রভৃতির সুনিপুণ ও সার্থক আলোচনা।

জয়পরাজয় ও পরিণাম-স্বীকৃতি :

ম্যাক্‌ডুগালের প্রবৃত্তিবাদ বিশেষতঃ প্রবৃত্তির সহিত প্রক্ষোভের (emotion) অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক লইয়া অনেক বাক্‌বিতণ্ডা ও সমালোচনা হইয়াছে বটে এবং এই প্রবৃত্তির অনেক কথাই হয়ত খণ্ডিতও হইয়াছে, আমেরিকার চেষ্টিতবাদী মনোবিদ্‌গণ ত প্রবৃত্তি শব্দটিকেই মনোবিদ্যার শাস্ত্র হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও ম্যাক্‌ডুগালের "হরমিক" মতবাদ বা "উদ্দেশ্যবাদ" খণ্ডিত হয় নাই। খণ্ডসংঘাতে পরাজিত হইলেও তাহা যুদ্ধ-জয়ী হইয়াছে। তাঁহার হরমিক মতবাদ তাঁহার শত্রুদল কর্ত্তৃক পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। চেষ্টিতবাদী Edward Chace Tolman (জন্ম ১৮৮৬) ত নিজের মতবাদকে "Purposive behaviourism" (or "উদ্দেশ্যমূলী-চেষ্টিতবাদ") বলিয়াই আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার "Purposive behaviour in animals and man" নামক গ্রন্থে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে এই "উদ্দেশ্য-মূলী চেষ্টিতবাদের" সূচনা হয়। পরে এই উদ্দেশ্যমূখিতাকে অন্যান্য অনেক চেষ্টিতবাদী পণ্ডিতই স্বীকার করিয়াছেন।

ম্যাক্‌ডুগাল প্রায় দিয়া দৃষ্টি দিয়াই তাঁহার এই অভিমত স্বীকৃতির কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দেই লিখিয়াছিলেন,

"Fifteen years ago American psychologists displayed almost without exception a complete blindness to the most peculiar, characteristic and important feature of human and animal activity, namely its goal-seeking. All bodily actions and all phases of experience were mechanical reactions to stimuli……Now happily, all is changed ; the animal psychologists…are busy with the study of 'drives' 'sets' and 'incentives' Much the same state of affairs prevails in current American writings on human psychology · American psychology has become purposive · in the vague sence.',

অর্থাৎ "পনের বছর পূর্ব্বে আমেরিকার প্রায় সমস্ত মনোবিদ্‌গণই প্রাণী ও মানুষের আচরণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যটি অর্থাৎ উদ্দেশ্য-মুখিতা সম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন। তখন সমস্ত শারীরিক ক্রিয়া-কর্ম্মকেই যান্ত্রিক উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া (stimulus response) হিসাবে ব্যাখ্যা করা হইত। সুখের কথা বর্ত্তমানে এই সবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সমস্ত "প্রাণি-মনোবিদ্"গণ এখন নোদনা (drive), বিন্যাস (set), প্রয়োজক (incentive) লইয়া গবেষণায় ব্যস্ত। মার্কিন মনোবিদ্‌গণের বর্ত্তমান "মনুষ্য-মনোবিদ্যা"র (human psychology) আলোচনাতেও এই অবস্থাই চলিতেছে …. আমেরিকার মনোবিদ্যা এখন উদ্দেশ্য-মুখিতাকে অস্পষ্ট স্বীকৃতি দিয়াছে"।

মনস্তত্ত্বে উদ্দেশ্য-মুখিতাকে অস্পষ্ট স্বীকৃতি দিলেও অধিকাংশ মার্কিন চেষ্টিত-বাদীই প্রাণীদের উদ্দেশ্যমূখী আচরণের যেন একটা যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহাদের

মতে ক্ষুধার সময় খাদ্য সংগ্রহ বা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় যৌন কামনার ক্রিয়া কলাপ প্রভৃতি শুধু "তন্তুর প্রয়োজন" (tissue needs) মাত্র। প্রাণীদের খাদ্যের প্রয়োজন বা যৌন কামনার প্রেরণাটা যেন যন্ত্রের পেট্রোল গ্রহণ করিবার (বা মবিল্ গ্রহণ করিবার) বা গ্যাস ছাড়িবার প্রয়োজনের মত ব্যাপার।

ম্যাকৃডুগাল এই মতবাদের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস ও প্রচার করিয়াছেন যে প্রাণীদের সমস্ত কাজ-কর্মের-ই মূলে আছে একটা চিৎ শক্তির লীলা, একটা উদ্দেশ্যমুখিতা, একটা "উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তন"; তাহা নিছক যান্ত্রিক কার্য্য কারণ মাত্র (mechanical causation) নহে।

উপসংহার

ম্যাকৃডুগালের এই মতবাদের মধ্যে জড়বাদী মনোবিদ্গণ একটা কল্পনা বিলাসের বা আধ্যাত্মিকতার গন্ধ পাইয়া ছিলেন। তাই তাঁহারা ম্যাকৃডুগালকে তেমন ভাবে স্বীকৃতি দিতে চাহেন নাই। আমেরিকান্ প্রবাদীতে ম্যাকৃডুগালের প্রশস্তি বা সমর্থন সূচক লেখা বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না, প্রমাণ হিসাবে তাঁহার উদ্ধৃতিও বড় একটা নজরে পড়ে না।

পণ্ডিতমণ্ডলে তিনি যে তাঁহার ন্যায্য স্বীকৃতিটুকু পান নাই, তাহার জন্য হয়ত অন্যতর কারণও আছে। অপরের সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার অকপট স্পষ্টবাদিতা ও সালঙ্কার অত্যুক্তিও হয়ত তাঁহার পক্ষ সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল।

মনোবিদ্যার বিভিন্ন পথ ও পথিকৃৎ সম্বন্ধে তাঁহার দুই একটি মন্তব্য লক্ষণীয়—

ফ্রয়েড সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে ফ্রয়েড যাহা করিয়াছেন, এ্যারিষ্টটলের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত কেহই তত্টা করিতে পারেন নাই,···তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে মূল্যবান্ তথ্য অনেক আছে, খানিকটা সত্যও আছে। তাহা হইলেও আমার মনে হয় প্রত্যেক সত্যটির সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে ভ্রান্তিও মিশিয়া আছে।"

Wundt-এর (১৮৩২-১৯২০) "Outline of Psychology" সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন "এটি হইতেছে পাণ্ডিত্যাভিমানের পঙ্কিল প্রান্তর (quagmire of pedantry), ভ্রান্তি ও বৃথামার সমবায়ী পিণ্ড (a mass of confusion and error)। ইহার মধ্যে আত্মার সামঞ্জস্যের সাধারণ গুণটিও লক্ষিত হয় না।"

গেস্টাল্ট্ মতবাদ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন "(ইহার) নামের মধ্যে নূতনত্ব আছে, তবে ইহার তত্ত্বগুলি বহু দিন হইতেই স্বীকৃত ও পরিচিত।"

Watson সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,

"আমার মনে হয় ডাঃ ওয়াট্সন্ হইতেছেন ভুল পথে চলা কাল লোক, একজন দুঃসাহসী পথিকৃৎ; তিনি সংস্কারের উন্মত্ততায় দিশাহারা হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত খানায় পড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যের দল যখন তাঁহার জয় গান করিতে করিতে গর্ত্তে ঝাঁপ দিতেছে, তখন তাঁহার প্রয়োজন ছিল একটা নৈতিক সাহসের, যাহার বলে তিনি আবার উপরে উঠিয়া ধূলা কাদা ঝাড়িয়া ফেলিতে পারেন।"

এই জাতীয় দম্ভোক্তি মানুষকে জনপ্রিয় করিতে পারে না। ফলে ম্যাকৃডুগালও গণ-স্বীকৃতির ভোট লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি নিজে এই গণ-স্বীকৃতিটা একান্ত ভাবেই কামনা করিতেন। তাঁহার আত্মজীবনীতে তিনি সমকর্মী মনোবিদ্গণের নিকট হইতে এবং জনসাধারণের নিকট হইতে এই স্বীকৃতির জন্য ব্যাকুলতা জানাইয়া ছিলেন এবং তাঁহার খানিকটা যশোদৈন্যের জন্য দুঃখ প্রকাশও করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যশের দিক হইতে তিনি তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য পান নাই। উড্ওয়ার্থের মতে মনোবিদ্যার আলোচনার সময় মনোবিদ্যার সীমারেখা অতিক্রম করিয়া দর্শনের রাজ্যে পদক্ষেপ করিবার জন্যই তাঁহার জনপ্রিয়তা বিঘ্নিত হইয়াছে।

আমাদের মনে হয় একথা খানিকটা সত্য হইলেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ফ্রয়েড মুখ প্রভৃতি অনেক মনোবিদ্গণের আলোচনার মধ্যেই তত্ত্বপ্রিয়তা ও দার্শনিকতা অল্প ছিল না। প্রতিপক্ষ পণ্ডিতদের প্রতি কঠোর মন্তব্য অনেকেই করিয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের গণ-স্বীকৃতি ঘটেই হইয়াছে। ম্যাকৃডুগালের ক্ষেত্রে তত্টা হয় নাই। আসল কথা বোধ হয় "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র।"

তামিল বৈষ্ণব কবি আণ্ডাল

অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

(২)

অতঃপর কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহার প্রতি গোপ-কুমারীদের নিবেদন। এই প্রসঙ্গে আমরা কেবল একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি—"আমরা জাতিতে গোপ; গোপ-কুলের পশ্চাতে বনে গিয়া সেখানেই আমরা আহার করি। আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। এইরূপ জ্ঞানহীন গোপ কুলে যে তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ইহা আমাদের বহু পুণ্যের ফল। হে সর্বদোষবিরহিত গোবিন্দ, তোমার সহিত আমাদের যে সম্পর্ক, ইহলোকে তাহা কখনও ছিন্ন হইবার নয়। অবোধ শিশুর মতো আমরা যদি ভালবাসিয়া তোমাকে ক্ষুদ্র নামে ডাকিয়া থাকি, তুমি ঘৃণা করিয়া রাগ করিও না। হে প্রভু, তুমি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর।" [১৩]

'তিরুপ্‌পাবৈ' কাব্যে আণ্ডাল গোপকুমারীদের কথাই বলিয়াছেন, আত্মকথা কিছু বলেন নাই। অবশ্য কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার কবিকে গোপরমণীদের অন্যতম কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। তৎসত্ত্বেও 'তিরুপ্‌পাবৈ'কে কবির ব্যক্তিগত জীবনের কাব্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। আণ্ডালের নিজস্ব কথা একান্ত করিয়া বলা হইয়াছে তাঁহার "নাচ্চিয়ার্ তিরুমোলি" (অর্থাৎ নায়িকার কথা) নামক কাব্যে। 'নায়িকার কথা'য় কবিই স্বয়ং নায়িকা। এই নায়িকা-কবির জীবন-কথা তেলুগু ভাষায় সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন ষোড়শ শতাব্দীর রাজ-কবি কৃষ্ণদেব রায় তাঁহার 'আমুক্তমাল্যদা' নামক গ্রন্থে। 'নাচ্চিয়ার্ তিরুমোলি' কাহিনী-কাব্য না হইলেও ইহার মধ্যে কৃষ্ণ-প্রণয়িনী আণ্ডালের প্রেমাকাঙ্ক্ষা চমৎকার রসরূপ লাভ করিয়াছে। মোট ১৪৩টি পদের মধ্যে আমরা মাত্র ৭.৮টি পদ উদ্ধৃত করিয়া বিষয়টির একটু আভাস পাওয়ার চেষ্টা করিব।

কবি যৌবনে পদার্পণ করিলে তাঁহার পালক-পিতা পেরিয়ালোয়ার্ বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কৃষ্ণপ্রেম-পাগলিনী আণ্ডালের পক্ষে কোনো মর্ত্যবাসীকে বিবাহ করা যে সম্ভব হইবে না একথা পিতাকে জানাইয়া দিতে তাঁহার কোনো কুণ্ঠাবোধ হইল না। প্রভু কৃষ্ণই যাহার পতি, রক্ত মাংসের মানুষে তাঁহার প্রয়োজন কী? এই প্রসঙ্গে মন্মথের উদ্দেশে বলা কবির একটি প্রসিদ্ধ পদ দেওয়া হইল—"স্বর্গবাসী দেবতাদের উদ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞের যে হবি নিদিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা বনে-জঙ্গলে বিচরণকারী শৃগাল আসিয়া ডিঙিয়া গেলে যেরূপ হয়, সেইরূপ শঙ্খচক্রধারী বিষ্ণুর জন্য আমার যে স্তনযুগল বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহা যদি মানুষেরই ভোগে লাগিয়া যায়, তবে হে মন্মথ, আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত। (১৪)

প্রিয়-দেবতার সংস্পর্শ কিরূপ মধুর লাগিবে সেই চিন্তায় কবি বিভোর। কিন্তু কাহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করা যায়, কাহারই বা সে অভিজ্ঞতা হইয়াছে? শঙ্খধারী

---

(১৩) করবৈকল্ সিন্ চেত্ কাদল্ চেয়ল্ উমবোল্;
অরিবোড়ু ইরাদ আর্ক্কুলত্তু উন্ তন্নৈ
পিরবি পেরুম্ তনৈ পুল্লুম্ বায্ উট্রেরোম্;
কুট্টু নোড়ু ইরাদ গোবিন্দা! উন্ অন্রোদু
উন্নৈপ্ পলহু ইন্নু ওলিক্ ওলিয়াদ;
অরিয়াদ পিন্নৈকলোম্ অন্বিনাল্ উন্তোট্রে,
চিন্নঞ্ চিরুপেরুমুন্ চীরিয়রুলাদে:
ইন্নৈ।। নী আরাল্ পরৈ, এলোরেম্পাবম্।। পাসম ১৮।

(১৪) যাদিটৈ যাগুল্ অন্ যাবরক্কু
মরৈয়বন্ কোল্‌বিদিল্ বযুত্ত অবি,
কাদিট্টৈ তিরিযবোল্ যরি পুল্লুম্
কডন্দন্দু গোমান্ চেয়ন্দ ওম্ম
উদিট্টু আলিনগুল্ উযন্দন্দু কুত্ত
উদিন্দু এলুন্দ এন্ তডমুলৈকল্
যাদিকন্দু এন্ত পেচ্চুগিল্
যারুকিরেন্ কডার্ মন্নবনে (১৪)

দেবতার কথা শঙ্খই বলিতে পারে ভাবিয়া আণ্ডাল তাহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া চলিলেন। একটি পদ এইরূপ: হে সমুদ্রজাত শুভ্র শঙ্খ, আমি গভীর তৃষ্ণা লইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি উত্তর দাও। আমার মাধবের অধরের স্বাদ কিরূপ? তাহা কি কর্পূরের মতো সুগন্ধি অথবা পদ্ম ফুলের মতো? সেই প্রবাল-সদৃশ অধরের মাধুর্যই বা কিরূপ?" [১৪]

প্রিয়-বিরহের বেদনায় অধীর হইয়া কবি কখনো দূতরূপে পাঠাইতেছেন কোকিলকে, কখনো বা প্রেরিত বিরহ-বার্তাবাহী মেঘকে। কোকিলকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"হে কোকিল, নবগন্ধযুক্ত পুষ্পিত উদ্যানে প্রেমিকার সঙ্গে তোমার দিন কাটে ভ্রমরের মধুর রাগিনী শুনিয়া। তুমি আমার কালোমাণিককে (কৃষ্ণকে) একবার আসিতে বলিও। আমার অস্থি গলিয়া যাইতেছে। আমার দুই চোখের পাতা বহুদিন যাবৎ এক হয় নাই। দুঃখ-সাগরে ডুবিয়া আমি বিকুরুণী তরণী না পাইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া মরিতেছি। প্রেমিকের কাছ হইতে দূরে থাকার যে বেদনা, হে কোকিল, তাহা তুমিও তো জানো। সেই স্বর্ণকান্তি গরুড়-ধ্বজকে একবার আমার কাছে আসিতে বলিও।" [১৬]

বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশে অবস্থিত বেঙ্কটাচলকে এক সময়ে তামিলনাদের সীমা বলিয়া ধরা হইত। বস্তুতঃ তামিল বৈষ্ণব সাহিত্যে বেঙ্কটাচল এবং তাহার দেবতা তিরুপতির বিবরণ যথেষ্টই পাওয়া যায়। বৈষ্ণব জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ এই বেঙ্কটগিরির মেঘসমূহকে সম্বোধন করিয়া কবি যাহা বলিয়াছেন তাহা যথার্থই হৃদয়স্পর্শী।—"হে মত্তহস্তী সদৃশ মেঘ, তুমি তো বেঙ্কটপর্বতকেই তোমার বাসস্থানরূপে বাছিয়া লইয়াছ। আমার প্রভুর খবর কী? তিনি কী উত্তর দিয়াছেন? দেখ মেঘ, যিনি সমস্ত জগতের আশ্রয়, তিনি কোনো বিচার বিবেচনা না করিয়াই একটি নারী-সতিকার মৃত্যু ঘটাইয়াছেন, একথা শুনিলে জগদ্বাসী তাঁহার গুণকীর্তন করিবে না।" [১৭]

যাহার সহিত বাস্তব মিলন ঘটে না, অগত্যা স্বপ্নের মধ্য দিয়াই তাহার সংসর্গজাতের আনন্দ ভোগ করিতে হয়। আণ্ডালের এইরূপ কয়েকটি পদ আছে যাহা স্বপ্ন-সম্মিলন পর্যায়ে স্থান পাইবে। স্বপ্নদর্শনের পরবর্তী দিন প্রাতে কবি-নায়িকা তাঁহার পূর্বরাত্রির অভিজ্ঞতার বর্ণনা-প্রসঙ্গে সখীর কাছে বলিতেছেন—"হে সখি, ইন্দ্র সমেত সমস্ত দেবতারা আসিয়া মন্ত্র পাঠের দ্বারা আমার সম্বন্ধের কথা পাকা করিলেন; আমাকে নববস্ত্র পরানো হইল; পার্বতী-দেবী আমাকে বিবাহ-মাল্যে ভূষিত করিলেন—এইরূপ আমি স্বপ্ন দেখিলাম। আমি স্বপ্ন দেখিলাম, মৃদঙ্গ বাজিয়া উঠিয়াছে, মধুর শঙ্খধ্বনি শোনা যাইতেছে, এবং মুক্তা-জালের শোভিত চন্দ্রাতপের নীচে আমার স্বামী মধুসূদন আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করিলেন। আমি স্বপ্ন দেখিলাম, শুকণ্ঠে বেদপাঠ হইতেছে, বৃত্ত আঁকিয়া তাহাতে সযত্ন দূর্বা স্থাপিত হইল, এবং তারপরে গজেন্দ্র-

(১৫) কর্পূরম্ নাললো? কমলপ্পূ নাললো?
তিরুপ্পবলক্ কেলবায়্ত্তান্ তিরিন্দু ইরুক্কুমো?
মরুন্দু ওরিন্দ মাধবন্তন্ বায়্চ্ চুবৈযুম্ নাট্রমুম্
বিরুন্দু উন্ কেট্ কিডন্দান্: কোল্, আরিবেন্ নংগাই। (৭১)

(১৬) পোদলর্ কাবিন্ পুন্নলর্ নাগপ্ পোরিবণ্ডিন্ কালনৈ,
কানলিয়োডন্ বাল্ ছুডিলে। এন্ করুমাণিক্কম্ করুত্তুবায়্,
এনরুরৈপ্পি, ইরৈক্কুম্ নেরুম্ নংকলিনৈ পোরুত্তা পল নাদুম্,
পুনরুক্কন্দ পুহু বৈকুন্দন্ এন্নপ্পার্ত্তো মিগ উরৈত্তিডুম্:
অন্দুরৈত্তলাগিলে, নিরিন্দু পোন্দ নীন্দু অরিদি ছুডিলে!
পোন্দুরৈয় মেনিন্ কলন্দ কোডিযুডৈপ্ পুরিযৈ করুত্তু কুবায়্।
—(৫—৩১)

(১৭) মরুবাদৈ পোন্ এন্নুম মা মুনিবর্কাল্!
বেঙ্কটত্তুপ্
পরিবাক বাল্গিরিক্কাল্! পারিডৈয়ান্
যার্কে এরে?
"কনি এন্দুন্ তামাযান্ কারণত্তাল্
ওরুপেন্ কোলিযৈ
মনৈ চেন্ড্রান্ এন্দুন্ চোল্
বৈয়কত্তার্ মদিয়ারে।
—৮৯

সদৃশ বিষ্ণুও আসিয়া আমার হাত দু'খানি ধরিয়া প্রদক্ষিণ করিলেন।" [১৮]

তামিল বৈষ্ণব সাহিত্যে অন্য কবির অনাবিল গৌরব থাকিতে পারে, কিন্তু শ্রিয় ও দেবতার ব্যবধান ঘুচাইয়া উভয়কে একই আসনে অধিষ্ঠিত করার গৌরব মহিলা কবি আণ্ডালেরই প্রাপ্য। ভক্তির দেবতাকে প্রেমের নায়ক করিয়া তিনি যে তাঁহার কণ্ঠে বরমালা অর্পণ করিয়াছেন, তাহা কেবল তামিল সাহিত্যের সামগ্রী নয়, আমরা তাহাকে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া মনে করি।

ইন্দ্রন্ ঈরিট্ট দেবর্ কুলর্ এল্লাম্
বন্দিরুন্দু এরৈ মকট্পেট্রি বলিসেয়
মন্দিরক্ কোডি উডুত্তি মরবালৈ
অন্দরি চূট্টক্ কণ্ডাক্কডেন্ তোলী বান্।
মন্দলন্ কোট্ট, মরিমদ্দন্ নিত্তিল,
মুন্দুটৈত্ তাদ নিরৈ তামুম পল্লন্ কৌল্
মৈন্দুনন্ নমি মদুরৈন্ মন্ এরৈক
কৈন্দলন্ পট্টক্ কণ্ডাক্ কডেন্ তোলী বন্।
বান্ বন্দার্ নম্ম মরৈত্তি, মরবাল্
পাদিনৈ আবল্ পড়ুত্তল্ পরিদি বৈত্
তান্ চিল মা-কলিক্ কণ্ডান্ এন্ কৈপ্ পট্রি
তীন্দন্ চেয়্দক্ কণ্ডাক্ কডেন্ তোলী বান্।

(৬-৩, ৩, ৭)

পথিক

॥ শ্রীঅরুণবরণ চক্রবর্তী ॥

"পথের কি শেষ নেই? কতদূর? আর কতদূর?"
শ্রান্ত পথিকের কণ্ঠে বেজে ওঠে হাহাকার সুর।
যাত্রা তার কবে সুরু হয়েছিলো তাও সে জানে না—
পিছনের হাতছানি শুধু তারে পশ্চাতে টানে না।

সুন্দর আকাশে যত আশার তারকা—ইসারায়
একটানা বলে যায়, "ওরে, চলে আয়, চলে আয়।"
পথিক এগিয়ে চলে। যখন ক্লান্তির ভারে নত,
নৈরাশ্য তখনি ঘেরে: দেহমন হয় শত ক্ষত।

অনন্ত কালের গতি: এই সীমানার রেখা দিয়ে
জীবনও সীমিত নয়: আহরিত সব বোঝা নিয়ে
একটি ষ্টেসন হতে আরেক ষ্টেসনে যাত্রা তার:
জাহাজ চলেছে যেন পেরিয়ে সমুদ্র পারাবার।
হে পথিক, ক্লান্ত কেন? জাহাজেই আছো, দুপায়ের
সবল ঐশ্বর্য দিয়ে ভরে নাও কাঁপি হৃদয়ের।

বাংলা আধুনিক লিরিকের জন্ম

॥ শ্রীঅম্বুজ বসু ॥

আধুনিকতার কোনো স্থির সংজ্ঞা নেই, তাই প্রয়োজন মতো তার সীমারেখা চিহ্নিত করে নিতে হয়। এই আধুনিকতার সামান্য লক্ষণটি রবীন্দ্রনাথ বিদেশী কাব্যের আলোচনাক্রমে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে, কবিতা আপন গতিপথে যখন বাঁক নেয় সেই নোতুন বাঁকের লেখাকেই বলি আধুনিক।

বুদ্ধদেব বসুর আধুনিকত্বের সংজ্ঞা আলাদা। যার আবেদন শাশ্বত তাকেই তিনি আধুনিক বলেন। সেই হিসাবে চণ্ডীদাসের পদও আধুনিক এবং মেঘনাদবধ কাব্যও আধুনিক। কথাটি চমকপ্রদ বটে কিন্তু অর্থহীন। কারণ আধুনিক শব্দটির মধ্যে কালচেতনা অবশ্যই নিহিত আছে। যা কালোত্তীর্ণ তাকে আমরা মহৎ কবিতা বলতে পারি, আধুনিক কবিতা বলবো না। আবার যা আধুনিক কবিতা, অর্থাৎ এ যুগের বিশেষ সমস্যা, চেতনা এবং লক্ষণে চিহ্নিত, তার সবই কালোত্তীর্ণ হবে এমন আশা অল্প।

এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের উপমাটি অনেক বেশি সার্থক। নদীর জল, জলের স্রোতটি শাশ্বত; কিন্তু তার রঙ, তার তটরেখা, তার বিশিষ্ট রূপ নির্ভর করে বিশেষ দেশকালের মৃত্তিকার বিশেষত্বের উপর। নদী যেমন বাঁক ফেরে বাইরের পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে তারপর আপন স্রোতোবেগেই আপন পথ কেটে চলে, তেমনি প্রতিভা, যুগ ও জীবন সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দেয় বটে; কিন্তু তার পর তার চলার বেগ নিজের থেকেই সঞ্চিত হয়ে ওঠে।

বাংলা কাব্য শেষ কবে এরকম মোড় ফিরেছে? এই মোড় ফেরার প্রমাণ এবং লক্ষণ কি? এমন জিজ্ঞাসার জবাব এককথায় দেওয়া যায় না, গেলেও তার মধ্যে অনেক কথা না-বলা থেকে যায় যার কোন সময় বিশেষে অভিধেয় হয়ে উঠতে পারে।

এই জন্যে ইংরাজী সাহিত্যে শতাব্দী ধরে যুগবিচারের রেওয়াজ আছে। প্রতিটি শতাব্দীর একটা বিশিষ্ট ভাব-ধারা, একটা চেতনাগত স্বকীয়তা, কতকগুলি স্বতন্ত্র লক্ষণ থাকেই। সেই লক্ষণগুলি আবিষ্কার করলেই সাহিত্যের একটা রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রশ্নকে পাশ কাটানোর এই পথ সহজ বলেই সাহিত্য-জিজ্ঞাসুর পক্ষে বর্জনীয়। সাহিত্যের বাহ্যলক্ষণ ও রূপরীতি জেনে তো লাভ নেই। তার অন্তঃশীলা প্রকৃতি ও গতিমুখ আবিষ্কারেই তার জীবনছন্দ উদ্ঘাটিত হবে।

উনিশ শতকের সঙ্গে বিশ শতকের বাংলা কাব্যের যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে তা হলো উনিশ শতক খণ্ডকাব্য ও মহাকাব্যের যুগ, বিশ শতক লিরিক কবিতার। কিন্তু কাব্যতত্ত্বজ্ঞরা বলবেন 'এহ বাহ্য'। কারণ ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ওই মহাকাব্যের যুগটাই একটা প্রক্ষিপ্ত যুগ। বাংলা কাব্যপ্রবাহের অগ্রগতির ধারাপথে এর কোনো সম্ভাবনা ছিলনা। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যজাতীয় যে সব কাহিনীকাব্যের নিদর্শন পাওয়া যায়—তার গোত্র এবং স্বরূপ একান্তই ভিন্ন, উপরন্তু ভারতচন্দ্রের হাতে তার চরম পরিণতি তথা পরিসমাপ্তি হয়েছিল। এই ধারা লোপ হলো কারণ গোটা প্রাচীন সমাজ কাঠামোই ভেঙে গেছে। প্রাচীন গ্রামীণ আধা-বর্বর গোষ্ঠী-ব্যবস্থা লোপ হয়েছে। যৌথ পরিবারের বদলে ব্যক্তিচেতনা ও আত্মস্বাতন্ত্র্য-বোধ স্থান করে নিচ্ছে। শিক্ষা এবং অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার প্রসার হচ্ছে, সমাজতন্ত্র ভেঙে পড়ছে। অর্থাৎ লিরিক কবিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে।

এই সূচনা পর্বের প্রমাণ হিসাবে দুটি তথ্য উল্লেখ করা যায়। অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের মতোই যখন চণ্ডীমঙ্গল দুর্গামঙ্গল কালিকামঙ্গল শ্রেণীর কাব্য অনাদৃত হচ্ছে তখন পাশাপাশি শাক্ত পদাবলীর উদ্ভব ও অসামান্য জনপ্রিয়তা। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন—যিনি এই উভয় জাতীয় গ্রন্থই রচনা করেছিলেন—দুই কালের সন্ধিতে দাঁড়িয়ে তিনি স্পষ্টই বুঝেছিলেন—"গ্রন্থ বাঁধে গড়াগড়ি, গানে রব মস্ত।"

বৈষ্ণব পদাবলীতেও কথঞ্চিৎ মাত্রায় লিরিক লক্ষণ ছিল কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার মতো এই নূতন শাক্ত কবিতায় 'রেজিমেন্টেশন অফ থট' নেই। ব্যক্তি অনুভূতির সুস্পষ্ট প্রকাশ সেখানে অব্যাহত, অনুভবনীয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই সময়ে এরই পাশাপাশি কবিওয়ালা দলের উদ্ভব। এই কবিওয়ালাদেরই অন্যতম উত্তরসাধক ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মানবিক মূল্য আরো স্পষ্টতর হলো। কাব্যবস্তুরও অকল্পিত প্রসার হলো।

কিন্তু তখনও সার্থক গদ্যসাহিত্য গড়ে ওঠেনি নবোদ্ভূত বাঙালী পাঠকের কাহিনী-পাঠের বুভুক্ষা তখন প্রাচীন সাহিত্যরসে তৃপ্ত হবার নয়। তখন ইউরোপীয় রোমান্টিক উপাখ্যানগুলির রসে অভিষিক্ত বাঙালী পাঠক-চিত্ত রঙ্গলালের বীরকাব্যে কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হয়েছিল। এরই পটভূমিকায় মধুসূদন তাঁর আশ্চর্য ও নিঃসঙ্গ প্রতিভায় সৃষ্টি করলেন মহাকাব্য। কাব্যে আজীবনের সাহিত্যসাধনায় তিনি ঘৃণাতিপাতী হতে পেরেছিলেন। যাতে তাজিল কালিদাস মিল্টনের প্রায় স-কালত্ব ও সগোত্রতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। প্রায় বলতে হলো এজন্যে যে, সার্থকনামা মহাকাব্য যেমন পুরা যুগের কথা বলে তেমনি কবির যুগেরও। এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়নি। এই কাব্যের পৌরাণিক কাহিনীর মর্মমূলে উনবিংশ শতাব্দীর জীবনরস ফল্গুধারার মতো বয়ে গেছে। উপরন্তু ক্লাসিককাব্যের ছিদ্র ভরিতে গেছে কবির রোমান্টিক মন—এ কাব্যে তার প্রমাণ প্রচুর। এ সব কথার বিশদ ব্যাখ্যার সুযোগ ও সার্থকতা এ প্রবন্ধে নেই। কিন্তু এই জন্যেই মেঘনাদবধের আর সত্যকারের অনুক্রম হলো না। এমন কি মাইকেলের পক্ষেও আর সম্ভব হলো না দ্বিতীয় মহাকাব্য রচনা করা। যে সব আলোচক বলেন, মাইকেল 'অলিখিত মহাকাব্যের কবি', তাঁরা ভুল করেন। কারণ অসচেতন শিল্পী মধুর পক্ষে যে যুগোত্তরণ সম্ভব ছিল, সচেতন শিল্পীর পক্ষে তার পুনর্সংঘটন অসম্ভব। তাই তাঁকে লিখতে হয়েছিল ব্রজাঙ্গনা বীরাঙ্গনা; এবং চতুর্দশপদী সনেটের কবি মধুসূদনের মহাকাব্য রচনার প্রয়াস বাতুলতা হতো। কারণ ইউরোপ প্রত্যাগত কবির মনে তখন লিরিক রস দানা বেঁধেছে।

এদিকে বাংলা দেশের পাঠক চিত্তেও তখন লিরিক মন বাসা বেঁধেছে। এই যুগপ্রবণতার বিরোধী বলেই উত্তর-মধুসূদন কোনো কাহিনী কাব্যই সার্থক হয় নি। মাইকেলের প্রজ্ঞা ও প্রতিভায় যে দুঃসাধ্য সম্ভব হয়েছিল সেই প্রজ্ঞা ও অসামান্য প্রতিভার অভাবেই পরবর্তীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তবু যে এই দুরূহ প্রয়াস হয়েছিল তার কারণ মাইকেলের প্রতিভা। প্রতিভা আছে অথচ তার প্রভাব নেই, তার অনুকৃতি নেই—এ হতেই পারে না। এমন কি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্য পরিকল্পনাতেও তাঁর প্রভাব দেখা গেছে।

অথচ সামাজিক পরিবেশের বিবর্তনের ফলে লিরিক মনের উপযোগিতা ক্রম বিবর্ধমান। এই লিরিক লক্ষণ স্পষ্টতম উনিশ শতকের শেষ পাদের কবি বিহারীলাল এবং নবীন সেনের কাব্যগুলিতে। কারণ ইতিমধ্যে উপন্যাস সাহিত্যের আবির্ভাবে কাব্যের কাহিনীগত প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাই নবীনসেনের ত্রিধাবিভক্ত মহাকাব্যে অজস্র লিরিক উচ্ছ্বাস শুধু ক্লাসিক কাব্যের রস বিপর্যয় ঘটায়নি—প্রায় দুর্বহ হয়ে উঠেছে।

সুতরাং আমাদের বিবেচনায় নবসৃষ্ট যে লিরিক কাব্যের প্রবাহটি উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে এসে অন্তর্লোতা হয়েছিল, বিশ শতকের সূচনায় তা আবার উপরে উঠে এসেছে। যদি মাইকেল মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের স্রোতধারায় মোড় ঘোরানোর চেষ্টা করে থাকেন সে প্রয়াস সার্থক হয়নি, শুধু এক নূতন যুগের

বিরাট বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। বাংলা ভাষাস্রোত এই বিশ্বে প্রবেশ করে কোথাও নিষ্ক্রমণ-পথ না পেয়ে পুরাণো স্রোতপথেই আবার বয়ে গেছে।

বিশ শতকের প্রথম দশক উনিশ শতকীয় কাব্য চেতনারই উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্য রচনা করলেও তখনও নিঃসন্দিগ্ধ প্রতিষ্ঠা পান নি। তখনো তাঁর কবিতা দুর্বোধ্যতার অভিযোগে নিন্দিত। কাব্যসৃষ্টি তখনো যথেষ্ট পরিমাণে আত্মনিষ্ঠ নয়, বেশি মাত্রায় বস্তুনিষ্ঠ। দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমমূলক এবং বিষয়-নির্ভর কবিতার আদর সর্বাধিক রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন লেখায় আবার মিষ্টিসিজমের দিকে ঝোঁক। অর্থাৎ প্রাচীন মিষ্টিক কবিতার ঐতিহ্যানুসরণ তখনো প্রবল। কবির তখনো পরিপূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠা হয়নি। এটি হলো তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর। তখন আর আগের মতো পাঠকের মুখ চেয়ে লিখতে হলো না রবীন্দ্রনাথকে; নিজের উপর পরিপূর্ণ আস্থা জন্মালো। এবার যা লিখলেন তার যেমন বিষয় বিস্তার, তেমন পরিপূর্ণ আত্ম-স্বরূপের উদ্ঘাটন। কবিতা নূতন, পূর্ণাঙ্গ রাবীন্দ্রিক, আধুনিক হয়ে উঠল।

এই আত্ম-উপলব্ধি যেমন ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথের, তেমনি গোষ্ঠীগতভাবে বাঙালী কবিকুলের। রবীন্দ্র-সাহিত্যে যেমন মোড় ফিরলো, বাংলা সাহিত্যেও তাই। নূতন একটা ভাবজোয়ার দেখা দিল বঙ্গদর্শনের পুনরাবির্ভাবে, প্রথমবার এসেছিল গল্পে, এবার পদ্যে ও কথাসাহিত্যে। এই যুগান্তরের পটভূমিতে রইল প্রথম মহাযুদ্ধ। আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস এই যুদ্ধকেন্দ্রিত মোড় ফেরার ইতিহাস থেকে সুরু। এই ইতিহাসের সূচক এবং কেন্দ্রীয় সত্তা রবীন্দ্রনাথ। এবং এর পরে অসংখ্য আধুনিক কবিকুলের সাধনায় সেই ইতিহাসই এক পূর্ণতর পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরোত্তম শ্রীঅর্জুনের প্রতি বলিয়াছিলেন—'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'। ...গুণকর্মানুসারে জাতি নির্বাচন করিতে হইলে ব্রাহ্মণের গুণকর্মসকল যাহাতে থাকিবে তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে। ক্ষত্রিয়ের গুণকর্মসকল যাহাতে থাকিবে তাঁহাকেই ক্ষত্রিয় বলিতে হইবে। বৈশ্যের গুণকর্মসকল যাহাতে থাকিবে তাঁহাকেই বৈশ্য বলিতে হইবে। শূদ্রের গুণকর্মসকল যাহাতে থাকিবে তাঁহাকেই শূদ্র বলিতে হইবে। কোন প্রকার বর্ণসংকরের গুণকর্মসকল যাহাতে থাকিবে, তাহাকেই বর্ণসঙ্কর বলিতে হইবে।...

ভগবান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রাহ্মণের সমস্ত গুণকর্ম দ্বারা বিভূষিত ছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মণ্য-প্রাপ্তিজনক পরমজ্ঞানও ছিল। তাঁহার কৃষ্ণাস্তরহিত প্রাণ পরাভক্তি দ্বারা অভিসিক্ত হইয়াছিল। তাঁহাতে যে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণতা লক্ষিত হইত সেইজন্যও যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ দ্বিজত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি তাঁহার নিজ মতানুসারে জন্মানুসারে অব্রাহ্মণ চণ্ডাল হইলেও ব্রাহ্মণোপযোগী গুণকর্ম সকল লাভদ্বারা, ব্রাহ্মণত্বসূচক পরম জ্ঞান লাভদ্বারা, শ্রেষ্ঠ দ্বিজত্বধারিনী বিষ্ণুভক্তি লাভদ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া, মহামুনি হইয়া, জীবন্মুক্ত আত্মজ্ঞানী হইয়া, শ্রেষ্ঠ ভক্তাচার্য্য হইয়া, পরম প্রেম নির্ণায়ক হইয়া বেদবিভাগাদি কার্য্যে শক্তি লাভ করিয়াছিলেন।..."

শ্রীনিত্যগোপাল

—জাতিদর্পণ—পৃঃ ২০১-২০২

সাময়িকী

'যো বেত্তি তত্ত্বতঃ' ঃ ভগবান বলিলেন যিনি তত্ত্বতঃ জানেন তিনিই মুক্তি লাভ করেন। জানিতে তত্ত্বতঃ জানিতে হয়, নহিলে উহা শুষ্ক পাণ্ডিত্য, ভক্তিও তত্ত্বতঃ জানিয়া করিতে হয়, নহিলে উহা অন্ধ কুসংস্কার, কর্মেও তত্ত্বতঃ করিতে হয়, নহিলে তাহা স্থূল তামসিকতা। আমরা অনেক কিছুই জানি বা করি অথচ তাহার তত্ত্ব জানি না। আমরা দুর্গাপূজা করি—প্রতি বৎসর করিতেছি—অতীতে করিয়াছি, ভবিষ্যতে করিব—কিন্তু দুর্গাপূজার অর্থ বা তত্ত্ব তো জানি না। খানি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গেলে কিংবা চণ্ডী পাঠ করিয়া গেলেও তাহা তত্ত্বতঃ জানা হয় না। দুর্গাপূজার পিছনে ভারতীয় ঋষিদের যে বিরাট পরিকল্পনা ছিল, তাহা অনুধাবন করা, তত্ত্বতঃ জানাই সত্যিকারের পূজা। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তথাকথিত আচার অনুষ্ঠান করিয়া দুর্গাপূজা করিতেন না, কিন্তু এই দুর্গাপূজার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব প্রতি বৎসর পূজার তিন দিন আলোচনা করিতেন। তাঁহার তিরোভাবের দুই বৎসর পূর্বে তিনি বাগুইআটি গ্রামে নরনারায়ণ আশ্রম স্থানান্তরিত করিয়া আনেন। ১৯৫৬-তে দুর্গাপূজার দিনগুলিতে তিনি যে আলোচনা করিয়াছিলেন তাহারই সামান্য আমি টুকিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহা হইতেই সংক্ষেপ করিয়া আমরা পাঠকদের নিকট শ্রীদুর্গাপূজার তত্ত্ব উপস্থিত করিলাম।

"বোধন হচ্ছে মা ঘুমিয়ে আছেন, ঘুমন্ত মাকে জাগাতে হবে। প্রশ্ন, মা কি কখনও ঘুমান? তাঁর স্থির আঁখি সদা রয়েছে জেগে।···আসল কথা আমরা ঘুমিয়ে আছি—আমার অহংকার যখন শুরু করব, তখন দেখব মা জেগে আছেন। ···অপরিচ্ছিন্ন মায়ের হাতে কর্তৃত্ব দেওয়ার মত আত্ম-নিবেদনময়ী ভক্তি হচ্ছে বোধন। বিরাটের কাছে যখনই আত্মনিবেদন করতে পারি, তখনই দেখি মা জাগলেন—অহংকারী জেগে থেকেও দেখবে মা নিদ্রিত। আমরা বিকারের ঘোরে আছি, তাই মাকে জাগ্রত দেখি না। বোধন ষোল আনার উপর আর দেওয়া।... আমি হাল ছাড়লাম, মা হাল ধরলেন—এই-ই হল বোধন। ...অধিবাস মানে মা আমার জীবনের সবটুকু অধিকার করে বসলেন। ভক্তের মত সুসন্তান বলবে, মা আমার সবটুকুতে তুমি বস।···যেই সন্তান শরণাগত হল, অমনি মা এসে দাঁড়িয়ে ভার নিলেন···সন্তান অহংকারবশতঃ যখন নিজের ভার নিজে নিল, তখন তাঁর দায় নেই, নইলে আমার জন্য তিনি সংগ্রাম করবেন।···

তিন দিনের পূজায় মানুষের জীবনের তিনটী গ্রন্থি ছিন্ন হয়। সপ্তমী দিনের পূজায় দেবী মহাকালী, ঋষি ব্রহ্মা,—অর্থাৎ তাঁরই কাছে সেদিনের পূজায় তত্ত্ব প্রকাশিত হয়ে ব্রহ্ম-গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। প্রলয়ের পরে নূতন সৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মা দেখলেন অতীতই পুনরাবৃত্ত হতে চায়···ব্রহ্মার ক্ষমতা স্মৃতি—পূর্বসৃষ্টির স্মৃতি ব্রহ্মার মধ্যে পাকাপাকি—সেই স্মৃতি দিয়ে গড়তে গেলে পুরণোটাই আবার হবে—তাই অতীতের হাত থেকে মুক্তি পেতে মহাকালীর পূজা···। ব্রহ্মার বিপদ, তাতে আমাদের কি? ব্রহ্মা যে আমাদের মধ্যেও আছেন—মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করবার যে দিক, সেটাই ব্রহ্মা—তাই নূতন সৃষ্টি করতে ব্রহ্মার সাধনা আমাদের নিতে হবে।··· পুরণোটাই নূতন নয়—দুটোর মধ্যে ফাঁক আছে—each development is by breaks, yet makes for continuity···কোনো দুটো ঘটনা গায়ে গায়ে লাগানো নেই —ব্রজগোপীদের মত প্রতি দুইটী ঘটনার মাঝখানে ভগবান দাঁড়িয়ে আছেন—যীশু আর অদ্ভুদের মধ্যে ভগবান—দুটো ফুলের মধ্যে যে ফাঁক তা মিলিয়ে দিয়েছে সুতো—ব্রহ্মসূত্র। দুটো মানুষ মিলবে কি করে মাঝখানে যোগসূত্র ভগবানকে না রাখলে—আমার বুদ্ধি আর আমার স্ত্রীর বুদ্ধি মিলবে না যদি তার মধ্যে ভগবান না থাকেন।···

তেমনি পুরোণোটাই নূতন নয়; দুটোর মাঝখানে যে ভগবান রয়েছেন, তাঁর মধ্য দিয়ে নূতন সৃষ্টি হয়ে চলে ...সমস্ত বর্ষের সঞ্চিত সংস্কার রয়ে গেছে অবচেতন স্তরে।... বর্ষাশ্রম চিন্তাধারা বলে সঞ্চিত ও প্রারব্ধের ওপরে কোন হাত নেই। সঞ্চিত ও প্রারব্ধ সব সময়ে প্রকাশ পেতে চায়—কোথা দিয়ে তিন জন্ম পরেও ফুটে বের হয়।... এইখানে গুরুর কাজ—এই সঞ্চিত-প্রারব্ধের অতীতের সাথে তুমি পারবে না—শরণাগত হও. ব্রহ্মা এই অতীত নিয়ে যখন বিপদাপন্ন, তখন মহাকালীর কাছে শরণাগত হলেন। অতীত বধা কর মানে কৃত বধা কর—কৃত মানেই অতীত—অহংকার গেলেই কৃত কাটে—অতীত কাটে। ব্রহ্মা বললেন, মা, আমি তো অতীত কৃতের মর্ম পাচ্ছি না;—মা বললেন, আমি আছি—ব্রহ্মা অতীত মুক্ত হলেন —সৃষ্টি আরম্ভ হল।.....অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের তিনটী স্বপ্ন নিয়ে মানুষ চলে—অহংকার গেলে এই তিন স্বপ্ন কাটে—কৃত শুদ্ধি মানে অতীত শুদ্ধি। ...অতীতের ছাঁচে তো ভবিষ্যৎ হবে না, সমস্ত থাকলেও অতীত অতীত, বর্তমান বর্তমান, ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ... অতীতকে আঁকড়ে থাকার বিপদ ব্রহ্মগ্রন্থি-হয়ে অতীতের আইন দিয়ে আজ সন্ন্যাসী গৃহী কারোরই চলবে না... অতীত ভীষণ শক্ত—অতীতের সঙ্গে লড়াই করাই সপ্তমী পূজার কাজ অতীতের সুসংস্কার বা কুসংস্কারই মধু ও কৈটভ।...মহাকালী, অতীতের যে সুসংস্কার বা কুসংস্কার আমাকে বেঁধে রেখেছে, যা নূতন সৃষ্টির পথে আমাকে পিছনে টেনে রাখে, তাকে তুমি সংহার কর।...মধু কৈটভের মেদের উপর বর্তমান জগৎ তৈরী হয়েছে—তাই মেদিনী।...সপ্তমী পূজায় মানুষ অতীতের সংস্কার-মুক্ত একটি 'আমি'র খোঁজ পেয়েছে...সপ্তমী পূজায় প্রার্থনা, নূতন যুগের ভোরে জীবন ও জগতের নূতন মূল্যবোধ (new valuation)-কে আমাদের বুঝতে দাও.. আমরা যেন নূতন সৃষ্টির দুয়ারে দাঁড়িয়ে অতীতের মধু কৈটভ সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে না থেকে সে মূল্যবোধকে রূপ দিতে পারি।

অষ্টমী পূজার দ্বিতীয় চরিত্র মহাগৌরী—ঋষি বিশ্ব মহিষাসুর বধ করে বিষ্ণুগ্রন্থি ছেদন করলেন।...সপ্তমী পূজায় মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে বিশুদ্ধ হয়ে অষ্টমী পূজার দিনে সঙ্ঘবদ্ধ হবে।... সৃষ্টি রক্ষা করতে বিষ্ণুকে অর্থাৎ নূতন বিশ্ব গড়বার একটা ব্যাপক পরিকল্পনা রয়েছে সেই বিষ্ণুকে প্রয়োজন—organised society গড়ে তুলতে হবে।...মহিষাসুর সমস্ত দেবশক্তিকে তাড়িয়ে দিয়েছে—একলা একলা লড়াই করে কেউ পারলেন না। দেবতা মানে departmental heads—এই সর্বদেবশরীরস্থা দেবী অসুর বধ করলেন—social life চালাতে গেলে ব্যক্তিগত সত্তায় কুলোবে না।...সমাজের সকল লোক দেবত্বপ্রাপ্ত হয়ে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হবে, সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিব—সঙ্ঘ না গড়লে বর্তমানে বাঁচবার কোন সম্ভাবনা নেই—সৃষ্টিকে রক্ষা করতে সঙ্ঘ গড়তেই হবে।...মায়ের পূজার উপকরণ দেখলেই বুঝবেন সমগ্র বিশ্ব নিয়ে টান পড়েছে—এ তো বাস্তবিক সামাজিক মা যাকে দেবতারা একত্র হয়ে সৃষ্টি করলেন।...হিন্দুরা ব্যক্তি-মানুষ হিসাবে ভাল, কিন্তু একটুও organised না...সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার কৌশল বাঙালীর ঘরের ঠাকুরের কাছেই ছিল, কিন্তু তা সে শিখল কোথায়?...মন্ত্র পড়লে দেখবেন কী বিরাট পরিকল্পনা—সমস্ত তীর্থবারি লাগে, বেশ্যার দুয়ারের মাটি লাগে।...সর্বদেবশরীরস্থা এই দেবীর পূজা করলে দেব-শক্তি তুষ্ট...সমস্ত বিশ্বশক্তির ফল আমার মা দুর্গা—তাই এর পূজায় প্রাকৃতিক শক্তি তুষ্ট হয়।...এক দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়—দুর্গা তো শুধু আমার বাড়ীর দুর্গা নন—চন্দ্র তিনি, সূর্য তিনি, ইন্দ্র তিনি —সকলের সব দেওয়া দিয়ে তো তিনি হয়েছেন।...তাই তো সর্বভূতেষু শব্দ চণ্ডীতে এত অসংখ্যবার প্রযুক্ত হয়েছে. সর্বভূতের কান্তি ক্ষান্তি শ্রদ্ধা তুষ্টি পুষ্টি সব মা...সমাজ তাঁকে সৃষ্টি করবে—তারপর তিনি সমাজকে রক্ষা করবেন—সর্বদেবশরীরস্থা বলে তিনি কোন এক দেবতার থেকে বেশী...আমি যদি বিরাট না হয়ে নেই, তবে এত বড় দেবীকে আমি ধারণা করব কি করে?... আসুন, আমরা প্রার্থনা করি, মা, আমরা মিলব—পরস্পর কৃতজ্ঞতা নেই; দেবতা হল মিলবার প্রবণতা। মা

এসেছেন, তিনি কি সামাজিক বা পারিবারিক কোন বিরোধ সইতে পারবেন?···সকল দেবতার শরীরজম্ বলে সম্বন্ধ হয়েই তাঁকে ধরতে হবে···নিত্যগোপাল তাই তো বললেন I am a cosmopolitan... ইংলাণ্ড ইংলাণ্ডকে ভালবাসে, রাশিয়া রাশিয়াকে ভালবাসে, আমেরিকা আমেরিকাকে ভালবাসে···ভারতবর্ষ একটী মাত্র দেশ যে সর্বভূতের কথা বোঝে।...মহালক্ষ্মীকে না চিনলে না জানলে ইউ-এন্-ও সম্ভব হবে কি করে?... পারস্পরিক রক্ত যেখানে আমরা শোষণ করছি, সেখানে কোন্ মাতৃপূজা হয়?···কিসের জাত রে? মায়ের জাত নেই—জন্ম যার নেই তার আবার জাত কিসের?... সকল দেবতার শরীরজ সেই মায়ের পূজা করতে করতে আমি তিনি হয়ে যাব, তাঁর যতখানি ব্যাপকতা ততখানি ব্যাপকতা আমাদের কেন হবে না?···আমি অসীম—তোমার মত সর্বদেবতাত্মজ হব, তোমার সন্তান হবে যোগ্য কর—সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে—একলার মঙ্গল নয়; সর্বার্থ-সাধিকা—কোন একজনের মঙ্গলসাধিকা নন; সর্বশক্তি-হরে—সকলের আর্তি হরণ করবেন, একজনের নয়··· মা, দুর্গম পথে তুমি দুর্গতিনাশিনী; নূতন যুগের ভোরে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। একটী নূতন কালচার সৃষ্টি হবে আজ—বিশ্ব জোড়া সম্বন্ধতা যার মূলে।...প্রত্যেকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে প্রত্যেকে চলতে চায় এটা মহিষাসুরের খেলা—এখানে সব কাড়াকাড়ির ব্যাপার—প্রত্যেকে অপরের অধিকার কেড়ে নিতে চায়···এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই সেই বিশ্বমায়ের পূজা—যিনি সৃষ্টি হলেন সকল দেবতার মিলন থেকে। দেবতারা যেমনই মিললেন—অমনি সেই মিলনের শক্তি থেকে, তেজ থেকে রূপ করে একটী নারী মূর্তি বিভাসিত হলেন.....বিশ্বজননী এরই নাম ত্রিলোত্তমা—বিশ্বের যেখানে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু উত্তম, তাই দিয়ে তাঁর সৃষ্টি...যা তাই সম্বমূর্তি—সম্বন্ধতার সাধনা শিখতে এই মায়ের পূজা।...একলা কেউ নেই, man is organic to world—সার্বজনীনতা মানুষের ধর্ম—পশুর ধর্ম নয়। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন—এতে পশু-মানুষ সমান—ধর্মেতেই পশু মানুষে তফাৎ।··· প্রত্যেক মানুষ দেবতাদের কোলে বসে আছে···সব ব্রহ্ম সূত্রে গ্রথিত···সব সূতোর সূতোয় বাঁধা।··· যা দেবী সর্বভূতেষু··· সর্বভূত বাদ দিয়ে তাই মাকে আরাধনা হয় না··· বিচ্ছিন্নতাই মৃত্যু—একটা পারস্পরিক ধারার মধ্যে যুক্ত না হলে কিছুতেই শ্রেয় নেই। সর্বভূতের সঙ্গে এই একাত্মতা, সম্বন্ধতা শিখতেই অষ্টমী দিনে মহালক্ষ্মীর সাধনা··· যা সৃষ্টির রক্ষার মন্ত্র···

নবমী দিনে ঋষি রুদ্রের কাছে মহাসরস্বতীর সাধনায় রুদ্রগ্রন্থি ছেদ···। আজ যার পূজা তিনি সর্বভূতেষু ছড়িয়ে আছেন। জীবনের সকল বৃত্তি দিয়ে এই ছড়িয়ে থাকা দেবীর আরাধনা করতে হবে···. সব বৃত্তির একটা ব্রহ্মময়ী রূপ আছে—সেই জন্যেই যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তি রূপেন সংস্থিতা—নিদ্রারূপেন সংস্থিতা—ক্ষুধারূপেন—তৃষ্ণারূপেন। মহাকালী দেবী, মহালক্ষ্মী দেবী—মহা-সরস্বতী দেবী নয়, মানবী—হিমালয়ের মেয়ে।··· সমস্ত বৃত্তি যেখানে সামঞ্জস্যীকৃত হয়, তখনই সেটা মানব-মূর্তি···মানুষ শেষ কথা···। নবমী পূজার মূর্তি মানবী—representative of all দেবতা···সহস্রভুজা থেকে আঠারভুজা—তারপর দশভুজা—তারপর দ্বিভুজা—মা ঐশ্বর্য্য কমিয়ে কমিয়ে মাধুর্য্যময়ী হচ্ছেন। দুই দিনের পূজায় যা সৃষ্টি হল তা কেমন করে ভোগ করতে হবে, ব্যবহার করতে হবে, নবমী পূজায় তাই শিখতে হবে···: বিশ্বে এমন কিছু নাই প্রয়োগ-কৌশল জানলে যা কাজে লাগান যায় না—প্রয়োগ-কৌশলের উপর সব নির্ভর করছে··· নবমীর দেবী বললেন, যো মাং জয়তি সংগ্রামে···তিনিই প্রকৃতি—বিশ্ব প্রকৃতি অর্থাৎ সূর্য গাছ পালা মাটি বলছে—আমাদের তো মানুষ ভোগ করতে চাইবেই—কিন্তু ভোগ করবার পথ কি?··· কোন জড় বস্তু পৃথিবীতে নেই—যা খুশী ভোগ করতে পারা যায় না···বস্তুকে নিয়ে যা খুশীও করা যায় না···। আমি না হলে সংসার চলে না, আমার কর্তৃত্ব···এটা ভোগাকাঙ্ক্ষা—নবমী দিনে এই ভোগাকাঙ্ক্ষার জন্য···সেবক যে সে-ই কর্তা হবে···সেবক তুমি—এই হল—শেষ কথা···বিশ্বের মনের দেবী মহাসরস্বতী বস্তুকে গ্রহণ করবার কৌশল বলছেন···নবমী পূজায় একটী মাত্র কথা ভোগ করব না।

বিশ্বের সব কিছু ভজনা করব···কোন বস্তুকে ভোগের দৃষ্টিতে দেখব না, দেখব ভজনার দৃষ্টিতে···। যুদ্ধ করতে হবে, যুদ্ধ করে আমার এই বিশ্বের যা কিছুকে গ্রহণ করতে হবে—কিন্তু তার পেছনে থাকবে বস্তুকে সেবাবুদ্ধিতে গ্রহণ করতে হবে এই মহাবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা···। প্রত্যেক বস্তুরই দুই শক্তি—আগুন দিয়ে রান্না হয়, আবার আগুন ঘরও পোড়ায়—একই ভাত কারো বলাধান করে, কারো মৃত্যুর কারণ হয়...ভাত হজম করলেই ভাতরূপ প্রকৃতি থেকে শক্তি লাভ করা যায়···হজম করতে না পারলে বস্তু বিষ, হজম করলেই স্ত্রী স্বর্গের দ্বার···নবমী পূজায় তাই হজম করবার কৌশল শিখতে হবে···ভেদবুদ্ধি গেলেই ব্রহ্মবিদ্যা নেমে আসে...সেবাবুদ্ধি উঠে গেছে বলেই দুর্ভিক্ষ মহামারী···সহযজ্ঞা প্রজা সৃষ্ট্বা পুরোবাচ··· যজ্ঞ মানে sacrifice—বিলিয়ে দাও—বিলিয়ে দেয় বলেই যা বড়—বিলিয়ে দেওয়া বিশ্বের স্বধর্ম···ভগবান সেবকের কাছে চিরকাল বাঁধা···।

—এমনি করে তিন দিনের পূজায় যা লাভ করলাম তা লাভ করতে পারলে জীবনে বিজয় আসবেই—তাই মায়ের কাছে সৃষ্টিকৌশল শিখবার পরে বিজয়া লাভ···· বস্তুকে ব্রহ্মমূল্য প্রদান কর—বিজয়ার ইহাই প্রধান কথা ···বিজয় করতে হলে বস্তুকে—বিশ্বের কোন কিছুকেই ঘৃণা করা চলবে না··বিজয়ার দিনে এই তত্ত্ব লাভ করে আজ আবার নূতন করে যাত্রা আরম্ভ করলাম···। চল, যাত্রা কর বিশ্বের সঙ্গে, বিশ্বের মধ্যে···। ঠাকুর, তোমার পথে আমি যাত্রা করব...যতখানি পার নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে চলো—তাহাতেই বিজয় লাভ করবে—সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে, শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে।

'একান্ত স্থিত বা একান্ত গতিশীল বলিয়া কিছুই নাই। এইজন্যই গীতায় বিশ্ব বলিতেছেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' দুনিয়াটা কেমন মজার? যার কাছে যেমন। দুনিয়া যদি ইউক্লিডের মাপের হইত, তবে সকলেই একরূপ দেখিত। কিন্তু এই দুনিয়া যে প্রত্যেকের কাছেই তার তার মত, এ বিষয়ে বোধহয় প্রত্যেকেই একমত। এইভাবে দুনিয়া অনন্তও বটে; অথচ অনন্ত দুনিয়ার একটা 'ঐক্য'ও তো চাই। তাই আদিয়াছেন পুরুষোত্তম সময়য়ের বাণীতায় এই বিচ্ছিন্ন অনন্ত দুনিয়াকে সম্বন্ধ করিতে, এক করিতে।'

—ব্রহ্মসূত্র—অবধূতভাষ্য (১ম খণ্ড), পৃঃ ১৮২।

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

উদ্ধারণ

অগ্রহায়ণ, ১৮৮৩ শকাব্দ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ ১৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

সমন্বয়-গুরু পুরুষোত্তমানন্দ স্মরণে

॥ অধ্যাপক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

(১৯৬১ সালের ২৮শে নভেম্বর রবিবার নরনারায়ণ আশ্রমে অনুষ্ঠিত সভায় পঠিত)

ওঁ আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ, সঙ্কীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ। বিশ্বপ্রেমঘন নরনারায়ণসেবীন্, বন্দে সমন্বয়-গুরুম্ পুরুষোত্তমানন্দম্ ॥

পরম শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, পূজনীয়া মাতৃমণ্ডলী ও সমবেত সজ্জনবৃন্দ,

আজ ফাল্গুনী কৃষ্ণা পঞ্চমী, নরনারায়ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের ৭৯তম শুভ জন্মতিথি। স্বামীজীর শুভ জন্মতিথির আসরে তাঁর পুণ্য জীবনকথা স্মরণ করার যে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও আমরা এই পবিত্র আশ্রম প্রাঙ্গণে সমবেত হয়েছি। আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁকে আমার ভক্তি-নম্র প্রণাম নিবেদন করি।

স্থূলদেহে তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। সাড়ে তিন বৎসর পূর্বে তাঁর জীবনদেবতা শ্রীগুরুর মহিমা কীর্তনকালেই বালীগঞ্জস্থিত গুরুপীঠে তিনি অপ্রকট হয়েছেন। সংসারের সর্বক্ষেত্রে বিরাজী পুরুষোত্তমানন্দের দিব্য দেহ আমাদের সম্মুখস্থ মন্দিরে সমাহিত। চাক্ষুস আমি তাঁকে দেখছি না বটে, কিন্তু তাঁকে স্মরণ করে যখনি চক্ষু মুদ্রিত করি তখনি তাঁর করুণাঘন মুখচ্ছবি আমার মানস মুকুরে উদ্ভাসিত হয়। প্রায় ১২ বৎসর তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই সুদীর্ঘকালে তাঁর মুখে অনেক ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও জগৎতত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক ব্যাখ্যা শুনেছি, তাঁর জীবনের অনেক ঘটনা তিনি আমাকে বলেছেন। কি স্নিগ্ধ স্নেহে কখন হাত ধরে, কখন বা আলিঙ্গন করে, তাঁর বক্তব্যগুলি আমাকে বোঝাতেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল বলে যেতেন, ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। এমন দিন গেছে যখন ৩ ঘণ্টা বক্তৃতা দিবার পর শুধু আমাকে নিয়ে আরও একঘণ্টা বলেছেন, সে সব কথা ভেবে এখন আমি অবাক হয়ে যাই।

কোন সাংসারিক দুর্ঘটনায় মর্ম পীড়িত আমি নিবিষ্ট চিত্তে শুনলাম তাঁর গীতা-উপনিষদ-ভাগবত ব্যাখ্যা। সাহিত্যের ছাত্র হলেও বেদান্তের উপর বরাবরই আমার গভীর শ্রদ্ধা, তার উপর দুঃখভারে প্রপীড়িত হয়ে গীতা-ভাগবত-উপনিষদের উপর আমার শ্রদ্ধা আরও গভীর হয়েছিল। এমনি যখন আমার মনের অবস্থা তখনি আমি স্বামীজীর সংস্পর্শে এসেছিলাম। তীব্র আগ্রহে স্বামীজীর কথা শুনেছি। গীতার যে অর্থ আমি মনে মনে ধারণা করেছিলাম, আর স্বামীজী গীতার যে অর্থ আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন, দেখতাম অনেক জায়গায় তা মেলে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর কথা শুনতাম, কিন্তু বুঝতে পারতাম না; ক্রমশ তাঁর বক্তব্যগুলি আমার হৃদয়ঙ্গম হ'ল। এখনও যে সব বুঝেছি তা বলতে পারি না, তবে তাঁর জ্ঞানসম্পদের একটা মোটামুটি ধারণা আমার হয়েছে, তার কিছু আভাষ আমি আপনাদের কাছে এখন নিবেদন করছি।

যুগের প্রয়োজনে ভগবান আবির্ভূত হন। সত্যপথ হতে স্খলিত হয়ে মানুষ যখন ভগবানের সাথের সৃষ্টি

নষ্ট করে তখন ভ্রষ্টা আসেন সৃষ্টির বুকে সকল সমস্যার মীমাংসার দ্বারা সত্যধর্ম স্থাপন করতে। এমনি করেই শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন দ্বাপরের শেষ এবং কলির প্রারম্ভের সন্ধিক্ষণে, গ্লানিগ্রস্ত ধর্মকে সত্যপথে স্থাপনের জন্য। সে ধর্মের কথা আমরা গীতার মধ্যে পাই। এই জন্যই পাঁচশত বর্ষ পূর্বে আলোক বর্তিকা হাতে নিয়ে নদীয়ায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। প্রেমের বাঁশী বাজিয়ে তিনি কলিযুগের নব গায়ত্রী হরিনাম প্রচার দ্বারা ভক্তাভক্তির মাঝে এক মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন। শতাধিক বর্ষ পূর্বে আবার তিনিই এলেন শ্রীনিত্যগোপালরূপে কোন্ দার্শনিক ভিত্তিতে সেই প্রেমধর্ম স্থাপন করা যায় তারই বার্তা নিয়ে।

সমন্বয়-মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল। তাঁর বাণী—জড়াজড় সমন্বয়, নিত্য-অনিত্য সমন্বয়, সর্ব সমন্বয়। যে দেশে 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যার' উপর সমাজ ও দর্শন গড়া, সে দেশে শ্রীনিত্যগোপাল বলেন—ব্রহ্ম সত্য জগৎ সত্য—মায়া ব্রহ্মের মতই সত্য। মায়াতীত মানুষের পক্ষে এর চেয়ে বড় আশার কথা আর কি আছে। প্রকৃতির গৌরব দিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির চরণে মাথা রেখে প্রকৃতির অন্তর্ধান করেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ধরার ধূলিতে লুণ্ঠিত হয়ে অবহেলিত জড় জগতের গৌরব স্থাপন করেছেন। যে ভারতবর্ষ আত্মজ্ঞানকেই চরম জ্ঞান মনে করে, সেখানে গুরুগম্ভীর স্বরে শ্রীনিত্যগোপাল বলেন—চরম জ্ঞানের এক শাখা আত্মজ্ঞান। সর্বজড় এবং অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই চরম জ্ঞান বা পূর্ণ জ্ঞান। শুধু আত্মজ্ঞানে আমাদের জীবনের অনেক সমস্যার মীমাংসা হয় নাই, উপরন্তু সাত শ বছর ধরে পাঠান মোগল ইংরেজের পদানত হয়ে অশেষ গ্লানি সহ্য করেছি। জড় জগতের অধিকারী হয়ে জড়কে ঘৃণা করা চলে না। যার যাই থাক পত্নি তাকে কেন এত ঘৃণা? যে নারী স্বামীর অর্থে যার পরে আর ভালবাসে পরপুরুষকে, তাকে বলে অসতী। আমাদের অবস্থাও আজ তাই। শ্রীনিত্যগোপাল প্রদর্শিত জড়াজড়সমন্বয় তত্ত্বের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ আপনাদের সাথে মিলিত হয়ে যাঁর কথা আজ আমরা এখানে স্মরণ করতে এসেছি।

১৯১৯ সালে বরিশালে শিক্ষকতার কার্যে ইস্তফা দিয়ে শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ পথে নামলেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আর মুখস্থ করা পথে চলেন নি। মুখস্থ করা সংসারীও তিনি ছিলেন না, মুখস্থ করা সন্ন্যাসীও তিনি ছিলেন না। তিনি ছিলেন নূতন জীবনের কথা নিয়ে নূতন পথের যাত্রী, আর তাঁর হৃদয়ে ছিল এক অফুরন্ত প্রীতির প্রবাহ। আজীবন তিনি রাজনীতি করেছেন, বেশ কয়েকবার জেলেও গিয়েছেন, ৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনে তাঁর শেষ কারাবাস। কিন্তু রাজনীতি করবেন বলে তিনি রাজনীতি করেন নি। শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই ছিল তাঁর ধর্ম, তাই তিনি রাজনীতি করেছিলেন। সমাজের শোষণের বিরুদ্ধে তিনি প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানিয়েছেন, আধ্যাত্মিকতা যেখানে মানুষকে শোষণ করে তাকে ক্লীব পঙ্গু করেছে সেখানেও তিনি বজ্রগম্ভীর প্রতিবাদ করেছেন। নিজের আত্মশক্তিকে উদ্দীপিত করে মানুষ কি ভাবে পশুশক্তির বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে পারে—বর্ষে সমাজে রাষ্ট্রে—পুরুষোত্তমানন্দ তারই জলন্ত দৃষ্টান্ত।

এই জীবন-বেদ পুরুষোত্তমানন্দের হৃদয়ে গভীরভাবে মুদ্রিত করেছিলেন তাঁর জীবন-দেবতা শ্রীনিত্যগোপাল —যোগাচার্য শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত। শ্রীনিত্যগোপাল একস্থলে লিখেছেন—'এ সংসার অতি ভীষণ স্থান,' তিনিই আবার অন্যত্র লিখলেন—'এই বিশ্বই আমার মহামঠ'। কিভাবে চললে সংসার বিষম স্থান, বিষয় বিষ হয়, আর কিভাবে চললে এই সংসারই হয় পরম সুখের আগার—এই সামগ্রিক সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত পুরুষোত্তমানন্দের জীবন আর তাঁর ব্যাখ্যাত প্রস্থান-ত্রয়ের অর্থাৎ উপনিষদ-ব্রহ্মসূত্র-গীতা ভাষ্য।

১৯৩২ সালে পুরুষোত্তমানন্দ যখন জেলে ছিলেন তখন তিনি ১২খানা প্রামাণিক উপনিষদ্ ও গীতার অবধূত ভাষ্য রচনা করেন। এর মধ্যে ঈশ কেন কঠ ও আর দুই একটী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়াও তাঁর অসংখ্য পত্র, বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির মধ্যে তাঁর

নূতন কালের জীবন-দর্শন আজও অর্থাভাবে মুদ্রিত হয় নাই। এই সব রচনা প্রকাশের জন্য সমবেত বন্ধুজনের নিকট আবেদন জানাই।

রাজনীতি ক্ষেত্রে বরিশালের পরম কুমার ঘোষের নাম সর্বজন পরিচিত। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁর ওজস্বিনী বক্তৃতা এবং দেশদেবায় অকাতর শ্রম ও সর্বস্ব ত্যাগে তৎকালীন বাংলাদেশে এক বিরাট উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। সংসার এবং সন্ন্যাসের কোন কঠিন ভেদের প্রাচীর তাঁর জীবনে ছিল না। সেইজন্য তিনি সকল ক্ষেত্রে—সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্রে—সমানভাবে বিচরণ করতেন। তিনি যখন বক্তৃতা দিতেন, সহসা বোঝা যেতো না তিনি কোন্ বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন—ধর্ম না রাজনীতি। তাঁর জীবনে কোন দোঠা-বিভাগ ছিল না বলেই, কোন ক্ষেত্রে আবদ্ধ না হয়েই তাঁর জীবনকে সমগ্রতার এক পরিপূর্ণ রূপদান করেছিলেন।

স্বামীজীর জীবনে স্ত্রীপুত্র কোন বাধা সৃষ্টি করে নি। মাতার সর্বমঙ্গলা মূর্তি উপলব্ধি করেছিলেন স্বামীজী। সংসার এবং সন্ন্যাস, ব্রহ্ম ও মাতার সমন্বয়ই ছিল তাঁর আদর্শ। সেজন্য তাঁকে আমরা বহুরূপে বহুক্ষেত্রে দেখেছি।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে কংগ্রেস ও বেদান্তে কোন বিরোধ ছিল না। তিনি লিখেছেন—কংগ্রেসকে জগন্নাথক্ষেত্র বুঝিয়াই ঝাঁপ দিয়াছিলাম। কংগ্রেস ছিল আমার নিকট ভারতের কুম্ভমেলা। আমি বেদান্তকে সর্বনীতির সমন্বিত ভাগবত নীতির লীলাক্ষেত্র বলিয়া চিনিয়াছি।

স্বামীজী ছিলেন ঘোর বিপ্লবী। অসহযোগ আন্দোলনের যুগে তাঁর দেশাত্মবোধের গর্জনে দেশ চঞ্চল হয়েছিল, ইংরেজ তাঁর বক্তৃতা বন্ধ করবার নির্দেশ দিলে সেই আদেশের প্রতিবাদে তিনি অনশন আরম্ভ করলেন। অন্যায় অত্যাচার অধর্মের বিরুদ্ধে অভিযানই তাঁর জীবন ব্রত। তিনি প্রায়ই বলতেন—যে ধর্ম মানুষকে তার অধিকার রক্ষা করবার জন্য উন্মাদ করে না, সে কি আবার ধর্ম! গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের ধারণা শ্রীগৌরাঙ্গ শুধু প্রেমের ঠাকুর। স্বামীজী বলতেন মহাপ্রভু ছিলেন একজন ঘোর বিপ্লবী। কাজীর বিরুদ্ধে অভিযান যে রাজবিদ্রোহ, একথা কি কেহ ভাবিয়াছে? তিনি যে সমাজের সকল বৈদিক নিয়ম পদ্ধতি সভায় জলে ভাসিয়ে দিয়ে গর্জন করে বললেন—চতুর্লোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ হরিভক্তিপরায়ণাঃ, এটি কি বিপ্লবী পুরুষের কার্য নয়? বরিশাল টাউন হলকে সিনেমা কোম্পানীর নিকট ভাড়া দিবার প্রতিবাদে স্বামীজী ৬৫ দিন অনশন করে সিনেমা বন্ধ করেছিলেন। কোন ক্ষেত্রের কোন অন্যায় তিনি নীরবে সহ্য করেন নাই।

ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন কর্মকে ঘৃণা করেছে; নৈষ্কর্মকে, চৈতন্যকে, একাকে, সাত্ত্বিকতাকে বড় করে তুলেছে। তাদের কাছে কর্ম করা ছোট কাজ, জপ তপ বড় কাজ; ব্রাহ্মণের পূজা পাঠ বড় কাজ, মুচির জুতা সেলাই ছোট কাজ। কর্মবিদ্বেষের এই কৌলীন্য ভারতের সর্বনাশ করেছে। তাই স্বামীজী লিখেছেন—একটা hierarchy (সিঁড়িতন্ত্র) করিয়া একটীকে রাখিয়াছে সিঁড়ির উর্দ্ধ ধাপে কুলীন করিয়া, আরগুলিকে পর পর নীচে নামাইয়া রাখা হইয়াছে। এইভাবে কিছুদিন বেশ চলিল। কিন্তু যখন উচ্চস্তরের চাপে নীচেরগুলি ধীরে ধীরে শুকাইতে লাগিল, তখনই বিদ্রোহের সূচনা হইল। ছোটরা, নীচের দল, সব বড়দের, উঁচুদের সমকক্ষতার দাবী করিল। ভাগবত বলিলেন, বড়-ছোট, উচ্চ-নীচ সকলের সঙ্গে পুরুষোত্তমের direct ও equal relation। গায়ত্রী জপ ও মুচির জুতাসেলাই যদি বিশ্বের কাজে সমভাবেই প্রয়োজন, তবে কেন একটি কুলীন (বড়) হইবে এবং অপরটি অকুলীন (ছোট) হইবে? ঘর ঝাঁট না দিলে যখন ঠাকুর-পূজাই হয় না, তখন ঠাকুরের কাছে ঘর ঝাঁট দেওয়া ও পূজা কি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়? কে কুলীন, কে অকুলীন?

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা—অতএব সকল ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে দিয়ে চল সকলে গোলোক-বৈকুণ্ঠে, তপ্ত-সংসার-মরু ত্যাগ করে চল সব নারায়ণের বসাল নন্দন কাননে—এই শিক্ষা ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন পেয়েছে, তার অস্থিমজ্জায় কর্ম না করার সাধনা দৃঢ়মূল। এই কর্ম-বিমুখতায় সুযোগ

নিয়েই বণিক ইংরেজ ভারতের রাজত্বও নিয়ে বসেছিল। আজ যদি ভারতবাসী এ কথা না ভাবে তবে তার স্বাধীনতাও একদিন বিপন্ন হবে। এক যুগে যাহা ছিল প্রয়োজন অন্য যুগে তা অচল। স্থিতিধর্মী ভারত যদি বর্তমান যুগের গতিধর্মের সঙ্গে সমন্বয় করতে না পারে তবে তার অস্তিত্ব হবে বিপন্ন। তাই পুরুষোত্তমানন্দ প্রচার করলেন—জড়-অজড় সমন্বয়ের বার্তা। শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ লিখছেন—গোলোক বৈকুণ্ঠকে টানিয়া মাটির বুকে নামাইতে হইবে, ইহাই ভাগবত ও গীতার কথা। সকল ঝঞ্ঝাট এড়াইয়া মনে মনে ধ্যান করা আর চলিবে না। গীতা তাই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধক্ষেত্রের বুকে দাঁড়াইয়া বলা হয়। ইহা সৃষ্ট জীবের কথা নয়, স্রষ্টার নিজ মুখের বাণী। সকল ঝড়ের মাঝে দাঁড়াইয়া আজ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে. তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন—ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—পুরাণ সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা আর চলিবে না।

আর একটী বিষয়ের উপরও স্বামীজী বার বার জোর দিয়ে কথা বলতেন—সঙ্ঘবদ্ধ সাধনা ছাড়া ভারতবর্ষের আর বাঁচবার উপায় নাই। সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে থাকিতে হইবে, পরিতে হইবে, ঈশ্বরের আরাধনা করিতে হইবে। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপসঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কত লীলা করেছেন। শ্রীবুদ্ধ বলেছেন—সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কীর্তনে মহোৎসবে এই সঙ্ঘবদ্ধ সাধনা প্রবর্তন করবার চেষ্টা করেছেন।

ধর্মের গৌরব প্রচেষ্টা, সঙ্ঘবদ্ধ সাধনার কথা শ্রীবুদ্ধ হতে এ পর্যন্ত অনেক মহাপুরুষই বলেছেন। কিন্তু কেহই মায়াবাদ শাসিত ভারতবর্ষে গতিধর্ম স্থাপন করতে পারেন নি, এর কারণ এঁদের কেউই ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি বদলাবার প্রয়াস করেন নি। লণ্ডন দখল করা না হলে যেমন ইংল্যাণ্ড দখল করা হয় না, সেইরূপ সনাতন ধর্মের ইস্পাত কাঠামো না বদলালে এ ভারতে কোন আন্দোলন স্থায়ী হবে না। শ্রীনিত্যগোপাল তথা শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ এই দার্শনিক ভিত্তি বদলানোর কথাই বলেছেন।

আর একটি কথা বলে আমার বক্তব্যের উপসংহার করছি। স্বামীজীর বাণী ও সাধনা রূপ লাভ করেছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণ আশ্রমে ও উদ্বোধন পত্রিকায়। দুর্বল শরীর নিয়ে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আশ্রমের কর্মসচিব শ্রীমতী রেণু মিত্র যে কাজ করে যাচ্ছে তা চিন্তা করে সত্যই আমি বিস্মিত হয়েছি। নরনারায়ণ আশ্রমের যে সকল অনুষ্ঠান স্বামীজীর জীবনকালে যথা নিয়মে পালিত হ'ত—যেমন দৈনন্দিন সেবা পূজা, বুদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পুণ্য দিবসে ধর্মীয় আলোচনা —তা নিয়মিত ভাবেই চলছে। আশ্রমের মুখপত্র 'উদ্বোধন' যথানিয়মে প্রকাশিত হচ্ছে। অধিকন্তু তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় একটী গ্রন্থাগার ও বয়স্কা মহিলা শিক্ষা ও শিল্প কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এতগুলি ব্যাপার সুষ্ঠু-ভাবে পরিচালনের সকল দায়িত্ব শ্রীমতী রেণু ব্রত হিসাবে নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছে। সত্য বটে যাঁর কাজ তিনিই সব ব্যবস্থা করেন, কর্মের মূলে সৎ প্রেরণা ও ইচ্ছা থাকলে কোন কিছুরই অভাব হয় না, তবুও আজ আপনাদের নিকট আমার এই বিনীত নিবেদন, সম্মিলিত ভাবে আপনারা শ্রীমতীকে সক্রিয় সহযোগিতার দ্বারা উৎসাহ দিন, কারণ বাগুইআটিস্থিত এই আশ্রম আপনাদেরও ; এ আশ্রমের গুরুদায়িত্ব পালন স্বামীজী শুধু একা রেণুর উপর নয়, আমাদের সকলের উপরেও ন্যস্ত করে গেছেন। আপনাদের সকলের চেষ্টায় স্বামীজীর সমন্বয়ের আদর্শ সফল হোক—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে পুনরায় আমি স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজকে প্রণতি জানাই।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীবেণু মিত্র ॥

ওঁ নমঃ তত্ত্বমূর্ত্তয়ে ভক্ত-ভগবতে নিত্যগোপালায় জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তুরীয়-তুরীয়াতীতায় ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবৎ-পুরুষোত্তমায়। ওঁ আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ সঙ্কীর্ত্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ। বিশ্বপ্রেম্বনৌ নরনারায়ণ দেবৌম্ বন্দে সমন্বয়গুরুম্ পুরুষোত্তমানন্দম্।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ১৯-তম জন্মকে স্মরণ করে আজ আমরা একত্রিত হয়েছি। তাঁর পক্ষ থেকে এবং আশ্রমের পক্ষ থেকে আপনাদের আমি সাদর সম্ভাষণ জানাই। আপনারা অনেকেই তাঁকে দেখেছেন, তাঁর প্রাণপূর্ণ ব্যবহারকে স্মরণ করতে পারছেন, তাঁর দেহে উপস্থিত থাকা কালে তাঁর জন্মক্ষণকে স্মরণ করেও অনেকেই এসেছেন, অনেকে তাঁর অজস্র লেখার মধ্য দিয়ে তাঁর বিপ্রবধন প্রাণের পরিচয় পেয়েছেন, আজ তাঁর সমাধি-প্রাঙ্গণে তাঁর জন্মতিথি দিনে বসে আপনাদের সে সকলই মনে পড়ছে। আপনারা এসেছেন—মানুষকে তিনি ভালবাসতেন, আজ তিনি দেহে নেই। তবু তিনি আছেন—তাই খুব বোধ করছি আপনাদের আসাটা তাঁকে কতখানি আনন্দ দিচ্ছে—তিনি কতখানি তৃপ্তি পাচ্ছেন। তাঁর সেই আনন্দকে স্মরণ করে আমি আবার আপনাদের সাদর সম্ভাষণ জানাই।

ভারতবর্ষ মহাপুরুষের খনি—বিচিত্র জীবনের কত রকম আস্বাদনের সংবাদ কত মহাপুরুষ রেখে গেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ আমাদের জন্য কি সংবাদ রেখে গেছেন আজ তাঁর এই জন্ম-সময়কে উপলক্ষ করে আপনাদের সকলের সঙ্গে তাই-ই একটু আস্বাদন করতে প্রয়াস পাব।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ এমন একজন মানুষ ছিলেন যাঁর জীবনে বেঁচে থাকবার কোন ব্যক্তিগত প্রয়োজন বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। তাঁর গুরুদেব শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের শ্রীচরণস্পর্শলাভের আগে অচেতন-ভাবে এবং তারপরে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সচেতন-ভাবে, পূর্ণজ্ঞানে কেবল এই কথাটার প্রমাণই তাঁর জীবন রেখে গেছে যে, কোন রকম ব্যক্তিগত প্রয়োজন-হীনতা থেকে জাত একটা সুগভীর আত্মতৃপ্তি মানুষকে কি গভীর ব্যাপক এক তীব্র সমাজসংগঠনাত্মক সংবেগের অধিকারী করতে পারে এবং সে সংবেগ তাকে আপামর জনসাধারণের মধ্যে কেমন করে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়াতে পারে। পুরুষোত্তমানন্দের জীবন-ধারণের এই প্রয়োজন-হীনতা কোন passive in-action যে নয় তা তাঁকে যারা একবারও দেখেছেন তাঁরা জানেন, তাঁর জীবন-দর্শন যারা সামান্যও অনুভব করেছেন তাঁরা জানেন। Passive inaction দূরের কথা, তাঁর ভেতরে একটা সমুদ্র-গর্জন শোনা যেত। সে গর্জন কিসের?—বিশ্ব জুড়ে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে নূতন মূল্যবোধ এসে গেছে, মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে নূতন সম্পর্ক স্থাপিত হবার জন্য মানুষ তার সমস্ত কুৎসিৎ মনোবৃত্তি সত্ত্বেও যে অন্তর্প্রেরণা বোধ করছে, সেই মূল্যবোধকে, সেই প্রেরণাকে ভারতবর্ষের প্রস্থান-ত্রয়ের অর্থাৎ উপনিষৎ-ব্রহ্মসূত্র-গীতার মধ্যে খুঁজে পেয়ে ভারতবর্ষকে তার স্থিতি-ভূমিতে রেখেও জীবনের গতিধর্মের সঙ্গে তাকে সমন্বিত করে দেবার প্রচেষ্টার গর্জন। পুরুষোত্তমানন্দ এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, যে নূতন চিন্তাধারা সমস্ত জগৎকে আজ চালিত করতে চাইছে, তার ঐকান্তিকতার কুফল থেকে ভারতবর্ষকে তথা বিশ্বকে বাঁচাতে হলে মানুষকে আজ যেমন বিশ্বনাগরিক হতে হবে, তেমনি অজড় ও জড়কে তাদের যথাস্থানে স্বতন্ত্র ও সম মূল্য দিয়ে উভয়ের সমন্বিত চিন্তাধারা নিয়ে জীবনে অগ্রসর হতে হবে।

'পূর্ণজ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান, পূর্ণজ্ঞানের এক শাখা আত্মজ্ঞান, সমস্ত জড় ও অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান'—শ্রীনিত্যগোপালদেবের এই চিন্তাধারাকে ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের কাছে দার্শনিকভাবে উপস্থিত করা ও সেই চিন্তাধারা অনুযায়ী জীবন যাপন করাই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জীবনের একমাত্র কথা ছিল। তিনি তাঁর উপনিষদের ভাষ্যে লিখলেন, 'নিলিপ্তের লিপ্ততাই সৃষ্টির গোড়ায় বর্তমান'—পুরুষোত্তমানন্দের জীবন-ধারণের মূলে ছিল এই নিলিপ্তের লিপ্ততা। কোন কিছুতেই যেমন তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছিল না, তেমনি ছিল না কোন আসক্তি, কিন্তু মানুষ কি করে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে একটা পারস্পরিক প্রীতি ও একটা ব্যাপকতর আদর্শের মধ্যে বাস করতে পারে সে কথাটা মানুষের কাছে তুলে ধরতে একেবারে সাধারণ মানুষের সঙ্গে অত্যন্ত লিপ্ত হয়েই তিনি ছিলেন। আজন্ম সন্ন্যাসী পুরুষোত্তমানন্দ মানুষকে—সব মানুষকে—কি গভীরভাবে ভালবাসতেন, তাদের মধ্যে সামগ্রিক জীবনবোধের উন্নততর সম্বন্ধযুক্ততা আনবার জন্য কি আকুল প্রচেষ্টা করতেন—সে কথাই তাঁর জীবনকথা। ভগবানকে পাওয়ার জন্য তাঁর আলাদা করে কোন সাধনা ছিল না—শ্রীনিত্যগোপালের শ্রীচরণস্পর্শলাভের বৎসরখানেক পর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 'সব মানুষকে' পাওয়ার সাধনাই তিনি করে গেছেন। বলতেন, ভগবানকে পেয়েই আছি—এখন 'সব মানুষ'কে এক করে পেতে চাই—মানুষকে পেয়ে বলতে চাই তারাও ভগবানকে পেয়েই আছে, কেবল সে পাওয়া সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে এবং সেই পাওয়ার বোধের উন্নততর জীবন-চেতনা দিয়ে সব মানুষকে পেতে পেতে চলতে হবে—এই-ই জীবন, এই-ই মানুষের সাধনা।

জীবন-যাপনের এই মূল প্রেরণাকে লাভ করেছিলেন শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যগোপালের কাছ থেকে। এ চিন্তাধারাটা ভারতবর্ষের প্রচলিত তথাকথিত বর্ণাশ্রমীয় বা ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যাবাদের চিন্তাধারা থেকে কেমন করে পৃথক, তার বিস্তৃত দার্শনিক আলোচনা বক্তব্যের স্থান এ নয়, তবে পৃথক বলেই শ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের কথা আজও মানুষের কাছে ঠিক বোধগম্য নয় এবং কেবল যে শ্রীনিত্যগোপালই আজ পর্যন্ত অপরিচিত হয়ে আছেন তা নয়, শ্রীপুরুষোত্তমানন্দও জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাঁর এত কথা সহস্র সহস্র মানুষের বিস্মিত চিত্তের কাছে উপস্থিত করেও আজও প্রায় অপরিচিত হয়েই ক্ষুদ্র গ্রামের এই স্থানটীতে পড়ে আছেন। তবে এ চিন্তাধারা যে মানুষকে আনন্দিত করে এবং একটু একটু করে যে সে জনসাধারণের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারছে তার প্রমাণ এই যে, বস্তুশক্তির এত স্বল্পতা সত্ত্বেও পুরুষোত্তমানন্দের প্রচেষ্টা ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জীবনধারাকে অনুসরণ করলে দেখতে পাই ব্যক্তিগত প্রয়োজন যেমন তাঁর কিছু ছিল না, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনও তিনি কোনদিন যাপন করেন নি। একটা সময় পর্যন্ত তিনি 'বুদ্ধো' ছিলেন, কারো সঙ্গে মিশতেন না, কোথাও যেতেন না—ইস্কুল আর বাসা এই ছিল তাঁর যাতায়াতের স্থান। তিনি বলেছেন যে, বরিশালের সুদৃশ্য নদীর পাড় দেখতেও তাঁর যেতে ইচ্ছে হতো না। কিন্তু এই নিঃসঙ্গ মানুষটি চুপচাপ নিজের কথা ভাবতেন না—তখনও ভাবতেন একটা বৃহত্তের কথা—ভগবানের কথা। তখনকার এই নীরব মানুষটির বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে, নরনারী নির্বিশেষে, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে, ধনী নির্ধন নির্বিশেষে, বালবৃদ্ধযুবা নির্বিশেষে সকল মানুষকে বুকে তুলে নেবার, সকল মানুষের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার এক অদ্ভুত প্রাণাবেগ। সেই নীরবতা নিস্তব্ধতা পরবর্তী জীবনের জন্য কেবল শক্তি সঞ্চয় করছিল। সেই প্রাণাবেগ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল শ্রীনিত্যগোপালের স্পর্শলাভের পর থেকে। ১৩১২ (ইং ১৯০৫) সনে ২৩ বৎসর বয়সে বি, এ, পড়বার সময় পুরুষোত্তমানন্দ শ্রীনিত্যগোপালের সংস্পর্শে আসেন। এর এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর জীবন প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে আরম্ভ করে। এই সময়ই কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে ১০৭ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটে 'সত্যব্রত সমিতি'

নামে এক সঙ্ঘ রচনা করেন। তখনকার মনের অবস্থা লেখাপড়া ও এ সব কাজে স্থিতিলাভ করে নি, ভাব ছিল বৃন্দাবন। দুই-ই ছেড়ে চলে গেলেন। মাস ছয়েক পরে তত্ত্বে স্থিতিলাভ করে ফিরলেন, ব্রজমোহন স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করলেন। এই সময় স্থাপন করলেন 'বিশ্বকল্যাণ সভা'। ৮ বৎসর শিক্ষকতা করবার পর ভাক এলো পথেরও—থাকতে পারলেন না শুধু ঘর নিয়ে—চাকুরী ছেড়ে দিয়ে চিরদিনের জন্য পথের ভিখারী সাজলেন ১৯১৯-এর ২রা ফেব্রুয়ারী। ছোট সংসার করবেন না, বিশ্বসংসার করবেন, ঘরে আর পথে উভয়ত্রই ভগবানকে আস্বাদন করবেন—চাকুরী ছাড়ার পিছনে এই ছিল প্রেরণা। তেতরে এক অনির্বচনীয় প্রাণাবেগ রূপ নেবার অপেক্ষায় গর্জন করছে—চাকুরী জীবনের নিশ্চিন্ত পরিবেশে তার তৃপ্তি নেই—অনিশ্চয়তার বিপর্যয়পূর্ণ পথে সে প্রাণাবেগের গতাগতি। সে প্রাণাবেগ লিখিতভাবে আত্মপ্রকাশ করল ১৯১৯-এ লিখিত বেদান্ত-দর্শনের অবধূত-ভাষ্যে, তারপরেই থিয়োসফিক্যাল সোসাইটীতে এই তত্ত্বেরই ভাবণে। বেদান্তের 'অবধূত-ভাষ্য' প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটী বিপ্লব—স্থিতিপ্রধান চিন্তাধারার অচলায়তনকে গলিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মীস্থিতিতে দৃঢ় হয়েও কি করে গতিশীল জীবনকে স্বীকার করা যায়, সংসারকে ছেড়ে না গিয়ে কি করে তাকে হজম করে তারই মধ্যে ব্রহ্মাস্বাদন করা যায়—তারই বিপ্লবপূর্ণ দার্শনিক চিন্তাধারা তাঁর সমস্ত ব্রহ্মসূত্র জুড়ে রয়েছে। গতিশীল জীবনকে—মানুষের সমাজ রাষ্ট্রকে, তার প্রতিদিনের জীবনকে ভারতীয় দার্শনিক কোনদিন পারমার্থিক মূল্য দিতে পারেন নি—কেবলই এই ঝঞ্ঝাটময় জীবনকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন—চাঁদ সওদাগরের বাঁ হাতে ফুলপাতা ফেলার মত,—কেবলই মায়াময় এই পরিবার সমাজ রাষ্ট্রের দুঃখ কষ্টের বাইরে গিয়ে স্পন্দনহীন ব্রহ্মবস্তুকে চূড়ান্ত ধূলা দিয়ে এদেশের দার্শনিকেরা পরম শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছেন—মনে মনে কোণে ধ্যান করেছেন। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ বললেন—এই জীবন্ত বিশ্ব নোংরা বলে ছাড়বার প্রয়োজন নেই। একে যে রকম দেখছি, সেটাই তার শেষ রূপ নয়—একে নূতন করে গড়া যায়, একে এমন করে ব্যবহার করার সংবাদ আছে যাতে এরই মধ্যে ভগবানের আস্বাদন, পরম শান্তি সম্ভব। ভগবানের সৃষ্টিকে অশান্তির আগার মনে করে এর থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকব, অথচ যার পরম রেঁচে থাকব এই সৃষ্টির মধ্যেই এ অকৃতজ্ঞতা তাঁর মতে পরাজিতের। আমার অস্তিত্বই এই সৃষ্টির সঙ্গে ওতপ্রোত। ভগবানকে খুঁজতে যাব আকাশ পাতালে—এই সৃষ্টির মধ্যে, এই মানুষের মধ্যে ভগবানকে খুঁজলে পাওয়া যাবে না? পুরুষোত্তমানন্দ বললেন, অবশ্যই পাওয়া যাবে। তাই যেমন তিনি সংসার রাজনীতি রাখলেন সঙ্গে তেমনি রাখলেন ভগবানকে এরই মধ্যে পাওয়ার প্রচেষ্টা। মানুষের মধ্যে ভগবানকে পাওয়ার কথা এই ভারতেরই মহাপুরুষদের মধ্যে প্রায় সকল কেউ কেউ বরেণ্যবারই শুনিয়েছেন, মানুষের এই জীবনেই সুন্দরতর জীবনলাভের ইঙ্গিত দিয়েছেন—সেই কয়েক হাজার বৎসরের বুদ্ধদেব থেকে সেদিনের স্বামী-বিবেকানন্দ মানুষেরই মাঝে ভগবানকে খুঁজতে বলেছেন, মানুষের সেবাকেই ভগবৎ সেবা বলে ঘোষণা করে গেছেন। কিন্তু ভারতীয় যে চিন্তাধারায় বিধাতার এই সুন্দর সৃষ্টিটাকে অশান্তির আগার বলে প্রমাণিত করে রাখা হয়েছিল, সে চিন্তাধারাটাকে দার্শনিকভাবে কেউ বদল করে দিয়ে যান নি। তাই পুরাণো খাতেই আবার এই প্রাণবন্ত মহাপুরুষদের জীবনকে বইয়ে দিয়েছে পরবর্তীরেরা।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সংস্পর্শের পর ভারতবর্ষের জীবনধারা থেকে 'জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য'-র মতবাদ বাস্তবিকতার দিক থেকে কতই না বদলে গেছে—তবু দর্শনের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি অন্তরের অন্তস্তলে এরই ভূতকে আজও আমরা বহন করে চলেছি। আমরা বিশ্বাস করি—মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষ যে বলেছিল জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য—সেটাই চিরন্তন সত্য কথা—আজ এই সব যা কিছু করতে হচ্ছে কালের প্রকোপেই এই সব মায়ার খেলা চলছে—আবার দিন পাল্টাবে—সত্যের প্রকাশ হবেই। শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের

কথা হচ্ছে সত্যের প্রকাশ অবশ্যই হবে, কিন্তু সেটা ঠিক আগের অবস্থাতেই ফিরে যাওয়ার নয়—দুটোর synthesis-এ। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ফলে যা কিছু হচ্ছে তার যে অনেকটাই প্রতিক্রিয়ার অসৌন্দর্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—কিন্তু তাই বলে জগৎ মিথ্যা বাজটাই এতে সত্য বলে প্রমাণিত হয় না। আজ এইটেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, নিরেট জড় বলে এমন কোন বস্তু নেই যার ভেতর থেকে চেতনশক্তি বের করা না যায়। এই জগৎটাও তাই নিরেট জড় হয়ে শয়তানের আবাসভূমি নয়—এটাও চৈতন্যে ওতপ্রোত হয়ে ভগবানের লীলাভূমি; তবে তাকে সেইরকম করে তুলতে হবে, গড়ে তুলতে হবে। প্রাচীন দার্শনিকের সর্ব-নিরপেক্ষ ব্রহ্মবস্তুর কল্পনার একটা সার্থকতা যেমন আছে, তেমনি এই দৃশ্যজগতের প্রতি বস্তুও ব্রহ্মবস্তু হওয়ার যোগ্যতা রাখে তাকে ব্যবহার করতে জানলে, গড়ে তুলতে জানলে, এটাও সত্য কথা। এ চিন্তাধারা প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্যের সার্থক রূপ রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু ভারতীয় প্রস্থান-ত্রয়ের কাঠামোর মধ্য দিয়ে অর্থাৎ গীতা-উপনিষদ্-বেদান্তের মধ্য দিয়ে তা প্রস্থাপিত হয় নি বলে ভারতীয় দার্শনিকতার অচলায়তনকে স্পর্শ করতে সময়ও যেমন লাগবে, তেমনি দর্শনকে দর্শন দিয়েই আলোচনা করবার অপেক্ষা ও অবকাশও তা রেখে যেত। তবু আজকের চিন্তাশীলকে রবীন্দ্রনাথ বাঁচিয়েছেন—এ কথা হাজারবার সত্য। এই দুদিন আগে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের ৩৮-তম অধিবেশনের বাণীতে শ্রীনেহরু লিখলেন, '...আমাকে বাণী প্রেরণ করিতে বলা হইয়াছে, ইহা খুবই আনন্দের বিষয়, কিন্তু আমি স্বীকার করিতেছি যে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা ছাড়া দার্শনিকদের নিকট বাণীতে কি বলিতে হইবে তাহা আমি জানি না।

আমার মনে হয় যে, দার্শনিকদের সম্পর্কে সাধারণের ধারণা যে, তাঁহারা সাধারণ লোক হইতে পৃথক এক উচ্চ শ্রেণীর লোক। সেই কারণে তাঁহারা সাধারণের সুখ দুঃখ হইতে দূরে থাকেন। জাগতিক সমস্যা হইতে যিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখেন তাঁহাকে উচ্চ শ্রেণীর দার্শনিক বলা চলে না।

অপরদিকে রাজনীতিকগণ দূর ভবিষ্যৎ অপেক্ষা বর্তমান লইয়াই বেশী মাথা ঘামান। বিভিন্ন সমস্যা লইয়া তাহাদের দৈনন্দিন লড়াই এবং দূর ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দিবার সময়ও তাহাদের নাই।

দার্শনিকদের বিজ্ঞ ও শান্ত দৃষ্টিভঙ্গী কি ভাবে বর্তমান ও তাহার সমস্যার সহিত জড়িত রাজনীতিকদের সহিত যুক্ত করা যায় তাহাই আমাদের বিবেচ্য।

বর্তমানকালে ভারতে অন্ততঃ একজন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যাঁহার মধ্যে এই সমস্ত গুণই ছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর...।"—আনন্দবাজার, রবিবার ১২ই কার্তিক, ১৩৬৮।

—শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের প্রসাদে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সেই ১৯১৮-এ লেখা তাঁর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে জাগতিক সমস্যা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক হন নি তিনি, বর্তমান ও তার সমস্যাকে কিভাবে বিজ্ঞ ও শান্ত দৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত করে একটা সামগ্রিক জীবন-চেতনার সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে, তারই বিস্তৃত আলোচনা রেখে গেছেন। এ চিন্তাধারাটাকে মানুষের কাছে দার্শনিকভাবে উপস্থিত করাই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জীবনের আদর্শ, উদ্দেশ্য, কর্ম।

এই চিন্তাধারার প্রেরণায় পুরুষোত্তমানন্দ চাকুরী ছেড়ে কলকাতায় এলেন। কি করবেন তা তাঁর জানা ছিল না—চাকুরী করতে পারছিলেন না এটা ঠিক, কিন্তু অন্তরের প্রেরণা কোন্ পথে কি ভাবে কি রূপ নেবে, তার সংবাদ তো তখনও আসে নি। বুঝতেন এই অনির্বচনীয় প্রেরণা ধ্বংসাত্মক নয়, সংসার থেকে পালাবার মনোবৃত্তি নয়, সংসারের বস্তুটাকে অস্বীকার করবারও নয়—সে প্রেরণা গভীরভাবে সংগঠনাত্মক, সংসারটাকে এমন ভাবে গুছিয়ে গড়ে নেওয়া যাতে সংসার আর বিষ থাকে না, তা প্রসাদ হয়ে যায়। এই সময়ই শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের গুরুভাই স্বর্গীয় নিতাই পাল শ্রীনিত্যগোপালের ঐ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখতে বললেন। কিন্তু অর্থ কোথায়? পুরুষোত্তমানন্দের স্ত্রী-পুত্রকন্যার ভরণপোষণের উপায় কি? নাট্যাচার্য শিশির

ঘোষের পুত্র ধীমানবাবু পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের গুরুভ্রাতা ছিলেন। স্থির হল তিনি এবং আর কয়জন গুরুভ্রাতা মিলে প্রতি মাসে ৫০৲ টাকা করে পাঠাবেন—পুরুষোত্তমানন্দ এক বৎসরে ব্রহ্মসূত্রের অবধৃত ভাষ্য শেষ করবেন।

তাই হল—এক বৎসরে শেষ করে ঐ ভাষ্য নিয়ে পুরুষোত্তমানন্দ আবার কলকাতায় এলেন। ঘটনাচক্রে কিছু দিনের মধ্যেই মনীষী হীরেন দত্তের ইচ্ছাক্রমে বিদ্যাসাগরিক্যাল সোসাইটীতে এক ক্রমে চৌদ্দ রবিবার পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর ঐ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বেদান্তের নূতন রূপ মানুষের কাছে তুলে ধরলেন। তাঁর আলোচনা শুনে আর তাঁকে দেখে হীরেন দত্ত মশাই বলেছিলেন, 'He has a life, he has a call of the life, he feels the life'। আরও বলেছিলেন—পুরুষোত্তমানন্দের মুখে বেদান্তের এক নূতন রূপ দেখলাম।

এরপর পুরুষোত্তমানন্দ ১৯২০-তে কংগ্রেসের কাজে যোগদান করেন। যে জীবন-দর্শন পুরুষোত্তমানন্দের বুকের মধ্যে আকুপাকু করছিল, তা ছিল শোষণের দর্শন—যে কোন রকম শোষণের বিরুদ্ধেই তার অভিযান। দেহের ক্ষেত্র ইংরেজের অধীনতায় পিষ্ট হতে থাকবে, তার বিরুদ্ধে আমি দাঁড়াব না, অথচ ধর্মকর্ম করে আমি আত্মার মুক্তি লাভ করব—পুরুষোত্তমানন্দের জীবন-দর্শনে সে কথা লেখা ছিল না। তাই তাঁর প্রাণ কাঁপিয়ে পড়ল ইংরেজের শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেদের মানুষ হবার আন্দোলনে। কি তীব্র আবেগ নিয়ে তিনি সেদিন জনসাধারণের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, একটা বুঝতে না-পারা অথচ ভাল-লাগার কতকগুলি চিন্তাধারা কি ভাবে সর্বসাধারণের চিন্তা-জগতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, তার সাক্ষ্য হয়ে আছে বাংলাদেশের ছোট বড় অগণিত মানুষের হৃদয়—যারা দীর্ঘ দিনের ব্যবধানেও সেদিনের শরৎ ঘোষের বজ্র-নির্ঘোষ জীবন-বেদান্তের দুইচারিটী কথাও অন্ততঃ মনে রেখেছেন, কিংবা যে শিহরণ সেদিন বোধ করেছিলেন, আজও তা স্মরণ করে পুলকিত হন। সেদিন কিংবা চিরদিনই শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ যা বলতেন সবই তার অনেকখানিই বুঝত না—বুঝত না যেমন করে চরকা আর ইংরেজ বিতাড়নের সঙ্গে রামকৃষ্ণ, বেদান্ত উপনিষদ্ এসে হাজির হয়—কি করে পুরুষোত্তমানন্দ এক সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে সব মিল দিয়ে বলে যান। আজও তাঁর রচনা অনেকখানিই দুর্বোধ্য হয়েই আছে, যেমন তাঁর জীবনও—তবু সর্বসমন্বয়, পরস্পর বিপরীতের সমন্বয় বলে যে একটা বস্তু বাস্তব জগতে চলে আসছে এবং তাই-ই যে চলতে চাইছে—আজকের রাজনীতিক ক্ষেত্রে বিশ্বের অবস্থা অনুধাবন করলে এর খানিকটা আভাস মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

যাইহোক, সমস্ত প্রাণ দিয়ে কংগ্রেসের কাজ করলেও, দেশের নেতৃস্থানীয় থেকে জনসাধারণ সকলের অশেষ প্রীতিভাজন হয়েও শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের পক্ষে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থাকা সম্ভব হল না। সেদিনের নো-চেঞ্জার প্রো-চেঞ্জারের নীতিগত ভেদের কথা অনেকেরই জানা আছে। শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের কাছে পথই গন্তব্যস্থলকে গড়ে তোলে—যে কোন উপায়ে মহৎ বস্তু লাভ হয় না—স্বরাজের মত মহৎ বস্তু লাভ করতে হলে সত্য ও মহৎ পথেই যেতে হবে—সেদিনের বিবাদের কারণটা ছিল এই। পথের বিশুদ্ধতার প্রতি গভীরভাবে আস্থাশীল শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ সেদিন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গুরু মহাত্মা গান্ধীজীকে অসীম শ্রদ্ধা নিয়েও তাই বলতে পেরেছিলেন, 'I shall fight with Gandhi in order to maintain his Gandhism'। নিখো ভোটের জোরে নিজেকে টিকিয়ে রাখবার প্রয়োজন তাঁর ছিল না—তাই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ছাড়লেন। কিন্তু কংগ্রেসের মূলনীতির সঙ্গে কোন বিরোধ ছিল না বলে জীবনে কোনদিন কংগ্রেসকে নিন্দিত করেন নি, তার বিরুদ্ধাচরণও কোনদিন করেন নি। তাঁর কথা ছিল—কংগ্রেস পিতৃস্থানীয়—তার ভুল হতে পারে, পথে আনতে না পারলে পথে আনবার প্রচেষ্টা নিয়ে একটু সরে দাঁড়াতেও পারি কিন্তু তাকে সত্যিকারের পরিত্যাগও করা চলে না, তার বিরুদ্ধে বলাও চলে না—কেবল তার ভুলকে শুদ্ধ করবার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা করা চলে।

কংগ্রেস-নীতি তিনি পরিত্যাগ করেন নি, নীতি-বহির্ভূত দল করবার পদ্ধতিকেই তিনি মেনে নিতে পারলেন না। তাই কংগ্রেসকে বাইরে থেকে ছাড়লেও কংগ্রেসের আদর্শই মানুষের কাছে তুলে ধরবার জন্য, আরও ব্যাপকতর জীবনবোধের পরিচয় মানুষকে দেবার জন্য তিনি সেই সময়ই 'স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ' গঠন করে জনসাধারণের মধ্যে কাজ করে যেতে থাকলেন। জনসাধারণের মধ্যে নিজেকে তিনি বিলিয়ে দিয়ে ছিলেন, —বুদ্ধি দিয়ে নেতৃত্ব তিনি করেন নি, প্রাণ দিয়ে একেবারে সাধারণ মানুষেরও মধ্যেকার অন্তর্নিহিত পরিপূর্ণ মানুষটিকে খোঁজ করে জানতে প্রাণপণ করে গেছেন।

যাই হোক, স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ চালাবার সময়ই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ 'উজ্জলভারত' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছিলেন। বাংলা ১৩৩১ থেকে ১৩৩৪ (ইং ১৯২৪-২৮) দুই বৎসর এটা চলেছিল। ১৩৩৪-এই তিনি নবদ্বীপের 'গৌরাঙ্গ গোষ্ঠি' নামে এক সমিতি করেন— নবদ্বীপের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তার সভ্য ও কর্মী ছিলেন। এই সময় অন্তরে তাঁর এলো আবার বৃন্দাবন যাওয়ার। এত দিনের শরৎ ঘোষ এই সময়ই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত নাম গ্রহণ করে বেরিয়ে চলে গেলেন। সেটা ইংরেজী ১৯২৭। তাঁর দেরুয়া পরার কথা শুনে মহাত্মাজী বলেছিলেন, শরৎবাবু আগে কম সন্ন্যাসী ছিলেন কিসে? এইবার বৃন্দাবন গিয়ে শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ আড়াই বৎসর ছিলেন। এই সময়ের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন— এ সময়টাতে যেন আমার মধ্যে তত্ত্ব-বৃষ্টি হতো—পরিপূর্ণ সামগ্রিক সমন্বয় তত্ত্বের প্রচুর কথা এই সময় তাঁর মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছিল।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সম্বন্ধে একটা উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, জগৎ ও জীবনের এই যে নূতন মূল্যবোধের কথা ভারতীয় শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে দিয়ে গেলেন, সারা জীবনে তেরো চৌদ্দ হাজার বক্তৃতার মধ্য দিয়ে মানুষের বিস্মিত চিত্তের কাছে তিনি যে শাস্ত্রের এক নূতন দৃষ্টি তুলে ধরলেন, এই এত কথা প্রকাশ্যভাবে তিনি কারো কাছে শেখেন নি—তাঁর গুরুদেব শ্রীনিত্যগোপালও একান্তে এর কোন কথাই তাঁকে বুঝিয়ে যেন নি। দীক্ষা দেবার সময় মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে শ্রীনিত্যগোপাল বলেছিলেন, 'এক বৎসর পর বদলে দেব'। এই এক বৎসরের মাথায় পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে কৃষ্ণ-তত্ত্ব, রাধা-তত্ত্ব, গৌর-তত্ত্ব, সামগ্রিক সমন্বয়-তত্ত্ব ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠতে থাকে— শ্রীনিত্যগোপালের জীবন ও রচনা এর মূল প্রেরণাদাতা আর উপনিষৎ গীতা ভাগবত সে ফুটে ওঠাকে সাহায্য করে তুলেছে। একবার মাত্র পুরুষোত্তমানন্দ শ্রীনিত্য-গোপালকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য বার বার তাঁর অনুমতি চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর উত্তরে শ্রীনিত্য-গোপাল তাঁকে বলেছিলেন, 'শরৎ, তুমি কি জান না ভগবান অন্তর্যামীরূপে তোমায় যখন যা প্রয়োজন বুঝিয়ে দিচ্ছেন'? শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের মধ্যে সমস্ত তত্ত্ব শ্রীনিত্য-গোপালের আশীর্বাদে ভেতর থেকে ফুটে উঠেছে। বস্তুকে অস্বীকার করে তাঁর অতীত হওয়ার সাধনা এক কথা—যা এতদিন প্রচলিত ছিল; আর বস্তুকে স্বীকার করে, তাঁকে সেবা বুদ্ধিতে গ্রহণ করে তাকে বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়ে তার অতীত হওয়া এ আর এক কথা। শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের মধ্যে স্বীকার করেও তার অতীত থাকার এমন একটা স্বতঃসিদ্ধ অবস্থা ছিল যেটার জন্যই সামগ্রিক সমন্বয়ের এই তত্ত্ব তাঁর ভেতর থেকে ফুটে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। এ সাধনা আজ আমাদের নূতন করে শিখতে হবে।

আড়াই বৎসর পর বৃন্দাবনে আর তাঁর থাকা হল না—তাঁর প্রতি একাধিক বার আদেশ এল—বাঙ্গালায় যাও, কাজ আছে। ফিরে এলেন—তখন ১৯৩০-এর আন্দোলন সবে সুরু হচ্ছে—পুরুষোত্তমানন্দ কারো আহ্বানের অপেক্ষা না রেখে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সে আন্দোলনে।

১৯২০-তেও তাঁকে জেলে যেতে হয়েছিল, ১৯৩০-এও গেলেন। ছয়মাস পর জেল থেকে বেরিয়ে স্বরাজসেবক সঙ্ঘের ঘরেই আনন্দমঠ নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়লেন। ঘটনাচক্রের পাকে এর পর পরিবারের সকলকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন—এসে ১৯৩২-এ নয়নারায়ণ

আশ্রম স্থাপন করলেন। কলকাতা থেকে এই নরনারায়ণ আশ্রমকে নিয়ে ১৯৫৬-তে ২৪ পরগণা জেলায় বাগুই-আটি গ্রামে এলেন—মাত্র দুই বৎসরের মাথায় এই মাটির নীচে চির বিশ্রাম লাভ করলেন। তাঁর পবিত্র দেহ এই মাটির নীচে থেকে আমাদেরকে প্রেরণা দান করছে।

—এই যে পর পর এতগুলি সঙ্ঘ তিনি গড়েছিলেন এর পিছনে কেবল দশে মিলে মিশে থাকার প্রেরণাই ছিল না—যদিও এই প্রেরণা, এই বিশ্বজনের ধারণা বস্তুকে গ্রহণ করে তার অতীত হতে গেলে একেবারে অপরিহার্য—তবু এটা মনে হতে পারে যে এই সঙ্ঘ গড়াটা তো আজকাল কতই হচ্ছে, সঙ্ঘ সমিতি ক্লাব প্রভৃতি তো ঘরের আনাচে কানাচে। তার উত্তর হচ্ছে, আজ এ আনাচে কানাচে হতে পারে, কিন্তু ১৯০৪-এ এটা আনাচে কানাচে ছিল না। আর আরও একটা কথা হচ্ছে যে, দশে মিলে তিনি আরাম ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করেন নি—একটা সেবাবুদ্ধি ছিল তার বাইরের প্রকাশে আর অন্তরের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বে সত্যানন্দ আস্বাদন করবার পথের কথা জানতে ও জানাতে, বিশ্বকে কি করে প্রেমাদ্বে গড়ে তোলা যায় সেই পুরুষোত্তম-কথা আস্বাদন করতে ও করাতে।

নরনারায়ণ আশ্রম স্থাপনা করে তিনি প্রধানত ভারতবর্ষের দার্শনিক ক্ষেত্রকে বদলাবার প্রয়াসই করেছেন, যদিও ১৯৪২-এও আগষ্ট আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেছিলেন, ১৯৬৬-এও সতীন সেন মহাশয়ের election campaign-এ তাঁকে সাহায্য করতে অনুরুদ্ধ হয়ে বরিশালে পরিভ্রমণ করে ছিলেন। কিন্তু সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানুষে মানুষে বা মানুষে ভগবানে সম্পর্কের যে নূতন ধারণা ছুটে উঠছে, সেটাকে দার্শনিকভাবে প্রস্থাপন না করলে, ভারতবর্ষের শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে ভারতীয় চিত্তের কাছে তা উপস্থিত না করলে, ভারতবর্ষের কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন খুব বেশী ফলপ্রসূ হবে না এবং ভারতীয় চিত্তের অচল অনড় অবস্থাকে সমূলে উৎপাটন করে তাকে কল্যাণের মধ্যে টেনে আনা যাবে না—কেবল হবে তা বাইরের অনুকরণ—চারদিকে তাকিয়ে দেখলেই যার পরিচয় আজ মিলবে—একথা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই ১৯১৯-থেকে এই ১৯৫৬ পর্যন্ত একই সমগ্র জীবননীতির কথা তিনি বলে গেলেন। রাজনীতি প্রত্যক্ষভাবে ছাড়বার পর ক্রমে সেটাকেই জোরালো করতে চাওয়ার প্রয়াস করে গেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন তাঁর আলোকন যা নূতন করে শাস্ত্র ব্যাখ্যা ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে যেমন সহজ ও সম্ভব করবে, তেমনি স্বাধীনতাকে তা সার্থক করবে—তাই নরনারায়ণ আশ্রম স্থাপনা করে বাংলাময় পরিভ্রমণ করে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে এই নূতন ধারণাটা মানুষের কাছে উপস্থিত করতে থাকলেন।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সম্বন্ধে আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, সেই ১৯১৯-এ যে তিনি চাকুরী ছাড়লেন কিংবা ১৯২৭-এ যে তিনি সন্ন্যাস নিলেন, এর কোন সময়ই তিনি তাঁর স্ত্রীপুত্রকন্যারূপ যে কন্যাটি তা ত্যাগ করেন নি। সেই প্রথম থেকে নরনারায়ণ আশ্রম স্থাপন করবার অনেক কাল পর পর্যন্ত তাঁরা সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন, তাঁর কর্ম ও আদর্শের সঙ্গে তাঁদের সাধ্যমত সহযোগিতা করে এসেছেন। পারিবারিক জীবনের জটিলতা ও কন্যাটকে স্বীকার করেও যে বিশ্বজন জীবন যাপনদ্বারা সে জীবনের অতীত যাওয়া যায়, পুরুষোত্তমানন্দ সাধা জীবন ধরে এইটেই প্রমাণ করে গেছেন। এজন্য তাঁকে যে মূল্য দিতে হয়েছিল সেটা এইজন্যই সম্ভব হয়েছিল যেহেতু পরম বৈরাগ্য তাঁর স্বভাবসুলভ বৃত্তি। যতক্ষণ তাঁর সংসার তাঁর আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে পেরেছিল, সহযোগিতা করতে পারছিল, ততক্ষণ তা তাঁর সঙ্গে ছিল—যখন তা সম্ভব হল না, তখন তা আপনিই খসে পড়ল; তিনি তাঁর আদর্শ নিয়ে চলতে থাকলেন—শেষ দিন পর্যন্ত চললেন। সংসারের সব ঘটনাকেই কি করে ভগবৎ-সেবার কাজে লাগান যায় তার ছন্দ তিনি জানতেন বলেই অনেক দুরূহ প্রচেষ্টা করে গেছেন। সেখানে যতটুকু তাঁর নিজের করবার সেটা ঠিক থাকলেও

আর দশজনকে সেই ছন্দে গড়ে তোলা সবটুকু তো শেষ পর্যন্ত হয় না—তবু সমগ্র প্রচেষ্টাটা তাতে একেবারেই ব্যর্থ হবে কেন? প্রচেষ্টাটারই নিজস্ব একটা মূল্য আছেই—সৃষ্টির মধ্যে নিগেটিভ দিকটা যখন রয়েছে, আলোর সাথে অন্ধকার যখন চিরদিন আছে, সৃষ্টি যতদিন আছে ততদিন থাকবেও, তখন অন্ধকারকে একেবারে মুছে ফেলার প্রচেষ্টা মূর্খতাও বটে, অবৈজ্ঞানিকও বটে; সৃষ্টিই যে তা না হলে সম্ভব হয় না। এটা শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ জানতেন বলেই অন্ধকারকে দূর করবার—যে অন্ধকার পথচলাকে ব্যাহত করে সে অন্ধকারকে দূর করবার বহু প্রচেষ্টা করবার অসীম ধৈর্য তাঁর ছিল, অথচ তাকে নিশ্চিহ্ন করবার অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিও তিনি রাখতেন না। তাই তাঁর সংসারকে তিনি কোন দিন ছাড়েন নি—শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন তাকে গড়ে তুলে তাকে ঈশ্বরলাভের উপযোগী, সহযোগী করতে—অপর পক্ষ যতদিন সম্ভব সহযোগিতা করেছে, তারপর ধাব ধার পথে রওয়ানা হয়েছে।

১৯৪২-এর আগে তিনি কয়েকটী বই প্রকাশ করেছিলেন—গীতার অধ্যাত্ম ভাষ্যের ভূমিকা ভাষ্যপ্রদীপ, ব্রহ্মসূত্রের চতুঃসূত্রী ভাষ্য এবং উদ্বোধনারতি, স্বরাজের পূর্ব-রূপ ও গীতা ঈশ্বরী বলে তিনখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৪২-এ আগষ্ট আন্দোলনে জেলে গিয়ে ঈশ-কেন-কঠ প্রভৃতি এগারখানা প্রধান উপনিষদ্ ও গীতার বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করেন। ১৯৪৩-এ জেল থেকে বের হওয়ার কিছুদিন পর ঈশোপনিষদ্ ছাপা হয়। তাঁর চিন্তা-ধারা নিয়ে লেখা অপর দুই তিনটি বই ছাপা হয়। এরপর ১৯৪৭-এ তাঁর উদ্বোধনারতি পত্রিকা আবার প্রকাশ করেন, এবার সাপ্তাহিক নয়, মাসিক হিসাবে। সেই থেকে উদ্বোধনারতি এ পর্যন্ত চলে আসছে, আপনারা তা জানেন। এ পর্যন্ত তাঁর দশখানা বই প্রকাশিত হয়েছে, আর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১০ বৎসরের পরিশ্রম লিখিত তাঁরেরী, বহু অপ্রকাশিত পত্র এখনও চখানা বই প্রকাশ করতে বাকি আছে। প্রায় ৪ বৎসর হল শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর স্থূল দেহকে সরিয়ে নিয়েছেন আমাদের মধ্য থেকে—চলে যাওয়ার মাত্র দুই বৎসর আগে এই গ্রামে এসেছিলেন, এসে যতটুকু প্রেরণা ও প্রীতি আপনাদের কাছে রেখে গিয়েছিলেন, তাঁর সারাজীবন ধরে যা বহু মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, তারই জন্য তাঁর কাজ আজও চলছে।

মানুষকে তিনি ভালবেসেছিলেন—সর্ব মানুষকে, কিন্তু এইখানেই তাঁর শেষ কথা নয়। যে মানুষকে প্রতিদিন দেখছি তার সমস্ত ক্ষুদ্রতা সংকীর্ণতা নীচতাশুদ্ধ সেই মানুষটীই মানুষের শেষ কথা নয়—এই মানুষের মধ্যেই লুকিয়ে আছে একটী ব্রহ্ম-মানুষ—যার সাথে অপরের বিরোধ নেই—বিরুদ্ধ অপরকে নিয়েও যে মিলে মিশে থাকতে জানে—সেই ব্রহ্ম-মানুষটিকে ফুটিয়ে তুলে সর্ব মানুষের সঙ্গে বিশ্বরূপ জীবন যাপন করার মধ্যে যে বিরাট গভীর মুক্তির আনন্দ আস্বাদন—সেই আস্বাদনে মানুষকে অধিকারী করার প্রাণঢালা প্রচেষ্টা হচ্ছে মানুষ সম্বন্ধে পুরুষোত্তমানন্দের শেষ কথা। এই ব্রহ্ম-মানুষকে ফোটাবার চেষ্টায় জীব-মানুষের আঘাত যে তাঁকে কত সইতে হয়েছে, সে ইতিহাসের লেখাজোখা নেই। কেননা যোগ্য মানুষকে তিনি নেবেন, সেটা তাঁর কথা ছিল না—সব মানুষকে—যে কোন জাত, যে কোন শিক্ষাদীক্ষা কালচারের মানুষকেই ব্রহ্ম মানুষ করার জন্য বুকে তুলে নেওয়া যায়—এটা তিনি সমস্ত প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতেন বলেই সব মানুষকে বুকে তুলে নিয়ে ব্রহ্ম-মানুষ করার চেষ্টা করতেন—আর জীবত্ব-প্রধান সে মানুষ কেবলই প্রতিঘাত করত। এই ছিল তাঁর সারা জীবনের ইতিহাস। শিষ্য তিনি ২।৩ জন করেছেন—কিন্তু বুকে তুলে নিয়েছেন আমাদের মত বহু নগণ্য ক্ষুদ্র মানুষকে। আমরা মানুষ হই নি বলেই তাঁর সৌন্দর্য নষ্ট হয় না—কেননা আমাদের মত অত্যন্ত সাধারণকেও তিনি এমন করে স্নেহ করতেন, আপন মনে করতেন—আমাদেরকেও ব্রহ্ম-মানুষ করতে তিনি প্রাণপণ করেছেন—এইখানেই তাঁর সৌন্দর্য, তাঁর মহত্ত্ব; আমরা মানুষ হই নি, আমরা ব্যর্থ হলাম। কিন্তু তাঁর মানুষ হওয়ার আহ্বান আকাশে বাতাসে রয়ে গেল, তাঁর

দেওয়া পথচলার ছন্দের কথা বলে গেল তাঁর অগণিত লেখায় ও জীবনে—আমার বেঁচে আসবে, আমার বেঁচে মানুষ হবে—তাঁর মানুষ হওয়ার পথের খবর তো আমাদের দিতেই ফুরিয়ে যায় নি—চিরদিনের মানুষের জন্য চিরদিন থাকবে—সত্য সন্ধানী মানুষের কাছে তা চিরদিন আহ্বান জানাবে।

আবারও বলছি আজ তাঁর জন্মদিনে আপনারা এসেছেন, আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করছি তিনি কেমন আনন্দিত হয়েছেন—আমি যে দেখেছি মানুষের কাছে কৃষ্ণ-কথা, বিশেষ পুরুষোত্তম-তত্ত্বকথা কইতে পারলে তিনি কত আনন্দ পেতেন—তাঁর সে আনন্দ উপলব্ধি করে তাঁর সাদর আহ্বান আমি আপনাদের জানাই। আপনারা তাঁর লেখা পড়ুন—পড়ে দেখুন কেমন সকল উপাধিমুক্ত—দেহে মুক্ত, আত্মায় মুক্ত—একটী স্বতন্ত্রের আধুনিকতম জীবনাস্বাদনের কথা তার মধ্যে রয়েছে—আমি আপনাদের সে আনন্দ আস্বাদনে আহ্বান জানাই। আপনারা আজ এসেছেন, ভবিষ্যতেও আসবেন—দেশকালপাত্র নিরপেক্ষ মানুষের সঙ্গে মানুষের মানুষোচিত সম্পর্কের আজকের এই নূতন ধারণাকে ভারতবাসীর জীবনে পৌঁছে দেবার তাঁর প্রচেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষাকে জয়যুক্ত করে তুলবেন—তাঁর হয়ে আপনাদের কাছে এই আমার নিবেদন। বিশ্বজুড়ে মুক্ত জীবনের অধিকারী এই চিন্তার জয় হোক, এই মানুষের জয় হোক্। আর আজ এই বিশেষ দিনটীতে আপনাদের সকলের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দকে আমি জানাই আমার সকল সত্তার প্রণাম—তিনি আমাকে ধন্য করেছেন, আমি যেন তাঁর আদর্শ ও পথ অনুসরণ করে জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তাঁর সেবা করে যেতে পারি, আজকের দিনে তাঁর কাছে এবং আপনাদের কাছে এই আশীর্বাদ আমি কামনা করি।

এই সঙ্গে আরও একটি কথা—আজকের দিনে এই যে আপনাদের সঙ্গে এখানে মিলিত হতে পেরেছি এ সম্ভব হয়ে ওঠার পিছনে যে কত মানুষের কত সহযোগিতা রয়েছে তার লেখাজোখা নেই—নাম করে করে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্রকাশ করা সম্ভব নয়—দূরের কাছের, ছোট মধ্যম বড়, অল্প বেশী কত রকম মানুষের কাছ থেকে কত রকমের সাহায্য নিয়ে যে আজকের এই অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছে, সে কথা প্রকাশ করা সম্ভব নয়, আমি আশ্রমের পক্ষ থেকে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি—তাদের সকলের সহযোগিতায় এতটা পথ এসেছি, ভবিষ্যতেও সকলের সহযোগিতাতেই পথ চলতে পারব এই ভরসা রাখি।*

"মায়াহীন ব্রহ্ম নিছক 'শূন্য'; ব্রহ্মস্পর্শহীনা মায়া শয়তানী। মায়াচুম্বিত ব্রহ্মই পরিপূর্ণ পুরুষোত্তম।"

"যখন কৃষ্ণ রাধা সঙ্গে প্রতিভাত হন, তখনই তিনি মদনমোহন; রাধাহীন কৃষ্ণ বিশ্বমোহন হইয়াও স্বয়ং মদন মোহিত।"

পুরুষোত্তমানন্দ।

---

* বিগত ১০ই অগ্রহায়ণ ১৩৮৭ রবিবার শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ৭৯-তম জন্মতিথি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় পঠিত।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ স্মরণে

॥ শ্রীচুনীলাল মিত্র ॥

মহাত্মা রা. রামমোহন রায়ের মৃত্যু-শতবার্ষিকী উৎসবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হল সভায় আচার্য সর্বপল্লী-রাধাকৃষ্ণন মহাশয় যে সারগর্ভ উক্তিটি করেছিলেন আজ তাঁর স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের শতম জন্ম উৎসব অনুষ্ঠানে বারে বারে সেই কথাই মনে হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন যে অন্যান্য দেশে রাজা-মহারাজা, যোদ্ধা সেনাপতিরই জন্ম বার্ষিকী পালিত হয়, কিন্তু ভারতবর্ষ এমনই একটা দেশ যেখানে কেবল মাত্র জন্ম বার্ষিকী নয় জন্ম শত বার্ষিকীও পালিত হয় রাজা সেনানায়কের নয়, ঋষি মনীষীর, সাধক ও মহাত্মার। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ এই শ্রেণীর সাধুমহাত্মা, ঋষি মনীষীর অন্যতম। তিনি একাধিক ক্ষেত্রে অনেকের অগ্রগণ্যও বটে। তিনি মানুষের অন্যতম শিক্ষাগুরু। তিনি মনের ও হৃদয়ের একাধিক গুণের অধিকারী ছিলেন যাহা আমাদের সাধারণ সমাজে বিরল। তিনি নিজেকে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের বলিয়া স্বীকার করিতেন না। সমস্ত মত ও পথ, একাধিক আদর্শ ও দর্শন তাঁহার জীবনে ব্যাপ্ত হইয়াছে। তিনি যথার্থই 'অবধূত'। সকলপ্রকার 'ism' ও 'orthodoxy' সঙ্কীর্ণ ও গোড়া মতবাদ তাঁহাতে বিলীন হইয়াছে।

মানুষের চিন্তার ইতিহাসে, সকল দার্শনিক মতবাদ বিশ্লেষণে ও নিজের বলিষ্ঠ ও মৌলিক মত স্থাপনায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। অথচ তাঁর স্বকীয় মত সর্বসম্মতি ও সর্বসমন্বয়ে পুষ্ট। কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্ত্য, কি প্রাচীন ও কি অধুনা সকল চিন্তাধারায় তিনি ছিলেন ধারক ও বাহক। পাণ্ডিত্যে ও প্রকাশে, ভাবে ও ভাষায় এমন অপূর্ব সমাবেশ আমরা দ্বিতীয় কোন পুরুষের মধ্যে দেখি নাই। তিনি যথার্থই ভাবের পূজারী ছিলেন। কী বৃন্দাবন-লীলা, কী শ্রীরাধাতত্ত্ব, কী বেদ কী উপনিষদ্—সকলের সারগর্ভ তত্ত্ব বিশ্লেষণে তিনি অদ্বিতীয়। অথচ ভাবের ক্ষেত্রেই তিনি বিচরণ করেন নাই। নিছক চিন্তা-জগতের পুরুষ তিনি ছিলেন না। ভাব, নীতি ও আদর্শকে তিনি নিজ জীবনে রূপায়িত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনীতে সমন্বয় ধর্মের সম্যক্ ব্যাখ্যা প্রকট হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, মানব ধর্ম ও সমন্বয় দর্শনের তিনিই সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। তাঁহার সমন্বয় কেবলমাত্র মতবাদে মতবাদে নয়, নারী পুরুষে নয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে নয়, শুধু কথা উহা জাতিতে জাতিতে ও জড় চেতনে। তাঁহার সমন্বয় জীবন মৃত্যুতে, বাল্যে বার্ধক্যে, সংসার সন্ন্যাসে, ইহকাল পরকালে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ, শ্রীঅরবিন্দের ন্যায়ই মৃত্যুকেই চরম বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না, দুঃখ দুর্দশাকেই মানব জীবনের শেষ কথা বলিতেন না। বস্তুতঃ "Death is a temporary inertia, suffering a temporary privation. Death is not the last word of existence, nor is suffering the only fact of life. They arise out of our wrongly identifying life with the phases of life. The cure lies not in forsaking them, but getting ourselves more and more identified with them."

অধ্যাত্ম জীবনকে তিনি কল্পনার জীবন ও পরপারের অবস্থা বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। উহা একাধারে একক ও বিশ্বজনীন বলিয়াই স্বীকার করিতেন। Eucken এর ভাষায় "Spiritul life is at the same time a self life and cosmic life. (Addolf Eucken's: Main currents of modern Thought)। যে জীবন যুগপৎ ব্যক্তিগত ও বিশ্বমানবের

উহাই অধ্যাত্ম জীবন। উহা সেই পরিমাণে সত্য।

স্বামী বিবেকানন্দের উত্তর ও একনিষ্ঠ সাধক অবধূত মহারাজ চিন্তায় ও বাক্যে, বাক্যে ও কর্মে, পরিবারে ও সমাজে অকপটে স্বীকার করিতেন "প্রসারতাই জীবন, সঙ্কীর্ণতা পাপ ও মৃত্যু।" অবধূতের অগ্রজের ভাষায় "Expansion is life. contraction death."

আজ যে পৃথিবী আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা, তাপীয় বোম ও থার্মোনিউক্লিয়ার (Thermo-nuclear) যুদ্ধের সম্মুখীন, সমগ্র মানব সমাজ যে সহস্রিতি অথবা সমূহ বিনষ্টির মধ্য পথে অবস্থিত ইহার একমাত্র কারণ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অমিল, জাতিতে জাতিতে অসঙ্গতি, মানুষের মনে প্রাণে অসদ্ভাব। এই সংকটে, এই বৃহত্তর জীবনের পটভূমিকায় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী অবধূত মহারাজের অবদান রহিয়াছে। মানুষ যদি মানুষকে স্বীকার করিত, প্রাণ দিয়া বুঝিত, হৃদয় দিয়া মর্যাদা দান করিত, তাহা হইলে মানুষে মানুষে বিদ্বেষ থাকিত না, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ হইত না। তাহা হইলেই যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান হইত, মনুষ্যজাতি সংকটের সম্মুখীন হইত না। এই মানব মিলন প্রাণের ক্ষেত্রেই সম্ভব, মনের ক্ষেত্রে নয়। স্বামিজী মহারাজ মানুষকে প্রাণধর্মী বলিয়া স্বীকার করিতেন বুদ্ধিজীবী বলিয়া নয়। প্রাণ মানুষকে তার ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য ও তাহাদের উৎসকে সামগ্রীকভাবে গ্রহণ করে, ক্ষুদ্র সংকীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন করিয়া নহে। এই নীতি—আদর্শই প্রতিপালিত হইলেই বিশ্বে এক মানব গোষ্ঠী স্থাপন সম্ভব, শত শতাব্দীর ও Co-existence-এ নয়।

তাঁহার জীবনাদর্শে জীবন-মৃত্যু, চাওয়া-পাওয়া, বাসা-বাঁধিবা, সংসার-সন্ন্যাস যুগপৎ সত্য ও তুল্য মূল্যবান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়

"এমন একান্ত করে পাওয়া এও সত্য যত,
এমনি একান্ত ছেড়ে যাওয়া সেও তারই মত।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোন মিল,
নহিলে নিখিল,
এত বড় নিদারুন প্রবঞ্চনা হাসিমুখে এতকাল
বিছুতে রহিতে পারিত না,—
সব তার আলো—
কীটে কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো।"

অবধূত পুরুষোত্তমানন্দ ভাগবতোক্ত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ জীবনকেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ জীবন বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার বিচারে পৃথিবীর ইতিহাসে কী অতীতে কী বর্তমানে, কী পশ্চিমে কী পূর্ব দেশে এমন পূর্ণ জীবন বিরল। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই ব্যাপকতম জীবন যাপন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায় শ্রীকৃষ্ণ একাধারে—

মল্লানাং অশনির্নৃণাং নরবরঃ
স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্,
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাম্
শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতেঃ বিরাড়বিদুষাম্
তত্ত্বং পরং যোগিনাম্,
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতঃ
রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

মহামতি ব্রাডলের সিদ্ধান্তও অনুরূপ :—"The more comprehensive a life is the more real it is. —G. H. Bradley: "Appearance & Reality." স্বামিজী অংশকেও পূর্ণ বলিতেন। জগত ব্রহ্মেরই ন্যায় তুল্য সত্য। ইহা যেন মহাজন বাক্য "So much appearing is so much Being." এরই প্রতিধ্বনি ও সমর্থক।

এক কথায়, ইম্মানুয়েল ক্যাণ্টের (Immanuel Kant, 1724—1804) অবদান স্মরণে রাখিয়াও যেমন বলা যায় যে সমগ্র পাশ্চাত্য দর্শন প্লেটোর দর্শনেরই ব্যাখ্যা ও মন্তব্য, পাশ্চাত্য জগতে প্লেটোর (Plato, 427—347 B. C.) পর কোনও তেজস্বী দার্শনিকের বলিষ্ঠ মতবাদ সৃষ্ট হয় নাই, তেমনই প্রাচ্য ভূখণ্ডে আচার্য শংকরাচার্যের পর স্বজনী প্রতিভার দ্বারা সৃষ্ট দর্শন গড়িয়া উঠে নাই। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত এই বিরাট অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহার

ধর্ম দর্শনের একাধিক গ্রন্থ ও তাঁহার প্রচার তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আমরা বিশ্বাস করি, আজ দেশে দেশে, সহরে পল্লীতে বাংলায় ও বাংলার বাহিরে স্বামিজী মহারাজের অর্পিত ভক্ত, শিষ্য ও অনুরাগী তাঁহার আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করিবেন, দিকে দিকে ভাগবত ধর্ম ও দর্শন প্রচার করিবেন, পরিবারে সমাজে ও বৃহত্তর রাষ্ট্রে পুরুষোত্তম জীবন গঠনে ব্রতী হইবেন। আজ তাঁহারা সমবেত চেষ্টায় স্বামিজীর জীবনী প্রণয়নে, স্থায়ী স্মৃতি স্থাপনে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার নামে বক্তৃতামালা প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হইবেন। তাহা হইলেই তাঁহার প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন সত্য হইবে। জন্মতিথি উৎসব বাসরে আমরা একবাক্যে এই সঙ্কল্পই গ্রহণ করিব।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা পচন্তি আত্মকারণাৎ

যজ্ঞ করার পরে যা থাকে, শিষ্ট-অবশিষ্ট অর্থাৎ বস্তুকে পরিত্যাগ করার পরই বস্তু আমার হ'তে পারে—। নিবেদন করতেই হবে যদি সার্থকভাবে পেতে চাও। অহংএর এতবড় সাধ্য নেই যে এই বিশ্বটাকে বা বিশ্বের কোন কিছুকে ভোগ করে। যজ্ঞের অবশেষ ভোগকারীরাই সন্ত-সাধু তারাই অর্থাৎ তাদেরই অস্তিত্ব রইল। Die to live—বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা—সেই সাধুরাই সর্ব্ব পাপ বা রোগ থেকে মুক্ত হয়। রোগ তখনই হয় যখন দেহকে আমার বলে মনে করি। নদী তখনই রোগমুক্ত হয় যখন সাগরের সঙ্গে তার যোগ নষ্ট হয়।—যে নিজের জন্য রাঁধে, সে চোর, সে পাপ খায়। দেবতা তো কারও একলার ভোগে লাগবে না, সকলের ভোগে তাকে লাগাতে হবে।—মানুষ প্রতিমুহূর্তেই যজ্ঞ করছে, কিন্তু জাগ্রত চেতনায় তা করছে না। যজ্ঞ জেনে করাই সাধনা।

পুরুষোত্তমানন্দ।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ স্মরণে

॥ শ্রীজিতেন গাঙ্গুলী ॥

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের ৭৯তম জন্ম তারিখ স্মরণে আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। ধ্বংস-বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে মানুষ আজ দিশাহারা। বিদ্বেষ ও শ্রেণী সংঘাতে মানুষের মন অবিশ্বাস ও সংশয়ে দোদুল্যমান। সকলেই নিজ নিজ বিশ্বাস আঁকড়ে থেকে ধ্বংস যজ্ঞের আয়োজনে ব্রতী। পরিণতিতে বিশ্বমানবতা ধ্বংসের আশঙ্কায় সাধারণ মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাই সে আজ খুঁজছে আলোর সন্ধান, যাতে সে নিজে বাঁচতে পারে, অপরকেও বাঁচাতে পারে। তাই এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে হ'লে এক তৃতীয় শক্তি, নৈতিক শক্তির মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে, যে নৈতিক শক্তির মধ্যে বিক্ষুব্ধ পৃথিবী আশার আলোক দেখতে পাবে। তাই একদল লোককে ব্যক্তি স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে সমষ্টিগত ভাবে বাঁচবার পরিকল্পনা নিতে হবে—তার জন্য চাই একাত্মবোধ।

একদল লোক ভোগের পথে অপরকে বঞ্চিত করে সমাজের মধ্যে বিদ্বেষ ও হিংসার বীজ অঙ্কুরিত করে চলেছে। আরেক দল বন্টনে সমতার নীতি মানলেও, ভোগের লালসা বাড়িয়ে চলেছে। ফলতঃ মানুষের মন বিচেতনধর্মী হচ্ছে। এমতাবস্থায় তথাকথিত জীবন-যাত্রার মান বেড়ে গেলেও মানুষের মনে শান্তি আসে নি। পুঁজিবাদী দেশ আমেরিকার জীবন-যাত্রা প্রণালী খুবই উঁচু। এর মূলে রয়েছে তার অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু এ সম্পদ তো পৃথিবীর সমস্ত মানুষের প্রাপ্য, কিন্তু ভোগ করছে সে একা। তাই অগ্রগত দরিদ্র দেশ তার ঐশ্বর্যে ঈর্ষান্বিত। অপর দিকে সমাজতান্ত্রিক দেশ সমূহ পুঁজীবাদ-এর পরিবর্তে সমষ্টিগত মালিকানায় তাদের সম্পদ বাড়িয়ে জীবন যাত্রার মান উত্তরোত্তর বাড়িয়ে চলছে। কিন্তু উভয়েই ছুটছে ভোগের পেছনে। চলছে ভোগের প্রতিযোগিতা। ভারত একদা 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এই নীতিতে বস্তুতান্ত্রিক জগৎকে উপেক্ষা করে অন্যান্য দেশের পেছনে পড়ে গিয়েছে। তাই আজ প্রয়োজন—ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয়। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের কথায়, চাই New Social order ; তবেই আসবে মানুষের শান্তি। নতুবা শুধুমাত্র শান্তি শান্তি বলে চীৎকার করলে কোন লাভ নেই। আমরা জানি পৃথিবীর ঘোর দুর্দিনে ভগবান নানাভাবে মানুষকে পথ দেখিয়েছেন, যুগাবতার রামকৃষ্ণ দেবের সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী, নিত্যগোপাল দেবের জড় অজড় সমন্বয়ের বাণী, পরিশেষে "I am a Cosmopolitan—আমি বিশ্বনাগরিক"—এই তাৎপর্যপূর্ণ-ভাবধারা আমাদের জন্য রেখে গেছেন।

এই ভাবধারার ধারক ও বাহক স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের জন্মতিথি বাসরে আজ এই কামনা করি—যেন আগামী দিনে সেই "পুরুষোত্তম সমাজ" গড়ে ওঠে—যেখানে কেউ কাউকেও শোষণ করবে না, প্রতিটি ধর্মমতকে সকলে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে, মানুষে মানুষে তফাৎ অর্থাৎ জন্ম সংস্কার ও কর্ম সংস্কার হজম করে মানুষের মধ্যে একাত্মবোধ জেগে উঠবে, ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয়ে মানুষ আস্বাদন করবে সৃষ্টি রহস্য—কেমন করে কারণ সূক্ষ্ম স্থূলের মধ্য দিয়েই অন্বয় ব্রহ্ম একই বহু এবং বহুই এক বলে প্রতিভাত হচ্ছে।

নবদ্বীপে পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীপ্রতিভা রায় ॥

অনন্ত গতিশীল এই বিশ্বপ্রকৃতি তাহার কালপ্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়া মানুষ ছুটিয়া চলিয়াছে অতীতকে পিছনে ফেলিয়া, বর্ত্তমানকে বরণ করিয়া, ভবিষ্যতের পথে। ফেলিয়া আসা অতীতের কত সুখ দুঃখ, কত ভাল মন্দ, কত হাসি কান্না অতীতের বুকে হারাইয়া যাইতেছে। মানুষের জীবনের রসধারা যোগায় এই সুখ দুঃখ। অতীতকে অতীত করিয়া দেওয়ায় মানুষ যায় শুকাইয়া, অতীতের সুখ দুঃখের সেই ক্ষণিকের মালা গাঁথিয়া মানুষ যদি তাহার সমগ্র জীবন সত্তার গলায় পরাইতে পারিত, তবে জীবন-পেয়ালা রসধারায় ভরপুর হইয়া উঠিত, জীবন সহজ হইত, চলার আনন্দ অব্যাহত থাকিত। আমরা তাহা পারি না বলিয়াই এলাইয়া পড়ি, সামনের পথ আমাদের দুর্গম হইয়া পড়ে। আজ মনে পড়িতেছে সেই ১৩৩৯ সনের কথা, সে এক উচ্ছ্বসিত আনন্দের দিন, আজও সে দিনের কথা মনে করিলে সমস্ত দেহের কানায় কানায় এক আনন্দের ঢেউ দিয়া ওঠে। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের মায়ের শ্রাদ্ধে গীতা পাঠ করিতে আসিবেন পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ। আমরা চার বাড়ীর লোক শচীন্দ্র নাথ বসুর বাসায় মিলিত হইয়া আকুল প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছি এমন সময় তিনি আসিলেন, বেলা তখন ৪টা। সেই সৌম্য সুন্দর মানুষটী যখন আমাদের মধ্যে আসিয়া অতি আপন জনের মত সকলের মঙ্গল সংবাদ লইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সেই স্নেহ মধুর ব্যবহারে আমাদের বুক আনন্দে ভরিয়া গেল, আমরা জুড়াইয়া গেলাম। তাঁহার নবদ্বীপ আসার সংবাদ পাইয়া কত লোক আসিতে লাগিল, সকলের সঙ্গেই তিনি পুরুষোত্তমতত্ত্বের কথা, বর্ত্তমান যুগের সমস্যার কথা ইত্যাদি আলোচনা করিতে লাগিলেন। সকলে চলিয়া গেলে আমার সঙ্গে মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিলেন, বিশেষ করিয়া মঠে মেয়েদিগকে রাখিতে হইলে কি ভাবে তাহাদিগকে তৈরী করিতে হইবে এই সমস্ত আলোচনায় রাত্রি ১২টা বাজিয়া গেল। গিরীন বাবুর বাড়ী নবদ্বীপের নিকট মাধাই নগরে। আমাদের স্থির হইল খুব ভোরে স্বামিজীসহ আমরা কেহ কেহ মাধাই নগর যাইব এবং বেলা হইলে আর আর সবাই যাইবেন। সেদিন সকলেরই সেখানে নিমন্ত্রণ ছিল। আমি স্বামিজীর সঙ্গেই গিয়াছিলাম। শ্রাদ্ধের পর স্বামিজী ভাগবত পাঠ করিলেন। তাঁহার সেই ভক্তি প্লাবিত চোখের জলে ভাগবত ধর্ম্মের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা মুগ্ধের মত শুনিতে লাগিলাম। সমস্ত চিন্তা ধারা যেন বদলাইয়া গেল। এতদিন যাহা শুনিয়া আসিয়াছি, যে ভাবে ভাবিয়াছি তাহার তো সবই উল্টা শুনিলাম। কত জন্ম জন্ম সাধনা করিয়া মানুষ ভগবানকে পায়, তিনি বলিলেন ভাগবত ধর্ম্মে সাত দিনে ভগবানকে পাওয়ার কথা। সাধনা করিয়া পাওয়ার কথা জানিতাম। তিনি বলিলেন, পাইয়াই সাধনা করার কথা। নরকেই ভগবানকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইবার কথা শুনিয়াছি। তিনি বলিলেন নরকেই পাইবার জন্য নারায়ণের ব্যাকুলতার কথা। ভাবিলাম—ভাগবত তো অনেক শুনিয়াছি কিন্তু এমন সুন্দর ব্যাখ্যা তো শুনি নাই। সমস্ত শাস্ত্র বাক্যের সহিত এমন ভাবে উদাহরণ সহকারে বর্ত্তমান যুগের সকল ঘটনার একটা সুষ্ঠু মীমাংসা যে ভাগবত ধর্ম্মের ভিতর রহিয়াছে ইহা তো শুনি নাই। অবাক হইলাম, মুগ্ধ হইলাম, আশা আনন্দে বুক ভরিয়া উঠিল। মানুষ সহজ জীবনকে, সহজ পথ চলাকে, শাস্ত্রের বিকৃত কঠিন রজ্জুতে বাঁধিয়া জীবনকে দুঃসহ ও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। আড়াই ঘণ্টা বক্তৃতা হওয়ার পর সকলে আহারাদি করিলাম। বৈকালেই নবদ্বীপ ফিরিতে হইবে, সকলেই প্রস্তুত হইলাম, মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ

হইল, বর্ষাকাল, বৃষ্টি আর থামে না। রাত্রি প্রায় আটটায় বৃষ্টি থামিলে আমরা প্রায় ২৫ জন স্বামিজীসহ নবদ্বীপ হাঁটিয়া রওনা হইলাম। রাস্তার জল জমিয়া গিয়াছিল, পথ অন্ধকার, ছেলেরা স্বামিজীর হাত ধরিয়া সঙ্গে করিয়া আনিতে লাগিল, আমরাও পিছন পিছন আসিলাম। সে পথ চলায় ছিল কত আনন্দ। পরের দিন সকালে স্বামিজী কলিকাতা চলিয়া গেলেন, আমাদের জন্য রাখিয়া গেলেন তাঁহার আনন্দময় স্মৃতির একটী দিন ও দুইটী রাত্রি।

১৩৪১ সনের বৈশাখ মাসে সত্যেন্দ্রনাথ সাহিত্য শাস্ত্রীর নামে চিঠি আসিল; স্বামিজী লিখিয়াছেন 'আমি মহা-নির্ব্বাণমঠের নিত্য সঙ্ঘের পক্ষ হইতে নবদ্বীপ বক্তৃতা করিতে যাইতেছি। নবদ্বীপ আমপুলিয়া পাড়া (অবধূত আশ্রমে) উঠিব। তোমরা সকলে সেখানে উপস্থিত থাকিবে'। পুরুষোত্তমানন্দ আবার নবদ্বীপ আসিতেছেন। তাঁহার স্নেহ-ধন্য আমরা আনন্দে তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষায় অবধূত আশ্রমে যাইয়া বসিয়া রহিলাম। তিনি আসিলেন আমাদের মধ্যে, কিন্তু এবার তিনি তাঁহার গুরু ভাই বোন পরিবেষ্টিত হইয়া আসিয়াছেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট থাকিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম। পরের দিন সকালে উঠিয়াই অবধূত আশ্রমে গেলাম। "বর্ত্তমান যুগ সমস্যায় শ্রীনিত্যগোপাল"—এই বক্তৃতা হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া বিলি করা হইল। বক্তৃতার স্থান হইল বঙ্গবাসী স্কুল। শ্রীযুত গোবিন্দ লাল গোস্বামী খুব আগ্রহ সহকারে সভার আয়োজন করিলেন। দুই দিন বক্তৃতা হইবে এই ব্যবস্থা হইল। বৈকাল ৪টায় সভা। নবদ্বীপের সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় সভায় উপস্থিত হইলেন। স্বামিজী আসিলেন গেরুয়াধারী ভাইবোন পরিবৃত হইয়া। কেশবানন্দ মহারাজ, নিত্যগৌরবানন্দ মহারাজ, নিত্য-গোপালানন্দ মহারাজ, গোলাপদিদি নির্ম্মলাদিদি এবং নিত্যগোপালের গৃহীভক্ত রামদাস মোদক, সরৎদিদি, যোগেন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি অনেকেই সভায় উপস্থিত হইলে আমরা সবাই সভায় যোগদান করিলাম। সভা আরম্ভ হইলে প্রথমেই স্বামিজী যে সুমধুর ঝঙ্কার তুলিয়া "বংশী বিভূষিত করান্নবনীরদাভাৎ"—শ্লোকটি বলিলেন সেই সুরে সকলেই যেন মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত দর্শন শাস্ত্রকে এবং প্রচলিত শাস্ত্র ব্যাখ্যাকে উপস্থিত করিয়া দেখাইলেন যে, প্রচলিত ভাষ্যের ফলে এই জগৎটা মিথ্যা এবং ব্রহ্মই একমাত্র সত্য—ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। এই ভাষ্যের ফলেই বর্ত্তমানের যত সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। তাহার পরই তিনি বলিলেন—শ্রীনিত্যগোপাল বলিলেন "ব্রহ্ম যেমন সত্য, মায়াও তদ্রূপই সত্য"; শাস্ত্র বাক্য দ্বারা তাহা প্রমাণিতও করিলেন। সে দিনের বিষয় অত্যন্ত জটিল, কিন্তু তাঁহার প্রাঞ্জল ভাষায় চোখের জলে ভরা মানুষ সমস্ত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও মুগ্ধ হইল। প্রায় ৩ ঘণ্টা সেদিন বক্তৃতা হইল। পরের দিন বৈকালে পুনরায় সভা হইল। সকলেই উপস্থিত হইলেন। সে দিনের আলোচনা গত দিনের চাইতে অনেক সহজ হইল। সেদিন ভাগবত ধর্ম্মের অবতরণ বাদের কথা আলোচনা করিলেন। কেমন করিয়া এই ধরাকে সার্থক করিতে, ধরার ধূলিকে ব্রহ্ম রেণুতে গড়িয়া তুলিতে, তিনি ক্রমে ক্রমে নরহরি, রাম, কৃষ্ণ রূপে ধরার বুকে অবতরণ করিলেন—তাহাই ব্যাখ্যা করিলেন। এই অবতরণের মধ্য দিয়া যত ছোটর মূল্য তিনি দিয়া গেলেন—এই আলোচনা সকলের ভিতরই একটা আলোড়নের সৃষ্টি করিল। সেখানে অনেকেই শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের নিকট স্বামিজীর অবতরণবাদের আলোচনা খুবই ভাল লাগিল। পরদিন স্বামিজী কলিকাতা চলিয়া গেলেন, বলিয়া গেলেন—শীঘ্র আর আমার নবদ্বীপ আসা হইবে না। এক ভদ্রলোক বই ছাপানোর জন্য ২০০৲ টাকা দিয়াছেন, তোমরা যে যাহা পার সংগ্রহ করিয়া পাঠাইও। আমি গীতার অবধূত ভাষ্য, "ভাষ্য প্রদীপ" নামে বই লিখিয়া ছাপাইতে আরম্ভ করিব। প্রুফ তো আমাকেই দেখিতে হইবে।

সত্যেন্দ্রনাথ সাহিত্য শাস্ত্রী, শচীন্দ্র বসু এবং আমাদের বাসা এই তিন স্থানে আমাদের ভিতর স্বামিজীর কথা লইয়া আলোচনা চলিতে লাগিল। অনেক ছেলেমেয়ে তাহাতে যোগদান করিত। স্বামিজীর লেখা উপদেশপূর্ণ বড় বড় চিঠি আসিত, তাহা লইয়া আমাদের দিন আনন্দে

কাটিয়া যাইত। ইতিমধ্যে শচীনবাবুর পিতা পরলোক গমন করিলেন। তিনিই জ্যেষ্ঠ পুত্র, পিতার শ্রাদ্ধাদি তাঁহাকেই করিতে হইবে। তিনি স্বামিজীকে আসিতে পত্র দিলেন, আপনি আসিয়া শ্রাদ্ধ বাসরে ভাগবত পাঠ ও আলোচনা করেন ইহাই আমার ইচ্ছা। স্বামিজী আসিতে স্বীকৃত হইলেন। আমরা আবার তাঁহাকে আমাদের মধ্যে পাইব এই আনন্দে সব আয়োজন চলিতে লাগিল। শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব দিন তিনি আসিলেন মেজপুত্র নিত্যব্রতকে লইয়া। শ্রাদ্ধ হইয়া গেলে স্বামিজীর ভাগবত পাঠ হইল এবং পাঠের পর কীর্ত্তন করিলেন। অনেক লোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেবারে পাঁচ দিন তিনি নবদ্বীপে ছিলেন। বহুলোক, স্ত্রী পুরুষ, সকল সময় তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল এবং পুরুষোত্তমতত্ত্ব ও ভাগবত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা সকাল হইতে রাত্রি ১১টা সময়ে চলিতে লাগিল। দ্বিপ্রহরে মাত্র ঘণ্টা দুই বোধ হয় বিশ্রাম করিতেন। সেই সময় স্বামিজীর নিকট নিত্যগোপাল চক্রবর্ত্তী নামে একটি যুবক দীক্ষা গ্রহণ করিল। কতজনই কত প্রাণের আবেদন তাঁহার নিকট জানাইত, কত ভাল লাগিত মানুষের স্বামিজীর সকলের প্রতি প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার। জয়নিতাই বলিয়া এক বৈষ্ণব প্রতি দিন আসিতেন, স্বামিজীকে দাদা বলিতেন এবং খুব ভাল বাসিতেন ও ভক্তি করিতেন। একদিন সকাল বেলা তাঁহার নিজের হাতে রোয়া বেশ বড় একটা কাঁচ ডাঁটা হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত, সেই ডাঁটা পাইয়া স্বামিজীর সে কি আনন্দ। তিনি বলিয়াছিলেন আজ জয়নিতাই যে আমাকে এই প্রীতিভরে ডাঁটা আনিয়া দিল ইহা তোমরা লিখিয়া রাখিও। প্রীতি মাখানো ছোট ডাঁটার যে কি গৌরব তাহা তাঁহার জীবনে সেদিন আমরা দেখিয়া ধন্য হইয়াছি। শচীনবাবুর রান্না ঘরে বসিয়া সেই ডাঁটা কোটা তিনি দেখিলেন এবং শচীনবাবুর স্ত্রী বড় সহকারে সেই ডাঁটার চচ্চরী রান্না করিয়া দিলেন। তিনি জয়নিতাইয়ের ভালবাসা স্মরণ করিয়া আনন্দ ভরে চোখের জল মুছিলেন আর ডাঁটা খাইতে খাইতে শ্রীরুক্ষ যে কত ছোটর মূল্য দিয়া গিয়াছেন, সুদামার চিড়া, বিদুরের শ্রীফল খোসা ইত্যাদি কত আলোচনাই না সেদিন করিলেন। স্বামিজী যখন যে পরিবারে গিয়াছেন তিনি যেন সেই পরিবারেরই একজন এমন ভাবেই একীভূত হইয়া গিয়াছেন। শচীনবাবুর স্ত্রী তখনকার কুলিতেন, তিনি বসিয়া দেখিতেন, কি রান্না করিবে জিজ্ঞাসা করিতেন, শচীনবাবুর স্ত্রী রান্না করিতে করিতে গরম গরম বড়া ভাজিয়া দিতেন, তিনি রান্না ঘরে বসিয়া খাইতেন। বহুবার তিনি শচীনবাবুর বাসায় আসিয়াছেন এবং শচীনবাবুর স্ত্রী কতই না আদর যত্ন করিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছেন। সেই সব অতীতের কাহিনী আলোচনা করিলে আজও প্রাণ কেমন করিয়া ওঠে।

সেবার পাঁচ দিনের মধ্যে একদিন মাত্র পোড়ামাতলায় তাঁহার বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইল। ঠিক বৈকালে বক্তৃতার যে সময় দেওয়া হইয়াছিল সেই সময় বৃষ্টি আসিল, খুব বেশী নয় অল্প অল্প। স্বামিজী তাহার ভিতরই পোড়ামাতলা রওয়ানা হইলেন, আমরা একটু অপেক্ষা করিতে বলায় তিনি বলিলেন আমি জীবনে কখনও অসময়ে সভায় উপস্থিত হই নাই, যখন যেখানে সময় দিয়াছি তখনই উপস্থিত হইয়াছি, ১৩।১৪ হাজার বক্তৃতা দিয়াছি, তাহার মধ্যে একদিন মাত্র ট্রেন ফেল করিয়াছিলাম, তাহাও তখনই কোন করিয়া জানাইয়া দিয়া পরের ট্রেনে গিয়াছিলাম। তখন স্বামিজী সহ অল্প বৃষ্টির মধ্যেই আমরা পোড়ামাতলা গেলাম। বৃষ্টি আর বেশী হইল না। অল্প বৃষ্টির মধ্যেই ঠিক সময়ে সভা আরম্ভ হইল। লোক তখন কম ছিল, ক্রমে অনেক লোক হইল, বৃষ্টিও থামিয়া গেল। ঘণ্টা দুই সভা হইল। পাবনা জেলা নিবাসী সরজু বালা নাগ (তাই তুলসী নাথের পিসী) কয়েক দিন স্বামিজীর নিকট খুব আসিলেন এবং স্বামিজী তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতেন; একদিন তাঁহার বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া খুব ভক্তি আদর সহকারে আহার করাইলেন। আমার মা-ও একদিন খিচুরী ভোগ দিয়া স্বামিজীকে আহার করাইলেন। সেই সময় একদিন নবদ্বীপ লাইব্রেরীতে বক্তৃতা করেন, লোক অনেক হয়, মেয়েরা অনেকে উপস্থিত ছিল। তিনি এই ভাবে আমাদের মধ্যে পাঁচ

দিন থাকিয়া আনন্দ দান করিয়া কলিকাতা চলিয়া গেলেন। যাওয়ার আগে বলিয়া গেলেন স্কুলের সামনে সাতদিন বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিও, আমি আসিব।

স্বামিজী চলিয়া গেলে কিছুদিন পরই চূড়ামণি যোগ। নবদ্বীপ লোকে লোকারণ্য, আমাদের বাসায় আমার বহু আত্মীয় স্বজন আসিয়াছিল। আমরা তখন স্থির করিলাম চূড়ামণি যোগের দিন কীর্ত্তন লইয়া নরনারায়ণ আশ্রমের জন্য ভিক্ষায় বাহির হইব; সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইল; ছেলে মেয়ে প্রায় ২৫ জন আমরা ভিক্ষায় বাহির হইলাম, প্রায় আধ মণ চাউল ও ১৫।১৬ টাকার মত পাইলাম। স্বামিজীকে সেই সংবাদ দিলাম ও টাকা পাঠাইয়া দিলাম। তিনি লিখিলেন—

নারায়ণেষু

তোমার পত্র ও টাকা পাইয়াছি। নরনারায়ণ তোমাদের সম্পদ। উহার জন্য যখন তোমরা সব কিছু করিতে পারিতেছ, তখন নরনারায়ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবেই দেখিতেছি। আমি তোমাদের কাছে নিত্য-ঋণী। তোমরা অন্নপূর্ণার দল আমার ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করিয়া দিয়া আসিতেছ। আমার জীবনের সম্বল শুধু রিক্ততা, শূন্য, আকাশ ধর্ম্ম। আকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্য্যতে—আকাশ স্ত্রী জাতির দ্বারাই পূর্ণ, তোমরা পূর্ণ, তোমাদের চরণ তলেই রিক্ত পুরুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তোমরা রাণী, আমি তো তোমাদের সেই রূপেই প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিয়াছিলাম।...তোমরা রাজ রাজেশ্বরী হও। ব্রজে কেবলই 'জয় রাধে'। বুলু, উষু, শঙ্করী,-তুমি, সুহাসিনী, তোমার বড় বোন প্রভা, তোমার ভাগিনেয়ী বিধুমুখী, সুশীলের দিদি তোমরা সকলেই আমার ঠাকুরের প্রাণের আশীর্ব্বাদ জানিবে। ধীরেন, অমরেন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরের স্পর্শে নূতন জীবন যাপন করুক। আমি তোমাদিগের মাঝে যাইবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিতেছি। আগামী শুক্রবার ৬টা ১০এর গাড়িতে রওনা হইয়া ৯টা ১৪এর সময় নবদ্বীপ পৌঁছিব। যদি ঐ গাড়িতে না আসি পরের গাড়ীতে দেখিও। আরও ২।১ দিন আগে আসিতে পারিতাম, ঠেকা শুধু শুক্রবার এক শুভ-লোক কিছু টাকা দিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সত্যব্রত সটীন কেহই এখানে নাই। সকলেই বলরামপুর গিয়াছে। হারমোনিয়ম বাজাবার লোক যদি দরকার হয় নিত্যব্রতকে নিয়া আসিব। আমি নিত্যব্রতকে আসিবার জন্য পত্র দিব। যদি সেখানে কাজের বিশেষ ঠেকা না হয় নিশ্চয়ই আসিবে। বাঁধানো উচ্চনকারত আনিব। বিজ্ঞাপন সঙ্গে আনিব। কিছু অবধূত ভাস্তও আনিব। শুক্রবার যেন ঐ সময় স্টেশনে ধীরেন প্রভৃতি কেহ থাকে। বক্তৃতার স্থানের জোগার পূর্ব্বেই দেখিও। শনি, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ। আগে বিজ্ঞাপন না ছাপাইলে শনিবার হইতে বক্তৃতা আরম্ভ কি সম্ভব হইবে? তোমার অমরেন্দ্রকে রাখিয়া দিও। নিচের নমুনা বিজ্ঞাপন যদি তোমাদের মনঃপুত হয় দিও।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিধুর্জয়তি।

"মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী" বলিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর মায়াবাদের বিরুদ্ধে যে অভিযান করিয়াছেন, যাহাকে সমাজ শরীরে ঘন করিবার জন্য তাঁহার শ্রীচরণরেণু-সেবী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সারা জীবন পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইয়া ছিলেন, অথচ প্রণালীবদ্ধ কোন দার্শনিক মতবাদ না থাকায় তাহা সমাজকে পূর্ণতম ভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে নাই, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই অভিযানকেই বর্ত্তমান বিশ্বকে গড়িয়া তুলিবার একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করিয়া নরনারায়ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তদনুকূলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'অবধূত ভাষ্য' প্রণয়ন করিয়াছেন। নরনারায়ণ আশ্রমের লক্ষ্য ইহলোককে গোলোকে গড়িয়া তোলা। নরনারায়ণ আশ্রমের পতাকা দৈরিকের সঙ্গে লাঞ্ছন। স্বামিজী এই আদর্শ প্রচার করিবার জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিতেছেন। নিম্নলিখিত সূচী অবলম্বনে বক্তৃতা হইবে। আমরা জন-সাধারণকে এই বক্তৃতায় যোগদান করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

স্নান উপলক্ষে নবদ্বীপ লোকে লোকারণ্য। বীরেন্দ্রনাথ বসু নিজে হাতে বড় বড় অক্ষরে "পুরুষোত্তমানন্দ নবদ্বীপ আসিতেছেন—পাঁচ দিন তাঁহার বক্তৃতা হইবে—বঙ্গবাসী স্কুলে একদিন, গোরাচাঁদের আখড়ায় একদিন, বড় আখড়ায় একদিন, হরিসভায় একদিন, পোড়ামাতলা একদিন" লিখিয়া সারা নবদ্বীপের মোড়ে মোড়ে টাঙাইয়া দিলেন, বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া বিলি করা হইল। বীরেন সুশীল প্রভৃতি প্রাণপণ খাটিয়া স্বামিজীর নবদ্বীপ আসিবার বার্তা প্রচার করিল। স্বামিজী আসিলেন, সঙ্গে তাঁহার বড় ছেলে সত্যব্রত আসিল। স্নান উপলক্ষে বহুস্থানের লোক নবদ্বীপ আসিয়াছিলেন। পুরুষোত্তমানন্দ অর্থাৎ ববিশালের মহৎ কুমার ঘোষ ইহা শুনিয়া শচীন বসুর বাসায় বহু লোক সমাগম হইতে লাগিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত মহৎ কুমার ঘোষের বহু পরিচিত বন্ধু-বান্ধব পুরুষোত্তমানন্দকে অনেকদিন পর পাইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজের প্রফেসর বীরেশ্বর বসু চিরকুমার ধর্মপরায়ণ, একঘরে খুব ভাল মানুষ। স্বামিজী যখন নবদ্বীপে আসিতেন তিনিও আসিতেন এবং কাছে কাছে থাকিতেন। আমাদের প্রোগ্রাম ছিল সকালে উঠিয়া শচীনদার বাসায় যাইয়া স্বামিজীর অতিপ্রিয় খাজা গরম লুচি আনিয়া তেল লবণ দিয়া তাহাই তাঁহাকে খাইতে দিতাম—তাহার পর নিজেরা সবাই কিছু খাইয়া কীর্তন লইয়া আমরা সবাই বাহির হইতাম এবং নর-নারায়ণ আশ্রমের জন্য চাঁদা তুলিতাম। আমাদের সঙ্গে থাকিত নরনারায়ণ আশ্রমের পল্লীসেবার কাজের জন্য ছাপান বিজ্ঞাপন। সত্যব্রত বীরেন নিত্যগোপাল সুধীর সুশীল সুনীলের মিষ্টি শচীনদার স্ত্রী প্রভৃতি আমরা প্রচারে বাহির হইতাম, ১০টায় বাসায় ফিরিতাম। সেখানে অনেক চাল ও টাকা পাওয়া গিয়াছিল। বৈকালে স্বামিজীর বক্তৃতা। সকালে কীর্তন লইয়া বাহির হওয়ায় নবদ্বীপে বেশ একটা সাড়া পড়িয়াছিল। প্রথম দিন বঙ্গবাসী স্কুলে বক্তৃতা হয়। পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত গোপেন্দু ভূষণ সাংখ্যতীর্থ ও বীরেশ্বর বসু এবং বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ও নবদ্বীপের সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বীরেশ্বরবাবু সভায় সভাপতিত্ব করেন। সেদিনের আলোচনা খুব জ্ঞানপূর্ণ হয়। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের পরস্পর বিরোধের ফলে বর্তমান যুগের যে পরিস্থিতি দাঁড়াইয়াছে, ইহাই বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। কঠিন হইলেও সকলের চিত্তই আকৃষ্ট করিল। সেই সভায় নবদ্বীপের চেয়ারম্যান শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র বাগচী আসিয়াছিলেন। স্বামিজী পরম প্রীতিভরে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"আমি তোমায় আজ তিরস্কার করিব—ভাইয়ের ঘরে ভাই রাখে না, আমি আজ দুইদিন হইল নবদ্বীপ আসিয়াছি, তোমার দেখা নাই। আমি যখন গৌরাঙ্গগোষ্ঠীর পক্ষ হইতে বক্তৃতা দিতে নবদ্বীপ আসিয়াছিলাম সেদিন তোমার মা, যিনি আমারও মা, তোমাদের বাসায় আমাকে লইয়া যাইয়া নিজে কাছে বসিয়া আমাকে খাওয়াইয়াছেন। আর আজ তুমি আমার খোঁজ রাখ না। তোমাদের ঘুরে থাকিতে দেখিলে যে আমি প্রাণে কত বেদনা পাই। চেয়ারম্যান পূর্ণবাবু তাঁহার সেই প্রাণের স্পর্শে যেন অপরাধীর মত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। সেইদিন দেখিলাম কত মিষ্টি হয় তিরস্কার। তিনি এমন একজন মিষ্টি মানুষ ছিলেন, যাহার সঙ্গে যে ব্যবহারই করিয়াছেন তাহা ছিল তাঁহার মিষ্ট প্রাণের পরশ মাখা। পরের দিন সকালে পূর্ণবাবু শচীন বসুর বাসায় আসিয়া স্বামিজীর নিকট অনেকক্ষণ ছিলেন এবং "অবধূত গীতা" কিনিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তৃতীয় দিন সভা হইল গোরাচাঁদের আখড়ায়। তিনি ভাগবত ধর্মের কথাই সেদিন চোখের জলে বলিলেন। সেদিন সভাপতিত্ব করিলেন গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ। সভা আরম্ভের পূর্বেই গোরাচাঁদের গলায় প্রসাদী মালা স্বামিজীকে এক বাবাজী পরাইয়া দিলেন। সে দিনের সভার আলোচনা অনেকটা সোজা ছিল, সভায় লোক অনেক উপস্থিত হইয়াছিলেন। বড় আখড়ায় একদিন সভা হইল, সেখানে প্রচুর স্থান ছিল। স্নানের সময় লোক সমাগমও খুব হইল। ২৷৷০ ঘণ্টা ৩ ঘণ্টার কম কোন দিনই বক্তৃতা হইত না। পোড়ামাতলায় এক দিন ও হরিসভায় একদিন বক্তৃতা হইল। হরিসভায় গোস্বামীর

পিতার সহিত শ্রীনিত্যগোপালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেজন্য হরিসভায় শ্রীনিত্যগোপাল আর শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে একই, দুই কলেবর মাত্র, মহাপ্রভুর অনর্গল কথা যে শ্রীনিত্যগোপাল বলিয়া গিয়াছেন সেই সম্বন্ধে সেদিন বিশেষ ভাবে আলোচনা করিলেন। গৌরাঙ্গদেবের প্রসাদী মালা হরি সভার গোঁসাই নিজে স্বামিজীকে পড়াইয়া দিলেন এবং সভান্তে মহাপ্রভুর প্রসাদ খাওয়াইয়া ছিলেন। সেদিনের সভায় নিত্যগোপালের অনেক ভক্ত শিষ্য উপস্থিত ছিলেন। এইভাবে ছয় দিন কাটিয়া গেল, সকালে কীর্ত্তন বৈকালে সভা—নবদ্বীপে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। পণ্ডিত সন্ন্যাসী বাবাজী গৃহী বংশেণী স্ত্রী পুরুষ সারাদিন, রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত আসিতে লাগিলেন। স্বামিজীর অফুরন্ত আলোচনা চলিতে লাগিল। স্বামিজীর জীবনে তো কোন কোঠাভাগ ছিল না। সকলেই যে যার কথা প্রাণ খুলিয়া তাঁহার নিকট বলিতে পারিত এবং তিনিও তাঁর তাঁর মত করিয়া সকলের সকল আলোচনার মীমাংসার কথা বলিতেন।

পাঁচ দিন বক্তৃতার পর নবদ্বীপের বিষ্ণুপ্রিয়ার স্থাপিত মহাপ্রভুর সেবাইতরা স্বামিজীকে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান জানাইলেন। স্বামিজী স্বীকৃত হইলেন। সে দিনের সভাতেও শ্রীযুক্ত গোপেন্দু ভূষণ সাংখ্যতীর্থ সভাপতিত্ব করিলেন। সভা আরম্ভের পূর্বে এক গোস্বামী মহাপ্রভুর গলার প্রসাদী মালা স্বামিজীর গলায় পরাইয়া দিলেন। সেদিনের বক্তৃতা হইল শুধু চোখের জলে। প্রিয়তমকে নিকটে পাইয়া প্রিয়তমার যে আত্মনিবেদন, সেদিন হইল তাহাই। সভাস্থ লোক চোখের জলে মুগ্ধের মত সে দিনের সেই আলোচনা শুনিলেন। পাঁচদিন ধরিয়া যাঁহার মুখে জটিল শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই ভাবিয়াছিলেন ইনি খুব পণ্ডিত ও জ্ঞানী, সেদিন সরল শিশুর মত তাঁহাকেই কাঁদিতে দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইলেন, দেখিলেন এ যে প্রেম ভক্তির উজ্জ্বল মূরতি। গোপেন্দু ভূষণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় কয়েক দিনই তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, সেদিন স্বামিজীর বক্তৃতার পর বলিয়াছিলেন—"মহাপুরুষদের জীবনে যাহা বহু সাধনায় ধন স্বামিজীর জীবনে তাঁহার গুরু কৃপায় তাহাই সহজ হইয়া গিয়াছে। আজ ইঁহাকে আমার গুরু বলিয়া মানিয়া লইতে ইচ্ছা হইতেছে। বহু দিন হইল বৈষ্ণব শাস্ত্র আলোচনা করিতেছি, যে সকল জায়গায় কঠিন বলিয়া মনে হইত আজ স্বামিজীর চোখের জলে আমার নিকট সহজ হইয়া গেল।" সভার পর স্বামিজীর জন্য মহাপ্রভুর কিছু প্রসাদ দেওয়া হইল, তাহা লইয়া আমরা শচীনন্দার বাসায় আসিলাম। ক্রমান্বয়ে কয়েক দিন বক্তৃতা, ২।৩ ঘণ্টা ৪ ঘণ্টার কম তো কোন দিনই বক্তৃতা হয় নাই, তাহার উপর সারাদিন লোক সমাগম, স্বামিজী খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, একদিন বিশ্রাম করিয়া কলিকাতা চলিয়া গেলেন। আমাদেরও সেই কয় দিনের আনন্দের রেশের মধ্যে বেশ কিছুদিন কাটিয়া গেল।

কয়েক মাস কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে সন্তোষ নাথ সাহিত্য শাস্ত্রীর পিতৃ বিয়োগ হওয়াতে তাঁহার শ্রাদ্ধে গীতা পাঠের জন্য স্বামিজী নবদ্বীপ আসিলেন। সন্তোষ শাস্ত্রী বলিলেন, আমাদের পিতৃ বিয়োগ হইয়াছে আপনি সেই স্থান আমাদের পূরণ করুন। তিনিও তাহাদের সে দায়িত্ব নেবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন। কিন্তু হয় নাই, মানুষ স্বস্বপ্রধান, তাহাকেও মানিয়া চলিতে বেশী দিন পারে না। শ্রাদ্ধের দিন শিষ্য নিত্যগোপাল তাহার স্ত্রীসহ আসিয়াছিল। নিত্যগোপালের অভ্যাগ্রহে তাঁহার শ্বশুর বাড়ী, অর্থাৎ নবদ্বীপের বৃন্দাবন চন্দ্রের বাড়ীতে একদিন স্বামিজীর বক্তৃতার বন্দোবস্ত হইল। স্বামিজীসহ আমরা সবাই গেলাম। বৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহের সামনে নাট মন্দিরে বক্তৃতার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, নাট মন্দির লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। প্রথমে স্বামিজী দাঁড়াইতেই নিত্যগোপালের শ্বশুর বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রসাদী বড় মালা এবছড়া গলায় পড়াইয়া দিলেন, সভা আরম্ভ হইল। সেদিনের বক্তৃতা যে কি চমৎকার হইয়াছিল তাহা এমন ভাষা দ্বারা বুঝাইবার সামর্থ্য আমার নাই। প্রায় ৪ ঘণ্টা বক্তৃতা হইল; চোখের জলে প্লাবিত, তেজস্বিতাপূর্ণ জ্ঞান-গর্ভ বাণী সকলে স্তব্ধ হইয়া শুনিলেন। প্রচুর জলযোগের আয়োজন হইয়াছিল, স্বামিজী সহ আমরা সবাই বৃন্দাবন

চন্দ্রের প্রসাদ পাইয়া রাত্রি প্রায় ১০ টায় সত্যেনবাবুর বাসায় ফিরিলাম। পরের দিন স্বামিজী কলিকাতা চলিয়া গেলেন, একাই আসিয়া ছিলেন, ছেলেরা যাইয়া নবদ্বীপ স্টেশনে তুলিয়া দিয়া আসিল। প্রত্যেক বারই স্বামিজীর আসিবার পূর্বে ছেলেরা ২.৪ জন স্টেশনে থাকিত এবং যাইবার সময়ও অনেকেই স্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে যাইতেন।

এইভাবে নবদ্বীপে তাঁহার যাতায়াতের ভিতর দিয়া একদল ছেলেমেয়ে তাঁহার অনুরক্ত হইয়া পড়িল। নর-নারায়ণ আশ্রমের সাহায্যের জন্য আমরা অর্থাৎ মেয়েরা বাড়ী বাড়ী মুষ্টির ঘট বসাইলাম। সুনীতি বলিয়া একটি বয়স্কা মহিলা চমৎকার কীর্তন গাইতে পারিতেন। প্রতিদিন আমরা বাড়ী বাড়ী যাইয়া আলোচনা ও গান করিয়া মানুষের ভিতর আমাদের একটু স্থান করিয়া লইতাম এবং মুষ্টির ঘট বসাইতাম। সপ্তাহান্তে মুষ্টির চাউল তুলিতাম। একবাসের চাউল এক জায়গায় করিয়া বিক্রী করিয়া স্বামিজীর নিকট টাকা পাঠাইয়া দিতাম। এইভাবে ২।৩ মাস গেলেই স্বামিজীকে আমাদের মধ্যে পাইবার জন্য আমরা ব্যাকুল হইতাম, স্বামিজীও বলিতেন অনেক দিন হইয়া গেলেই আবার অনেক কথা জমিয়া যায় তোমাদের নিকট বলিবার জন্য, আমিও তো আসিবার জন্য ব্যাকুল হই। আমরা জানিতাম তাঁহাকে শুধু শুধু আসিতে বলিলে তো তিনি আসিবেন না, তাঁহাকে পাইতে হইলে তাঁহার আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তবে তাঁহাকে ডাকিতে হইবে। আমরা আবার নবদ্বীপে দুই দিনের বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিলাম। স্বামিজী এবার একাই আসিলেন। বকুলবাগী স্কুল এবং গোড়ামাতলায় বক্তৃতার ব্যবস্থা হইল। সেই সময় নবদ্বীপ মহিলা সমিতির সম্পাদিকা শ্রীজনরঞ্জন রায়ের স্ত্রী সাবিত্রী দেবী মেয়েদের সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহার সমিতিতে আয়োজন করিয়া স্বামিজীকে লইয়া যান—সভায় অনেক মেয়ে হইয়াছিল। সেই দিন নবদ্বীপের জগবন্ধু সান্যালের ভগিনীর সহিত স্বামিজীর অনেক আলোচনা হয়। একদিন তাহাদের বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া স্বামিজীকে খুব আদরের সহিত আহার করান। সেবার চার দিন শচীন বসুর বাসায় ছিলেন। দুই দিন বক্তৃতা হওয়ার পর স্বামিজীর শিষ্য নিত্যগোপাল চক্রবর্তী কৃষ্ণনগর তাহার বাসায় স্বামিজীকে যাইবার জন্য অনুরোধ করায় তিনি যাইতে স্বীকার করিলেন। স্বামিজীর সহিত সত্যেন শাস্ত্রী ও আমি গেলাম। নিত্যগোপাল নিজে আসিয়াই লইয়া গেল। সেখানে স্বামিজীর সঙ্গে আমরা একদিন এক রাত্রি আনন্দে কাটাইলাম। তিনি রাণাঘাট হইয়া ঐপথেই কলিকাতা চলিয়া গেলেন, আমরা নবদ্বীপ ফিরিয়া আসিলাম।

নবদ্বীপের চেয়ারম্যান ইলেকশনের ব্যাপারে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে স্বামিজীকে বক্তৃতা দিবার জন্য আনিতে কলিকাতা নরনারায়ণ আশ্রমে লোক যায়। স্বামিজী যাইতে স্বীকার করেন। আমি সেই সময় নরনারায়ণ আশ্রমেই ছিলাম, আমিও স্বামিজীর সহিত নবদ্বীপ গেলাম। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে স্বামিজীকে নবদ্বীপ ষ্টেশনে নামিবার সঙ্গে সঙ্গেই গলায় ফুলের মালা দিয়া বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিয়া শোভাযাত্রা করিয়া নবদ্বীপ লইয়া যায়। অনেক লোক সেদিন ষ্টেশনে সমবেত হইয়াছিল। আমি স্বামিজীর সহিত হাঁটিয়াই নবদ্বীপ গেলাম। স্বামিজী শচীনবাবুর বাসাতেই উঠিলেন। তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গেই নবদ্বীপের চেয়ারম্যান পূর্ণ বাগচী প্রভৃতি এবং কংগ্রেসের পক্ষের এক ডাক্তার স্বামিজীর সহিত দেখা করিলেন। তুমুল আলোচনা শচীনবাবুর বাসায় রাত্রি ১১টা পর্যন্ত চলিল। পরের দিন সকালে এবং বৈকালে স্বামিজীর বক্তৃতা হইল বাজারের ভিতর এবং কাঁসিতলা ঘাটের মোড়ে। স্বামিজীর মুখে রাজ-নীতির বক্তৃতা তো শুনিয়াছিলাম না, সেইদিন শুনিলাম। কি তেজদৃপ্ত ভাষণ। কংগ্রেসের পক্ষই জয়লাভ করিল। পরের দিন সকালে স্বামিজীকে নবদ্বীপ ষ্টেশনে তুলিয়া দেওয়া হইল, তিনি কলিকাতা চলিয়া গেলেন। প্রায় ছয় মাস আর তিনি নবদ্বীপ আসেন নাই, বলরামবাবুর পল্লী-কেন্দ্র গঠন লইয়া ব্যস্ত থাকেন। ইতিমধ্যে নিত্যগোপাল চক্রবর্তী যকৃৎরোগে আক্রান্ত হইয়া স্বামিজীর নির্দেশ মত নবদ্বীপ কালীতলা ঘাটে বাসা ভাড়া করিয়া থাকিয়া কবিরাজী চিকিৎসা করে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

নিত্যগোপাল স্বামিজীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে, সেই সময় স্বামিজী আসেন তাহাকে দেখিবার জন্য। ৩ দিন নবদ্বীপে থাকেন, শচীনবাবুর বাসাতেই উঠিয়াছিলেন। বোজ দুইবেলা নিত্যগোপালের গায়ে কত স্নেহে হাত বুলাইয়া দিতেন। কলিকাতা হইতে ফল আনিয়াছিলেন, কাছে বসিয়া খাওয়াইতেন। গুরুর স্নেহে নিত্যগোপাল কত উৎফুল্ল হইয়া উঠিত, কত কথাই গুরু শিষ্যে হইত, সেদিন চোখের জলে আশীর্বাদ করিয়া স্বামিজী কলিকাতা চলিয়া গেলেন। মাসখানেকের মধ্যেই নিত্যগোপাল ইহলোক ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে চলিয়া গেল। ধীরে ধীরে আমাদের নবদ্বীপের আনন্দের হাটও ভাঙিয়া গেল। ধীরেন বসু স্বামিজীর নিকট নরনারায়ণ আশ্রমে চলিয়া গেল।

কিছুদিন পর স্বামিজী আর একবার নরনারায়ণ আশ্রমের প্রচার কার্যে নবদ্বীপে আসিতে চাহিলেন, কিন্তু উঠিবেন কোথায়? তিনি লিখিলেন একটি এমন স্থানে ঘর দেখ যেখানে আমি থাকিলে সত্যেন এবং শচীনের বাড়ীর সবাই আমার সহিত দেখা করিতে পারে। তাহাই করা হইল। ঘরটি সত্যেন শাস্ত্রীর বাসার নিকট হওয়ায় তার বাসাতেই খাওয়ার ব্যবস্থা হইল। অবশ্য একদিন শচীনদার বাসায়ও খাইয়াছিলেন। সেবারে সত্যব্রতকে সঙ্গে করিয়া স্বামিজী আসিলেন নবদ্বীপে। গোবিন্দ লাল গোস্বামী, গোপেন্দু সাংখ্যতীর্থ, বীরেশ্বর বসু, শচীনদা প্রভৃতি সকলেই আসিয়া দেখা করিলেন। কিন্তু সেবারে প্রচার কার্যের সুবিধা হইল না। পোড়ামাতলা একদিন সভা হইল মাত্র। তিন দিন থাকিয়া স্বামিজী কলিকাতা চলিয়া গেলেন। আমার বাবা বারো বাওয়ার নবদ্বীপের বাস উঠিল, আমি পাবনা চলিয়া গেলাম। আর দীর্ঘ দিন স্বামিজী নবদ্বীপ যান নাই। শ্রীনিত্যগোপালের শতবার্ষিকী উপলক্ষে পুনরায় গিয়াছিলেন। সেই সময় একদিন অদ্বৈত আশ্রমে, একদিন দেওচাপাড়া মহানির্বাণ মঠে, তিন দিন পোড়ামাতলায় শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের জড়াজড় সমন্বয়ের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীনিত্যগোপালই যে শ্রীগৌরাঙ্গ ইহা উদাত্ত কণ্ঠে নবদ্বীপবাসীকে শুনাইয়া আসিয়াছেন। সেবারেও তাঁহার কৃপায় তাঁহার সঙ্গে থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। ইহাই স্বামিজীর শেষ নবদ্বীপ যাওয়া। নবদ্বীপেই তিনি শ্রীনিত্যগোপালের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বহুবার নবদ্বীপে তিনি বর্তমান যুগের দর্শন যাহা শ্রীনিত্যগোপালের জীবন মন্থন করিয়া অর্জন করিয়াছিলেন তাহা নবদ্বীপের জন সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিয়া তাঁহাদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত যুগ-দর্শন মানুষ একদিন লইবেই ইহা তিনি শতবার বলিয়া গিয়াছেন। আমরা সেই আশায় জয় জয় বসিয়া থাকিব। শ্রীনিত্যগোপাল কালের বুকে জয় যুক্ত হউন, তাঁহার দর্শন জয় যুক্ত হউক, পুরুষোত্তমানন্দ জয়যুক্ত হউন।

'পৃথিবীতে যা কিছু সকলের বড়ো তার প্রমাণ নেই। পৃথিবীতে যত কবি, যত কবিত্ব সমস্ত যদি ধুয়ে মুছে ফেলতে পার, তাহলেই প্রমাণ হবে এতদিন কেজো লোকেরা তাদের কাজের জোরটা কোথা থেকে পাচ্ছিল, তাদের ফলল ক্ষেতের মূলের রস জুগিয়ে এসেছে কারা। মহারাজ, আপনার দরজার বাইরে ঐ যে কান্না উঠেছে সে কান্না থামায় কারা? যারা বৈরাগ্যবারিধির তলায় ডুব মেরেছে তারা নয়, যারা বিশ্বকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে তারা নয়, যারা কাজের কৌশলে হাত পাকিয়েছে তারাও নয়, যারা কর্তব্যের শুষ্ক রুদ্রাক্ষের মালা জপ্‌ছে তারাও নয়—যারা অপর্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েছে বলেই জগতের কিছুতে যাদের উপেক্ষা নেই, জয় করে তারা, ত্যাগ করেও তারাই, বাঁচতে জানে তারা, মরতেও জানে তারা, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ পায়, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ দূর করে—সৃষ্টি করে তারাই, কেননা তাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র, সব চেয়ে বড়ো বৈরাগ্যের মন্ত্র।'

—ফাল্গুনী, রবীন্দ্রনাথ

ঃ তুমি মূর্ত হয়ে ওঠো ঃ

॥ শ্রীবিষ্ণুপদ রায় ॥

তুমি মূর্ত হ'য়ে ওঠো।
তোমার আনন্দ-ধারা প্রবাহিত হোক
দিকে দিকে :
বিন্দুকের বুকে আর সাগরের বুকে
সমুদ্র আর নীল দিগন্ত আকাশে
প্রতিফলিত হোক আজ,
অতল প্রশান্তি আজো পরিব্যাপ্ত হোক
বিন্দুকের বুকে বুকে।

আকাশে অনেক মেঘ
ঘন নীল আকাশ কোথায়
ক্ষণে ক্ষণে গর্জিছে বজ্র প্রলয়
কাণা গলি সদর রাস্তা
সকলি অন্ধকারে নিমজ্জিত।

তুমি মূর্ত হ'য়ে ওঠো,
হে নতুন দিনের উজ্জ্বল প্রভাকর,
দুর্দিন সুদিনে পরিণত হোক,
মুছে যাক পৃথিবীর তমিস্রাযোর অন্ধকার :
কালোয় ডুবেছে ভুবন
আলোর মুখেছে আঁখি যেন
এ-আঁধার ভুবনে তুমি এসো
হে নতুন আলোর বার্তাবহ।

তুমি জাগ্রত হও
প্রতিভাত হও
সংকীর্ণ এ-জীবনের
অলি-গলি পথে
নতুন দিনের স্বপ্নে আলোকোজ্জ্বল করো এ-জীবন।
অহংএ গর্বিত মানবকুল
হৃদয় ধু-ধু-মরুহারা কিংবা গোবি,
ছিন্নমূল জীবনের অজস্র সংকট।

তুমি মূর্ত হ'য়ে ওঠো
সমন্বয়-সুন্দর স্নিগ্ধ-শান্ত নরবপু,
অথবা তত্ত্বের মহোত্তম
গৌরবের শিখায়।

তোমাকে প্রয়োজন বড় আজ
ছিন্নমূল জীবনের প্রতি পদে পদে
এই আলো-অন্ধকারে
জীবনের সহস্র সংকটে।
তুমি মূর্ত হ'য়ে ওঠো 'আমী',
অতুল আনন্দ-স্নিগ্ধ—
প্রজ্জ্বলন্ত আলোর শিখায় :
এ-পৃথিবী সে আলোকে
হোক সমুদ্ভাসিত—
তোমার এ-জন্মদিনে
আমার এ-জীবন সে আলোয়
হোক আলোকিত।

। শ্রীমৎ আমী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৭৯তম জন্ম-বাসরে পঠিত ।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ
—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—
(৫)

১৯.৫.৫৬

ওঁ নমো···। শ্রীনিত্যগোপাল ধনী লোক ছিলেন—বেশ ধনী। শ্রীনিত্যগোপালের বিমাতা ছিলেন। শ্রীনিত্যগোপালের বাবার ব্যবসায় ছিল—একবার ব্যবসায়ে মার খান—বহু অর্থের প্রয়োজন হয়—শ্রীনিত্যগোপালের মা সেইসময় নিজের সম্পত্তি দিয়া স্বামীকে সাহায্য করেন

শ্রীনিত্যগোপালের জীবনে ছোটবেলা থেকেই একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে, যে কোন আবেষ্টনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারতেন। Philosophy is home-sickness. সে-ই হল বুদ্ধিমান যে আবেষ্টনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। শ্রীনিত্যগোপাল সুখে-স্বচ্ছন্দে লালিত পালিত হয়েও ঐ আহিরীটোলাতেই কিছে কয়ে খেয়েছেন। ভেবে দেখ কত বড় কথা! মাধুকরী করতেন বলে শুনেছি তাঁকে তালাবন্ধ ক'রে রেখে দিয়েছিল আত্মীয়েরা। তিনি বেরাল টপকে কাশীমিত্তিরের ঘাটে পড়ে থাকতেন।···

বুদ্ধকে চুন্দ শূকরের মাংস খেতে দিয়েছিল—তিনি খেলেন, বললেন, আমার বুদ্ধত্ব লাভের দিন যে আমাকে খাবার দিয়েছিল, সে-ও শ্রদ্ধা করে দিয়েছিল—আর আজ যে চুন্দ আমাকে মাংস খাওয়ালে তা-ও সে শ্রদ্ধা করেই দিয়েছে—তাই এই দুই-ই একই।···কৃষ্ণ দুর্যোধনের অন্ন না খেয়ে বিদুরের অন্ন খেলেন—তা ঐ শ্রদ্ধার অন্ন বলে।···বিজয়কৃষ্ণ বলেছিলেন, ঘি পেলে খেয়ো, না পেলে খাবড়ে খেয়ো না।···নিত্যগোপাল কাদা খেয়েছেন···তথাগত নিত্যগোপাল যে পথে চলে গেছেন, সেই পথে আমরা যাব।···১৯০৬ থেকে তেল দেই না—শক্ত ছেঁড়া এক্তির চাদর পরে যত বক্তৃতা দিয়েছি—বৈরাগ্য বরণ না করলে ভগবান লাভ হয় না—যে বিশ্বে অন্নহীনের অভাব নেই, সেখানে কি ভাল খাওয়ার অধিকার আছে?···শিব শ্মশানের ঠাকুর—যে ফুল কেউ নেয় না—সেই ধুতুরা ফুল তাঁর—আমাদের পথ বৈরাগ্যের পথ। ··যখন যে অবস্থায় থাকি, আহা উহু না করে তা যেন সহ্য করে যেতে পারি—তুমি কোলে রেখো—গৃহেতে বনেতে যখন যেখানে থাকি—সম্মান নিয়ে থাকি যেন।···মানুষের কাছে চাইতে পারব না, ঠাকুর যেমন বলতেন, তেমনি বাচ্চাদের মত যেখানে সেখানে যখন তখন চাইতে যাওয়াও বন্ধন—বৃন্দাবনে লালাবাবুর শেঠেদের বাড়ীতে মাধুকরী করার কাহিনী—।··খুঁজে দেখ প্রতিদিন কোথায় কোন্ ত্রুটী রয়েছে, কোথায় কোন্ অহংকার চালিয়েছ—।··যেখানে যা সাজে, সেখানে তা সাজিয়ে রাখার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। জগন্নাথের জগতে সকলে মিলে চলতে হবে, আবার আত্মসম্মান বজায় রাখতে হবে—আত্মসম্মান মানে আত্মঅহংকার নয়—আজ আমি মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়ে···জগন্নাথ নিত্যগোপাল···

রবিবার, সকাল—২০.৫.৫৬

·· রাম, শবরীর মূলা, গুহকের মূলা, বনবাসের মূল্য তুমি দিয়াছ···নাগরিক সভ্যতার অকিঞ্চিৎকরতা স্থাপন করিতে তুমি রাম আসিয়াছিলে।···

লাঙ্গলের সভ্যতা, ঋষি সভ্যতা প্রবর্তন করিতে হলধর বলরাম তুমি আসিয়াছিলে।

রক্তপ্লাবিত বিশ্বে করুণার বাণী প্রচারিতে বুদ্ধ তুমি আসিলে.....সব উপেক্ষিতকে কোল দিতে, মানুষের মহিমা প্রচার করিতে আসিলে...

সকল মেচ্ছভাব, সকল বহির্মুখীনতা, সকল বিলাস ব্যসন চূর্ণ করিতে তুমি কল্কিরূপে আসিলে—তোমায় নমস্কার।

গৌররূপে তুমি আবার এলে—সমন্বয়ের বীজ স্থাপন করিতে—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"...তারপর এলে নিত্যগোপাল রূপে—জীবনে চৈতন্য-অচৈতন্য, ব্রহ্মমায়া, আত্মা-অনাত্মার সমন্বয় করতে...বাইরের চাকচিক্য, পাশ্চাত্ত্যের ভাবে আচারে বেশভূষায় দেশ ছেয়ে গেছে—নিত্যগোপাল, তুমি এসেছ এই দুইয়ের সমন্বয় করতে—যে ভারতবর্ষ আত্মার সাধনায় কৌপীনসর্ব্বস্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই ভারত আজ পাশ্চাত্ত্যের দীক্ষায় প্রয়োজন বাড়ানয় ব্রতে ব্যাপৃত। তুমি এলে প্রয়োজন বাড়াও আর প্রয়োজন কমাও—এই দুইয়ের সমন্বয় করতে। এই সমন্বয় করতে যে সংযম প্রয়োজন তা আত্মা-সাধনার চেয়ে অনেক বেশী।... মাত্রা-বোধ এই পথে একমাত্র কথা ..ভোগের মাত্রা,... ত্যাগের মাত্রা, গ্রহণের মাত্রা, ছাড়ার মাত্রা...কর্ম্মের মাত্রা নৈষ্কর্ম্মের মাত্রা...কর্ম্ম-নৈষ্কর্ম্মের সমন্বয়...। নিত্যগোপাল, নরনারায়ণ আশ্রমের দেবতা তুমি—তোমার চরণতলে এ আশ্রম গড়িয়া উঠুক। টিউবওয়েল আজ হবে—তোমার ব্যবস্থা তুমি করিও...আমি বুদ্ধির বড়াই করব না—আমি-বুদ্ধি তোমার মধ্যে লয় হউক। সকলের হানবড়াভাব লয় হউক। প্রাণ—তোমারই মহিমা প্রতিষ্ঠিত হউক—বিশুদ্ধ বুদ্ধি আর বিশুদ্ধ কর্ম্মশক্তি নিয়ে রাবণ নিহত।...মুকুন্দকে গৌররূপে তুমি শান্তি দিয়াছিলে...এক লক্ষ বৎসর পরে গৌরকে পাবে শুনেও মুকুন্দ বিশ্বাসী হয়ে নাচতে আরম্ভ করল—সেই বিশ্বাসই এক লক্ষ বৎসরকে এক দিনে পরিণত করে দিল—মহাপ্রভু তখনই মুকুন্দকে ডেকে পাঠালেন। তাই বলি শান্তি মাথা পেতে নিতে হয়—তুমি শান্তি দাও।...

সন্ধ্যা।...সাধনার ধারা বদলে গেছে—তিনি আসছেন—তিনি আমাকে চান—এখন আমার যা করা উচিত—আজকালকার সাধনা তাই।...বিচ্ছিন্ন আশ্রম থেকে সাধনা আরম্ভ করলে চলবে না, আজকের দিনের পথ তা নয়।...অনুগত হও—তোমার বুদ্ধিতেই যদি সব বুঝতে, তাহলে কথা ছিল না—তুমি অনুগত হলেই সত্যকে পাবে।...

সোমবার—২১. ৫. ৫৬—সকালে

.. এই জরামরণশীল জগৎকে গড়িয়া তুলিবার লাগি তুমি গোলকনাথ তুমি অবতীর্ণ হলে মূর্ত্তিতে ..অবিরাম তুমি আস জীবের দুয়ারে দুয়ারে...আজ ধরার বুকে তোমার আসন রচিব—গোলোক বৈকুণ্ঠে যাইতে হইবে না—তোমার জন্য নূতন সমাজ, নূতন বিশ্ব, নূতন রাষ্ট্র গড়িব...আজ ব্রহ্ম-জীবন, ব্রহ্ম-পরিবার, ব্রহ্ম-সমাজ, ব্রহ্ম-রাষ্ট্র...গড়িবে বলিয়া আসিয়াছ নিত্যগোপাল রূপে নারায়ণ—বিশ্ব মানবের সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া.. "আমি বিশ্ব-নাগরিক" মন্ত্র ঘোষণা করিলে.. নারায়ণ তুমি আসিয়াছ ...যুগে যুগে ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় তুমি আসিয়াছ...মানুষের কাছে তোমার লাঞ্ছনার সীমা নাই—তবু তুমি আসিয়াছ—তোমার অনন্ত সহিষ্ণুতা অসীম ধৈর্য্য তুমি আমায় দাও। ...মানুষের সব পাপ-তাপ-আমিত্বের আঘাত পেয়েও তুমি মানুষের জন্য আছ—তোমার ছাঁচে আমি গড়ে উঠব—আমার প্রকৃতি নূতন করে গড়ে উঠুক।...নর-নারায়ণ আশ্রম শৃঙ্খলা—দ্রব্য, কাল সব কিছুতে—শৃঙ্খলা শিখুক। বিশ্বের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত ভোগ—কোন কিছুরই অনিয়ন্ত্রিত ভোগ—চলে না। যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ বস্ত্রহীন বলেই শিব কাপড় ছেড়ে বল্কল পড়লেন...বিশ্বকে বঞ্চিত করে বেশী খাওয়ার প্রশ্ন নেই...ছেড়া কাপড় পড়তে হয়, মাধুকরী করতে হয় বিশ্বের সঙ্গে—সকল নিপীড়িতের সঙ্গে, বঞ্চিতের সঙ্গে একাত্মতার আস্বাদন করতে।...নূতন সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে দুর্জ্জয় সাহস নিয়ে অগ্রসর হবে এই আদর্শ নিয়ে নরনারায়ণ আশ্রম।...মেনে চলো—মানুষ বড় অবুঝ—শ্রদ্ধাবান হও। নিত্যগোপাল, আজকের দিনের মানুষকে শ্রদ্ধা শেখাও।...নিত্যগোপাল, তুমি আমার কাঙাল—এর চেয়ে আমার গর্ব্বের কিছু নেই—লজ্জারও কিছু নেই—আমার জীবনে তোমার চাওয়া হোক...। মানুষকে আমি চাই, ভালবাসি—মানুষ তো তা বোঝে না—কত লাঞ্ছনা দিয়েছে—পিঠে

আমার যা হয়পদি—কত পরব যাত্রা, কত কটু কথা—তবু আছি—তুমি আমার আছ বলেই আছি—তুমি আমার ঘরে এসেছ—আমার এই জলপড়া ভাঙা ঘরে—এই পরমের ঘরে তুমি কত কষ্ট পাবে—আমি তো পরমাত্মার পূজা করি না—তুমি মানব—তোমার তো কষ্ট হবে। তোমার ছাচে মানুষকে গড়ে তুলব এই আশা নিয়েই তো চলি—গড়তে তো পারলাম না···মানুষ তো কাদার মত হয়ে থাকে না—কেমন করে গড়ব ?···ঠাকুর, আমি যেন তোমার নামে নিজেকে প্রচার না করি, আমি যেন কর্তৃত্ব না করি···জীবের আবার গর্ব কিসের ? একবার বেশী পারখানা হলে যারা মরতে বসে তাদের আবার কি গর্ব ? কিন্তু এই জীবই শিবের শরণাগত হলে সেই মানুষই উন্নতশির হইয়া দাঁড়াইতে পারে।···

২২. ৫. ৪৬—সকাল

(তোমারেই প্রাণের কথা কহিব—এই গান করেন) ···প্রাণহীন বিশ্বে আমার প্রাণের ভাষা কে শুনিবে, কে বুঝিবে ? প্রাণপূর্ণ ব্যবহার কে বুঝিবে ? তোমারই কাছে কহিব—তুমি সমগ্র। প্রাণ সুখদুঃখমন্থনধন।··· তুমি দ্বন্দ্বের মাঝে দ্বন্দ্বাতীত।···প্রাণ হাতে করিয়া আমি চলিব।···তুমি ছাড়া আমার কিছু নাই, কেহ নাই—কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে ? কেন বলিলে বাংলায় যাও, কাজ আছে।—কী কাজ ? তোমার সংসারে আমি কি করিব ?···কেন পাঠালে তুমি তা জান—তোমারি আদেশে রহিব।···পথ চলতে চলতে পথ হারিয়ে ফেলি—অর্জুন যেমন একদিন পথ হারিয়েছিলেন—যুদ্ধ করলে গুরু বধ, যুদ্ধ না করলে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা বজায় থাকে—দোদুল্যমান অর্জুন—তুমি গুরুর মত পথ দেখিয়ে দিলে। মানুষের কাছে এমনি কত পরস্পরবিরোধী সমস্যা—সংসারে থাকব, না সংসার ছাড়ব ? এক দল সংসারের দাবী অতিরিক্ত মাত্রায় পূর্ণ করে, আর একদল সংসার ছাড়ে—এ দুইয়ের পথের সমাধান দিতে তুমি এলে—তাই তুমি শিখলে মহানির্বাণতন্ত্রের গার্হস্থ্য সন্ন্যাস এক বলিয়া মনে হয়।···ভারতবর্ষে কেউ কখনও এ কথা শুনেছে ?—তাই তোমায় নাম লইয়া ডাকি—নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল (খুব জোরে করতাল উচ্চারণ করলেন)···চিরকাল পথে দাঁড়াইয়া আছি তুমি পরিচ্ছিন্ন অপরিচ্ছিন্নের সমন্বয়—তুমি তথাগত—তুমি যে পথে গেছ, আমি সেই পথে যাব।···তোমারই জগতে প্রেম বিলাইব।···অপেক্ষা করিয়া ছিলে—নগেন প্রামাণিকের জন্য, মায়ের প্রাণ লইয়া ভাত বাড়িয়া তুমি অপেক্ষা করিয়া ছিলে···তোমারই আশীর্বাদে মানুষকে ভালবাসিতে শিখিয়াছি—যে লোক টিউবওয়েল খোড়ে তার মাথায় ছাতা ধরিয়াছি···যার যেখানে ব্যথা আমি সেইখানে মানুষের কাছে দাঁড়াইয়াছি···নিত্যগোপাল আমি তোমার বিরাট সংসারের গৃহিণী—এই বিরাট সংসার আমি গুছাইব।...যেদিন তোমার স্নান (মহানির্বাণ মঠ) ঝাড়ু দিবার কেহ ছিল না, সেদিন ঝাড়ু হাতে আমি তোমার মঠ ঝাড়ু দিয়াছি—লীলার সন্তান নরেন সেদিন আমার হাত থেকে ঝাড়ু কেড়ে নিয়েছে—মঠের কেউ নেয় নি·· আমাকে মেথরের কাজ দিও—যত ছোট কাজ আছে আমাকে তাই দিও—ছোট কাজকে মানুষ বড় ঘৃণা করে—আমি তার ব্রহ্মরূপ ফুটিয়ে তুলব।...আমি অনিকেতন—আমার বাড়ী নাই, ঘর নাই, আমি তোমার ঘরের দাওয়ায় পড়িয়া থাকিব—আমার নিজের কাজ নাই, আমি তোমার কাজ করিব, আমার নিজের ঘর নাই আমি তোমার ঘরে থাকিব—আমি তুমিময় হইব···আমি নিত্যদাস, নিত্য সম্প্রদায়ের দাস...দেহ এলিয়ে পড়তে চায়—তোমারই চরণতলে মাথা রেখে যেন আমি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করি—ধরার ধূলি হোক্ ব্রহ্মধূলি—ধরার মানুষ হোক ব্রহ্ম মানুষ—আমি বিশ্ব-বৃন্দাবনে বাস করি।···

ক্রমশঃ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫০—

(১০)

সকালে আষাঢ় মাসের দুই ফর্মার প্রুফ দারোয়ান দিয়া যায়···জবা নারিকেলের সন্দেশ ও অমৃতীসহ এখানে আসে ৯টার মধ্যেই।···রেণু কলিকাতা ঘুরিয়া ফিরিয়াছে ৫টার পর মালতী-কমলের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে সরিশালের সুধা সেন আসে। সে নিজেই পত্রিকার চারিটাকা দেয়। সরিশালের খবর শুনি। সন্ধ্যার পর আমি, সুধা, মালতী, প্রণতি, কমল আফিসে যাই। আমার জন্য প্রস্তুত সরবৎ সুধাকে দেই। ইতিমধ্যে রেণু প্রণতি ফিরিয়াছে। চশমার দাম ২৬৲ টাকা, খোকনের ৮৲ টাকা। ঐ টাকা রেণুই দিল। তাহাকেই সব আগলাইতে হইতেছে, হইবেও। সে যোগ্যতা ঠাকুর তাহার দিন।···লা জুলাই ব্রহ্মসূত্রের কপি বীরেনবাবু চাহিয়াছেন। অজিত দত্ত উজ্জলভারতের খুব নিন্দা করিয়াছে—'পত্রিকা speaks nonsence। আপনি কতগুলি বাজে বই পড়িয়াছেন ইত্যাদি'। রবিবাবু, শরৎবাবুর বই বাজে বই? পুলিনা তাহার মাকে ছাড়িয়া অস্বস্তি বোধ করিয়াছে। দেখিয়া সে মাকে না চিনিলেও স্পর্শদ্বারা সে নিশ্চয়ই চেনে। সেই স্পর্শ বেহালা সরিয়া যাওয়ায় সে নিশ্চিন্তে ঘুমায় নাই। ইহাই 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর'। জবার সঙ্গে শরণাগত হইয়া, ঠাকুরের আমিতে আমি মিলাইয়া ঠাকুরের নাম নিবার কথা আলোচনা হইল।

১৪ই জুন

সকালে প্রবন্ধগুলি শুনিবার জন্য আফিসে যাই।··· আফিসে আজ আমাদের প্রবন্ধ দেখা শেষ হয়। এখন প্রিয়দারঞ্জনবাবুর নিকট উপস্থিত করিব।···মালতীকে N. M. 12x+C. P. 6x+N. P. 6x মিলাইয়া তিনবার করিয়া ব্যবহার করিতে বলিয়া দেই। সকালে 'ব্রহ্মসূত্র' revise করি 'গৌনশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ' সূত্র পর্যন্ত।··· রাত্রি ১০।টা পর্যন্ত উজ্জলভারতের 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার' প্রুফ দেখি।

১৫ই জুন

সকালে প্রুফ রেণুর ওখানে দিয়া আসি। প্রতিভা ১০।টার পর ঐগুলি নিয়া প্রেসে দিয়া আসে।···প্রণতি আসে ৪টায় কিছু আগে। সে ৫।টার মধ্যেই চলিয়া যায় ২১৲ টাকা লইয়া চশমা আনিবার জন্য। রেণুই ৩৪৲ টাকা দিয়াছে।...ব্রহ্মসূত্রের পাণ্ডুলিপি দেখি।··· মাখনবাবু সন্ধ্যার পর আফিসে আসেন। গতকল্য বৈকালে যখন ট্রামে করিতে করিতে আফিসে যাইতেছিলাম, তখন আমি নিজের পা দুখানা দেখিয়া বড় আনন্দ পাইতেছিলাম। গেরুয়া রং-এর আভাও পায়ের উপর পড়িয়াছিল। রামানুজাচার্য্যের গুরুও একদিন নিজের পা নিজের মাথায় ধারণ করিয়াছিলেন, কেননা তাঁহার গুরু তাঁহাকে কত ভালবাসেন। নাসিকাসনও বসিয়া বসিয়া জলের মধ্যে নিজের ছায়া দেখিতেন। কৃষ্ণও নিজ রূপ দেখিয়া চমকিয়া যাইতেন। নিজের প্রতি মানুষের কত প্রীতি। এই আত্মপ্রীতি মূলে থাকিলে বিশ্বপ্রীতি বাস্তব হয়। আত্মপ্রীতি ও বিশ্বপ্রীতি একই পুরুষোত্তমপ্রীতির দুইটী স্বতঃমূল্য প্রকাশ। নিজের সবটুকু পাইবার জন্য কি লালসাই না মানুষের। কিন্তু এই লালসা শুধু নিজকে লইয়াই মিটিতে পারে না। বিশ্বকে বুকে লইয়াই এই আত্মপ্রীতি আস্বাদিত হইতে পারে।

আমার পা দুখানির মধ্যে বাবার পা ও ঠাকুরের পায়ের সাদৃশ্য আছে। নিজের পা দেখিলে ঠাকুরের পায়ের কথাই মনে পড়ে, তখন চুম্বন করিতে ইচ্ছা হয়।

১৬ই জুন

সকালে আফিসে যাই।...বর্ত্তমান আবেষ্টনকে পরিপাক করিয়া সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারার জন্য, সর্ব্বভূতের বুকে আত্মাকে, পুরুষোত্তম-দর্শনকে রূপায়িত করিতে না পারার জন্য বুকের মধ্যে একটা স্থায়ী বিষাদ বাসা বাঁধিয়া বসিয়াছে। আমি তো আকাশের ভগবানকে মাটির বুকে, সর্ব্বভূতের মধ্যে পাইতে চাই। ব্যক্তিকে ধরিয়া যাত্রা করিলে ব্যক্তির লয়-নির্ব্বাণ ছাড়া গতি নাই। ব্যক্তিকে যদি বাঁচিতে হয়, তবে সর্ব্ব ব্যক্তির সঙ্গে সমন্বিত হইতে হইবে। যতটা ব্যক্তি-সর্ব্বব্যক্তির সমন্বয় সাধিত হইবে, ততটা ভগবানের আকাশরূপ ক্ষীণ হইবে, মাটির রূপ সুন্দরতর হইবে। তখন চিৎ মৃৎরূপে উদ্ভাসিত হইবে, চিৎ-মৃতের ভেদ বিলুপ্ত হইবে। চিৎকে মৃৎ-এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখাই বর্ত্তমান যুগের সাধনা। ইহাই আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। সন্ধ্যার পর চারুবিকাশ উপেন ঘর আসিয়া তাহার বন্ধুর টাকা দিয়া যায়।

১৭ই জুন

সকালে রেণু মালতীকে সহ ৭টার প্রশান্ত ডাক্তারের ওখানে যায়। চট্টগ্রামের, বর্ত্তমানে চেতলাবাসী, এক ভদ্রলোক দেখা করিতে আসেন...উজ্জীবনভারতের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আগামী রবিবার তিনি আসিয়া গ্রাহক হইবেন বলিলেন। তিনি চলিয়া যাওয়ার পরই মালতী রেণুর ওখান হইতে উষাঙ্গিনীর ছানা লইয়া এখানে আসে। মালতী বলিল যে, খাওয়া দাওয়া নিয়া অনেক বাড়াবাড়ি তাহার ছিল, এখন সে তাহা ত্যাগ করিয়াছে।... অসুখ হইয়া থাকিলে, কথামত চলিলে একদিন নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারিবে। 'যা হবার হবে' বলিয়া বসিয়া থাকিলে তাড়াতাড়ি হইবেই। কি কি হইতে পারে, মানুষ যখন তাহা কিছু কিছু জানে, তখন তাহাকে সামলাইবার জন্য প্রস্তুত যদি মানুষ না থাকে, মানুষ তাহার আক্রমণে দাঁড়াইতে পারিবে না। আবেষ্টনকে হজম করিতে পারার জন্যই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন গুরুর দরকার। যাহার কাছে টেকনিক শিখিতে হয়...অমলকান্তি মজুমদার দেখা করিতে আসে। তাহার সঙ্গে প্রায় ১ ঘণ্টা কথা হয়। বর্ত্তমান যুগদর্শন ও উজ্জীবনভারত সম্বন্ধে আলোচনা হয়। প্রকৃতির অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ রূপগুলির সমন্বয় সাধিত হইলে পুরুষ-প্রকৃতি এক হইয়া যায়, ইহা বিশেষ করিয়া আলোচিত হয়। গ্রাহক হইতে বলিল।...১টার পর আফিস হইতে ফিরি।

সকালে...আফিসে যাই।...গাড়ী হইতে কমলা নামিল। সে হাসিয়া আমার সামনে দাঁড়াইল। আমি প্রথমে ঠিক চিনিতে পারি নাই। 'আমি কমলা' বলার পর তাহাকে নিয়া আশ্রমে আসি। ১ ঘণ্টার উপর সে এখানে থাকে। তাহাকে আমার লেখাগুলি সব দেখাই। সে এম, এ, বি, টি, হইয়া এখানে সাহাপুর স্কুলে প্রধান-শিক্ষয়িত্রী। এই কমলাই সাহানগর রোডে আমার আশ্রমে প্রথমে ঠাকুরের আসন স্থাপন করিয়াছিল। সে সংস্কৃত জানিত। তাহাকে সেই দিক দিয়া ঠাকুরের সেবায় নিয়োজিত করিবার ইচ্ছা ছিল।...তাহাকে আমার ভাবগুলি পড়িয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইবার কথা বলিলাম। নল-দময়ন্তী, সৈব্যা-হরিশ্চন্দ্র কেহই ঘরে বসিয়া ঘর রক্ষা করিতে পারেন নাই, সারা পৃথিবী চষিয়া ঘরকে পাইয়াছিলেন। সেখানেই হরিশ্চন্দ্রের গৃহপ্রতিষ্ঠা হইল—ইহাই রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরের মূল মর্ম্ম। কমলা মাষ হইতে পত্রিকা নিয়া গেল। সে গ্রাহক হইবে। চাঁদা দিয়া টাকা পাঠাইয়া দিবে। কেন-উপনিষদও দিয়া দিলাম। দুপুরে সুধাংশু-প্রতিভা একযোগে আসে। কেমন করিয়া প্রতিভা প্রভৃতির অতীতকে ভবিষ্যতের মধ্যে সার্থক হইবার উপযোগী পথের সন্ধান দিয়াছি, তাহাই বলিলাম। পুরুষোত্তম-সাধনায়ই অতীতের সব ভবিষ্যতে সার্থক হইতে পারে।

এতদিনের সাধনা ভবিষ্যৎ-বর্তমানকে ঠেলিয়া পিছনে লইয়া যাইবার সাধনা। অতীতকে ভবিষ্যতের সাধক জীবনের মধ্যে সার্থক করিতে হইলে পুরুষোত্তম-জীবনলাভ চাই-ই; আমি তাহারই খোঁজ দিয়াছি। অতীতের সব ভুল পুরুষোত্তমে সার্থক হয়।...রেণু কলিকাতা হইতে ৬টায় ফেরে। ৭টায় ইন্‌ভেস্‌টারস্‌ কাটেন, কালকাটা কেমিক্যাল, প্রিয়দারঞ্জনবাবুর কাছে যায়। প্রবন্ধ দিয়া আসে। রেণুর শরীর খুব দুর্বল হইয়া পড়ে। পাবনার যতীনবাবুর পোষ্টকার্ড রেণুর ঠিকানায় আসে।...

১৯শে জুন

সকালে 'ব্রহ্মসূত্র' revise করিতে করিতে 'Final Cause'-এর 'What is vulgar' অংশ আছে যে অধ্যায়ে সেই অধ্যায়টী পড়ি। রেণু বিজ্ঞাপন লইয়া বাকী প্রুফ লইয়া প্রেসে যায়। ফেরে ৪টার কিছু আগে। সে আর আর এখানে আসে না। প্রতিভা আসে ২টার পর।...৭টায় মালতী ও কমল আসে।...হেরম্ববাবু এই সময়ে আসে। পত্রিকা সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে কথাবার্তা হয়। সমস্ত মানুষের বর্তমানে যে রূপ মানসিক অবস্থা তাহাতে আমাদের এই cultural পত্রিকার চলা একরূপ আশ্চর্য্য ও বাহাদুরী বটে—ইহা হেরম্ববাবুর মত। লোক অন্তঃসারহীন শুধু গল্পই চায়। "Thus,...the type of creative activity is not mechanical industry, although it is from this datum that we set out to rise to the idea of divine art and although there is even here a mode of action much superior to mechanical instinct. No more is it a calculating intelligence obliged luxuriously to combine means to reach its end. It is creative genius, in which is combined the faculty of combining and foreseeing, while at the same time it is absorbed by a higher power, it is the point where intelligence is united to in feeling and within an indissolsuble union.' P 409—Final Cause. It will be said that if the concept of matter does not oppose to the formation of certain determinate bodies,—the elements, for instance —it is not evident why and should be opposed to more complicated bodies." P 398-99. সৃষ্টির গোড়ায় 'বাধা' স্বীকার না করিলে পরবর্তী সময়ের 'বাধা'-র কোন অর্থ থাকে না। এইখানেই অরবিন্দের মতবাদ...। ৯টার পর আশ্রমে ফিরি।

২০শে জুন

সকালে Final Causes পড়ি, ব্রহ্মসূত্র আর দেখা হয় না। রেণু ১২টার মধ্যেই আসে।...আমি যখন বাহির হই, তখনই সিঁড়িতে সুধা সেনের সঙ্গে দেখা। সে ও আমরা একত্র হইয়া আফিসে যাই।.. ধীরেনবাবু আসেন। .. রেণু গীতার অবতরণ কাল (ভাষ্য প্রদীপ) হইতে প্রথম অধ্যায়ের প্রাণবাদের অংশ ও প্রাণ প্রজার সময়য় আরম্ভ পর্য্যন্ত পড়িয়া রাখিয়া দেয়। তখন ৭॥০টা। ধীরেনবাবু চলিয়া যায়। সুধা বিশ্বকল্যাণ সভা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের কথা বলে। বনমালীবাবু, সুধা সেন, আমি, সতীশ দাস ও রমেন্দ্র ঘোষ—এই পাঁচজন যেন যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব—পঞ্চ পাণ্ডব। সত্যব্রত সমিতির কথাই উঠে। অতীতের মত অনুষ্ঠান যেন আজ আবার মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে চাহিতেছে। আমার তাই বুকভরা বেদনা। অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া ভবিষ্যতের পথে আগাইয়া চলা, ছুটিয়া চলার জন্যই তো এত বেদনা। আমার ঠাকুর বেদনার ঠাকুর। 'আমার ব্যথার পূজা হয় নি সমাপন'। সেই উন্মাদিনী 'লাল টুকটুকে' মেয়েটি আজও তো জীবনকে ঘিরিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। সেই কান্নাই তো আমার জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কান্নার আমার বিরাম নাই। যাহারা আমার কাছে, তাহাদিগকে জ্বালাইয়া মারিতেছি। কিন্তু কি করিব আমি? আমারও জ্বালা, তাহাদেরও জ্বালা।

...পেপার কণ্ট্রোলারকে ফোন করিয়া জানা গেল তাহারা ব্রহ্মসূত্র ছাপাইবার order পাঠাইয়াছেন। আমরা পাই নাই। খোঁজা গিয়াছে নিশ্চয়ই। নকল দিয়া দিবে বলিল। ৯টার পর চলিয়া আসি।

২১শে জুন

সকালে একবার আফিসে যাই।...রেণু আজ পেপার কণ্ট্রোলারের নিকট হইতে ডুপ্লিকেট অর্ডার আনিয়াছে। ব্রহ্মসূত্র ১১৫২ পৃষ্ঠার বই তবল ডিমাই, ৫০০ কপি, ১১৭৫ পাউণ্ড কাগজ।...ঠাকুরের জন্ম, বিশ্বের জন্ম যতদূর পারিয়াছি, জীবনের রক্ত দিয়া খাটিয়াছি—ইহাই আমার তৃপ্তি। ফাঁকি আমি কাহাকেও, কোন কাজকেও দেই নাই, ইহাই আমার আনন্দ।...সকালে Final Causes পড়ি। আমি সকালে যখন আফিসে যাই, তখন মন্মথবাবু ফোন করেন। আমি ফিরিয়া ফোন করি। তিনি আগামী কাল সন্ধ্যা ৬॥০টায় অতুল গুপ্তের বাসায় (১২৫ শ্যামবিহারী এভিনিউ) পুরাতন কংগ্রেস কর্মীদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার জন্ম একটী সভায় আমাকে যোগদান করিতে বলিলেন। আমাকে নিয়া যাইবেন। নলিনাক্ষ সান্যাল এক পত্রও দিয়াছে।

২২শে জুন

সকালে মন্থর ওখানে যাই...। ৬টার পরই মন্মথবাবু মোটরে আসেন। শিশিরবাবুর ৪৲ টাকা নীচেই রেণুকে দেয়। উপরে আর উঠেন নাই। ৬॥০ টায় অতুল গুপ্তের ওখানে পৌঁছি। সেখানে নলিনাক্ষবাবু প্রিয়রঞ্জন বাবু ও অপর ২।১জন উপস্থিত ছিলেন। আমি বলিলাম —বর্তমান অবস্থার পরিবর্তনের জন্ম ঝড়ের মত জন-সাধারণের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাদিগকে মন্থন করিয়া জল গড়িয়া তুলিলে, একটা বিশুদ্ধ আবহাওয়া সৃষ্টি করিলে জনসাধারণই মীমাংসা করিতে পারিবে। ৮॥০ টায় আফিসে আসি মন্মথবাবুর গাড়ীতেই।... সকালে Final Causes পড়ি।.....।

২৩শে জুন

সকালে কোথায়ও বাহির হই না। মন্মথবাবু ফোন করিয়া জানান যে আগামী শনিবার মেদিনীপুরের এক জনসভায় আমাকে বক্তৃতা দিতে হইবে। শুক্রবার ৬টা হইতে ৬॥০টার মধ্যে এখান হইতে গাড়ীতে নিয়া যাইবে। আমি যেন প্রস্তুত থাকি। আমি রাজী হইলাম। রেণু খুব ভোরে মন্থর ওখানে গিয়া কাগজের কথা নীহারের সঙ্গে বলিয়া আসে। আগামী সপ্তাহে হইবে না, পরের সপ্তাহে হইবে। প্রেস ফোন করিয়া জানায় যে ১২৷৷০টার পর উজ্জ্বলতারও গাড়ীতে রওয়ানা হইয়াছে। রেণু ছানা নিয়া আসিয়া আমাকে খবর দেয়। আমি খাইয়া ১২টার পর রওয়ানা হই। তখন বৃষ্টি হইতেছিল। আমি ও রেণু বিস্তার যাই। প্রতিভার ছাতি যমুনা নিয়া যাওয়ায় সে বৃষ্টিতে ভিজিয়া এবং ট্রাম না চলায় হাঁটিয়া আফিসে আসিয়াছে।...আমরা গিয়া দেখি গোকুল আসিয়াছে। ৩টার পর ১ম কিস্তিতে ১৫৩ এবং ৪টায় ২য় কিস্তি ১৫৫ আজ ডাকে দেওয়া হয়।...প্রতিভা সন্ধ্যার আগেই চলিয়া যায়। গোকুল যায় ৮টায়। কালিদাসবাবু আসেন, অনেকক্ষণ অনেক আলোচনা হয়। বর্ণাশ্রম ও গণতন্ত্রের সম্বন্ধেই বিস্তারিত আলোচনা হয়, যাহা বর্তমান সময়ে হিন্দুদের কাছে বিশেষ সমস্যা। শ্রীনিত্যগোপালের দিব্য ব্রাহ্মণ, দিব্য ক্ষত্রিয়, দিব্য বৈশ্য ও দিব্য শূদ্রের কথাও বলিলাম। মুচি মুচি থাকিয়া, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ থাকিয়া কেমন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে থাকিবে, তাহাই বর্তমান যুগের প্রশ্ন। এতদিন ছিল ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়ার কথা। ব্রাহ্মণ শব্দটীকে বর্ণ অর্থে রাখিয়া উহার অর্থ 'ব্রহ্ম জানাতি ইতি ব্রাহ্মণঃ' করিলেও ব্রাহ্মণত্ব elastic হইবে না, বর্ণগত এই অধিকার বিন্দুতেই সর্ব বর্ণে ছড়াইয়া দেওয়া যাইবে না। কাহাকেও 'ব্রাহ্মণ' হইয়া ব্রহ্ম হইতে হইবে না, প্রত্যেকেই যে যাহার স্বকর্ম, স্বধর্ম বজায় রাখিয়া direct ব্রহ্মলাভ করিতে পারিবেন। রাইহরণবাবুও আসেন, অনেকক্ষণ থাকেন ও আলোচনা শোনেন। বৃষ্টির মধ্যেই রেণুর ছাতাসহ রওয়ানা হই। পথে বৃষ্টি চলিয়া গিয়াছিল।

২৪শে জুন

সকালে বাহির হই না, 'ব্রহ্মসূত্র' দেখি।...প্রায় ১২টায় রামগোপাল আসিয়া ছানা দিয়া যায়।...গোকুল সকালে আসে, উদ্বোধন ঠিক করে এবং আমরা আফিসে গেলে পর বাসায় চলিয়া যায়। সন্ধ্যার পর শেখরবাবু আসে। সকালে রেণুর স্কুলে নলিনী ঘড় আসিয়াছিলেন। মাখনবাবুও সন্ধ্যার পর আসিয়াছিলেন। শেখরবাবুকে 'শিক্ষার সমস্যা' প্রবন্ধ রেণু পড়িয়া শোনায়। প্রবন্ধটী বেশ হইয়াছে। শিশুশিক্ষায় যে কৌশল, বয়স্কদের শিক্ষায়ও সেই একই কৌশল। আমি তো তাহাই সারা জীবনে সকলের সঙ্গে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি। যাহাকে আপন মনে করিয়াছি, তাহাকে তাহার আবেষ্টনশুদ্ধই আপন করিতে চাহিয়াছি। তাহার অতীত, তাহার সুখ দুঃখ, তাহার ত্রুটী বিচ্যুতি, যেখান হইতে তাহার উপর প্রভাব পড়িতে পারে, সবটুকুর সঙ্গেই তো পরিচয় লাভ করিতে চাহিয়াছি; কিন্তু কয়জন তেমন করিয়া বলো দিল? তাহাদের আপন হইবার জন্য এবং আপন করিবার জন্য কি-ই না করিয়াছি? শিশুশিক্ষায় যে 'দর্শন', সমগ্র সমাজের শিক্ষায় সেই একই দর্শন বর্ত্তমান যুগে চলিবে এবং আমরা তাহাই দিতে চাহিতেছি। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী', 'চিত্রা' হইতে কয়েকটী কবিতা রেণু পাঠ করিয়া শুনায়। কয়েকটীর ভাষা এত জড়ানো ও দুরূহ যে, মাথা যেন ঝম্‌ঝম্ করে। এই সব কবিতা সার্ব্বজনীন নয়।

২৫শে জুন

...রেণু প্রিয়রঞ্জনবাবুর স্থান হইতে প্রবন্ধগুলি ও তাঁহার বিবেচনানুযায়ী ক্রমানুসারে লেখকদের লিষ্ট নিয়া আসে। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম কপি রেণুর নিকট নেই, সে দেখিয়া দিবে।...সকালে ব্রহ্মসূত্রের পাণ্ডুলিপি দেখি।... সকালে জ্ঞানেন্দ্র দাস রেণুর স্থানে আসিয়াছিল। সে কম্যুনিজমের দার্শনিক ত্রুটীর সম্বন্ধে সজাগ হইয়াছে এবং কম্যুনিষ্টদের নৈতিক দুর্ব্বলতার জন্য চটিয়া গিয়াছে। তাহার চাকুরী নিয়া তাহাকে তাতাইয়াই বিব্রত করিতেছে।

২৬শে জুন

সকালে গীতা-ভাষ্যটী দেখি। 'ন জায়তে' শ্লোকের 'ন'-পদের অর্থ Law of Excluded middle যাহা বলিয়াছে বর্ত্তমান যুগ তাহা স্বীকার করে না। 'ন'-এর একটা positive meaningও আছে। জিন্‌স্-এর 'half-tone'-এর প্রসঙ্গ ও বোসাঙ্কের লেখা ঐ শ্লোকের নীচে তুলিয়া দিব।...রেণু ৯টায় রওয়ানা হইয়া মেডিক্যাল কলেজ ও প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ঘুরিয়া ৬টায় মধ্যে আফিসে ফেরে।...কিছু পরেই ধীরেনবাবু আসেন। গীতা-পাঠ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাখনবাবু আসেন। মাখনবাবু বিলগুলি লিখিয়া নেয়। সরকারের ৪০টী গ্রাহকের টাকা তৈয়ার হইয়া আছে আজ খবর দিয়াছে। পড়া বেশী হয় না। ইতিমধ্যে সুবোধ মুখার্জী আসেন। আমাদের দর্শনের গুরুত্ব ও উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। গীতা-ভাষ্য বিশেষভাবে পড়িবার জন্য অনুরোধ করি। ৮-২৪-এ সন্তোষ ও তাহার স্ত্রী আসে। ৯টায় যায়। সন্তোষ তাহার শ্বশুরের টাকা ও নিজের একটী কবিতা দিয়া যায়। 'যে ফেরেনি'-র মত একটী গল্প লিখিয়াছে, বলিল। ইহার আগে গোকুল আসে। তাহার বিবাহ স্থির বলিয়া তাহার ভবীপতি খবর দিয়াছে। আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ও সংযোগ থাকিলে বিবাহিত জীবনেও পুরুষোত্তমের পথে চলা অব্যাহত থাকিবে—এই আশ্বাস তাহাকে দিলাম। যে-কোন অবস্থার ভিতরে পুরুষোত্তম নিজ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। আমার জীবনে উবাদিদির সার্থকতার কথা বলিলাম। আমি তো কখনও তাহাকে লইয়া পথচ্যুত হই নাই। ধীরেনবাবুর কাছে 'বিক্রীড়িতম্' শ্লোকটী ব্যাখ্যা করা হয়। রাসপঞ্চাধ্যায় বিশ্বজীবনের গুহ্যতম সমস্যায়, 'কামে'র একটী সুন্দর সমাধান ফুটিয়া উঠিয়াছে রাধাকৃষ্ণজীবনে। প্রকৃতি-পুরুষের কামময় সম্বন্ধের দিব্য সমাধান রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধ। তাই উহার শ্রবণে হৃদ্রোগ কাম দূর হয়। ১০টায় আশ্রমে ফিরি।

২৭শে জুন

সকালে ব্রহ্মসূত্র রিভাইস করি। ৮টার পূর্ব্বে মন্মথ-বাবুর স্থানে যাই মেদিনীপুর যাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা।

করিবার জন্য। সেখানে আধ ঘণ্টার উপর থাকিয়া বাজারের মধ্য দিয়া যখন আসিতেছি, তখন দেখি রেণু দালানের কোণায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। সে এখানে আধ ঘণ্টা থাকিয়া একটু চিঠি লিখিয়া বাসায় চলিয়া যাইতেছিল। রেণু চানা দিতে আসিয়াছিল। সে রাইটার্স বিল্ডিং, ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে যায়। সরকারের টাকা কাল পাওয়া যাইবে। সে ২টার মধ্যেই ফেরে। তখন খুব বৃষ্টি হইতেছিল। কিছু পরেই মালতী ও প্রতিভা আসে।···ইহার পরই শিবির আসে।···পূর্ণিমার যাওয়ার কথা বলে। পূর্ণের মেদিনীপুর যাওয়ার কথা স্থির, কি করিয়া সম্ভব হইবে? বারবার এইভাবে যাওয়া নিরস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে। কি কারণ রহিয়াছে ইহার মধ্যে? আমারও যাওয়ার ইচ্ছা আছে, অথচ যাওয়াও হয় না। ইহার পর সুধীর দাস নামে আমার এক ছাত্র আসিয়াছিল যাহার সঙ্গে সেদিন···দেখা···। সে গ্রাহক হইয়া আষাঢ়ের সংখ্যা নগদ দাম দিয়া নিল। একটী ছোট ছেলে stall-keeper বসা-হাজরার মোড়ে ৩ কপি উদ্বোধনও নিয়া গেল। বিক্রি করিয়া টাকা দিবে। মাখনবাবু আসিয়া P. E. N.-এর চিঠিটা ঠিক করিয়া দেয়। কমলার একটা চিঠি···। সুবোধবাবুও থাকেন প্রায় ১ ঘণ্টা। তিনি রাত্রিতে ইন্‌স্টিটিউট অব কালচারে থাকিবেন। একদিন শ্রীরামপুরে অমরবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার কথা তাহার সঙ্গে হইল। ১০টায় আশ্রমে ফিরি।

২৮শে জুন

সকালে ব্রহ্মসূত্র রিভাইস করি। ৮টার পর পাকলের চিঠিসহ দক্ষিণেশ্বর হইতে সুহাসিনী কিস্তীশের স্ত্রীর সঙ্গে মঠ হইয়া সেবানন্দের সঙ্গে এখানে আসে দীক্ষা-গ্রহণের জন্য। তখন সকল বই ছড়াইয়া ব্রহ্মসূত্র দেখিতে-ছিলাম। বই বন্ধ করিয়া সুহাসিনীর সঙ্গে আলোচনা করি। কিছু পরেই রেণু আসে। সে ঠাকুরের জন্য ফুলের মালা আনিয়া দিয়া রাইটার্স বিল্ডিং-এ যায় গ্রাহকদের টাকা আনিতে। ইতিমধ্যে বরিশালের হোমিও ডাক্তার সুরেন দত্ত (রিফিউজী) আসে আর এক ভদ্রলোক সহ। তাহাদের সঙ্গে বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়। তাহারা চলিয়া গেলে সুহাসিনীকে দীক্ষা দেওয়া হয় ঠাকুরের মন্ত্রে। মালতী আসে···। যাওয়ার সময় সুহাসিনী, মালতী, নন্দরাণী মুটকে আমার তরকারীমাখা ভাত দেই। রেণুর জন্য কিছু রাখিয়া দেই। ১২৪০টায় সময় চেক নিয়া রেণু আসে। ভূপালের আম ও সন্দেশের জন্য টাকা দেয়। উহা আনা হয়। রেণু সন্দেশ নিয়া আসে। সুহাসিনীকে মালতী মঠে পৌঁছাইয়া দেয়। আমি ও রেণু দক্ষিণেশ্বরে পাকলের বাবাকে দেখিবার জন্য ২৫০টায় রওয়ানা হই। ৪-৩৫-এ সেখানে পৌঁছি। সুস্থ মনে সুস্থ মস্তিষ্কে গিরিজাবাবু আমার আলোচনায় যোগ দিলেন। 'আত্মানকাঙ্ক্ষেচামি' ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা বর্তমান সমস্যার আলোচনা হয়। গিরিজাবাবু তাহা উপলব্ধি করেন। ৭-৪৫-এ আফিসে ফিরি। দক্ষিণেশ্বরে আম ও পানতুয়া খাই। বাস পর্যন্ত পাকল ও কমলা (পাকলের বড় বোন) আসিয়াছিল। চিফ এস্‌প্ল্যানেড পর্যন্তের টিকিট কিনিয়া দেয়। আমরা ডালহৌসী নামিয়া ট্রামে মোড়ে নামি। ইহার কিছু পরে মালতী ও প্রতিভা বাসায় যায়। আমি ৯৪০টার পর আশ্রমে ফিরি। যতীনবাবু আসিয়া আমাকে পান নাই। সুহৃদের একটা চিঠি (রেণুর নামে লেখা) রাখিয়া যান। মন্মথবাবু ফোন করিয়াছিলেন, আমাকে ফোন করিতে বলিয়াছেন।

২৯শে জুন

(আগামী কল্য সন্ধ্যায় মেদিনীপুরের এক জনসভায় বক্তৃতা দিবার জন্য আজ সন্ধ্যায় ৬—৬৩০টার মধ্যে এখানে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে।)

৮টার পর মন্মথবাবুর ওখানে গিয়া জানি যে, মেদিনীপুর যাওয়া হইবে না, উহারা সভার বন্দোবস্ত করিতে পারে নাই। ব্রহ্মসূত্র revise করি। রেণু ১১টার পর আসিয়া প্রায় ১টা পর্যন্ত থাকিয়া কলিকাতা যায়, ঝুমিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, বোম্বে মিউচুয়াল প্রভৃতি

স্থানে। মালতী আসে আনারস লইয়া। প্রতিভা ঘুরিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক (হাজরা) ও ব্যাঙ্কার্স ইউনিয়ন ঘুরিয়া এখানে আসে। রেণু এখানে খেয়ে না। সে প্রায় ৬টায় শশীর ওখানে হইয়া আফিসে যেয়ে। আমাকে তাহার জন্য ওষুধের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছে। আমি মালতী ও প্রতিভা ৫টার পর আফিসের জন্য রওয়ানা হই।……প্রতিভার সঙ্গে আজার কথাবার্ত্তা হয়। পুরুষোত্তম-তত্ত্ব আজার ভাল লাগে, কিন্তু কোথায় তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা সে জানিতে চাহে শুধু বিচার দ্বারা। কিন্তু জীবন তো একান্ত বিচার, একান্ত কর্ম্ম বা একান্ত ভক্তিদ্বারা বুঝা যায় না। কেহই একাকে অপরের জীবন পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারে না; কতদূর আগাইয়া নিয়া সে স্তব্ধ হইয়া যায়। তাই কোনও মানুষের ঝগড়া হইলে তাহা শুধু আলাপ আলোচনাদ্বারাই মীমাংসা হয় না। মীমাংসা চাহিলে কর্ম্মের মধ্য দিয়া কিম্বা ভালোবাসার মধ্য দিয়া তাহার সহিত সংস্পর্শ বজায় রাখিতে হইবে। ঝগড়া হইলে যে ঘুরে সরিয়া যায়, অভিমানে কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া দেয়, সে ঝগড়াই চায়, মিলন চায় না। সে কখনই বস্তুতন্ত্র নয়। সে নিজের খেয়ালই বাঁচাইয়া রাখিতে চায়। জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি জীবনের এই তিনটী বৃত্তিকে সর্ব্বদা জাগরূক রাখিতে হইবে; সুবিধা বুঝিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। যখন এক দিক রুদ্ধ, অপর দিক দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সব দিক রুদ্ধ, কখনই এরূপ ঘটনা ঘটে না। গোকুল ২জন গ্রাহকের টাকা আনিয়াছে। সে পত্রিকাগুলি গুছাইয়া দিল। গোকুলের বিবাহ যেন এখানে হয়, আমরা বিবাহে যোগ দিব—বলা হইল। গোকুল ও আমি একত্র হইয়া বাহির হইয়া আশ্রমে ফিরি। গোকুল এখান হইতে বাসায় চলিয়া যায়।

৩০শে জুন

সকালে ব্রহ্মসূত্র revise করি। রেণু প্রিয়রঞ্জন সেনের ওখান হইতে প্রবন্ধগুলি আনিয়া সুহৃৎবাবুর ওখানে দিয়া আসে।…–বাবু যেয়ীতে আসে বলিয়া তাহার সঙ্গে 'exclusive' হওয়ার বিষয়ে কোনও কথা হয় না। ১২টার পরই রেণু ছানা লইয়া এখানে আসে, তখনও আমার খাওয়া হয় নাই। শ্রাবণের 'চরিত্রহীন' পড়ে ও সন্ধ্যার পর সেব করে। গোকুল আসে ১২টার পর, যায় ৮।০টার পর। ব্রহ্মসূত্রের ইংরাজী লেখাগুলি লিখিয়া দেয়। রামগোপাল আসে। রেণু কিছু আগে আফিসে যায়। আমি ও প্রতিভা ছয়টার পূর্ব্বে আফিসে যাই। গোকুল চিনাবাদাম ও ভালমুট খাওয়ায়। সুধাংশু আসে আফিসে, এ মাসের পত্রিকা কয়েকখানি নিয়া যায়। প্রায় ৯টায় ময়মনসিংহের মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের পণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ আসেন। তিনি প্রশ্ন করেন—সাধুসঙ্গে মানুষ অবশ্যই পবিত্র হইবে কি না? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশধরগণ কেন পরস্পর কাটাকাটি করিয়া মরিল? ভগবান যেন অগ্রগতির জন্য একটা 'প্রেরণা'। সে অগ্রগতি যে কোন্ পথে হইবে, কে জানে? বাহির হইতে কোনও চাপ ভগবান দেন না। মানুষ-গুরুরা কিছু কিছু দেন; ভগবান মোটেই দেন না। যিনি যতখানি ভগবান তত কম চাপ তিনি দেন। তবে ভগবানের স্পর্শে মানুষের সব অতীত নিজ ব্যাখ্যার জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। সাধু সঙ্গেও ইহা হয়। তাই ভগবানের দর্শনলাভে মানুষ মহা বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়ে। পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বিতীয় প্রশ্ন প্রারব্ধ লইয়া। 'কীরন্তে চাস্য কর্ম্মাণি' বলিতে প্রারব্ধ কথাও বুঝিতে হইবে। প্রারব্ধের যে চক্র আপনা-আপনি ঘুরিতেছে, তাহার উপর যদি ব্রজগোপীদের মত 'দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহে'র 'তাপ' আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে সে প্রারব্ধও কাটে। 'নরক' শব্দ গীতা ছাড়া প্রাচীন উপনিষদে আছে কিনা তাহাও প্রশ্ন করেন। ৯।০টার পর তিনি যান। আমি ও প্রতিভা চলিয়া আসি।

১লা জুলাই

…৬টার মধ্যে প্রার্থনাকালে রেণু এখানে আসে। ৮।০টা পর্য্যন্ত থাকে। ঠাকুরের সেবার জন্য জিলাপী ও গুজিয়া ১৲ টাকায় আনিয়া দেয় ও এখানে লুচি তরকারী, কাঁঠাল ও ঐ সব প্রসাদ পায়। আমি তাহার পর

ব্রহ্মসূত্র দেখি। গোকুল ১২টার মধ্যে ছানা দিয়া যায়। তাহার সঙ্গে গত রাত্রির বঙ্কিম পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গীয় কথাবার্ত্তা আবৃত্তি করি। অনেকক্ষণ সে থাকে। আমার ঘর ঝাড়িয়া, বিছানা সাফ করিয়া দিয়া যায়। কেন উষাঙ্গিনীকে সন্ন্যাসী হইয়াও আমি সঙ্গে রাখিয়াছি, তাহা বলিলাম। একটী 'সন্দেহ' উত্থাপন করিয়া সত্যকে স্থাপিত করিতে হয়। মানুষ সন্দেহ করিবে, প্রশ্ন করিবে, আমি ও উষাঙ্গিনী জীবন দিয়া উত্তর দিব—তবেই হইবে গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস সমন্বয়। ২টার পর শশী ওখান হইয়া বেণু আসে। শশী বেণুর ওষুধ স্থির করিয়াছে, কাল ভোরে খালি পেটে গিয়া খাইয়া আসিতে হইবে। প্রতিভা আজ আর আসে নাই, বাঁশবেড়িয়া গিয়াছে বোধ হয়। যাইবারই তো কথা। আমরা ৪টার পর আফিসে যাই। গোকুল ব্রহ্মসূত্রের ইংরাজী অংশ লিখিয়া দিতেছে। আজ 'কবির স্বপ্নে'র প্রুফও একবার দেখে। নিজের পড়া তো করিয়াছেই। সকালে মাখনবাবু...আসে।...গোকুল সন্ধ্যার পরই চলিয়া যায়। পণ্ডিত মহাশয় আসেন। তিনি তাঁহার লেখা 'শ্রীকৃষ্ণ ও পূতনা' প্রবন্ধ পাঠ করেন। পূতনা 'কলঙ্কী' ও জিঘাংসু হইয়াও কেন 'ধাত্রীচিতাং গতিম্' লাভ করিল তাহার একটী আলোচনা উহার মধ্যে আছে। আলোচনাটী আমাদের মনঃপূত হইয়াছে। কিন্তু বরুণার যে সাইকোলজিকাল রূপটী বর্ত্তমানে ধরা পড়িয়াছে, তাহা আলোচিত হয় নাই। উহা বেণুকে লিখিয়া দিবার জন্য পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন। চিন্তাপ্রণালী আমাদের সজাতীয়। হিন্দুরা কেমন করিয়া মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে (বাঙ্গলাই সর্বশেষে মুসলমানের আমলে আসিয়াছিল) দলে দলে মুসলমান হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করেন। হিন্দুর সমাজ ব্যবস্থাই যে এজন্য দায়ী, মুসলমান নবাব যে দায়ী নয়, তাহাও বর্ণনা করেন। গত বৎসর ময়মনসিংহে বেস্তার সঙ্গেও হিন্দুর বিবাহ ইহারা দিয়াছেন। ১০টার পর আমি ও পণ্ডিত মহাশয় বাহির হই। কালীঘাট পার্ক পর্য্যন্ত আমরা আসিলে তিনি তাঁহার বাসার দিকে যান, আমি আশ্রমে ফিরি।...

২রা জুলাই

সকালে ব্রহ্মসূত্র দেখি ও বাঙ্গলার বর্ষপঞ্জীর সমালোচনা লিখি।...বেণু ১১টার পর ছানা লইয়া আসে। ১২টার পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী হইতে মহেশ পালের শঙ্করতন্ত্র ও তাহার অনুবাদ ২টার পর ফেরে। লাইব্রেরী হইতে আশুবাবুর ওখানে ও প্রেসে যায়। সিদ্ধান্তকৌমুদী বাঁধিতে দেওয়া হইয়াছিল।...প্রতিভা বাঁশবেড়িয়া। আমি ও বেণু প্রায় ৬টায় আফিসে যাই। রাধাচরণবাবুর বই...। ব্রহ্মসূত্রের কম্পোজ করা আরম্ভ হইয়াছে। আমার মত সর্ব্বতোভাবে রিক্ত একটী মানুষের ছোট জীবনকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান যুগের জীবন দর্শন আত্মপ্রকাশ করিতেছে, ইহা শুধু নিত্যগোপাল আমার জীবনে চাপিয়া বসিয়া আছেন, তাহারই ফলমাত্র। কোথায় শঙ্কর-রামানুজ প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিতগণ, আর কোথায় আমি! বর্ত্তমান যুগ যে এই দর্শনদ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিবে, ইহা স্থির। এখন ইহাকে ঝড়ের মত ছড়াইয়া দিতে হইবে। ঠাকুর তো হাত ধরিয়া আমাকে প্রয়োজন মত যথাসময়ে আগাইয়াই দিয়াছেন, এবারেও নিশ্চয় দিবেন। আমি তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি। প্রমতি বোধহয় আর আসিবে না। মালতীর চিঠি আসিবার এখনও সময় হয় নাই। রাধাচরণবাবুর একটা চিঠিতে...।

৩রা জুলাই

ক্রমশঃ

স্মরণ তীর্থে

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

এ তোমার স্মরণ-উৎসবে
এসেছি আমরা এই স্বল্প কয় জন।
শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিয়ে। আড়ম্বর নাইকো এখানে।
একটি একটি করে দুরন্ত বছের মালা গেঁথে
উচ্চ কণ্ঠে জানাতে আসিনি
আমাদের জ্ঞানের পরিধি কতটুকু।

আমরা এসেছি এই স্নিগ্ধ শান্ত এ আশ্রম মাঝে,
যেইখানে তুমি ছিলে (এদিকে ওদিকে চারিধারে
তোমার উজ্জ্বল স্মৃতি আজও তো রয়েছে একই মতো)
বলেছিলে কত কথা : সে-কথা তো শুধু
তোমার আমার নয়, সে-কথা বিশ্বের।

'বিশ্বনাগরিক' ছিল তোমার যে দীক্ষাদাতা গুরু,
তাঁরই তো সুযোগ্য শিষ্য, আত্মার আত্মীয়।
সহজ সরল করে কাছে ডেকে নিয়ে,
একান্ত স্নেহের স্পর্শে মন প্রাণ ছুঁয়ে ছুঁয়ে, ক'য়ে
তাঁরই কথা বলেছিলে (আজও সেই কথা যেন
কানে ভেসে আসে) সে কথা প্রাণের।
সে-কথা অনেক দুঃখ-বেদনার মাঝে
বলিষ্ঠ সান্ত্বনা ;
হতাশা-নিরাশা-ক্লিষ্ট জীবনে আশ্বাস।

আজ তুমি নেই রূপ ধরে :
নাই থাকো, (পঞ্চভূতে-গড়া এই দেহ
একদিন শেষ হবে সে তো)
আছে সেই স্নেহ-স্পর্শ অনুভবে পাই,
আছে সেই অন্তরের অন্তঃস্তল হতে
উৎসারিত প্রাণময় বাণী, শুনি কান পেতে ;
আর আছে সমুজ্জ্বল এ আশ্রম-ভূমি
তোমার স্মৃতির স্পর্শে সুরভিত প্রতি ধূলি যার।

এখানেই নিয়েছি আমরা :
এনেছি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য আনন্দ-বেদনা দিয়ে মেশা।
দু-ই রেখে যাই এই পবিত্র আশ্রম ভূমি 'পরে—
'নর আর নারায়ণ' দু'-রূপেই অর্চনা যেথা চলে,
সেই দু'রে প্রণতি জানাই।
এ স্মরণ-তীর্থে এসে নিয়ে যাই প্রসন্ন অন্তরে
তোমার আশিস্‌পুঞ্জ, যা দিয়েছ অকাতরে,
পেয়েছি কত না অযাচিত :
সে-ঐশ্বর্য পেয়ে ধন্য হই। *

---

* শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৭৯ তম জন্মোৎসবে পঠিত।

আমার গ্রাম

॥ শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ॥

গাঁয়ের পথ মাঠের ধূ ধূ নাম্‌লা জমি দিয়ে
বাবলাবন, শিটুলি আর আম-জামলের ফাঁকে ;
উড়িয়ে ধুলো কঁকিয়ে কেঁদে গরুর গাড়ী হাঁটে।
চাষার হাতে কাস্তে—ক্ষেতের ফসল নেড়ে নিয়ে
গোলায় তোলে ; পুকুরে হাঁস, লাল শড়কের বাঁকে—
একটা বুড়ো অশ্বত্থ গাছ তাকিয়ে আছে মাঠে।

কুফকলি মেয়ে কাঁখে কলসী নিয়ে চলে,
"খয়রামারী" দিঘীর কালোজলের বুকের ছায়া
ছায়া খেজুরগাছের তলায় উপ্‌ছে পড়া রসে,
ঘনিয়ে এলো আঁধার, বাতি জ্বলে দাওয়ার তলে ;
ঘনিয়ে বসে নারীপুরুষ, চোখে ঘরের মায়া,
দিঘীর পাবে দুর্বাঘাসে শিশির মাখা ঘসে।

দূরের গাঁয়ে মন্দিরেতে ঘণ্টা বাজে—শু'নে
দাওয়ার নীচে সন্ধ্যামনি গাঁদার মেয়া দু'য়ে
তুলসীগাছে জ্বালিয়ে দীপ নোয়ায় মাথা মেয়ে ;
পরনে তার ডুরে শাড়ি, আকাশতারা শুনে
শুদ্ধ মাটির বুকের কাছটী আপ্তে থাকে ছুঁয়ে,
অনেক দূরে মেঘের ছায়া আলোর থাকে চেয়ে।
ওরাফসল মাটি মায়ের স্নেহতে উঠে নেয়ে
বাউল প্রাণ সন্ধ্যাতারার আলোকে যায় পেয়ে।

পুস্তক পরিচয়

Religion and Realisation.

প্রকাশক : সুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সুরধাম', ১, কালী ব্যানার্জী লেন, হাওড়া, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৩, মূল্য লেখা নাই।

আজকের মানুষ বড় বেশী জড়বাদী। আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি আগ্রহ প্রায় নেই বললেই হয়। বিশ্বাসও নেই। আধ্যাত্মিকতার আলোচনা বৃদ্ধ বয়সে অবসর যাপনের সামগ্রী। তবু কিছু মানুষ আজো মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের কথা ভাবে। বিভিন্ন সাধন ভজনের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করা যায়, বিশ্বাস করে। সময় করে নিয়ে কিছুক্ষণ অন্তত এই জাতীয় পুস্তক পাঠ করে এবং সাধ্যমত সাধন পথের সহজ এবং গ্রহণযোগ্য কোন পন্থাকে অবলম্বন করে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করে।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নানা বাণী উদ্ধৃত করে এই পথের কথাই আলোচনা করেছেন। এই জাতীয় পুস্তক পাঠে যাদের আগ্রহ তাঁরা পড়ে আনন্দ পাবেন। ভাষা সহজ ও সরল।

এই বইখানারই বাংলা অনুবাদ "ধর্ম ও অনুভূতি" নামে ছড়িয়ে পাওয়া মাণিক বের করেছেন। এটীর উপজীব্য শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের যৌগিক রূপ, কথামৃতের কথায় অমৃতত্ব নূতন ভাবে আস্বাদন করানো। আমরা বিশ্বাস করি বইখানি উৎসুক পাঠককে আনন্দ দেবে।

—সুগত

সাময়িকী

শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ-জন্মোৎসব ঃ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ৭৯-তম জন্মতিথি কার্তিকী কৃষ্ণা পঞ্চমী উপলক্ষে বিগত ১০ই অগ্রহায়ণে রবিবার তাঁহার সমাধিস্থান নরনারায়ণ আশ্রমে বিকাল ৪টায় এক জনসভা হয়। শ্রীনলিনীকিশোর গুহ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামিজীর ও নরনারায়ণ আশ্রমের অনুরক্ত অনেকেই আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অধ্যাপক বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমিথিলরঞ্জন রায়, ডাক্তার যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীননীগোপাল ভট্টাচার্য, শ্রীসমরেন্দ্রনাথ বসু রায় ও সভাপতি শ্রীমৎ স্বামিজীর জীবন, তাঁহার জীবনদর্শন ও তাঁহার রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আশ্রম সম্পাদিকা বেণু মিত্রও শ্রীমৎ স্বামিজী সম্বন্ধে বলেন। অনেকে উপস্থিত থাকিতে অক্ষম হইয়া পত্রদ্বারা দুঃখ প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে জনাব বেজাউল করীম লেখেন, 'স্বামিজীকে আমি অন্তরের সহিত ভক্তি করি। তাঁর মধ্যে আছে প্রাচীন ও নবীনের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়। তাঁর মহান আদর্শ যদি দেশ গ্রহণ করিতে এবং তদনুসারে জাতীয় চরিত্র গড়িয়া তুলিতে পারে, তবে জাতি জীবন-সংগ্রামে পরাস্ত হইবে না'। প্রবীণ এ্যাডভোকেট শ্রীযুত মন্মথনাথ দাস লেখেন, স্বামিজীর প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। আমার জীবন তাঁহার নিকট নানারূপে উপকৃত হইয়াছে। তিনি তাঁহার পরিচিত সকলকেই আপন করিয়া লইয়াছিলেন…।' স্থানীয় জনসাধারণ ও বন্ধুজন সহ সভায় প্রায় তিনশত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভা শেষে সকলকে সামান্য প্রসাদ দেওয়া হয়।

পরদিন সোমবার জন্মতিথি দিনে আশ্রম-দেবতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের পূজা অঞ্জলি ও ভোগ হয় এবং তৎপর ৮ শতাধিক লোককে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়ান্স, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

উদ্বোধন

পৌষ, ১৮৮৩ শকাব্দ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ ১৪শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৭)

সন্ধ্যা—(ঠাকুরের শেষ উপদেশবাণী পাঠ করলেন)—'আমার শিষ্যগণের প্রতি আমার এই শেষ উপদেশ যে তাঁহারা পরস্পর ভ্রাতৃভাবে থাকিবেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বিপদে পড়িলে অন্য সকলে তাঁহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবেন। যদ্যপি কাহারও কোন কষ্ট হয় তবে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। পৃথিবীস্থ যাবতীয় লোককে ভ্রাতৃভাবে দেখিবেন ও পরস্পর সাহায্য করিবেন। অনাথ আতুর দেখিলে সাহায্য করিবেন। পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন না। সকল ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমানভাবে ভক্তি ও বিশ্বাস রাখিবেন।'—

—(এটা সবাইকে মুখস্থ করতে বললেন।) বিশ্বের সকল মতকে স্বীকার করা সোজা কথা নয়—অথচ করতে হবে। মানুষে মানুষে আচারে ব্যবহারে রুচিতে আহারে সব কিছুতে পৃথক—ভ্রাতৃভাব আসবে কি করে? শাক্ত শৈব বৈষ্ণব পরস্পরকে ভালবাসবে কি করে?... God is our Common Father—একই ব্রহ্ম কালী-কৃষ্ণ-শিব...একই মানুষ যেমন কখনও পুত্র, কখনও পিতা, কখনও ভ্রাতা; একই দুধ যেমন ছানা মাখন দধি সন্দেশ—তেমনি একই ব্রহ্মের লক্ষ লক্ষ প্রকাশ। একই মানুষের প্রকাশ যদি বিভিন্ন—তবে এর সঙ্গে কি মিলন সম্ভব নয়?...শাক্ত বলে কেউ নেই, আছে মানুষ; মানুষ কি না তাই দেখব—মানুষ মানুষকে ভালবাসতে পারবে না? শাক্ত হয়েও মানুষ কি না, বৈষ্ণব হয়েও মানুষ কি না—তাই দেখতে হবে। নিত্যগোপাল অবধূত—সমস্ত সংস্কারের মধ্য দিয়ে মানুষ বেরিয়ে আসছে—সবার উপরে মানুষ সত্য—সন্ন্যাসী হও, ব্রাহ্মণ হও, ইংরেজ হও, আদিবাসী হও, তুমি মানুষ—এই মানুষ হিসাবে আজ সকলকে পরিচিত হতে হবে। টিকি, পৈতা, দাঁড়ি সব উড়ে যাবে—মানুষ হয়েছ কিনা—সজ্ঞা পড়ে থাকতে পার কি না—সেইটে তোমার পরীক্ষা—মানুষ হয়েছ কি না তার পরীক্ষা...।...যে মনে করে আমি বুঝি সব, সে আসলে কিছুই বোঝে না। নিউটন বললেন, আমি উপলখণ্ড কুড়াচ্ছি...যিনি সকল ভাবকে গ্রহণ করতে পারেন তিনিই নিরুপাধি। বিশ্বমৈত্রীর সংবাদ নিয়ে নরনারায়ণ আশ্রম এখানে এসেছে।... সকলের ইষ্ট আমারই ইষ্ট। ভগবানকে ভজনা না করলে মানুষকে ভালবাসতে পারবে না—বাপকে ভালবাসতে না পারলে ভাই ভাইকে ভালবাসতে পারবে না। আমাকে ভাল না বাসলে আমার শিষ্যকে ভালবাসতে পারবে না।...দুই সতীনের গল্প জানো না? তাদের স্বামীসেবা নিয়ে ঝগড়া—তাদের দৃষ্টি নিজেদের দিকে—স্বামীর দিকে নয়—তাই ঝগড়ায় স্বামীর পা কেটে ফেলতে হয়—এটা তার, এটা আমার, এটা অমুকের—সমগ্রের ধারণা যায় লোপ পেয়ে।...আজ সমগ্রের ধারণা আনতে হবে—সমগ্র মানুষ, সমগ্র সমাজ। যে কাড় দিচ্ছে, যে রান্না করছে, যে বই লিখছে—সবাই মিলে একেরই সেবা করছে।... শাক্ত শৈব বৈষ্ণবের ঝগড়ার মধ্য দিয়ে 'মানুষ' যখন মাথা গেল, তখন বুদ্ধ এলেন—নির্ব্বাণের মধ্যে, শরণাগতির মধ্যে মিলতে হবে।... তোমাদের প্রতি আমার নির্দেশ এই, বিশ্বের সকল সম্প্রদায়কে ভাল বাসতেই হবে...একলা গোবিন্দ পাবে না...নিত্যগোপাল সর্ব-সম্প্রদায়ের মিলনসূত্র দিয়ে গেছেন।...জগন্নাথ নিত্য-গোপাল, জগন্নাথ নিত্যগোপাল...

২৩, ৫, ৫৬

...নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল..., আমার জীবনে

তুমি যাহা চাও আমি তাহা প্রাণপণে পালন করিব। বুদ্ধের দৃঢ় সংকল্প আমায় দাও। এই আসনে বসিলাম—হয় সিদ্ধি লাভ করিব, নয় দেহ শুষ্ক হইয়া যাউক—এই দৃঢ় সংকল্প আমায় দাও।...সকলকে ভাই-এর মত দেখিব, যেমন লক্ষ্মণকে রাম দেখিতেন। উপনিষৎ বলিতেছেন—যাহাকে আমার বাহিরে রাখিলাম, সে-ই আমাকে পরাস্ত করিবে। আমি যেন কাহাকেও আমার বাহিরে না রাখি।...প্রণতঃ ক্লেশনাশায়—প্রণত হইলেই আমার ক্লেশ নাশ হয়। প্রণত হইলেই তোমায় আমি আমি লাভ করিব।...রাধারাণী নিজেকে গোবিন্দকে দিয়া যে আমিকে লাভ করিয়াছিলেন, সেই আমি আমি লাভ করিব। 'আমি' মনে ঘুচিবে জঞ্জাল—আমার যে আমির সঙ্গে অপরের আমির টক্কর লাগে, সে আমি ছাড়িয়া আমি তোমার আমি লাভ করিব।...যে-আমি একে অপরকে পূরণ করে, আমি সেই আমি চাই।...প্রত্যেকেই এক হিসেবে নিজে পূর্ণ—কিন্তু প্রত্যেকে অপরের সঙ্গে না মিলিলে সমগ্র হয় না।...আমির মেলা বসে গেছে—এখন এই সব আমিগুলিকে পরস্পর হাত ধরাধরি করাইয়া কেমন করিয়া গোবিন্দকে ধরিতে পারি, তাহা করিতে পারিলেই নিত্যগোপালের নির্দেশ পালন করা সম্ভব হইবে।...জগন্নাথ নিত্যগোপাল, তোমার নির্দেশ পালন করিবার জন্য অটল অটল বিশ্বাস দাও...। এই আশ্রম হইতে ব্রহ্ম বিদ্যা প্রচারিত হইবে।...

সন্ধ্যা

নিত্যগোপাল...মহানির্বাণ মঠের নাম গুরুপীঠ রেখেছেন।...সকল গুরুর সমন্বয় করেছেন বলেই সকল গুরুরই ওটা পীঠ স্থান।...পরস্পর বিপরীতের এই সমন্বয়ের পথে এ যুগে তিনিই প্রথম—তাঁর গুরু নেই—তিনি যে গুরু করেছেন সেটা লোকশিক্ষার জন্য। তিনি কার কাছে শিখবেন? তিনি জ্ঞানময়।...তবু কৃষ্ণ মহাপ্রভু নিত্যগোপাল সকলেই গুরু করেছেন। বুদ্ধদেব গুরু করেন নি।...শ্রীরামকৃষ্ণ সমন্বয়ের প্রথম অর্ঘ্য দিয়েছেন।...বুদ্ধে-শঙ্করে, শাক্তে-শৈবে, বৌদ্ধে-জৈনে... জড়বাদীতে-অজড়বাদীতে অদ্বৈতের ভূত ছাড়াবার সময়ে নিত্যগোপাল দিতে এসেছেন—তিনি ঐক্য-বিধায়ক ভারত ভাগ্য বিধাতা।

[নিত্যগোপালের শেষ বাণী পাঠ]... আমি অর্থ বিশ্ব, আমি অর্থ রাষ্ট্র, আমি অর্থ সমাজ, আমি অর্থ পরিবার—একলার ধর্ম নাই আজ...নরনারায়ণ আশ্রমের জয়যাত্রা সার্থক হউক—অনৈক্য দূর করবার জয়যাত্রা...।

বুদ্ধপূর্ণিমা—২৯, ৫, ৫৬—সকাল।

যাজ্ঞেগোবিন্দ... নর নারায়ণ, নর নারায়ণ, নর না নর নারায়ণ।

যে সমগ্র ভারতীয় সভ্যতা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ৫ হাজার বৎসর পূর্বে নিজ জীবনে ও দর্শনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, যে সভ্যতার একদিক শঙ্কর নিয়েছেন, তারই আর একদিক ভগবান বুদ্ধ স্থাপন করে গেছেন। কোন একটাই পূর্ণ নয়—ভারতবর্ষ নরনারায়ণের পূজক... আজও ভারতবর্ষে নরনারায়ণ তপস্যা করছেন...। বুদ্ধদেব আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে নারায়ণকে পাওয়ার জন্য নয়, মানুষের দুঃখ দূর করবার জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। ...নারায়ণপরায়ণাঃ দেবাঃ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক সময়—কিন্তু 'যা দুষ্পূরা সদুদ্রা সধায়া'...এর মধ্যে নর ও নারায়ণ দুইয়ের কথাই রয়েছে।...প্রচলিত সাধনা অ-রসের, অ-গন্ধের সাধনা...বুদ্ধ নিলেন গতির দিকের সাধনা... বাল্য একটী ক্ষণ, যৌবন একটী ক্ষণ, বিশ্ব ক্ষণিকের মেলা... —ভালবাসা ভাঙেই, আবার ভাঙেও না... ক্ষণে ক্ষণে নিত্য নূতন হয়...। বুদ্ধ বেদ মানতেন না,...বৈদিক আচারও মানতেন না...। বেদের আচারে—যজ্ঞের ধূমে—আকাশ বাতাস যখন মলিন করছিল, তখন বুদ্ধ বললেন, থামো—সকলকে ডাকো—নাপিত ডোমা তাঁতি বেত্তা সকলকে—সকলে মিলে মিশে থাক।...বুদ্ধ না মানার দিকটা দেখালেন, শঙ্কর মানার দিক—বৃন্দাবন মানা না-মানার সমন্বয়। বুদ্ধ মানুষে মানুষে মিলনের কথা বললেন...বর্তমানে মার্ক্সের মতে man is the measure...বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি...বুদ্ধ পুরুষকারের উপর জোর দিলেন—বেদ নারায়ণের উপর—কৃষ্ণ দুইয়ের উপরই—

নরনারায়ণ আশ্রম দুইয়ের উপরই জোর দেয়।...স্বাধীনতার উপাসক—স্বাধীনতা মানে উচ্ছৃঙ্খলতা নয়।...বিশ্বোন্মুখ হও, বিনীত হও, শরণাগত হও—নিজের আমি না গেলে চলবে না ...বিশ্বের মানুষকে ভালবাসতে বলেছেন বুদ্ধদেব—ভাগবতেও তাই আছে—রন্তিদেবের কাহিনী —রন্তিদেব মরবার আগে প্রার্থনা করছেন

ন কামযেঽহম্ গতিমীশ্বরাৎ পরাম্
অষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজাং
অন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥

রন্তিদেব ঈশ্বরের কাছ থেকে পরাগতি চান না, অষ্ট ঋদ্ধিযুক্ত পুনরায় না হওয়াও চান না, তিনি অখিল-দেহভাক্‌গণের—অর্থাৎ সকল মানুষের—অন্তরে স্থিত হইয়া তাদের আর্তি গ্রহণ করবেন, যেন তারা অদুঃখ হয়। অর্থাৎ মানুষের দুঃখ যেন তিনি দূর করতে পারেন —এই হচ্ছে ভাগবতের সাধনার কথা।...বুদ্ধের নির্বাণ যা, ভাগবতের শরণাগতিও তাই-ই। অহংকারের জন্যই জন্মমরণে জনছ—যা জনছে তা অহংকার। তাই নিবে যেতেই হবে।...আবার ভাগবতের কথাতেই বলি

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা···

প্রহ্লাদ বলছেন, মুনিরা প্রায়ই নিজের নিজের মুক্তিকামনা করেন, কিন্তু প্রহ্লাদ নিজের মুক্তি চান না, সকলে যেদিন মুক্ত হবে, সেই দিন তাঁর মুক্তি।

পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর জোর দিতেই হবে। কূটনীতি—এখানে এক রকম, ওখানে আর এক রকম—এ চলবে না, হৃদয় দিয়ে বিশ্বকে ভালোবাসতে হবে।..

আজ বুদ্ধের জন্মদিন, বোধিসত্ত্ব লাভের দিন, পরিনির্বাণের দিন।...আচার্য্য শংকরেরও জন্মদিন এই বৈশাখেই।...বুদ্ধের সঙ্গে শংকরের সমন্বয়-মূর্তি নিত্য-গোপাল।...পুরুষোত্তম-ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, পুরুষোত্তম-সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, পুরুষোত্তমং শরণং গচ্ছামি।... নিত্যগোপাল, ধরার বুকে তোমায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বেরিয়েছিলাম পথে পথে···বুদ্ধের জীবন আমায় দাও, শংকরের জীবন আমায় দাও, আমায় প্রাণ দাও।··· [দুপুরে ভোগের পর]—হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর সামনে তুমি নিয়ে এলে মিলনের বাণী,...বুদ্ধদেব, বেদের সত্যতার পরিপূরক হিসাবে তুমি এসেছিলে···বন-ফুল জাতি কিছু না থাকলেও মানুষ হিসাবে মানুষ উন্নততম জীবনের অধিকারী হইতে পারে, এই কথা তুমি বলিলে।···মানুষকে তার মর্য্যাদায় স্বীকার করব, মানুষকে ভালবাসব—এই আশীর্বাদ কর। ১৯১৯-এর ৯ই ফেব্রুয়ারী পথে বেরিয়েছি—ভগবান তথাগত, তোমারই পথে প্রব্রজ্যা নিয়েছি।···সঙ্ঘ গঠন করবার নূতন দীক্ষা আজ বুদ্ধের জন্ম দিনে গ্রহণ কর।···নূতন বুদ্ধ তুমি নিত্যগোপাল, তোমার ভড়াজড় সমন্বয়ের বার্ত্তা দিয়া মানুষকে নূতন জীবনের পথ চিনাইয়া দাও।...

বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে ২৪শে মে ১৯১৬ বিকেলে সভা হয়।

শ্রীনিত্যগোপালের শেষ বাণীর সঙ্গে বুদ্ধদেবের জীবনবাণী মেলে। এই শেষ বাণীর মধ্যে ঈশ্বরের কথা কোথাও নাই—শোনায় যেন কয়েকটা নীতিকথা। বুদ্ধদেবেও ঈশ্বরের উল্লেখ পাবে না।···একজন মানুষ মানুষের দুঃখ দূর করবার জন্য পাগল হলেন, মুক্তি দেব বলেন নাই··· ডাক দিলেন ধনীকে, ডাক দিলেন দরিদ্রকে, ডাক দিলেন কুলহীনকে···মানুষের দুঃখ দূর করব...। বেদান্তে তো বুদ্ধের স্থান নেই—তাকে নেবেন কি করে?··· পাষণ্ড যাকে বলছেন, সেই বুদ্ধকে নেবেন কি করে?···

ক্রমশঃ

কন্নড শৈব সাহিত্য

॥ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ॥

অনাধুনিক কন্নড সাহিত্যকে সাধারণত যে তিনটি যুগে ভাগ করা হয় তাহার প্রথম যুগের আরম্ভ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কন্নড সাহিত্যের তিনশত বৎসর জৈন সাহিত্যের যুগ বলিয়া পরিচিত। তামিল ছাড়া অন্য কোনো প্রাদেশিক ভাষার প্রাচীন সাহিত্য জৈনধর্মের দ্বারা এত বেশী প্রভাবিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। কন্নড সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ "ত্রি-রত্ন" পম্প-পোন্ন-রন্ন ইহারা তিনজনেই জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন।

নবম শতাব্দীর পূর্বেই তামিলনাড়ে জৈনধর্ম শক্তিহীন হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু কর্ণাটকে তখনও তাহার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। ধীরে ধীরে দক্ষিণের ভক্তিধর্ম উত্তরাভিমুখে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। একাদশ শতকের একেবারে শেষভাগে (১০৯৮ খ্রীষ্টাব্দে) তামিলনাড়ের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য রঙ্গনাথ-সেবক রামানুজের কর্ণাটকে আগমন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কর্ণাটকের তৎকালীন রাজধানী দেবসমুদ্রে (বর্তমান হালেবীড) উপস্থিত হইয়া রামানুজ হোয়সংক বংশীয় জৈনধর্মাবলম্বী নরপতি বল্লাল-রাজকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার নতুন নামকরণ করিলেন বিষ্ণুবর্ধন।

এই গেল বৈষ্ণবধর্মের কথা। শৈবভক্তিও তামিলনাড়ে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে নাই। রামানুজের ন্যায় কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ শৈবাচার্যের উত্তরাভিযানের কথা জানা যায় না বটে, কিন্তু শৈবধর্ম যে রাজানুকূল্যে উত্তরাঞ্চলে বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষিণের পল্লবরাজবংশ এবং পাণ্ড্যরাজবংশ বৌদ্ধ-জৈনদের প্রভাবে আসিলেও চোলরাজবংশ বরাবরই তাহাদের পরম্পরাগত শৈবধর্মে অবিচলিত ছিল। তামিলনাড়ের যে ৬৩ জন শিবভক্ত নায়নমার্-রূপে পরিচিত, তাঁহাদের জীবৎ-কালের শেষ সীমারেখা নবম শতাব্দী। সুতরাং দশম শতাব্দীর শেষভাগে (৯৮৫ খৃষ্টাব্দে) রাজরাজ চোল যখন কর্ণাটকের একাংশ অধিকার করিয়া লইলেন, তখন যে রাজধর্ম শৈবধর্মের সহিত নায়নমার্ ভক্তবৃন্দের আশ্চর্য জীবন-কাহিনী অধিকৃত অঞ্চলে প্রচারলাভ করিবে ইহাই স্বাভাবিক। রাজরাজ চোলের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ ১ম রাজেন্দ্র চোলের রাজ্যকালে (১০১৮—১০৪৩) শৈবধর্মের প্রচার আরও কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করিয়া থাকিবে। ইহারই ঠিক একশত বৎসর পরে আবির্ভূত হন কর্ণাটকে বীর শৈব ধর্ম সম্প্রদায়ের অদ্বিতীয় ধর্মগুরু বসবন্ন, বা বসবেশ্বর বা বসব।

বসবেশ্বরই বীরশৈব সম্প্রদায়ের প্রথম পুরুষ কিনা এ সম্পর্কে একটা দ্বিমত আছে। কেহ কেহ মনে করেন, এই সাধক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অনেক কাল পূর্ব হইতেই ছিল, বসবন্ নতুন করিয়া তাহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত করিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে শ্রীচৈতন্যের যে স্থান, কর্ণাটকের বীরশৈব সাধনায় বসবন্নও সেই স্থানের অধিকারী।

ভক্তি-মার্গের ব্যাপক প্রচারণায় বসবের একটি বিশেষ সুবিধা ছিল এই যে, তিনি কেবল ভক্ত পুরুষই ছিলেন না, ব্যবহারিক জীবনেও ছিল তাঁহার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। চালুক্যদের সেনাপতি কল্লচুরিবংশীয় বিজ্জল চালুক্যরাজ্য অধিকার করিয়া বসিলে (১১৫৬ খৃষ্টাব্দে), তাঁহার প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতিরূপে নিযুক্ত হইলেন বসবন্। একাধারে তিনি সন্ত, ও রাজনীতিজ্ঞ, সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারক, উচ্চদরের কবি, বীরশৈব আন্দোলনের পুরোধা, শাসক ও সেনাপতি, তিনি যে অত্যন্ত প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ নাই।

বসবনের ভক্তি-আন্দোলন ব্যাপক রূপ ধারণ করে

রাজধানী কল্যাণ-নগরে "শিবানুভব মণ্টপ (মণ্ডপ)" প্রতিষ্ঠার পর হইতে। বাংলাদেশে একদিন যেমন শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করিয়া নবদ্বীপ শহরের শ্রীবাসের গৃহে ভক্তি-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তেমনি দ্বাদশ শতকের কর্ণাটকে ভক্তি-সাধনার সূচনা হইয়াছিল ঐ শিবানুভব মণ্ডপে। শতশত ভক্ত সেখানে সমবেত হইতেন—তাঁহাদের মধ্যমণি বসবন্। বসবন্ সেজন্যই পুরুষ হইলেও কিছু কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধাভাজন ভক্তেরও সেখানে পদার্পণ হইত। গৌরাঙ্গের কীর্তন-মণ্ডলীতে যেমন থাকিতেন প্রবীণ ভক্ত অদ্বৈত প্রভু, বসবের শিবানুভব-মণ্ডপেও তেমনি আসিতেন সে যুগের বিশেষ তপস্বী পুরুষ অল্লম প্রভু। বসব, তাঁহার ভাগিনেয় চেন্ন (সুন্দর) বসব এবং অল্লম প্রভু—শৈব সম্প্রদায়ে এই তিনজন "শিবশরণত্রিমূর্তি" নামে পরিচিত। ইঁহাদের মধ্যে বসব ছিলেন ভক্তির প্রতিমূর্তি, চেন্ন বসব জ্ঞানের এবং অল্লম প্রভু বৈরাগ্যের। এই 'ত্রিমূর্তি' ব্যতীত কর্ণাটকের 'পণ্ডিতত্রয়' এবং 'আচার্যপঞ্চক'-এর কথাও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। ইঁহাদের অনেকেই ছিলেন বসবনের অগ্রজ সম-সাময়িক। মরুল (বা শিবলেঙ্ক), শ্রীপতি পণ্ডিত এবং মল্লিকার্জুন পণ্ডিতারাধ্য—ইঁহারাই হইলেন পণ্ডিতত্রয়। আচার্য পঞ্চকের তালিকায় আছেন রেবুকাচার্য (বা রেবণসিদ্ধ), মরুলসিদ্ধ, মল্লিকার্জুন পণ্ডিতারাধ্য, একোরামি এবং বিশ্বেশ্বরাচার্য। লক্ষ্য করিবার বিষয় মল্লিকার্জুন পণ্ডিতারাধ্য পণ্ডিত এবং আচার্য উভয় তালিকায় স্থান পাইয়াছেন। ইনিই অন্ধ্র-দেশে বীরশৈবাচারের প্রথম প্রচারক এবং তেলেগু শৈবসাহিত্যের জনকরূপে সম্মানিত।

কর্ণাটকের শৈব সম্প্রদায় তামিল শৈব সাধনার নিকট বিশেষ ঋণী ছিল সন্দেহ নাই এবং তামিলনাডের ৬৩ জন নায়নমার 'পুরাতন' বলিয়া কর্ণাটকী শৈবদের নিকট সর্বদাই শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিতেন। কিন্তু দুয়েকটি বিষয়ে বসবন্ প্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। সমাজ পুনর্গঠনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বসবন্ যে সংস্কার কার্যে ব্রতী হইলেন তাহার কয়েকটি সিদ্ধান্ত এইরূপ :—

(১) বর্ণাশ্রম ধর্মের পূর্ণ বিরোধিতা এবং জাতিভেদ বর্জন।

(২) বেদ ও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বে অনাস্থা

(৩) মূর্তিপূজা অস্বীকার

(৪) ব্রাহ্মণের পক্ষে যজ্ঞোপবীত ধারণের অনাবশ্যকতা

(৫) সাত্ত্বিক নিরামিষ ভোজনের আবশ্যকতা

(৬) শিবলিঙ্গ ধারণের অপরিহার্যতা

বিজয়াপুরের ব্রাহ্মণ-সন্তান বসবনের পক্ষে উল্লিখিত সংস্কার সমূহের কয়েকটী বিশেষ দুঃসাহসের পরিচায়ক বলা যায়। কিন্তু বেদব্রাহ্মণ সম্পর্কে বসবন্-প্রবর্তিত সংস্কার সকলের পক্ষে মানিয়া লওয়া সম্ভব হইল না। সেই কারণেই বোধকরি বীর শৈবদের মধ্য হইতে মল্লিকার্জুন পণ্ডিতারাধ্যের নেতৃত্বে 'আরাধ্য শৈব' বলিয়া বেদ-ব্রাহ্মণে আস্থাশীল একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। প্রধানত অন্ধ্রদেশেই এই সম্প্রদায়ের ব্যাপক প্রচার হয়। বসবের অনুগামীদল যথার্থ বীরত্বের সঙ্গে শৈবধর্ম প্রচারে ব্রতী হইয়াছিল বলিয়া ইহারা 'বীর শৈব' নামে পরিচিত।১ গলায় সর্বদা শিবলিঙ্গ ঝুলাইয়া রাখা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া এই সম্প্রদায় 'লিঙ্গবন্ত' বা 'লিঙ্গায়ৎ' বলিয়াও অভিহিত হয়।

দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় সাহিত্য রচনায় বিশেষ তৎপর হইয়া উঠে। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই ধারা চলিলেও ষোড়শ-ষোড়শ শতকে আর একটি সাহিত্য-ধারা প্রবল হইয়া উঠে—তাহা কন্নড় বৈষ্ণব সাহিত্য। তখন হইতে প্রাচীন কন্নড় সাহিত্যের তৃতীয় যুগের সূচনা। শৈব সাহিত্যের সমৃদ্ধির যুগে ব্রাহ্মণ হইতে হরিজন এবং বসবনের স্ত্রী-কন্যা হইতে সামান্যা রমণী নানা স্তরের নরনারীকেই আমরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখিতে পাই। ইঁহারা সকলেই উচ্চাঙ্গের কবি নন, কিন্তু প্রবল ধর্মোদ্দীপনার ফলে সাহিত্যে যে একটা বিশেষ ভাবাবেগ দেখা দিয়াছিল, ছোট বড় কবিদের অজস্র রচনা তাহারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

---

1. ...Statwart Saivas worshipping Siva alone. Farquhar—An outline of the religious literature of India P. 261

সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হয় "বচন সাহিত্যে"র কথা। কেবল শৈব সাহিত্যের নয়, সমগ্র কন্নড় সাহিত্যের ইহা একটি গৌরবময় শাখা। "বচন" কথাটির প্রকৃত অর্থ হইল গদ্য-রীতি। বসবন্ এবং তাঁহার সমকালীন অন্যান্য শৈব কবিগণ সাহিত্যের পূর্বতন পদ্য রূপ পরিত্যাগ করিয়া গদ্যকেই তাঁহাদের ধর্ম-প্রচারের উপযুক্ত বাহনরূপে বাছিয়া লইলেন। জনসাধারণের বোধগম্য সরল ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য সমবায়ে গঠিত এক একটি নাতিদীর্ঘ অনুচ্ছেদই হইল বচনসাহিত্যের ভিত্তি। একই কবির রচিত পর পর অনুচ্ছেদগুলিতে ভাবের অনুবৃত্তি যে থাকিবেই এমন নয়। মোটকথা প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদ স্বয়ং-সম্পূর্ণ। এইগুলি আকারে ছোট; কোনোটি কয়েকটি শব্দের সমষ্টিমাত্র, আবার কোনো কোনো বচন দুই পৃষ্ঠাব্যাপীও হইতে পারে। তবে সেইরূপ দীর্ঘ বচন সংখ্যায় খুবই কম। সংক্ষিপ্ততা বচন সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। গদ্যে রচিত হইলেও বচন সাহিত্যে ছন্দের বিশেষ প্রবাহ নষ্ট এবং অনুপ্রাসও দুর্লক্ষ্য নয়। মূল রচনাগুলি গদ্যের রীতিতে লিখিত হইলেও আধুনিক সংকলন গ্রন্থে কোথাও কোথাও সেগুলি পদ্যের ভঙ্গিতে সাজানো হইয়া থাকে। (এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' ও 'পুনশ্চ'র কথা স্মরণীয়।) এই বচনশাস্ত্রগুলি শিবভক্তদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় এবং আধুনিককালেও ইহার প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয় নাই।

ভক্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও সাহিত্যিক দৃষ্টিতেও এই বচন-কবিতাগুলি কন্নড় সাহিত্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাষার ক্ষেত্রে ইহা এক বিপ্লব সৃষ্টি করে। পূর্বে যেখানে সাহিত্যের ভাষা ছিল জনসাধারণের দুর্বোধ্য সংস্কৃত-নিষ্ঠ কন্নড়, সেখানে সেই প্রাচীন রীতি লঙ্ঘন করিয়া বচনকার কবিরা খুবই সাহসের সঙ্গে নিরক্ষর লোকেও বুঝিতে পারে এমন কথ্যভাষায় বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। কন্নড় যাহাদের মাতৃভাষা, তাহাদের কাছে এই বচন কবিতাগুলি যে কিরূপ আদরের বস্তু, তাহা বোঝা যাইবে নিম্নলিখিত অংশ হইতে—"কন্নড় সাহিত্যে বিচরণ করিতে করিতে আমরা যখন বচন সাহিত্যরূপী তপোবনে প্রবেশ করি, তখন এমন দিব্য আনন্দের অনুভূতি জন্মে যে, মনে হয় যেন আমরা সিদ্ধ সাধক মুনিঋষিদের সাক্ষাৎ লাভ করিলাম, যেন তাঁহাদের উদার জীবন এবং ধার্মিক উপদেশে আমাদের অন্তর নির্মল হইল, যেন আত্মার বন্ধন খসিয়া গিয়া আমরা মুক্তাবস্থায় উত্তীর্ণ হইলাম। এখানে নাগরিক জীবনের কোলাহল নাই, রাজ-সভার ঐশ্বর্য নাই। এখানে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে তপোবনের সহজ শান্তি, প্রেম ও সাম্য। সত্য জিজ্ঞাসা যেন সাহিত্যের রূপ ধরিয়া আমাদিগকে আনন্দ দান করিল। বচন সাহিত্যকে বলা যায় তপোবনের উপনিষৎ সাহিত্য; আর বচনকার কবিদের বলা যায় উপনিষদের মহর্ষি। এখানে জাতি লিঙ্গ বর্ণ ভেদের আভাস নাই, অধিকারী-অনধিকারী ভেদ নাই, বেদ বড় না আগম বড় এই তর্কও এখানে অনুপস্থিত। (এম্, আর, শ্রীনিবাস-মূর্তির "বচন ধর্মসার" পৃঃ ১)

কন্নড় সাহিত্যের ইতিহাসে বচনকার কবিদের সংখ্যা ২১০ বলিয়া ধরা হইয়াছে এবং তাঁহাদের মধ্যে ২৮ জন মহিলা। আমরা কেবল ৬ জন পুরুষ এবং ১ জন মহিলা এই ৭ জন কবির রচনা হইতেই বচনসাহিত্যের বস্তু, রূপ ও মাধুর্য বুঝিবার চেষ্টা করিব। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের নির্বাচিত সকল কবিরই আবির্ভাবকাল দ্বাদশ শতাব্দী।

বচনসাহিত্য প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। বাঙালি বৈষ্ণব কবির পদের শেষে যেমন ভনিতা থাকে, এবং সেই ভনিতা হইতেই কোন্ পদটি কাহার রচনা চিনিয়া লইতে পারি, সেইরূপ কন্নড়িগ বচন-কবিদের প্রতিটি বচনের শেষে 'অঙ্কিত' থাকে। কিন্তু তাহা সাধারণত কবির নিজের নামের নয়, তাঁহার আরাধ্য দেবতার নামের 'অঙ্কিত'। ঐরূপ নামাঙ্কিত পদের সাহায্যেই পাঠক উক্তিটি কবির নামটি জানিয়া লইতে পারেন। অবশ্য সেই সঙ্গে কোন্ কবির কী 'অঙ্কিত' তাহাও জানা চাই। যেমন বসবনের 'অঙ্কিত' কূডল-সঙ্গমদেব, চেন্নবসবের 'অঙ্কিত' কূডল চেন্নসঙ্গমদেব; অল্লমপ্রভুর 'অঙ্কিত' গুহেশ্বর; সিদ্ধরামের 'অঙ্কিত'

কপিলসিদ্ধ মল্লিকার্জুন; মহিলা-ভক্তকবি মহাদেবিয়ক্ক-র 'অক্কিত' চেন্ন মল্লিকার্জুন; শিবলেঙ্কর 'অক্কিত' উপাস্য মূর্তি মল্লিকার্জুনসিদ্ধ; এবং মল্লিকার্জুন পণ্ডিতারাধ্যের 'অক্কিত' অমরগুণ্ড মল্লিকার্জুন। 'অক্কিত' বিভিন্ন হইলেও সকলেরই উদ্দিষ্ট দেবতা শিব—বিভিন্ন স্থানীয় নামে তিনি চিহ্নিত হইয়াছেন এই যা।

ষটস্থল বচন, শিখারত্ন বচন, কালজ্ঞান বচন এবং নয়নোপ্য—বসবের নামে প্রচলিত এই চারিখানি গ্রন্থের মধ্যে 'ষটস্থলবচন'—প্রসঙ্গে একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। কেবল বসব নয়, অন্য কোনো কোনো বচন-কারও ষটস্থল সম্পর্কে বচন লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার কারণ বীর শৈবমতের ভক্তিমার্গকে বলা হয় ষটস্থল সিদ্ধান্ত। সাধকের সাধনাবস্থার ছয়টি বিভাগ এবং এই ছয়টি বিভাগ বা ষটস্থলের স্বতন্ত্র নাম রহিয়াছে—ভক্তস্থল, মহেশ্বরস্থল, প্রসাদিস্থল, প্রাণলিঙ্গস্থল, শরণস্থল এবং ঐক্যস্থল। এই ষটস্থল সাধকের ভক্তিসাধনার পথে যেন ছয়খানি সিঁড়ি। সাধক যখন যেস্থলে অবস্থান করিবেন, তাঁহার ভক্তিসাধনাও তদনুরূপ বিকাশ লাভ করিবে। সুতরাং ষটস্থলের অনুরূপ ষড়ভক্তির কথাও রহিয়াছে—সদ্ভক্তি, নিষ্ঠাভক্তি, অবধানভক্তি, অনুভব ভক্তি, আনন্দ-ভক্তি এবং সমরসভক্তি।

বসবের একটি বচনে দেখা যায় প্রচলিত মূর্তিপূজা, তীর্থাটন প্রভৃতির তীব্র বিরোধিতা। কবি বলিয়াছেন; পাথরের দেবতা দেবতা নয়, মাটির দেবতা দেবতা নয়, কাঠের দেবতা দেবতা নয়, পঞ্চধাতু নির্মিত দেবতাও দেবতা নয়। সেতুবন্ধ, রামেশ্বর, গোকর্ণ, কাশী, কেদার প্রভৃতি আটষট্টি কোটি পুণ্যতীর্থে অবস্থিত (২) দেবতারাও দেবতা নয় ইত্যাদি। বেদ-বিহিত পূজা উপাসনা ওঁকার ধ্বনির পরিবর্তে ভক্তিই যে মানবজীবনের পরম পাথেয় সেই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে: আমাদের আরাধ্য দেবতা নাদপ্রিয় নন, বেদপ্রিয় নন, তিনি কেবল ভক্তিপ্রিয়। (৩)

ক্রমশঃ

পুস্তক পরিচয়

বিগত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'Religion and Realisation' বলে একটী বইএর সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। উহারই বাংলা সংস্করণ 'ধর্ম ও অনুভূতি' নামেও একটী বই প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাড়াতাড়ীতে আমাদের একটী ভুল হইয়াছে। 'ধর্ম ও অনুভূতি' বইটীর প্রকাশক প্রভৃতি কয়েকটী সংবাদ লেখা হয় নাই। এজন্য আমরা দুঃখিত ও লজ্জিত।

যাহাহউক, 'ধর্ম ও অনুভূতি' প্রকাশ করিয়াছেন জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য, তিন টাকা। গ্রন্থটি রচয়িতার প্রত্যক্ষ অনুভূতির প্রকাশ। তাই পরিচিত কথাকেও ইহা মানুষের নিকট নূতনভাবে উপস্থিত করিয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি গ্রন্থটি উৎসুক পাঠককে আনন্দ দিবে।

---

(২) কাশীবেকু দেবরূ; মন্ত্রবেকু দেবরূ; মরবেকু দেবরূ; পঞ্চলোহদলি ধাতু বেকু দেবরূ; সেতুরামেশ্বর গোকর্ণ কাশী কেদার মোদলাদ অট্টাবট্টি কোटि পুণ্যতীর্थদলু পুণ্যক্षेत्रगलल्लि इरु देवरू देवरूग इत्यादि।

—কর্ণাটক কবি চরিতে (১ম খণ্ড) বসব ৩৭৭

(৩) নাদপ্রিয নল্ল, বেদপ্রিয় নল্ল, ভক্তিপ্রিয়নয় কূडलसङ्गमदेव—বচনবৈভবদ বসব ৫০।

শাক্ত পদাবলী

॥ শ্রীপ্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

শাক্ত ধর্মচেতনা ও দর্শনকে ভিত্তি করিয়া যে এক-শ্রেণীর শক্তি বিষয়ক পদাবলী অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে প্রচলিত হয় তাহার নাম শাক্ত পদাবলী। চণ্ডী হইলেন শাক্তের আধার। এই চণ্ডীর অনেক নাম—দুর্গা, কালী, অন্নদা, উমা ইত্যাদি। মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে দেখা যায় দেবী দুর্গা বা চণ্ডীকে লইয়া চণ্ডীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি বিভিন্ন মঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর মঙ্গল কাব্যগুলির ধারা অবলুপ্ত হইবার পর অথবা প্রায় লুপ্ত হইতেছে এমন অবস্থায় ঐ সমস্ত কাহিনী লইয়া খণ্ড খণ্ড কবিতা লিখিবার প্রচলন দেখা গেল। এইভাবেই শাক্ত পদাবলীর উদ্ভব।

বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচিত পদগুলির নাম যেমন বৈষ্ণব পদাবলী, সেইরূপ শক্তি বিষয়ক পদগুলির নামকরণ করা হইয়াছে শাক্ত পদাবলী। বৈষ্ণব পদকর্তারা যেমন রাধাকৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া পদ রচনা করিয়াছেন, তেমনি শাক্ত পদকর্তৃগণ দেবী দুর্গা ও কালীকে লইয়া শাক্ত পদাবলী সৃষ্টি করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে শাক্তধর্ম এবং বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে খানিকটা পার্থক্য থাকিলেও ভক্তি ভাবই দুই ধর্মের মূল কথা। শাক্ত এবং বৈষ্ণব পদাবলীতে এই ভক্তি ভাবেরই বিচিত্র প্রকাশ দেখিতে পাই।

শাক্ত পদাবলীর মধ্য দিয়া শাক্ত ধর্মচেতনা ও দর্শনের প্রকাশ ঘটিলেও সেই সমস্ত তত্ত্ব কথাগুলি এমন সরলভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, তত্ত্বকথাগুলি গৌণ হইয়া রহিয়াছে, সঙ্গীতের রসই মুখ্যস্থান অধিকার করিয়াছে। বাংলা দেশের কবিদের বৈশিষ্ট্যই এই, যে-কোন গুরুগম্ভীর ভাব ও নীরস তত্ত্বকথাকে সরল ও সহজ রূপ দান করা। তাই দেবী কালীর ভীষণতার অন্তরালে যে স্নেহময়ী মাতৃরূপটি আছে সাধক কবিরা তাহাকেই কাব্যের উপাদান স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। পদাবলীর কবিগণ বুঝিয়াছেন ভক্তির দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়। চণ্ডী বা কালীর বিবিধ রূপ—একটি তাঁহার ভীষণতার দিক, সংহারের দিক; অপরটি তাঁহার জগজ্জননী রূপ, সৃষ্টি ও পালনের দিক। ভীষণতা মানুষের মনে ভয় জাগাইয়া তোলে কিন্তু দেবতার জননীরূপটি মানুষের মনে ভক্তি ভাবের উদ্রেক করে। তাই শাক্ত পদাবলীতে দেখা যায় দেবতার মাতৃত্বময় স্নেহময়ী রূপটিই কাব্যের আকারে প্রকাশ করা হইয়াছে।

সাধক কবিগণ চণ্ডীকে দুই ভাবে দেখিয়াছেন। কখনও তিনি কন্যারূপিণী উমা, কখনও তিনি মাতৃরূপিণী কালিকা। চণ্ডীর এই বিবিধ মূর্তি লইয়া দুই ধারায় শাক্ত পদাবলী রচিত হইয়াছে—কন্যারূপিণী উমার কাহিনী লইয়া 'আগমনী বিজয়া গান' এবং মাতৃরূপিণী কালিকা লইয়া 'শ্যামাসঙ্গীত'। আগমনী গানের মধ্যে ঘরোয়া ভাবের স্পর্শ আছে। বাৎসল্য রসই এই সঙ্গীতের প্রধান অবলম্বন। বাংলা দেশের মায়েরা তাঁহাদের মেয়েকে স্বামীগৃহে পাঠাইয়া যে বেদনা বোধ করেন, যে সুখ-দুঃখের বিচিত্র ভাবে আপ্লুত হন, আগমনী বিজয়া গানের মধ্যে তাহারই স্বতঃ উৎসারিত প্রকাশ। বাংলা দেশের সমাজে কন্যাকে শিশু বয়সেই বিবাহ দিবার প্রথা ছিল। এই শিশুকন্যাকে পরের ঘরে পাঠাইয়া মা কেবলই উদ্বেগ ও আশঙ্কায় দিন যাপন করিতেন। কন্যা কবে পিত্রালয়ে আসিবে তাহারই আশায় প্রতীক্ষায় দিন গুণিতেন। কন্যা পিত্রালয়ে আসিলে মায়ের আনন্দের অবধি থাকিত না। মেয়েকে পুনরায় নিজের কাছে পাইয়া মায়ের অবরুদ্ধ অশ্রু-নির্ঝর উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। দিন কয়েক পিত্রালয়ে কাটাইয়া কন্যা আবার জননীকে কাঁদাইয়া স্বামীগৃহে যাইত। এই আসা-যাওয়ার মধ্য দিয়া মা এবং মেয়ের মধ্যে যে সুখ দুঃখের মর্মবাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিত তাহারই প্রতিধ্বনি আগমনী বিজয়া গানের মধ্য দিয়া

শুনিতে পাই। এই সম্পর্কে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের উক্তিটি সুন্দর—"আশ্বিন মাসের কয়া শিউলিফুলের মতো এই যে মাতৃ মিলন প্রত্যাশায় বালিকা-বধূদের চক্ষুজল দিন রাত্রি ঝরিত, এই সকল আগমনী গান সেই সকল অশ্রু-রচিত হার, উহা তৎকালিক বঙ্গজীবনের জীবন্ত বিচ্ছেদ রসে পুষ্ট।"

আগমনী বিজয়া গানের একটি করুণ কাহিনীর সূত্র আছে। উমা গিরিরাজ হিমালয় ও মেনকার আদরের কন্যা। ত্রিপুরারী শিবের নিকট কন্যাকে সমর্পণ করিয়া মা মেনকার মনে শান্তি নাই। শিবের অভাবের সংসারে কতো কষ্টে উমা দিন কাটাইতেছে তাহা কল্পনা করিয়া মেনকা আর ধৈর্য ধারণ করিতে পারেন না। জাগরণে মেয়ের কথাই তিনি চিন্তা করেন, নিদ্রায় তাহাকেই তিনি স্বপ্নে দেখেন। কন্যার বিচ্ছেদে তিনি আর থাকিতে না পারিয়া তাহাকে দিন কয়েকের জন্য আনিবার মনস্থ করিলেন।

মাকে ছাড়িয়া উমারও শান্তি নাই। বাপ মাকে একবার দেখিবার জন্য আকুল হইয়া স্বামীর নিকট মাত্র তিন দিনের জন্য পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি পাইল। উমা বাপের বাড়ী আসিল। মেনকা সংবাদ পাইয়া তাহাকে বরণ করিয়া আনিবার জন্য আত্মহারা হইয়া ছুটিলেন :

রাণী ভাসে প্রেমজলে, দ্রুতগতি চলে,
খসিল কুন্তল তার।
নিকটে দেখে যারে, শুধাইছে তারে,
গৌরী কতদূরে আর গো।
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ,
নিরখি বদন উমারে।
বলে, মা এলে, মা এলে, মা কি ভুলে ছিলে;
মা বলে একি কথা মা'র গো।
(রামপ্রসাদ)

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিনদিন পিতৃগৃহে কাটাইয়া উমা পুনরায় মাকে কাঁদাইয়া বিজয়া দশমীর দিন কৈলাসে স্বামীগৃহে যাত্রা করিল।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন শাক্ত পদাবলীর প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণা জেলার কুমারহট্ট গ্রামে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পৈতৃক অবস্থা সচ্ছল ছিল। বাল্যকালে উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা তিনি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর সংসার চালাইবার জন্য তিনি এক জমিদারের মুহুরীর কার্য গ্রহণ করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার প্রগাঢ় কালী-ভক্তির উদয় হয়। কথিত আছে, তিনি হিসাবের খাতায় 'আমায় দাও মা তহবিলদারী। আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী' এই বিখ্যাত পদটি রচনা করেন। তাঁহার মনিব এইরূপ ভক্তিরসাপ্লুত কবি-হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে মাসিক তিরিশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে গৃহে পাঠাইয়া দেন।

ভাবতন্ময়তা এবং আন্তরিকতা রামপ্রসাদী সঙ্গীতের প্রাণ। নিম্নের পদটি এই আন্তরিকতার গুণে মর্মস্পর্শী :

আজ শুভ নিশি, পোহাইল তোমার,
এই যে নন্দিনী আইল—বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখ শশী দেখ আসি ঘুচে যাবে দুঃখ রাশি
ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধারাশি করে।
শুনিয়া এ শুভ বাণী এলোচুলে ধায় রাণী
বসন না সম্বরে।

রামপ্রসাদী সঙ্গীতগুলি ভক্তিরসে সিক্ত। তিনি ছিলেন কালীর সাধক। কবি নিজের সাধনালব্ধ উপলব্ধি অতি সহজ কথায় প্রকাশ করিয়াছেন। দুঃখের কষ্টি পাথরে ভক্তির সোনা যাচাই করা যায়। দুঃখের সাধনাই চরম সাধনা। ইহার মধ্য দিয়াই সাধক কবি রামপ্রসাদ কালীকে পাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
দাও দুঃখ মা আর কত চাই।
শুনি সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে
আমি করি দুঃখের বড়াই।

কবি কালীকে পাইয়াও পান নাই। তাই তাঁহার শ্যামা সঙ্গীতে একটি অপ্রাপ্তি ও অতৃপ্তির সুর ধ্বনিত হইয়াছে, একটি অবিরত মা মা ক্রন্দন ধ্বনি তাঁহার শ্যামাবিষয়ক

পদগুলির ভাবকোশকে বেদনায় বিধুর করিয়া তুলিয়াছে।

মা আমায় ঘুরাবি কত।
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত॥
তবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত।

রামপ্রসাদ ছাড়া শাক্ত পদাবলীর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবি হইলেন কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, রাম বসু, দাশু রায়, এণ্টুনী ফিরিঙ্গি ইত্যাদি।

দুঃখময়

॥ শ্রীদিবাকর ঘোষ ॥

নিদারুণ শোক-তাপ-দারিদ্র্য-জ্বালায়
জর্জ্জরিত হোয়ে ভাবি কখনো কখনো—
বুঝি তুমি নাই, কিংবা বধির প্রজ্ঞায়
আছো আত্মমগ্নতায় লিনীভূত যেন।

প্রসারিত মননের সুদীর্ঘ বিস্তারে
খুঁজি তোমা প্রার্থনার তীব্র দীপ জেলে;
দুঃসহ এ-বেদনার একান্ত নিস্তারে
ডাকি তোমা সামগ্রিক ইচ্ছা শক্তি মেলে।

তথাপিও অপ্রত্যক্ষ অস্তিত্ব তোমার
অত্যাশ্চর্য ইন্দ্রজাল-কৌশলের বলে
ঘুচাতে পারে না হায় যন্ত্রনা আমার।
দুঃখ-অগ্নি নিত্যকাল অনির্বাণ জ্বলে।

ক্ষোভহীন চিত্তে তবু নৈতিক সান্ত্বনা—
দুঃখ মাঝে তব কৃপাভিক্ষার মাধ্যমে
তব পদে অর্পিয়াছি একাগ্র প্রার্থনা;
দুঃখময় রূপে এলে মম প্রাণাঙ্গনে।

চাহি না প্রত্যক্ষ তোমা নয়নসম্মুখে,
এসো প্রভু অনুভূতি স্মরণ-মননে;
দুঃখময়, যেন তীব্র দুর্বহ দুঃখে
স্মরি তোমা মুক্তি-ভিক্ষু জাগ্রত চেতনে।

বৃদ্ধাশ্রম (A Home In oldage)

সেবাব্রতী—শ্রীজিতেন গাঙ্গুলী

সমাজের বহুমুখীন সমস্যার মধ্যে একটি সমস্যা বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করছি। কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রে বহু সমস্যা সমাধানের ভার সে দেশের সরকারই গ্রহণ করে, কিন্তু আমাদের দেশের সরকারের যে গতি, তাতে করে যে এসব সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ আয়োজন করা হবে—তা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত, তাই নিয়ে অযথা গবেষণা করে লাভ নেই। আজ পৃথিবীর প্রগতিশীল কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রপুঞ্জ সমাজতান্ত্রিকতার পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করেছে। ব্যক্তির পরিবর্তে আজ দুনিয়ার সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় সমবেত সুখ স্বচ্ছন্দতার সঙ্কল্প নিয়ে মানুষ এগিয়ে চলেছে; তাই জাতিতে জাতিতে, মানুষে মানুষে হানা-হানি মারামারির স্থানে রব উঠেছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের, পরিণতিতে আসবে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, আসবে বিশ্ব-নাগরিত্ব। এটা কোন রঙীন কল্পনা নয়, ভবিষ্যতে আসবে সেই সমাজ, যেখানে প্রতিটি মানুষ নিজস্ব মূল্যে তার পরিচিতি পাবে, সাম্য ও প্রীতিবন্ধনে সমগ্র মানুষ একই পরিবারভুক্ত বলে মনে করবে।

এখন প্রশ্ন ইঙ্গিত সে সমাজ-ব্যবস্থা কবে আসবে? কতদিন লাগবে সে সামাজিক অবস্থান্তর ঘটতে? তা সঠিক ভাবে বলা সম্ভব নয়—কিন্তু সমস্যা যখনই রয়েছে—সমাধানের প্রচেষ্টা ব্যক্তিগতভাবেই হউক আর সমষ্টিগত ভাবেই হউক করে যেতে হবে। কথায় আছে লোকে "ঠেকে শেখে"; আমারও অন্ততঃ ২।৪ টী ঘটনা সামনে রেখেই এই সমস্যাটি মনের কোণে রেখাপাত করেছে। একদিন ছিল, যখন আমাদের দেশে একান্নভুক্ত পরিবারে যৌথব্যবস্থায় সংসার গড়ে উঠতো, পাশ্চাত্যের শিক্ষার প্রথম ধাক্কায় সে ব্যবস্থা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। আজ মাঝে মাঝে যে যৌথ পরিবার দেখা যায় তা একান্নভুক্ত পরিবারের জীর্ণ কঙ্কাল মাত্র। এখানে না আছে পূর্বের মত মানসিক প্রসারতা, না আছে প্রীতির বন্ধন, কেবলমাত্র বাইরের দৃষ্টিতে যৌথ পরিবারের ঠাট বজায় রাখার একটা প্রচেষ্টা মাত্র। বাস্তবকে অস্বীকার করে লাভ নেই, এ যান্ত্রিক যুগে সমাজ বিন্যাস পুরো পালটে গিয়েছে, মানুষ ছুটছে বস্তুতান্ত্রিকতার পিছনে, ভোগই যেন মানুষের একমাত্র কামনা—মন তাই বিক্ষিপ্ত, বহির্মুখিন। সে কেবলই ভাবে—ভোগেই আসবে পরম তৃপ্তি, চরম আনন্দ। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে পশ্চিমী দেশগুলো আমাদের দেশের তুলনায় অনেক এগিয়ে গিয়েছে ভোগ্য-বস্তু আহরণে, কিন্তু তারা কি সামাজিক জীবনে সুখী? এর উত্তর মিলবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং মার্কিন মুলুকের বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যা দিয়ে। সুতরাং একমাত্র ভোগ বা ভারতীয় চিন্তাধারায় "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" এই ত্যাগ কোনটাই সমাজ-জীবনে সুস্থতা আনয়ন করবে না, এই দুই-এর মাঝামাঝি সামঞ্জস্য আনতে পারে সুন্দর সহজ সমাজ-বিন্যাস। আমরা ত্যাগের দৃষ্টান্ত নিদর্শন হিসাবে ভারতীয় সমাজের ক্ষীয়মাণতা লক্ষ্য করেছি, একমাত্র ভোগের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার অগ্রগতিও আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করছি; কিন্তু দুইয়ের সমন্বয়ই হবে আগামী সমাজ-ব্যবস্থার সুষ্ঠু রূপান্তর।

আগেকার সমাজে পরিবারের বৃদ্ধ, অক্ষম প্রভৃতি লোকের ভার পরিবারের পাঁচজন বহন করতো। এটা তাদের কর্তব্য এবং ধর্মেরও অঙ্গ বলে বিবেচিত হতো। পিতৃসত্য রক্ষার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের বনে গমন, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমাদের ধর্ম-পুস্তকে পাওয়া যাবে; কিন্তু আজ সে "রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।" পাশ্চাত্যের অনুকরণে আজ সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, পূর্বেকার সামাজিক নিয়ম এখন

অচল; তাই অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সারা জীবন হাড়ভাঙা খাটুনী খেটেও বৃদ্ধাবস্থায় সংসারের কর্ত্তা পাঁচজনের করুণার পাত্র। আগেই বলেছি যে বর্ত্তমান যুগে পিতামাতা বা পরিবারের আশ্রিত গুরুজনদের প্রতি সন্তান সন্ততিদের আর তেমন ভক্তি বা নিষ্ঠা নেই। ধর্ম্মের যে অনুশাসন পূর্বেকার সমাজ-ব্যবস্থায় প্রচলিত ছিল, আজ কাল তা লোপ পেতে চলেছে। তাই সমাজের চারদিকে বৃদ্ধদের ভরণপোষণ একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া বর্ত্তমানে আর্থিক অনটন বা পারিবারিক সমস্যার অভাবে অনেক ক্ষেত্রে অনেক ছেলেমেয়ে অবিবাহিত জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। কর্ম্মময় জীবনে এদের সাধ্যমত পরিবারের পাঁচজনকে অর্থ সাহায্য করেন, অবসর-জীবনে রিক্ত হস্তে অন্যান্য সকলের উপর নির্ভরশীল হয়ে দুঃসহ জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই যে একরকম ফল প্রসব করবে তা নয়, এর ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। তবু আজকাল বৃদ্ধেরা সম্পূর্ণভাবে পরবর্ত্তীদের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। প্রগতিশীল অনেক দেশেই সেখানকার সরকার বৃদ্ধদের জন্য পেনসন বা বিভিন্ন নিবাস তৈরী করে তাদের ভরণপোষণ করার ব্যবস্থা করেছে; কিন্তু আমাদের দেশের সরকার তাদের কর্ত্তব্য হিসাবে শিক্ষা স্বাস্থ্য উপজীবিকা প্রভৃতি প্রাথমিক চাহিদাগুলো নিয়েই বিব্রত, বৃদ্ধদের নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তাদের এখনও আসেনি। ভবিষ্যতে তারা এ সমস্যার ভারও নেবেন। কিন্তু আমরাও সর্ব বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী, সরকারের উপর নির্ভরশীল। সকল সমস্যার দায়িত্ব সরকারের কাঁধে চাপিয়ে সকল অবস্থায় নিজেরা আত্মসন্তুষ্ট থাকতে চেষ্টা করি। কিন্তু পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে বৃদ্ধদের জন্য পেনসন বা নানারূপ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বেসরকারী প্রচেষ্টায় বহু প্রতিষ্ঠান এসব বৃদ্ধ, পঙ্গু বা দুঃস্থ বৃদ্ধদের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। আমাদের দেশে এ রকম প্রতিষ্ঠান আছে বলে জানি না; তবে এর অতীব প্রয়োজন যে রয়েছে সে বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। আজ বহুদিন যাবৎ এ নিয়ে চিন্তা করছি, সকলেই এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার মত নিঃস্বার্থ কর্ম্মীকে এগিয়ে আসতে দেখিনি।

কিছুদিন পূর্বে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে খুব অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা। বহুদিন পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তখন তিনি কলিকাতারই কোন এক অফিসের বড়বাবু, অবসরগ্রহণও করেছেন আজ প্রায় ২০ বছর। এর মধ্যে তাঁর চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। ভদ্রলোকের কয়েকটী ছেলেমেয়ে, সকলেই জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু আলাপে ভদ্রলোকের বর্ত্তমান জীবনের করুণ কাহিনী শুনে-খুবই অস্বস্তি বোধ করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তা আপনি অবসর গ্রহণ করার সময় যে ১৯।২০ হাজার টাকা পেয়েছিলেন—সে টাকাটা কি হলো? তিনি বললেন—অবসর গ্রহণ করার পর ছেলেদের টাকায় তো সংসার চলছিল না—তাই এই কয় বছরের ঘাটতি মেটাতে সে টাকাগুলো নিঃশেষ হয়ে গেছে; এখন রিক্ত। বৃদ্ধ বয়সে একটু দুধ একটু ভাল খাওয়ার প্রয়োজন—কিন্তু জোটাতে পারছি না! একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন—এখন পরপারের ডাক-এর অপেক্ষায় আছি। জিজ্ঞেস করলাম, তা আপনার ছেলেরা তো সকলেই রোজগার করছে? উত্তরে বললেন—"আগের যা গলা পায় না" জানতো?

এটা স্বাভাবিক যে মানুষের বয়স হলে, রুচি পালটে যায়—ভালমন্দ খাবার ইচ্ছে যায়, আমাদের চলতি কথায়ও বলে যে "ছেলে ও বুড়ো" সমান; সত্যিই শিশুদের মত বৃদ্ধদেরও খাবার-এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার, তাছাড়া এ সময় ছোট বড় অসুবিধাগুলো মনের উপর খুবই বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে, মেজাজ খিটখিটে হয়; এ সময় বহির্মুখিন মনটাকে আস্তে আস্তে অন্তর্মুখিন করতে পারলে খুবই আনন্দ পাওয়া যায়, তবে সেরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার। আমাদের দেশে সমাজ-ব্যবস্থা ধর্ম্মের অনুশাসনে গড়ে উঠেছিল, বাল্যে গুরুগৃহে বিদ্যা শিক্ষা, যৌবনে গার্হস্থ্যাশ্রম, পৌঢ় বয়সে বানপ্রস্থ অর্থাৎ সংসারের আবর্ত্তন থেকে মনটাকে আস্তে আস্তে গুটিয়ে নিয়ে অন্তর্মুখিন করা এবং মানুষের

জীবনের পরিণতির জন্য নিজেকে তৈরী করা—যাতে জীবন-সায়াহ্নে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস আশ্রমে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ হয়। আমাদের দেশে এই ছিল ধারা। যারা এ পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁরা সত্যদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। সমাজের পরিবর্তিত অবস্থায় আজ কি করতে হবে, কেমন করে ঐ ব্যবস্থার ভিতরের উদ্দেশ্যটুকু আজকের জীবনে কার্যকরী করা যায়, তা ভেবে দেখতে হবে।

কর্ম থেকে অবসরান্তে ব্যক্তি-স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দশের জন্য যে কর্মের অনুপ্রেরণা, তাই-ই আজকের বানপ্রস্থের অবস্থা এবং এই নিষ্কাম কর্মের ভিতর দিয়ে নিজেকে তৈরী করে এগিয়ে যেতে হবে। জীবনের প্রতিটী স্তরই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, কোনটাই একদমী নয়; প্রতিটী স্তরই পূর্ববর্তী স্তরের অভিব্যক্তি, সুতরাং মানুষের চরম লক্ষ্য সামনে রেখেই জীবন পথে প্রথম থেকেই চলতে হবে। আমাদের দেশের একটা চলিত কথাও আছে যে "পাঁজী দেখে সন্ন্যাসী হওয়া" সম্ভব নয়। এখন প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের অবস্থানুযায়ী সুযোগ সুবিধা থাকলেও তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের কোন সুযোগ সুবিধা আমাদের দেশের বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় নেই—তাই আজ ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যে এমন সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার যেখানে অবসর গ্রহণের পর মুক্ত থেকে নিঃস্বার্থভাবে দেশের ও দশের কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে উন্নততর স্তরে পৌঁছান যায় এবং বৃদ্ধ বয়সে সংসারের মধ্যে আটকে না থেকে অন্তর্মুখিন চিন্তায় জীবনের শেষ দিনগুলো আনন্দে কাটাবার সুব্যবস্থা করা যায়। যাদের সংসারে সুস্থ পরিবেশ রয়েছে, যেখানে শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ়, আমি সে সব লোকের কথা ভাবছি না। যারা উপেক্ষিত, অনাদৃত, অবহেলিত, বা পরিবারের বন্ধন যেখানে শিথিল বা নেই, সে সব লোক নিশ্চয়ই এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে আনন্দময় পরিবেশে তাদের জীবন কাটাবার সন্ধান করতে পারবেন।

কয়েক দিন আগে অফিসে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি সেজন পান, তাঁর ছেলেমেয়েরা কৃতবিদ্য এবং সংসারে প্রতিষ্ঠাবান। কিন্তু ভদ্রলোকের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিবারের পাঁচজনের মতের মিল না হওয়ায় খুবই একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। নূতন এবং পুরাতন চিন্তাধারার দ্বন্দ্ব সঙ্ঘর্ষ যদি না হতো, খুবই সুখের ছিল; কিন্তু ভদ্রলোক বনিবনা না হওয়ায় সংসার ছেড়ে বেরিয়ে এলেন; কিন্তু যাবেন কোথায়? আমাদের দেশে তো তেমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই। আমার অফিসের বন্ধুরা প্রায়ই তাঁকে বলতেন—সান্যালবাবু একটী বৃদ্ধদের জন্য আশ্রম করছেন। তিনি সরল বিশ্বাসে আমার হাত দুটো ধরে বলতেন—আমায় একটু স্থান দেবেন। তাঁর আকুতি দেখে বৃদ্ধদের জন্য যে একটী প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে, সে বিষয়ে প্রত্যয় আরও দৃঢ়তর হয়। আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যারা অকৃতদার, তারাও মাঝে মাঝে আমাকে কৌতুকভাবে বলেন যে "আমরা তো retire করে আপনার আশ্রমে স্থান নেবো"—তাঁরা কথাটা যে ভাবেই বলুন এর মধ্যে যে বৃদ্ধ বয়সের একটা অনিশ্চিতের সুর রয়েছে তা বেশ ধরা পড়ে। কয়েক মাস পূর্বে কলকাতার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসককে আমি আমার পরিকল্পনার কথা বলি। শুনেই তিনি বলেন যে তাঁর ঠিক এরকম একটী প্রতিষ্ঠানের কথা মনে রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে তাঁর কাছে যে সব মেয়েরা নার্সের কাজ করে, তারা কর্মজীবনে অনেকেই বেশ দু-পয়সা রোজগার করেন। আত্মীয় স্বজন পাঁচজনকে ভরণ-পোষণ করেন কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এসব মেয়েরা অবসর গ্রহণের পর রিক্ত হস্তে পরিবারের গলগ্রহ হয়ে নিদারুণ কষ্টে দিনাতিপাত করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত আমার সামনে ধরে তুললেন। তিনি বলেন, আমি যখন এই Nursing Home খুলি তখন একটী খিরিস্তি মহিলা তাঁর কাছে কাজ করতেন এবং বরাবরই তিনি অর্থ উপার্জন করে আত্মীয় স্বজনের জন্য ব্যয় করতেন, কারণ তিনি নিজে অবিবাহিতা। যখন বার্দ্ধক্যের চাপে তিনি কাজ করতে অক্ষম—আত্মীয় স্বজন

সকলেই তখন দূরে সরে গিয়েছে—সেই মহিলাটি তখন বিক্ত, নিঃসহায়। ডাক্তারবাবুকে তিনি ছেলের মত দেখতেন, তাই ডাক্তারবাবু তাকে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যারা সারাজীবন অবিবাহিত থেকে সংসারের পাঁচজনের জন্য সর্বস্ব দান করলেন, তাদের প্রয়োজনের দিনে আত্মীয় স্বজন দূরে সরে দাঁড়ানোর মত ট্রাজেডীর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ডাক্তারবাবু আমাকে খুবই উৎসাহ দিলেন এবং জার্মানীতে এরকম ২১ প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে গল্প করেন এবং এরকম প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

কয়েকদিন পূর্বে কলকাতার কোন একজন অগ্রগণ্য স্থানীয় দৈনিক কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে আমার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন যে, যদিও আংলো ইণ্ডিয়ান, ইউরোপীয়ানদের জন্য কলকাতায় এরূপ ২।৩টী প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখা যায় কিন্তু আমাদের দেশের ঐতিহ্য বজায় রেখে বৃদ্ধদের জন্য কোনরূপ প্রতিষ্ঠান নেই; সুতরাং যে-কোন লোকই যে এরূপ একটী প্রতিষ্ঠানকে স্বাগত জানাবে সে বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ নাই। তিনি সর্বতোভাবে তার সাহায্যের অঙ্গীকার করে আমাকে উৎসাহিত করলেন।

কিরূপে এরূপ একটী প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো যায় সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করবো। আমি দেশের সহৃদয়হৃদয়সম্পন্ন, নিঃস্বার্থ সমাজসেবী প্রতিষ্ঠা লোকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবো, কারণ এরূপ একটী প্রতিষ্ঠান গড়তে গেলে ধনবল ও জনবল উভয়েরই প্রয়োজন। যারা ব্যক্তিগত কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে যারা ব্যক্তি-স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে সেবাভাবে উদ্বুদ্ধ, তাঁরা এরূপ কাজে প্রচুর আনন্দ পাবেন বলে বিশ্বাস করি। কয়েকটী নিঃস্বার্থ কর্মীর যোগাযোগ পেলে এরূপ একটী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়।

এ রকম একটী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে প্রথমেই চাই একটু স্থান—খুব কম পক্ষে দেড় বিঘা জমি যাতে ৫০ জন আশ্রমিকের স্থান হতে পারে। এই জমিতে বাসস্থান, উপাসনার স্থান, লাইব্রেরী, শাকসব্জী ও ফুলের বাগান, গোশালা এ সব যেমন থাকবে, তেমনি একটী অবৈতনিক বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, সর্বসাধারণের ব্যবহার-যোগ্য খাবার স্থান প্রভৃতি জনহিতকর কার্যের জন্য ব্যবস্থাও থাকবে। এর জন্য প্রাথমিক ব্যয় পঞ্চাশ-হাজার টাকা তো বটেই। এ টাকা প্রথম অবস্থায় সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য হলেও উদ্দেশ্য যখন মহৎ, কেবলমাত্র কিছু-সংখ্যক কর্মী ও আশ্রমিক সঙ্ঘবদ্ধ হলে এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা নিশ্চয়ই সম্ভব বলে বিশ্বাস করি। প্রথমে দশজন লোক নিয়ে আরম্ভ করা যায়। এঁকে তো সোসাইটী এ্যাক্ট অনুযায়ী রেজিষ্ট্রারীও করতে হবে। প্রতি আশ্রমিক তার অবস্থানুযায়ী সামগ্রিক ব্যয় বাবদ মাসিক ৫০৲ থেকে ৭৫৲ টাকা ব্যয়ভার বহন করবেন অথবা এককালীন ৫ হাজার টাকা দিলে আজীবন ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকারী হবেন। মানুষের কাছ থেকে ছোট বড় এককালীন বা মাসিক দান সংগ্রহের জন্যও অগ্রসর হতে হবে। এ প্রতিষ্ঠান ব্যবসাভিত্তিক নয়, রাজনীতিও এর উপজীব্য থাকবে না। সকল মানুষের সেবায় মনোবৃত্তি ও প্রয়াস রেখে ত্যাগ, তিতিক্ষা, পারস্পরিক প্রীতি ও সহযোগিতার মধ্য দিয়ে উন্নততর জীবনবোধের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত কয়েকটী মানুষ যাতে শান্তি ও আনন্দ নিয়ে কর্মসাধনার মাধ্যমে জীবনের বাকি দিনগুলি কাটিয়ে দিতে পারে—এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য শুধু তাই-ই। এ প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত অর্থ এরই কল্যাণে ব্যয়িত হবে, ক্রমান্বয়ে শাখাপ্রশাখা বাড়ান যাবে। আমি দেশের সকল স্তরের মানুষের নিকট সকল রকম সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানাই।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫০—

(৯৯)

…সকালে ব্রহ্মসূত্র দেখি। মেদিনীপুরের বালগোবিন্দপুরের আশু রায় আসে। কংগ্রেসের বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যথিত হইয়া তাহারা একটি সংস্থা গড়িয়াছে গঠনমূলক কার্য্য করিবার জন্য। আমি তাহাকে মন্মথবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে বলি। কেননা তাঁহারা তো বড় করিয়াই এই কার্য্যে হাত দিতে চান। একযোগে কাজ করাই ভাল। আধ ঘণ্টার পর মন্মথবাবুর ওখানে যায়। রেণু আসে ১২টায়।…২টায় পর প্রেসে যায় রাধাচরণবাবুর প্রুফ নিয়া। ৩টার মধ্যে ফিরিয়া প্রবন্ধগুলির পৃষ্ঠা ঠিক করে। ৪টায় আফিসে যাই। কালিদাসবাবু 'কবির স্বপ্নে'র প্রুফ দেখে।…১৯১৯-২০তে লেখা ব্রহ্মসূত্র আজ পরিপূর্ণটি ছাপা হইতে চলিল। উহা আমার নয়, ঠাকুরের। আমার লিখিবার কর্তৃত্বও নাই। উহা আজ ঠাকুরের শক্তিতে ঠাকুরের সত্তা-চৈতন্য-আনন্দ গায়ে মাখিয়া প্রকাশিত হইবে, আমি উহার প্রকাশনের সামনে বারবার ধূলাবলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম জানাইতেছি। আমার ঘাড়ে ব্রহ্মসূত্র চাপিয়া বসিয়া ছিল, তাই উহা লেখা হইতে পারিয়াছে। ঠাকুরই ব্রহ্মসূত্র মূর্ত্তি। তাঁহার জয় হউক। ব্রহ্মসূত্র ঘরে ঘরে, জাতিতে জাতিতে, মানবে মানবে ছড়াইয়া পড়ুক, আমি যেন তাঁহার ধন্য হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি। ৯টার পর আশ্রমে ফিরি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ফিগ্রিফের ৩০ কপি দিয়া যায়।

৪ঠা জুলাই

সকালে ব্রহ্মসূত্র দেখি। ব্রহ্মসূত্রের বাণ্ডিল কিনিবার তাগিদের জন্য রেণু খুব ভোরে নীহারের কাছে যায় ও বলিয়া আসে, ওখান হইতে সুহৃৎবাবুর ওখানে প্রবন্ধের ঊন যায়। কাল রেণুর সামনে দেখিয়া দিবেন বলিলেন, রেণু খুব ভোরে যাইবে। সেখান হইতে রেণু এখানে আসে। ব্রহ্মসূত্রের পাণ্ডুলিপি নিয়া যায় ৪৩ পৃঃ পর্য্যন্ত। আবার ১২টার পর আসে। প্রেসের লোক ৯টায় আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। প্রেসে যাইয়া রেণু করিব স্বপ্নের অর্ডার দিয়া আসে। সেখান হইতে ফেরে ২টার মধ্যে। জয়া আসে ৩টার পর…। জয়াকে ট্রামে তুলিয়া দিয়া ৩।৩০টায় আফিসে যাই। সেখানে ইতিপূর্ব্বেই ধীরেনবাবু আসিয়া বসিয়া আছেন। রেণু প্রায় ১ ঘণ্টা গীতার ভাষ্য প্রণীত পাঠ করিল। ৮।৩০টার পর ধীরেনবাবু চলিয়া যান। পাঠ চলিতে থাকা কালীন প্রতিভা আসে। সে ৩টার গাড়ীতে রওয়ানা হইয়া আসিয়াছে প্রেস হইতে ব্রহ্মসূত্রের ২০ পৃষ্ঠার প্রুফ দিয়া যায় ও আষাঢ় মাসের চেক নিয়া যায়। ৯টার পর চলিয়া আসি। টেবিল ল্যাম্পটা বিগড়াইয়া যায়, নিতাব্রত ঠিক করিয়া দেয়। প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত প্রুফ দেখি। নীহার ১২টার পর রেণুকে ফোন করিয়াছিল…। জয়ার কাছে আজ অনেকক্ষণ আমাদের দর্শন বলি। সে কিছুটা বুঝিয়াছে। বুঝিবার ইচ্ছা তাহার আছে। আমার উপরে প্রাণখোলা বিশ্বাস ও শরণাগতিযোগে যুক্ত থাকিলে সব তত্ত্ব স্ফুরিত হইবেই।

৫ই জুলাই

সকালে ১১টার পর পর্য্যন্ত ব্রহ্মসূত্রের প্রথম কর্ম্মের প্রুফ দেখি। রেণু সকালে সুহৃৎবাবুর ওখানে যায়, পরে হাওড়া 'সুমাবেশে'র ওখানে যায়। সেখান হইতে ১২টার পর এখানে আসিয়া বাসায় চলিয়া যায়। সে ছানা সঙ্গে নিয়া বাহির হইয়াছিল। এখানে দিয়া যায়। প্রতিভা আসে ১টার পর। দুপুরে কিছুটা নিদ্রা যাই।

সকালের কাজে বেশ শ্রম হইয়াছিল। মন্মথবাবু সকালে ফোনে ডাকেন। আগামী ১৬ই মেদিনীপুর সভা হইবে, যাইতেই হইবে প্রথম একটা বাজা দিবার জন্ত। সাতকড়িপতিবাবুও হয়ত যাইতে পারেন। আমি ব্রহ্মসূত্রের ছাপা ও উজ্জলভারতের কথা বলিলাম। তিনি ছাড়িলেন না। রেণু দুপুরে আসে না। ৪।০টার পর গিয়া রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউটে ৯৲ টাকা দিয়া শ্রীরাজের চতুঃসূত্রী নিয়া আসে। আমরা ৬টার পর আফিসে যাই। প্রতিভা তখনই মঠে যায় চৈতন্তের সঙ্গে দেখা করিবার জন্ত, সে একদিন ডাকিয়াছিল। বাজা হইতে আমার জন্ত একটী টাপা ফুল কিনিয়া আনে, ঠাকুরের জন্ত ২টী। তিনটী ফুলের দাম ৵০ এক আনা। রেণু প্রেসে ধীরেনবাবুর কাছে ফোন করিয়া ব্রহ্মসূত্র ছাপাইবার জন্ত ডিমাই সাইজে কত 'এম্' হইবে, তাহা জানিয়া লয়। রেণু প্রুফ আমাকে শুনাইয়া সংশোধন করে। প্রথম বার যে প্রুফ প্রেস দিয়াছে, তাহা সন্তোষজনক। মালতীর নিকট চিঠি রেণু দেয়, আমি সেই ফুলুমের নিকট পেটেণ্ট ওষুধ কিনিয়া খাইবার জন্ত। ব্রহ্মসূত্র ছাপানোই যদি হয়, প্রচারিত হইবে কি করিয়া? যে জগদ্বিধানে ইহা লেখা হইয়াছে, ছাপা হইতে চলিল, সেই বিধানে পড়ার লোকও জুটিবে—ইহাই আমার ভরসা। যিনি লিখাইয়াছেন, তিনি যে না-ছাপাইয়া ছাড়িলেন না, তাহা তো চোখের সামনেই দেখিলাম, তবে পাঠকের জন্তই বা ভাবিব কেন? কোথা হইতে পড়িবার লোক তিনি জুটাইবেন, তিনি জানেন। রেণু প্রতিভা কুসুম নীলুরা যদি পড়িতে পারিত, তবে বুকটা জুড়াইত। কে কবে আসিবে, তাহার জন্ত প্রতীক্ষা অবশ্যই করিব, কিন্তু ইহাদের যে পড়া চাই-ই। আমার হৃদয়ের রস নিংড়াইয়া লেখা বইগুলি হৃদয়ে ধারণ করিলেই না হৃদয় আমার ঠাণ্ডা থাকে। প্রায় ১০টায় আমি ও প্রতিভা চলিয়া আসি।…

৬ই জুলাই

সকালে ব্রহ্মসূত্র revise করি। রেণু ১১টার পর আসিয়া ১৷০ ঘণ্টা থাকিয়া প্রেস, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে যায়। ৪।০টায় বাড়ীতে ফেরে, এখানে আসে না।…বৈকালে সন্তারত আসে। তাহার সঙ্গে তাহার বর্ত্তমান অবস্থা, আমার কাজকর্ম, দাদার কথা আলোচনা হয়। মনু যে ব্রহ্মসূত্র ছাপাইবার খরচ দিবে, তাহা বলিলাম। ব্রহ্মসূত্র বাহির হউক, ইহা তাহারও নিশ্চয় কাম্য হইত। আমি যে তাহাকে আজও জীবনের কাছাকাছি রাখিয়াছি, তাহাও বলিলাম। মেদিনীপুর যাওয়ার কথা, আমার বর্ত্তমান স্বাস্থ্যের কথা বলিলাম। আবার একটা নূতন আন্দোলন হয়ত আসিতেছে। সম্ভব হইলে তাহাতে নামিব …রেণু বলিতেছিল, সেই কোন্ অতীতে ব্রহ্মসূত্র লেখা; এই অবধূত-ভারতবাসী সেই যুগের সঙ্গে আমার একটী যোগসূত্র স্থাপিত হইল। লক্ষ লক্ষ মানুষ অতীতের সঙ্গে বিযুক্ত হইয়া নিজেদের জীবন চালাইতেছে। আজ অতীত ও বর্ত্তমান একসূত্রে গ্রথিত হইল।—আমার ইচ্ছা ইহারা আমার এই ভাষ্য-গুলি পড়িয়া আয়ত্ত করে, লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে ছড়াইয়া দেয়। কি গভীর ভাবেই না ইহা আমি কামনা করি। রাধাচরণবাবুর অভুতকার চিঠিতে…। আজ বৈকালের দিকেও ব্রহ্মসূত্র দেখি। ৯।০টার পর ফিরি। রাত্রিতে প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত ব্রহ্মসূত্র দেখি। মনে পড়িতেছে সেই ব্রহ্মসূত্র লিখিবার কালের খাটুনি। এখন চোখে কষ্ট হয়, নয়তো খাটিতে পারি বোধহয় আগের মত।…

৭ই জুলাই

সকালে কিছুকাল ব্রহ্মসূত্র রিভাইস করার পর মহিম হালদার ষ্ট্রীটে বীরুর খবর জানিবার জন্ত যাই।…রেণু কলিকাতা ঘুরিয়া ১২টার মধ্যে এখানে আসে, তখনও আমি ব্রহ্মসূত্র দেখিতেছিলাম, যমুনা আমার জন্ত প্রতিভা এখানে আর আসে নাই। প্রায় তিনটায় মন্মথ রায় আসেন। রিফিউজীদের নৈতিক বল পুনরুদ্ধারের জন্ত তাঁ রায়ের নির্দ্দেশে তিনি এক নাটক লিখিয়াছেন, তাহাই শুনাইবার জন্ত আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা

অমল হোম ফিরাইয়া দেন নাই বলিয়া আনিতে পারেন নাই। ইহার পটভূমিকা শ্রীকৃষ্ণের যদুবংশসহ ভরাসন্ধ আক্রমণের ভয়ে মথুরা হইতে 'উষান্ত' হইয়া দ্বারকায় যাওয়া। ইহার মধ্যে পাকিস্থানের প্রতি কোনও বিদ্বেষ না থাকে, চুক্তি ব্যর্থ করার কোন প্রচেষ্টা না থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নাটকটি ভাল হইলেও কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন ঐ পাকিস্থান বিদ্বেষ প্রচারিত হইবে এই ভয়ে। আমি ideaটীকে আরও constructive করার কথা বলিলাম। রেণু আষাঢ় মাসের সামরিকী 'চুক্তির পর' পড়িয়া শুনায়। থিকিউজী-দের 'যেন ধারা' শ্লোকটীর তাৎপর্য্য উপলব্ধি করাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। রেণু প্রণতির সঙ্গে দেখা করিয়া রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউটের প্রীতাঙ্ক ও সূত্র দিয়া আসে। আমি সন্ধ্যার প্রাক্কালে আফিসে যাই।...

৮ই জুলাই

সকালে ব্রহ্মসূত্র রিকাইস করি বেলা ১২টা পর্য্যন্ত। রেণু সুবোধ দে, রেণু গুহের ওখানে যায়, কাহাকেও পায় না। শেষে মন্থর ওখানে হইয়া আসে। বাগজ কেনা ও পাঠানো হইয়াছে বলিল। দাম ১০২৲ টাকা। রেণু ১টার পর আসে, ছানা লইয়া আসে।...ভগবানও তো এমনি করিয়াই আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের ব্যবস্থা করেন। সকলকে বঞ্চিত করিয়া বেশী চাহিলে বেশী দেন না। আর আমরা কাঁদি, যেমন শিশু কাঁদে। রেণু ব্রহ্মসূত্রের প্রুফ শুনাইয়া ও উপনিষদ্ মিলাইয়া দেখে। উপনিষদের লেখার সহিত পরিচয় হওয়া উচিত। পাতা উল্টাইয়া গেলেও অনেক খানি জানা হয়। গোকুল আসে...রেজাউল করীমের নিকট...চিঠি দেওয়া হয়।...

৯ই জুলাই

খুব সকালে মন্থর ওখানে যাই।...ব্রহ্মসূত্রের পাণ্ডুলিপি রিকাইস করি। প্রতিভা সকালে যাইয়া পোস্টাফিস হইয়া ১১টার মধ্যেই আসে। সে ব্রহ্মসূত্রের সংশোধিত ও কর্ত্তিত দ্বিতীয় অংশ পুনরায় লিখিয়া দেয়। রেণু সকালে কলিকাতা যায়, এখানে আসে ১টায়। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের প্রুফ দেখিয়া আবার শক্তি ঔষধালয়, মালঞ্চায় যায়। শক্তি ঔষধালয়ে দেখা হয় না। সেখান হইতে আফিসে ফেরে প্রায় ছয় টায়। আমি প্রতিভা ৪।০টায় আফিসে যাই। রেণু প্রিয়রঞ্জনবাবুর ওখানে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার final করিবার জন্য যায়। রেণু সকালে সুহৃৎবাবুর ওখানেও গিয়াছিল।...

১০ই জুলাই

সকালে ব্রহ্মসূত্র রিকাইস করি। এবারে আফিসে যাই। ছানা নিয়া আসি। আফিসে দেখার জন্য আসেন, একজন গ্রাহকের (শ্রাবণ হইতে) নাম দেন। পথে নরিশাল জেলার নবগ্রাম নিবাসী বিভেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দেখা। আমার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে তেতলা পর্য্যন্ত আসে...তিনটার পর শিশির আসে রথের সময় যাত্রীতা ও বাসুদেবপুর যাইবার জন্য। এদিকে এবারেও মেদিনীপুর যাওয়ার কথা আছে বলিয়া হইল না। কমলার সম্বন্ধে আলোচনা হয়।...'যা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' মন্ত্রটী ব্যাখ্যা করিয়া বলা হয়, ঘোড়া হইতে যুক্ত না হইলে কাজের মাঝখান হইতে কাহাকে নিলে তাহাকে দিয়া কাজ তেমন পাওয়া যাইবে না। কর্ম্মীর 'আমি' সব সময়েই বিচ্ছিন্ন থাকিতে চায়, অথচ এখানেই 'মামেকং শরণং ব্রজ' বাক্যের সার্থকতা সব চেয়ে বেশী। যুদ্ধক্ষেত্রেই 'শরণং ব্রজ' বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল—ইহা যেন সর্ব্বদা মনে জাগ্রত থাকে। ইহাতে তিসিদিনে রক্ষিত হয়। রেণু আজ আর এখানে আসে না। শিশিরসহ আমি ও প্রতিভা প্রায় ৬টায় আফিসে যাই, ইহার কিছু পূর্ব্বে রেণু আসে।...

১১ই জুলাই

সকালে সামরিকী 'বন-মহোৎসব' ও 'কোরিয়া যুদ্ধে ভারতবর্ষ' লিখি। ৮।০টার পর মন্মথবাবুর বাসায় যাই। শনিবার যাত্রাজ মেলে যাইতে হইবে। সোমবার

আসিবার কথা হইল। তাহার পর আসিয়া ব্রহ্মসূত্র রিকাইস করি। রেণু ছানা দিয়া কলিকাতা যায়। ·· বৃষ্টির মধ্যে গীতা, রাণী প্রভৃতিকে এখানে থাকিতে বলা হয়···আমি তো সব মানুষকে কাছে কাছেই রাখিতে চাহিয়াছি, কেহই তো কাছে রহিল না। আমার 'উদ্বোধন' ও আমার কাজ বাঁচাইয়া রাখিয়াই আমার যাহা কিছু করিতে হইবে। কেহ কোনও দিন আমার কাজের কথা কানে নাই। অথচ ইহা আমার 'কাজ'ই ছিল না। ইহা ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ, ভবিষ্যৎ বিশ্ব সংগঠনের কাজ। যাক্। রেণু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ন্যায়দর্শনের বাৎস্যায়ন ভাষ্য (বঙ্গানুবাদ কবিভূষণ তর্কবাগীশের) ও রামানুজ ভাষ্য এক বোঝা বই নিয়া আসে। আমার বেদনাও হয়। অথচ উপায় কি? সুবোধবাবু বলিয়াছেন 'কাল যদি কাগজে রেণুমিত্রের কোনও accident-এর খবর না পাই, বৈকালে দেখা করিতে যাইব'। অল্প অল্প বৃষ্টির মধ্যে আমি রেণুর ছাতিতে, রেণু-প্রতিভা প্রতিভার ছাতিতে আফিসে যাই। ৯টার পর ফিরি। রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত প্রুফ দেখি।

১২ই জুলাই

সকালে ব্রহ্মসূত্র রিকাইস করি। ইতিমধ্যে নগেন গুহ (ভাগিনেয়) আসে। তাহাকে অন্তঃশক্তির উপর নির্ভর করিয়া পথ কাটিয়া তাহার জীবনের দুর্যোগের মধ্য দিয়া বাহির হইতে বলি। অতীত কখনও মানুষকে আটকাইতে পারে না। যে-কোনও পথে, যে-কোনও স্থান হইতে, যে-কোনও অবস্থা হইতে মানুষ নূতন করিয়া যাত্রা করিতে পারে। বর্ত্তমানে যতটুকু সুযোগ তাহার পরিবারে আছে, সেই সুযোগটুকু সম্বল করিয়া সে যেন নৈতিক জীবন যাপন করিয়া আগাইয়া যায়। আমার নিকট টাকা দিলে তাহার নামে ব্যাঙ্কে জমা রাখিব—ইহাও বলিয়া দিলাম। কিছুই তো সে রাখে নাই। রেণু আজ আর বাহির হয় না। সে ১২টার পূর্ব্বেই আসে।···আজ প্রথম ব্রহ্মসূত্রের প্রথম কর্ম্মার কাইল কপি প্রতিভা নিয়া আসে।···রেজাউল করীমের এক চিঠি আসে। ইব্রাহিম পিতা, ইসমাইল পুত্র।

১৩ই জুলাই

সকালে ব্রহ্মসূত্র দেখি। প্রতিভা ১১টার মধ্যে আসে। রেণু কলিকাতা হইতে আফিসে যাইবে, এখানে আর আসিবে না বলিল। সে বার্মাশেল, যুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে যাবে। ২টার পর গীতা ও সুধীর আসে। সুধীরের বর্ত্তমান বর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়। যে-কোন সময়ে যে-কোনও অবস্থা হইতে মানুষ নূতন করিয়া রওয়ানা হইতে পারে, ইহাই পুরুষোত্তম-দর্শনের বৈশিষ্ট্য। সুধীর এখন আর মেডী না করিয়া কোহিনূরের কাছে শামুকতলায় ডিস্‌পেনসারী খুলিবে যে ঔষধপত্র তাহার আছে তাহা সম্বল করিয়া। এবং সকালে ১ ঘণ্টা বিনা পয়সায় লোক দেখিবে, ঔষধের দামটী লইবে, আর সর্ব্বোপরি নিজের বন্ধের উপর আস্থা রাখিয়া খুব খাটিয়া যাইবে, তাতেই পথের সন্ধান মিলিবে। সুধীর যেন বাগানে গিয়া ২ দিনের বেশী বিশ্রাম না করে। কোনও রকমেই যেন সেখানের উপর ভার না হয়। ওখানে থাকিতে পারিলে সব দিক দিয়াই সুবিধা। নীলুর জীবনের স্পর্শে উহাদের জীবনলাভের সুবিধা হইবে, নীলুরও কিছু সাহায্য হইবে। উহারা ৬টার পর চলিয়া যায়। বিজয় ও তাহার পুত্র গুণী আসে। বিজয়ের সঙ্গে বর্ত্তমান পরিস্থিতি, পরিপার্শ্বের প্রত্যেকের খবর, কারবারের অবস্থা বিশেষভাবে আলোচনা হয়।···

১৪ই জুলাই

কলিকাতা—মেদিনীপুর

আজ ব্রহ্মসূত্র রিকাইস করার পর ৮৷৷০টায় আফিসে যাই প্রুফগুলি ঠিক আছে কি না দেখিবার জন্য। রেণু ৯টার পর কলিকাতা যায়, ১২৷৷০টায় ফেরে।···৩৷৷০টায় গাড়ী আসে।·· যমুনাবাবুর বাসা হইয়া স্টেশনে আসি। আমরা এখানে ১০৷৷০টায় পৌঁছি। খড়্গপুর হইতে বাসে

আসি। গাড়ীতে আসিতে প্রায় অর্ধেক রাস্তা মন্মথ-বাবুর সঙ্গে দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে করণীয় কি, আমার বর্ত্তমান কর্ম্মপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়।.....ব্রহ্মসূত্র উপলক্ষে বেশ খাটুনি পড়িয়াছে। খাটুনিতে আনন্দ আছে, কিন্তু চোখের ক্ষতি হয়। কর্ম্মকে কর্ম্ম হিসাবে যতদূর পারিয়াছি, মর্য্যাদা দিয়াছি। তাই কর্ম্ম আমাকে কোনদিনই ফাঁকি দেয় নাই। কর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠাশীল ব্যক্তির কাছে কর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষেত্র অবশ্যই সাজানো আছে—এই কথাগুলি সুধীরকে বলিয়া ছিলাম। নিজেও ইহার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি। প্রাণ ঢালিয়া কাজ করিয়াছি, কোনও গোঁজামিল দেই নাই, কর্ম্মের মূল চাহিয়াই কাজ করিয়াছি।

১৫ই জুলাই

মেদিনীপুর

সকালে এখানের মন্মথবাবু, চারু মাইতি, নরেনবাবু এক মিলিত কমিটিদ্বারা বি, পি, সি, সি,-র nominee ঠিক করিতে বসে, সেখানে বসি। ইহার পূর্ব্বে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শান্তিবাবুর সঙ্গে আমাদের দর্শন সম্বন্ধে প্রায় তিন ঘণ্টা আলোচনা হয়। রামসুন্দর সিংহ, গোপাল অধিকারী, মৃত্যুঞ্জয় জানা প্রভৃতি উপস্থিত ছিল। ১২টায় কলিকাতা হইতে রায় বাহাদুর রমণী ব্যানার্জী প্রভৃতি ৮জন উকীল আসে। ক্ষুদ্রীবাবু পরিচিত। তিনি আমাকে চেনেন। তিনি অশ্বিনীবাবু জগদীশবাবুর প্রিয় ছিলেন বলিলেন। তাহার সঙ্গে অন্যান্য উকীলদের সামনে আমার দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয়) তিনি উজ্জল-ভারতের গ্রাহক ছিলেন। মাঘ মাস হইতে পত্রিকা পাঠাইতে বলিলেন।...উকীলগণ ৪॥০টায় চলিয়া যান। ছয়টায় রিক্সা করিয়া সভায় (বিদ্যাসাগর হলে) পৌঁছি। কিছু পরেই সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতি হন যতীন মাইতি। যতীনবাবুর মেয়ে 'বন্দেমাতরম্' গান করে। তারপর মন্মথবাবু ভূমিকা করেন। মহাত্মা গান্ধী রাজনীতি ছাড়িয়া দেশসেবার ও কন্ট্রোল তুলিয়া দিবার কথা বলিয়াছিলেন। কংগ্রেসকর্ত্তারা তাহা শুনিলেন না। দুর্নীতিতে দেশ করিয়া দিয়াছে। জনসাধারণ নিজের পায়ে দাঁড়াইলে অনেক কিছু করিতে পারে। চোরাবাজার বন্ধ করিতে হইলে জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। তৎপর সান্তকড়িপতিবাবু কিছু বলেন। তারপর আমি বলি। বুকের রক্ত দিয়া যে কংগ্রেসকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা আজ সর্ব্বসাধারণের কাছে নিন্দিত হইয়াছে। সে আজ দেশের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। সেই বেদনায় বেদনাতুর হইয়া মেদিনীপুর আসিয়াছি। মেদিনীপুরের সঙ্গে আমার নাড়ীর যোগ রহিয়াছে। কয়েক হাজার মাইল আমি মেদিনীপুরে সেবা লইয়া ঘুরিয়াছি। মেদিনীপুর কখনও আত্মদ্বন্দ্বে কলঙ্কিত হয় নাই। আজ আবার তাহাকে পথ দেখাইতে হইবে। কংগ্রেস সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বেদনা বোধ করিতেছি—Inspite of all thy faults, I love thee still—বিষবৃক্ষেঽপি সংবর্দ্ধ স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্। সেই কংগ্রেসের সঙ্গে ভক্তির লড়াই, প্রীতির লড়াই করিতে হইবে, যেমন রামপ্রসাদ তাহার মায়ের সঙ্গে করিয়াছিলেন, 'আর মা সাধন সমরে, দেখি মা হারে কি পুত্র হারে'। দেশ ইংরেজ-বিতাড়নের রাজনীতি করিয়াছে, বিদ্বেষ প্রচার করিয়াছে। আজ শূন্য; সেখানে বলিবার কোনও কথা নেতাদের, কর্ম্মীদের নাই। দেশ-সেবা লইয়া কয়জন নামিয়াছিল? জনসাধারণ সহায় না হইলে গভর্ণমেণ্ট কি করিবেন? মানুষ নিজের জন্য নিজে না করিলে ঈশ্বর জীবের কিছু করিতে পারেন না। তাই নরনারায়ণ। গীতায় ভগবান বলিলেন, আত্মনা উদ্ধরেৎ আত্মানম্'। আমার উদ্ধার আমি না করিলে জওহরলাল আমার কি উদ্ধার করিবেন? গভর্ণমেণ্টের অপর অর্দ্ধ জনসাধারণ। আমরা জওহরলালকেও সৃষ্টি করিতে পারি—ইহাই স্বরাজ। জনসাধারণ এখনও তাহা পারে নাই। পূর্ব্ব হইতে অধিকতর ত্যাগ লইয়া কর্ম্মীদের জনসাধারণকে লইয়া থাকিতে হইবে। জয়-বিজয় যেমন ভক্তির ঠাকুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কর্ম্মীদিগকেও তেমনি ভক্তির পাত্র কংগ্রেসের সঙ্গে ভক্তির লড়াই করিতে হইবে। বক্তৃতা ছোটর মধ্যে বেশ সুন্দর হইয়া

ছিল। রামসুন্দরবাবু বলিলেন, আজ বরিশালের শ্রেষ্ঠ বোধের বক্তৃতা শুনিলাম। আমার সহযোগী মেদিনীপুরের বন্ধুদের পার্মিটের মোহ, পদীর মোহ ছাড়িয়া জন-সাধারণের চরণতলে ফিরিয়া আসিতে নয়নের জলে অনুরোধ জানাই।

বাসায় ফেরার পরেও মন্মথবাবুদের কমিটির আরও আলোচনা হয়।...

১৫ই জুলাই

রথযাত্রা

...কংগ্রেস অফিসে যাই কতদূর হাঁটিয়া, পরে রিক্সায়। সদর মহকুমা কংগ্রেস কমিটীর মীটিং বসে সভাপতি চারু মহান্তি।.....আমি কিছু বলি—means justifies the end—এবং ভরতের হাতে রাজ্য দিয়া রামচন্দ্রের বনে চলিয়া যাওয়া। সব সময়েই 'সমগ্রত্ব' রক্ষা করার নীতি আজ গ্রহণ করিতে হইবে। ১টার পর বাসায় আসি। আজ মন্মথবাবুর মায়ের রথে বহু লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। আমি, মন্মথবাবু, সাব ডেপুটি শান্তিবাবু ও তাহার বন্ধু রামসুন্দরবাবু এক স্থানে বসিয়া প্রসাদ পাই। একটু বিশ্রাম করি বাইরে। বৈকালে জগন্নাথতত্ত্ব আলোচনা করি; গোপাল অধিকারী, চারুবাবু প্রভৃতি ছিলেন। মন্মথবাবুর রথ ৫টায় তাহার গোপাল-সহ বাহির হয়, ৭টায় ফেরে। প্রায় ৮টায় মন্মথবাবু জগন্নাথদর্শনে বাহির হন, আমি যাই না। এক রিটায়ার্ড বড় পুলিশ অফিসারের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা হয়, ভদ্রলোকের বেশ আলোচনা আছে। ব্যারিষ্টার দিওা পত্রিকা পাঠাইতে বলিয়াছেন তাহার স্ত্রীর নামে। আলোক-কেন্দ্র গ্রন্থাগারের নগেন্দ্র ঘাসওয়ালা (পোঃ আলোককেন্দ্র, জিঃ মেদিনীপুর) পত্রিকা V.P. করিতে বলেন।...

১৭ই জুলাই

মেদিনীপুর হইতে কলিকাতা

সকালে বেশ বৃষ্টি হইতেছিল। গত রাত্রির মাঝা-মাঝি হইতে বৃষ্টি সুরু হইয়াছে। পোটলাপুটলি লইয়া ৭টার সময় বাসে আমরা সবাই খড়্গপুরের জন্য রওয়ানা হই। ৮টায় মেদিনীপুর লোকালে রওয়ানা হই। মাত্রাজ মেইল আসিতে ৪ ঘণ্টা লেট। হাওড়ায় আসিয়া পৌঁছি ১২-১০-এ। মন্মথবাবুর গাড়ীতে তাহার ছেলে জ্ঞান আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া যায়। খাইতে বসিয়াছি এমন সময় প্রতিভা পোষ্টাফিস হইতে আসে। বেণু আসে ৯টার সময় মদন গ্রামোফোন কোং হইয়া। সকালে সে ছাতা দিয়া গিয়াছে। ৫টায় আমরা আফিসে যাই। অতিরিক্ত বসিয়া থাকার জন্য কোমরটায় বেশ বেদনা। আর বসিতে পারি না। ট্রেনে এক উন্মাদকে লইয়া সকলে রগড় করিতেছিল। মন্মথবাবুও এক পাগল উকিলের কথা বলিলেন। পাগল উকিলটী ভাবিতেন তিনি শীঘ্রই হাইকোর্টের জজ হইবেন। অন্য সব বিষয়েই জ্ঞান। যদি একজন বলিতেন, 'Sir', আর তো আপনাকে 'Sir' বলা চলিবে না, কিছুদিন পরেই 'My Lord' বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিতে হইবে, তিনি লাফাইয়া চটিয়া গিয়া কোথা হইতে তবে তাহার জজ হওয়ার কথা শুনিলেন, তাহা বেশ তৃপ্তির সঙ্গে শুনিতেন। আমি বলিলাম, কোনও আদর্শ, কোনও কর্মের সঙ্গে একেবারে 'এক' হইয়া যাইবার বিপদ ইহাই। ইহাতে উন্মত্ততা আসে। সেইজন্যই তো প্রত্যেকের তাহার আদর্শ বা কর্মের সঙ্গে 'পরকীয়'ভাবে যুক্ত থাকা উচিত। নইলে উন্মত্ততা অনিবার্য। আফিসে জ্ঞানেন্দ্র বাবু আসেন। তাহার সঙ্গে উন্মাদদের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়। নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া নিজেদের প্রতিকার না করিলে স্থায়ী প্রতিকার হইতে পারে না, তাহা আলোচনা করিলাম। মেদিনীপুরের unity-move-এর কথা বলিলাম। আফিস যাইতে বাড়ীর দুয়ারেই শিশিরের সঙ্গে দেখা। সে-ও আফিসে যায়। ৮টা পর্য্যন্ত থাকে...।

১৮ই জুলাই

কোমরের বাত বৃদ্ধি পাওয়ায় বসিতে না-পারায় জন্য সকালে প্রার্থনায় যোগ দিতে পারি না। শুইয়া

শুইয়া ব্রহ্মসূত্র রিভাইস করি।...জানিলাম যে গত ৩০শে আষাঢ় হাওড়া হাসপাতালে হরিপ্রসাদ মারা গিয়াছে। হরিপ্রসাদ শ্বশুর-শ্যালকের চেয়েও আমাদের আপন মনে করিত। আদর্শবাদী ছিল। যাহা সে করিতে পারিত, তাহা পারিল না। গঠনমূলক কর্মের দিকে খুব ঝোঁক ছিল। নিজে কৃষিক্ষেত্র রচনা করিয়া ছিল। শাকসব্জী, ফল প্রভৃতির বাগান সে নিজ হাতে করিয়াছে।...

রেণু উষাঙ্গিনীর চক্ষু দেখাইবার জন্য মঠের সংলগ্ন চশমার দোকানে যায়।...৭৷৷০টায় পর আফিসে যাই ধীরেনবাবু আসিতে পারেন এই আশায়। যাওয়ার কিন্তু পরেই রেণু ফেরে। ধীরেন চৌধুরী ডাক্তার এখানে ঘুরিয়া আফিসে যায়। তাহার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ হয়। সে ভবানীপুর আসিয়াছে। মাঝে মাঝে আসিবে।...১টার পূর্বেই ফিরি। ফিরিয়া শুনি গত শনিবার রাত্রিতে গোপাল গুপ্ত মারা গিয়াছেন।...

১৯শে জুলাই

কে লইবে মোর কার্য্য কহে সন্ধ্যা রবি
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, স্বামি,
আমার যেটুকু সাধ্য, করিব তা আমি।

—রবীন্দ্রনাথ

উপরের কবিতাটুকু কেহু কাছ হইতে পাইলাম। খুব ভাল লাগিতেছে। আমিও তো ছোট মাটির প্রদীপের মত বাতুলের প্রচেষ্টায় শ্রীনিতাগোপালের কাজ করিয়া চলিয়াছি। আজ কোমরের ব্যাণ্ডেজটার উদ্বেগ কমিয়াছে।...শনিবারের চিঠি হইতে রেজাউল করীমের 'পাকিস্থানের অভিশপ্তি' প্রবন্ধটী ও প্রবাসী হইতে নির্মল বসু 'নেহরু-লিয়াকত' চুক্তি প্রতিবা পড়িয়া শুনায়। হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধের মূল ধরিয়াছেন লেখক অর্থ-নৈতিক, মধ্যবিত্তদের মধ্যে শক্তির কাড়াকাড়ি। কিন্তু ইহা কি আরও গভীর অন্য কোন কারণের বহিঃপ্রকাশ নয়? এক হাজার বৎসরের পূর্বের সন্ধান কেন? কাল্পনারাল সন্ধান না ধরিলে সব, ঘটনার মীমাংসা সম্ভব হইবে না। একজন মুসলমান রেজাউল করীমের মত এইভাবে ভাবিতে পারেন, ইহা আমার ধারণা ছিল না। ভাল লাগিল।...

২০শে জুলাই

আজ সকালে ঠাকুর ঘরে বসিয়া প্রার্থনা করিতে পারিলাম। পরে ব্রহ্মসূত্র রিভাইস করি।...ধীরেন ব্যানার্জীর সঙ্গে রেণুর পথে দেখা।...ইহার পর চিঠি আসে। তাহার নিকট গিরিজাবাবুর সম্বন্ধে বিস্তারিত শুনি।...

সকাল হইতে ব্রহ্মসূত্র রিভাইস করি।...১২টার আগে গোছুল ছানা ও উজ্জ্বলভারতের ৩টী file ও ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ফাইল কপি দিয়া যায়। তাহার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা হয়। পুরুষোত্তম-দর্শন বরণ করিয়া লইলে যে জীবন লইয়া অগ্রসর হয় আটকাইতে পারিবে না, তাহা আলোচনা হয়। রেণু কলিকাতা ঘুরিয়া ২টায় আসে। প্রতিভা আসে প্রায় ৩টায়...বলাই দেবশর্মা আসিয়া উপস্থিত। ১২ বৎসর পর দেখা। আমার ঘরে আসিয়া বসিলাম। লেখা ভাস্কগুলি দেখানো হইল। কথা বলিতে বলিতে আমরা আফিসে গেলাম। তাহার পত্রিকার কথা, আর যাদের কথা, ওপানকার শ্রীকুমার মিত্র, বলাই মুখোপাধ্যায় ইত্যাদির কথা, জিজ্ঞাসা করি। সামনের পথ তেমন স্পষ্ট নাই বলিয়া অনেকখানি নিরাশ। তবুও অনেকটা হাসিমুখে চলিতেছে। পথে যাইতে যাইতে বলিতেছিল—আমার চেয়ে আপনি ভাল আছেন। সেই যে উপনিষদে আছে—মুখ দেখিয়া মনে হইতেছে যে তুমি ব্রহ্মলাভ করিয়াছ, আপনাকে দেখিয়াও তাহাই মনে হইল। আপনাকে দেখিয়া অনেক পাইলাম।...কিন্তু পরেই রাইহরণবাবু আসেন। পরেই মাখনবাবু আসেন...

২২শে জুলাই

সকাল হইতে ব্রহ্মসূত্র রিভাইস করি। প্রায় ১২টায় সোকুল আসে চানা লইয়া। বেণু আজ সকালে পার্ক স্ট্রীটে সতীকান্ত গুহের বাসায় যায়। ১১টার পর ফেরে। সোকুলের সঙ্গে আমার এক ঘণ্টার উপর আমার খাওয়া-দাওয়ার পর আলোচনা হয়। সময় গড়িয়া তোলা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। সংসারের বাস্তব টান সামলাইতে হইলে বাস্তব-আদর্শ সমন্বিত একটী জীবন্ত মানুষের টানে পড়া প্রয়োজন, না হইলে সম্ভবও হয় না', ব্যক্তিগত জীবন চালানোই সম্ভবপর নয়। আমি সোজাসুজি দিয়া কোন কিছু পাইতে চাই না। বর্ত্তমান সময়ে মেয়েরা স্বামীর চেয়ে মনে, গায়ের জোরে, সমাজ ব্যবস্থায়, বয়সে ছোট তো থাকেই বিদ্যায় অবশ্য সমান সমান আজ কেহ কেহ হয়। যাহারা বাহিরের আবেষ্টনকে বিপ্লবের ভিতর দিয়া বদ্ধা দিতে পারিবে না, তাহাদের পক্ষে বিবাহিত জীবন যাপন চলে যদি তাহারা পুরুষোত্তম-দর্শন চায়। বাহির ও ভিতর দুই দিক দিয়া সমাজকে বদ্ধা না দিলে এ সমাজ-কাঠামোকে কিছুতেই গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইবে না। বিবাহ না-করা সম্ভব হয় যদি wedded to the world কেহ Jesus-এর মত হন। ভগবান প্রাপ্তির জন্য সন্ন্যাস স্বীকার আমি করি না। যাহারা ভগবানের জগৎ নিয়া থাকিবেন, তাহাদের জন্যই সন্ন্যাসের ব্যবস্থা। সন্ন্যাসীরা হইবেন ভগবানের 'স্বেচ্ছাসেবক'।...ঠাকুর করিমপুরে কোনও সময়ে কালেক্টরীতে কাজ করিতেন। একদিন সরকারের অনেক টাকা নিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, তখন একজন লোক রাস্তায় পাতার উপর দিয়া মচমচ করিয়া অনুসরণ করিতেছে টের পান। পুলের নিকট গেলে লোকটী মাথায় লাঠি মারে। ঠাকুর লাঠি ধরিয়া সেখানেই তাহাকে জড়াইয়া ধরেন। দুই জনে জড়াজড়ি করিয়া গড়াইতে গড়াইতে ঢালু স্থান দিয়া মাটিতে পড়িয়া যান। ঠাকুর থাকেন উপরে, সেই লোকটী নীচে। ঠাকুর ঘুসির উপর ঘুসি চালান। লোকটী হেঁসের মত হয়। ঠাকুর দৌড়াইতে দৌড়াইতে বাসায় আসেন। পরের দিন লোকটী আসিয়া ঠাকুরকে 'দোস্ত' বলিয়া মিলিত হন।—এই কথা বেণু প্রতিভা এখানে থাকাকালীন বলি।

২৩শে জুলাই

ব্রহ্মসূত্র রিভাইস করি সারা সকাল। প্রতিভা উদ্বোধন আসিতে পারে এই ভরসায় খাওয়া দাওয়া করিয়া পোষ্টাফিসে সতীশ গুহের নিকট সহর পড়া বই খণ্ড ও কোনোপনিষদ্ রেজিষ্টারী করিয়া বেণুর স্থানে আসে....আমি ৫টা পর্য্যন্ত ব্রহ্মসূত্র রিভাইস করি। ৫।০টার পর বিশির আসে। তাহার সঙ্গে কিছু কথা কওয়ার পর আফিসে যাই।...রাহতা সম্বন্ধে কথা হয়। রক্ষাকালী পূজার জন্য পাঁঠা বলি দিতেই হইবে। দুর্গাপূজায় কালীপূজায় পাঁঠা-বলি-বন্ধ করা যায়, কিন্তু গ্রাম্য দেবতা রক্ষাকালীর পূজায় পাঁঠা বলি বন্ধ করা চলিবে না। হিন্দুর বর্ণাশ্রম ও মুসলমানদের অধিকারবাদ যে পরস্পরের পরিপূরক হইতে চাহিতেছে—ইহা এখন হইতেই শিক্ষার ভিতর দিয়া ছড়াইয়া দিতে হইবে। উদ্বোধন পড়া ও পড়ানো প্রয়োজন।...আগামী ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে রাহতা থাকিতে হইবে। ১৩ই বৈকালে যাইবার ইচ্ছা রহিল। প্রায় ১০টায় আশ্রমে ফিরি।

২৪শে জুলাই

সকালে ব্রহ্মসূত্রের *প্রুফ* দেখি। ৮টার পর আফিসে যাই। প্রতিভা একাই পত্রিকাগুলিতে র‍্যাপার লাগায়, টিকিট লাগায় ও খাতায় লেখে। কিছু পরে রাধাচরণ-বাবুর ছেলে ও তাহার বন্ধু আসে। তাহাদের সঙ্গে নিয়া প্রতিভা প্রথম দফা পত্রিকা পোষ্টাফিসে দিয়া আসে। প্রায় ১২টায় আমি ও প্রতিভা বাহির হই। বেণু ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মসূত্রের রুপি ও একটী কাইনাল অর্ডার প্রেসে দিয়া আসে।...আমি ৩।০টার পর আফিসে যাই। বৈকালে গ্রাহকদের পর পত্রিকা সরস্বতীসহ প্রতিভা পোষ্টাফিসে দিয়া আসে।...ব্রহ্মসূত্রের পাণ্ডুলিপি ৭৪ পৃঃ হইতে ১২১ পৃঃ পর্য্যন্ত দুই ভাগে (৭৪-৯৭) (৯৮-১২১) প্রেসে দেওয়া হইল।

২৫শে জুলাই

সাময়িকী

গীতাজয়ন্তী : বিগত ২রা পৌষ ১৩৬৮, ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৬১ অগ্রহায়ণের শুক্লা একাদশীতে গীতাজয়ন্তী দিবসে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখিত 'গীতা-জয়ন্তী' প্রবন্ধটি আমরা নরনারায়ণ আশ্রমবাসীরা স্মরণ করিয়াছি ;—বন্ধুজনদের বুঝাতে গীতা সম্বন্ধে চব্বিশ বৎসর আগের প্রকাশিত পুরুষোত্তমানন্দের চিন্তাধারা খানিকটা এইখানে উপস্থিত করিতেছি।

"...শ্রীভগবান্ উবাচ—এই মহাবাক্যটীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গীতাকে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। গীতা পুরুষোত্তমতত্ত্বের শাস্ত্র, নরনারায়ণের বাণী। গীতার ধর্ম 'নরনারায়ণীয় ধর্ম।' নরের স্তরে দাঁড়াইয়া, নরকে মান-কৈবল্য (Body of reference) ধরিয়া অদ্বৈত-দ্বৈত প্রভৃতি যত বিবদমান মতবাদের আজ পর্য্যন্ত উদ্ভব হইয়াছে, একমাত্র নরনারায়ণের স্তরেই উহার সমন্বয় সম্ভব। নরনারায়ণের স্তর হইতে কথিত শাস্ত্রকে একান্তভাবে নরের স্তরে দাঁড়াইয়া ব্যাখ্যা দিলে দলাদলি হইবেই, হইয়াছেও তাহাই। গোড়ায় গলদ। স্তরের ভুলেই সব ভুল হইয়াছে। প্রতিবিপ্রতিপন্ন সম্প্রদায়সমূহ সৃষ্টি সম্বন্ধে, প্রভু সম্বন্ধে, মায়া সম্বন্ধে পরস্পর বিবদমান মতবাদসমূহ প্রচার করিয়া যখন বিশ্বময় পরস্পরকে আহ্বান করিতেছেন, তখনই প্রয়োজন হইল নরের কানে কানে, প্রাণে প্রাণে নারায়ণের কথা বলিবার। যখন সর্ব্বশাস্ত্র, ভাইসব-এর কথাতেই ব্যাপারের মীমাংসা হয়, তখন পর্য্যন্তও সম্রাটের কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই। তেমনি যতদিন নরের শাস্ত্রে কুলাইত, বিশ্বের সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইত, ততদিন নারায়ণের শাস্ত্র বলিবার কোনও প্রয়োজন হয় নাই। কেবল উঠিয়াছে, সে বুঝে নৌকা ভাসাইবার সাহস সেই এক পুরুষোত্তম কৈবর্ত্তেরই আছে ; কোনও মুনি-ঋষি-সাধক-সিদ্ধের ক্ষমতা নাই যে ঐ ঝড়ে দেহ ছিন্নি ছাড়ে। প্রশ্ন যদি কেবল আধ্যাত্মিক হইত, তিনি আধিদৈবিক হইত, কিম্বা আধিভৌতিক হইত, শ্রেষ্ঠ নরগণের দ্বারা তাহার মীমাংসা সম্ভব ছিল আজিকার প্রশ্ন—ব্রহ্ম ও জগৎ, Idealism (আদর্শবাদ) ও Materialism (জড়বাদ) দুয়েরই ব্রহ্মসত্তা ও জগৎসত্তা—এই দুই সমস্যার টানাটানির ভিতর বিশ্ব আজ দাঁড়াইয়াছে। কে মীমাংসা দিবে ? ভগবান্ ছাড়া কথা বলিবার দ্বিতীয় পুরুষ নেই। নরের শাস্ত্র নিজের লয়, নির্ব্বাণ, সমাধির ব্যবস্থা ছাড়া কিছুই দিতে পারে না। নরের সিদ্ধান্ত "ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা"। নর নিজের অস্তিত্ব নিজে রক্ষা করিতে পারে না ; সে-নির্ব্বাণই তাহার শেষ কথা। জীবজগতের কোনও মূল্য তাহার শাস্ত্রে থাকিতে পারে না। নৈষ্কর্ম্মেই তাহার সিদ্ধি, কর্ম্মক্ষেত্র তাহার দুই দিনের। নর যেমন নিজের মরণ দিয়া, নিজ সাংসভূমি এই জগতের মিথ্যার প্রমাণ করিয়া নারায়ণকেই প্রতিপন্ন করিতে যায়, পক্ষান্তরে নারায়ণের শাস্ত্র নিজেকে মুছিয়া ফেলিয়া নরের অস্তিত্ব, মুমুক্ষুর মূল্য, কর্ম্মের গৌরব স্থাপন করিতেছে। নারায়ণের শাস্ত্রে "ব্রহ্ম মিথ্যা জগৎ সত্যম্"। নর বলেন—তুমিই আছ, আমি নাই, আমার জগৎ নাই, কোনও কর্ম্ম নাই ; নারায়ণ বলেন—তুমি আছ, আমি নাই, জগৎ সত্য, মায়া সত্য, কর্ম্ম সত্য, বিকার সত্য, বিশ্ব সত্য, নামরূপ সত্য। নরের শাস্ত্রে নামরূপ মিথ্যা ; অনাম-অরূপকে প্রতিপন্ন করাতেই সেখানে নামরূপের মূল্য ; নারায়ণের শাস্ত্রে অনাম-অরূপ বিশ্ব নামরূপের শ্রীচরণতলে নিজেকে ডুবাইয়া নাম-রূপের মহিমা, এক কথায় প্রকৃতির জয়-জয়কার ঘোষণা করিতেছেন। নরের মাঝে নারায়ণের অস্তিত্ব লয়, জীবজগতের মাঝে গোলোক-বৈকুণ্ঠের নির্ব্বাণেই নারায়ণের

শাস্ত্র অবতারবাদের ভিত্তির দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে। মাটির ব্রহ্মধাম এই নারায়ণের শেষ স্থিতিক্ষেত্র, যেখানে প্রকৃতির চরণতলে পুরুষ, নামরূপের চরণতলে অমায়-অরূপ, বাক্যের চরণতলে অবাক্, বিশ্বেশ্বর, কর্মের চরণতলে নৈষ্কর্ম্য, ব্যাখানের চরণতলে সমাধি—"দেহি মে পাদপল্লবমুদারম্।"

গীতা তাইতো অষ্টাদশাসের শাস্ত্র, নরনারায়ণ-সংবাদ, কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ, কর্ম-নৈষ্কর্ম্যের সমন্বয়সংবাদ, ঈশ্বর ও মায়ার সমন্বয় সংবাদ; চিৎ ও জড়-এর সমন্বয়সংবাদ; যোগেশ্বর-মনুষ্যের সমন্বয়সংবাদ। শ্রীভগবান্ যাহা বলেন তাহারই নাম ভাগবত ধর্ম।...

নবের শাস্ত্রে জীবনকে "সরল" করার উপদেশই রহিয়াছে। তাই না আমরা কালমাহাত্ম্যের বল পূর্ণ জটিলতার ক্ষেত্র [illegible] পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র হইতে না' বাঁচাইয়া ব্রহ্মচারী বলিবার জন্য এত লালায়িত? আদর্শ যদি হয় "সরল জীবন," ব্রহ্মচর্য্য তাহার এরূপ; আদর্শ যদি হয় জটিল জীবনে ব্রাহ্মীস্থিতি, সেখানের ব্রহ্মচর্য্য তো বিভিন্ন ব্যাপার নিশ্চয়ই হইবে। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ জটিলতম জীবনলাভের শ্রীবালীরূপে ব্রহ্মচর্য্যের নূতন জীবন্ত পন্থার অন্বেষণ করিলেন। তাই না গোপালতাপনী উপনিষদে শ্রীব্রহ্মবৈবর্তগণ মুনিবর দুর্বাসাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"কথং কৃষ্ণঃ ব্রহ্মচারী"—কৃষ্ণ কি করিয়া ব্রহ্মচারী? কৃষ্ণ-ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা গীতায় আছে, যোদ্ধা-ব্রহ্মচারীর খবর গীতায় আছে। মায়াজয়ে ভীত, ভীরু-কাপুরুষ-হৃদয়দুর্বল ব্রহ্মচারীর জন্য গীতা বলিতে আসেন নাই। ইহাই 'শুদ্ধতম' ব্রহ্মচর্য্য। সত্যিকার ব্রহ্মচর্য্য সেখানেই, যেখানে জটিলতা-কুটিলতায় নিত্য-সত্য মর্য্যাদা দান করিয়া তাহাতেই স্থিত করিবার মত যোগবল, যৌগবল পুরুষের হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে। পলায়নপরতায় নাম ব্রহ্মচর্য্য নয়; আবার সাথ করিয়া ইহুন দিবার কথাও ব্রহ্মচর্য্য নাই। গীতা তাইতো আমাদের মনুষ্য স্তরের উপরের স্তরের শাস্ত্র।" ভগবান্ তাইতো বারবার অর্জুনের "মন" লইয়া টানাটানি করিতেছেন—"মন্মনা ভব"—"ময্যেব মন আধৎস্ব" ইত্যাদি। গীতা মনের স্তরে দাঁড়াইয়া বলা বা লেখা শাস্ত্র নয়। গীতার স্তর আত্মার স্তর হইতে উচ্চে; সেখানে আসীন হওয়াই উদাসীন হওয়া; উদাসীন হওয়া অর্থ-উৎ-আসীন, পুরুষোত্তমে আসীন হওয়া। "উদাসীন"-এর ইংরাজী প্রতিশব্দ indefferent নয়। গীতা প্রাণস্তরের শাস্ত্র....

বিশ্বকে, বিশ্বের আত্মাকে শক্ত (rigid) করিয়া মানিয়া লওয়াই মনস্তত্ত্বের নিয়ম। মনের লক্ষণ মহর্ষি গৌতম দিতেছেন—"যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তিঃ মনসো লিঙ্গম্"—যুগপৎ-জ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়াই মনের চিহ্ন। যেখানে মনের কাজ, সেখানে যুগপৎজ্ঞান (simultaneity, togetherness) অসম্ভব। [illegible] অতি-বাস্তির যুগপৎ অস্তিত্ব মনের স্তরে বাস্তবিকই সম্ভবপর নয়। কিন্তু পুরুষোত্তমস্তরে, শুধু এই স্তরেই, সব পরস্পর বিরুদ্ধ (contradictory) মতবাদের যুগপজ্জ্ঞান সম্ভব।...

আগে concrete, পরে abstract পূর্ণে তো চাই একটি অখণ্ড বাস্তব জীবনকে জীবন দিয়া আপনার করা। কৃষ্ণজীবনে কোঠাভাগ-নীতি নাই। ভাগবত গাহিতেছেন—মল্লানামশনিঃ নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্, গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাম্ শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ। মৃত্যুর্ভোজপতেঃ বিরাডবিদুষাম্ তত্ত্বং পরং যোগিনাম্" বৃষ্ণীনাং বাসুদেবেতি বিদিতঃ ব্রহ্ম পরং সাত্ত্বতঃ।...

শ্রীযুক্ত দ্বিজ কর্ত্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।